মঙ্গলকাব্যে
বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন

তত্ত্বাবধানে
ডঃ মঞ্জুলা বেরা (রীডার)
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
বিকাশচন্দ্র পাল

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. (কলা)
ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

Ref
80·901
বিকা/মহাল

198550
29 AUG 2007

STOCK TAKING - 2011

নিবেদন

পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্তরে পড়ার সময় মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ থাকলেও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা শেষ করার পর গবেষণার জন্য মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী হই। প্রথম থেকেই বাঙালী জাতি, বাঙালীর সামাজিক পরিকাঠামো, ধর্ম-কর্ম, বাঙালীর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল। কিভাবে কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে বাঙালী বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তার ঐতিহ্যমূল কোথায় প্রোথিত আছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ছিল। বিভাগীয় প্রধান ডঃ মঞ্জুলা বেরার নিকট জানতে চাইলে তিনি অতি প্রাঞ্জল করে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। তাঁর অসাধারণ ধী-শক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। মনে হয় একমাত্র মঙ্গলকাব্যেই আমার যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেতে পারি। তখনই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে থেকে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের উপাদান অন্বেষণে নিরত হই। এ বিষয়ে আমি সব রকমের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি আমার গবেষণা-তত্ত্বধায়িকা ডঃ বেরার নিকট থেকে।

আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়িকা গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ-নির্দেশ ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে নানা কাজের মধ্যেও কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ভবনে, কখনো তাঁর নিজ বাড়িতে বিভিন্ন সময়ে বহু জটিল বিষয় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও সহায়তা ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ সুবোধ কুমার যশ বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান আলোচনা করে, উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। তাছাড়া বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা যাঁরা আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গবেষণার কাজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। তাঁরা এক বছর ছুটি মঞ্জুর করে কাজকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার পারিবারিক জীবনে যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন তাঁরা হলেন আমার শ্বশুর মহাশয় অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্বশ্রূমাতা ডঃ রমা চক্রবর্তী (মণ্ডল), শিক্ষিকা। তাঁদের আমি প্রণাম জানাই। তাছাড়া আমার মাতৃদেবী জ্যোতিরানী পাল, পিতৃতুল্য বড় জামাইবাবু বীরেন্দ্রনাথ পাল, অগ্রজ শ্রী হিরন্ময় পাল ও আমার দিদিরা প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের উৎসাহ ও স্নেহাশীর্বাদ ছাড়া একাজ সম্ভব ছিলনা। সর্বোপরি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রী প্রভাসচন্দ্র পাল ও বড়দা স্বর্গীয় শ্রী বিজনকুমার পাল জীবিত কালে যাঁরা আমার উচ্চশিক্ষালাভে অনেক ত্যাগ স্বীকার

করেছেন। তাঁদের প্রয়াত আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।

গবেষণা কর্মের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জলপাইগুড়ির আদর্শ ক্লাব ও পাঠাগার, কোলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার, কোলকাতা ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ গ্রন্থাগার ও কলেজস্থ বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়া সর্বক্ষণ পাশে থেকে, উৎসাহ দিয়ে, লেখা ও প্রুফ সংশোধনের কাজে সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা কেয়া মণ্ডল (পাল), দর্শন বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন কলেজ, দুর্গাপুর। তিনি তাঁর সাংসারিক কাজকর্ম ও অধ্যাপনার মধ্যে থেকেও সর্বদাই আমার পাশে থেকেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বাহুল্য মাত্র।

ধন্যবাদ জানাই বীরভূম ইনফোটেকের কর্মী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল ও শ্রীমান পার্থ বর্দ্ধনকে। তাঁরা গবেষণাপত্রটি ধৈর্য্য সহকারে সযত্নে মুদ্রিত করে সাহায্য করেছেন।

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ
সিউড়ী, বীরভূম

বিকাশচন্দ্র পাল

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিবেদন :	i – ii
ভূমিকা :	১ - ৯
প্রথম অধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ	১০ - ৫৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস	৫৪-১৩৯
তৃতীয় অধ্যায় : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস	১৪০-২৪০
চতুর্থ অধ্যায় : ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস	২৪১-৩১৫
পঞ্চম অধ্যায় : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস	৩১৬-৩৬০
ষষ্ঠ অধ্যায় : অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস	৩৬১-৪০২
সপ্তম অধ্যায় : মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন	৪০৩-৪৬৫
অষ্টম অধ্যায় : সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য	৪৬৬-৪৭৯
গ্রন্থপঞ্জী :	৪৮০-৪৯৬

ভূমিকা

ভূমিকা

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

. . . .

শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ'পরে
ওরা কাজ করে॥"[১]

'আরোগ্য' কাব্যের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবিগুরুর এই বাণী পরম ও চরম ঐতিহাসিক সত্যকে নির্দেশ করেছে। রোগশয্যায় শায়িত কবি জীবনের অন্তিম প্রহরে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেন,—যুগ যুগ ধরে বিজিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিহাসের ভগ্নস্তুপে মূক হয়ে আছে, আর তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে যুগান্তরের খেটে খাওয়া-শ্রমজীবী মানুষের বিপুল কর্মস্রোত। শাসকের রক্তচক্ষু আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি নয়, দেশের সাধারণ মানুষই প্রকৃত ইতিহাসের রচয়িতা।

সাহিত্য মানব জীবনের অনুকৃতি; আর কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ ও দেশ-কালের মধ্যে থেকেই উপকরণ আহরণ করে তাঁর নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলেন। এ কারণেই স্রষ্টার সৃষ্টিতে দেশ-কালের প্রভাব পড়বেই। যুগ যুগ ধরে কবি ব্যক্তিত্বের নিপূণ সমাজ বীক্ষণের তথ্য সমৃদ্ধ ফলাফল পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিতে। তাই ইতিহাস যেখানে মূক, সাহিত্য সেখানে সরব। ইতিহাসে আক্রমণকারী বা শাসককূলের ভাগ্য নির্ধারণের বিবরণ যতটা থাকে, সাধারণ জনজীবনের কথা সেখানে ঠিক ততখানি নীরব। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বাঙালীর ইতিহাসের অভাবের কথা বলেছিলেন এবং বাংলাদেশের যথার্থ তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার উপদেশ দিয়েছিলেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন, দেশ শাসন, সমাজব্যবস্থা, ধর্মবোধ, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি নানাবিধ বিষয়ের তথ্য সমৃদ্ধ একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কথা। এ বিষয়ে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা

'বাঙালীর ইতিহাস' ও ডঃ অতুল সুরের লেখা 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' বাঙালীর ইতিহাস আলোচনার গ্রন্থ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মাশ্রিত হলেও দেখা যায় এই সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার মাটি ও মানুষের বহু কথা, বহু উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত উপাদান আহরণের মধ্যে দিয়ে বাংলার জাতি, সমাজ ও দেশের অনন্য চিত্র অঙ্কিত হতে পারে এবং এর মধ্যে থেকেই পরিবর্তিত কালের বিবর্তিত চেহারা ধরা যেতে পারে। বাংলা মঙ্গলকাব্য নিয়ে বহু গবেষণা হলেও লক্ষ করা গেছে যে, ইতিহাসের তথ্য চয়নের কাজই বেশী হয়েছে। কখনো মঙ্গলকাব্যের বাঙালী সমাজ, কখনো লৌকিক উপাদান, কখনো নরনারী চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাঙালী সমাজের বিবর্তনশীল চরিত্র নিয়ে আলোচনা প্রকাশনা বা গবেষণা কোনদিকেই তেমন লক্ষ করা যায় না। এ বিষয়ে আমার গবেষণা নির্দেশিকা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরই পরামর্শক্রমে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণা নির্দেশিকার উপদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা হল তিনটি—মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণবপদসাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণবপদসাহিত্য অনেকটাই আদর্শায়িত সাহিত্য, সেখানে রচয়িতারা ইহলৌকিক জীবনকে উপেক্ষা করে কবি কল্পনা ও সীমাহীন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবকথা নির্ভর কাব্যকাহিনী গ্রহণ করেও বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেননি। তাই ইতিহাস আলোচনায় মঙ্গলকাব্যের যতটা গুরুত্ব আছে অনুবাদ সাহিত্য বা বৈষ্ণবপদসাহিত্যের ঠিক ততখানি গুরুত্ব নেই। এ কারণেই মধ্যযুগীয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যকেই গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সাহিত্য-ভিত্তিক ইতিহাস আলোচনায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকবেই; কেননা কবিরা ইতিহাস রচনা করতে বসেননি—সাহিত্য রচনা করেছেন। ফলে ঐতিহাসিক তথ্য আহরণে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,- "কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা ইহাতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষের সন্ধান করেন।" মঙ্গলকাব্যের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উপাদান চয়নে একথা মনে রাখা উচিত। কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি কল্পনা শক্তির ব্যবহার করে থাকেন, তাই তথ্য আহরণে সচেতন থাকা প্রয়োজন। আমাদের আলোচনা অবশ্য অনেকটাই জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধানের মত।

সমাজ চিত্র আর সমাজ ইতিহাস এক নয়, আর ইতিহাস কোন স্থাবর বস্তু বিশেষও নয়। সমাজ চিত্রে শুধুমাত্র সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির

সামগ্রিক উপস্থাপনা বোঝায়। কিন্তু সমাজ ইতিহাস বলতে যে সমস্ত বিষয়গুলি সমাজ সম্পৃক্ত, যেমন—রাজ্যশাসন, ধর্মবোধ, সমাজ পরিকাঠামো, অর্থনীতি ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ রূপকে বোঝায়। তাছাড়া ইতিহাস প্রস্তরখণ্ড মাত্র নয়, মানুষই ইতিহাসের মূল ভিত্তি, তাই এখানে যুগ পরিপ্রেক্ষিতে আপামর মানব স্বভাব, তাদের বোধ-অভিব্যক্তিকেও চিহ্নিত করে। কেননা প্রতিটি জাতির খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার থেকে ধর্ম, চিন্তা-চেতনা এমন কি তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র। তাই এখানে শুধুমাত্র সমাজচিত্র বলে সঙ্কীর্ণ না করে সমাজ ইতিহাস বলা হয়েছে।

ইতিহাস স্থাবর নয়, জঙ্গমতাই ইতিহাসের ধর্ম। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ধর্মবোধ, আচার-আচরণ, খাদ্যবোধ, পোশাক-পরিচ্ছদ ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। শুধু তাই নয়, মানব স্বভাবও বদলে যেতে থাকে। পঞ্চদশ শতক থেকে যে মঙ্গলকাব্যের জয়যাত্রা শুরু হল, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা প্রচলিত গঠনরীতি মাথায় রেখেও কাব্য আঙ্গিক ও কাব্য বিষয়ের তারতম্য ঘটে যাচ্ছে। মধ্যযুগে যেহেতু দৈবাদেশ ভিন্ন মানুষের করণীয় কিছুই ছিল না, তাই কাব্য বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে দৈব নির্দেশেই। মধ্যযুগে মানুষের ধর্মবোধের পরিবর্তনই কাব্য আঙ্গিকের বিবর্তন ঘটায়। সমাজের পরিবর্তনশীলতা সাধারণভাবে অনুভব করা দুষ্কর, তাই কাব্যরীতির পরিবর্তনের মধ্যে থেকে অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের মধ্যে থেকেই সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন ধরা সম্ভব। তাই মঙ্গলকাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনকে জানতে হলে মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ করা প্রয়োজন।

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি মোটামুটি পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালসীমায় রচিত হয়েছে। স্থূল বিভাজন অনুযায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল, ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল, সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল কাব্যকে ধরা যেতে পারে। প্রতিটি যুগ পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ কাব্যগুলির উদ্ভব ও বিকাশের কারণ নিহিত আছে। সুতরাং ঐ যুগ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেই সমকালীন ইতিহাসের ছায়াপাত আছে, তাই কাব্যধারা পরিবর্তনের মধ্যে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন খোঁজা একটি সার্থক প্রয়াস। কাব্যধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ-মানসের পরিবর্তন কাব্যে কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, লিপিবদ্ধ করাই এই গবেষণা নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

এই গবেষণা নিবন্ধের পদ্ধতি মূলত বিশ্লেষণাত্মক। প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সামাজিক বিবর্তন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তন যেহেতু গ্রাম্য সমাজের প্রেক্ষাপটেই ঘটেছে, সেহেতু সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন বলতে এখানে তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনকেই বোঝানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। একারণেই,ইতিহাস সমাজকেন্দ্রিক, ধর্মকেন্দ্রিক নয়। ধর্মকে সামনে রেখেই মধ্যযুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, কেননা ধর্মের অনুশাসনই সামাজিক পরিকাঠামো তৈরীর

নিয়ন্তা।

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবকথামূলক সাহিত্য হলেও রচয়িতা কবিগণ দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি, বরঞ্চ বলা যায় দেবতাকে পিছনে ফেলে এখানে মানবকথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কবিরা ধর্মকথার মোড়কে আপন আপন সমাজের খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করেছেন, সে সমস্ত তথ্যগুলি একত্রিত করে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের সামগ্রিক রূপ পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সাহিত্যে অতীত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সেই ইতিহাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের কাহিনী উদ্ধার করা যেতে পারে এই সব সাহিত্য থেকে। কবিরা যতই কল্পনার আকাশে উড্ডীন থাকুন না কেন, তা দেশ-কালের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। হয়ত ইতিহাসের সমান্তরাল ধারার সঙ্গে তার মিল না হতে পারে, তবে সাবধানে তার মধ্যে থেকে লোকজীবনের বিচিত্র সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। তাই তথাকথিত ইতিহাস যেখানে নীরব হয়ে থাকে সেখানে সাহিত্যের ইঙ্গিত মাত্র ইতিহাসের গতিপথকে চিনিয়ে দিতে পারবে। এ সমস্ত তথ্যে কালগত ভিন্নতা ব্যতিরেকেও কবিদের ভৌগোলিক অবস্থানগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন মনসামঙ্গলের পরিব্যাপ্তি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ ব্যাপী, সুতরাং তিন বঙ্গের প্রাপ্ত তথ্যাদিতে ভিন্নতা সামান্য হলেও আছে। প্রায় একই কথা বলা যায় চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্যান্য কাব্যগুলি সম্পর্কেও। তাছাড়া পঞ্চদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে সমাজ ইতিহাসের তারতম্য দেখা যায়। আবার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে রাঢ়বাসীর যে শ্রেণীচরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তা অন্যান্য কাব্যে দুর্লক্ষ। শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল আরও ভিন্নতর দেশ-কালের পটভূমিতে রচিত হওয়ায় সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই মঙ্গলকাব্যগুলিতে খাদ্য-পানীয়, আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসগত ভিন্নতা তো বটেই, তাছাড়াও যুগ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মবোধ মনন-মানসিকতাগত পরিবর্তনগুলির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গবেষণা-কার্যে মধ্যযুগের সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আছে। প্রথমতঃ কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে কল্পনা ও লোকশ্রুতির ব্যবহার করেছেন. তাই কল্পনা ও লোকশ্রুতি নির্ভর তথ্য থেকে বাস্তবসম্মত তথ্য নির্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কালানুক্রমিক বিবর্তনরেখা তৈরীতে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করেছে সঠিক কালক্রম অনুসারে কবিদের সময়কাল নির্ণয়ের জটিলতা। এই অসুবিধা থাকায় সব সময় যে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে কাব্যে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন দেবদেবীর চরিত্রগত বিবর্তন, মানুষের অবস্থানগত বিবর্তন, ধর্মমঙ্গলে ডোমদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান কিংবা প্রধান দেবদেবীমঙ্গলের স্থলে অপ্রধান দেবদেবী মঙ্গল বা পৌরাণিক

দেবদেবী মঙ্গল সৃষ্টি ইত্যাদি। এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করে সময়কাল ও বিবর্তনের ধারাটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে তথ্য ও ঘটনা বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণা নিবন্ধে সুস্পষ্ট দু'টি ভাগ রয়েছে, তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমাজ বিবর্তনের রূপরেখা তৈরী করা। তথ্যসংগ্রহ ঠিকমত না হলে বিবর্তনের ধারাটিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। গবেষণা নিবন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রধান মঙ্গলকাব্য-ধারা থেকে সমাজ ইতিহাসের উপাদান চয়ন করা হয়েছে। একারণেই দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পাল্লা অনেক ভারী হয়েছে। কিন্তু গবেষণা নিবন্ধের শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখেই অষ্টম অধ্যায়ে যুক্তি সহকারে সর্বস্তরের বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ প্রতিটি অধ্যায়েই সমাজ বিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে. এই বিবর্তনের রূপরেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সর্পিল। বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনায় সঠিক কালক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত পুঁথির নির্দিষ্ট কাল নির্দেশের অভাব বিবর্তনের রূপরেখা তৈরীতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

যদিও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সকল মঙ্গলকাব্যগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি কেবল প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান কবিদের রচনাই গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ছাড়াও অনুবাদ সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী কাব্য, রোমাণ্টিক-প্রণয় কাব্য এবং আধুনিক সাহিত্যকেও সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। আধুনিক যুগের ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিবরণ অপেক্ষা সাহিত্যকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলির আলোচনায় যেমন পাণ্ডুলিপির সাহায্য না নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিকদের বিবরণও অনেকক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা থেকেই নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিষয়গত আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য উল্লিখিত কালপর্ব মধ্যযুগ হলেও প্রাচীন বা আধুনিক যুগও আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত থেকে মোগল আমল, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের কথাও এসেছে। এভাবে বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তন চিত্র স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিভাগগুলি হল ঃ

১। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, সাজসজ্জা

প্রসাধন ইত্যাদি।

২। আচার-বিচার ও সংস্কার-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩। ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি।

৪। স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ লোকক্রীড়া, শরীরচর্চা ইত্যাদি।

৫। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি।

সমাজ ইতিহাসের তথ্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে। এবিষয়ে কোন মঙ্গলকাব্যের একাধিক সংস্করণ ব্যবহৃত হলেও শুধুমাত্র আকরগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত সংস্করণগুলি থেকেই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। আকর গ্রন্থ ও মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থগুলি থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে কবির নাম ও তার পাশে পৃষ্ঠা সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বিজয় গুপ্তের তেত্রিশ (৩৩) পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি নিলে— (বিজয়/৩৩), এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনামূলক গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্য ও উদ্ধৃতির গ্রন্থনাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা অধ্যায়ের শেষে তথ্যপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবহৃত সমস্ত গ্রন্থাবলীকে আকর গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ভাগ করে 'গ্রন্থপঞ্জী' অংশে সংযোজন করা হয়েছে। উদ্ধৃতি কোন কোন অধ্যায়ে সুকুমার সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবর্তী) [illegible]

গ্রন্থভিত্তিক অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে পূর্বোল্লিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া কাব্য কাহিনী ও ঘটনাগত বিশ্লেষণ সহ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটিতে সর্বমোট আটটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির শিরোনাম এবং অধ্যায়গুলিতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ

তুর্কী আক্রমণ পূর্ব বাঙালী সমাজ ছিল নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মত। সেখানে সর্বপ্রথম অভিঘাত সৃষ্টি করে তুর্কী আক্রমণ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুর্কী আক্রমণকে কেন্দ্র করে বাঙালী হিন্দুসমাজে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার মধ্যে থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা ও হিন্দুর জাগরণের প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজন থেকেই উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে জনমিশ্রণের সুযোগ এসেছিল। এর ফলে মনসা ও চণ্ডীর মত বিভিন্ন ব্রতকথার দেবীরা সমাজের উচ্চশ্রেণীতে উঠে আসার সুযোগ পেল। যে সমস্ত দেবদেবীর কাহিনী ব্রতকথার আকারে ছড়িয়ে ছিল তাদের কাহিনী নিয়ে মঙ্গলকাব্য তৈরী হল। ব্রতকথার প্রধান দেবদেবী ছাড়াও অপ্রধান দেবদেবীকে নিয়ে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। ব্রতকথার মধ্যে থেকেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল।

অনুবাদ সাহিত্যেরও উদ্ভব অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই। হিন্দুর আদর্শ ও বীরগাথা জনসমাজে প্রচারের প্রয়োজন থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়ার অধিকার ছিল না, তাই রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের

মত গ্রন্থগুলি বাংলায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে জনসমাজে প্রচার করা হয়েছিল।

চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বৈষ্ণবপদসাহিত্য রচনার ধারা গড়ে উঠেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে, মূলত ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবপদসাহিত্য একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। অপরদিকে দেবকল্প শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে চৈতন্য জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় উপাখ্যান ছাড়াও রোমান্টিক প্রণয় কাব্যের স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছিল। সেখানে মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত কাব্যগুলিতে মানবীয় প্রেম-প্রীতি, কামনা-বাসনা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। বিদেশী,ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের অনুবাদ হলেও বাঙালী কবি বিদেশী কাহিনীকে দেশ- কালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে মধ্যযুগের আর্থসামাজিক পটভূমিকায় কিভাবে বিভিন্ন সাহিত্যধারার উদ্ভব ঘটল এবং ব্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালীর মধ্যে থেকে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হল অর্থাৎ ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সম্পর্কের দিকগুলি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের তথ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত লোকজীবন সম্পৃক্ত খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাজসজ্জা, সংস্কার-বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাথমিক পরিচয় আছে এখানে। এখানে দেখা যায় সময়ের নিরিখে মনসার ক্রুরতা এবং চাঁদসদাগরের উগ্র ব্যক্তিত্ব হারিয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়েছে। সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

চণ্ডীমঙ্গল যেহেতু মূলত ষোড়শ শতাব্দীর কাব্য, তাই পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ের মতই ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অনেকটা জাতপাতহীন সমাজ গড়ে উঠেছিল। এপর্বের বাংলায় মোগল শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা গেল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

ধর্মমঙ্গল কাব্য মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর সৃষ্টি হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ের মত সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। রাঢ়বঙ্গের মানুষের ইতিহাসই প্রধানত ধর্মমঙ্গলে প্রাধান্য লাভ করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত সমাজের চেহারা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

রামকৃষ্ণ রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কাব্য রচনা করলেও প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কাব্য রচনা করেছিলেন। যুগ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ইতিহাসের তথ্যগুলি তুলে ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এসময় পুরাতন রীতিনীতির প্রতি যেমন মোহ ছিল, তেমনি নতুনের প্রতিও সমান আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। দৈববাদ বা যুক্তিবাদ কোনটিই নয়, একটা দোলাচলতা হল এই পর্বের সমাজ ইতিহাসের বিশেষত্ব। এর মধ্যে থেকে আধুনিক জীবনযাত্রার সূত্রপাত লক্ষ করা যেতে পারে, আধুনিক যুগের সঙ্গে মধ্যযুগের অন্বয়সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ পর্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন

সমাজ স্থিতিশীল নয়— এই ধারণাটিকে সামনে রেখে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রম বিবর্তিত সমাজ ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমাজবৃত্ত, অর্থনীতি ও ধর্মবোধের যে পরিবর্তন ঘটছিল, মঙ্গলকাব্যকে ভিত্তি করে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিবর্তন শব্দটির অর্থ পরিবর্তন বা রূপান্তর, এর সঙ্গে মন্দ-ভালো বা উন্নতি-অবনতির সম্পর্ক নেই। দীর্ঘ কয়েক'শ বছর ধরে বাঙালীর সামাজিক পরিকাঠামোগত, যেমন জাতি-বৃত্তিগত, আর্থসামাজিক বিবর্তন ঘটেছে তেমনি বাঙালীর মানসিক দিক থেকেও, যেমন - সমাজে নারীর স্থান, ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকার, মানবচরিত্র, মানসিক গঠন, ধর্মবোধ ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে মূলত তথ্য চয়ন করা হলেও একই ধারার কাব্যে বিশেষত যেগুলি ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বা কালগত ব্যবধানে রচিত হয়েছে তাতে যে পরিবর্তনগুলি ফুটে উঠেছে তা ধরা হয়েছে। তবে বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন কালের যে বিবর্তন চিত্র তার একটা সামগ্রিক উপস্থাপনা আছে এই অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য

মধ্যযুগের অবস্থানকে কাটিয়ে আধুনিক যুগে উন্নয়ন কোন্ পথে, কিভাবে হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে উপসংহারে। আধুনিক যুগে বাঙালী তার ঐতিহ্যগত চিরাচরিত জীবনধারা থেকে কতটা সরে এসেছে বা কতটা নিজস্বতাকে ধরে রেখেছে তা আধুনিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও বর্তমান জীবনযাত্রার মধ্যে থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১। সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৩২।

২। বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩০।

৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩।

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ কোন সাহিত্যের মূল্যায়ণ ঐতিহাসিক পটভূমির অপেক্ষা রাখে। তাই একটি সাহিত্যকে জানতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকেও জানা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য যে মঙ্গলকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রয়েছে এক রক্তাক্ত ইতিহাস। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বারবার বিদেশী ও বিধর্মী জাতি ভারতবর্ষের বুকে আঘাত হেনেছে, কিন্তু তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত কোন শক্তিই বাঙালী সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করতে পারেনি। পর্যায়ক্রমে বহু রাজশক্তির উত্থানপতন ঘটলেও বাঙালীর সমাজিক জীবনে তার ছায়াপাত ঘটেনি। তুর্কী আক্রমণই বস্তুতপক্ষে প্রথমবার বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণ ছিল বাঙালীর পক্ষে একটি সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা, এই আক্রমণকে প্রতিহত করার কোন মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। ১২০২-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি (কথিত আছে) মাত্র সতেরো (১৭) জন অশ্বারোহী সেনা নিয়ে নবদ্বীপ জয় করেন। এরপর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস হল মুসলমান শাসনের ইতিহাস, এই পর্বের ইতিহাস হল তুর্কী, পাঠান, মোগলের উত্থান-পতন-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইতিহাস।

বখ্‌তিয়ার খিলজির মৃত্যুর (১২০৬)পর প্রায় কুড়ি বছর খিলজি বংশীয় আমীর-ওমরাহগণের শাসনকাল। বহু হত্যা এবং রক্তপাতের পর শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইয়াজ খিলজি কিছুটা হলেও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের বিরোধিতা করায় সিংহাসন ও প্রাণ দুই-ই হারান, অবশেষে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে শাম্‌সউদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কী আক্রমণের সময় থেকে ইলিয়াসশাহী বংশের শাসনের সূত্রপাত পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে এক বিশেষ কালপর্ব । ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের পর ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী পর্যায়ে একবার হিন্দুর পুনরুত্থান ঘটেছিল। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার ভাতুরিয়া পরগণার সুবিখ্যাত জমিদার রাজা গণেশের নেতৃত্বে হিন্দু শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজা গণেশ 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য দনুজমর্দনদেব' উপাধি ধারণ করে ক্ষমতা বিস্তার করেন।[১] তুর্কী বিজয়ের সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় হিন্দু নরপতি বলতে শুধুই রাজা গণেশ, কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বী আমীর-ওম্‌রাহ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে অল্পকালের মধ্যে তার পতন ঘটে এবং গণেশের পুত্র যদু বা জিৎমল ইসলামধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম ধারণ করে কিছুকাল শাসন করেন। ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণেশের বংশের শেষ শাসক শামসউদ্দিন আহম্মদ শাহের মৃত্যু হলে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহের অধীনে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় মামুদশাহী বংশ নামে পরিচিত। নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহের পুত্র রুকনুদ্দিন বারবক শাহ সুশাসক ছিলেন ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিও তারা অনুরাগী ছিলেন। ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মামুদশাহী বংশের অবসান হলে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বছর হাবসী খোজার শাসনকাল চলে। হাবসীরা ছয় বছর ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, বাংলার ইতিহাসে হাবসী শাসনকাল এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত। হাবসী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা সম্মিলিত ভাবে শেষ হাবসী সুলতান শামস্‌উদ্দিন মজফ্‌ফর শাহকে হত্যা করে আলাউদ্দিন হোসেন শাহকে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। হোসেনশাহী বংশ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। হোসেনশাহী আমল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কাল থেকে হোসেনশাহী রাজবংশ (১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আটটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। আমরা এই কালপর্বের একটা মোটামুটি রূপরেখা

উল্লেখ করতে পারি। তবে উল্লিখিত সন-তারিখ সম্পর্কে মতদ্বৈততার অবকাশ আছে। এখানে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (প্রথম খণ্ড) শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়' ও ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার মুসলিম শাসনের আদিপর্ব' গ্রন্থ অনুসরণে নিম্নলিখিত তালিকা তৈরী করা যেতে পারে ঃ

ক) খিলজী আমীর-ওমরাহদের অধীনে বাংলা - (১২০৩-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১। ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজী। (১২০৩-১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)

২। আলাউদ্দীন আলিমর্দান (১২০৬-১২১৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ খিলজি। (১২১৩-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)

খ) দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলা (১২২৭-১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দ)

১। মামলুক শাসন (১২২৭-১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

২। বলবন শাসন (১২৬৮-১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ)

গ) ইলিয়াসশাহী বংশের অধীনে বাংলা, প্রথম ধারা (১৩৪২-১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ)

১। শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)

২। সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯১-১৪১০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। সৈফুদ্দিন হাম্‌জা শাহ (১৪১০-১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ)

ঘ) বায়জিদ বংশের অধীনে বাংলা (১৪১২-১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

১। শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ (১৪১২-১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

২। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

ঙ) রাজা গণেশের রাজবংশের অধীনে বাংলা (১৪১৪-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ)

১। গণেশ দনুজমর্দ্দনদেব (১৪১৫,১৪১৭-১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

২। যদু. জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। মহেন্দ্রদেব (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। শামস্‌উদ্দিন আহম্মদ শাহ (১৪৩১-১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ)

চ) মামুদশাহী বংশ বা ইলিয়াসশাহী বংশের অধীনে বাংলা, দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

১। নাসিরুদ্দিন মামুদ শাহ (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ)

২। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। সিকন্দর শাহ (১৪৮০-১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ)

৫। জালালউদ্দিন ফতে শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

ছ) হাবসী সুলতানদের অধীনে বাংলা (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

১। বারবক্ সুলতান শাহ্‌জাদা (১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

২। সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ (১৪৯০-১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। শামস্‌উদ্দিন মুজাফ্‌ফর শাহ (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

জ) হোসেনশাহী বংশের অধীনে বাংলা (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

১। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ)

২। নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ - (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ)

৩। আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ- (১৫৩২-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

৪। গিয়াসউদ্দিন মামুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কাল থেকে দেড়'শ-দু'শ বছর ধরে বাংলার বুকে রাজনৈতিক ঘনঘটা চলেছিল। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেড়'শ বছর কালসীমা বাংলার রাজনৈতিক আকাশে কখনো আমীর-ওমরাহগণ কখনো দিল্লীর সুলতানগণ বাংলার ভাগ্যকে নিয়ে খেলা করেছে। বাংলার ইতিহাসে এই দেড়'শ বছর সময়কাল যুগসন্ধিকাল বা অন্ধকারপর্ব নামে চিহ্নিত। ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন ঐতিহাসিকগণ, ২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, হুণ ইত্যাদি বর্বর জাতির আক্রমণে রোমীয় হেলেনিক সভ্যতার পতন ঘটেছিল, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আসলে ধর্মীয় ও রাজতন্ত্রের তীব্র অনুশাসনের ফলে সভ্যতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, মানুষের স্বাভাবিক চেতনার বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং বহিরাগত বর্বর শক্তিকে প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল না। এ যুগটি ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত[২]। তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে প্রায় দেড়'শ বছর কালপর্ব বাংলার ইতিহাসে 'যুগসন্ধিকাল' বা 'অন্ধকার যুগ' নামে চিহ্নিত। প্রাচীন যুগের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধের সর্বক্ষেত্রেই অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল; কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতেই সাহিত্য, সংস্কৃতিতে নতুন জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙালীর দেবভাবনা, মূল্যবোধ, আচার-বিচারগত ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত রূপ গড়ে উঠার প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে ঐ অবক্ষয়ের অন্তরালে চলেছিল ভবিষ্যতের প্রস্তুতি পর্ব — যা পরবর্তীকালে উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া মাত্র ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এই কালপর্বটিকে তাই অন্ধকার যুগ না বলে বাঙালীর মানস-প্রস্তুতিকাল বলে চিহ্নিত করা চলে।

তুর্কী আক্রমণের অনেক পূর্বে নবম-দশম শতাব্দীতেই বাঙালীর জাতি গঠনের কাজ শেষ হয়েছিল এবং পাল ও সেন যুগে বাংলার সংস্কৃতি নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটি সমন্বয়ের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তুর্কী বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ঘটলেও বাংলার গ্রামজীবন নিস্তরঙ্গ ছিল। পাল ও সেন যুগে রাজ আনকূল্যে এবং ভূস্বামীদের দ্বারা বৌদ্ধ বিহার, সঙ্ঘারাম, হিন্দুর মঠ-মন্দির গঠিত হয়েছিল। বাংলার সংস্কৃতিচর্চা রাজসভাগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, এছাড়াও বাংলার লৌকিক জীবনে, লৌকিক প্রেরণায় সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গঠিত হয়েছিল। বাংলার আর্য ও অনার্য গোষ্ঠী তথা উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোন রকম সাংস্কৃতিক, সমাজনৈতিক আদান-প্রদান ছিল না. অনার্যগণ বরাবর ব্রাত্য রূপেই চিহ্নিত হয়ে এসেছিল। ডঃ সুকুমার সেন বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছেন - "নবীন স্তরের ব্রাহ্মণেরা ও তাঁহাদের শিষ্য-ভৃত্যেরা ছিলেন সংস্কৃতাশ্রয়ী আর প্রবীণ ব্রাহ্মণ- অব্রাহ্মণেরা ছিলেন প্রাকৃতশ্রয়ী এবং কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতে নিষ্ঠাহীন। অনেকেই জৈন বৌদ্ধ অথবা যোগপন্থী ছিলেন। মনোধর্মের দিক দিয়া নবীনেরা ছিলেন চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী যজ্ঞ বা পূজাপরায়ণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও সংযমনিষ্ঠ, আর প্রবীণেরা ছিলেন দৈববাদী ব্রতপরায়ণ কর্মস্পৃহালু ভাববিলাসী সঙ্গীতসাহিত্যরসলিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ।"[৩] প্রাক্ তুর্কী আক্রমণ পর্বে বাংলার উচ্চবর্ণের সমাজ নিম্নবর্ণের সমাজকে নানা বর্ণে ও শ্রেণীতে ভাগ করে অবদমিত করে রেখেছিল। বৌদ্ধরাও সেন শাসনকালে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলার গ্রামীণ জীবনে পরিবর্তন না হলেও পুরাতন সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন— "বাঙালির সংস্কৃতি-জীবনের এই দুই পীঠই পর্যুদস্ত হল। বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু নূতন তুর্কি রাজসভা ও অভিজাতদের আনুকূল্য পেল না। এদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হতেই বহু বৎসর কেটে গেল।"[৪] নবাগত রাজশক্তির সহায়তায় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের কখনো বলপূর্বক, কখনো অর্থলোভে ধর্মান্তরিতকরণের পালা চলেছিল।

বৌদ্ধ বিহার, মঠ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হল। হত্যালীলা, রক্তপাত, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ নির্বিবাদে চলতে থাকল। বস্তুত মুসলমানগণ হিন্দু কাফেরদের হত্যা, ধর্মান্তরিতকরণ, মঠ-মন্দির-দেববিগ্রহ- ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করাকে পূণ্যকর্ম বলে মনে করেছিল। রাজধানী থেকে দূরবর্তী গ্রামগুলিতে মুসলমান পীর, গাজী, ফকিরের দল আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। তারা রাজশক্তির সমর্থন পুষ্ট হয়ে বলপূর্বক ব্রাহ্মণদের জাতিনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। রাজা গণেশের মত শাসকও তা থেকে রেহাই পেলেন না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দিলে তার ফল হত আরও ভয়াবহ। হয় ধর্মত্যাগ করে আত্মরক্ষা, নয় প্রাণত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল।চর্তুদশ- পঞ্চদশ শতকের কবি বিদ্যাপতি তাঁর 'কীর্তিলতা' নামক গ্রন্থে তুর্কী শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিদ্যাপতি লিখেছেন- — "কতহুঁ তুরুক বরকর।/ বাট জাইতেঁ বেগার ধর॥/ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ।/মথাঁ চড়াবএ গাইক চড়ুআ॥/ ফোট চাট জনউ তোড়।/উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়॥/ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ।/দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ॥/ গোরি গোমঠ পূরলি মহী।/ পদরহু দেবাক ধাম নহী॥/ হিন্দু বোলি দূরহি নিকার।/ ছোটেও তুরকা ভভকী মার॥"[৫] অর্থাৎ কত তুরুক পথে যেতে বেগার ধরে, বড় ব্রাহ্মণকে ধরে এনে মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাঙ। ফোঁটা চাটে, পৈতে ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপরে চড়াতে চায়, ধোয়া উড়িধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ গড়ে, গোরে ও গো-মঠে মহী পরিপূর্ণ হল, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে, দূর নিকাল, তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে চায়। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখেছেন- "মুসলমান আক্রমণকারীরা হিন্দুদের পরাজিত করে অধিকাংশকেই নির্বিচারে হত্যা করত, ধর্মের বিনিময়ে কেউ কেউ কোনো প্রকারে প্রাণভিক্ষা পেত। ধর্মান্তরীকরণের ফলে সমাজে দ্রুত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।"[৬] অন্যভাবেও মুসলমান সমাজের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। শুধু যে পীর-ফকির-দরবেশদের সহায়তায় হিন্দু সম্প্রদায়কে কৌশলে বা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত তাই নয়, অরা সূক্ষ্ম কূট-কৌশল প্রয়োগ করত, অনেক সময় হিন্দুর দেব মন্দিরের পাশে মসজিদ, পীরের দরগাহ স্থাপন করত। সেখানে তারা তুক্‌তাক্, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-তাগা ইত্যাদি বিতরণ করে সাধারণ নিম্নবর্ণের হিন্দুকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করত। হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মিত হলেও বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা পূর্বতন সংস্কার বশত পীরের দরগায় প্রদীপ জ্বালাত, শীর্নি দিত। অবশ্য পীর ও গাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সৎ এবং উদার মনোভাবের পরিচয় দিত। পীর-দরবেশদের মহিমার কথা প্রচার করত, ফলে হিন্দুসমাজে তথা কথিত অন্ত্যজ-অপাঙ্‌ক্তেয় হিন্দুরা ইসলামের সাময়িক উদারতায় মুগ্ধ হয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করত। কেননা উচ্চবর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্নবর্ণের তথা কথিত অন্ত্যজ হিন্দুর কোন সামাজিক সম্পর্ক ছিল না, এমন কি তারা সামান্যতম মনুষ্যত্বের অধিকারটুকুও লাভ করেনি। তাছাড়াও একবার কেউ জাতিচ্যুত হলে হিন্দুসমাজ তাকে আর কোন দিনই গ্রহণ করত না।. একারণেই রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলামধর্ম গ্রহণের পর 'সুবর্ণধেনু' প্রায়শ্চিত্ত করলেও হিন্দুসমাজে গৃহীত হননি। সুতরাং রাজা গণেশের মত ক্ষমতাবানকেও সমাজে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার এ সম্পর্কে বলেছেন— "হিন্দু সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল,— বর্ণসমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণগুলি এবং বর্ণসমাজের বাইরের অস্পৃশ্য জাতিগুলি— তারা ইসলামিক সমাজ-সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধানদাতাদের নিকট যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা।- - - - - - - তুলনায় মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতি ছিল প্রগতিশীল, আর সেজন্য তার বিজয়ও হয়েছে অপ্রতিহত। সামাজিক চিন্তাধারার এই উদারতা এবং সমানাধিকারের আদর্শই ভারতের সমাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।'"[৭] অবশ্য প্রথম দিকে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের কোন প্রকার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কিন্তু ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে থাকে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে উঠতে থাকে। এর ফলে দেখা যায় মুসলমান শাসকের দরবারে হিন্দুরাও রাজকর্মচারীর পদ গ্রহণ করে, মুসলমান সুলতানগণ অনেক সময় হিন্দু জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তাদের উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতেন। রুকনুদ্দিন বারবক শাহ মালধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁন' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। হিন্দু কবিগণও এই সুলতানদের প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

হিন্দুধর্মের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আঘাত, শাসকশক্তির মদত, বৌদ্ধধর্মের বিলোপ, এবং ইসলামধর্ম গ্রহণের বাস্তব সুবিধা বাংলার সমাজে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম সমাজের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছিল। সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা জনজীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। সহজিয়া বৌদ্ধ ও লৌকিক-অপৌরাণিক আচরণে প্রাকৃত জনসমাজ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং উভয় সমাজের মানুষ একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছিল। এই দুই জনসমাজ একত্রিত হয়ে নতুন গোষ্ঠী ও জাতি গঠনের জন্য যে প্রচুর শক্তি ও আঘাত প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল, তুর্কী আক্রমণ এই অনুঘটকের কাজটি করেছিল। এর ফলে সমাজের উচ্চকোটি থেকে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অবনমন ঘটল এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হল। সাধারণ জনসমাজ নবাগত ধর্মকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হল। বাঙালী হিন্দুসমাজের এই বিপর্যয়ে ইসলামের আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে চলেছিল। এটাই ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাঙালী হিন্দুসমাজের বাস্তব রূপচিত্র। তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমাজ ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলিকে ডঃ গোপাল হালদার নিম্নসূত্রে বিধৃত করেছেন[৮] —

১। উচ্চ ও নিম্ন বর্গের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হল।

২। পরাজিত হিন্দুসমাজ সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল।

৩। প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য এবং তারপর হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হল। ফল স্বরূপ মুসলমান বিজেতারা ধীরে ধীরে হয়ে উঠল বাঙালী, রইল না আর বিদেশী।

তুর্কী আক্রমণের আরো একটি বড় রকমের ফলশ্রুতি— বাঙালী সমাজ আরও বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পেল অর্থাৎ নিজস্ব গ্রামজীবনের বাইরে বৃহত্তর দেশ-কালের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেল। বাঙালী জীবনের মূল ভিত্তি ছিল গ্রামজীবন ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। তুর্কী আক্রমণ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভাঙনের ঢেউ নিয়ে এল, ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে সর্বপ্রথম সর্ব ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অবকাশ পেল আর সাংস্কৃতিক জীবনের উপর তার প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক দিক্ থেকে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। বণিক শ্রেণীর মাধ্যমে পরিবর্তনশীলতায় আস্থাবান এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—" মানুষ যতটা না তার ধর্ম, জাত্যভিমান, দেশাচার ও দেশাচারগত বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী আকৃষ্ট হয় বহু মানুষের মেলামেশা সঞ্জাত ভাবতরঙ্গের প্রতি। লক্ষ্য তার স্বার্থ,পণ্যের লেনদেন থেকে লাভবান হওয়া; পাথেয় তার মেলামেশার মনোভাব, প্রীতি । এই গরজের টানে যখন সে অন্যের অভিজ্ঞতা ও কথাবার্তা চলনবলন আচারের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়, তখন সে বিস্মিত হয়ে দেখে পারস্পরিক অভিজ্ঞতায় গড়মিলের চেয়ে ঐক্য বেশী। তাদের ইন্দ্রিয়াভিজ্ঞতা এক । ঐ একের খাতিরেই অজ্ঞাতসারে গড়মিলের বাধাগুলি ধীরে ধীরে খসে পড়ে, সে সংস্কারবর্জিত হয়ে বহু মানুষের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে। অর্থাৎ, বণিক-সমাজের অনুকূল নব- মানবতার হয় বিবর্তন।"[৯] একটা বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়া গেল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ নিম্নবর্ণের মানুষকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখলেও এতদিনে তা দূর করতে বাধ্য হয়েছিল বিধর্মী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের হাত থেকে নিজ অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে । অন্ধকার যুগের প্রায় দেড়'শ বছর পরে বাঙালী সমাজ সমন্বয়বাদী আদর্শ

গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতিভূমি রচনা করেছিল। এই প্রতিরোধ সম্পূর্ণভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ। বাঙালীর সংস্কৃতিতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু, বিবাহ, পোশাক, পরিচ্ছদ, সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, চরিত্র-মানসিকতার একটা নির্দিষ্ট নিজস্ব রূপ গড়ে উঠেছিল। এযুগের সংস্কৃতির এই সমন্বিত রূপ সামগ্রিকভাবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই আসে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কথা। বর্ণহিন্দু সমাজের চোখে অন্ত্যজ হিন্দুরা ব্রাত্য থাকলেও কিন্তু তাদের অপৌরাণিক-আর্যেতর লৌকিক দেবদেবীরা আর ব্রাত্য থাকেনি। মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর অনার্য-অপৌরাণিক স্তর থেকে সমাজের উচ্চকোটিতে স্থান পেল। মনসা, চণ্ডী, লৌকিক-শিব, কামকেলিযুক্ত কাব্যের নায়ক কৃষ্ণ ইত্যাদির দেবমাহাত্ম্য সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত হল; শুধুমাত্র ধর্মঠাকুরের সংস্কার পূর্ণ না হওয়াতে সমাজের সর্বস্তরের স্বীকৃতি পেল না। আবার কিছু লৌকিক দেবী যথা শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সুবচনী, এদের উপর আর্য সংস্কারের প্রলেপ না লাগলেও এরা অনার্য রূপ বজায় রেখেই সমাজের অন্তঃপুরে মহিলা মহলে স্থান করে নিতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ্য আর্য সংস্কার, পূজাবিধির প্রভাব সামান্যতম হলেও এদের উপরে পড়েছে এবং বাঙালী হিন্দুর ঠাকুরঘরে স্থান করে নিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, সর্বস্তরের মিশ্রণের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম, দেবদেবী ও আর্যসংস্কার লৌকিক সমাজেও গৃহীত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— "মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দেবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কি ভাবে একদেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।"[১০] এই মিশ্রণের ফলে ব্যাধ সমাজের দেবী, ব্রতকথার হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার দেবী চণ্ডী হল শিব ঘরণী চণ্ডী, কোন কোন কবির কল্পনায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আদর্শে মঙ্গলাসুর বধকারিণী চণ্ডী। অনার্য দেবী, সিজগাছ পূজার দেবী,কৃষিজীবী সমাজের উর্বরতা শক্তির দেবী মনসা হল শিব দুহিতা, আর ধর্মঠাকুরের দেবপরিকল্পনায় আদিম রণ দেবতার পূজা, সূর্য দেবতার পূজা, প্রস্তরপূজা তাছাড়াও বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও শৈব ভাবনার মিশ্রণ ঘটে গেছে। তাছাড়া বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা, প্রাকৃতিক শক্তিপূজা, গ্রাম-দেবতার পূজা, বাস্তুপূজা, নানা ব্রতের দেবদেবী ও পূজা পদ্ধতি ক্রমে স্থান গ্রহণ করেছে আর সংমিশ্রণের পথে সকলকেই হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন নতুন দেবদেবীকে নিয়ে কবিরা নতুন নতুন কাব্য পরিকল্পনা করলেন। অন্যদিকে পৌরাণিক দেবগণও অপৌরাণিক, লৌকিক ভাব অঙ্গীকার করে নিয়েছিল এবং এদের মধ্যে প্রধান দুই দেবতা হল শিব ও কৃষ্ণ। পুরাণের রুদ্র-দেবাদিদেব মহাদেব হল বাংলার কৃষক সমাজের দেবতা, স্খলিত চরিত্র, গঞ্জিকাসেবী শিবঠাকুর; কৃষ্ণ চরিত্রের দেব সুলভ গৌরব নেই, সে শুধু ব্রজের রাখাল বালক মাত্র, কখনো বা কোন গোপ পল্লীর গোপ বালক মাত্র। অপরদিকে জনসাধারণের সামনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য, ভারতীয় বীরধর্ম, আদর্শ, দর্শন, বিজয়গাথা তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। একদিকে যেমন পৌরাণিক দেবমাহাত্ম্য কথা কথক ঠাকুরের মুখে প্রচারিত হয়েছিল তেমনি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ কাহিনীর মধ্যে দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছিল। জনসমাজ তার মধ্যে তাদের জাতীয় নায়ককে খুঁজে পেল; বাস্তব জীবনের আদর্শ, পারিবারিক মহিমা, মানবিক সম্পর্ককে খুঁজে পেল। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের ভাষায়- "দ্বিধাদীর্ণ বাঙালি ধর্মে ও আচরণে ঐক্যবদ্ধ হল। নির্জিত বাঙালি নূতন আদর্শে ও আশায় জাগরিত হল।"[১১]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ঃ ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা হলে মোটামুটি ভাবে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা

স্থাপিত হয় কিন্তু তা খুব বেশীদিন কার্যকর হয়নি।এই বংশের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ মামুদশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে স্থায়ীভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহ, রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ প্রত্যেকেই সুশাসক ছিলেন। এরপরে হাবসী খোজারা কিছুদিন বাংলাদেশে তাণ্ডব চালিয়ে ছিল এবং ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হুসেনশাহী বংশের শাসনকাল বাংলাদেশে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাংলাদেশে যে সুস্থ পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী । মাঝে মাঝে দুর্যোগ দেখা দিলেও মোটামুটি ভাবে রাজনৈতিক জীবনের যে সুস্থিরতা এসেছিল তাতেই তার সৃষ্টিভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। চতুর্দশ শতকের শেষপর্ব থেকে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকেই কৃত্তিবাসের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতিতে অভিনবত্বের সূচনা হয়। চৈতন্যদেবের প্রেম সাধনা বাংলার আকাশ-বাতাসকে সিক্ত করেছিল, তার ফলে সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলায় সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। এপর্বের বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের প্রদত্ত সূত্রানুযায়ী,[১২] প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ্য ও লৌকিক দুই ধারার মিশ্রণে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতি প্রতিষ্ঠা পেল। অন্ধকার পর্বের অস্থিরতার অবসানে জাতীয় জীবনে কতকটা স্থিতিশীলতা এসেছে। দ্বিতীয়তঃ প্রাক্-তুর্কী যুগে বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ ঘটলেও সম্যক প্রতিষ্ঠা হল পঞ্চদশ শতকে। বাঙালী জাতি সম্পূর্ণভাবে মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে এই পর্বে। তৃতীয়তঃ মুসলমান বাঙালীরাও এই পর্বে কাব্য রচনা শুরু করেন। চতুর্থতঃ এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের অপর মুখ্য ধারাগুলির সূত্রপাত ঘটে। এই ধারাগুলি হল, যেমন- অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত), মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল)এবং বৈষ্ণব সাহিত্য (বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং অবাঙালী কবি বিদ্যাপতি)। বাংলা সাহিত্যের প্রধান শাখাগুলি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

চৈতন্য-পররর্তীকালে অর্থাৎ অন্ত্য মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। আমরা সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য ধারাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করতে পারি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুস্পষ্ট চারটি ধারা ছিল। এই ধারাগুলি হল— ১। অনুবাদ সাহিত্য ধারা। ২। মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ধারা। ৩। বৈষ্ণব সাহিত্য ধারা ৪। লৌকিক সাহিত্য ধারা।

অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় দু'টি ভাগ ছিল— প্রথমতঃ সংস্কৃত পুরাণ-মহাকাব্য অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ হিন্দী ও ফার্সি গ্রন্থের অনুবাদ। সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। হিন্দী ও ফার্সি গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল অনেক পরে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে। বিশেষত রোমান্টিক প্রণয়কাব্য অনুবাদের নিজস্ব ধারা গড়ে উঠেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিকে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[১৩] যথা— ১। বৈষ্ণবমঙ্গল ২। পৌরাণিক মঙ্গল এবং ৩। লৌকিক মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণবমঙ্গল কাব্যগুলি হল- চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, জগৎমঙ্গল, কিশোরীমঙ্গল, স্মরণমঙ্গল, গোকুলমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যগুলি হল— গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, কমলামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল। লৌকিক মঙ্গলকাব্যগুলি হল— মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল ইত্যাদি।বৈষ্ণবমঙ্গল কাব্যগুলি নামে মঙ্গল

হলেও অন্তঃপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুগত ভিন্নতার জন্য যথাযথ মঙ্গলকাব্য নয়। অন্যভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— প্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল, আর অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ঃ শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল ইত্যাদি।আমরা জানি পরবর্তীকালে সমাজ ইতিহাসের প্রয়োজনেই পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়েও মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুস্পষ্ট দু'টি বিভাগ— বৈষ্ণবপদসাহিত্য এবং চরিতকাব্য সাহিত্য। চরিতকাব্য সাহিত্যে চৈতন্য জীবনী চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি ছাড়াও স্বল্প পরিমাণে বৈষ্ণব মোহান্তদের জীবনী নিয়েও চরিত সাহিত্য রচিত হয়েছিল; যেমন- অদ্বৈত জীবনী, অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতা দেবীর জীবনী ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞগণ লোকসাহিত্য বা লৌকিক সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা— মুসলমানী সাহিত্য বা কিস্সা সাহিত্য, পল্লী গীতিকা বা গাথাকাব্য সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য । এর বাইরে আছে বৈষ্ণবতত্ত্ব সাহিত্য, কুলজী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, শাক্তপদসাহিত্য ইত্যাদি।

অনুবাদ সাহিত্য ঃ অতঃপর বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবও প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক্। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী ভয়াবহ এক কালপর্ব অতিক্রান্ত হবার পর উপযুক্ত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলায় নবজাগরণ শুরু হয়েছিল। সদ্য জাগরিত জাতি নতুন উদ্যম ও প্রেরণা নিয়ে উদ্দীপ্ত হলেও কিন্তু নতুন সৃষ্ট বাংলা ভাষা নতুন সাহিত্য সৃষ্টির উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাইতো সেকালের কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে রসদ সংগ্রহ করেছিলেন; প্রথম থেকেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন সম্পদ রামায়ণ, মহাভারতের মত মহাকাব্য ও ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হল। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কোন যোগাযোগ ছিল না; সংস্কৃত ভাষাও সাহিত্য থেকে অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা পরিপুষ্ট হবার সুযোগ লাভ করেছে। অনুবাদ সাহিত্য এই সুযোগ পেয়েছে সর্বাপেক্ষা অধিক। বস্তুতপক্ষে, তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে অন্ধকার যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্যেই অনুবাদ সাহিত্য উদ্ভবের প্রেরণা লুকিয়ে ছিল। বিধর্মী মুসলমান শক্তির কাছে পরাভূত হিন্দু শক্তি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে তৎপর হয়েছিল। এই প্রতিরোধের মূল প্রয়াস ছিল পৌরাণিক ও অপৌরাণিক জনসমাজের সংমিশ্রণ। ইসলামের আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ জনগণের সামনে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদির প্রচার ছিল সাধারণত অভিজাত শিক্ষিত জনসমাজে; তাই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে হিন্দুর আদর্শ ও বিজয় গৌরব প্রচার করার প্রয়োজন ছিল। এর ফলে লৌকিক জনজীবনে পৌরাণিক আচার-বিশ্বাস, আদর্শের প্রচার ঘটল। এই পর্বের কবিরা যুগগত প্রবণতা সম্পর্কে সম্যক্ভাবে অবগত ছিলেন বলেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে ছিলেন। এই কালপর্বে হিন্দুসমাজে এক জন জাতীয় নেতারও প্রয়োজন ছিল; রামায়ণ, মহাভারতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রামচন্দ্র প্রমুখ চরিত্রে যুগোচিত জাতীয় নেতাকে খুঁজে পেয়েছিল। এই কালপর্বে নবাগত মুসলমান জনসাধারণ ও সুলতানগণ— ধীরে ধীরে তাদের ইসলামিক সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে চলে এসেছিল; ফলে তারা ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুর আদর্শ ও হিন্দু বীরপুরুষদের বিজয় কাহিনী ও ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এর ফলে মুসলমান সুলতানগণ হিন্দু কবির সাহায্যে রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ করিয়ে নেন সুলতান হুসেন শাহের সময়কালে চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ যথাক্রমে সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে নেন। হুসেন শাহ্

198550

29 AUG 2007

UNIVERSITY ... BENGAL

এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ দু'জনেই পরধর্মসহিষ্ণু ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। জানা যায় কৃত্তিবাসও কোন এক গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, কারও কারও মতে এই গৌড়েশ্বর ছিলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের প্রশংসা করে লিখেছেন—

"পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥"[১৪]

শুধুমাত্র রাজ-আনুকূল্যেই অনুবাদ হয়নি, সমাজ ইতিহাসের প্রয়োজনে, নিজেদের দায়বদ্ধতা হেতু, নিজের রসবোধের কারণেও কবিরা অনুবাদ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কবিরা কতটা যুগসচেতন ছিলেন তাঁদের কাব্যে তার পরিচয় আছে। মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" গ্রন্থে যবন শাসন ও অত্যাচারের কথা বলেছেন—

"ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব ॥"[১৫]

শুধু তাই নয়, তিনি হিন্দুর আদর্শ জাগরণের জন্য ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তিনি লোক নিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তাই মালাধর বসু লিখেছেন—

"ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
.. ..
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥"[১৬]

ইসলামের অগ্রাসন রোধে পৌরাণিক ভাবাদর্শের প্রচার মালাধর বসুর প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা ছিল। আর কৃত্তিবাস বাঙালীর সংস্কার, রুচি, আদর্শবোধের অনুকূলে বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাস স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সুতরাং তাঁর রামায়ণ রচনার উদ্দেশ্য হল সমাজ সংগঠন । লোক বুঝাবার জন্য এবং ভগ্নপ্রায় বাঙালী সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে তিনি লিখেছেন—

"সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥"[১৭]

বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য ঃ বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মতবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী যুগেই বাঙালী রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছাড়াও কিছু কিছু ক্ষুদ্র প্রকীর্ণ কবিতায়, যথা কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, হালের গাথাশপ্তশতী গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনী পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালেই বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। চৈতন্য-পূর্বকালেই বৈষ্ণবধর্ম নতুন পথে অগ্রসর হচ্ছিল; ভাগবতে উল্লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে এই বৈষ্ণবধর্মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকলেও কৃষ্ণভক্তির নতুন ধারাটি এসেছিল ভাগবত পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে থেকেই। ডঃ সুকুমার সেনের মতে— "পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভক্তির নূতন স্রোত বহিয়া আসিল ভাগবত-পুরাণের উৎস হইতে।" [১৮] এই স্রোতের মুখ খুলে দিয়েছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী, তিনি

চৈতন্যদেবের আগমনের পথও প্রশস্ত করেছিলেন। বস্তুত অনুবাদের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণভক্তির নতুন পথ বাঙালী সমাজে খুলে গিয়েছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণভক্তির ধারা লক্ষ করা গেলেও তা ভাগবতোক্ত ধারা নয়, কারণ মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তি অঙ্কন করেছিলেন, বাঙালী সুধী সমাজ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপকে গ্রহণ করেননি, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রূপকেই ভালবাসতেন। তুর্কী বিজয়ের পূর্বেকার রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত রচনাগুলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বলিত কাহিনী পাওয়া যায়। তুর্কী বিজয়ের পূর্ববর্তীকালে এমন কি চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল তা পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্ম, যেখানে ভাগবত ও পুরাণে উল্লিখিত বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিশেষভাবে ছিল। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পুরাণোক্ত বৈষ্ণবধর্মের সম্বন্ধ ছিল না বলা চলে, কেননা তখন পর্যন্ত সমাজে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা পূজ্যস্থান অর্জন করতে পারেনি। কবিগণ ধর্মেও বৈষ্ণব ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী সেবক ছিলেন। বিদ্যাপতির ধর্ম নিয়ে মতানৈক্যের অবকাশ থাকলেও তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, সম্ভবত বিদ্যাপতি পঞ্চোপাসক ছিলেন। পদাবলীর চণ্ডীদাস সম্ভবত সহজিয়া সাধক ছিলেন। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলন বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্পর্ক স্থাপন করে। চৈতন্যযুগেই বৈষ্ণবপদকর্তাদের পদ রচনা সাধনার নামান্তর হয়ে পড়ে। চৈতন্য-পূর্ব কালে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্যগুলির সঙ্গে বৈষ্ণবপদসাহিত্যের সম্পর্ক ছিল না, তখন দুটি পৃথক ধারা ভিন্ন পথে চলেছিল। কিন্তু এযুগেই বৈষ্ণবপদসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতা স্থাপনের প্রয়াসও চলতে থাকে। মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণনামের মহিমার কথা ঘোষণা করেন। মালাধর বসু লিখেছেন—

"উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে।
জল আচরত যেন সংসার ভিতরে॥"[১১]

মালাধর বসুর কাব্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবধর্মের পূর্বাভাস আবিষ্কার করেছেন। 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই পঙ্‌ক্তিটিকে আশ্রয় করে শ্রীচৈতন্যদেব ভাববিহ্বলতা বোধ করতেন । আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের শেষাংশে 'রাধা-বিরহ'তে কৃষ্ণ বিরহে উন্মাদিনী শ্রীরাধার সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে জয়দেবের কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরবর্তীকালীন কৃষ্ণলীলার যোগসূত্র রক্ষা করেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ছিলেন না, আর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে যে ভক্তির প্রকাশ আছে তা বেদ নির্দেশিত বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তির সঙ্গে তর পার্থক্য সুস্পষ্ট।চৈতন্যযুগে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৈষ্ণবপদসাহিত্য শাখায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । চৈতন্য-পূর্ব যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বহন করে প্রসারিত হলেও চৈতন্য পূর্ব ও পরবর্তীকালে বৈষ্ণবপদসাহিত্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ করা গেল । ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শ ও ভাব আন্দোলনের ফল। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দার্শনিক ব্যাখ্যার আলোকে গড়ে উঠল পরবর্তীকালীন পদাবলী সাহিত্য। এইপর্বে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব পদাবলীর নতুন শাখা বিস্তার লাভ করে। বৈষ্ণব সাধকগণ চৈতন্যলীলাকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে এক দেখতে চাইলেন। রচিত হল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী ও গৌরচন্দ্রিকা। অন্যদিকে বৈষ্ণবগীতি কবিতার পাশাপাশি শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠল চৈতন্য জীবনী সাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা গেল কাশীরাম দাসের মহাভারতে।

মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ এই আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে আমাদের জানতে হবে

মঙ্গলকাব্য কি বা কাকে বলে? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - "বাংলার লৌকিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাংলার সমাজ জীবনাশ্রিত নরনারী-চরিত্রেরই জয়গান করা হইয়াছে, তাহাদিগকেই বাংলার মঙ্গলকাব্য বলা হইয়া থাকে।"[২০] আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর বিকাশ, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের পর আর কেউ মঙ্গলকাব্য রচনা করেননি বা মঙ্গলকাব্য রচনা করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি। মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত আখ্যান কাব্য, পল্লীর জনসভা থেকে উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভাতেও তা সমাদৃত হয়েছিল। পল্লীকবির লেখনীপ্রসূত, মূলত দেবকথামূলক ধর্মাশ্রিত হলেও কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়নি। যাই হোক্ ডঃ ভট্টাচার্যের মতে—"বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে।"[২১]

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল পাল রাজাগণ বৌদ্ধধর্মের উপাসক হলেও তারা পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। সমাজের গভীরে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের অন্তঃশীলা প্রবাহ নিঃশব্দে বয়ে চলেছিল। সেন রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য-লৌকিক, অপৌরাণিক সংস্কৃতি সংমিশ্রণের সুযোগ লাভ করেছিল। বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধধর্ম, আর্য, অনার্য সংস্কৃতির মিলন হয়ে চলেছিল, আর তুর্কী আক্রমণের ফলে তার সঙ্গে যুক্ত হল নবাগত ইসলামধর্ম। ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের ফলে ইসলামের প্রবল অভিঘাতে অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ভাবধারা ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে বাংলার নিম্নকোটির জনসমাজ থেকে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নও লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। জনসাধারণ উপলব্ধি করেছিল জীবন বাস্তবে শূন্য নয়; সেখানে ভয়-ভীতি, দারিদ্র্য আছে, তাই মানুষ লোকায়ত দেবদেবীর আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যত্নবান হয়েছিল। এই সর্বস্তরের অরাজকতার মধ্যে লোকায়ত দেবদেবীর অভ্যুত্থান ঘটেছিল, অবশ্য তারা সমাজের গভীরে লোকসমাজে দীর্ঘকাল ধরে পূজিত হয়ে আসছিল। নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদেই সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাদের উন্নাসিকতা পরিত্যাগ করে নিম্নকোটির লোকায়ত দেবদেবীকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল; এর ফলে পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটল, এই মিশ্রণই মঙ্গলকাব্য রচনার ঐতিহাসিক প্রেরণা । এসমস্ত লোকায়ত দেবদেবীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল মনসা, চণ্ডী, বাশুলী, শীতলা, ষষ্ঠী, ধর্মঠাকুর ইত্যাদি । মিশ্রণের ফলে লৌকিক দেবতার আর্যীকরণ ঘটতে লাগল; ফলে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে এদের সম্পর্ক স্থাপন করে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে তারা গৃহীত হল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্বীকৃতি পেল। ডঃ অতুল সুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন-—"আর্যসমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিল পুরুষদেবতা, আর আর্যেতর সমাজের প্রধান দেবতাসমূহ ছিলেন নারীদেবতা। আর্যদেবতাসমূহ যতই প্রাধান্যলাভ করতে লাগলেন, আর্যেতর এ সকল নারীদেবতাসমূহ ততই পর্বতকন্দরে, ঝোপজঙ্গলে বা গাছতলায় আশ্রয়লাভ করলেন। কিন্তু মধ্যযুগে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি টলমল করে উঠল, তখন এ সকল নারীদেবতা তাঁদের পর্বতকন্দর, ঝোপজঙ্গল ও গাছতলার আশ্রয় পরিহার করে ক্রমশ হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ধর্মসংস্কারের মধ্যে প্রবেশলাভ করতে লাগলেন। এই অনুপ্রবেশকে সহজ করবার জন্য তাঁদের পৌরাণিক মাতৃদেবীর সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা হল॥"[২২] সাধারণ মানুষ শাসকের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য এসমস্ত লৌকিক দেবতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইল। এভাবে অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান দেবতার কল্পনা করে বাঙালী সেদিন আত্মতৃপ্তি অনুভব

করেছিল। এসমস্ত অমঙ্গলকারী দেবতার পূজা করলে, ভক্তি করলে সংসারের মঙ্গল হয় এই বিশ্বাস থেকে তারা হয়ে উঠল মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী । এভাবে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে লৌকিক সাহিত্যকে আশ্রয় করে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যরীতি গড়ে উঠল, যেখানে স্থান পেল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাব-ভাবনা। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা কিন্তু স্বভাব চরিত্রে গোলোকবিহারী দেবতা নয়; স্বর্গের দেবতা মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি-মাটির সংস্পর্শে এসে তাদের দেবসুলভ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে রেখে মাটির কাছাকাছি মানুষ হয়ে উঠেছে। তাইতো পার্বতী কখনো পাটনীর বেশ ধারণ করে খেয়া পার করে, শিবঠাকুর কাঁধে লাঙল-জোয়াল নিয়ে হাল বইতে যায়; মনসা সাধারণ মানুষের মত ক্ষুদ্রচেতা ও ঈর্ষাপরায়ণ, সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীনতা ও নীচতার পরিচয় দিতে পারে; তাছাড়া দেবদেবীরা অশিক্ষিত সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর মত রুচিহীন, কলহপরায়ণ। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর স্বভাব পরিচয় প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র চরম কথা বলেছেন। দেবী অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে বর দিতে চাইলে হরিহোড় বলেছে—

"হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥"(ভারত/১৪৬)

রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন- "এককালে পুরুষদেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোনো উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়েদেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পুজো চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই। তোমার দলিল কী। গায়ের জোর। কী উপায়ে দখল করবে। যে উপায়েই হোক।"[২৩] মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের স্বরূপ সম্পর্কে সূত্রাকারে আলোচনা করা যেতে পারে-

প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ পৌরাণিক দেবদেবী নয়; অনার্য-লৌকিক, অপৌরাণিক দেবদেবী; নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে, নানা উপাদানের সংযোগে এদের উৎপত্তি । যেমন দেবী চণ্ডী ব্যাধ সমাজের শিকারের দেবী, মেয়েলী ব্রতকথার-হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার দেবী, অসাধ্য সাধনের দেবী, পশুসমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী (আরণ্যক উপন্যাসে উল্লিখিত পশুসমাজের রক্ষয়িত্রী দেবী টাঁরবাড়ো হতে পারে)। মনসা সর্পপূজা, সিজগাছপূজা ও কৃষিজীবী সমাজের উর্বরতা শক্তির দেবী, প্রজনন শক্তির দেবী। ধর্মঠাকুরের মূলে আছে আদিম প্রস্তরোপাসনা, সূর্য আরাধনা; তাছাড়া রোগভীতি ও রোগ থেকে উপশমের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পরিকল্পনা, যেমন বসন্তের দেবী শীতলা, ওলাওঠা বা কলেরা রোগের দেবী ওলাবিবি, ব্যাঘ্রভীতি থেকে ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায় বা বড়গাজী খাঁ-র সৃষ্টি।

দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সঙ্গে সুউচ্চ আদর্শ বা দার্শনিকতার সম্পর্ক নেই। ইহলোকে সমৃদ্ধি এবং শেষে স্বর্গে গমন, সে স্বর্গও পৃথিবীর চাইতে অধিকতর ভোগ বিলাসিতার স্থান ছাড়া কিছু নয়। মোক্ষ বা মুক্তি দানে তাদের আগ্রহ নেই। হরিহোড় অন্নদার পাদপদ্মে ঠাঁই চেয়েছিল। কিন্তু দেবী তাকে জানায়—

"হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে।
কিছু দিন সুখভোগ করহ বিশেষে॥" (ঐ)

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা মানুষের কামনা-বাসনা পূর্ণ করে, ভয়ভীতি, রোগশোক দূর করে। তাই দেবী তুষ্ট হলে মঙ্গল, অসন্তুষ্টিতে অমঙ্গল হয়।

তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী চরিত্র রূপায়ণে হিন্দুর লৌকিক দেবী, বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী ও পৌরাণিক দেবীকে সমন্বিত করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে পুরাণের দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে কৌলীন্য প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী মানবায়িত, তারা মানুষের মত রাগ-দ্বেষ, লোভ-হিংসা, দুঃখ-দারিদ্র্য সমস্ত মানবিক গুণাবলী দ্বারা পুষ্ট। মাঝে মাঝে দেব লক্ষণাক্রান্ত করতে গিয়ে তাদের চরিত্রে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের ভয়ে ভীত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের গঠনগত ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুসৃত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে তার বিষয় পরিকল্পনায় কতকগুলি সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বস্তুত কোন বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়নি, পরবর্তীকালে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যকে বিচার করে কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই দেখা যায় সকল বৈশিষ্ট্যগুলি কোন একটি মঙ্গলকাব্যে অনুপস্থিত। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যেরই দূর সম্পর্কিত আত্মীয়, তাই বাংলায় পুরাণের আদর্শকে অনুসরণ করে মঙ্গলকাব্যের একটা গঠনগত রূপ গড়ে তোলা হয়েছে। আদর্শ মঙ্গলকাব্যে কয়েকটি বিভাগ রয়েছে, যেমন ১। গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা ২। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ ও কবির আত্মপরিচয় বর্ণনা ৩। দেবখণ্ড এবং ৪। নরখণ্ড। এই গঠন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বাংলার সমাজ ইতিহাসে অঙ্গীভূত হতে পারে, কারণ এতে বাংলার মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। বস্তুত বাংলার লৌকিক জীবনের বাস্তব ইতিহাস সম্মত পরিমণ্ডলই মঙ্গলকাব্যের গঠন নির্দিষ্ট করেছিল। মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—

প্রথমতঃ প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়েছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা দিয়ে। কোন মঙ্গলকাব্যেই একজন দেবতার বন্দনা নেই, এখানে মঙ্গলকাব্য নির্দিষ্ট দেবদেবী ছাড়াও দেবদেবীর পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় সমস্ত দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গলে চণ্ডী ও মনসার দ্বন্দ্বই প্রাধান্য পেলেও কাব্যের শুরুতে চণ্ডী-আদ্যাশক্তি মহামায়ার বন্দনা করা হয়েছে। শৈব ও শাক্ত দ্বন্দ্ব প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের কবি শিব বন্দনা করেছেন তাছাড়াও চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবিরা চৈতন্য বন্দনা, সর্ব দেবদেবী বন্দনা, এমন কি বিপ্র বন্দনাও করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে জন্ম হলেও কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সমাজের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের সম্মিলনই মঙ্গলকাব্যে বড় হয়ে উঠেছে। এবং এতে সেকালের বাঙালীর ধর্মগত অবস্থান সম্পর্কেও ধারণা করা যায়। বস্তুত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব যাই হোক না কেন বাঙালী পঞ্চোপাসক। কোন নির্দিষ্ট দেবতার প্রতি তাদের আস্থা নেই, তাই কবি বৈষ্ণব হলেও শাক্তদেবীর বন্দনা করতে ভোলেননি। যুগগত পরিবর্তনের ফলে ধর্ম সম্পর্কিত চেতনাও বদলে যায়, তাই চৈতন্য-পরবর্তীযুগের কবিগণ চৈতন্য বন্দনা করেছেন, আবার ভারতচন্দ্রের যুগগত প্রতিবেশ অনুযায়ী ভারতচন্দ্র দেবতাকে নিয়ে বিদ্রূপ তামাসা করেছেন; বন্দনা প্রথাসিদ্ধভাবে করলেও দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তির বহিঃপ্রকাশ নেই। মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দুর দেবকথামূলক কাব্য হলেও সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই মঙ্গলগানের আসরে ভীড় করত, প্রত্যেকেই জাতীয় জীবনকথা সাগ্রহে শ্রবণ করত। মঙ্গলকাব্যের কবি তাই সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কথাই মঙ্গলকাব্যে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা করা। প্রায় সব কবিই কাব্য রচনার কারণ হিসাবে দেবদেবীর স্বপ্নাদেশের কথা বলেছেন। মনে হয় দৈববাদী, ব্যক্তি- স্বাতন্ত্র্যহীন বাঙালীর পক্ষে

মধ্যযুগে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই দৈবাদেশের কথা এসেছে; তাছাড়া মানুষের কাছে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জনের জন্য, গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দৈবাদেশের কথা এসেছে। এর ফলে মানুষের উৎসাহ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেত। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনায় কবির আত্মপরিচয় থাকত এবং আত্মপরিচয় সূত্রে কবি দেশ-কালের কথা বলতেন, ফলে একালের পাঠকের পক্ষে কবির সমকালের ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ মঙ্গলকাব্যের একটা অন্যতম অংশ দেবখণ্ড। এখানে থাকে সাধারণত সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, দক্ষের শিব হীন যজ্ঞের আয়োজন . সতীর দক্ষালয়ে যাত্রা, শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় গৃহে সতীর জন্মগ্রহণ, মদনভস্ম, হরগৌরীর বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা ইত্যাদি এবং শেষে দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা। তবে একমাত্র চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যেই এই অংশগুলি সুস্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত; অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে কবিকঙ্কণের কাব্যেই তা সুস্পষ্ট। দ্বিজ মাধবের কাব্যে এই বর্ণনার পরিবর্তে মঙ্গলাসুর বধের বৃত্তান্ত আছে। মনসামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার পরেই মনসার জন্মকথা, পার্বতী মনসার দ্বন্দ্ব বর্ণিত। আর ধর্মমঙ্গলের দেবখণ্ড সুস্পষ্ট নয়। যাইহোক, দেখা যাচ্ছে মঙ্গলকাব্যগুলি দেবখণ্ড হয়ে নরখণ্ডে প্রবেশ করেছে। কারণ মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনার্য দেব-পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত ; অনার্য-অপৌরাণিক দেবকাহিনী মধ্যযুগীয় হিন্দুসমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু সামাজিক সমীকরণের ফলে যখন অপৌরাণিক দেবদেবীর উত্থান ঘটতে থাকল তখন বর্ণহিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে অপৌরাণিক দেবদেবীর কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটানো হল, যদিও এর মধ্যে দিয়ে লৌকিক জীবনকথাই বড় হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবই একমাত্র দেবতা যার পৌরাণিক এবং লৌকিক দুই পরিচয়ই সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই শিবের সঙ্গেই অন্যান্য দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করতে দেখা গেল। এর মধ্যে দিয়ে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অপৌরাণিক লোক-সংস্কৃতির মিলন ঘটানো হয়েছে ইতিহাসের প্রয়োজনেই। একথাও ঠিক যে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের পর মঙ্গলকাব্যের যুগই হল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠার যুগ। কিন্তু এই নবযুগে নিরঙ্কুশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, মঙ্গলকাব্যে এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিফলন দেখা যায়।

চতুর্থত ঃ মঙ্গলকাব্যের মস্তিষ্ক হল নরখণ্ড। এখানে দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী কোন অপ্সর বা অপ্সরীকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যে প্রেরণ করে থাকে, এখানে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগের মধ্যে দিয়ে পূজা প্রচারের পর স্বর্গে গমন করে। স্বর্গের অপ্সর বা গন্ধর্ব মর্ত্যের ধূলিমাটির স্পর্শে সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। নরখণ্ডে থাকে নায়কের চৌতিশা, নায়িকার বারমাস্যা, নারীগণের পতিনিন্দা, কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ, নায়িকার রন্ধন বর্ণনা. বিবাহাচার বর্ণনা ইত্যাদি সমাজ ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধ উপকরণ। লোকজীবন সম্ভূত এ সকল বর্ণনা সমাজ ইতিহাসের দলিল, তাই মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বহু অপ্রাপ্ত তথ্যের শূন্যস্থান পূরণ করেছে এই মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্য (কি দেবখণ্ড, কি নরখণ্ড) বর্ণনায় কবি যে সমস্ত পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন, যাকে আমরা মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্ব বলে চিহ্নিত করে থাকি, সেগুলিতে সমাজ ইতিহাসের বহু সত্য লুকিয়ে আছে। অপ্সর-অপ্সরীর মানব ঘরে জন্মগ্রহণ, বণিক শ্রেণীর আধিপত্য, শিব-শক্তির দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়গুলিতে বহু ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে যা আমরা পরে আলোচনা করব।

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য ঃ মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে লোককথা ও লোকসাহিত্যের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে; এদিক থেকে ব্রতকথা, রূপকথাগুলি মঙ্গলকাব্যের পরমাত্মীয়। ব্রতকথাগুলির মধ্যেই মঙ্গলকাব্যের বীজ লুকিয়ে

ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলির উৎস সন্ধানে পুরাণ সাহিত্যের কথাও উঠতে পারে; এমন কি কোন কোন দিক থেকে মঙ্গলকাব্যগুলিকে পুরাণ সাহিত্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ট হতে দেখা যায়।পুরাণ সাহিত্যে আমরা পৌরাণিক দেবতার প্রাধান্যের কথাই পাই, এখানে পৌরাণিক দেবতার বিজয়গাথা প্রচার করা হয়েছে, আর মঙ্গলকাব্যগুলির লক্ষ্যেও কিন্তু ঐটিই অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যে অপৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারই মূল লক্ষ্য, কিভাবে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হল সেকথাই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে উপজীব্য। মঙ্গলকাব্যের দু'টি মূল অংশ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে আমরা সম্পূর্ণভাবে পৌরাণিক দেব কাহিনী পাই, সেখানে লৌকিক দেবদেবীর কোন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়নি। অবশ্য এর মধ্যে দিয়ে সমাজ ইতিহাসের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে অপৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অপৌরাণিক দেবদেবীর আর্যীকরণ বা পৌরাণিকীকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়াও আমরা দেখি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে প্রচুর পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অংশে দেখা যায় কাহিনী কখনো রামায়ণের রাম কাহিনীর মত, কখনোবা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীর মত করে গ্রথিত করা হয়েছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক প্রভাব ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায় না। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের মূলে পুরাণ সাহিত্যের গভীর প্রভাব থাকলেও কিন্তু উভয় সাহিত্য শাখায় বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্য ও পুরাণ সাহিত্য উভয়ই দেবকথায় পরিপূর্ণ হলেও পুরাণগুলি দেবতার কীর্তিকলাপেই পূর্ণ, সেখানে মানুষের কথা স্থান পায়নি। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যের দেবকথা থাকলেও সেখানে দেবকথার মোড়কে মানবকথাই পরিবেশিত হয়েছে, দেবতা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য কিন্তু মানুষ।

দ্বিতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যগুলি সমকালীন সমাজ ইতিহাসের যেন জীবন্ত দলিল; বাস্তব জীবন ও পরিমণ্ডলকে বাদ দিয়ে মঙ্গলকাব্য পূর্ণ হতে পারে না; অথচ পুরাণগুলিতে সমকালের সমাজ ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র পাওয়াও সাধারণভাবে দুষ্কর; মঙ্গলকাব্যগুলি পুরাণ অপেক্ষা তাই অনেক বলিষ্ঠ জীবনবোধে ভরপুর।

মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে লোকসাহিত্যের যোগ অতি ঘনিষ্ট; বাংলার লৌকিক ব্রতকথাগুলি লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ। ব্রতকথাগুলির সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগাযোগ আছে, বলা যায় ব্রতকথাগুলিই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবমূলে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এখন দেখা যাক্ ব্রতকথা আসলে কি? 'ব্রত' শব্দটি 'বৃ' ধাতুর সঙ্গে 'অত্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ব্রত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল তপস্যা, নিয়ম, সংযম। ডঃ শীলা বসাকের মতে— "সাধারণত কোন কিছু কামনা করে দেবতার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানিয়ে কোন বিশেষ আচার পালন বা অনুষ্ঠান করা কিংবা পার্থিব কল্যাণ কামনায় 'দশে মিলে' যে সামাজিক নিয়ম বা অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই ব্রত বলা হয়। তাই ব্রত হল নিয়ম-সংযমের মধ্যে দিয়ে কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূণ্যকর্মের অনুষ্ঠান।"[২৪] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[২৫] আবার 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে' বলা হয়েছে, ব্রত হল— "পূণ্যলাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; তপস্যা; সংযম।"[২৬] নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন—"ব্রত কথাটির অর্থই বোধ হয় আবৃত করা, সীমা টানিয়া পৃথক করা; নির্বাচন করাই ব্রতের উদ্দেশ্য; বরণ কথাটিরও একই ব্যঞ্জনা। ব্রতানুষ্ঠানে আলপনা দিয়া অথবা বৃত্তাকারে সীমারেখা টানিয়া দিয়া ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়; এই সীমারেখা টানা, স্থান নির্বাচন বা চিহ্নিত করার মধ্যে জাদুশক্তি বা ম্যাজিকের বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন।"[২৭] তাহলে দেখা গেল ব্রত হল কামনা-বাসনার অনুষ্ঠান। ব্রতের অনুষ্ঠান করলে ঐহিক

ও পারত্রিক লাভ হয়। তবে লক্ষণীয়, বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতগুলি সাধারণ মানুষের ইহলৌকিক বা ঐহিক কামনা-বাসনা পূরণের অনুষ্ঠান। সাধু-সন্ন্যাসীগণ ঈশ্বর দর্শনেচ্ছায় বা অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের কারণে ব্রতানুষ্ঠান করে, তাতে তাদের পারত্রিক কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষাও থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতগুলি মূলত সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনা, সুখ-সমৃদ্ধি, পুণ্য অর্জন, পাপক্ষয়ের জন্য কৃত অনুষ্ঠান। যারা ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকে তাদের বলা হয় ব্রতী। ডঃ শীলা বসাক জানিয়েছেন— "ব্রতী অর্থে কোন গুরুতর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়। সংসারে বা পরিবারে নারীদের ভূমিকা বা দায়িত্ব অসীম। নারীদের ত্যাগ, আদর্শপরায়ণতা ও সেবাই সংসারকে সুখের করতে পারে। . . . . ব্রতকথা শোনার মধ্যে দিয়ে সংসারে কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা লাভ হয় এবং কিভাবেই বা ত্যাগ, কর্তব্যপরায়ণতা ও স্নেহশীলতার দ্বারা আদর্শ নারী হওয়া যায় তারই প্রচ্ছন্ন আদেশ বা নির্দেশ দেওয়া হয়।"[২৮] আর বাংলার ব্রত অনুষ্ঠানে ব্রতীরা নানাবিধ আচার ও পূজা অনুষ্ঠানের শেষে যে কথা গল্পাকারে আবৃত্তি করে তাকে ব্রতকথা বলে। ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে বলেছেন— "লৌকিক দেবদেবীর পুজো অনুষ্ঠানে ব্রত পালনের সময় লোককথাগুলি আবৃত্তি করা হয় বলেই একে ব্রত কথা বা ব্রত অনুষ্ঠান কথা বলে।"[২৯] পূর্বোক্ত অভিধানে বলা হয়েছে—যে দেবতার আরাধনাকল্পে ব্রত করা হয়, সেই-দেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনীই ব্রতকথা।[৩০] এসমস্ত ব্রতানুষ্ঠান বা ব্রতকথার উদ্ভব মূলে রয়েছে গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, আদিম টোটেম-টাবু, জাদুশক্তি বা জাদুবিদ্যার প্রতি আস্থা, প্রজনন শক্তির উপাসনা, লৌকিক সূর্যপূজা ইত্যাদি কৃষিজীবী সমাজের বাস্তব প্রয়োজন বোধ। এসমস্ত ব্রতকথা বাংলার বাইরে প্রচার লাভ করেছে তাই নয়, সমস্ত ব্রতকথা বা ব্রতাচারই যে বাংলার লোকসমাজের তা না-ও হতে পারে। অনেকের মতে ব্রতকথার মৌলিক প্রেরণা বাংলাদেশের বাইরের বিভিন্ন কৃষিজীবী আদিম সমাজও হতে পারে, কিন্তু তা বাংলার জল-বাতাসে পুষ্টিলাভ করেছে। তারপর আর তাদের উপর বিদেশীয় আবরণ থাকেনি, এদেশীয় আচার-বিচার আত্মীকরণের মধ্যে দিয়ে বাংলার লোক-সমাজের সম্পদে পরিণত হয়েছে।

ব্রতকথার দেবদেবীরা কিন্তু শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক দেবদেবী নয়, অনেক সময় তাদের পুরাণোক্ত দেবদেবী বলে ভ্রম হতে পারে; বিশেষত তাদের নামানুসারে। কিন্তু তারা অপৌরাণিক-লৌকিক দেবদেবী মাত্র; তাই এদের পূজা পদ্ধতি ও আচার স্বতন্ত্র; কোন পুরোহিতদর্পণে এদের পূজা পদ্ধতি লেখা হয়নি, পূজা অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই।আসলে আর্য-অনার্য সমাজ সংমিশ্রণের ফলে নতুন সংহত সমাজ গড়ে ওঠার অবকাশ পেয়েছিল, সেখানে দেবচরিত্রগত সংমিশ্রণের ফলে তার ভিতরে একাধারে শুভঙ্করী শক্তি ও অন্যদিকে অনিষ্টকরী শক্তির প্রকাশ পেয়েছে। তাইতো পূজা-অর্চনা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে ইষ্টলাভ, আর দেবী অসন্তুষ্ট হলেই অনিষ্ট। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— দেবী সন্তুষ্ট হলে গোলা ভরা ধান হয়, গোয়াল ভরা গরু হয়, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া হবে, আর অসন্তুষ্ট হলে গোয়ালে গরু মরে, হাতিশালে হাতি মরে, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে।[৩১] তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রতীর কামনা-বাসনাও অত্যন্ত সাধারণ, ঐহিক কামনা বাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সাধারণত পারত্রিক কোন কামনা-বাসনা ব্রতকথার মধ্যে প্রকাশ পায় না।ব্রতের দেবীরাও মানুষের মত হাসে, কাঁদে, তারা লোভ-দ্বেষ-হিংসা নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনসীমাকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। এখানে মানুষের সঙ্গে দেবতার পার্থক্যও প্রায় থাকে না। ডঃ ভট্টাচার্যের মতে— যেহেতু ব্রতকথাগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন সমাজব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত, তাই এখানে কোন ব্যক্তিত্বমণ্ডিত চরিত্র থাকতে পারে না, ফলে দেবতা এখানে মানব চরিত্রের দ্বারাই

প্রভাবিত, মানুষ দেব চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত নয়।[৩২] আসলে ভয় থেকেই ভক্তি আসে; একদা অরণ্যবাসী মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলি যথা—দাবানল, ঝড়, বজ্র,বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যাকে ভয় পেত। কেননা তারা ছিল সকল প্রকার শিক্ষার সংস্পর্শ বর্জিত । ফলে বিপদসঙ্কুল পরিবেশ থেকে তাদের মনে নানা প্রকার সংস্কার, ভয়-ভীতি দানা বাঁধতে থাকে। মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নানা রকম অলৌকিক শক্তি কল্পনা করে এবং তাদের ভক্তি করে, পূজা-আচ্চা দ্বারা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে— এ বিশ্বাস থেকে যে, তারা সন্তুষ্ট হলে আর অনিষ্ট করবে না। এ সূত্রকে অন্তঃস্থলে বহন করে স্মরণাতীত কাল থেকেই ব্রতাচার পালিত হয়ে আসছে। আজও তা হিন্দু বাঙালীর ঘরে ঘরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। এভাবে ক্রমশ বহু অপৌরাণিক ব্রতাচার ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে গেছে, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে আদি ও মধ্যযুগে এসে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে কোন লৌকিক ব্রতের উল্লেখ নাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে জানিয়েছেন- আর্যরা অনার্যদের 'অন্যব্রত' নামে ডাকত।[৩৩] আর্যদের চোখে অন্যব্রতরা ছিল হীন। ঠিক একইভাবে নীহাররঞ্জন রায় 'ব্রাত্য' শব্দটির উৎস সন্ধান করেছেন। তিনি অনুমান করেছেন 'ব্রাত্য' শব্দটি 'ব্রত' থেকে এসেছে। তিনি লিখেছেন— "যাত্রা, ধ্বজাপূজা প্রভৃতির মতো ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ব্রতোৎসবের ইতিহাস অতি জটিল ও সুপ্রাচীন, তবে এই ধরনের ধর্মোৎসব যে প্রাক্-বৈদিক আদিবাসী কোমদের সময় হইতেই সুপ্রচলিত ছিল এ সম্বন্ধে সংশয় বোধ হয় নাই। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি যাঁহাদের বলিয়াছে 'ব্রাত্য' বা পতিত , তাঁহারা কি ব্রতধর্ম পালন করিতেন বলিয়াই ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন?"[৩৪] তিনি আরও জানিয়েছেন যে,- অবৈদিক-আর্যভাষীদের বৈদিক-আর্যভাষীরা 'ব্রাত্য' বলে চিহ্নিত করেছিল। ব্রাত্যরা তাদের কাছে পতিত, বিপথগামী, তই 'ব্রাত্যষ্টোম' যজ্ঞ দ্বারা পরিশুদ্ধির মাধ্যমে ব্রাত্যদের সমাজে গ্রহণ করা হত।[৩৫] প্রাচীনকালে আর্য পুরুষরা যুদ্ধ জয়ের যাগ-যজ্ঞ করেছে, অনার্যরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন অন্তঃপুরচারিণী নারীরা ব্রত পালন করে স্বামী-পুত্রের সৌভাগ্য কামনা করেছে, বিজয় কামনা করেছে। ব্রতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন— "নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই-সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্য কামনায়— এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করেছে কী আর্য কী অন্যব্রত সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস"[৩৬]। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে ব্রতগুলি প্রাক্‌বৈদিক যুগের সংস্কৃতিকে বহন করেই এসেছে।

ব্রতগুলি উদ্ভবকালের বহু উপাদান আপন অঙ্গে বহন করে চলেছে আজও তার প্রায় কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের মানসিক গঠন ও জীবনচর্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে নিজের জীবনযাত্রাকে গড়ে তোলে এবং নিজের জীবনকে নিরাপদ করতে চায়, এই আত্মরক্ষার প্রবণতা থেকেই মানুষ অনিষ্টকারী শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে এবং তার উপকরণ সংগ্রহ করেছে নিজ নিজ পরিবেশ থেকে, নিজ নিজ জীবনযাপনের সহকারী উপাদান থেকে। তাই ব্রতাচার, ব্রতের ছড়া-পাঁচালীর মধ্যে চারিপাশের উপকরণগুলির ব্যবহারই দেখা যায়; শুধু তাই নয়, ব্রতের কামনা অনুযায়ী উপাদানগুলির রকমফের ঘটে যায়। আদিম মানব সমাজে প্রাকৃতিক শক্তিপূজা, বৃক্ষপূজা, নদীপূজা, বাস্তুপূজা ইত্যাদির আলাদা আলাদা উপাদান-উপকরণ আছে, তাছাড়া বিশেষ কামনায় অনুষ্ঠেয় ব্রতগুলিতে আলাদা আলাদা উপকরণ আছে।

তাই আমরা দেখি পূজা-পার্বণ বা ব্রতের বিবর্তন পথে প্রাকৃতিক শক্তিপূজা-বৃক্ষপূজা-পশুপূজা-প্রতীকপূজা-মূর্তিপূজায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। আমরা দেখি লৌকিক দেবদেবীদের প্রত্যেকেরই পশুবাহন আছে, তাদের সিজবৃক্ষও আছে। ধারণা করা যায়— ঐ দেবদেবী নির্দিষ্ট পশু বা সিজবৃক্ষের প্রতীকে পূজিত হত। আমরা দেখি দেবদেবীদের বাহন হল পশু ও পাখি; যেমন- চণ্ডীর সিংহ, লক্ষ্মীর পেঁচা, সরস্বতীর হাঁস, কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর, শিবের ষাঁড়, ইত্যাদি। আবার শিবের বেলগাছ, কৃষ্ণের তুলসী ও কদমগাছ, মনসার মনসাসিজ বা ফণীমনসা গাছ, লক্ষ্মীর কলাগাছ, শীতলার নিমগাছ এছাড়াও বিভিন্ন দেবদেবীর বকুল, অশ্বত্থ, বট, বাঁশ, মানকচু, পলাশ, আম, ডুমুর, শেওড়া, আমলকি ইত্যাদি দেবতার প্রতীকে পূজা করা হয়। ব্রতানুষ্ঠান বা পূজায় ঐ সমস্ত বৃক্ষপত্র বা ফল আবশ্যক হয়। যেমন শিবের ত্রিপত্র- বেলপাতা, কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর পূজায় তুলসী পাতা, লক্ষ্মী পূজায় কলাগাছ, সরস্বতী পূজায় পলাশফুল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়াও পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্য আবশ্যক হয়। ব্রতাচারের এসমস্ত বহু উপাদানই অনার্য সংস্কার জাত, যেমন- ধান, যব, তিল, সরিষা, কলাই, নারকেল, পান, সুপারি, আম্রপল্লব, কলা পাতার অগ্রভাগ (আগ্নিপাতা), মঙ্গলঘট, সিঁদুর, আখ, কুশ, হলুদ, দূর্বা, বিভিন্ন ধরনের পত্রপল্লব ইত্যাদি। পশুপালক সমাজের স্মৃতি বহন করে গৃহপালিত পশুজাত দ্রব্য, যথা— পঞ্চগব্য অর্থাৎ গোবর, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ব্রতাচারগুলিতে বিভিন্ন প্রতীক আলপনা অঙ্কন করা হয়, তাতে কামনা-বাসনার পরিস্ফুরণ লক্ষ করা যায়। কখনো উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি কামনায়, কখনো প্রজনন শক্তি বৃদ্ধির কামনায়, কখনো বা জাদুশক্তি কামনায় ঐসব ব্রতগুলি পালিত হয়। এর মধ্যে বহু যুগের বহু মানুষের কামনার প্রকাশ আছে; আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, সমাজের প্রতিটি মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের অশ্রুসজল কাহিনী আছে। সেখানে আর্য আর অনার্যদের বিচিত্র আদান-প্রদানের ইতিহাস, পৌরাণিক-অপৌরাণিক সকল দেবদেবীর উদ্ভবের ইতিহাস, এই বিচিত্র ভাবের আদান-প্রদানের ইতিহাস, শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় সকল প্রকার ব্রতের ইতিহাস ঐ একই ভূমিতে উপ্ত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— "পুরাণের দেবদেবীদের উৎপত্তির ইতিহাস এই আদানপ্রদানের ইতিহাস;ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই, কেবল এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেই-সব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতন-পুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তার পর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারও তলায় অন্যব্রতদের এই-সব ব্রত— একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন-ভাণ্ডারে।"[৩৭]

শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি বাদে মেয়েলি ব্রতগুলি দু'প্রকার— নারীব্রত ও কুমারীব্রত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন নারীব্রতগুলির সঙ্গে অনেকখানি শাস্ত্রীয় ব্রতাচার মিশে আছে, কুমারী ব্রতগুলি অনেকখানি বেশি খাঁটি। ব্রতাচারগুলি কুমারী মেয়েদের কামনা-বাসনার প্রতীক, তবে যেমন কামনা তেমনি তার ব্রতাচার। এখানে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, নারীরাই ব্রতী, নারীই আয়োজক ও পুরোহিত। গ্রাম্য মেয়েরা ভবিষ্যত জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় মুখরিত করে রাখে। বারোমাসে তেরো পার্বণের বাঙালী সমাজে এসব ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ সমাজ মুখরিত হয়ে থাকত। অন্তঃপুরচারিণী নারীর গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে রূপলাভ করত। কখনো স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা, কখনো সতীত্ব রক্ষা, কখনো বা সন্তান কামনা এবং সুখ-সম্পদ কামনা করে ব্রতগুলি পালিত হত। এর মধ্যে সমকালীন সমাজ সত্য, ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে থাকে, নারীর পার্থিব কামনা-বাসনার মধ্যে তা প্রকাশ পায়। বহুবিবাহের জ্বালা, সপত্নী কলহ থেকে রেহাই পাওয়া, পুত্রবতী হওয়া, ভালো রাঁধুনী হওয়া, সহনশীলা হওয়ার কামনা থাকে; যার মধ্যে সেকালের নারীর অবস্থান ও তাদের করুণ কাহিনী রূপলাভ করে থাকে। যেমন 'দশপুতুল' ব্রতের মন্ত্রে নারীর চিরায়ত কামনা রূপলাভ করেছে। যেমন—

১। এবার ম'লে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব।

২। এবার ম'লে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব॥

৩। এবার ম'লে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব।

৪। এবার ম'লে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব॥

৫। এবার ম'লে মানুষ হব, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।

৬। এবার ম'লে মানুষ হব, কর্ণের মত পুত্র পাব॥

৭। এবার ম'লে মানুষ হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হব।

৮। এবার ম'লে মানুষ হব, দুর্গার মত সোহাগী হব।

৯। এবার ম'লে মানুষ হব, দূর্বার মত নত হব।

১০। এবার ম'লে মানুষ হব, ধবার মত ধৈর্য ধরব॥

সমাজ জীবনের বহু করুণ বাস্তব চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় উচ্চারিত মন্ত্রে। যেমন সেঁজুতি ব্রতের 'অশ্বত্থ গাছ' মন্ত্র—"অশ্বত্থ তলায় বাস করি। সতীনের ঝড় বিনাশ করি॥ সাত সতীনের সাত কৌটা। তার মাঝে আমার এক অস্ত্রের কৌটা॥ অস্ত্রের কৌটা নাড়ি চারি। সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি॥"

কন্যা সন্তানের জন্মদানের পরিণতি আমাদের সমাজের জানা; নারীর তাই কামনা পুত্রসন্তান, কন্যাসন্তান নয়, তাই 'অশ্বত্থপাতা' ব্রতের মন্ত্র—

"ঝুরঝুরোটি মাথায় দিলে, চুনি-মুক্তোর ঝুরি হয়।
কচিটি মাথায় দিলে, কমল পুত্র কোলে হয়।"

ব্রতাচারগুলির মূল লক্ষ্যই হল দেবদেবীর গুণকীর্তনের মধ্যে দিয়ে কামনা-বাসনার পূরণ আকাঙ্ক্ষা করা। নারী সমাজ শুধুমাত্র আপন সুখ-সমৃদ্ধিই কামনা করে না, করে সকলের মঙ্গল কামনা। তাই বৈশাখ মাসে যখন নদ-নদী, খাল-বিল, শুকিয়ে যায় তখন ধরিত্রীর উর্বরতা কামনায়, বৃষ্টি কামনায় বসুধারা ব্রত বা পৃথিবী ব্রত পালন করে। পুকুর খননের ইচ্ছায় 'পুণ্যিপুকুর' ব্রত, শস্য কামনায় অগ্রহায়ণ মাসে 'ইতুপূজা ব্রত' পালিত হয়। অরণ্যষষ্ঠী ব্রতেও সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়—

"জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্য ষাট। ফিরে ঘুরে এল ষাট॥
বার মাসে তের ষাট। ষাট ষাট ষাট॥
ঝি-চাকরের ষাট। গোরু-বাছুরের ষাট॥
কর্তার ষাট, ছেলেমেয়ের ষাট।
বউ ঝিয়ে ষাট, নাতি-নাতনীর ষাট। ষাট ষাট ষাট॥"[৩৮]

সকল ব্রতেই এই জাতীয় মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় নারীর চিরন্তন কামনার প্রতিফলন দেখি। আমাদের সাহিত্যে বাংলার বিভিন্ন ব্রতাচারের বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালী রমণীগণ নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে ব্রত পালন করে থাকে। কেননা ব্রত পালনের ফলে মঙ্গল হয়, আর ব্রত পালনের ত্রুটি হলে অমঙ্গল হয়। মঙ্গল-অমঙ্গলের আশঙ্কায় নারীগণ আপন অন্তঃপুরে থেকেই দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায়, কল্যাণ কামনা করে।

তাছাড়াও ব্রত পালনের অন্য ফলও আছে। উপবাস করলে শরীর সুস্থ থাকে. ফলমূলাদি ভক্ষণে নারীর পুষ্টিলাভ ঘটে, বিশ্রাম লাভ ঘটে, ধৈর্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ক্ষমতা জন্মায়। ব্রতের পালনীয় বিভিন্ন আচারের বৈজ্ঞানিক কারণও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করলে টক্ না খাওয়া, সরস্বতী পূজার আগে কুল না খাওয়া, নবান্ন উৎসবের আগে নতুন চাল না খাওয়া ইত্যাদিতে সংস্কারের পাশাপাশি আবেগ ও সংস্কৃতির পরিচয় থাকে। এর মধ্যে থেকে সমাজ জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবন পদ্ধতির পাঠগ্রহণ সম্ভব।

এসব ব্রত পালনের বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন, কিছু ব্রত মাসিক ব্রত হিসাবে পালিত হয়, আবার কতককগুলি বারোমেসে ব্রত। ঋতুবৈচিত্র্যময় বাংলাদেশে ঠিক ঠিক ঋতুধর্ম অনুযায়ী ব্রত পালিত হয় এবং তার

উপকরণ ব্যবহৃত হয়। যেমন জামাইষষ্ঠীর ব্রতের অন্যতম উপকরণ আম, তালনবমী ব্রতের উপকরণ তাল। আবার এগুলি অন্যান্য ব্রতে নিষ্প্রয়োজন। যেমন বিভিন্ন সময়ে পালিত মাসিক ব্রতগুলি হল— বৈশাখ মাসে পুণ্যিপুকুর ব্রত, অশ্বত্থপাতা ব্রত, শিবঠাকুরের ব্রত, গো-কল ব্রত, পৃথিবী ব্রত, হরিরচরণ ব্রত, দশপুতুল ব্রত, নিত্ সিন্দুর ব্রত, অক্ষয়ফল ব্রত, অক্ষয়ঘট ব্রত, মধু সংক্রান্তি ব্রত, ছাতু সংক্রান্তি ব্রত, ঘৃত সংক্রান্তি ব্রত, বৈশাখী পূর্ণিমা ব্রত, অক্ষয়কুমারী ব্রত, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, বৈশাখ চম্পক ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, জামাইষষ্ঠী বা অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, চাঁপাচন্দন ব্রত, জ্যৈষ্ঠচাঁপা ব্রত। আষাঢ় মাসে বিপত্তারিণী ব্রত।শ্রাবণ মাসে নাগপঞ্চমী ব্রত, লোটনষষ্ঠী ব্রত। ভাদ্র মাসে মন্থনষষ্ঠী ব্রত, দূর্বাষ্টমী ব্রত, তালনবমী ব্রত, অনন্তচতুর্দশী ব্রত। আশ্বিন মাসে দুর্গাষষ্ঠী ব্রত।কার্তিক মাসে বৈকুণ্ঠচতুর্দশী ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপূজা ব্রত, সেঁজুতি ব্রত, নাটাইচণ্ডী ব্রত। পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা ব্রত। মাঘ মাসে ভৈমীএকাদশী ব্রত। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ব্রত। চৈত্র মাসে অশোকষষ্ঠী ব্রত, রামনবমী ব্রত ইত্যাদি। এছাড়াও বারোমেসে ব্রত, যেমন সুবচনী ব্রত, সত্যনারায়ণ ব্রত; সাপ্তাহিক ব্রত হিসাবে পালিত হয় শনির ব্রত। প্রতি সপ্তাহের শনিবার এই ব্রত পালিত হয়। এই ব্রতাচারের বিভিন্নতা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন কামনা— জাদুশক্তির কামনায় বৃক্ষবিবাহ, পশুবিবাহ ইত্যদিও বিভিন্ন ব্রতাচারের অঙ্গীভূত হতে দেখা যায়, যা আদিম সমাজব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। বট ও অশ্বত্থ গাছকে বর-কনে হিসাবে ধরে বৃক্ষ বিবাহ, কোথাও বা কলাগাছ বিবাহ, কোথাও বা ব্যাঙের বিবাহ (বৃষ্টি কামনায়); সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে মানুষের বিবাহও হতে দেখা যায়। অমানবিক প্রথা হলেও আজও তা সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে মুছে যায়নি।

লৌকিক ব্রত হলেও এই ব্রতগুলির উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের ছাপ পড়ে গেছে, বহু ব্রতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। কতকগুলি ব্রতে মূল্যবান সামগ্রী ব্রাহ্মণ পুরোহিত পেয়ে থাকে। এই ব্রতগুলি উচ্চবর্ণের সমাজে গ্রহণের পাশাপাশি ব্রাহ্মণের লোলুপতার ছাপ সুস্পষ্ট। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল ব্রত সৃষ্টির মূলে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণদের আর্থিক দুর্গতিকে চিহ্নিত করেছেন, তিনি মনে করেন আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পেই লোভী ব্রাহ্মণরা বিভিন্ন ব্রতে নানা রকম দ্রব্য দানের বিধান দেয়।[৩৮] যেমন অক্ষয়ঘট ব্রতের শেষ বছর চারজন ব্রাহ্মণকে পিতলের কলসী, পিতলের সরা, পাখা ইত্যাদি দিতে হয়, কিংবা মধুসংক্রান্তি ব্রতে বারোটি মধু পূর্ণ কাঁসার বাটি, একটি মধু পূর্ণ রূপার বাটি দিতে হয়, সুতরাং সাধারণ দরিদ্র ঘরের মেয়েদের পক্ষে এসব ব্রত পালন করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে এসব ব্রতগুলিও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মধ্যে পড়ে জটিল হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজ আপন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পলি পড়লেও দেখা যায় অনেক দেবদেবীর ক্ষেত্রে এই সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধেক বা কোন ক্ষেত্রে সামান্য সংস্কার হয়েছে মাত্র. যেমন শনিদেব; শনিদেব গৃহের মধ্যে এলেও তার পূজা হয় আঙ্গিনায়, গৃহাভ্যন্তরে নয়। শনিদেব অস্পৃশ্য দেবতা হওয়ায় তার প্রসাদও ঘরে তোলা হয় না। তেমনি অনেক দেবতা আজও অরণ্যে, ক্ষেত্রে বা বৃক্ষতলেই থেকে গেছে। ব্রতকথাগুলি কিন্তু নারী মহলেরই সম্পদ, পুরুষের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বলা চলে। কেননা পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান অন্তঃপুর; অন্তঃপুরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ নারী দেবতার কাছেই তাদের একান্ত কামনা-বাসনা নিবেদন করে এসেছে। ধরা যেতেও পারে, পুরুষশাসিত সমাজেই নারীব্রতের সৃষ্টি হয়েছিল। যত দিন না সামাজিক প্রয়োজনে মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছে ততদিন পুরুষ সমাজ এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। ব্রতের দেবীরাই সমাজ ইতিহাসের প্রয়োজনে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে. তারা মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ব্রতের দেবী মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হলেও ব্রতের দেবীর মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "ব্রতকথার দেবতাদিগের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ভাবগত সম্পর্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথা ভিত্তি করিয়াই উচ্চতর সাহিত্য মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রতকথার একটি স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র আছে বলিয়াই মঙ্গলকাব্য ইহার ধারাটি লুপ্ত করিয়া দিতে পারে

নাই।"[৪০] ব্রতকথাগুলি থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি সৃষ্টি হলেও ব্রতকথাগুলি কেন কোন রকম পরিবর্তন ও পরিমার্জনা ছাড়াই অটুট থেকে গেছে, তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ব্রতকথাগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীন সমাজ থেকে সৃষ্টি বলে আজও অপরিবর্তিত থেকে গেছে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক পরিশীলিত সৃষ্টি বলে কালগত চেতনা পরিবর্তনের ফলে তার গঠনগত, রূপগত, স্বভাবগত নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে। বস্তুত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল মঙ্গলকাব্য হলেও এক নয়, কারণ কবির চেতনাগত পরিবর্তন। আবার একই মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন সময়ের সৃষ্টি বলে একই দেবীমঙ্গল কাব্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে অর্থাৎ নতুন মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু নতুন নতুন ব্রতকথা তৈরী হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে পুরুষ দেবতা-কেন্দ্রিক শনি বা ত্রিনাথের ব্রতকথা এবং স্ত্রীদেবতাকে কেন্দ্র করে সন্তোষী মাতার ব্রতকথা তৈরী হয়েছে। সমাজের বিভিন্নরকম প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র থেকে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রতকথাগুলি সম্পূর্ণভাবে সমাজের সৃষ্টি। নির্দিষ্ট সমাজ থেকে ব্রতকথার উৎপত্তি ও ব্রতের বিধি তৈরী হয়েছিল, তা কালক্রমে বাহিত হয়ে এসেছে অপরিবর্তিত ভাবে। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যগুলি পরিশীলিত সৃষ্টি, সেখানে আছে সচেতন কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ, ফলে কবি ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী মঙ্গলকাব্য পরিবর্তিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ ব্রতকথাগুলি ধর্মাচরণের অঙ্গ, একারণে বহুল প্রচার সত্ত্বেও দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থেকে গেছে। মঙ্গলকাব্যগুলি কিন্তু ধর্মাচরণের অঙ্গ নয়। কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে ঐ দেবতার মঙ্গলগান গীত হতে পারে, তবে এবিষয়ে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই। তাছাড়াও বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলগান গীত হতে পারে। কিন্তু ব্রতকথাগুলি নির্দিষ্ট ব্রতাচারের অঙ্গ হওয়ায় ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না, এমনকি ব্রতের শেষে ব্রতকথা শ্রবণ না করলে ব্রতের সম্পূর্ণ ফললাভ সম্ভব নয়, তাই নতুন ব্রতকথা সৃষ্টি হয়নি।

চতুর্থতঃ ব্রতকথাগুলি একান্তভাবে নারী সমাজের বিষয় হওয়ায় তা সহজে বদলে যায়নি। কেননা আমাদের অন্তঃপুরটা সহজে বদলায় না, এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য— "এই সব অতি পুরাতন ব্রত এখনও কেমন ক'রে বাঙালির ঘরে ঘরে করা হয়, এর উত্তরে বলা চলে আমাদের সদর অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সঙ্গে তো বদলে যায়নি। সেটা কাল, তার পূর্বে এবং তার—তার—তারও পূর্বে যা আজও তা। অন্তত বেশির ভাগ মেয়েলি কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতনির এবং ঠাকুরমাতে ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাত নেই।"[৪১]

ব্রতকথাগুলি অটুট থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হওয়ায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি অর্থাৎ ব্রতকথাগুলি প্রাচীন এবং রক্ষণশীল ধারাকে অনুসরণ করে এসেছে। ব্রতের কাহিনী পল্লবিত হয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্য ব্রতকথা থেকেই এসেছে, ব্রতকথা মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা গ্রহণ করেনি।[৪২]

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের সম্পর্কের দিকটিকেও লক্ষ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ব্রতকথাগুলি মৌখিক সাহিত্যের অঙ্গ আর মঙ্গলকাব্যগুলি লিখিত সাহিত্যের অন্তর্গত। মৌখিক সাহিত্য কালে কালে মুখে মুখে প্রচারিত। দিদিমা থেকে নাতনী পর্যন্ত একই আকারে আবৃত্তি হয়ে এসেছে; এর হোতা কে তা জানা যায় না। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যগুলি লিখিত হওয়ায় এতে শিক্ষিত কবি-ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। প্রতিটি দেশের সাহিত্যেই মৌখিক সাহিত্যকে ভিত্তি করেই লিখিত সাহিত্য গড়ে ওঠে, সুতরাং মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা ব্রতকথা প্রাচীনতর।

দ্বিতীয়তঃ ব্রতকথাগুলি গল্পাকারে গদ্য ভাষায় বিবৃত হয়, ফলে তাতে সংক্ষিপ্ততা থাকে, অবশ্য ব্রতকথা ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লিখিত হলে পাঁচালীতে পরিণত হয়। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রথমাবধি আগাগোড়া ছন্দোবদ্ধ রচনা, ফলে তাতে বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা থাকে।

তৃতীয়তঃ ব্রতকথার স্রষ্টা এবং পোষ্টা উভয়ই নারী। ব্রতের স্থান নারী মহলে আর মঙ্গলকাব্যের স্রষ্টা পুরুষশাসিত

সেহি দোসে ছাড়ি তোরে জায় লক্ষিন্দর ॥" (নারায়ণ/৭৫)

শুধুমাত্র ব্রত মাহাত্ম্যই নয়, সমগ্র মঙ্গলকাব্য জুড়ে এরকম অজস্র ব্রতের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও নানা ব্রতের উল্লেখ আছে। আমরা মধ্যযুগীয় কাব্য ধারানুযায়ী ব্রতের তালিকা উল্লেখ করতে পারি। যেমন- মনসা ব্রত, চণ্ডীব্রত, দশহরা ব্রত, অরফা বা অরন্ধন ব্রত, ষষ্ঠী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, লক্ষ্মী ব্রত, সূর্য ব্রত, একাদশী ব্রত, নারায়ণ ব্রত, অষ্টমী ব্রত, অসিপত্র ব্রত, চান্দ্রায়ণ ব্রত, অম্বুবাচী ব্রত, ধর্ম ব্রত, অনন্ত ব্রত, অমাবস্যা ব্রত, সত্যপীর ব্রত, কার্তিক ব্রত ইত্যাদি নানান ব্রতের মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ আছে। তাছাড়াও নাম না জানা বহু ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মহাভারত, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন, কৃষ্ণরাম দাসের রচিত ষষ্ঠীমঙ্গল, কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীমঙ্গল কাব্যে, মৈমনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকাতে প্রচুর বিভিন্ন ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রতকথার কাহিনীই যে ধীরে ধীরে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে সমালোচক পণ্ডিতগণ সকলেই একমত।ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, তুর্কী আক্রমণের বহু পূর্বেই মনসা-চণ্ডীর মত বিভিন্ন ব্রতের দেবদেবীর লীলাকাহিনী প্রচলিত ছিল ব্রতকথার আকারে। তারপর একদা সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠালাভ ঘটলে পুরুষ সমাজেও ব্রতকথা পাঁচালীর আকারে পঠিত বা গীত হত।[৪৪] এভাবে ধীরে ধীরে ব্রতকথাগুলি পুরুষ সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় এবং পরবর্তীকালে বৃহত্তর সমাজ ব্রতকথা ও পাঁচালীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়। তাই ব্রতের কাহিনী অপেক্ষা পাঁচালীর কাহিনীগত পার্থক্য হয়ে যায় এবং সেখানে মঙ্গলকাব্যগুলি আরও পল্লবিত হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, মঙ্গলকাব্যের চরিত্র পরিকল্পনাও ব্রতের চরিত্র পরিকল্পনা জাত। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের সম্পর্ক অর্থাৎ ব্রতকথা থেকে মঙ্গলকাব্য কিংবা ব্রতের দেবী কিভাবে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- "অন্তঃপুরাশ্রিতা অসহায়া নারী দৈব করুণার উপর সর্বোতভাবে আত্মনির্ভর করিয়া যেমন নিজের অবস্থার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া থাকে, একদিন তুর্কী আক্রান্ত বাংলার হিন্দু সমাজও অন্তঃপুর-বন্দিনী নারীর মতই তেমনই অসহায় বোধ করিয়াছিল। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন সে স্বভাবতঃই দৈব-শক্তির উপর নির্ভর করে । যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া নারী দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রতকথাগুলির জন্মদান করিয়াছে, সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই পুরুষকেও মঙ্গলকাব্যের দেবত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইয়াছিল বলিয়া উভয়ের পরিকল্পিত দেবচরিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ'কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকর হইয়াছে।"[৪৫] বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন- "দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক ছড়া ও ব্রতকথা পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্ব হইতেই লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। এইগুলিরই অপেক্ষাকৃত সুগঠিত রূপকে পাঁচালী বলা হয়। ক্ষমতাবান কবিদের হাতে পড়িয়া এই পাঁচালীই মঙ্গলকাব্যে পরিণতি লাভকরিয়াছে।"[৪৬] ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে — "বহু রূপকথা ও উপকথা পরবর্তীকালে ব্রতকথায় রূপান্তরিত হয়েছে। ব্রতকথাকে ভিত্তি করেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে।"[৪৭] উপরিউক্ত মন্তব্যসকল থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ব্রতকথা থেকেই মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি। প্রথমে ব্রতকথা পাঁচালী কাব্যে এবং পরে পাঁচালী আরও সুগঠিত রূপ পেয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হয়েছে; ব্রতকথা-পাঁচালী-মঙ্গলকাব্য রূপে বিবর্তিত হয়েছে। অনেক পরবর্তীকালে পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী এবং ত্রিনাথের পাঁচালী রচিত হয়েছে. আবার পুরুষ পুরোহিতের দ্বারাও অনেক সময় মেয়েলি ব্রতকথা পদ্যরূপ লাভ করেছে। ব্রতকথার লিখিত রূপই পাঁচালী হিসাবে কথিত হলেও ধীরে ধীরে পাঁচালী একটি বিশিষ্ট পরিভাষায় পরিণত হয়েছে।ব্রতের দেবতা সাধারণত স্ত্রী, মঙ্গলকাব্যের দেবতা স্ত্রী হলেও পুরুষ দেবতাও আছে, কিন্তু সত্যনারায়ণ, শনি কিংবা ত্রিনাথ পুরুষ দেবতা। ব্রতকথা সাধারণত ব্রতানুষ্ঠানে গল্পাকারে বলা হত, কিন্তু পুরুষ দেবতাদের ব্রতকথা গল্পাকারে বলার নিদর্শন

মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রতের দেবী হিসাবে মনসার কোন প্রতিপত্তি নেই, অন্তঃপুরচারিণী মহিলার মত সেও খানিকটা অসহায়, তাই তার দৈবীসত্তার প্রকাশ হিসাবে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে। ব্রতকথার চরিত্রগুলিই মনসামঙ্গলে খানিকটা ব্যক্তি পরিচয়ে চিহ্নিত। ব্রতের কাহিনীতে কোন বৃহত্তর সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই ক্ষুদ্র গণ্ডীকে কাটিয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি এখানে যুক্ত হয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামো। ব্রতকথার গল্পাকারে প্রচলিত কাহিনী গেয় কাব্যে পরিণত হয়েছে।

মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসাবে চিহ্নিত কানা হরি দত্ত। বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে হরি দত্তের উল্লেখ করেছেন এবং হরি দত্তের কাব্যের নানা ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলেছেন এবং বলেছেন হরি দত্তের গীত মনসার পছন্দ হয়নি। মনসা স্বপ্নে কবিকে নির্দেশ দিয়েছিল—

"সর্ব্ব লোকে গীত গাহে না বোজে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥
হরিদত্তের গীত লোপ্ত পাইল এই কালে।
জোড়া গাথা নাহি কিছু ভাগে বোলে চালে॥
গীতে মতি না দেয়ে কেহ ভাবে বোলে চাল।
তাহা দেখি পুত্র মোর উপজে বিশাল॥
মোর বোলে পুত্র তোমি হও সাবহিত।
নানা ছন্দে নানা রাগে রচ মোর গীত॥" (বিজয়/৫)

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কানা হরি দত্ত সম্পর্কে বলেছেন— "তিনি সম্ভবতঃ মনসামঙ্গলের ছড়ার রূপকে পাঁচালীর আকার দিয়াছিলেন।"[৫০] পঞ্চদশ শতকে বিজয় গুপ্তের সুগঠিত মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হলে হরি দত্তের পাঁচালী ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত মনসামঙ্গলের ক্ষুদ্র রচনা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫১] এই রচনাটি ব্রতকথার পাঁচালীর মত। সুতরাং মনসামঙ্গল কাব্য ব্রতকথা ও পাঁচালীর মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে। যদিও নাগপঞ্চমী ব্রতকথার সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনীর কোন মিল নেই, তবে মনসামঙ্গলের মতই কনিষ্ঠা বধূর অসাধ্যসাধনের কাহিনী আছে, মনসার দাক্ষিণ্যে যশ ও খ্যাতির কথা আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীও কনিষ্ঠা বধূর অসাধ্য সাধনের কাহিনী— জাদুশক্তি এবং মৃতের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী, প্রাণের উর্বরতার কাহিনী, হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়া, সন্তান লাভ, বন্ধ্যাত্ব মোচন ও অন্ধত্ব মোচনের কাহিনী। বিভিন্ন কবির রচিত মনসামঙ্গলে ব্রতের প্রসঙ্গটি আছে যা চাঁদ সদাগরের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ মনসাপূজা ও মনসার ব্রত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"এইত আষাঢ় মাসে জগত হরষিত।
চৌদিগে মনসা পূজে গাইনে গাহে গীত॥
পাতিয়া বিচিত্র ঘট সমুখে গীত গায়ে।
কোন অপরাধে ঘট ঠেলে বাম পায়ে॥
চান্দো সদাগর বেটা চম্পকিয়া রাজা।
চম্পক নগরে বেটা মানা করে পূজা॥
এইত শ্রাবণ মাসে মনসা পঞ্চমী।
লুকাইয়া সনকা পূজে তথা গেলাম আমি॥" (ঐ / ৪৯৮)

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে অনুরূপ প্রসঙ্গের সাক্ষাৎ পাই। শিবঠাকুর মনসাকে বর দিতে গিয়ে বলেছে—

"সদয় হইয়া আমি তোরে দিল বর।
করিব তোমার পূজা দেব সুর নর॥
বার পর্ব্ব তোমার হইব বার মাসে।
জ্যৈষ্ঠে জগতী পূজা-দশমী দিবসে॥
আষাঢ়ে হইব নাগ পঞ্চমীর পূজা।
ঝাপান করিব যত ঝাপানিয়া ওঝা॥
শ্রাবণ মাসেতে পূজা লবে খরতরা।
খই দধি দিয়া লোক পালিবেক ঢেরা॥
ভাদ্রমাসে ভালমতে পূজিবেক নরে।
হইবে আরন্ধ ব্রত প্রতি ঘরে ঘরে॥
পান্ত ওদন দিয়া পূজিবেক তোমা।
আশ্বিনে অকথ্য পূজা দিতে নাঞি সীমা॥
কার্ত্তিক মাসের পূজা কহনে না যায়।
কুহু তিথি সুহু বৃক্ষে পূজিবেক তোমায়॥
আখণ্ড সিজের ডাল করিয়া রোপণ।
আতব তণ্ডুল রম্ভা নানা আয়োজন॥
করিব তোমার পূজা দেবাসুরগণে।
নৌতন সকল দ্রব্য হইব আঘনে॥
পৌষে পরমেশ্বরী পবিত্র আচারি।
মাঘমাসে মহাপূজা লইবে কুমারী॥
ফাল্গুন চৈত্র মাসে চৌদ্দ ভুবনে।
করিব তোমার পূজা দেবাসুরগণে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬)

এখানে মনসার ব্রত বারোমেসে ব্রত হিসাবে উল্লিখিত। মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলাকে মনসার দাসী অর্থাৎ ব্রতদাসী হিসাবে উল্লেখ করতে দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে আছে—

"যদি হই শুদ্ধমতি রক্ষা করবে পদ্মাবতী
তোমার গাইলে কি হইব আমা।
চিত্ত দিয়া শোন বসি আমি মনসার দাসী
যতি দেখি খেমিলাম তোমা॥" (বিজয়/৩২৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও মনসা জালু-মালুর জননীকে ব্রতদাসী বলে উল্লেখ করেছে এবং বলেছে, মনসা আগে তার পূজা নিতে যাচ্ছে—

"মনসা বলেন নেত শুন মোর বাণী।
করিব আমার পূজা জালুর জননী।
চাম্পাই নগরে আছে জালুমালুর মা।
রাত্রিদিন জপে মনে মনসার পা॥
পদুমার পরিচর্য্যা করে দিবানিশি।
জালুর জননী বটে মোর ব্রতদাসী॥

.. ..

আমার মঙ্গল পূজা আছে ব্রতগাথা।
জালুমালুর পূজা নিতে আগে যাব তথা॥" (ক্ষেমানন্দ/১৩৬)

বেহুলাও নিজেকে মনসার ব্রতদাসী বলে উল্লেখ করেছে—

"বেহুলা বলেন মাতা জয় বিষহরি।
আমি তব ব্রতদাসী সাধুর কুমারী॥"(ঐ/২৮৯)

পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় 'বগুলার বারমাসীতে' মনসার ব্রতাচারের কথা পাই—

"শাওন বাওনা মাস আখাল পাখাল পানি।
মনসা পূজিতে কন্যা হইল উৎযোগিনী॥
কান্দিয়া বসাইল ঘট আপনার গিরে।
প্রাণপতি ঘরে আইসে মনসার বরে॥
চাচর চিক্কণ কেশে গিরটি মাঞ্জিল।
নূতন পিটালি দিয়া আলিপনা দিল॥
পঞ্চনাগ আঁকে কন্যা শিরের উপরে।
মনসা দেবীরে আঁকে অতি ভক্তি ভরে॥
শির নোয়াইয়া করে শতেক পন্নতি।
বর দাও মনসা গো ঘরে আইওক পতি॥"[৫২]

আবার বিভিন্ন কাব্যে দেখা যায় সাধারণ ব্রতীদের মতই সনকা, রাখালগণ, বেহুলা, জালু-মালু জননী কখনো সম্পদ কামনায়, সন্তান লাভের জন্য, স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য, হারানো সম্পদ ফিরে পাবার জন্য, বিপদে রক্ষা পাবার জন্যই মনসার স্তুতি করেছে। মনসামঙ্গলে দেখা যায় স্বর্গের নর্তকী উষা মনসাপূজার প্রতিশ্রুতি নিয়েই মর্ত্যে বেহুলা রূপে জন্মগ্রহণ করেছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' মনসা উষাকে মর্ত্যে আনয়নের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—

"যখনে বিপদ হয়ে পড়িব সঙ্কটে।
তখনে আসিবা মাতা আমার নিকটে॥

.. ..

মোর বরে হবে তোর সুন্দর আকৃতি।
ত্রিভুবনের স্ত্রী হইতে তুমি হবা সতী॥
অগ্নির জ্বালে তুমি না হবা পীড়ন।
মৈলে মড়া জিয়াইবা হারাইলে পাবা ধন॥" (বিজয়/২০১-২০৫)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখি ব্রতের ফলের মতই মনসার কৃপায়—

"ঘোড়াশালে ঘোড়া উঠে হাতিশালে হাতি।
দানীগণ উঠে আর সৈন্য সেনাপতি॥" (জগজ্জীবন/৩২৭)

সুতরাং মনসামঙ্গল কাব্য নাগপঞ্চমী ব্রতের উত্তরাধিকারকে বহন করেই কাব্যরূপ পেয়েছে। ব্রতকথার সংক্ষিপ্ততা ধর্ম এখানে নেই, তবে মঙ্গলকাব্যে পূজা প্রচারের শেষে স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসে পূজা প্রচার করেছে। ব্রতের কাহিনী অনেক বেশী লৌকিক, আর মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্বর্গ-মর্ত্য একাকার হয়ে গেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও মূলত ব্রতকথা ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী যে ব্রতকথার দেবী

চণ্ডী— সে প্রসঙ্গটি বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রতকথার দেবী হিসাবে লৌকিক চণ্ডীর প্রায় এগারো প্রকার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে; যথা— নাটাইচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, কুলইচণ্ডী, শুভচণ্ডী বা সুবচনী, খাড়া শুভচণ্ডী, রথাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, রূপচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ককাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, রণচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। মঙ্গলচণ্ডীর আবার বিভিন্ন রূপ আছে— নিত্য মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, কুলুই মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী, উদয় মঙ্গলচণ্ডী, ভাউত্তা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল সংক্রান্তি ইত্যাদি। আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবাচণ্ডীর কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৩] বাংলার লৌকিক চণ্ডীপূজার বিভিন্ন রূপ এখানে মিলিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবী চণ্ডী অবশ্য মঙ্গলচণ্ডী। বস্তুত দেবী দুর্গারই একটি রূপ হল চণ্ডী; চণ্ড বিনাশিনী বলে তার নাম চণ্ডী, জীবধাত্রী বলে তার নাম মঙ্গলচণ্ডী, বরাভয়দায়িনী বলে তার নাম অভয়া। অনেক কবির মতে মঙ্গলাসুর নিধনকারিনী বলে এই দেবী মঙ্গলচণ্ডী। ব্রতকথার দেবী চণ্ডীপূজা অবশ্য বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন বৈশাখ মাসে হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত জ্যৈষ্ঠ মাসে, নাটাইচণ্ডী অগ্রহায়ণ মাসে পূজিত হয়। এছাড়া বারোমেসে ব্রত হিসাবে চণ্ডীপূজা হয়ে থাকে, শুভচণ্ডী বা সুবচনীর ব্রত একটি জনপ্রিয় লৌকিক ব্রত; বছরের যে কোন সময় এর পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

প্রতিটি ব্রতের শেষে ব্রতীরা দেবীর মাহাত্ম্যসূচক একটি গল্প বলে; লক্ষণীয় বিষয় যে, চণ্ডীর বিভিন্ন রূপভেদ থাকায় তাদের মাহাত্ম্যসূচক গল্পগুলিও পৃথক পৃথক। হতে পারে ব্রতের এই দেবীরা বিভিন্ন সমাজে পূজিত হত এবং তার জন্য পৃথক পৃথক ব্রতকথারও উৎপত্তি হয়েছে। তবে প্রতিটি ব্রতের দেবীর লক্ষ একই অর্থাৎ দেবীরা অসাধ্য সাধনের দেবী, হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার দেবী, সাংসারিক সুখ ও সমৃদ্ধি দানের দেবী। নাটাই চণ্ডী ব্রতের কাহিনীটি নিম্নরূপ–এক সদাগর তার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সুখের সংসার। এক স্ত্রীর মৃত্যুর পর সদাগর বাণিজ্যে যায়। আর এদিকে বিমাতা সতীনের সন্তানদের দিয়ে গরু, ছাগল চরিয়ে নিতে থাকে। একদিন তাদের গরুগুলি হারিয়ে যায়; তখন এক গৃহস্থ ও গৃহিণীর পরামর্শে তারা নাটাইচণ্ডীর পূজা করে হারানো গরুগুলি ফিরে পায়। অন্যদিকে তাদের সদাগর পিতা প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়। লক্ষ করা যাচ্ছে যে, নাটাই চণ্ডীর ব্রত কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বণিক কাহিনীর সামান্য মিল আছে। মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালিত হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম মঙ্গলবার থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর অনুরূপ। তবে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীর দুটি খণ্ড, আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র বণিক খণ্ডই এখানে আছে এবং বণিক খণ্ডের ধনপতি-শ্রীমন্ত-খুল্লনা- লহনা-সংক্রান্ত কাহিনীর ধারাটিই বজায় আছে। হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কাহিনীটি আরও অন্যরকম। প্রতি বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবারে ব্রতীগণকে এই ব্রত নিতে হয়। ব্রত কাহিনীটি গড়ে উঠেছে এক বামনী ও তার গয়লানী সইকে অবলম্বন করে। বামনীর পরামর্শে হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করে গয়লা-বৌ অসাধ্য সাধন করে কিভাবে তা দেখা যায় এখানে। হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করলে ব্রতীর কখনো চোখের জল পড়ে না অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট থাকে না। আবার সুবচনী বা শুভচণ্ডীর ব্রত একটি বারোমেসে ব্রত। বিবাহিত নারীরাই এই ব্রতের ব্রতী। ব্রতের শেষে সধবাদের সুপারি, পান, নাড়ু, কলা, চিনি, তেল, সিঁদুর দিতে হয়। সুবচনী ব্রতের কাহিনী গড়ে উঠেছে কলিঙ্গ দেশের এক দরিদ্র বামুন, তার বামনী ও পুত্রকে কেন্দ্র করে। দেশের রাজার খোঁড়া হাঁস মেরে মাংস খাওয়ার অপরাধে দরিদ্র বামুন-বালককে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে সুবচনী মায়ের কৃপায় তার মুক্তি হয় এবং রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ধন ঐশ্বর্যে তার ঘর ভরে ওঠে। এভাবে ব্রতের কাহিনী প্রচারিত হয়।

দেবী চণ্ডী সম্পর্কিত এসব কাহিনী থেকে মনে হয় হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ও সুবচনী ব্রতের কাহিনী অনেক প্রাচীন, কারণ এখানে এক ভেদাভেদ হীন, নাম-পরিচয়হীন এক সমাজের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা অপেক্ষা নাটাইচণ্ডীর ব্রতকথাটি প্রাচীন, নাটাইচণ্ডীর ব্রতে কাহিনী দানা বেঁধে উঠতে পারেনি, অবশ্য এখানে

বণিক সম্প্রদায়ের কথা আছে। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কথাটি অপেক্ষাকৃত ঘনপিনদ্ধ ও বলিষ্ঠ। পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ কাহিনীকে ভিত্তি করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কাহিনী অপেক্ষা চণ্ডী সম্পর্কিত অন্যান্য ব্রতের কাহিনীর তফাত এখানেই— প্রথমতঃ ব্রতকথার গল্পগুলিতে কোন বাঁধন নেই, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কাহিনীকে প্রসারিত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিস্তারিত হলেও কাহিনী আরও বলিষ্ঠতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রতের কাহিনীর চরিত্রগুলি নাম-পরিচয়হীন, বিশেষত্বহীন , তাদের ব্যক্তিক পরিচয় নেই। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কাহিনীর চরিত্রগুলির নাম পরিচয় থাকলেও তারা ব্যক্তি-পরিচয়হীন টাইপ চরিত্র। অপরদিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলি অনেক স্বাভাবিক এবং নাম পরিচয়-যুক্ত খানিকটা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তৃতীয়তঃ ব্রতকথার দেবদেবী চরিত্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নেই। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ স্বর্গের দেবতা হলেও মাঝে মাঝে মর্ত্যের মানবী হয়ে উঠেছে আবার মাঝে মাঝে দেবী স্বরূপটিও প্রকটিত হয়েছে। আর ব্রতকথার দেবীগণ নিছক অলক্ষে বিরাজমান দেবী।

কাহিনীর বাস্তবতা, দেবী চণ্ডীর অলৌকিক ভূমিকা, কমলেকামিনী ইত্যাদি প্রসঙ্গ কবিকঙ্কণকে মুগ্ধ করেছিল, তাই সম্ভবত তিনি মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাকে সম্প্রসারিত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দের পূর্বে মানিক দত্ত ও দ্বিজ মাধব মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের কাহিনীকে আশ্রয় করেই কাব্য রচনা করেছিলেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীই একমাত্র মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথাকে সার্থক কাব্যে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের কিংবা ব্রতকথার বহু উপাদান চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে, যেমন ব্রতকথাগুলি প্রধানত নারী সমাজের বিষয়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও দেখি প্রথমেই দেবী চণ্ডী স্ত্রীলোকের পূজা নেওয়ার মনস্থ করেছে। কাব্যের প্রস্তাবনা অংশে কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈলা মতি।
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করেন পার্ব্বতী॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরমাসুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী॥" (মুকুন্দ/৯১)[১]

সুতরাং রত্নমালাকে শাপগ্রস্ত করে খুল্লনা রূপে জন্মগ্রহণ করানো হল। ব্রতকথায় এ সমস্ত কাহিনী নাই অর্থাৎ ব্রতকথার সংক্ষিপ্ততা ধর্ম এতে রক্ষিত হয়নি। আরও বিভিন্নভাবে লক্ষ করা যেতে পারে— চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথারই রূপান্তর। যেমন, খুল্লনা ছাগল চরানোর সময় হারানো ছাগল সন্ধান পাবার জন্য চেষ্টা করেছে, তখন দেখতে পেয়েছে দেবকন্যাদের, এরা দেবী চণ্ডীর আটজন সখী। তারা খুল্লনার কাছে চণ্ডীমাহাত্ম্য কীর্তন করেছে এবং হারানো ছাগল ফিরে পাবার জন্য চণ্ডীর পূজা করার পরামর্শ দিয়েছে—

"আমরা ইন্দ্রের সুতা সকল ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর পূজা এসেছি অবনী॥
পূজার উচিত স্থান এ ভারত ভূমি।
বিপদ হইবে দূর ব্রত কর তুমি।" (ঐ/১১৮)[২]

আবার দেখি রত্নমালাকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যে প্রেরণ করলে রত্নমালা বিলাপে বলেছে, সে চণ্ডীর ব্রত প্রচার করবে-

"অবনীমণ্ডলে যাব তোমার কিঙ্করী হব
করাইব ব্রতের বিধান॥" (ঐ/৯২)[৩]

ব্রতের প্রচারার্থেই খুল্লনার জন্ম, তাই 'খুল্লনার রূপ' অংশে আছে—

"দেবীর ব্রতের তরে খুল্লনা বেণের ঘরে
রম্ভাবতী সফল মানিল॥"(ঐ/৯৩)[৪]

রম্ভাবতীর ছদ্মবেশে 'খুল্লনাকে ছলনা' অংশে দেখা যায় চণ্ডীব্রতের প্রসঙ্গটি—

"এমন স্বপন তারে দিয়া মহেশ্বরী।

নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিল অন্তরে॥" (ঐ/১১৬)[৫]

শাপগ্রস্থ মালাধরকে দেবী নির্দেশ দিয়েছে—

"দেবমানে মহীতলে থাক চারি মাস।
কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ॥" (ঐ/১৩৮)[৬]

'অষ্টমঙ্গলায়' কবি বলেছেন—

"এই ব্রত ইতিহাস শুনিলে কলুষনাশ
কলিযুগে হইল প্রচার॥" (ঐ/২৩৭)[৭]

খুল্লনা হল চণ্ডীর ব্রতদাসী; তাই পদ্মাবতী চণ্ডীকে বলে—

"ধনপতি নাম তার যুগল রমণী।
তোমার ব্রতের দাসী খুল্লনা বেণেনী॥" (ঐ/২০৪)

কখন চণ্ডীর ব্রত করতে হয় সে সম্পর্কে কবি উল্লেখ করেছেন—

"কলিকালে চন্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পুরে তার আশ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিব ক্ষত্রিগণ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি।" (ঐ/২৪৩)

মোক্ষলাভের বিষয়টি অবশ্য চৈতন্যযুগের দান। আবার মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলেও চণ্ডীব্রতের কথাই বলা হয়েছে। চণ্ডী নারদকে এমন পূজা প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছে যা প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হতে পারে, এবং মানিক দত্ত তিন'শ ষাটটি পদে ব্রতকথা সম্পূর্ণ করার কথা বলেছেন। কালকেতুর কাহিনীতে চার দিনের ব্রতকথা সমাপ্তি এবং ধনপতির কাহিনীতে অবশিষ্ট চার দিনের ব্রতকথা বর্ণনা করা হয়েছে—

"চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত হইল॥
চারিদিনের ব্রতকথা সমাপ্ত করিঞা।
বসিলা ভবানী দেবী চিন্তাযুক্ত হয়া॥" (মানিক/১৭০)

পূজা প্রচরের শেষে স্বর্গের নর্তকীকে দেবী আবার স্বর্গে ফিরিয়ে দিয়েছে, দেবী বলেছে—

"দুর্গা বলে চারিভক্ত লইয়াছিলাম আমি।
মর্থে ব্রত পূর্ণ হৈল নিত্তকী লেহ তুমি॥" (ঐ/৩৭২)

মানিক দত্তের কাব্যের শেষ অংশের নাম 'ব্রতকথা'। ব্রতকথা বলেই কবি শেষে বলেন—

"ব্রতকথা শুনি সভে করহ প্রনতি।
গাইল মানিক দত্ত মধুর ভারতী॥" (ঐ/৩৭৬)

দ্বিজ মাধব রচিত ' সারদামঙ্গল' কাব্যে একটি ছিন্ন অংশে আছে—

"সভার মঙ্গল ঘট ব্রতের স্বরূপা।
সকলি সম্পূর্ণ হয়ে জারে কর কৃপা॥"[৫৪]

চণ্ডীর ব্রত করলে কি ফললাভ হয় এবং ব্রতের অবহেলা করলে কি ফল হয় সে সম্পর্কে কোচবিহারের কবি দ্বিজ

মাধবচন্দ্র 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

"দেবী বোলে কারাগারে বন্ধন সহিত।
আছেন জনক তব হইয়া দুঃখিত॥
ব্রতনিন্দা অপরাধ করিছে আমার।
তার ফল ফলিয়াছে শুনহ কুমার॥
বাতরোগ পীড়িত কৃবেশ অতিশয়।
ধনজন হীন হয়া আছে এ সময়॥
অখন আমার এহি প্রসাদ পাইয়া।
সর্ব্বমতে শুভযুক্ত নিজ দেশে গিয়া॥
করিবে আমার ব্রত তোমার মন্দিরে।
তবে সে তাহার বাতরোগ যাবে দূরে॥
ধনধান্য যুক্ত হয়া নানা ভোগ করি।
রাজত্ব করিয়া অন্তে আপনার পুরী॥
পরিহরি যাবে সবে আমার ভবন।
আমার ব্রতের এহি বিচিত্র কথন॥
ইহাক সতত যে মানুষ পাঠ করে।
ভক্তি করি শুনে কিবা নারী আর নরে॥
বিশেষ মঙ্গলবারে করিয়া পূজন।
শুনিলে পড়িলে কথা করিলে স্মরণ॥
অভীষ্ট ফলদাতার সত্যে সত্যে আমি।
হইব সতত পুত্র জানিবেন তুমি॥"[৫৫]

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের উপকরণ হল আট গাছি দূর্বা ও আটটি তণ্ডুল বা ধান। চণ্ডীমঙ্গলে এই অষ্ট দূর্বা তণ্ডুলের কথা আছে। শ্রীমন্তের কল্যাণ কামনায় এই অষ্ট-দূর্বা তণ্ডুল তার শিরে পাগড়ীতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে—

"স্নান করি সদাগর উঠিলেন কূলে।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা তথা পাইল আঁচলে॥" (মুকুন্দ/২০০)[৮]

মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রতকথাটিকেই সম্প্রসারিত করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। ব্যাধ সমাজের দেবী, বনদেবী, পশু সমাজের রক্ষয়িত্রী চণ্ডীই বণিক খণ্ডে নারী পূজিতা ব্রতের দেবী।

ধর্মঠাকুর রাঢ়বঙ্গে ব্রাত্যদের দেবতা, যদিও সকল শ্রেণীর মানুষই এ পূজা করে থাকে। আমরা জানি 'ব্রাত্য' কথাটি এসেছে ব্রত থেকেই এবং ব্রতাচার পালন করে বলেই তারা ব্রাত্য। মানিকরাম গাঙ্গুলীও বলেছেন- "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান" (মানিক/২৩)। জানা যায় রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হলেও ধর্মপূজা করে পতিত বা ব্রাত্য হয়েছিলেন এবং ডোম সম্প্রদায়ের পুরোহিত হয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর এই ব্রাত্যদেরই দেবতা। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেন— "ধর্ম ব্রাত্যদের ঠাকুর। ব্রাত্যেরা সাবিত্রী-পতিত। তাদের উপাস্য এক ব্রাত্য, মহাদেব ঈশান। ব্রাত্যরা সর্বত্র পূজিত।— অভিজাতদের নিকট তারা নিন্দিত. কিন্তু গণধর্মের ধারক গোষ্ঠীপতি ও গণমণ্ডলীতে তারা অভিনন্দিত।"[৫৬] আর্য সংস্কৃতির বহির্ভূত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা সূর্য উপাসনা করে।ড ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন — সূর্য দেবতার অশ্বারোহী মূর্তি বৈদিক ও পারসিক ধারার মিশ্রণ।[৫৭] তাই ধর্মঠাকুরের পূজায় মাটির ঘোড়া প্রয়োজন হয়। বাংলার মেয়েরা রালদুর্গার ব্রত পালন করে। 'রাল' শব্দটি রাতুল

শব্দের অপভ্রংশ, রাতুল (অর্থাৎ সূর্য) থেকে রাউল > রাল। সে দুর্গা হলেও পুরুষ দেবতা। ব্রতকথায় সে কুষ্ঠরোগের দেবতা বলে উল্লেখ আছে। আবার ইতু ব্রতের সঙ্গেও ধর্মের ব্রতের সম্পর্ক আছে। 'ইতু' শব্দটি এসেছে 'আদিত্য' শব্দ থেকে। অগ্রহায়ণ মাসে ইতুর ব্রত পালিত হয়। এই ব্রতের দেবতার নাম 'করমঠাকুর'। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে করমঠাকুরই ধরমঠাকুরের অন্য নাম।[৫৮] ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্য উপাসনার ধারাটি মিশে গেছে। সুতরাং মনে করা যেতে পারে ধর্ম ব্রত সূর্য ব্রতের একটি প্রচলিত রূপ। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ধর্মের ব্রত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যে রঞ্জাবতীকে ধর্মের ব্রতদাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

"বাজে জোড়া শঙ্খ কাঁসি রঞ্জাবতী ব্রতদাসী
আভিলাষী লভিতে সন্তান॥" (ঘনরাম/৯১)

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ধর্ম ব্রতের কথা পাই। রঞ্জাবতী অন্যান্য বার-ব্রত পালন করার পরও পুত্রসন্তান লাভ করেনি, তাই সামুলার পরামর্শে ধর্মের ব্রত করে। সামুলা রঞ্জাবতীর কাছে ধর্ম ব্রতের মাহাত্ম্যকথা বলে—

"বার ব্রত বিস্তর করিলাম দেবার্চন।
কিছু না করিল সিদ্ধ কিসের কারণ॥
.. ..
সামুলা কহেন শুন তবে সবিশেষ।
প্রধান পুরুষ পূর্ণ প্রভু ধর্মরাজ।
সেবিলে তাহার পদ সিদ্ধ হয় কাজ॥
আর লভে চতুর্বর্গ অন্য ফল কতি।
নির্ধনী ধনাঢ্য হয় বন্ধ্যা পুত্রবতী।
অন্ধ কুষ্ঠ আদি করে ব্যাধি উপচয়॥
সকল ঘুচয়ে ধর্ম হইলে সদয়॥" (মানিকরাম/৪৯-৫০)

পুত্র কামনায় ধর্ম ব্রত পালন করলে পুত্রসন্তান লাভ হয়, রোগমুক্তি কামনায় ব্রত করলে রোগমুক্তি ঘটে, বিশেষত কুষ্ঠ ব্যাধি নিরাময় হয়। রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা করে অর্থাৎ ধর্মব্রত করে পুত্র লাউসেন লাভ করে—

"চাঁপায়ে সেবিল ধর্ম শালে দিয়া ভর।
শুনি আনন্দিত সবে পাইল পুত্রবর॥"(ঘনরাম/১০৫)

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে দেখি সুরিক্ষার কাছে ধর্ম ব্রতের কথা বলেছে ও কৌশলে আত্মরক্ষার জন্য ব্রতের কিছু নিয়মকনুন বলেছে, যেমন—

"প্রবেশ করিলে পূর্ণ পঞ্চম বৎসরে।
বার বর্ণ সকলে ধর্মের ব্রত করে॥
ব্রতের নিয়ম শুন বচনের ফল।" (মানিকরাম/২৬৪)

রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে লাউসেন জামাতির বনিতাদের বলেছে সে ধর্মের উপাসক, এবং প্রতি শুক্রবার ধর্ম-একাদশী ব্রত পালন করে—

"কি করিব পানগুয়া চন্দন শীতল।
গৃহস্থ লোকের হাথে নাহি খাই জল॥
শিশু কাল হইতে আমি ধর্মের তপসী।

শুক্রবার দিনে করি ধর্ম একাদশী॥
শনিবারে নিয়ম ভাঙ্গিলে জল খাই।
ধর্মের সেবক আমি সুখ নাহি চাই॥" (রূপরাম/১৫৩)

মনে হয় রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্মপূজা বিধান ও সংযাত পদ্ধতি আসলে ধর্মের ব্রতবিধি যা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হত। ধর্মের গাজন আসলে শিবের গাজন, এবং উভয়ের আচার বিধি প্রায় একই রকম। রামাই পণ্ডিত ধর্মের ব্রতকে বিধিবদ্ধ করেন। তাছাড়াও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও ধর্মদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। রঞ্জাবতীর চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা বা শালেভর, লাউসেনের চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা ধর্মেরই কঠোর ব্রতাচার। ধর্মের ব্রতপালন করলে অসাধ্য সাধন করা যায়, লাউসেন ধর্ম ব্রত করে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয় ঘটায়। ব্রতের দেবতারা নারী হলেও ধর্ম ব্রতের দেবতা পুরুষদেবতা এবং এর স্রষ্টা পুরুষ, ব্রতের বিধানদাতাও পুরুষ। এসমস্ত তথ্যই প্রমাণ করে ধর্মের ব্রত অনেক পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছে, অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য রচনার পরে ধর্মব্রত প্রচারিত হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— বৈদিক একাদশী ব্রতের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজা বিষয়ে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীর সম্পর্ক আছে। ডঃ সেনের ভাষায়— "ধর্ম-ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজার বিষয়ে যে সবচেয়ে পুরানো গল্পটি পাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, তাহাতে একাদশী ব্রতের ছাপ পড়িয়াছে।"[২২] ঋক্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্ব কাহিনী আছে তর সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালার মিলই বেশী। আবার ধর্মের অনুষ্ঠানে বৈদিক শ্লোকের প্রভাবও লক্ষ করেছেন ডঃ সেন।[২৩] সুতরাং ধর্মঠাকুরের ব্রতের সঙ্গে বৈদিক আচারের সম্পর্ক আছে এবং পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র পালাটিই ধর্মের ব্রতকথায় পরিণত হয়েছে। ডঃ সেনের অনুসরণে বলা যায় লাউসেনের গল্পটি হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

যদুনাথের হরিশ্চন্দ্র কাহিনী আসলে ব্রতকথা। ধর্মমঙ্গলে অপুত্রক রঞ্জাবতীকে সামুলা হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনী শুনিয়েছে এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের কথা শুনে রঞ্জাবতী চাঁপাইয়ে শালেভর দিয়ে পুত্রলাভ করেছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর দু'টি ভাগ—হরিশ্চন্দ্রের পালা ও লাউসেনের কাহিনী। আসলে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীই ধর্মের ব্রতকথা। হরিশচন্দ্র ও লাউসেনের উভয় কাহিনী সমান্তরাল ভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে, কিন্তু হরিশচন্দ্র কাহিনী কাব্যে সামান্য অংশ হলেও মূল কাহিনী লাউসেনের কাহিনী। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পল্লবিত হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য গড়ে না উঠলেও, মূল ভাবটিকে নিয়ে লাউসেনের কাহিনী গড়ে উঠেছে ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ব্রতকথার উপর ভিত্তি করেই ধর্মমঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছে।হরিশ্চন্দ্রের পালাতে ব্রতকথার সংক্ষিপ্ততা ও স্বল্প চরিত্রের উপস্থিতি আছে, তাছাড়া লাউসেন কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। আর এর সঙ্গে কিছু কিছু রূপকথার কাহিনী যুক্ত হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী তৈরী হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র কাহিনী ও লাউসেন কাহিনীর লক্ষ্য কিন্তু এক।

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য প্রকৃতপক্ষে ব্রতকথারই রূপান্তর। শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই শিব সম্পর্কিত গীত ও শিবচতুর্দশী ব্রত প্রচলিত ছিল। বাংলা মহাভারত ও ধর্মমঙ্গল কাব্যে শিবচতুর্দশী ব্রতের কথা ও ব্রতের মাহাত্ম্যকথা পাই। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—

"শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী শঙ্করের পূজা॥
এই ব্রত অসুর অমর নরলোকে।
ভবিষ্য পুরাণ কথা শুনি কবিমুখে॥
পার্ব্বতী প্রকাশ কৈল্য উদ্ধারিতে জীব।
এই ব্রতে সর্ব্বথা সদয় সদাশিব॥
তিথির মহিম্যা কিছু নিবেদন করি।
ঘুণাক্ষর ন্যায় ব্রতে ব্যাধ গেলা তরি॥" (ঘনরাম/২১৮)

এরপর শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের ব্যাধ কাহিনীর প্রসঙ্গ অর্থাৎ ব্রতকথা বলা হয়েছে। শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করে দু'রকমের ব্রত প্রচলিত ছিল — শিব ব্রত ও শিবচতুর্দশী ব্রত। শিব ব্রত বা শিবঠাকুরের ব্রত বৈশাখ মাসে পালিত হয়। শিবায়ন কাব্য এবং শিবচতুর্দশী ব্রতকাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। আসলে শিব সম্পর্কিত কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র ধারা থেকেই শিবচতুর্দশীর ব্রতের কাহিনী এসেছে। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে কিন্তু শিবচতুর্দশী ব্রত কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে শিবচতুর্দ্দশী ব্রত মাহাত্ম্যকথা বলেছেন। তিনি 'শিবরাত্রি বিধি' অংশে লিখেছেন—

"শঙ্কর সন্তোষ হয়্যা শঙ্করীকে কন।
বিধুমুখী শুন ব্রতরাজ বিলক্ষণ॥
ফাল্গুনে যে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণপক্ষে হয়।
তাহার যে রাত্রি তাকে শিবরাত্রি কয়॥
....
সপ্ত দ্বীপেশ্বর হয়্যা হয় কামাচারী।
তিথির মাহাত্ম্য শুন ত্রিপুর-সুন্দরী॥" (রামেশ্বর/২০০-২০১)

অতঃপর শিবচতুর্দশী ব্রতকাহিনী অর্থাৎ ব্যাধের শিবচতুর্দশী ব্রতের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শিবচতুর্দশীর ব্রতের কাহিনী হল 'মৃগলুব্ধ কাহিনী'। রাজা মুচকুন্দ শিবচতুর্দশীর ব্রত উপলক্ষে ব্যাধের শিবচতুর্দশী ব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী শুনে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিল। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে শিবকাহিনী থাকলেও তার রচনাকাল শৈবধর্মের বিভগ্নতার যুগ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শৈবধর্ম পুনরায় নতুন করে বিকশিত হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। লৌকিক শিবকাহিনী ও মৃগলুব্ধ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই, মৃগলুব্ধ কাহিনীর শিবঠাকুর লৌকিক শিব নয়; শিবপুরাণগুলিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা পৌরাণিক শিবকাহিনী অবলম্বনে মৃগলুব্ধ কাহিনী তৈরী হয়েছিল যা ব্রতকথার মত সংক্ষিপ্ত এবং স্বল্প কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। মনে হয় এটিই শিব সম্পর্কিত প্রকৃত কাহিনী। কালক্রমে ধর্ম সমন্বয়ের যুগে লৌকিক শিবের সঙ্গে পৌরাণিক শিব এক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং লৌকিক শিব কাহিনীর সঙ্গে ব্রতকথার কাহিনী স্থান লাভ করেছে। রামরাজা ও রতিদেব মঙ্গলকাব্যের আদলে মৃগলুব্ধ কাহিনী ভিত্তি করে শিবমঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন।

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়াও প্রচুর অপ্রধান মঙ্গলকাব্য আছে, লক্ষ্মীমঙ্গল বা কমলামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, কপিলামঙ্গল, কালিকামঙ্গল ইত্যাদি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কালিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল প্রধান। অন্নপূর্ণা পৌরাণিক দেবী হলেও ব্রতের দেবী। অন্নপূর্ণা অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভারতচন্দ্র অবশ্য ব্রতকথা নির্ভর করে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেননি। অন্নদামঙ্গলের কাহিনী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব পরিকল্পনা। অন্নপূর্ণার ব্রত জনসমাজে প্রচলিত ছিল, ভারতচন্দ্র কাব্যে অন্নপূর্ণার ব্রতের কথা উল্লেখ করেছেন একবার বসুন্ধরের মুখে এবং আরেকবার ছদ্মবেশী দেবী অন্নপূর্ণার মুখে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়　　ইথে রতি যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।" (ভারতচন্দ্র/১৩৫)

কিংবা,

"এই যে অষ্টমী　　পুণ্যদা এ তমী।
অন্নদার ব্রততিথি।" (ঐ/১৫১)

ব্রতের প্রধান কামনাই হল পার্থিব। তাই অন্যান্য ব্রতের মতই অন্নদার ব্রত পালন করলে অন্নহীনের অন্ন হয়, দরিদ্রের ধন সম্পদ ও সুখ সমৃদ্ধি হয়, তাই অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে জানায় অন্নদার ব্রত পালন করলে মাটি মুঠা

ধরলে সোনা মুঠা হবে, শূন্য হাঁড়ি ভরে অন্ন-ব্যঞ্জন হবে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥"(ঐ/১৪৪)

দেবীর কৃপায় কাঠের সেঁউতি ম্যাজিকের মত 'অষ্টাপদ'-এ (সোনা) পরিণত হয়। অন্নদামঙ্গলের মূল ভাবটি যে ব্রতের মত, ঈশ্বরী পাটনীর কামনাতেই তার প্রকাশ। অন্নদামঙ্গলে ব্যাসকাহিনী ও হরিহোড়ের কাহিনী দু'টি স্বতন্ত্র কাহিনী অংশ। ব্যাসকাহিনী ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনা আর হরিহোড়ের কাহিনী ব্রতকথার মত সংক্ষিপ্ত। যদিও এখানে চরিত্র সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়, তবুও হরিহোড়ের কাহিনীকে অন্নদার ব্রতকথা ধরা যেতে পারে। আবার অন্নদার 'এয়োজাত' অংশটি ব্রতাচার ভিন্ন কিছু নয়। বাঙালী মেয়েরা দলবদ্ধভাবে কখনো কখনো ব্রতপালন করে থাকে, অন্নদার এয়োজাত অংশে এই ছবিই পাওয়া যায় । কালিকামঙ্গল অবশ্য চরিত্রধর্মে মঙ্গলকাব্য বা ব্রতকথা নয়। কালিকাদেবীর ভূমিকা এখানে গৌণ। আসলে সপ্তদশ শতকে যে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ধারা গড়ে উঠেছিল কালিকামঙ্গলও তাই। দেবী কালিকার নামে বিদ্যাসুন্দরের অবৈধ প্রেম কাহিনীকে পরিশুদ্ধি ঘটানো হয়েছে মাত্র। তাই কাব্যটি কালিকামঙ্গল অপেক্ষা বিদ্যাসুন্দর নামেই পরিচিত। অন্যান্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি আসলে ব্রতকথা মাত্র, যেমন ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যটি। ষষ্ঠী ব্রতের দেবী; সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠী ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। বারোমেসে ষষ্ঠী ছাড়াও জ্যৈষ্ঠ মাসে ও পৌষ মাসে ষাঁড়াষষ্ঠী এবং চৈত্র মাসে অশোকষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লোটনষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে মন্থনষষ্ঠীর ব্রত পালিত হয়। সবগুলিই সন্তান কামনায় ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় পালিত হয়।আবার বাঙালী সমাজে সন্তানের জন্মের ছয় দিনে ছয়-ষষ্ঠী পূজা করার রীতি আছে। ধারণা করা হয় ঐ দিন নবজাতকের বা নবজাতিকার ভাগ্যলিপি লেখা হয়, তাই আঁতুরঘরে মসীপত্র রাখা হয়। মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলকাব্যে ষষ্ঠী ব্রত পালনের কথা আছে। কৃষ্ণরামের ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের গেরস্থ-বৌ আর মা ষষ্ঠীর বাহন কালো বিড়ালীর কাহিনী অবলম্বনে। কৃষ্ণরাম ব্রতকথার ষষ্ঠী কাহিনীকে পাঁচালীর রূপ দিয়েছেন মাত্র। কাব্যে ষষ্ঠী ব্রতের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"সোমবারে ষষ্ঠী তিথি যেই মাসে মাসে।
সেদিন কেবল পূজা হবে স্বর্গ বাসে॥
পৃথিবী পাতালে পূজা নবে সেইদিন।
কেহ যদি করে পূজা হবে পুত্রহীন॥
যেই মাসে শনিবারে ষষ্ঠী তিথি হবে।
কেবল পাতালে পূজা অন্য ঠাঁই নবে॥
রবি শুক্র পূজ পূজ বুধবার বৃহস্পতি।
পৃথিবীতে পূজিবে যতেক পুত্রবতী॥" (কৃষ্ণরাম/১৬২)

ষষ্ঠী ব্রতের ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"দুর্গা নামে ষষ্ঠী পূজি আশ্বিনে আনন্দ।
যেই বর মাগে পায় তার নাই সন্দ॥
কার্ত্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী পূজে বর বর জুড়ি।
শ্মশান হইতে পুত্র আইসে বাহুড়ি॥
বার মাসে বার ষষ্ঠী যেবা নারী করে।
রোগশোক দুঃখ কভূ নহে তার ঘরে॥" (ঐ/১৬১)

অনুরূপভাবে লক্ষ্মীমঙ্গল বা কমলামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কপিলামঙ্গল ব্রতকথারই রূপান্তর মাত্র। বাঙালী সমাজে গো-দেবতা পূজ্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে গো-দেবতা কপিলার কাহিনী বিশেষ স্থান লাভ করেছে। তাই দেখা যায় পরবর্তীকালে গো- দেবতা কপিলা অবলম্বনে কপিলামঙ্গল কাব্য গড়ে উঠেছে। বাঙালী সমাজে নারীরা গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় ও তার আশীর্বাদ লাভের জন্য বৈশাখ মাসে গো-কল ব্রত পালন করে থাকে। কপিলামঙ্গল গো-কল ব্রতেরই রূপান্তর।কপিলা মঙ্গলে বলা হয়েছে—

"কপিলামঙ্গল কথা শুন ইতিহাস।
যুনিলে সংসারের পাপ হইব বিনাশ॥
. .. .
সংসারের মধ্যে ভাই পুজিবে গোধন।
জার সেবা আপনি করিলা নারাঅন॥"[৬১]

অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি ব্রতকথা ও পাঁচালীর ক্ষেত্র কাটিয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম শ্রেণীর কবি প্রতিভার অভাবে অনেক পরবর্তীকালে উদ্ভূত অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি শেষ পর্যন্ত ব্রতকথা ও পাঁচালীর আকারে আজও রয়ে গেছে।

লোকসমাজে প্রচলিত ব্রতকথার দেবীরাই ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের পারিবারিক অন্তঃপুরে জায়গা করে নেয়; উচ্চবর্ণের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের পথটি কিন্তু খুব একটা মসৃণ ছিল না। দেবী মনসা কিভাবে বণিক সমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল? মনসামঙ্গলে দেখা যাচ্ছে মনসা জালু-মালুর জননীকে ধন দিয়ে বশীভূত করে পূজা আদায় করল। চাঁদ সদাগরের ঘরণী সনকা সখী পরিবেষ্টিত হয়ে স্নানে যাওয়ার সময় হঠাৎ জালু-মালুর ঘরে সম্পদ বৃদ্ধিতে বিস্মিত হয়। বিপ্রদাসের কাব্যে সনকা জাল-মালু জননীকে বলেছে—

"সনকা বলেন শুন জালুর জননী
কেমন দেবতা পূজা করিস আপনি।
অদ্য অন্নশূন্য তুমি ছিলা এই স্থান
এতেক বিভব হৈল কহ ত কারণ।" (বিপ্রদাস/৮৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও অনুরূপ প্রসঙ্গ দেখতে পাই। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসা স্বপ্নে শুলুকাকে নির্দেশ দিয়েছে–

"স্বপ্নে আসি বলে শুলকারে।
যখন যে বর চাবে তখন তাহাই পাবে,
ঘট গিয়া আন পূজিবারে॥" (বংশীদাস/৭১)

দেবী মহিমার কথা শুনে সনকা মুগ্ধ হয়। সম্পদের প্রলোভনে তার ভক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সনকা নিছনির কাছ থেকে দেবী পূজার পদ্ধতি শিখে মনসার ঘটবারি মাথায় নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। জালু-জননীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনসার ঘট দিতে হয়, কারণ সনকা রাজরানী-

"নিছনি শুনিয়া বাণী মহাদুঃখ মনে গণি
রাজরানী কি করিতে পারি।'(বিপ্রদাস/৮৮)

ক্ষেমানন্দের বিবরণ অনুযায়ী সনকা দেবীর ঐশ্বর্য ও মহিমার কথা শুনে ছয় পুত্রের কল্যাণের কথা ভেবে জালু-জননীর নির্দেশ অনুসারে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে জালুমালুর ঘরেই মনসাকে প্রণিপাত করে-

"স্নান করি গেল ত্বরা নিছনির ঘরে।
গলায় বসন দিয়া প্রণিপাত করে॥"(ক্ষেমানন্দ/১৪৮)

বংশীদাসের কাব্যে শুলুকা জালু-মালুকে সম্পদ দিয়ে মনসার ঘট নিজ গৃহে নিয়ে আসে। বংশীদাসের বর্ণনায় —

"শত পণ সুবর্ণ ঝালো লইল জোখিয়া।

ঘটবারি লইল শুনাই মস্তকে তুলিয়া॥

.. ..

ঝালো মালো শুনি তাহা ঘরেতে চলিল।

ঘটবারি লইয়া শুনাই পুরে প্রবেশিল॥" (বংশীদাস/৭২)

বিপ্রদাসও অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন—

"যত্নে লইল সুন্দরী হাতে কাথে দুই বারি

নিজপুরে গেলা রাজরানী॥" (বিপ্রদাস/৮৮)

আর চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা দেবকন্যাদের কাছে দেবী পূজার কৌশল আয়ত্ব করে পূজা করে নিজ গৃহে। এই ঘটনার সঙ্গে মনসামঙ্গলে রাখালগণের মনসা পূজার মিল আছে। মনে করা যায় অপৌরাণিক দেবদেবীগণের মধ্যে মনসাই আগে অভিজাত অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, তাই তার পক্ষে চাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ এত কঠিন। পরবর্তীকালে দেবী চণ্ডীর পক্ষে এই প্রবেশ অনেক সহজ হয়েছে। বোধহয় শেষ পর্যন্ত ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার পরিবর্তন এবং বিভিন্ন দেবতার অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে অন্য দেবদেবীর অনুপ্রবেশ অনেক সহজেই হয়েছিল।

মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পশ্চাদ্‌পটে শুধুমাত্র ব্রতকথাই নয়, পুরাণ-ইতিহাস-রূপকথা-লৌকিক ধর্ম ও লোকসাহিত্যের সম্পর্ক আছে, এসম্পর্কে দু'-এক কথা বলা যেতে পারে। পুরাণগুলির উপর নির্ভর করেই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু উভয় সাহিত্য শাখার মধ্যে মিল যেমন আছে পার্থক্যও তেমনি বিস্তর। মঙ্গলকাব্য ও পুরাণ উভয়ই আখ্যায়িকামূলক রচনা এবং উভয়ই দেবকথামূলক রচনা, কিন্তু দেখা যায় পুরাণের দেবতরা গোলোকবিহারী দেবতা, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা অসীম। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট, মঙ্গলকাব্যের নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা, কিন্তু ধূলিমাটির স্পর্শে মলিন। তাদের অলৌকিক ক্ষমতা থাকলেও তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, তাই দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই দেবতা মানুষের কাছে ভীত হয়েছে। চাঁদের 'হিন্তাল' লাঠিকে মনসার ভয়, তাই মনসা বলেছে—

"যদি মোর পূজা সে করিবে চাঁদবাণ্যা।

হিন্তালের বাড়িগাছি আগে পেল টান্যা॥

এত শুনি চাঁদবাণ্যার উপজিল হাস।

হিন্তালের বাড়ি আর না কর তরাস॥

.. ..

বেহুলা বিনয় বলে আপন শ্বশুরে।

হিন্তালের বাড়িগাছি টান্যা পেল দূরে॥

শুনিঞা বধূর বোল চাঁদ সদাগর।

হিন্তালের বাড়ি টান্যা পেলে দূরান্তর॥" (ক্ষেমানন্দ/২৯১)

পুরাণের দেবতারা ত্রিভুবন বিজয়ী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তাদের একাধিপত্য; মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সেখানে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ। মানুষের স্বীকৃতি না পেলে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পুরাণের দেবতারা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আপন পরাক্রম প্রদর্শন করেছে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সেখানে হীনতা, ক্ষুদ্রতা ও নিম্নতার পরিচয় দিয়েছে। এদিক থেকে পুরাণের দেবতা অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যের দেবতারা অনেক মানবিক, মানবিক মহিমার জয় ঘোষণাই মঙ্গলকাব্যের মূল লক্ষ্য। পুরাণ অপেক্ষা মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক বেশী বাস্তব জীবনাশ্রয়ী। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে আবার দেবখণ্ড ও নরখণ্ড বিভাজন আছে, দেবখণ্ডে পৌরাণিক দেবতার কাহিনী আছে, নরখণ্ডে লৌকিক দেবতার কাহিনী বর্ণিত। পুরাণের গঠন অনেক ঘনপিনদ্ধ, আর সেখানে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিক অনেক

শিথিল। মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা ছক থাকলেও কবিরা অনেকক্ষেত্রেই সামান্য নতুনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন তাদের যুগগত প্রবণতা অনুযায়ী; তাই মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি জাতীয় জীবন ও জাতীয় চরিত্রের অনুসারী হয়ে উঠেছে। যুগগত প্রবণতা অনুযায়ী সমকালীন জীবনকে রূপায়ণের চেষ্টা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেখা যায়। পক্ষান্তরে পুরাণগুলি একাধারে তত্ত্ব ও দর্শনশাস্ত্র, বাস্তব জীবনের দাবীকে পুরাণকারগণ রক্ষা করেননি। পৌরাণিক দেবমহিমা জনমানসের অন্তঃস্থলে প্রোথিত ছিল বলেই লৌকিক দেবতারা সমাজ বিবর্তনের ধারায় উপরের স্তরে উঠে আসতে শুরু করলেও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ভয়ে বা ভক্তিতে যে কারণেই হোক সাধারণ মানুষ দেবতাকে স্বীকৃতি দিলেও উচ্চতর আদর্শের অভাব দেবচরিত্রকে ভক্তির সিংহাসনে বসায়নি। মূলত অরণ্য বা বৃক্ষতলেই তাদের অধিষ্ঠান হয়, তবে ধীরে ধীরে পৌরাণিক আদর্শের প্রলেপ লাগিয়ে খানিকটা আদর্শায়িত দেব পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছিল। পুরাণের সূত্র ধরেই একদা কেবল মাত্র পৌরাণিক দেবভাবনা নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য হলেও কিন্তু লৌকিক মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যোগ ছিল, কিন্তু পৌরাণিক দেবভাবনা যুক্ত মঙ্গলকাব্যগুলি সেই স্থান পায়নি। মঙ্গলকাব্যের মতই একই সামাজিক ভাবধারার সূত্র বহন করে মঙ্গলকাব্যের মত অনুবাদ সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সংস্কৃত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত হলেও লোকজীবনের বহু উপাদান তাতে প্রবেশ করেছে। বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের আদর্শের দ্বারা যেমন মঙ্গলকাব্যগুলি প্রভাবিত হয়েছিল তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যও মঙ্গলকাব্যগুলির নিকট ঋণ গ্রহণ করেছে অর্থাৎ দ'টি ধারা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাই দেখা যায় মঙ্গলকাব্যগুলির ভিতরে বহু পৌরাণিক কাহিনী অনুবাদের মাধ্যমে প্রবেশ করেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবখণ্ড পুরাণের আদর্শেই গড়ে তোলা হয়েছে, আর নরখণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরাণিক উপাদানের ব্যবহার হয়েছে, যেমন হনুমান প্রসঙ্গটি রামায়ণ ও মহাভারত থেকেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যে প্রবেশ করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যটি এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত। সর্বোপরি পৌরাণিক আদর্শ ও ভাবধারা অনেকাংশে মঙ্গলকাব্যগুলিকে প্রভাবিত করেছে। আবার মঙ্গলকাব্যের কাহিনীও অনেকক্ষেত্রে বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতে প্রবেশ করে গেছে। যেমন বাংলা মহাভারতের দাতাকর্ণের কাহিনী ধর্মমঙ্গল থেকেই সামান্য রূপান্তরিত হয়ে প্রবেশ করেছে। আবার মনসামঙ্গলের সঙ্কর গাড়রীর কাহিনী থেকে লৌকিক রামায়ণের রাবণের মৃত্যুবাণ সংগ্রহের কাহিনী গৃহীত হয়েছে। কাজেই মঙ্গলকাব্য গড়ে ওঠার পিছনে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পটে দূরাগত ইতিহাসের পদধ্বনি শোনা যেতে পারে, যেমন চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ থেকে প্রাচীনকালের বাঙালীর বহির্বাণিজ্যে ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রা ও চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতির রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা রাজার নির্দেশে বাণিজ্যযাত্রার কথা পাই ভিন্নতর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক সমাজের প্রাধান্যের কথা লক্ষ করা যাচ্ছে, পণ্ডিতদের মতে পাল যুগে বাংলার সমাজ জীবনে বণিকদের একচ্ছত্রতার কথাই এতে স্থান পেয়েছে, তবে তার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে বহু যুগের ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান। আবার হাসন-হোসেন পালার মত ঐতিহাসিক তথ্য এক যুগের বিষয় না হলেও মনসামঙ্গলে এমনভাবে স্থান করেছে যা আলাদা করে দেখা কঠিন। ধর্মমঙ্গলে বণিক সমাজের কথা নেই, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যে সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল তখন সমাজ জীবন থেকে বণিক সমাজের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। এখানে লাউসেনের বীরত্ব অনেকের মতে পাল রাজাগণের শৌর্য ও বীর্যের পরিচায়ক। ডোম সৈন্যগণের বীরত্বগাথা, কালু ডোমের দেশত্যাগে রাজার অনুমতি গ্রহণ, ডোমদের বৃত্তি পরিত্যাগ প্রবণতার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন ঐতিহাসিক ঘটনার ছোঁয়ায় রচিত। তছাড়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে কবিগণের আত্মবিবরণীতে তৎকালীন যুগ পরিস্থিতি বর্ণিত।শাসকের অত্যাচার, প্রজার দুর্দশা, ধর্মকলহ, মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধে

বৈষ্ণব জ্বরের জয়লাভ ও মহেশ্বর জ্বরের পরাজয় ধর্মগত ক্ষেত্রে কিছু কিছু অন্তর্নিহিত সত্য নির্দেশ করেছে। বাঙালী সমাজের গঠনগত যে বিবরণ কবিরা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে দিয়েছেন তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মগত বোধ হ্রাস পায় এবং দৈবভক্তির স্থলে যুগচেতনা, যুগরুচি ও মানবিকতার বিকাশ ঘটেছিল তার ছায়াপাত পড়েছে মঙ্গলকাব্যে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-"অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজের হৃদয় দৈবভক্তিহীন হইয়া পড়িবার ফলে সে যুগের মঙ্গলকাব্যের উপর যুগপ্রভাব পুনরায় কার্যকর হইয়া উঠিল—নিজের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মঙ্গলকাব্যগুলি চারিদিক হইতে যুগের উপকরণ দ্বারা নিজেদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল।"[৬২]

মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার মত মৌখিক সাহিত্য-ধারাকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়, মৌখিক সাহিত্যের লোককথা ও রূপকথার সঙ্গেও মঙ্গলকাব্যের যোগ আছে। রূপকথা- লোককথা-উপকথা থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করে মঙ্গলকাব্যগুলি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে।সাধারণত লোককথা, রূপকথা ও উপকথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে যে কাহিনী প্রকাশ করা হয় তাকে লোককথা বলা হয়; ইংরেজীতে যাকে Folk tale বলা হয় বাংলায় তাকে সাধারণভাবে 'কথা' বলেও চিহ্নিত করা হয়। রূপকথা এবং উপকথা লোককথারই অন্তর্গত বিষয়, বস্তুত রূপকথাগুলি লোককথাগুলির মধ্যে আকারে দৈর্ঘ্যে সব চাইতে দীর্ঘতম রচনা; তাছাড়া উহাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। অপরদিকে উপকথাগুলি পশুপাখির চরিত্র কেন্দ্রিক। পশুপাখির আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে যে সকল নীতিকথামূলক কাহিনী রচিত হয় তাকে উপকথা বা Fable বলা হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোককথার এই সমস্ত উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল থেকে ধর্মমঙ্গল পর্যন্ত কাব্যগুলিতে বিভিন্নভাবে ঐ সমস্ত উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন মনসামঙ্গলে অযোনিসম্ভূতা মনসার জন্মকথা অতিলৌকিক জন্ম প্রসঙ্গ; লোককথার দেবদেবীর জন্ম হয়ে থাকে অলৌকিক উপায়ে। মনসামঙ্গলে দেখা যায় স্বাভাবিক ভাবে মনসার জন্ম হয়নি। বিজয় গুপ্ত অযোনিসম্ভবা কন্যা মনসার জন্ম প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"পুষ্পবনে শিবকন্যা আছে একেশ্বরী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পরম সুন্দরী।" (বিজয়/২০)

আবার নেতার জন্ম শিবের ঘাম থেকে, বংশীদাস লিখেছেন—

"প্রচণ্ড রবির তাপে নিকলিল ঘাম॥
ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়ে পদতলে।
মুছিয়া তুলিল শিব নেতের আঁচলে॥
নেত নিঙ্গাড়িয়া ঘর্ম্ম ফেলিল ভূমিতে।
কামরূপা কন্যা গোটা হইল আচম্বিতে॥" (বংশীদাস/৪৫)

রূপকথার মতই মনসামঙ্গলে দেখা যায় কনিষ্ঠার অসাধ্য সাধনের কাহিনী। মনসামঙ্গলে কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলার অসাধ্য সাধনের কথা আছে, চণ্ডীমঙ্গলে কনিষ্ঠা বধূ খুল্লনার অসাধ্য সাধনের কথা আছে, ধর্মমঙ্গলে কর্ণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র লাউসেনের অসাধ্য সাধনের কথা আছে। তাছাড়া মনসামঙ্গলে মৃতের পুনর্জীবন লাভের কাহিনী, চণ্ডীমঙ্গলে কমলেকামিনীর কথা, ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতীর পুনর্জীবন লাভের কথা, লাউসেনের দ্বারা সূর্যের পশ্চিমোদয়ের কাহিনী, লাউসেনের লৌহগণ্ডার ছেদনের কাহিনী রূপকথার কাহিনী । তাছাড়াও মনসামঙ্গলে সঙ্কর গাড়রী ও চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান লাভের কাহিনী, চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণের বৃত্তান্ত, সঙ্কর গাড়রীর মৃত্যু রহস্য, মৃতব্যক্তির আত্মার ভ্রমর-ভ্রমরী রূপ ধারণের কাহিনী, দেবদেবীদের জড়তীবেশ ধারণের কাহিনী রূপকথার কাহিনী। আবার বিভিন্ন উপকথায় পশুপাখির আচার-আচরণ মানুষের আচার-আচরণের মত হয়, তারা মানুষের মত কথাও বলতে পারে, যেমন মনসামঙ্গলে শ্বেতকাক কিংবা শ্বেতমাছির কাহিনী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাটুয়া কুকুর, কামদল বাঘ বা

আণ্ডীরপাথর অশ্বের প্রসঙ্গ কিংবা চণ্ডীমঙ্গলে শুক-শারীর প্রসঙ্গ রূপকথা ও উপকথার কাহিনী। তাছাড়া একটি জাতির মানসিক গঠন, তার আদর্শবোধ লোকসাহিত্যে দেখা যায়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী সতী নারীর অভিশাপে ভিনদেশী অসৎ বণিকের বাণিজ্যতরী চড়ায় আটকে যায়। বেহুলাও দেবলোকে যাত্রাকালে ধনা-মনা, গোদা, টেটন, জুয়ারির পাপাচারকে ব্যর্থ করে সিদ্ধির পথে এগিয়ে যায়, লোহার কলাই সেদ্ধ করে অসাধ্য সাধন করে। সতী নারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করতে পারে না, সাপে কামড়ায় না, কাটারিতে কাটে না, এমন কি ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল আনা সম্ভব হয়, তাই ঐ সমস্ত প্রসঙ্গগুলি বেহুলা কিংবা খুল্লনার সতীত্বের বিভিন্ন পরীক্ষায় বর্ণিত হয়েছে। ধর্মমঙ্গলে নটী সুরিক্ষার অসাধ্য সাধনের কাহিনী বর্ণিত। লাউসেন প্রদত্ত শর্তানুযায়ী—

"মিনি চাষের ধান্যার আতব চালি নিবে।
ভেরান্ডার ঢেঁকিতে সে ধান্য ভানিবে॥
....
আও হাঁড়ি সরা আন সুরীক্ষা সুন্দরী।
চালনি করিয়া আন তারাদীঘির বারি॥
রন্ধনের কাষ্ঠ হব পানির শিয়ালা।
আমার সাক্ষাতে রান্ধ না করিহ হেলা॥" (রূপরাম/১৭৩)

ঘনরামের কাব্যেও লাউসেন সুরিক্ষাকে অনুরূপ শর্ত দেয়—

"রন্ধনে ইন্ধন চাই জলের শেয়ালা॥
সুখান বালির চুলা নূতন নির্ম্মাণ।
উদুখল এড়ণ্ডে ভাজিবে উড়ি ধান॥
কাঁচা কুম্ভ কেবল কুমার চাকে লবে।
তারা দীঘি গমনে দাড়ুকা পায়ে দেবে॥
সাতখানি পরে কানি ঝাঁট আন জল।
পার কি না পার মোর বসে নাই ফল॥
রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।
রাত্রি মধ্যে রান্ধিলে অতিথি তোর বাড়ী॥" (ঘনরাম/২৯৪)

সুরিক্ষা দেবীর কৃপায় এ সমস্ত অসাধ্য সাধন করেছিল। ব্রতকথার মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে এসমস্ত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান মঙ্গলকাব্যের প্রেরণামূলকে সমৃদ্ধ করেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব মূলে বাংলার লৌকিকধর্ম বা লোকধর্মের প্রভাবও বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। একথা সুবিদিত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ লৌকিক দেবদেবী, লোকসমাজের অভ্যন্তর থেকেই তাদের উদ্ভব। যেমন লৌকিক দেবদেবীর উপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপের চেষ্টা করা হয়েছিল তেমনি লৌকিক সমাজে প্রচলিত লোকধর্মের উপর পৌরাণিকত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণ লোকদেবতা ও লোকধর্মের সঙ্গে পৌরাণিক দেবতা ও পৌরাণিক ধর্মের পার্থক্য অনেক। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময়ে পৌরাণিক ভাবাদর্শ প্রচার করার প্রয়োজনে লৌকিক দেবদেবীকে নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে পুরাণের শিব ও লৌকিক কৃষিজীবী সমাজের দেবতা শ্মশানচারী শিবের মধ্যে একটা ভারসাম্য গড়ে তোলা হয় এবং সে সঙ্গে অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীদেরও কোন না কোন ভাবে শিবের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। এভাবে বাংলার নাথধর্মে যে যে লোকদেবতার আদর্শ ছিল তাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও

মঙ্গলকাব্যের দেবাদর্শের সঙ্গে এক হয়ে যেতে থাকল। ফলে লোকসমাজে এই মিশ্রিত দেবমূর্তিই প্রতিষ্ঠিত হল, এক্ষেত্রে অবশ্য সর্বাগ্রগণ্য শিবঠাকুর। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড অভিঘাতে শৈব আদর্শ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি দেখা গেল মঙ্গলকাব্যের আভ্যন্তরীণ ধর্মাদর্শে। কেননা তখন হিন্দুসমাজ আশ্রিত তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রধান দেবাদিদেব মহাদেবের নিষ্ক্রিয় ভাববিলাসী মূর্তি লোকসমাজের আকাঙ্ক্ষা প্রতিপূরণ করতে সমর্থ হল না, তখন নতুন দেবাদর্শের প্রয়োজনেই লৌকিক স্তরে নারী দেবতা তথা শক্তিদেবীর কল্পনা করা হল। সেই সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় সাংসারিক জীবনে পুরুষের সর্বস্তরের ব্যর্থতায় নারীর খানিকটা উত্থান ঘটল; অন্তঃপুরচারিণী নারী গৃহাভ্যন্তরেই প্রচলিত প্রথাকে আঁকড়ে ধরে নতুন দেবদেবীকে অভ্যর্থনা জানায় আর পুরুষ তার রক্ষণশীল আধিপত্যকে বজায় রাখার জন্য অসহায় নারীকে বারবার লাঞ্ছিত করে। মনসামঙ্গলে তাই মনসাপূজা করার ফলে সনকাকে চাঁদ সদাগর লাঞ্ছিত করে, মনসার ঘটবারি ভেঙে পদাঘাত করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, এমন কি সনকার মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীকেও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়।আর ধর্মদেব পুরুষ দেবতা হওয়ায় তাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি, ধর্মদেব অলক্ষে থেকে হনুমানের সাহায্যে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; বরঞ্চ ধর্মমঙ্গলে প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ধর্মদেবের সঙ্গে চণ্ডীর বিরোধই চোখে পড়ে। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিশেষ ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত লৌকিক দেবতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল ফলে সমাজের অভ্যন্তরে নারী দেবতার অনুপ্রবেশ ঘটে। শুধুমাত্র নারী দেবতা পুরুষ শক্তিরই বিষ নজরে পড়েনি, পক্ষান্তরে নারী দেবতা সৃষ্টিতে তথা নারীর শক্তির উত্থানকে নারীও ভাল চোখে দেখেনি। মনসামঙ্গলে চণ্ডী মনসার বিরোধিতা করে এবং চণ্ডীমঙ্গলে লহনা চণ্ডীর বিরোধিতা করে। এরপর ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিছু পর থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার পুনরুত্থান ঘটতে থাকলে দেব চরিত্রগুলি আবার পৌরাণিক ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে ফলে এ সময়ে কিছু কিছু পৌরাণিক দেবমঙ্গল রচিত হতে থাকে।এক্ষেত্রে অন্যতম রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্য।

বাংলার লৌকিক ধর্মেরক্ষেত্রে অন্যতম বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবধর্মের কমনীয়তা ও প্রেমধর্ম মঙ্গলকাব্যের ভাবাদর্শকে স্পর্শ করেছিল তাই লৌকিক দেবদেবীরা আর তাদের দানবীয় উগ্রতা ও মেজাজকে বেশী দিন ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। চৈতন্য-পরবর্তীকালের লৌকিক দেবীরা যেমন কোমল মাতৃমূর্তি সম্পন্ন তেমনি শৈবপন্থী পুরুষও তাদের পৌরুষ ও উগ্রতাকে রক্ষা করতে পারেনি।বস্তুত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে দিয়েই পুরুষ নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে ফলে নৃমুণ্ডমালিনী শক্তিদেবী যেমন রামপ্রসাদের শ্যামা জননীতে পরিণত হয়, তেমনি অন্যক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যেও প্রধান দেবতা হিসাবে পুরুষ দেবতার অনুপ্রবেশ ঘটে। এভাবেই চৈতন্য-পরবর্তীকালে, বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।মঙ্গলকাব্যের বাইরের সমাজের অভ্যন্তরে ন্যাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের মত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী তৈরী হয়। আবার দেখা যায় লোকধর্মের প্রয়োগ হলেও বৈষ্ণবধর্ম আর মঙ্গলকাব্যের শাক্তধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা বৈষ্ণবধর্মের মূল সুর যেখানে ইহজীবন বিমুখতা পারত্রিক কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর, মঙ্গলকাব্যগুলি সেখানে অনেক বস্তুবাদী ধারা। মঙ্গলকাব্যের মানুষ দেবীর কাছে ধন-জন-ঐশ্বর্য কামনা করেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-—"মধ্যযুগের বাংলার সমাজে বৈষ্ণব ধর্ম যেমন বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়াছে, তেমনি অপর পক্ষে মঙ্গলকাব্যবর্ণিত লৌকিক শাক্তধর্ম পরম সংসারাসক্তির গুণগান করিয়াছে। ভোগের ভিতর দিয়া সাধনাই ছিল মঙ্গলকাব্যের আধ্যাত্মিক বাণী।"[৬৩]

এভাবে লৌকিক জীবনের নানা উপাদানের সমন্বয়ে মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী সাহিত্যধারা মঙ্গলকাব্য গড়ে উঠেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর জন-ইতিহাসের যে খুঁটিনাটি বিবরণ ধরা পড়েছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তারই তথ্য চয়নের মধ্যে দিয়ে সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের পশ্চাদ্‌ভূমি বিশ্লেষণ বস্তুতপক্ষে বাঙালী সমাজের ভিত্তিভূমি অনুসন্ধানের প্রয়াস।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬৫।

২। ঐ, পৃঃ ২৫২।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৭৯

৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৪৯।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড,অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৬।

৬। ঐ, পৃঃ ২৭৩।

৭। মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ৫৪-৫৫।

৮। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, গোপাল হালদার রচনা সমগ্র, পৃঃ ৪৩।

৯। মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ৬৭।

১০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৪।

১১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৫৩।

১২। ঐ, পৃঃ ৫৪।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬২-৬৩।

১৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড,অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩৬।

১৫। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, পৃঃ ৬৩।

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড,ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১১৪।

১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৪৫।

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১১২।

১৯। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৯২।

২০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬১।

২১। ঐ, পৃঃ ১১।

২২। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, অতুল সুর, পৃঃ ২২১।

২৩। বাতায়নিকের পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পঃ বঃ সংস্করণ, পৃঃ ৬৩০।

২৪। বাংলার ব্রতপার্বণ, ডঃ শীলা বসাক, পৃঃ ২।

২৫। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫।

২৬। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত, পৃঃ ৫৩৩।

২৭। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৯৮-২৯৯।

২৮। বাংলার ব্রতপার্বণ, ডঃ শীলা বসাক, পৃঃ ২২।

২৯। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৯১।

৩০। সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংশোধিত, পৃঃ ৫৩৩।

৩১। বাংলার লোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০৩।

৩২। ঐ, পৃঃ ৫০৪।

৩৩। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১১।

৩৪। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৯৮।

৩৫। ঐ, পৃঃ ৩২।

৩৬। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১৭।

৩৭। ঐ, পৃঃ ১২।

৩৮। বাংলার ব্রতপার্বণ, ডঃ শীলা বসাক, পৃঃ ২৪।

৩৯। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, পৃঃ ২৪৬।

৪০। বাংলার লোকসাহিত্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০৪।

৪১। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ১২।

৪২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১০।

৪৩। কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত, দ্বিতীয় খণ্ড, শান্তিপর্ব, পৃঃ ২৩।

৪৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬১।

৪৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৩।

৪৬। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ, পৃঃ ৫।

৪৭। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৩৯১।

৪৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৭-১১৮।

৪৯। ঐ, পৃঃ ১১৪।

৫০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬১।

৫১। ঐ, পৃঃ ৬২।

৫২। পূর্ববঙ্গগীতিকা,'বগুলার বারমাসী', চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ২২৪।

৫৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪০২।

৫৪। A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts volume-1, By Sunilkumar Ojha , Page: 67.

৫৫। চণ্ডিকার ব্রতকথা, দ্বিজ মাধবচন্দ্র, মৃণালকান্তি দাম ও নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত, পৃঃ ৩২।

৫৬। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, ভূমিকা অংশ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪০।

৫৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৭৬।

৫৮। ঐ, পৃঃ ৬৭৭।

৫৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১১২।

৬০। ঐ, পৃঃ ১১২-১১৩।

৬১। A Descriptive catalogue of Bengali Manuscripts Volume- 2&3, By Sunilkumar Ojha , Page: 317।

৬২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১২৯-১৩০।

৬৩। ঐ, পৃঃ ৮০।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত পাঠ ঃ-

১) "স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈল মতি

- - - - - - - - - - - -

পরম রূপসী কন্যা ইন্দ্রের নৃত্যকী।" (পৃঃ ১০৯)

২) "আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পঞ্চ ভগিনী

- - - - - - - - - - - -

বিপদ নাশিবে জদি পূজা কর তুমি।" (পৃঃ ১৪৬)

৩) "অবণী মণ্ডলে জাব তোমার কিঙ্করী হব

করিব পূজার অনুষ্ঠান।" (পৃঃ ১১১)

৪) "দেবীর ব্রতের তরে দেবকন্যা বান্যার ঘরে

রম্ভাবতী সফল মানিল।" (পৃঃ ১১২)

৫) "এমন সপন দেখাইআ মাহেশ্বরী

- - - - - - - - - - - -

ছাগল লুকায়্যা দেবী রহিল অম্বরে।" (পৃঃ ১৪৪)

৬) "দেবমানে অবনিতে রয়্যা চারিমাস

কর গিআ পার্বতীর ব্রতের প্রকাশ।" (পৃঃ ১৭৬)

৭) "এই ব্রত ইতিহাস সুনিলে কলুষ নাশ

কলিকালে হইল প্রচার।" (পৃঃ ৩০৬)

৮) "সূর্য-অর্ঘ্য দিআ সদাগর উঠে কূলে

অষ্ট তণ্ডুল দূর্বা পাইল পাগের আঁচলে।" (পৃঃ ২৫৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

মনসামঙ্গল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক প্রচারিত, দীর্ঘ কয়েক শত বছর ধরে পরিব্যাপ্ত, সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং মঙ্গলকাব্যধারায় সর্বপ্রাচীন কাব্য। মনসামঙ্গল বাংলার লোকসমাজের কাব্য, নিজস্ব কাব্য। বাংলাদেশের দীর্ঘকালের সমাজ জীবন ও লোকসমাজের নির্যাস গ্রহণ করে এই কাব্যধারা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনসামঙ্গলের কবিগণ কেউই কিন্তু নাগরিক সমাজের বিদগ্ধ কবি ছিলেন না; জনসভার কবি ছিলেন। কেউ কেউ হয়ত রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাদের মনোরঞ্জনার্থে কাব্যরচনা করেননি। কবিগণ অনেকেই ছিলেন গায়েন মাত্র; তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা যে খুব বেশী ছিল তা নয়। বিজয় গুপ্ত তো মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি কানা হরি দত্তকে মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তা দেবী মনসার উক্তি বলে গণ্য হয়েছে। জনসভার কবি হওয়াতে তাঁদের জনসংযোগ ছিল অত্যন্ত সম্পৃক্ত; তাঁরা আপন সমাজ-চরিত্রানুযায়ী সমাজধর্ম ও লোকধর্মকে নিরীক্ষা করেছিলেন। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লোকউৎসবকে কেন্দ্র করে সমগ্র পল্লীবাসী এক সামিয়ানার নীচে সমবেত হত - তারা প্রত্যেকে লোকমানুষ। সেখানে পরিবেশিত হত মঙ্গলগান, সেখানে গায়ক ও শ্রোতা সকলেই সম স্তরের মানুষ। সর্পভীতিজাত সর্পদেবী মনসার পূজাবিধি লোকায়ত এবং অঞ্চল বিশেষে পৃথক পৃথক রীতি প্রচলিত ছিল; পালাগান গাওয়ারও পৃথক পৃথক রীতি প্রচলিত ছিল।

মনসাপূজার প্রচলনঃ সর্পদেবী মনসার কৌলীন্য নাম মাত্র; সে পৌরাণিক দেবী নয়, লৌকিক দেবী, ব্রতের দেবী। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে তার আবরণটুকু ধরা যায় মাত্র। বৈদিক-আর্য প্রভাবের বাইরে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় প্রভাবিত সমাজে এই দেবীর সৃষ্টি। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশে সর্পভীতি থেকে সর্পদেবী মনসার সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। পুরুষতান্ত্রিক বৈদিক আর্য সমাজে স্ত্রী দেবতার প্রভাব ছিল না। বাংলাদেশে সর্পপূজা ও দেবী মনসার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; তা থেকে আমরা মনসার পৌরাণিক ও লৌকিক উৎস সম্পর্কে জানতে পারি। দেবী মনসার উৎস সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করা হল— ডঃ সুকুমার সেনের মতে, আদি দেব নিরঞ্জনের মানসোদ্ভূতা সর্পদেবী মনসা, পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যার দেবী এবং সিজবৃক্ষ পূজক সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসার উৎপত্তি। বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রের জাগুলী বা জাঙ্গুলী দেবীও মনসার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।[১] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও ডঃ সেনের মত বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্রের দেবী জাগুলী তারাকেই মনসা দেবীর ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও তিনি দাক্ষিণাত্যের সর্পদেবী 'মুদামা'র প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।[২] তিনি একথাও বলেছেন পরবর্তীকালে জৈন ঐতিহ্যের পদ্মাবতী এবং মহাভারতে উল্লিখিত জরুৎকারু প্রসঙ্গও মনসার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে।[৩]

মনসামঙ্গলের কবি ও কাব্যঃ মনসামঙ্গল যেহেতু সর্বাধিক প্রচারিত কাব্য, তাই বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব ধারা অনুসারে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে গড়ে উঠেছে। মনসামঙ্গলকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাজন অনুসারে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। এই তিনটি ধারা হল–
(১) পূর্ববঙ্গীয় ধারা, (২) দক্ষিণবঙ্গীয় ধারা এবং (৩) উত্তরবঙ্গীয় ধারা। এই তিন ধারার প্রধান কবিগণ হলেন ঃ

১। পূর্ববঙ্গীয় ধারায় – বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস ও জীবন মৈত্র।

২। দক্ষিণবঙ্গীয় ধারায় - বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বিষ্ণু পাল।

৩। উত্তরবঙ্গীয় ধারায় – তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল।

এছাড়াও কয়েকজন অপ্রধান কবি আছেন, যেমন ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, দ্বিজ রসিক, বাণেশ্বর রায় প্রমুখ।

মনসামঙ্গলের কাহিনী অংশ অত্যন্ত সুপরিচিত বলে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে বিভিন্ন কবির রচিত মনসামঙ্গলের কাহিনী একই এবং অঞ্চল বিশেষে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। পুচ্ছানুগ্রাহিতার কারণে কবিগণ বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছেন মাত্র। তিন বঙ্গের কাহিনীতে এবং বিভিন্ন কবির সমরকালের ভিত্তিতে যে সামান্য পরিবর্তন তাতে সমাজ ইতিহাসই চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ইতিহাসকে উদ্‌ঘাটিত করাই আমার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণে, ভাষা সংস্থাপনে, বর্ণনা ভঙ্গীতে কবিগণের আপন প্রতিভা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও সমসাময়িক কালের সত্যকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সুতরাং তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলের এক্কেকটি ধারাকে অবলম্বন করে সেই বঙ্গের সমাজ চিত্রগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যা সমাজ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মূল্যবান। একাধিক কবির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব, এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রধান কবিদের কাব্য অবলম্বনে আমার আলোচনা এগিয়ে চলবে। অবশ্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিরক্ষেত্রেও এই রীতি প্রযোজ্য হবে।

মনসামঙ্গল কাব্য ধারার প্রাচীনতম কবি হলেন হরি দত্ত। হরি দত্ত সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না বলেই পণ্ডিতদের অভিমত। সম্ভবত বিজয় গুপ্তের পূর্ববর্তী কবি বলেই বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে হরি দত্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন হরি দত্তের সময়কাল সম্পর্কে লিখেছেন — " বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি।"[৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য হরি দত্তকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে স্থাপন করেছেন।[৫] বিজয় গুপ্ত পদ্মাপুরাণে হরি দত্তকে মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন; তিনি জানিয়েছেন হরি দত্তের গীত কালে কালে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কাব্যটি ত্রুটিপূর্ণ তাই মনসার পছন্দ হয়নি। কানা হরি দত্তের কাব্য পাওয়া যায়নি তবে প্রাচীনতম কবি হিসাবে তাঁকে প্রথমে রাখা প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গীয় ধারা ঃ পূর্ববঙ্গীয় মনসামঙ্গল কাব্য-ধারার অন্যতম কবি হলেন বিজয় গুপ্ত এবং নারায়ণ দেব। বিজয় গুপ্ত বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা সনাতন এবং মাতা রুক্মিণী দেবী। বিজয় গুপ্তের কাব্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে প্রথম সন-তারিখ যুক্ত কাব্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিজয় গুপ্তকে 'ঋতু শশী বেদ শশী' পাঠ ধরে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করতে চেয়েছেন। বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন সেই হিসাবে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ যুক্তিযুক্ত। ডঃ ভট্টাচার্যের ভাষায় - "শেষোক্ত পদটি হইতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সময় হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। অতএব এই সময়টিই বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"[৬] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতই ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দকে বিজয় গুপ্তের সময়কাল ধরেছেন, তবে তিনি মনে করেন, এ সমস্ত কল্পনা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়— "বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ) কাব্যরচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অবশ্য এ সমস্ত সন-তারিখের জল্পনা যে খুব নির্ভরযোগ্য নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ নানা পুঁথিতে যে পয়ার তিনটি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ঐক্য নাই।"[৭]

বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যটি স্থূলায়তন এবং পালাভিত্তিক রচনা। 'বন্দনা' অংশ দিয়ে কাব্যের সূত্রপাত। এর পর কাব্যদেহ এভাবে সাজানো - স্বপ্নাধ্যায় পালা, মনসার জন্ম পালা, চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ

পালা, মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার, পদ্মার বিবাহ, বিচ্ছেদপালা, সমুদ্রমন্থন, পদ্মার বনবাস, রাখয়াল বাড়ীর পূজা, কাজির সহিত যুদ্ধ, গুয়াবাড়ী কাটা পালা, মহাজ্ঞান হরণ, সঙ্কুর গাড়রি নিধন, ছয় কুমার বধ, ঝাল বাড়ী পূজা, অনিরুদ্ধ উষা হরণ ও যম যুদ্ধ, চাঁদসদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন, বস্তু বদল পালা, ডিঙ্গা বুড়ান, চান্দের অবস্থা ও লক্ষ্মীন্দ্রের জন্ম, লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহের জোড়ানি, লোহার বাসর গঠন, লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহ, লক্ষ্মীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান, ইত্যাদি। বন্দনা ও স্বপ্নাধ্যায় সহ মোট ছাব্বিশটি পালায় কাব্যটি রচিত।

পূর্ববঙ্গীয় ধারার অপর প্রখ্যাত কবি হলেন নারায়ণ দেব। নারায়ণ দেব বর্তমান পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত মৈয়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।কবির পিতার নাম নরসিংহ দেব, মাতা রুক্মিণীদেবী। কবির উপাধি ছিল 'সুকবিবল্লভ'। নারায়ণ দেবের কাব্য শ্রীহট্ট বা সিলেট এবং আসাম অঞ্চলে বিশেষ প্রচারিত হওয়ায় তাঁকে শ্রীহট্ট ও আসামের মানুষ হিসাবে দাবী করা হয়। অন্যান্য কবিগণের মত নারায়ণ দেবের সময়কাল নির্ণয় নানা জটিলতায় আকীর্ণ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন নারায়ণ দেব সম্ভবত বিজয় গুপ্তের সময় কালেই কাব্য রচনা করেন।[৮] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণ দেবের বংশতালিকা বিচার করে তাঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করেছেন। ডঃ ভট্টাচর্যের ভাষায় –"চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।"[৯] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ দেবকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা কিছু পরে স্থাপন করেছেন।[১০] ডঃ সুকুমার সেন এ সম্পর্কে বলেছেন –"ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভবনা কম হয়।"[১১]

নারায়ণ দেবের কাব্যও স্থূলায়তন। তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' গ্রন্থের আঙ্গিক নির্মাণে খানিকটা বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। 'বন্দনা' দিয়ে কাব্য শুরু এবং তারপর ভবানীর বিলাপ, চণ্ডীর ডুমনীবেশ ধারণ, নেতার জন্ম এবং পদ্মার জন্ম পালা; তারপরই হঠাৎ শুরু হয়েছে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ ও মনসাদেবীর প্রতাপ, বিবাহ উপলক্ষে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান, বেহুলার বিবাহে তাড়কার রন্ধন, নারীগণের হাস্যপরিহাস ও বাসিবিবাহ, চাঁদসদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন, লোহার বাসর ও মনসাদেবীর কোপ, লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগিনীর দংশন, বেহুলার বিলাপ, সনকার রোদন, চাঁদসদাগরের ক্রোধ, ভেলা নির্ম্মাণ, বেহুলার বিদায় গ্রহণ, লক্ষীন্দরের মৃতদেহ সহ বেহুলার ভেলা ভাসান, প্রথম বাঁকে মনসাদেবীর পরীক্ষা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ ও বাঁকের বিবরণ, নেতার সহিত বেহুলার সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহ-লাভ, শিবের নিকট বেহুলার অনুগ্রহ-লাভে নেতার প্রচেষ্টা. শিবের আদেশে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, দেবসভায় বাদানুবাদ ইত্যাদি। এরপর আকস্মিক ভাবে শুরু হয়েছে লক্ষ্মীন্দরের জন্ম বিবরণ। মনে হয় মনসা যেন দেবসভায় বিবরণ দিয়েছে কিভাবে সে দেবলোক থেকে নরলোকে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে এল এবং চাঁদসদাগরের সর্বনাশ করল। এখানে পরপর পালাগুলি হল, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের জন্ম-বিবরণ ও মনসাদেবীর যমরাজার সহিত যুদ্ধ, উষা ও অনিরুদ্ধকে মর্ত্যলোকে আনয়ন, চন্দ্রধরের বাণিজ্য-যাত্রা, চন্দ্রধরের দক্ষিণপাটন আগমন, চন্দ্রধরের বদল-বাণিজ্য, চন্দ্রধরের পাটন হইতে স্বদেশ যাত্রা. মনসাদেবী কর্তৃক চন্দ্রধরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবান, ডিঙ্গা ডুবির ফলে চন্দ্রধরের দুর্দ্দশা, চন্দ্রধরের স্বগৃহে আগমন, ভাটের বর্ণনা শ্রবণে লখাইর বিবাহ অভিলাষে চন্দ্রধরের উজানি নগর যাত্রা, বেহুলাকে পদ্মাদেবীর ছলনা, বেহুলার লোহার তণ্ডুল রন্ধন, চন্দ্রধরের সহিত সাহেরাজার যুদ্ধ, সাহেরাজা ও চন্দ্রধরের মিত্রতা, কেসাই কামারের উপর মনসাদেবীর ক্রোধ বর্ণিত হবার পর 'পূর্বকথা' সমাপ্ত, তারপর আবার ফিরে এসেছে লখাইর পুনর্জ্জীবন লাভের বিবরণ. চৌদ্দ ডিঙ্গাসহ বেহুলা-লখাইর যাত্রা. চন্দ্রধর কর্তৃক পদ্মা-পূজার উদ্যোগ, চন্দ্রধরের পদ্মা-পূজা, বেহুলার পরীক্ষা. বেহুলা-লখাইর উজানি নগরে গমন, বেহুলা-লখাইর স্বর্গারোহণ ইত্যাদি। তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নির্ভরযোগ্য সংস্করণ নয় বলে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, কারণ এতে পুঁথির

পাঠ উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। তাঁর মতে- "১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের সম্পাদনায় নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে। তাহাতে বিভিন্ন পুঁথির পাঠ উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে।"[১২]

পূর্ববঙ্গীয় মনসামঙ্গলের অপর একজন কবি হলেন দ্বিজ বংশীদাস। ইনি চৈতন্য পরবর্তীকালের অন্যতম কবি। কবির নাম বংশীদাস চক্রবর্তী। বংশীদাস মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা যাদবানন্দ, মাতা অঞ্জনা দেবী। ইনি প্রথম বাঙালী মহিলা কবি দেবী চন্দ্রাবতীর পিতা। নারায়ণ দেব ও দ্বিজ বংশীদাস একই স্থানের মানুষ ছিলেন। কবি প্রদত্ত কাল নির্দেশক পয়ার অনুযায়ী বংশীদাস ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই পয়ারটির প্রামাণিকতা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থাপন করতেই আগ্রহী। তাঁর মতে— "পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজ বংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়। দ্বিজ বংশীর ভাষা ও স্থানীয় জনশ্রুতি এই সময়ের অনুকূল।"[১৩] সম্ভবত বংশীদাস ও নারায়ণ দেব পরস্পরের প্রতিবেশী হওয়ার জন্য এবং উভয়ের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হওয়ায় বংশীদাসের কাব্যে নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত রচনা প্রবেশ করেছে। বংশীদাসের কাব্যে প্রতিটি প্রসঙ্গ পৃথক পৃথক শিরোনাম অঙ্কিত। পূর্ববঙ্গীয় মনসামঙ্গলের অপর দুই অপ্রধান কবি হলেন ষষ্ঠীবর দত্ত এবং জীবন মৈত্র। ষষ্ঠীবর শ্রীহট্টের এবং জীবন মৈত্র বগুড়ার কবি ছিলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ষষ্ঠীবর নারায়ণ দেব অপেক্ষা শতাধিক বৎসরের পরবর্তী কবি।[১৪] আর জীবন মৈত্র ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন।[১৫]

দক্ষিণবঙ্গীয় ধারাঃ মনসামঙ্গলের দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার অন্যতম দুজন কবি হলেন বিপ্রদাস পিপিলাই এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। অন্যান্য অপ্রধান কবিদের মধ্যে রয়েছেন বিষ্ণু পাল, সীতারাম দাস, বাণেশ্বর রায় প্রমুখ। বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ডঃ সুকুমার সেন বিপ্রদাস সম্পর্কে বলেছেন – "বিপ্রদাস মনসা-পাঞ্চালীর সবচেয়ে পুরানো কবি। তাহার রচনা অখণ্ডিত ও অছিন্ন রূপে পাওয়া গিয়াছে। মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যেই লভ্য।"[১৬] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাসের প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কাব্যে কবি প্রদত্ত পয়ার 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ' এবং হুসেন শাহের নাম উল্লিখিত হলেও কিছু আধুনিক স্থানের নাম, আধুনিক বাংলা ভাষা প্রয়োগের ফলে তাঁকে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন বলতে চান না ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত পণ্ডিতরাও।[১৭] বিপ্রদাস কাব্যে কামানের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর প্রথম পানিপথের যুদ্ধে প্রথম কামান ব্যবহার করেন। সুতরাং কাব্যটি ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী রচনা হওয়া সম্ভব। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন— "বড়ই বিস্ময়ের বিষয় বিপ্রদাসের পুঁথিতে সেরূপ কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই— যদিও চারিখানি পুঁথির মধ্যে তিনখানির অনুলিপির কাল বিজয়গুপ্তের ১৮৩৭ সালের পুঁথির অপেক্ষা প্রাচীনতর।"[১৮] বিপ্রদাসের কাব্যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ার আছে -

"মুকুন্দ-পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি নাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপলায় পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর॥
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥" (বিপ্রদাস/৩)

চব্বিশপরগণা জেলার নাদুড়্যা-বটগ্রামে বিপ্রদাস জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ নাদুড়্যা বটগ্রামকে আধুনিক বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া বলে মনে করেন। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। বিপ্রদাসের কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'।

মনসাবিজয় পালাভিত্তিক রচনা, এখানে আছে মোট তেরোটি পালা। পালাগুলিতে কাব্য বিষয়গুলি নিম্নরূপে গ্রথিত

প্রথম পালা – দেববন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মের নির্দেশে পদ্মফুল তুলতে শিবের কালিদহে গমন, পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারণ, মনসার জন্ম, পার্বতী মনসার কলহ, মনসার বনবাস।

দ্বিতীয় পালা – সিজুয়াতে নগর স্থাপন, মনসার সজ্জা, কপিলার মাহাত্ম্য, দেবতাদের সমুদ্রমন্থন।

তৃতীয় পালা – শিবের মন্থনজাত বিষ ভক্ষণ, মনসা কর্তৃক শিবের পুনর্জীবন, মনসার বিবাহ।

চতুর্থ পালা – জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ বর্ণনা, চাঁদ সদাগরের পরিচয়, চণ্ডী কর্তৃক কুবুদ্ধি প্রদান, রাখালগণের মনসাপূজা, হাসন-হোসেন পালার একাংশ।

পঞ্চম পালা – হাসন-হোসেন পালার শেষ অংশ, হাসন কর্তৃক মনসাপূজা, জালু-মালুর মনসা পূজা, সনকার মনসাপূজা, মনসার ঘটবারি ভাঙা, চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, সাধের বাগান ধ্বংস।

ষষ্ঠপালা – ধন্বন্তরি বধ।

সপ্তম পালা – ধনা-মনা বা ধন্বন্তরির সাঙ্গাৎ বধ।

অষ্টম পালা – চাঁদ সদাগরের প্রত্যক্ষ বিবাদ, ছয় পুত্র বধ, অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ; চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ।

নবম পালা – বাণিজ্যযাত্রা, বস্তুবদল।

দশম পালা – বেহুলা লখীন্দরের জন্ম, চাঁদের প্রত্যাবর্তন, সপ্তডিঙ্গা ডোবান।

একাদশ পালা - চাঁদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দরের বিবাহের আয়োজন।

দ্বাদশ পালা – লখীন্দরের বিবাহ, বাসরঘর নির্মাণ, সর্পদংশন, বেহুলার দেবলোক যাত্রা, নৃত্য পরিবেশন।

ত্রয়োদশ পালা – লখীন্দরের পুনর্জীবন থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত।

দক্ষিণবঙ্গীয় মনসামঙ্গলের অপর কবি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কবির নাম ক্ষেমানন্দ, সম্ভবত প্রকৃত নাম শঙ্কর মণ্ডল। আত্মবিবরণী অংশে কবি লিখেছেন —

"শুনহ মণ্ডল তুমি : উপদেশ কহি আমি : গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে।
প্রসাদ তাহার পাত্র : ইঙ্গিত পাইল মাত্র : পলাইল শঙ্কর মণ্ডল।
প্রসাদ হরিষ হয়্যা : যুক্তি দিন আশ্বাসিয়া : ধান্য কিছু দিলেন সম্বল॥" (ক্ষেমানন্দ/৫-৬)

ক্ষেমানন্দ মনসাকে 'কেতকা দেবী' বলে উল্লেখ করেছেন এবং কেয়াপাতায় জন্মপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাই কবি 'কেতকাদাস' এই উপনাম গ্রহণ করেছেন। ক্ষেমানন্দ যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাতে কোন সুস্পষ্ট কবি-পরিচয় নেই, তবে কবি সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। কবির আত্মবিবরণীটি উদ্ধৃত করা গেল —

"শুন ভাই পূর্ব্বকথা : দেবী হৈলা বরদাতা : সহায়পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয় : চন্দ্রহাস সম হয় : তাহার তালুকে ঘর করি॥
– – – – – – –
শূন্য রস বাণ শশি : সিয়রে মনসা আসি : আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।
দেবী মনসার গীত : ক্ষেমানন্দ বিরচিত : নায়কের করিবে কুশল॥"(ঐ/৫-৬-৭)

ক্ষেমানন্দ দামোদর তীরবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি কাব্যে ভারমল্ল, বিষ্ণুদাস, বারা খাঁ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। বারা খাঁ দক্ষিণ রাঢ়ে সেলিমাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন। কবির বিবরণ অনুসারে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তার পরবর্তীকালে কবি কাব্য রচনা করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন -"১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বারা খাঁ প্রদত্ত একটি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে এই সময়ের পর তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তাহার পর কেতকাদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।"[১১] মোটামুটি ভাবে বলা যায় ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্য রচনা করেন। তিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর পরবর্তীকালীন কবি, কেননা কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব স্পষ্ট। মুকুন্দের অনুকরণেই তিনি কাব্যে বিস্তৃত আত্মবিবরণ দিয়েছেন এবং প্রতিটি পদের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। স্মরণীয় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলই সর্বপ্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার অন্যান্য কবিগণের মধ্যে প্রধান হলেন বিষ্ণু পাল, ইনি বীরভূমের কবি। কবি জাতিতে কুম্ভকার, রাণীগঞ্জের নিকটে সেরগড় পরগণার কোন এক গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বীরভূম অঞ্চলে বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মিল দেখে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন- ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যখন রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তখন অর্থাৎ সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি মনসামঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেছিলেন।[২০] তাঁর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের মত আটটি পালা আছে। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল 'অষ্টমঙ্গলা গান' নামেও পরিচিত।

উত্তরবঙ্গীয় ধারাঃ মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন জগজ্জীবন ঘোষাল এবং তন্ত্র বিভূতি। জগজ্জীবন ঘোষাল কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় ভণিতা অংশে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় কবি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কবির পিতা রূপ রায়চৌধুরী, পিতামহ জয়ানন্দ চৌধুরী, মাতা রেবতী দেবী, কবির বর্ণনানুসারে —

"চৌধুরী রূপরায় সর্ব্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন॥" (জগজ্জীবন/ ২১০)

কবির নিবাস দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামোড়া গ্রামে; তিনি কাব্যে দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের সম্পাদক আশুতোষ দাস মহাশয় কাব্যে মহারাজা প্রাণনাথের নাম উল্লেখ থেকে মনে করেন জগজ্জীবন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পর কাব্য রচনা করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য - প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন এই তথ্য ধরে জানিয়েছেন - "মনে হয়, জগজ্জীবনের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রচিত হয়।"[২১] ডঃ সুকুমার সেনও মনে করেন অষ্টাদশ শতাব্দী আরম্ভের আগেই জগজ্জীবনের কাব্য রচিত হয়।[২২] জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল একটি স্থূলায়তন কাব্য; কাব্যে দু'টি অংশ দেবখণ্ড ও বাণিয়া খণ্ড। দেবখণ্ডটি আকারে ছোট এবং বাণিয়া খণ্ডটি আকারে বড়। দেবখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা থেকে মনসার সঙ্গে শিবের সাক্ষাৎ, গৃহে আনয়ন ও চণ্ডীর সঙ্গে কলহ পর্যন্ত; আর বানিয়া খণ্ডে চাঁদ সদাগরের পিতা কোটীশ্বর সদাগরের কাহিনী থেকে। উত্তরবঙ্গীয় ধারার অপর কবি হলেন তন্ত্রবিভূতি। কবির নাম সম্ভবত বিভূতি এবং কবি তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে তাঁর নামের পূর্বে 'তন্ত্র' এই উপনামের ব্যবহার আছে। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কাব্যে 'দ্বিজ', 'দ্বিজসুত' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন। আবার ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন— কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন তন্তুবায় বা তাঁতি, সেকারণে তিনি 'তন্ত্র' এই উপনাম গ্রহণ করেছেন।[২৩] তিনি আরও মনে করেন তন্ত্র বিভূতির কাব্যের অনেকটাই জগজ্জীবনের রচনা, তাই 'দ্বিজ' ও 'দ্বিজসুত' বলতে জগজ্জীবনকেই বোঝানো হচ্ছে।[২৪] তাঁর 'মনসাপুরাণ' কাব্যে 'তন্ত্রবিভূতি', 'বিভূতি' এবং জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাও আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।"[২৫] তন্ত্রবিভূতির কাব্যেরও দুটি অংশ দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড।

তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলের ত্রিধারায় কবিদের কাব্য আঙ্গিকে ও কাহিনী গ্রন্থনে কিছু কিছু পার্থক্য আছে; কাহিনী

সম্পর্কিত সংযোজন বিয়োজন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং দ্বিজ বংশীদাসের মধ্যে বিজয় গুপ্ত ও বংশীদাসের কাব্যে হাসন- হোসেন পালা বর্ণিত হয়েছে, আবার বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বিষ্ণু পাল তিন জনের কাব্যেই হাসন-হোসেন পালা আছে। উত্তরবঙ্গীয় কবিদের কাব্যে হাসন-হোসেন পালা নেই। শুধু তাই নয়, বর্ণনার বিষয়েও পার্থক্য আছে। কোথাও নেতার জন্ম শিবের ঘাম থেকে আবার কোথাও শিবের জটার জল থেকে। বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যে অনিরুদ্ধ-উষা হরণ, যমযুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগর ও সাহেরাজার যুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, অন্য কাব্যগুলিতে তা নেই। বংশীদাস ও জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ সদাগরের জন্মবিবরণ আছে, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস, তন্ত্রবিভূতির কাব্যে এই প্রসঙ্গটি নেই। প্রত্যেক কবির কাব্যেই প্রচুর পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তবে চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি বংশীদাস, ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবনের কাব্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গের বর্ণনা বেশী মনে হয়। চৈতন্য পরবর্তীকালের কাব্য বলেই অনেক বেশী পৌরাণিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, আর জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দরের মাতুলানীর শ্লীলতাহানি প্রসঙ্গ বর্ণনা আছে। যাই হোক বিভিন্নক্ষেত্রে যে তফাৎগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে তা কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ইতিহাসের বিষয় রূপে বিবেচিত হতে পারে।

সমাজবৃত্ত ঃ মানুষই ইতিহাসের অন্যতম উপাদান, আর নানা বস্তুকে আশ্রয় করেই মানুষ ভাবময় জগতে প্রবেশ করে থাকে। প্রাচীনযুগ থেকেই তাই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মূল্য অপরিসীম। যখন ইতিহাস রচনার রেওয়াজ ছিল না, তখন ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যে ইতিহাসকে অন্বেষণ করতে হয়েছে। ইতিহাস শুধুমাত্র শাসকের রক্তচক্ষু নয়, জনসমাজও সেখানে যুক্ত হয় তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। জনসমাজে আবিষ্কৃত মানুষের ব্যবহৃত বস্তুকে নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ ইতিহাস। মুখে শুনে কিংবা দেখে শিখে সমাজ ইতিহাসের উপাদানগুলি পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন জনসমাজে বিস্তারলাভ করে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ সমস্ত উপাদানগুলি বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ ও লৌকিক নিম্নবর্ণের সমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানগুলি সামান্য বিভিন্ন। আবার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি অনেকক্ষেত্রে অভিন্ন, কারণ একই বাঙালী সমাজের আশ্রয়েই তা বিকাশলাভ করেছে, তবে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ স্থানভেদে সামান্য বিভিন্ন। সমাজ ইতিহাসের এ সকল উপাদানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা—

১। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ খাদ্য-পানীয়, গৃহাস্থালীর দ্রব্য, সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, শিল্পবস্তু, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

২। বিশ্বাস ও সংস্কার-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি-প্রথা ইত্যাদি।

৩। ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি।

৪। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ স্বাস্থ্য-শরীরচর্চা ও বিনোদন।

৫। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ছড়া, পাঁচালী, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানঃ

খাদ্য ও পানীয় ঃ মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বাঙালী জীবনের সর্বরূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, বাঙালী সমাজের বিভিন্ন লৌকিক উপাদানগুলির ব্যবহারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে আসা যাক্ খাদ্য ও পানীয় ঘটিত উপাদানের কথায়। বাঙালী ভোজন রসিক। প্রাকৃতপৈঙ্গল ও চর্যাপদে রসনাপ্রিয় বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়, মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই পরিচয় আরও স্পষ্ট। রন্ধনকার্যে বাঙালী নারীর মত পুরুষরাও সিদ্ধহস্ত ছিল, মঙ্গলকাব্যের রন্ধন বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ হেঁসেলের খবর রাখতেন। মনসামঙ্গলে রন্ধনকার্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ; 'মাছে ভাতে বাঙালী' এই প্রবাদটি মঙ্গলকাব্যগুলিতে

সত্যে পরিণত হয়েছে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য দুই প্রকার – আমিষ ও নিরমিষ। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাছ, যথা— ইলিশ, রুই, কাতলা, মাগুর, কই, চিতল, সোল, পাবা, বাইন, বোয়াল, পুঁটি, মৌরলা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার মাংস, যথা— খাসির মাংস, হরিণের মাংস বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। নিরামিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, মসুর মাষকলাই, খেসারি, ছোলা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার শাক্‌সবজি, যথা— কচু, ওল, পূঁই, নিম, শিম, বেগুন, কাঁচাকলা, মূলা, হিঞ্চে, পালং, নালতে, গীমে ইত্যাদি। মিষ্টান্ন জাতীয় খাদ্যে বাঙালী গৃহিণীরা শুধুমাত্র রসনা পরিতৃপ্তই করত না, শৈল্পিক দক্ষতা প্রদর্শন করত। বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য। দুধ, গুড়, চিনি, নারকেল, চালগুঁড়ো সহযোগে বিভিন্ন প্রকার লোভনীয় খাদ্য পিঠা, পায়েস, ক্ষীরপুলি, দুগ্ধপুলি, দুগ্ধচুষি, নারিকেলপুলি, মুগসাউলি, সরুচাক্‌লি, রুটি, চিতুইপুলি, কলাবড়া, তালবড়া, ছানাবড়া, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরসা, চন্দ্রকাতি ইত্যাদি তৈরী করত। দুগ্ধজাত খাদ্য হিসাবে দধি, দুগ্ধ, দৈ, ঘোল বা তক্র, ঘি ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। শুকনো খাবার হিসাবে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, গুড়, সন্দেশ, নাড়ু, মোয়া অতি জনপ্রিয় খাবার। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে সনকার সাধভক্ষণ উপলক্ষে বিস্তৃত রন্ধন তালিকা পাই —

"তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক্ ধুক্।
নারিকেল খাড় দুগ্ধে রান্ধে মুগ সুপ॥
শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইয়ন পোড়া॥
রান্ধন রান্ধিতে সোনাইর দ্বারে বাজে শিঙ্গা।
নারিকেল দিয়া রান্ধিলেক ঝিঙ্গা॥
লতা পাতা সর্ব্ব শাক করে ফেচ ফেচা।
নারিকেল ঘৃত দিল আর আদা ছেচা॥
বাইগন সলুফা অতি দেখিতে শোভন।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সুকত পাচন॥
রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই ভরে বাটী বাটী।
ঢেকির কড়ি দিয়া রান্ধে কাঁঠাল আটি॥
খেসারির ডাইল রান্ধে কাঁটালের মুছি।
দুগ্ধ লাউ দিয়া রান্ধে খাড়লা মুছি॥
রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই করিল ভাগ ভাগ।
হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক শ্বেত সরিষার শাগ॥ (বিজয় / ২৯৮-২৯৯)

বাঙালীর ঘরে আমিষ এবং নিরামিষ পৃথক পৃথক ভাবে রান্না হত, এমন কি পৃথক হেঁসেলও থাকত। যেমন—

"নিরামিষ রান্ধিয়া করিল একভিত্য।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিতে গেল চিত্ত॥
বড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে কোল।
কত তৈলেত ভাজে কত রান্ধে ঝোল॥
ছোট ছোট চেঙ্গ মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক নন্দন বারিব থোড়॥
বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সঙ্কচুর আলু॥

বড় বড় চাইন মৎস্য দেখিতে বড় ভাল।
কত করে ভাজা ভোজা কত করে ঝোল॥
বড় (বড়) কই মৎস্য করিয়া ভাগ ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ আলু কচু লগে॥
চেঙ্গ পোড়া দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বউল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পীপলিয়া সউল॥
রান্ধিতে রান্ধিতে সোনার কানের লড়ে সোনা।
কটু তৈল দিয়া ভাজে রাঙ্গা সৈলের পনা॥
ছোট ছোট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুড়ি।
সরুসা বাটিয়া দিয়া রান্ধিলেক ঝুরি॥
... ...
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া করে এক ভিত।
মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধে হৈয়া হরসিত॥
ধূম নিধূম রান্ধে দিয়া চৈইর ঝাল।
আখিনি পলাহু রান্ধে ঘৃতের মিশাল॥
খির খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ মিঠা।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা॥ (ঐ/২৯৯-৩০০)

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দক্ষিণ পাটনে গিয়ে চাঁদ সদাগর খেচরান্নের সুখ্যাতি করে, খিচুড়ি বা খেচরান্ন একটি অতি প্রিয় বাঙালী খাবার —

"অধিক তৃপ্তি হয় খাইয়া নিরামিষ।
ঘৃত দিয়া খায় যদি রান্ধিয়া খিচরি।" (ঐ / ২৭১)

এছাড়াও কচ্ছপের মাংস, পাঁঠা ও খাসীর মাংস, কবুতরের মাংস, হরিণের মাংস, হাঁসের ডিম খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে বেহুলার বিবাহে তাড়কার রন্ধন বর্ণনায় পাই—

"খাসির মাংস তোলে ঘৃতেতে ছাবিয়া।
হরিণের মাংস কথ অম্বল রান্ধিয়া॥
মেসের মাংস কত সুর্দ্ধ চাইয়া লইল।
তলিত মরিচ দুই বেঞ্জন রান্ধিল॥
জত্ন করিয়া পাছে রান্ধে কবুতর।
তলিত মরিচ দুই হয় সমসর॥
কাচুয়া কৎসবের আসুলি পাসুলি।
সব রস রাখিয়া রান্ধে ঘৃতে তুলি॥"(নারায়ণ / ৪৮)

বিপ্রদাসের কাব্যে সনকার সাধভক্ষণের রন্ধন কৌতুকাবহ —

"দুগ্ধ গুড় নারিকেল শর্করা নবাত
বিবিধ পিষ্টক সজ্জা করে নানামত।
উত্তম তণ্ডুল-গুড়ি দুগ্ধ চিনি দিয়া
দুগ্ধ-ফেনি সজ্জ কৈল প্রচুর করিয়া।

আসিকা ভিজায় দুগ্ধে রাখিল প্রচুর
খিরপুলি দুগ্ধ-চুষি রাখিল প্রচুর।
নারিকেল-পুলি মুগ-সামলি বিস্তর
রুটী সরুচাকলি করিল বহুতর।
রান্ধিল শাকের ঘন্ট ডালি আর মৎস্য
কতেক প্রকার ভাজা করিল অসচ্য।
লাউর অম্বল রান্ধে তাহে গুড় দিয়া
পরমান্ন রান্ধে বধূ হরষিত হইয়া।
দুগ্ধে চিড়া দিয়া কাটি দিল বহুতর
অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল দিলেক তারপর।
পশ্চাতে শর্করা দিয়া ওলায়্যা রাখিল
আর বধূ হড়ি ঘৃত চড়াইল।
সুপক্ক হইল ঘৃত দেখিয়া সত্বর
পরমান্ন দিল নিয়া তাহার উপর।
লবঙ্গ মরিচ জীরা আর জায়ফল
এলাইচ দালচিনি গুড়াইয়া সকল।
আগে নারিকেল কোড়া দিলেক তাহাতে
সকল মসলা লইয়া দিলেক পশ্চাতে।
ঘন ঘন কাটি দিয়া ঢালিলো পাত্রেতে
শাল্যা তুণ্ডলের অন্ন রান্ধে হরষিতে।" (বিপ্রদাস / ১৫০)

বংশীদাসের কাব্যে শুলুকার রন্ধনের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তা অতি মনোহর—

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন স্তরে, বসাইল একেবারে,
সম্বরিল তৈল ঘৃত ঢালি॥
প্রথম নালিতা শাকে, রান্ধিলেক ঘৃত পাকে,
কচু শাকে নারিকেল কাটি।
সাঞ্চিশাক ঘৃতে ভাজে, আদা দিয়া তার মাঝে,
লাঠাশাকে জিরা লঙ্গ বাটি॥
পালঙ্গ শাক বসাইয়া, তার মধ্যে জ্বাল দিয়া,
পাশরিয়া না দিল লবণ।
নাড়িতে সে জল ফোটে, খর জ্বালে ধুঁয়া উঠে,
লাজে শুনাই বিরস বদন॥
ঘৃতে ভাজে নিমপাতে, উদিসা পূরল তাতে,
বেথ অগ্রে থৈরের চসি।
বার্ত্তাকু তরাই ঝিঙ্গা, ভাজে দুগ্ধরাজটাঙ্গা,
কাঁচাকলা ভাজে দুগ্ধ কসি॥
কদু কুমড়ার চাকি, হরিদ্রা পিঠালি মাখি,

বসবাস জিরা লঙ্গ বাটি॥
কচু আনাজ কাঁঠাল হালি, রান্ধিলেক ঘৃতে তুলি,
ছিম উরূসিব কর্কটি॥
একে একে নিরামিষ, রান্ধিলেক ব্যঞ্জন ত্রিশ,
সুক্তা মরিচ মুগডালি।
অম্ল রান্ধে পাকাকলা, আদা লেবু পৈরাম্বলা,
দ্বিজ বংশীদাসের ছিকলি॥" (বংশীদাস / ১০৬)

দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে আমিষ রান্নার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। যেমন– চাঁদের ভোজনে শুলুকার রন্ধন অংশে আছে —

"নিরামিষ ব্যঞ্জন সব ঘৃতে সম্বরিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল পাক দিয়া॥
বড় বড় কৈ মৎস্য ঘন করি আঞ্জি।
বসবাস মাখিয়া তৈলেতে কৈল ভাজি॥
কাতলের পেটি ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের পেটি ভাজে জিরা লঙ্গ মাখি॥
ইলিসা তলিত করে বাচা ভাঙ্গেনা।
শোলের খাড়কি ভাজে সউলের পনা॥
বড় বড় ইচা ভাজে ধনিয়া তলিত।
মূলা কাটি থুইলেক তাহার সহিত॥
বেতডোগা পলি রান্ধে চোচুড়া মৎস্য দিয়া।
সুখেতে ব্যঞ্জন রান্ধে আদা তাহে দিয়া॥" (ঐ / ১০৬)

বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে তত্ত্ব হিসাবে শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছিল—

"চিপট মুড়কি দিল মলাম সন্দেশ।
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ॥
ডাগর ঝালের নাড়ু চিনি চাঁপাকলা।" (ক্ষেমানন্দ / ২৬৩)

বাঙালীর রান্নায় বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। তাছাড়া চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা অংশে নানা প্রকার মসলার কথা আছে, যেমন — ডালের বড়ি, আদা, নারকেল, সুক্তা, কাঁচা হলুদ, জিরা, লবঙ্গ, এলাজ, জয়িত্রী, জায়ফল, দারুচিনি, সরিষা, মরিচ, পিপলি, জোয়ানি, কালজিরা, তেজপাতা, হিং, কর্পূর, গুড়ঞ্চক ইত্যাদি। রান্নায় সাধারণত সরিষার তেল, ঘি, তিসি ও তিল তেল ব্যবহার করা হত। তাছাড়া শুঁটকি মাছের ব্যবহার ছিল; পেঁয়াজ ও রসুনের ব্যবহার হিন্দুসমাজে প্রায় ছিল না, নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যবদল অংশে পেঁয়াজ ও রসুনের কথা পাই –

"রসুণ পেয়াজ ধরি সতগুণে জউ ভরি
কর্পূর বদলে বাখর।" (নারায়ণ / ১৮১)

বিভিন্ন রকম ফল, মিষ্টিআলু, আম, কাঁঠাল, আমলকি, হরিতকি, চালতা, ডেঁফল, ডাউয়া, বহেরা, কমলালেবু, করঞ্জা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত ––

"খাইতে মউয়া আলু মিটা সোণা তার গোটা গোটা

নারেঙ্গ কমলা আর জত।

... ...

ঘৃত রসা আমলকি পহেলা বয়েড়া হরিতকী

আলু আর করঞ্জা বহেড়া।" (ঐ)

রন্ধন বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র কার্য, তাই স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে ঘি, ধূপ, দীপ দিয়ে অগ্নিপূজা করে রন্ধনে নিযুক্ত হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে সনকার রন্ধনকালে এমনি পারিপাট্যের চিত্র পাই –

"স্নান করিয়া সোনই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
নানা দ্রব্য উপহার কিছু দুঃখ নাই।
রন্ধনের দ্রব্য যত থুইল ঠাই ঠাই।
আগে পূজিল অগ্নি ধূপ দীপ দিয়া।
চড়াইল রন্ধন রাণী হরষিত হইয়া॥" (বিজয় / ২৯৮)

বাঙালীর হেঁসেলে আমিষ, নিরামিষ, পিঠা ও মিষ্টান্ন পৃথক পৃথক ভাবে রান্না হত। পরিবেশনেও বাঙালীয়ানার নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য ছিল। ভোজনের স্থান মার্জনা করে পিঁড়ি পেতে ভোজন করাই রীতি এবং প্রথমে শাক-সুক্ত ও নিরামিষ ব্যঞ্জন, পরে আমিষ ব্যঞ্জন এবং শেষে টক ও মিষ্টান্ন দ্রব্য পরিবেশন করা হত। বিপ্রদাসের বর্ণনা অনুযায়ী —

"পরে ভোজনের স্থানে করিল মার্জনে।
বিচিত্র কাঞ্চন পিঁড়ি তাহাতে রচিয়া
সনকা বসায় অতি সাদর করিয়া।
সুবর্ণের থালে অন্ন করিয়া চরণ
প্রথমে দিলেক শাক হরষিত-মন।
ক্রমে ক্রমে দিল সুখে জতেক বেঞ্জন
হরিষে সনকা রামা করএ ভোজন।
কতেক প্রকার দিল পিষ্টক আনিয়া
দুগ্ধ-গুড় দিল রামা প্রচুর করিয়া।
বাটি ভরি পরমান্ন দিলেক হরিষে
অমৃতসমান দ্রব্য অশেষ বিশেষ।" (বিপ্রদাস / ১৫০)

ধনী বাঙালী গৃহে ত্রিশ, পঞ্চাশ, ছাপান্ন, চৌষট্টি ব্যঞ্জন রান্নার কথা মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও দরিদ্রদের খাদ্য ছিল সাধারণ—পান্তা-আমানি, গাঁদাল পাতা, বিভিন্ন প্রকার মাছ ও পশুপাখির মাংস, নানা প্রকর শাকসবজি ইত্যাদি। আহার শেষে তার অঙ্গ হিসাবে পান-সুপারির বহুল প্রচলন ছিল। তাছাড়া অতিথি আপ্যায়নে, নিমন্ত্রণে পান-সুপারি ব্যবহার বিশিষ্ট রীতি। যেমন বিপ্রদাসের কাব্যে পাই—

"কর্পূর-তাম্বুল সুখে পূরিয়া বদনে
যাত্রার উদ্‌যোগ ডাক পড়ে ঘনে ঘনে।" (ঐ/১৮২)

সাধারণ মানুষ প্রচুর পান-সুপারি খেত, তাই মঙ্গলকাব্যে পান-সুপারির প্রচুর ব্যবহার দেখি। যেমন—

"হাল বাহে শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।
বৃষহ জুড়িল হর খায় পান রঙ্গে॥" (জগজ্জীবন / ২২)

বংশীদাসের কাব্যে পাই এই প্রসঙ্গ –

"ভোজন করিয়া খায় কর্পূর তাম্বুল।" (বংশীদাস/১০৭)

পান-সুপারি দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন ও নিমন্ত্রণ বাঙালী সমাজে একটি বিশিষ্ট রীতি; মনসার বিবাহকালে দরিদ্র শিবের সংসারে পান, সুপারি, তেল, সিন্দুরের অপ্রতুলতার কথা বলা হয়েছে—

"আইয় আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দুর পাইব কথায়ে।" (বিজয় / ৭৪)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাওয়া যায় কাজলাকে চাঁদ পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়িত করেছে –

"কাজলারে ডাক্যা সাধু তারে দিল পান।
কাজলা মাল্যানী করে মউর নির্ম্মাণ।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৭)

তাছাড়া পান-সুপারিকে অনেক সময় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক হিসাবে দেখা হত। চুয়া, কর্পূর, সুপারি, নানা রকম মসলা সহযোগে পান সাজানোর কথাও মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়।

গৃহস্থালীর দ্রব্য ঃ লোকজীবনের অঙ্গ নানা রকম গৃহস্থালীর উপাদান, সাজসরঞ্জাম, কৃষিজ উৎপাদন যন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র , বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার মনসামঙ্গল কাব্যে আছে। গৃহাস্থলীর দ্রব্য হিসাবে হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, ঘটি, চাড়ি, পাতিল, সরা, প্রদীপ, ডাবর, ঝারি, খুরি, বাটা, চালুনি, পিকদানী, করণ্ডি বা সাজি, ডালা, ধুচুনি, কুলা, চুপড়ি, কাঠা, খুচি, উনান, কাটারি, ব্যজনী বা পাখা, পিঁড়ি, দড়ি, সেচনি, পাটা, ছাতা, ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। নারায়ণ দেবের কাব্যে দেখি লখীন্দরের বিবাহে তাকে থালায় খেতে দেওয়া হয়েছে –

"একে একে বর্জিত কৈলা লক্ষিন্দর
ভাল অন্য আনিঞা থালের উপর॥" (নারায়ণ / ৫১)

বিপ্রদাসের কাব্যেও থালার ব্যবহার দেখি, যেমন–"হস্ত পাখালিল বধূ থালের উপর।"(বিপ্রদাস/১২৯)

কুম্ভ বা কলসী জলপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। বাঙালী বধূরা কাঁখে করে জল আনত –

"পুনরপি পদ্মাবতী বধূ-রূপ হইয়া
কাঁখে কুম্ভ করি বলে চাঁদো কাছে গিয়া।" (বিপ্রদাস/১৫৯)

ঝারিও জলপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত, যেমন—

"চলিল সুরনারী লইয়া হেম-ঝারি
জল সহে ঘরে ঘরে।" (ঐ/৪১)

ফুল তোলার জন্য করণ্ডি বা সাজি ব্যবহার করা হত। আমরা জানি শিবঠাকুর মনসাকে ফুলের করণ্ডিতে করে লুকিয়ে এনেছিল, পার্বতী করণ্ডি থেকে মনসাকে আবিষ্কার করে –

"এহার তরে কপাট বান্ধিয়া গেলা আজি।
সকল ফুল তুলিয়া ভাঙ্গিব ফুলের সাজি॥" (বিজয় / ৪৬)

ঘট একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, জলপাত্র হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও পূজা-পার্বণে ঘট ব্যবহার করা হত। বিপ্রদাসের কাব্যে পদ্মাপূজায় ঘটের ব্যবহার আছে। যেমন—

"সুবর্ণের ঘটে দিবা সিজের পল্লব।" (বিপ্রদাস/৮৮)

হাঁড়ি বা পাতিল একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। রন্ধনকার্যে হাঁড়ির ব্যবহার করা হয়। পূর্ববঙ্গের ভাষায় তাকে 'পাতিল' বা 'পাতালি' বলে. বংশীদাস তার উল্লেখ করেছেন –

"এক মুখে দিল জ্বাল. নয় মুখে শোভে ভাল,
বসাইল নয়টি পাতালি।" (বংশীদাস/১০৬)

পিঁড়ি বসার আসন এবং গাড়ু আঁচানোর জলপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ভোজনকালে সমস্ত পরিপাটি করে সাজিয়ে দেওয়া হত, যেমন –"থাল গাড়ু পিঁড়ি দিল ভোজনের তরে।" (ঐ/১০৭)

চালুনি একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও এর প্রয়োজন হয় —

"সুবর্ণের চালুনবাতি মেনকা লৈঞা রঙ্গে
জামাতা বরিতে যায় রাইহোগণ সঙ্গে॥" (জগজ্জীবন / ১৯৩)

তাছাড়াও জাঁতি, সাঁড়াশি, বাটি ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়, যেমন –"কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান।"(ক্ষেমানন্দ/ ২৫৬), কিংবা, "সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াশি।" (ঐ), কিংবা, 'তিয়ড়ি' বা উনুনে রান্না করা হত, যেমন— "তিন নারিকেল দিয়া সাজাল্য তিয়ড়ি।" (ঐ)। তাছাড়া তরাজু, ডালা, কোদাল, ছাতা, ভাঁড়, দড়ি ইত্যাদির কথা আছে। যেমন ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে রাখাল বালকদের মনসাপূজা উপলক্ষে নানা দ্রব্যের কথা পাই –

"ছেলি ভাঁড় ছাতা বাড়ি : শিরেতে লইয়া কড়ি : উপনীত বুড়ীর নিকটে।
যতেক রাখাল ভাই : কোদালে চাঁছিয়া ঠাঞি : পূজা করে কচুয়ার তটে॥
... .
মোদক দোকানে বালা : ধরিয়া তরাজু ডালা : কিনিল সন্দেশ মিঠাখণ্ড।
ঝুরি নিল তিন পুয়া: আদেসা সন্দেশ মুয়া : আদসের নিল নব খণ্ড॥" (ঐ/৯৬)

কৃষিকাজের উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের ব্যবহারও আছে মনসামঙ্গলে। সেকালের কৃষিকার্যে ব্যবহৃত উপকরণগুলির মধ্যে দিয়ে চাষবাসের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। চাষের কাজে লাঙল, জোঁয়াল, পাচনি, টোকা, কাঠি, কাটারি, বাকুরি বা বাঁক ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বিপ্রদাসের কাব্যে হাসন-হোসেন কৃষিকার্যে নিযুক্ত; কৃষাণ দিয়ে তারা চাষাবাদ করে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে —

"শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত
চষিতে গমন কৈল বড় হরষিত।
জোয়ালি জুড়িয়া গরু লইল খেদাইয়া
হরিষে চলিল হাথে পাচনি লইয়া।
বুহিতা বাকুড়ি গিয়া দিল দরশন
লাঙ্গল জুড়িয়া চাষ চষে সর্বজন।" (বিপ্রদাস / ৬৩)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে শিবঠাকুরের হাল বওয়া ও চাষবাসের কথা আছে, যেমন –

"সোনার লাঙ্গলে হাল জুড়ে পশুপতি।" (জগজ্জীবন/২২)

অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত সরঞ্জাম, যেমন— তাঁতির তাঁত, কুমারের চাক, ছুতোরের ক্ষুর-বাটালি, জেলের জাল-বঁড়শি, তাছাড়া দা, কাটারি, বটি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। জগজ্জীবনের কাব্যে ডোমেরা বাঁশ ও বেতের কাজের সহায়ক হিসাবে দা ব্যবহার করেছে। যেমন –

"ঋষির বচনে কালু না থাকিল রয়া।
করণ্ডি গঢ়ায় কালু হাতে দাঅ লয়া॥" (ঐ/২৮)

জেলেরা মাছ ধরার কাজে বঁড়শি, খালই, পলই, জাল ইত্যাদি ব্যবহার করত —

"খালই পলই জাল: পাথি পাটা সর্ব্বকাল : হইা বিনু নাহি সম্ভাবনা।" (ক্ষেমানন্দ/১৪৫)

বিজয়গুপ্তের কাব্যে গোদার বঁড়শি ও ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ পাই।

যুদ্ধাস্ত্র : মনসামঙ্গল যুদ্ধবিগ্রহের কাব্য নয়, এবং যুদ্ধ বর্ণনার অবকাশও কম। তবু হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার যুদ্ধ, নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কাব্যে যমযুদ্ধ, সাহে রাজার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের যুদ্ধ, ক্ষেমানন্দের কাব্যে

মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ, কার্তিকের সঙ্গে যাদবগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণ রাজার যুদ্ধের বর্ণনা পাই। ঘটনাগুলি কবি কল্পিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে সেকালে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের কথা পাই, যেমন লাঠি, মুদগর, তীর, ধনুক ইত্যাদি। মধ্যযুগে যুদ্ধে কামান ও বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার যুদ্ধে কামান ব্যবহারের কথা পাই —

"কামানে পুরিয়া গোলা গাড়ির উপর তোলা

সাজে তাহা জত গোলদার।

....

বন্দুকি ধানুকি জত নানা অস্ত্রে বিভূষিত

হাসন হুসেন বেড়ি খানা।" (বিপ্রদাস/৬৯)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে এবং পরবর্তীকালে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধে বোধ হয় জীবাণু যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দ এই যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

"শিবজ্বর-বাণ তবে এড়ে বাণরায়।

অস্থির হইলা হরি, জ্বর আইল গায়॥

জ্বরেতে অস্থির বড় দেব দামোদর।

বিষ্ণুজ্বর-বাণ এড়ে তাহার উপর॥" (ক্ষেমানন্দ/২১৯)

সাজ-সজ্জা ঃ মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোকজীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা বা অলঙ্কার, প্রসাধন ইত্যাদির সুন্দর বর্ণনা আছে এখানে। মধ্যযুগে বাঙালী নারীরা প্রধানত শাড়ী এবং পুরুষরা ধুতি, চাদর, গামছা পরিধান করত। নারায়ণ দেবের কাব্যে 'বস্ত্রবদল' অংশে শাড়ীর কথা পাওয়া যায়। যেমন —

"বার হাতি সণের সাড়ি দিল সদাগর।

তাহারে লইয়া গেল বাড়ির ভিতর॥

পরিয়া সণের সাড়ি দাড়াইল রাণি পাস।

নারায়ণ দেব কয় মনসার দাস॥" (নারায়ণ / ১৮৩)

বিজয় গুপ্তের কাব্যে চাঁদকে ছলনা করতে যাবার আগে মনসা পট্ট বসন পরিধান করে —

"পরিয়া পট বসন অঙ্গে দিব্য আভরণ

দধি লইয়া বিস্তর।" (বিজয়/১৬৯)

ক্ষেমানন্দের কাব্যের বিবরণে আছে—

"যাইতে ওঝার বাড়ী : পরিলা পাটের শাড়ী : সুরঙ্গ সিন্দূর দিয়া ভালে।" (ক্ষেমানন্দ/১৮১)

বস্ত্র হিসাবে গামছার ব্যবহার দেখা যায়। স্নানের সময় গা মোছার বস্ত্র হল গামছা। যেমন —

"স্নান করিলে থাকিতে পার আমার সংহতি॥

গামছা নাহিক মোর এই বাক্য ধর।

এ বুঝিয়া মহারাজা মোরে আজ্ঞা কর॥

... ...

গামছা পাইয়া পদ্মা হরষিত হইল।

ততক্ষণে পদ্মাবতী উঠিয়া লড় দিল॥" (বিজয়/১৬১-১৬২)

পুরুষরা ধুতি নামে এক খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করত, অন্তর্বাস হিসাবে ইজার ব্যবহার করত। যেমন চাঁদের বাণিজ্যবদল অংশের বর্ণনায় - "চটের ইজার দিল চটের পাছরা।" (নারায়ণ/১৮৩)

বিপ্রদাসের কাব্যে হাসান-হোসেন পালায় পাই —

"কামড় খাইল পেটে ইজার ভিতরে॥
আশ্চম্বিতে পেটে জেন পড়ে বজ্রাঘাত।
ইজার চিরিয়া মিনা পেটে দেই হাথ॥"(বিপ্রদাস/৬৪)

নারীরা বক্ষাবরণ হিসাবে কাঁচুলি ব্যবহার করত। যেমন জগজ্জীবনের কাব্যে পাই —

"ভাঙ্গিল পরিধান শাড়ী পাএর নপুর॥
চিণ্ডিলা গলার হার ছিড়িল কাচুল।
ভাঙ্গিল নাকের নথ কর্ণের কর্ণফুল॥" (জগজ্জীবন/৩৯)

আবার মনসার সজ্জা বর্ণনায় পাই — "মঙ্গলিয়া বোড়া দেবীর হৃদয়ে কাঁচুলি।"(বিপ্রদাস/২)
তাছাড়া নারীরা ঘাঘরা, সায়া ইত্যাদি ব্যবহার করত। ধনীরা সুন্দর করে বিছানা সাজিয়ে বাসগৃহের সৌন্দর্য বাড়াত। উৎসব-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হত। যেমন চাঁদ সদাগর মনসা পূজার সময় আপন নামে চাঁদোয়া সেলাই করে মনসার উপরে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল—

"আপনার নামে চান্দো সিয়াই চান্দুয়া।
পদ্মার উপরে চান্দো দিলেন টাঙ্গিয়া॥" (ঐ/৩৫৫)

সেকালের শয্যা নির্মাণের কথা পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে। ধনীরা সুদৃশ্য সুরম্য শয্যায় শয়ন করত; খাট-পালঙ্ক, বালিশ, মশারি ইত্যাদি শয্যা নির্মাণের উপকরণ। বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে শয্যা নির্মাণের কথা পাই -

"সাত ভাইয়ের সাত পুরী নানামত রঙ্গি।
তার মধ্যে বালাখানা বেহুলার টঙ্গি।
বিনা দীপে প্রকাশ করয়ে তার তেজে।
চক্র চান্দোয়া ভাল নানা চিত্র সাজে॥
বিছানা করেছে তাহা সোণার পালঙ্কে।
শিয়রে পার্শ্বেতে সগ্রিদা দিয়া নানা রঙ্গে॥
দশাঙ্গ ধূপের ধুঁয়া অগুরু জ্বালিয়া।
কয়রায় টানিয়াছে খোটা জাল দিয়া॥" (বংশীদাস / ১৮২)

মধ্যযুগে পায়ে দেওয়ার জন্য প্রধানত খড়ম ব্যবহার করা হত। নানা ধরনের জুতার ব্যবহার থাকলেও ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ খড়ম ব্যবহার করত। লখীন্দরের বিবাহকালে খড়ম পায়ে দিতে দেখা যাচ্ছে –

"সোণার খড়ম আনি দাসে আগে ধরে।
খড়ম পায়ে দিয়া গেল বরশয্যা ঘরে॥" (ঐ)

লখীন্দরের বিবাহকালে লোহার মাঞ্জসে যে শয্যা নির্মাণ করা হয়েছিল তাতে শীতলপাটির ব্যবহার আছে –

"কাড়য়ারে চারি খুঁটি, বিছানে শীতলপাটী,
লেপ নেহালি নানা রঙ্গে।
লেপ গ্রিদা সুন্দর, বিছানেতে পট্টাম্বর,
শয্যা কৈল সোণার পালঙ্কে॥"(ঐ / ১৬৬)

অতঃপর আসি গহনা ও অলঙ্কারের কথায়; বাঙালী নারীরা অলঙ্কার প্রিয়, মঙ্গলকাব্যে অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষত নারীরা নানা রকম

অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলত। যে সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল,— গলার সুতলি, হার, মাথার মণি, চাকী, বলি, পাসুলি, শাঁখা, মল, কানের দুল বা কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়, নাকের বেশর, নথ বা নোলক, খাড়ু ইত্যাদি। নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় —

"সূর্য্যগুল দুই জেন কর্ণের কুণ্ডল।
সুবন্তের চাকি বলি তাহার উপর॥
গলায়ে পরিল বেউলা নব লক্ষের হার।
বাহুতে পরিল বেউলা সুবন্তের চাইর তাড়॥
আভের কাকৈ দিয়া পাইট কৈল সিথি।
নাসিকা উপরে দিলা রত্ন গজমতি॥
তোড়ল-মল পরিলা নূপুর চরনে।
সংসার মুহিত করে বেউলার সাজনে॥" (নারায়ণ /৪২)

আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশা বা বাইশ কবির মনসামঙ্গলে 'মনসার সর্পসজ্জা' বর্ণনায় সেকালে ব্যবহৃত নানা অলঙ্কারের পরিচয় পাই। হরি দত্তের বর্ণনা অনুসারে —

"বিচিত্র নাগে করে দেবী গলার সূতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী॥
সখিশুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।" (বাইশা/১-২)

জগজ্জীবনের কাব্যে পার্বতীর বিবাহের সাজসজ্জা বর্ণনায় বৈচিত্র্য লক্ষণীয় —

"অরুণ মকর বেঢ়ি যেন শরদ ইন্দু।
চাকি কোঢ়ি মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে॥
নাসিকাতে বেসর যেন মুক্তাফুল দুলে॥
হৃদয়ে কাচুলি পহ্নে দীপ্ত করে জ্যোতি।
মণি মুকুতা পহ্নে প্রবাল গজমোতি॥
চরণে নপুর পহ্নে করে ঝলমল।
দুই চক্ষ শোভা করে কমল উৎপল॥" (জগজ্জীবন /৬৬)

বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে শুধু নারীরাই নয়, পুরুষরাও ব্যবহার করত বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার। লখীন্দরের বিবাহে তাকে নানা রকম অলঙ্কার পরানো হয় —

"বিবাহে কুমার লড়ে   বাপের কৌতুক বাড়ে

নানামতে সাজয়ে কুমার।

সুবর্ণ টোপর মাথে কনক অঙ্গুরি হাতে

গলে মণি মুকুতার হার।

বিরমল খারু পায়ে কনকের খারু তায়ে

সুবর্ণের কুণ্ডল দিল কানে॥" (বিজয়/৩৬৫)

বিবাহকালে টোপর একটি বিশিষ্ট অলঙ্কার, শোলা নির্মিত টোপর ব্যবহার হলেও ধনীরা সুবর্ণ টোপরও ব্যবহার করত। মণি, মুক্তা, প্রবাল, গজমোতি ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ব্যবহার করত অলঙ্কার তৈরীতে। সমাজের সাধারণ মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত, সাধারণ পোশাক ও গহনা ব্যবহার করত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাকড়ি, রসকাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করত। বেহুলা ডোম নারীর বেশ ধারণ করলে –

"রূপার মাকড়ী কানে ঘন ঘন দোলে।

ডাগর রসের কাঁঠি গাঁথ্যা দিল গলে॥" (ক্ষেমানন্দ / ২৮৫)

সাধু-সন্ন্যাসীরা বাঘছাল, কৌপিন, রুদ্রাক্ষ পরিধান করত, কমণ্ডলু ও ত্রিশূল ধারণ করত। অনেকে হাতে খাড়ু ও কানে কুণ্ডল ব্যবহার করত।

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর প্রসাধন ও রূপচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে সিন্দুর, চুয়া, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, অগুরু, কাজল, হরিদ্রা, আলতা, আমলকি, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তেল, তিল তেল, নারায়ণ তেল ইত্যাদি রূপচর্চার জন্য ব্যবহৃত হত। এ বিষয়ে দুটি অন্যতম সহায়ক জিনিস হল দর্পণ ও চিরুণী। যেমন বিজয় গুপ্তের কাব্যে আছে লখীন্দরের রূপচর্চার কথা-

"তিল তৈল আমলকি গিলা হরিদ্রা মিশালি।

লেপিয়া লখাইর অঙ্গে কৌতুকে জল ঢালি॥" (বিজয়/৩৬৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার বিবাহে রূপচর্চার কিছু অংশ —

"হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।

নারায়ণ তৈল দিল তাহার মাথায়॥

সোনার চিরণী দিয়া আঁচড়িল কেশ।

বিবিধ বন্ধানে সভে করে তারা বেশ॥" (ক্ষেমানন্দ/২৫০)

আমলকি, বাটা হলুদ, তিল তেল, চন্দন দিয়ে অঙ্গ মার্জনা করত, অনেক সময় বিশেষত বিবাহকালে পুরুষরাও অঙ্গ মার্জনা করে রূপচর্চা করত। যেমন লখীন্দরের বিবাহে —

"হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাঞ্চনের জুতি।

পরিধান করিল হরিদ্রাযুত ধুতি॥

মকর-কুণ্ডল কানে ঘন ঘন দোলে।

প্রবাল মুকুতা হার-শোভে তার গলে॥" (ঐ/২৪৮)

নারীরা নানা ছাঁদে খোপা বাঁধত, কেশ বিন্যাস করত, যেমন দেবখণ্ডে দুর্গার বিবাহে —

"কাকোই আনিয়া দুর্গার আচুড়িল কেশ॥

বান্ধিল মাথার কেশ দেবী নানা ছন্দে।

অমূল্য সোনার ঝাপা পৃষ্ঠ-পরে বান্ধে॥" (জগজ্জীবন/৬৬)

বাঙালী নারীরা কত রকমের খোঁপা বাঁধতে পারত তার বর্ণনা দিয়েছেন নারায়ণ দেব, যেমন— 'বাঙ্গালি বেহার', 'নবেহার', 'দেবমহল' 'পচিমা বেহার' ইত্যাদি। কবির বর্ণনায়—

"বাঙ্গালি বেহার খোপা লাগিল বান্ধিতে।
... ...
নববেহার খোপা না দেখিয়া ভাল।
দেবমহল খোপা লাগে বান্ধিবার॥
পচিমা বেহার খোপা ঊষার ভাতি।
কেসের গোড়েতে দিল সোনা রূপার পাতি॥" (নারায়ণ /৪২)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই নারায়ণ তেল ব্যবহারের কথা —

"সুবর্ণ চিরণী লয়্যা : নারায়ণ তৈল দিয়া : বন্ধানে বান্ধিল কেশভার।" (ক্ষেমানন্দ/১৫৩)

মেয়েরা মাথার খোপায় ফুলের মালা পরিধান করত, যেমন —

"জাতী যূথী দেহ মোরে গন্ধরাজ চাঁপা।
মালাপুষ্প দেহ মোরে রঙ্গে বান্ধি খোঁপা॥" (ঐ)

নারীপুরুষ উভয়েই ধূপের ধোঁয়া দিয়ে চুল শুকাত, চুলে অগুরু, চন্দন, কস্তুরী মাখত। যেমন –

"আগর চন্দন চুয়া কস্তুরি বিশেষ।
ধূপের ধুয়া দিয়া শুখায়ে মাথার কেশ॥" (বিজয়/৩৬৩)

মেয়েরা চোখে কাজল ব্যবহার করত, কালনাগিনী তাই মনসার চোখের কাজল হয়েছে। যেমন –

"কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।" (বিপ্রদাস/২)

শিল্পকর্ম ঃ মধ্যযুগের লোকসমাজের মানুষ তাদের বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পবস্তু তৈরী করত। মনসামঙ্গলে মধ্যযুগীয় বাঙালীর শিল্প দক্ষতার পরিচয় আছে তাদের ব্যবহার্য শিল্প উপকরণে, যেমন— আসন তৈরী করা, শোলার কাজ, কাঁথা তৈরী, সূচিশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যে দেবীর কাঁচুলি নির্মাণ একটি বিশেষ প্রসঙ্গ; বাঙালী নারীরা ঘরে বসেই রঙবেরঙের সুতার সাহায্যে চিত্র অঙ্কন করত, কাঁচুলি নির্মাণে তার পরিচয় পাই –

"বিচিত্র কাঁচুলি তবে করিল নির্মাণ।
এ তিন ভুবনে জত বৈসে চরাচর
দেবাসুর নাগ নর লিখিল সকল।" (ঐ/১১)

নক্শীকাঁথা ও কাঁচুলিতে লতাপাতা, ফুল, পশুপাখি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী সুঁই সুতার কারুকার্যে চিত্রিত হত। কার্পাস, রেশম, পাটের আঁশ থেকে তৈরী হত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র— শাড়ী, চট, চাঁদোয়া, পাছড়া, মশারি, দুলিচা, বিছানা, পালঙ্ক-পোষ, সামিয়ানা, বালিশ ইত্যাদি। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যবদল বর্ণনায় এরকম বর্ণনা পাচ্ছি —

"চটের কাবাই দিল চটের কমরবেড়া।
চটের ইজার দিল চটের পাছড়া॥
আউট গজ খুঞিয়া দিয়া মাথায় বান্দিল।
বোকড়া পিন্দিয়া রাজা বড় হরসিত হৈল।" (নারায়ণ/১৮৩)

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণেও এর বিস্তৃত পরিচয় পাই —

"দিঘল পসর যত বড় বড় গড়া।
চিত্র বিচিত্র যত রাঙ্গা পাটের ডুরা॥
রাঙ্গা পাটের থুপ ফুল সারি সারি।

চটের চান্দোয়া খসায় চটের মশারি॥
চটের দুলিচা খসায় চটের বিছান।
চটের তাবুগ্রিদা খসায় আর সামিয়ান॥
চটের পালঙ্কপোষ চটের বন্দিস।
চটের ইজারবন্দ চটের বালিশ।" (বংশীদাস/১৩৪)

বাংলার বস্ত্রশিল্প কত উন্নত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষেমানন্দের কাব্যে। বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, যেমন ক্ষীরোদ, তসর, ক্ষোম, রতন, অম্বর, রেশমী, তসর, সোনাগাই, পট্টবাস ইত্যাদির উল্লেখ আছে এখানে। বাংলার মসলিন এক সময় বিখ্যাত ছিল, যেমন মনসা পরিহিত শাড়ী মসলিন হতে পারে। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় –

"বহুত বসন লয়্যা ধরিল যোগান॥
ক্ষীরোদ তসর ক্ষোম রতন অম্বর।
না ভায় দেবীর মনে রেশমী তসর॥
সোনাগাই পট্টবাস পেলাইল দূরে।
আপনে বাছিয়া বস্ত্র বিষহরি পরে॥
রূপার পড়্যান তার হেম গুণাটান।
বিশ্বকর্ম্মা বুন্যাছিল সেই বস্ত্রখান॥
মাপিলে শতেক হাথ সমান বসন।
মুঠিতে রাখিতে পারে গুড়াই যখন॥
... ...
লইল সুরঙ্গ বস্ত্র আপন ইচ্ছায়।
সূর্য্যের কিরণ হেন জুতি করে গায়॥" (ক্ষেমানন্দ/১৫৩)

শোলার টোপর নির্মাণ বাংলার একটি বিশেষ কারুশিল্প। প্রসঙ্গত স্মরণীয় টোপর নির্মাণ মঙ্গল কাব্যের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। বাংলার শিল্পীরা শোলার শিল্পে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল তার পরিচয় পাই মনসামঙ্গলে। প্রধানত মহিলারা ঘরে বসে এই শিল্পকর্ম করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মহিলা শিল্পী কাজলা মালিনীর কথা পাওয়া যায়। লখীন্দরের বিবাহ উপলক্ষে টোপর নির্মাণের বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ লিখেছেন —

"কাজলারে ডাক্যা সাধু তারে দিল পান।
কাজলা মাল্যানী করে মউর নির্ম্মাণ॥
নানা চিত্র করে তায় লিখে নানা ফুল।
সোনার টোপর করে হেম সমতুল॥
... ...
মউর আনিঞা দিল সাধু-সন্নিধান
নানা ধনে সাধু তারে করিল সম্মান॥" (ঐ/২৪৭)

শোলার বিভিন্ন গহনা অর্থাৎ সাজসজ্জা বা ডাকের সাজ তৈরী বাংলার বিশিষ্ট শিল্প, এছাড়া অলঙ্কার শিল্প, শঙ্খশিল্প, অলঙ্করণ শিল্প, কারুকার্যময় বস্ত্র নির্মাণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। লখীন্দরের বিবাহকালে কারুকার্যময় পাটের শাড়ী, কারুকার্যময় শঙ্খ, চিরুণী উপহার দেওয়া হয়েছিল। যেমন -

"অধিবাসের দির্ব করি বিবিধ প্রকার।
সুন্দর পাটের সাড়ি নানা অলঙ্কার॥

বিচিত্র নির্মাণ শঙ্খ কনক-চিরনি।
সুবর্ণ-সাপুড়া পুরি নানা রত্ন মণি॥" (বিপ্রদাস/১৭৮)

সোনারূপার গহনা রাখার জন্য কারুকার্যময় সাঁপুড়া বা কৌটা তৈরী করা হত। বাঁশ ও বেতের কাজ বাংলার প্রাচীন কুটীর শিল্প। বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী পুরুষরা বাঁশ ও বেত দিয়ে গৃহস্থালীর উপযোগী ডালা, কুলা, ঝাঁপি, সাজি, তালপাতার পাখা বা বিয়নী, ধুচুনি, চুপড়ি তৈরী করত। বিপ্রদাসের কাব্যে বিয়নী ও টোকা তৈরীর কথা পাই। বংশীদাসের কাব্যেও খাগ কেটে বিউনি বোনার বিবরণ আছে। যেমন –

"শুনিয়া বেহুলা বাণী, পাছে লখাই পাটনী,
বিউনি বোনে কাঁচা খাগ আনি।
লখায়ের আদেশ পায়্যা, খাগ আনে কাটিয়া,
বেতি তুলি বুনিল বিউনি॥" (বংশীদাস/২৪২)

নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবনের কাব্যে ব্যজনী বা বিচনি নির্মাণের কথা আছে –

"কামিলা বন্ধানী : গড়িছে বিয়নী : শুধু সুবর্ণের ডাঁটি
বিয়নী দেখিয়া : স্থির নহে হিয়া :পবন মানিল ভাটি॥"(ক্ষেমানন্দ/২৮৪)

সাধারণত ডোম ও বাগদীরাই বাঁশ ও বেতের কাজ করত, ক্ষেমানন্দের কাব্যে ডোমনী বেশধারী বেহুলা ছদ্ম পরিচয়ে বলেছে—

"অতি কুলহীন মোরা হই ডোম জাতি॥
ধুচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি ডালা।
সিয়নী বিয়নী বুনি আর বুনি কুলা॥
নগরে বেচিয়া বুলি জাতি অনুসারে।" (ঐ/২৮৬)

জগজ্জীবনের কাব্যে ডোমের সাজি বা করণ্ডি তৈরীর প্রসঙ্গ পাই –

"চিরিয়া বাঁশের পোর করিলেক পাতি।
গঢ়িয়া করণ্ডিখানি বান্ধিলেক বাতি॥
তলে তিন খুরা দিল ধরিবার কান্ধে।
করণ্ডি লইয়া গেল ঋষির সাক্ষাতে॥" (জগজ্জীবন/২৯)

আলপনা অঙ্কন নারীদের বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। উৎসব, পূজা-পার্বণ, বিবাহ উপলক্ষে মণ্ডপে, ঘরের বারান্দায়, পিঁড়িতে মেয়েরা আলপনা অঙ্কন করত। ব্রতাচারের বিশিষ্ট অঙ্গ আলপনা অঙ্কন। পশু, পাখি, লতা, পাতা, ফুল ছাড়াও ব্রতের কামনানুযায়ী আলপনা শিল্পের বিশেষত্ব ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে আলপনা অঙ্কনের কথা পাই —

"ছবি চিত্র আলিম্পনা দেখিতে সুন্দর।
সিজের পল্লব দিল ঘটের উপর॥" (বিপ্রদাস/২২৯)

তাছাড়া উদ্যান নির্মাণ, গৃহনির্মাণ ইত্যাদিতে বাঙালীর কৌম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। চাঁদের বাগান-নির্মাণ, জগজ্জীবনের কাব্যে শিবের উদ্যান-নির্মাণ কিংবা স্বর্গের দেবমন্দির-নির্মাণ, লখীন্দরের বাসরঘর- নির্মাণ, মন্দির-নির্মাণে বাঙালীর গৃহনির্মাণ পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। স্তম্ভ করা, চৌকাট, কপাট, প্রাচীর তৈরী, ছাদের উপর সুবর্ণ কলস স্থাপন, নেতের পতাকা দেওয়া মধ্যযুগীয় বাস্তুবিদ্যা ও লোকায়ত শিল্পরীতির পরিচায়ক। মৃৎশিল্প বাংলার বিখ্যাত শিল্প, তার পরিচয়ও ঐতিহাসিক।

বাদ্যযন্ত্র ঃ বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রাচীনকাল থেকেই জনসমাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, নবজাতকের জন্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। মনসামঙ্গলে বিভিন্ন

প্রকার বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন - ঢাক, ঢোল, বীণা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, শিঙ্গা, করতাল, বেণুবীণা, বাঁশি, পিনাক, সাহিনী, কবিনাস, সপ্তস্বরা, মোহরি, ঝাঁঝর, নূপুর, দুন্দুভি, মরুজ বীণা, ঘন্টা, বিষাণ, ভেরী, রবাব, পাখোয়াজ, মন্দিরা ইত্যাদি তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র, ধাতব বাদ্যযন্ত্র, চামড়া আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র ও বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন মনসার বিবাহ উপলক্ষে উল্লিখিত নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র –

"দুন্দভি মরুজ পড়া বীণা করতাল।
ঝাঝরি মুহরি বাজে মৃদঙ্গ রসাল॥
ভেউর করনাল বাজে ডিণ্ডিম কাহাল।
দুসরি বাজয়ে ঘন অতি সে রসাল॥
কপিলাস ঘন্টা আর বাজয়ে মন্দিরা।
দুসরি মঙ্গলা আর বাজে সপ্তসরা॥" (বিপ্রদাস/৪৩)

লখীন্দরের বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাওয়া যায় জগজ্জীবনের কাব্যে, যেমন —

"নানা জাতি বাদ্য বাজে থরে থরে বাদ্য সাজে
দামা ভেউর বাজে করতাল।
জোড়া পঢ়া বীণা বাঁশী দগড় মান্দল কাসি
শঙ্খ শিঙ্গা মৃদঙ্গ করনাল॥
ঢাকা কাঢ়া আর ঢোল মহাশব্দে গণ্ডগোল
বেণু বীণা পিনাক সাহিনী।
কবিনাস সপ্ত স্বরি স্বর মণ্ডল মোহরী
বাজে বাদ্য দশ অক্ষৌহিণী॥" (জগজ্জীবন/১৭৮)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও মনসার বিবাহে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় –

"ঘন বাজে জয়ঢোল : ঝনঝন ঝিকিরোল : দামা দড়মসা জয়ঢাক।
বাজে শঙ্খ সিন্ধুয়ান : কাঁসি বাঁশী খরসান : পাখাজুয়া দেই ঘন পাক॥
রসাল মৃদঙ্গ পড়া : সানি বেণী বাজে কাড়া : রবাবীতে রবাব বাজায়।
সঘন ফুকরে ডম্ফ : ভূতল হইল কম্প : কিন্নর কিন্নরী গীত গায়॥"(ক্ষেমানন্দ/৭৮)

যুদ্ধবিগ্রহ ও শোভাযাত্রাকালে রণবাদ্য বাজানো হত; ঢাক, ঢোল, কাঁসি, দামামা, রামশিঙ্গা, দগড়, সানাই, জগঝম্প ইত্যাদি রণবাদ্য হিসাবে চিহ্নিত। যেমন নারায়ণ দেবের কাব্যে চন্দ্রধরের সঙ্গে সাহে- রাজার যুদ্ধ অংশে —

"দামামাতে বাড়ি পরে মেঘের গর্জনে।
ঢাক ঢোল বাড়ি পড়ে না সুনি শ্রবণে॥" (নারায়ণ/২৫২)

অথবা — "রণ জিনিয়া চান্দো বাজায় ঢাক ঢোল।" (ঐ /২৫৩)

অথবা — "জয়ঢাক চান্দো বাজায় কুতুহলে।" (ঐ)

বিবাহ বা উৎসব অনুষ্ঠানে বাজী পোড়ানো হত। বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রীদের সঙ্গে বাজী পোড়াবার জন্য বাজীকররাও সমবেত ছিল। চরকি, তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি বাজীর বিবরণ পাওয়া যায় –

"বাজী ভরি প্রচুর নড়িল বাজীকর
হাউই মন্দীরে বাজী দীপক প্রচুর॥
ভূঁইচাপা তুবড়ি চরখি অগণন।
চাদর লইল কুমুরিকা অসংখ্যন॥" (বিপ্রদাস/১৮৪)

যানবাহন ঃ এরপর আসা যাক্ যানবাহনের কথায়, মধ্যযুগীয় সমাজে যে সমস্ত লোকযান ব্যবহৃত হত তার কথা জানা যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। প্রধানত দু'ধরনের যান ব্যবহৃত হত, নৌযান বা জলযান এবং স্থলযান। জলযান হল নৌকা এবং ভেলা বা মাঞ্জস আর স্থলযান হল গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পালকী, চতুর্দোল ইত্যাদি। মনসামঙ্গলে অত্যন্ত সুপরিচিত হল চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী। চাঁদ সদাগরের বৈদেশিক বাণিজ্য সুদূরকালের স্মৃতি বিজড়িত হলেও বাণিজ্য ও যাতায়াতের অন্যতম যানবাহন নৌকা এবং বাণিজ্য জাহাজ বলতে বড় বড় পালতোলা নৌকাকে বোঝাত। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকার ব্যবহার অত্যন্ত সুলভ। মনসামঙ্গলের কবিগণ চাঁদ সদাগরের চৌদ্দডিঙা বাণিজ্য তরীর পরিচয় দিয়েছেন, কোথাও বা সপ্তডিঙা মধুকরের বর্ণনা দিয়েছেন। বিপ্রদাসের বর্ণানুসারে-

"গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে।
অনেক ছাগল করিয়া বলিদানে॥
... ...
দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্বজয়া।
দু-লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া॥
তৃতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে জগদ্দল।
বারো বরিষের ধরে তণ্ডুল সম্বল॥
চতুর্থ মেলিল ডিঙ্গা নাম সুমঙ্গল।
জার রূপে দুই কূলে হইল উজ্জ্বল॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে নবরত্ন।
জার রূপ দেখিতে দেবের হয় যত্ন॥
সষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে চিত্ররেখা।
জার ধনে আদি অন্ত নাই লেখা জোখা॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নামে শশিমুখী।
বহু দূর হৈতে যার ছইঘর দেখি॥" (ঐ/১৪২)

বংশীদাসের কাব্যে চৌদ্দডিঙা বাণিজ্যতরীর নাম পাওয়া যায়, যেমন – মধুকর, শঙ্খচূর, রত্নসাত, খরসান, দুর্গার, আগলপাগল, চৌয়াঠুটী, লক্ষ্মীপাশা, উদয়তারা, মাণিক্য, মেড়ুয়া, চন্দনপাট, কাজলরেখি, হংসবল, সাগরফেণা ইত্যাদি। এগুলি থেকে সেকালে জলপথে যোগযোগের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। সাধারণ মানুষ খেয়া তরীতে পারাপার করত; ডোম ও পাটনীরা খেয়া পার করত, মনসামঙ্গলে তার বিবরণ আছে। জলযান হিসাবে ভেলা বা মাঞ্জসের ব্যবহার অতি প্রাচীন। সাধারণত কয়েকটি কলাগাছ পাশাপাশি সাজিয়ে আড়াআড়ি ভাবে একটি বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে ভেলা তৈরী করা হয়। মনসামঙ্গলে ভেলা ব্যবহারের কথা পাওয়া যাচ্ছে; বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে ভেলার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হলে বেহুলা বলেছে —

"মাজষ ভাসাএ আমা দেও ভাসাইয়া।
মনসা গোচরে জাবো মৃত পতি লইয়া॥" (ঐ/২০৫)

ভেলা পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'ভুরা' নামে পরিচিত। নারায়ণ দেবের কাব্যে ভুরার কথা পাই। চাঁদসদাগর লখীন্দরকে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছে —

"ভুরা ভাসাইয়া দিল তিন ঢেউ পানি।
খায়াছিনু তোর ধার লইয়া জাও কানি॥" (নারায়ণ/৯১)

স্থলযান হিসাবে চতুর্দোল ব্যবহার হত। অভিজাত ধনী ঘরের নারী-পুরুষরা চতুর্দোল ও পালকী ব্যবহার করত।

বেহারারা কাঁধে করে পালকী ও চতুর্দোল বহন করত। বিবাহ, উৎসব অনুষ্ঠানে চতুর্দোল ব্যবহৃত হত। লখীন্দরের বিবাহে চতুর্দোল সুসজ্জিত করা হয়েছে –

"চারু চতুর্দোলে নানা প্রকারে সাজিয়া।
ছত্রিশ আশ্রমে নড়ে তথি আরোহিয়া॥" (বিপ্রদাস/১৭৮)

জগজ্জীবনের কাব্যে দেবখণ্ডে দুর্গার বিবাহে চতুর্দোলে দুর্গাকে বের করা হয়েছিল - "চৌদোলে বাহিরায় দুর্গা মোহিনী-আকার।" (জগজ্জীবন/৬৬)। বেশীরভাগক্ষেত্রেই স্থলপথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ী, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। জগজ্জীবনের বর্ণনানুসারে —

"রাজপথে সরোবর বন ঝাড় নহে।
নিরন্তর হস্তী ঘোড়া পথ দিয়া বহে॥" (জগজ্জীবন/১৭০)

কিংবা, বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহ যাত্রাকালের চিত্র —

"হস্তীর উপরে ভর, সাজিলেক, লখিন্দর,
বিবাহ করিতে হরষিতে।
নট ভাট ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি কুটুম্বগণ,
বেড়িয়া চলিছে সমুদিতে॥
হস্তী ঘোড়ায় রথে, সবে চলে হরষিতে,
পায়েতে হাঁটিয়া কেহ যায়।
চৌদল পালঙ্ক ভাল, শতে শতে লোক পাল,
কেহ চলে সুবর্ণ দোলায়॥
....
পার হইয়া নদ-নদী, নায়ে চড়ে নিরবধি,
স্থানে স্থানে যায় লোক বৈয়া।" (বংশীদাস/১৭০)

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানঃ অতঃপর আসা যাক্ সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির আলোচনায়। মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, লোকাচার যুগ যুগ ধরে প্রচারিত ও প্রতিপালিত একটি সমাজ-মানসের সমন্বিত রূপ। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে একটি সামগ্রিক জাতি সত্তা। এই উপাদানগুলিকে সমাজ ইতিহাসের অন্তর্গত করা যেতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালী মানসের এই রূপ আনুপূর্বিক বিবৃত হয়েছে। সমাজ ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে উপাদানগুলি আলোচিত হল।

তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলে এই সংস্কার-বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ বাংলাদেশের ছবি পাওয়া যায়। হাঁচি-জিটির বাঁধন, কাকের ডাক, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক্, মারণ-উচাটন, বশীকরণ-সম্মোহন, তান্ত্রিকতার বাঁধন ছিল পদে পদে। পাঁজি-পুথির প্রতি এক জাতীয় বিশ্বাস কাজ করেছিল, স্বপ্নদর্শন, অভিশাপ, আশীর্বাদ এসবের প্রতি আস্থা ছিল প্রবল। অদৃষ্টবাদী বাঙালী হাঁচি-টিকটিকির বাঁধনকে বিশ্বাস করত, এসবের দ্বারা তাই শুভাশুভ নির্ধারিত করত। যেমন বিপ্রদাসের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রাকালে 'জেটী' অর্থাৎ টিকটিকির ডাক অমঙ্গল নির্দেশ করে। কবির কথায় —

"হাঁচি জেটী পড়ে জবে যাত্রা করে রায়
সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়।" (বিপ্রদাস/১৪০)

শুধু তাই নয়, যাত্রাকালে বাম দিকে কালসাপ, দক্ষিণ দিকে শৃগাল দেখা অমঙ্গলসূচক। ক্ষেমানন্দের কাব্যেও চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে হাঁচি-জেটীর বাধা পড়ে —

"এত বলি সনকায় : সাধু সফরেতে যায় : পাছে পড়ে হাঁচি জেঠী বাধা।" (ক্ষেমানন্দ/২২৩)

মাথার উপর শকুনি বা গোধিকা ডাকা অমঙ্গল সূচক, যেমন –

"নাসিকা পরশ করি যাত্রা করে অধিকারী।
সুবর্ণ ঘট পড়িল টলিয়া।
চরণে উঝটি লাগে সগুনি আইল আগে
শৃগাল যায় দক্ষিণভাগে॥" (জগজ্জীবন/১২৫)

লখীন্দরের বিবাহ যাত্রাকালে মাথার উপর গোধিকা ডাকে –

"গমনে গোধিকা ডাকে মস্তক-উপর॥
দৈবের কারণে তাহা কেন নাঞি শুনে।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৮)

এসব পশুপাখি-কেন্দ্রিক সংস্কার ছাড়াও আছে অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক সংস্কার, যেমন — হাঁচি পড়া, অঙ্গ-স্পন্দন ইত্যাদি। আবার আছে ঘটনা-কেন্দ্রিক সংস্কারও, যেমন— যাত্রাকালে হোঁচট লাগা, চোখে কানামাছি পড়া, মাথায় ঘরের চাল ঠেকা অশুভকর বা অযাত্রা। আবার দিন বা বার-কেন্দ্রিক সংস্কারও আছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদের বাম নাকে শ্বাস বয়, বাম চক্ষু স্পন্দিত হয়, যা অশুভকর। তাই সনকা চাঁদ সদাগরকে যাত্রা-অযাত্রা সম্পর্কে সাবধান করে দেয় —

"চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সফর
হরসিতে করিল গমন।
বাম নাকে বহে সর প্রাণ করে ধরপড়
বাম চক্ষু কম্পীঞে ঘন ঘন॥
দুই হস্তে জোড় করি বোলে সোনাঞী সুন্দরী
শুন প্রভু নারির বচন।
এহিত বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে জায় জেবা নরে
জাতি প্রাণ না রহয় ধন॥
এহি রবিবার দিনে লঙ্কার রাজা রাবণে
মদগর্ভে সিতা কৈল চুরি।
ধনে বংসে সংহার শ্রীরামে করিল তার
সমবারে পড়িল দসগীরী॥
মঙ্গল বুধ দুই বার দুই করী বোলে সংসার
ইয়াতে জে জায় সফরে।
ধনে বংসে নিদ্ধণ কয় জত মুণীজন
ভাগ্যে সে তাহার প্রাণ ধরে॥" (নারায়ণ/১৫৬-১৫৭)

পক্ষান্তরে মঙ্গল নির্দেশক লক্ষণও পাওয়া যায়, যেমন যাত্রাকালে জ্বলন্ত প্রদীপ, জলপূর্ণ ঘট, সুগন্ধি ফুল, উতলানো ভাত, তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র, কচি ধানের চারা দেখা ইত্যাদি। আবার ডান চক্ষু স্পন্দিত হওয়া শুভ ঘটনার নির্দেশক। বেহুলা দেবলোকে যাত্রাকালে কতকগুলি মঙ্গলসূচক চিহ্ন নির্দেশিত করে যায়, যা দেখে সকলে মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝতে পারবে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলা সনকাকে বলেছে —

"কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া।
শাশুড়ীর তরে যায় বিশেষ বলিয়া॥

কড়ার তৈলেতে দীপ ছমাস জ্বলিবে।
তবে সে জানিবে মনে লখীন্দর জীবে॥
সিজানা ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত বসিয়া পাবে ঘরে॥
. . .   .
অঙ্গারে বাসর ঘরে ময়ূর লিখিয়া।
শাশুড়ীর তরে যায় বিশেষ বলিয়া॥
ছয় মাস বই যদি শিখী পুচ্ছ ধরে।
তবে সে জানিবে মনে প্রভু আইসে ঘরে॥"   (ক্ষেমানন্দ/২৬১)

যাত্রাকালে মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করা হত, সম্মুখে মঙ্গলঘট স্থাপন করা হত, যেমন —

"যাত্রা করি পাটনে চলেন মহাশয়।
সমুখেতে পূর্ণ ঘট করি আরোপণ
পুরোহিতগণ বেদ করে উচ্চারণ।
নানা বাদ্য হুলাহুলি করে শঙ্খধ্বনি
যাত্রা করিয়া চলে চাঁদো নৃপমুনি।"   (বিপ্রদাস/১৪০)

এ ছাড়াও বহু রকমের সংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল, যেমন— ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাই গোয়ালে খাবার খাওয়া, গরু-বাছুরকে ঝাঁটা নিক্ষেপ করা, মাথায় কাপড় না দিয়ে গোয়ালে যাওয়া, চালের বাতা ধরে ঝোলা অমঙ্গল সূচক (ক্ষেমানন্দ/৩৪)। আবার গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অশূদ্রের নীল বস্ত্র পরিধান করা, কুইলা বলদ গোয়ালে রাখা পাপ বলে বিবেচিত হত। বিষ্ণু পালের কাব্যে তাই উষা মনসাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়েছে জন্মান্তরে মনসা তাকে দিয়ে এসমস্ত কাজ করাবে না। কবির বর্ণনানুসারে —

"গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে।
তুমি না তরাল্যে বাছা সেই পাপ ধরে॥
শূদ্র না হইঞা যেবা নীল বস্ত্র পরে।
তুমি না তরাইলে বাছা সেই পাপ ধরে॥
কুইলা বলদ যেবা রাখিবে গোহালে।
তুমি না রাখিলে বাছা সেই পাপ ধরে॥"   (বিষ্ণুপাল / ৬৫)

স্বপ্নদর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হত এবং সত্য বলে মনে করা হত। তাই দেখা যায় চাঁদকে দেবী চণ্ডী স্বপ্নে যে নির্দেশ দেয় তা পালন করতে চাঁদ-মনসার শত্রুতা শুরু হয়। চাঁদের ছয় পুত্রবধূ রাত্রে অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন দেখে— এক ভীষণাকৃতি পুরুষ ছয় ভাইকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বপ্ন সত্যি হয় ছয় পুত্রের মৃত্যুতে।যেমন—

"বধূগণে বলে, 'মাতা, শুনহ বচন।
রাত্রিশেষে মোরা আজি দেখিলাম স্বপন॥
কালবর্ণ পুরুষ এক হাতে দীর্ঘ কুড়ি।
তামার শলা হেন চুল, দেখি গোঁপ-দাড়ি॥
পরিধানে বস্ত্র নাই, বিপরীত অঙ্গ।
বিপরীত বেশ তার, হাতে লোহার শার্ঙ্গ।
. . .   .

আচম্বিতে হেন স্বপন দেখিলাম বিকট।
মনে বড় ভয় বাসি বড়ই সঙ্কট॥" (বাইশা/১২১)

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা চাঁদ সদাগরকে ভয়ানক স্বপ্নদর্শন করিয়েছে, এতে চাঁদ সদাগর অত্যন্ত ভীত হয়েছে এবং ধন্বন্তরি ওঝার কাছে ব্যক্ত করেছে —

"জ্ঞানহত শোকাকুলি আছিনু শয়নে
দেখিনু কুচ্ছিত স্বপ্ন মহাভয় মনে।
নাগরূপা কন্যা এক বসিয়া শিয়রে
প্রচুর ভূজঙ্গে সঙ্গে অতি ভয়ঙ্করে।
অধিক বাড়িল ত্রাস হইনু মূর্ছিত
ইহার উপায় ওঝা করহ তুরিত।
প্রাণতুল্য নাখরা জিয়ায়্যা দেহ মোরে
তবে যে হইব স্বাস্তি মোর কলেবরে।" (বিপ্রদাস/৯৫)

বাঙালী আজন্ম জন্মান্তরবাদী, তাই জন্মান্তরের প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং একারণে দৈববাদ তাদের নিয়ন্ত্রিত করত। চাঁদ সদাগর জন্মান্তরেই মনসার সঙ্গে বিবাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেহুলা জন্মান্তরেই মনসার পূজা প্রচারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্বজন্মের কথা মনে করা যায় অর্থাৎ জাতিস্মর হওয়া যায় বলে বিশ্বাস ছিল। আবার আশীর্বাদ ও অভিশাপের প্রতিও বিশ্বাস ছিল। সাধারণত ধান-দূর্বা দ্বারা আশীর্বাদ করার রীতি প্রচলিত ছিল। গুরুজনদের আশীর্বাদ যেমন ফলপ্রসূ তেমনি অভিশাপও ভয়াবহ হত। তাই মনসামঙ্গলে মনসার অভিশাপে ঊষাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আবার দেখি বেহুলাকে বিধবা ব্রাহ্মণী বেশধারী মনসা যে অভিশাপ দেয় তাও সত্যে পরিণত হয়েছে।

তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ-উচাটন, বশীকরণ-সম্মোহন, ঔষধীকরণ, ঝাড়ফুঁক-তুক্‌তাক্ এসবের প্রতি মানুষের এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। ওঝা, গুণীন, গণৎকার, দৈবজ্ঞের প্রতিও এক জাতীয় বিশ্বাস কাজ করত। তাই দেখা যায় বিবাহকালে কনের মাতা জামাতা বশীকরণের ঔষধ করে, আবার কনে স্বয়ং পতি বশীকরণের ঔষধ করে। নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলা স্বামী বশীকরণের ঔষধ করছে-

"সুমুখে রহিল বেউলা ঔসদ করিবার।
নানা মতে ঔসদ বেউলা লাগে করিবার॥
পুষ্প ছিড়ি ডাহিন বামে ফালাএ উড়াইয়া।
আর পুষ্প বিপুলা বসিল পাড়িয়া॥
. . .   .
দর্পণ বদল কৈল সাহের কুমারি।
ডরে করি লইল বেউলা সাইজ ছয় কুড়ি॥
লখাইরে ডেঞোইয়া মাইজ ফেলায় চতুর্দিগে।
পানে করি হস্ত লেপন দিল পিষ্টে বুকে॥
হেট মাথা হইয়া লখাই ডাহিন বামে চায়।
জয়ধরে লখাইর হাতে গামছা জোগায়॥
গামছা লইয়া ঔসদ লাগে মুছিবার।
কন্যা বরে তোলা তুলি হইল সাতবার॥" (নারায়ণ/৪৪-৪৫)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও ঔষধ করার প্রসঙ্গ পাই —

"অনেক ঔষধ : করিয়া পরিচ্ছদ : বেহুলা দিল পতি-ভালে।
সুন্দর লখীন্দরে : বরণ করি তারে : অমলা বাণ্যানী চলে॥"(ক্ষেমানন্দ /২৫১)

বরণকালে কনের মাতাও জামাতা বশীকরণের ঔষধ করত, কোথাও বা নব জামাতাকে খাওয়ানোর সময় বশীকরণের ঔষধ করা হত। জগজ্জীবনের কাব্যে পাই –

"মিষ্টি পরমান্ন দধি মধু আন
যত দ্রব্য দিল পাছে।
ঔষধের তর করিল অন্তর
রাখিল থালের কাছে॥" (জগজ্জীবন/২০২)

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে সনকার সখীরা তাকে জামাতা বশীকরণের পদ্ধতি দিয়েছে —

"যোড় গুয়া যোড় পান মক্ষিকা মাকড়।
উভত নোঙ্গেরার ছাল মানের শিকড়॥
একত্র বাটিয়া পুনঃ কেশে দেহ জড়ি।
এক তিলে জামাই যে নাহি যাবে ছাড়ি॥
... ...
আর সখী বলে আমার ঔষধের গুণে।
বার হলে ঘরে আসে দুই চারি দিনে॥
শ্মশানের জল আর কলসের মাটি।
পুরাণ কাঞ্জির রস একত্রেতে বাটি॥
গেঁঠুলিতে বান্ধিয়া রাখিও বামপাশে।
হাজার দোষ পায় যদি মুখ চেয়ে হাসে॥
... ...
কাঁকড়ার বামহাত ইন্দুর পিত্তিতে।
পেঁচার বাম চক্ষু দিয়া কাজল রাত্রিতে॥
বাম চক্ষুতে দিবে অঙ্গুলি করিয়া।
গালি পাড়িলেও থাকে পেঁচা মত চাইয়া॥
আর সখী বলে আমি ফুলপড়া জানি।
যদি শুঁকাইতে পার যত্ন করি আনি॥
পুষ্প মধু খেয়ে যেন ভ্রমরা মোহিত।
এইমত স্বামী যে না ছাড়ে কদাচিত॥" (বংশীদাস / ১৭৭)

অদৃষ্টনির্ভর বাঙালী সমাজে ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞদের প্রভাব ছিল। কিছু কিছু দৈবজ্ঞরা সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনা করত আবার অনেকে সংসার ধর্ম পালন করত। অনেকে সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ছিল, কারণ অশিক্ষিত জনসমাজ তাদের শ্রদ্ধা করত। বিবাহ, পূজাপাঠ, যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ বা গণৎকারদের সাহায্যে শুভাশুভ নির্ধারণ করা হত। বিবাহের দিনক্ষণ নির্ণয়ে দৈবজ্ঞরা পাঁজি-পুথি মিলিয়ে, গণ, রাশি বিচার করে যোটক নির্ধারণ করত। লখীন্দরের বিবাহের দিনক্ষণ নির্ণয়ের জন্য দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করা হয়েছিল। সোমাই পণ্ডিতের কথা অনুযায়ী —

"দুই প্রহর বেলা হইল শুভক্ষণ।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর নন্দন॥
পূর্ব্ব [ব] যু নক্ষত্র আর তিথি একাদশী।
লিখিয়া লইল লখাইর নক্ষত্র আর রাশি॥
জোগ করন ভাল দিন বুধবার।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর কুমার॥" (বিজয়/৩১৯)

দৈবজ্ঞ, গণৎকাররা অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পার্শ্বচরের মত থাকত। যাত্রাকালে তারা যাত্রা-অযাত্রা নির্ণয় করত। চাঁদ সদাগরের পার্শ্বচর গণক, দৈবজ্ঞগণ লখীন্দরের বিবাহ সম্বন্ধের সময়েও সঙ্গে গিয়েছিল —

"দৈবজ্ঞ আসিয়াছিলো রাজার সংহতি
করে পাঁজী লৈয়া লগ্ন কৈল শীঘ্রগতি।" (বিপ্রদাস/১৭৪)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহের লগ্ন নির্ণয়ে গণক জনার্দন রাশি বিচার করে —

"গণক আনিঞা ভূমে পাতাইল খড়ি॥
দৈববশে দুইরাশে হইল মিলন।
পরম হরিষ হৈল দ্বিজ জনার্দন॥" (ক্ষেমানন্দ/২৪২)

আবার স্বগোত্রে বিবাহ বারণ ছিল। তাই চাঁদ সদাগর লখীন্দরের বিবাহে ঘটককে বলেছিল —

"চান্দ বলে স্বগোত্রেতে উচিত না হয়।" (বংশীদাস/১৫৮)

চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে গণৎকারগণ অযাত্রা নির্ণয় করেছিল, তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। দৈবজ্ঞ বা গণৎকারদের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত বলেই মনসা গণৎকার বা দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে সনকাকে ছলনা করে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে মনসা গণৎকার দৈবজ্ঞ সেজে সনকাকে ছলনা করে এবং বলে, আজ তার বাড়ীতে চুরি হবে। কবির বর্ণনায়—

"কপালে কাটিয়া ফোঁটা কক্ষতলে পুঁথি।
চাঁদের বাড়ীতে আগে গেলেন জগতী।
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
ভূমেতে পাতিয়া খড়ি করিল গণন॥
দৈবজ্ঞ বলেন শুন সনকা সুন্দরী।
নিশ্চয় তোমার বাড়ী আজি হব চুরি॥" (ক্ষেমানন্দ/২৩৯)

মনসার মন্ত্রী নেতাকেও বার বার খড়ি পেতে গণনা করতে দেখা যায়। এক প্রকার সহজাত বিশ্বাস থাকায় মানুষ অনেক সময় এদের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত হত। সেকালের সমাজে দৈবজ্ঞ-গণৎকারদের মত পুরোহিতদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তারা সর্বদা যে সৎ হত তা নয়, বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর দৈবজ্ঞ যথাশাস্ত্র অগ্নিকার্য করার উপদেশ দিলে চাঁদসদাগর বলে — "দক্ষিণার লোভে সবে বলে অনুচিত।" (বিপ্রদাস/১৩২)। আবার সোমাই পণ্ডিত চাঁদকে মনসাপূজা করতে বললে চাঁদ সদাগর বলে —

"না বুঝিয়া সর্বলোক বলে অনোচিত
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।" (বিপ্রদাস/২২৮)

এটাই বোধ হয় প্রকৃত অবস্থা। শুধু হিন্দুসমাজেই নয় মুসলমান সমাজেও পীর, দরবেশ, গাজী, মোল্লা, ফকিরদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সেই সঙ্গে ছিল পাঁজি-পুথি ও শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি আনুগত্য।

আবার পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতিকারার্থে দৈবজ্ঞ বা পুরোহিতরা বিধান দিত; এই ভাবে তারা

সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। বেহুলার বাসরে স্বামীর মৃত্যু তার পাপের ফল, আবার বেহুলার দাদা ভগ্নিকে কু-প্রস্তাব দেয়, এ পাপ থেকে নিষ্কৃতির বিধান বেহুলার মুখে হলেও যেন পুরোহিত ব্রাহ্মণের বিধানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন বেহুলা তার ভাইদের বলেছে —

"যতেক অকথ্য কথা কহিলাঙ চিত্তে।
সে সকল পাপ রহিল খণ্ডিবে কেমতে॥
বালী বোলে না কান্দ দাদা শুন সদাগর।
প্রায়শ্চিত্ত করিহ দাদা উজানি নগর॥
উচ্চে দিঅ সরোবর নীচে দিঅ আলি।
ব্রাহ্মণকে দিহ ধেনু উত্তম দুধালি॥
অন্ন দেহ দাদা গ্রীষ্মকালে পানি।
বস্ত্রদান করিহ বিবস্ত্র জন আনি॥
ব্রাহ্মণকে আনি দাদা করাবে ভোজন।
তবে সে তুমার পাপ হৈবে বিমোচন॥"(জগজ্জীবন/২৮৫)

বলাই বাহুল্য এই সামাজিক শিক্ষা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থে। সত্যাসত্য, পাপপুণ্য বোধে মানুষের আস্থা ছিল, তাই 'তিন সত্য' করলে তা লঙ্ঘন করা মহাপাপ মনে করা হত। বিষ্ণু পালের কাব্যে দেখি উষা মনসাকে দিয়ে 'তিন সত্য' করিয়েছে যে, মর্ত্যে মনসা তাকে সাহায্য করবে। আসলে এ সব ঘটনাগুলি সমকালীন সমাজ মানসের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, মনসামঙ্গলে এই ক্রিয়ারই প্রতিফলন ঘটেছে।

মনসামঙ্গলে তৎকালীন বাঙালী সমাজের বহুবিচিত্র প্রবণতার চিত্র পাওয়া যায়— যা সমাজ ইতিহাসেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যেগুলি আজও পরিবর্তিত হয়নি। সমাজ ভঙ্গী পরিবর্তিত হলেও সমাজ রীতি বদলে যায়নি, যেমন পিতৃশ্রাদ্ধের পর বা অশৌচান্তে মাছ খাওয়া, শনিবারে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ব্রত উৎযাপন করা, মৃতদেহ যথা নিয়মে অগ্নি সংস্কার করা ইত্যাদি। সঙ্কর গাড়রী মৃত্যুকালে তার দেহ আট টুক্‌রো করে আট দিকে পুঁতে দিতে বলেছিল। কিন্তু মনসা ব্রাহ্মণ বেশে তাকে 'যবন আচার' বলে নিন্দা করে। মনসার উদ্দেশ্য যাই হোক, হিন্দুর মৃতদেহ দাহ করাই রীতি, আবার সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে মৃতদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়াও গবেষকগণ নানা গবেষণার দ্বারা সর্পপূজা, সর্পসংস্কৃতি, সর্প সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্কার, এসবের মধ্যে থেকে নানা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গদেশীয় সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা সংস্কার, আচার-বিচার পালিত হয়ে থাকে। নবজাতকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা আচার পালিত হত, যেমন প্রসূতির গর্ভকালীন আচার, প্রসবকালীন আচার, নবজাতকের জন্মকালীন আচার, বিবাহকালীন আচার, মৃত্যুতেও নানা আচার পালিত হত; এসব আচারে অবশ্য অঞ্চল বিশেষে ভিন্নতা ছিল। তিন বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে এই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রসূতির ছয় বা সাত মাসের গর্ভাবস্থায় তার রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম সুখাদ্য খাওয়ানো হত এবং নানা রকম স্ত্রী-আচার পালিত হত। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নারীরা সমবেত হয়ে নানা দ্রব্য উপহার সহযোগে প্রসূতিকে সাধভক্ষণ করাত। মনসামঙ্গলে সাধভক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ আছে; যেমন সনকার সাধভক্ষণ সম্পর্কে বিজয় গুপ্ত লিখেছেন —

"রাজ্যের ঠাকুর চান্দো সোনা তার রাণী।
সাধ খাওয়াইতে আনে যতেক বাণ্যানি॥
স্নান করিয়া সোনাই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।" (বিজয়/২৯৮)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও সনকার সাধ ভক্ষণের কথা পাই—

"সপ্তমাস গর্ভ : লোকে জানে সর্ব্ব : শুন সখী বলি তোরে।

এমন দিবসে : মনের হরিষে : সাধ খায়াইবে মোরে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৩৭)

জগজ্জীবনের কাব্যে পাঁচ মাস গর্ভকালে পঞ্চামৃত এবং বিপ্রদাসের কাব্যে নয় মাসে সাধভক্ষণের কথা পাওয়া যায়। যেমন জগজ্জীবনের বর্ণনায় —

"পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত খায় বানিয়ানী।

দশ মাস দশ দিনে হইল পুত্রখানি॥" (জগজ্জীবন/১৫৯)

কখনো প্রসূতির ছয় মাস গর্ভকালে ষষ্ঠীপূজা করা হত। যেমন—

"ষষ্ঠী পোজে সনকা ষষ্ট মাস পাইয়া।" (বিজয়/২৩৭)

সেকালে সন্তানের জন্মকালে দাই বা ধাই বা ধাত্রী-মাতাদের প্রভাব ছিল। প্রসবকালে তারাই যাবতীয় কাজ করত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে লখীন্দরের জন্মকালে রতি বলে এক ধাই এর কথা পাওয়া যাচ্ছে। নবজাতকের জন্মকালে সমবেত প্রতিবেশী ও আত্মীয়া নারীরা উলুধ্বনি সহকারে নবজাতককে বরণ করে নিত। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে সূতিকাগৃহ বা আঁতুরঘরে রাখা হত, নবজাতককে ভূত-প্রেত ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য নানা তন্ত্র -মন্ত্র, ঔষধ দ্বারা আবদ্ধ করা হত। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ নবজাতকের কোষ্ঠী তৈরী করত। তারপর পঞ্চম দিবস থেকে নানা সংস্কার পালিত হত। দেশাচার অনুযায়ী এ সমস্ত লোকাচারে বিভিন্নতা থাকে। যেমন পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের বিবরণ অনুযায়ী ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, সাত দিনে উঠানি, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ করানো হত। দক্ষিণবঙ্গের কবি বিপ্রদাসের কাব্যেও তার সুন্দর বর্ণনা পাই, এখানে ছয় দিনে সূতিকাপূজা, আট দিনে আটকলাই, নয় দিনে নত্তা, ত্রিশ দিনে অশৌচান্ত, একত্রিশ দিনে ষষ্ঠীপূজার কথা পাই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দাই সন্তানের মস্তক ও নাসিকা তোলার জন্য অঙ্গ মার্জনা করত। বিপ্রদাসের বর্ণনানুযায়ী —

"তবে অঙ্গ মার্জিয়া মস্তক নাসা তুলি
নাভি সুকর্তন কৈল দিয়া হুলাহুলি।
কুমারিকা লতায় সূতিকা-ঘর বেড়ি
নানা মহোষধিতে গুমুড় দ্বারে এড়ি।
তাঁতি দিয়া নিবন্ধন করিল কুমারে
প্রভাতে পাচন দিল বিধি-লোকাচারে।
দৈবজ্ঞ আনিয়া কোষ্ঠী তুলিল তাহার
গণিয়া দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রশংসে অপার।
ছয় দিনে সূতিকা পূজিল সুবিধান।
অষ্ট দিনে আটকলাই কৈল শিশুগণ।
নবম বাসরে নত্তা করিল হরিষে
ত্রিশ দিনে অশোচন্তি করিল বিশেষে।
একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন
নানা পরকারে কৈল নানা আয়োজন।" (বিপ্রদাস/১৫১)

কোথাও দেখা যায় পঞ্চম দিবসে নাপিত এসে নবজাতকের মস্তক মুণ্ডন করে যায়, তার পর ছয় দিনে 'ষাটিরা' বা ষষ্ঠীপূজা করে; বিশ্বাস এই যে, ঐ দিন বিধাতা নবজাতকের ললাট লিখন করে থাকে। তাই ঐ দিন শিয়রে 'মসীপত্র' রাখা হয় এবং প্রসূতি ভিন্ন কেউ কাছে থাকতে পারে না। ক্ষেমানন্দের কাব্যে এ সমস্ত তথ্য পাচ্ছি –

"সনকা হরিষে : পঞ্চম দিবসে : কৈল লোকাচার লর্ত্তা॥
প্রতি ঘরাঘরি : নগরে নাগরী : ডাক্যা আনে ঝাউআ চেড়ী।
শুনিঞা নাপিত : মনে হরষিত : আইল সাধুর বাড়ী।
বসি নরসুন্দ : পরম আনন্দ : খেরু কৈল সভাকারে।
তৈলপিত রসা : অঙ্গে করি ভূষা : সভে গেল ঘরে ঘরে॥
ছদিনে ষাট্টারা : করিল বাণ্যারা : বিহিত ষষ্ঠীর পূজা।
সনকা বাণ্যানী : নানা সজ্জ আনি : কিঙ্করে ডাকিল দ্বিজা॥
সনকা সুন্দরী : ষষ্ঠীপূজা করি : যাহার যে নীত আছে।
হাতে খড়্গ লয়্যা : রহিল জাগিয়া : মসীপত্র থুয়্যা কাছে॥
কথ রাত্রি গেলে : বিধি হেনকালে : লিখিতে আইলা ভালে।" (ক্ষেমানন্দ /২৩৮)

ছয় মাসে অন্নপ্রাশন বা নবজাতকের মুখে ভাত দেওয়া হত। এ উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা হত, পুরোহিত নবজাতকের নামকরণ করত। ব্রাহ্মণকে দান ও জ্ঞাতি বন্ধুদের ভোজন করিয়ে নবজাতককে সমাজের একজন করে নেওয়া হত। যেমন বিপ্রদাসের বর্ণনায় –

"ছয় মাস হইল যদি রাজার নন্দন
অন্ন দিতে করিল প্রচুর আয়োজন।
শুভ দিন শুভ লগ্ন পায়্যা হরষিত
পুরোহিত আনাইল সোমাই পণ্ডিত।
...   .
দেবার্চনা কৈল তবে হরষিত-মনে
নান্দীমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিল বিধানে।
নানারত্নবিভূষণ পুত্র কৈল কোলে
নানাবিধি বাদ্য বাজে মহাকোলাহলে।
শুভক্ষণে অন্ন দিল পুত্রের বদনে
লক্ষিন্দর নাম রাখে রাজার বিধানে।" (বিপ্রদাস/১৫১)।

বিবাহ মানবজীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। নানান লোকাচার ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটি পালিত হত। মনসামঙ্গলে বাঙালীর বিবাহরীতির সুন্দর বর্ণনা পাচ্ছি। বাঙালী হিন্দুর বিবাহাচার ক্রমানুয়ে কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হত, যথাক্রমে অধিবাস – নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ – ক্ষৌরকর্ম - বর বরণ – সাতপাক – মালাবদল – শুভদৃষ্টি – সম্প্রদান – বাসরযাপন – শয্যা তোলা – বাসিবিয়ে – বধূবরণ - কালরাত্রি ইত্যাদি। অধিবাস নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহাচার শুরু হত। বিবাহের দিন কোথাও বা পূর্বদিনে পাত্র বা পাত্রীর পিতা বা গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিরা ষোড়শমাতৃকাপূজা ও অধিবাস করাত। বিভিন্ন অঞ্চলে এ সমস্ত আচারগুলি পালিত হত নির্দিষ্ট কৌম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। অধিবাসের পর এয়োগণ অথবা পুরোহিত পাত্রপাত্রীর হাতে হলুদ মাখানো সুতা পরিয়ে দিত। মনসার বিবাহে বিপ্রদাসের কাব্যের বর্ণনানুযায়ী—

"পরম উল্লাস   পদ্মার অধিবাস
করিল জত আইয়-গণে
হরিদ্রা তৈল লৈয়া   পদ্মার অঙ্গে দিয়া
বাঁধিল সূত্র বাম করে।"   (ঐ /৪১)

এরপর জলসওয়া নামক অনুষ্ঠান; এয়োগণ বাদ্য সহকারে মঙ্গলগান গাইতে গাইতে জলসইতে যায়। কুলা বা চালুনিতে ধান, দূর্বা, কলা, সিন্দুর, প্রদীপ, হরিদ্রা, আম্রপল্লব যুক্ত জলপূর্ণ কলস নিয়ে এয়োরা জলসইতে যায়। লখীন্দরের বিবাহে 'পড়া আঁখিবার' বলে একটি অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন বিপ্রদাস। এটিও জলসওয়া নামক অনুষ্ঠানেরই নাম —

"পড়া আঁখিবারে জায় সনকা সুন্দরী
ধান্য দূর্বা কদলি কুলায় পূর্ণ করি।
আইয়-গণ সঙ্গে লইয়া মঙ্গল বিধানে
যথাবিধি পড়া আখে আনন্দিত মনে।
হরিদ্রা শোভিত বাস আচ্ছাদন করি
বাম করে পূর্ণ ঝারি বারিপূর্ণ করি।
সুনাদ মঙ্গল বাদ্য শুনি জয়ধ্বনি
পুত্রের মঙ্গল বচে সনকা বাণ্যানী।
... ...
ধান্য দূর্বা সিন্দুরাদি সুগন্ধি চন্দনে
আখিলেন পড়া রামা লৌকিক বিধানে।" (ঐ / ১৮০-১৮১)

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পূর্ববঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী জলসওয়া অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে, এর নাম সম্ভবত 'সোহাগ সাধা'। বংশীদাসের বর্ণনানুযায়ী —

"মিলিয়া সকল নারীলোকে।
কেহ নাচে কেহ গায়, সোহাগ সাধিতে যায়,
বেহুলার বিহার কৌতুকে॥
... ...
বাড়ি বাড়ি উত্তরিয়া, ঘৃতের প্রদীপ দিয়া,
আলিপনা পাতিয়া দুয়ারে।
জিরা মরিচ লঙ্গ বাটি, খাসা চাউল গুটী গুটী,
লয় সজ্জা মঙ্গল জোকারে॥" (বংশীদাস / ১৭৫)

জলসইবার সময় এয়োরা মঙ্গলগান গেয়ে নৃত্য করে, শঙ্খধ্বনি ও জয়জোকার বা উলুধ্বনি দিয়ে গ্রামের পথ মুখরিত করে তুলত। এরপর পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ লাভের জন্য বর ও কনের পিতা নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে। এ উপলক্ষে ষোড়শমাতৃকাপূজা, গৌর্যাদিমাতৃকাপূজা করা হত, বিপ্রদাসের বর্ণানুসারে —

"স্নান দান করি সাহে বসিলা আসনে
প্রথমে গণেশ পূজে দ্বিজ সন্নিধানে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজে হরষিত হইয়া
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া।
বসুধারা নর-মাঝে দিলেক হরিষে
নান্দীমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিল বিশেষে।" (বিপ্রদাস/১৮০)

বংশীদাসের কাব্যেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে —

"ছায়া মণ্ডপ করি তাম্বু সামিয়ানে।

নান্দীমুখ করিবারে নানা দ্রব্য আনে॥

. . .   .

গৌর্য্যাদি মাতৃকাগণে ক্রমে ক্রমে পূজে॥

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া।

দেবসেনা স্বাহা স্বধা লোকমাতৃ জয়া॥

শান্তি পুষ্টি তুষ্টি ক্ষমা দেবতার নাম।

পঞ্চ উপচারে পূজে অতি অনুপম॥

দধি দুগ্ধ ছানা আর নৈবেদ্য প্রমাণ।

পিতৃশ্রাদ্ধ করি কৈল নব পিণ্ডদান॥" (বংশীদাস/১৭৩)

বাঙালী হিন্দুর বিবাহে নাপিতের ভূমিকা থাকে। নাপিত এসে খেউরি করে যায় –

"নাপিতে খেউর কৈল ঘৃতদীপ প্রজ্বালিল" (বিপ্রদাস/১৮১)

বংশীদাসের কাব্যে বর্ণনায় পাই –

"জয় জোকারে লখাইর হাতে দিল ক্ষুর॥

আর চারি নাপিতে নরুন লৈয়া হাতে।

পঞ্চ গোটা নখ কাটি ফেলিল নাপিতে॥"(বংশীদাস/১৭৩)

এর পরের আচার—গায়েহলুদ; এয়োগণ তিল তেল, আমলকি, বাটা হলুদ সহযোগে এক প্রকার মিশ্রণ তৈরী করে বর ও কনেকে মাথায় এবং এরপর স্নান করায়। যেমন —

"ঘাইট ঘিলা আমলকী, হরিদ্রাদি তৈল মাখি,

তিন গুণ করিয়া সন্ধান।

দাসগণ সবে ধরি, শরীর মার্জ্জন করি,

কাঁচা সোণা সমান সুঠাম॥

সুবর্ণ কলসি ভরি, তীর্থজল সারি সারি,

শিরে ঢালে পঞ্চাশ কলসী।" (ঐ/১৭৪)

এয়োগণও তেল-হলুদ মাখে, স্নান করে, নানা উপহার লাভ করে। এরপর 'তিতাবস্ত্র' পরিত্যাগ করিয়ে বর-কনেকে সাজানো হয়। বর সুসজ্জিত হয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুরোহিতের সঙ্গে কনে গৃহে যাত্রা করে। ক্ষেমানন্দ ও বিপ্রদাস 'আঠার বাকড়া' বলে একটি আচারের কথা বলেছেন। সম্ভবত বরযাত্রীরা কন্যার গ্রামে উপস্থিত হলে বালকরা বরের পথ আটকায় এবং 'আঠার বাকড়া' বলে আঠার জন বীরের কথা আবৃত্তি করে বরপক্ষের নিকট থেকে উপহার আদায় করে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে—

"আগু জায় সর্ব লোক একত্র হইয়া।

এখনি বাকড়া গুয়া লইব রহায়্যা।

. . .   .

চাঁদো বলে আঠারো বাকড়া নাম বলো

তবে গুয়া পান দিব না কর কোন্দল।" (বিপ্রদাস/১৮৫)

ক্ষেমানন্দের বর্ণানুসারে —

"যত শিশু মেলি : রাখিল খাটলি : আঠার বাকড়া বল্যা॥

কর পসারিয়া : পথ আগুলিয়া : আঠার বাকড়া পড়ে।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৯)

আঠার বাকড়া হল আঠার জন পৌরাণিক পুরুষ দেবতার নাম। এটি অবশ্যই একটি আঞ্চলিক রীতি। ওদিকে কনে রাঙা চেলি পরে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। বর কনে গৃহে উপস্থিত হলে এয়োগণ স্ত্রী-আচার পালন করে থাকে। কন্যার পিতামাতা বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক উপহার দিয়ে বর বরণ করে থাকে। মনসার বিবাহে –

"বিবিধ বিধানে বরিল শিব জামাই লোকরিত তর্ক
মাল্য আভরণ গন্ধ পুষ্প দিয়া আর দিল মধুপর্ক॥" (বিজয়/৮১)

কোথাও বরের পা ধুইয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বংশীদাসের বর্ণনায় —

"বরণের দ্রব্য যত আনে একে একে।
সুবর্ণের পাত্রে ভরি পরম কৌতুকে॥
সুবর্ণ কুণ্ডল হার সুবর্ণ বলয়া।
সুবর্ণ অঙ্গুরি আনে রত্নে বিভূষিয়া॥
... ...
পাদ্য আচমন দিল লখাইর হাতে।
হস্ত পাতি অর্ঘ্য লৈয়া তুলি দিল মাথে॥" (বংশীদাস/১৭৭)

কনের মাতা এই সুযোগে জামাতা বশীকরণের ঔষধ করে নিত। কন্যাগৃহে যথাশাস্ত্র স্ত্রী-আচার পালিত হত। কলাগাছ পুঁতে ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হত এবং কনেকে সুসজ্জিত করে ছায়ামণ্ডপে নিয়ে আসা হত। এদিকে কিছু লোক বরকে কাঁধে করে নিয়ে দাঁড়াত; কনে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং তার পর বরের মুখের আবরণ সরিয়ে ছামনি বা শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকা করা হত এবং এই সঙ্গে কনে পতি বশীকরণের ঔষধ করার জন্য পান ও ফুল বরের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে ফেলে। নারায়ণ দেবের বর্ণনানুসারে –

"বাহির হইল সুন্দরি বেউলা পাটেত চড়িয়া।
হরসিত হইল লখাই বেউলারে দেখিয়া॥
দস জন মাল আইল কাছিয়া কাপড়।
কান্দে করি লইল বর চান্দের কোঙর॥
আগে লখাই পাছে বেউলা সাত পাক ফিরি।
লক্ষিন্দরে রাখিলেক পূর্ব্ব মুখ করি॥
অন্তস্পট দূর করি মুখচন্দ্রিকা।
সুভ দিনে বেউলা লখাই হইয়া গেল দেখা।" (নায়ায়ণ/৪৪)

বিপ্রদাসের কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। এর পরের আচার—সম্প্রদান; কনের পিতা বা গুরুজন- স্থানীয় ব্যক্তি সম্প্রদান করে। বরকে ছায়ামণ্ডপে পূর্ব দিকে মুখ করে বসানো হত, বরের সম্মুখে কনেকে বসিয়ে বর ও কনের দুই হাত একত্রিত করে কুশ দ্বারা বেঁধে দেওয়া হত, কুশণ্ডিকা স্থানে অগ্নিসংযোগ করে বেদবাক্য উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদানকার্য সম্পন্ন হত। শেষে অগ্নিতে ঘি ঢেলে কর্মসম্পাদন শেষ হলে ছায়ামণ্ডপ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়ে বর-কনে ঘরে তোলা হত। এই সময় বরকে নানা দ্রব্য উপহার দেওয়া হত। ধনীরা গ্রাম, ভূমি, গাভী, রজত, কাঞ্চন, দাসদাসী পর্যন্ত উপহার দিত। বংশীদাসের কাব্যে বিবাহের আনুপূর্বিক বর্ণনা পাওয়া যায়—

"ছায়ামণ্ডপে বর বৈসে পূর্ব্বমুখে।
কাছাকাছি কন্যা বৈসে জামাই সম্মুখে॥
কুশ হস্তে উত্তর মুখে বসিলেক কর্ত্তা।

কর্ম্ম করায় পুরোহিত হাতে লৈয়া পৈতা ॥
অগ্নি স্থাপন করি কুশণ্ডিকা স্থান।
মহাবাক্য বলিয়া করিল সম্প্রদান ॥
. . .   .
গ্রন্থি বন্ধন করি যত দ্বিজগণে।
পাণিগ্রহণ করিলেক হরষিত মনে ॥
বরণ পূর্ব্বক যথা কুল পুরোহিত।
কুশণ্ডিকা করিয়া অগ্নিতে ঢালে ঘৃত ॥
এইমতে যথাবিধি কর্ম্ম সম্পাদিয়া।
হরষিতে ঘরে চলে কন্যা বর লৈয়া ॥
বরসজ্জা কৈল যেন আছে লোকাচার।
ঘুরুনি ঢাকোনি পুনঃ কৈল তিন বার ॥"   (বংশীদাস/১৮০)

এরপর বর ও কনেকে ভোজন করানো হয় এবং ভোজনান্তে বাসর যাপন। বাসরঘরে উপস্থিত নারীদের হাস্য পরিহাস, রহস্যালাপ ও প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা চলে। পরের দিন বাসি বিবাহ। সকাল বেলা এয়োগণ বরের কাছে শয্যাতোলা বাবদ অর্থ আদায় করে, তাকে 'শয্যাতুলুনি' বলে। এয়োগণ কৃত্রিম পুকুর তৈরী করে, কোথাও বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে তার চারিদিকে আলপনা দেয়, বর-কনে সেখানে দাঁড়ায়। এয়োগণ এক জাতীয় মিশ্রণ তাদের মাখিয়ে স্নান করায়, তার পর পুকুরের জলে অর্ঘ্য প্রদান করে এবং পরে 'কড়িখেলা' হয়। বর-কনে মোট সাতবার কড়ি তোলে, শেষে পুকুর সাতবার প্রদক্ষিণ করে বিবাহ সমাপ্ত হয়। নারায়ণ দেবের বর্ণনানুযায়ী —

"কুপিয়া বাসের কুঞ্চি   মনি মুক্তা প্রবাল সিছি
বেদি বেড়ি বিচিত্র আলিপন।
বাটি গিলা আমলকী   লখাই বেউলার গায়ে মাখি
স্নান করায় জত নারিগণ ॥
. . . .
খাচিয়া পুখরি খানি   ঢালিয়া ঝারির পানি
কড়া তোলা করে সাতবার।
সাহেব পুরহিত   আনন্দে নির্ত্ত গিত
কড়া তোলা করিল সাতবার।
ধরিয়া লখাই বেউলার হাত   বেদি বেড়ি সাতপাক
সুমক্ষ করে সাতবারে।"   (নারায়ণ/৫৪)

বিবাহান্তে বর-কনে বিদায় গ্রহণ করে, কনে প্রথমবার পতিগৃহে উপনীত হলে পাত্রের মাতা নানা দ্রব্য উপহার দিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বধূবরণ করে। এই দিনের রাত্রি 'কালরাত্রি' রূপে পালিত হয়ে থাকে। পরদিন প্রীতিভোজনান্তে বধূকে সমাজের একজন করে নেওয়া হত। বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিবাহের বিস্তৃত বিবাহাচারের বর্ণনা আছে।

উত্তরবঙ্গীয় বিবাহরীতি একটু অন্যরকম; জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহের বর্ণনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন বিবাহের পাকাদেখা ও কথাবার্তা হয়ে যাবার পর কনের পিতা ও পাত্রের পিতা পরস্পর তুলসীপত্র বদল করে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হত।জগজ্জীবনের বর্ণনানুসারে—

"চান্দো বোলে যদ্যপি করিলে অঙ্গীকার।
তুলসীপত্রেক দেহ প্রত্যয় আমার॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন বাছো মহারঙ্গে বসি।
চান্দোর হস্তেতে বাছো দিলেন তুলসী॥
তুলসী পাইয়া চান্দো আনন্দিত মন।
আভরণ দিয়া করে কন্যা বরণ॥" (জগজ্জীবন/১৭৪)

অবশ্য দক্ষিণবঙ্গীয় কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যেও 'তুলসীবদল' রীতি দেখা যায় —

"চতুর ঘটক ছিল জনার্দ্দন সাথে।
তুলসী আনিঞা দিল দুজনার হাথে॥
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
লখীন্দরে কন্যা দিব সায়বাণ্যা কয়॥" (ক্ষেমানন্দ/২৪৪)

বিবাহরীতিতে এরূপ আঞ্চলিকতা ছিল। জগজ্জীবনের কাব্যে কন্যাকে ছায়ামণ্ডপে আনার পর কন্যা বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণাম করে, তারপর মহুয়ার ডাল গঙ্গাজলে ডুবিয়ে বর-কনে পরস্পরের প্রতি জল ছিঁটিয়ে দেয় এবং পরে দু'জনে পরস্পরের প্রতি ফুল ছিঁটিয়ে দেয়। জগজ্জীবনের বর্ণনানুযায়ী —

"স্বামী প্রদক্ষিণ করি বহিরায় সুন্দরী
কুন্দ পুষ্প নিঞাচলে করি।
দেখিয়া দুহার মুখ দুহার পরম সুখ
দুহে দেখিল নয়ান ভরি॥
ফিরি ফিরি সপ্তবার করে কন্যা নমস্কার
সমুখে মুখানি নাই তুলে।
... ...
সুবর্ণ কলস আনি গঙ্গাসাগরের পানি
মহুকার ডাল লৈল হাতে।
ডুবায়া ঘাটের জলে বাদ্য বাজে সুমঙ্গলে
ছিটাইল দুজনার মাথে॥
ধরিয়া পুষ্পের মুঠি দুইজনে ছিটা ছিটি
মঙ্গল উৎসব করি মহারঙ্গে।" (জগজ্জীবন/১৯৬)

এরপর সম্প্রদান—বরের হাতে কনের হাত দিয়ে ঘটের উপর স্থাপন করে হাতের উপর ফল দিয়ে সম্প্রদানকার্য সম্পন্ন হত। তাছাড়া অন্যান্য আচারসমূহে কিছুটা মিল আছে, অবশ্য কবি সবটা বর্ণনাও করেননি।

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু এই তিন নিয়ে মানব জীবনচক্র। জন্ম ও বিবাহের মত মৃত্যুর পরও মৃতের সন্তান-পরিজনেরা নানা লোকাচার পালন করে থাকে। সাধারণত পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই পিতার পারলৌকিক কর্মের অধিকারী, অবশ্য সন্তানের মৃত্যুতে পিতাই পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করে। তাই চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর পাত্র-মিত্র, পুরোহিত চাঁদ সদাগরকেই অগ্নিকার্য ও শ্রাদ্ধের বিধান দিয়েছে। বিপ্রদাসের কাব্যে পাই —

"মাজস গড়াও ঝাটো বলে চাঁদো রাজ।
ভাসাব কানির মড়া রাখিয়া কি কাজ॥
পাত্র মিত্র পুরোহিত বলে সম্বিধান।

অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ কর শাস্ত্রের বিধান॥" (বিপ্রদাস/১৩২)

স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবা স্ত্রীরও কিছু আচার পালন করতে হত। যেমন, সদ্য বিধবা স্ত্রীর হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দিয়ে সিন্দুর মুছে দেওয়া হত এবং হাতের নখ কেটে দেওয়া হত—

"নাম্বিঞা বসিল বালী গগড়িঞার ঘাটে।
নাপিত আনিয়া কন্যা দশ নখ কাটে॥" (জগজ্জীবন/২৫৮)

সতীদাহ প্রচলিত থাকায় সতীরা বিবাহের সাজে সজ্জিত হয়ে আম্রডাল হাতে স্বামীর মৃতদেহের অনুগমন করত। শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাবার পর মৃতদেহকে গঙ্গাজলে স্নান করানো হত এবং অগুরু, চন্দন, ঘি মাখানো হত; ধনীরা চন্দন কাঠের চিতা ব্যবহার করত এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নি প্রদান করত। সাধারণত পুত্ররাই অগ্নিকার্য্যের অধিকারী হত। তাইতো লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকা বিলাপ করে বলেছে – "আমি মরিলে বাপু কে দিবে আগুনি।" (বিজয়/৪৩৩)। বস্তুত মৃতদেহ বাসি করাও সামাজিক দৃষ্টিতে অপরাধ ছিল। তাই লখীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ বলেছে —

"কান্দিতে কান্দিতে হইল দশ দণ্ড বেলা।
জ্ঞাতি লোকে খোটা দিব দ্বারে বাসি মড়া॥" (বিজয়/৪৩৬)

দাহকার্য শেষ হলে জল ঢেলে 'চুল্লি' শীতল করা হত। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেবখণ্ডে ধর্মদেবের মৃত্যুর পর পুত্রেরা অগ্নিকার্য সম্পাদন করে এভাবে —

"আপনার উরু তুলি তাহাতে বান্ধিআ চুল্লি
বাপের করয়ে অগ্নিকাজ।
গঙ্গাসাগরের পানি আগর চন্দন আনি
ধর্ম্মদেবের শরীর ধোয়ায়।
করিয়া উত্তম খাট চাপায় আগর কাঠ
তাতে নিআ ধর্ম্মকে শোয়ায়॥
আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
আনল ভেজায় তিন ভাই।
মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মাহর অগ্নি দিল মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ছাই॥
করিয়া অগ্নির কাজ ধোয়ায় আঙ্গার কাষ্ঠ
তিন ভাই কান্দে উচ্চ স্বরে।
করিলেন তর্পণ পিণ্ড দিল তিনজন
তপস্যাকে চলিল সাগরে॥" (জগজ্জীবন/১৩-১৪)

দাহকার্য শেষে চিতা শীতল করার পর পিণ্ডদান বিধি ছিল। অবশ্য সর্পাঘাতে মৃত্যু দাহযোগ্য ছিল না–

"সর্পাঘাত হইলে অগ্নিতে না পুড়ি।" (বিজয়/৪৩৭)

যে সমস্ত স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় সতী হত তারা স্নান করে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে স্বামীর চিতায় অনুপ্রবেশ করত আর পুত্ররা অগ্নিসংযোগ করত। জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখণ্ডে ধর্মদেবের মৃত্যুর পর মনসার সতী হওয়ার বর্ণনা পাই

"স্নান করি মনসা সুন্দরী মহাসতী।
জোড় হস্ত করিয়া ধর্ম্মকে করে স্তুতি॥
চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।

চিতাত শুতিলা মনে ভাবিয়া অসার॥
চারিদিগে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা-কামিনী॥" (জগজ্জীবন/১৫-১৬)

এরপর অশৌচান্ত পর্যন্ত নানা আচার পালিত হত। অশৌচান্তে মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও পিণ্ডদান করা হত। অর্থবান ব্যক্তিরা তীর্থে গিয়ে পিতৃতর্পণ করত। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে জল দানই তর্পণ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-– নানা আচার ও ব্যয়বহুল বিধানের মধ্যে দিয়ে পালিত হত। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে অন্ন দান, বস্ত্র দান, ভূমি দান, গো দান, কাঞ্চন দানও করা হত। সামাজিক অবস্থান অনুসারে শ্রাদ্ধের নানা বিধান। বংশীদাসের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগর পিতার মৃত্যুর পর 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ করে –

"চন্দ্রধরের মাতা পিতা মৈল কাল পায়্যা।
শতপুত্র কার্য্য করে এক পুত্র হয়্যা॥
রজত কাঞ্চন ধেনু জল ভূমি আদি।
দানসাগর শ্রাদ্ধ কৈল বৃষোৎসর্গ বিধি॥" (বংশীদাস/৬৮)

তাছাড়া কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেলে বা বিদেশে মৃত্যু হলে 'তেরাত্রি' শ্রাদ্ধ করা হত। চাঁদ সদাগরের মৃত্যুর খবর পেলে সোমাই পণ্ডিত সেই ব্যবস্থা করার আদেশ দেয় —

"সোমাই পণ্ডিতে বলে স্থির কর মন।
তেরাত্রি শ্রাদ্ধ হবে বেবস্থার বচন॥" (বিজয়/৩১১)

বাঙালী সমাজে বিভিন্ন রকম পূজা-পার্বণ ও উৎসব পালিত হত; যেমন ফসল রোপণ উৎসব; অকুমারী ভূমিতে লাঙ্গল দেওয়া নিষিদ্ধ, তাই ভূমিপূজার ব্যবস্থা করা হত। জগজ্জীবনের কাব্যে শিবঠাকুরের চাষবাসের পূর্বে এই আচার পালিত হয়েছে–

"সোনার লাঙ্গলে হাল জুড়ে পশুপতি।
রহিয়া ডাক পাড়ে কুমারী বসুমতী॥
ধর্ম্মের দোহাই লাগে ধর্ম্মের মাথা খাঅ।
অকুমারী বসুমতীতে লাঙ্গল না লাগাঅ।
... ...
সোবর্ণের ঘটবারি স্থাপিলেন আগে।
বসিলেন ইন্দ্র বসুমতী বাম ভাগে॥
মাথাত ছিটায় আগে পল্লবের জল।
সুরনারীগণে করে উর্লুর্লু মঙ্গল॥
দুইজনার কাপড়ে বান্ধিল লগ্ন-জাটি।
ইন্দু বসুমতী করে ফুল ছিটাছিটি॥" (জগজ্জীবন/২২)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকার ব্যবহার ছিল প্রচুর, তাই নৌকাপূজাও করা হত। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে নারীরা ধান, দূর্বা, পূর্ণঘট সাজিয়ে উলুধ্বনি ও বাদ্যসহকারে নৌকায় হরগৌরী পূজা করে। বংশীদাসের বর্ণনানুযায়ী—

"হস্তে ধান্য দুর্ব্বা নারী, পূর্ণ কুম্ভ সারি সারি,
বেদ পঠে সকল ব্রাহ্মণ॥
যাত্রা করি অধিকারী, পূজিলেন হরগৌরী,
প্রণাম করিলা সপ্তবার।

সুত মাগধ ভাটে , বন্দিয়া যে স্তুতি পঠে,

নারীগণ দিলেক জোকার॥" (বংশীদাস/১১২)

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনে ছন্দোবদ্ধ আচার-বিচারে আবর্তিত মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের রূপরেখা পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে।

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি ভাব-কেন্দ্রিক উপকরণগুলি অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতির কথায়। প্রথমে আসি শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যে। বাঙালীর প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে খুব একটা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে বেশীর ভাগ মানুষই ছিল অশিক্ষিত, সাধারণ জনসমাজে শিক্ষা তেমন প্রভাব ফেলেনি, আর সেকালের শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা হল চণ্ডীমণ্ডপের শিক্ষা। ধনী ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় পাঠশালা বসত, কখনো কখনো গুরু মহাশয়রা চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে শিক্ষা দিত। অবশ্য তা ছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্তই, উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না, মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে সম্পর্কিত তথ্যও তেমন পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র ও লখীন্দরের শিক্ষার কথা পাওয়া যায়। এর মধ্যে দিয়ে চৈতন্য-পূর্ব যুগের শিক্ষার কথা, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহের কথা জানা যায়। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের হাতে অর্পণ করা হত। 'হাতেখড়ি' নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুর বিদ্যারম্ভ হত। অনেক সময়ই ধনী ঘরের ছেলেরা অধিক বয়সে লেখাপড়া শিখত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে লখীন্দরের পাঁচ বছর বয়সে 'হাতেখড়ি' দেওয়ার কথা পাই —

"পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।

হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল॥" (বিজয়/৩০৩)

বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের শিক্ষা বর্ণনায় সেকালের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায় —

"উচ্চারণ মাত্রা শিক্ষা করে গুরু-স্থানে
পড়িবারে যত্ন করে জননীর স্থানে।
লখাইর অনুমতি পায়্যা রাজরানি
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে ডাক দিয়া আনি।
সনকা বলেন দ্বিজ না করিহ হেলা
যত্নে পড়াইহ মোর লখিন্দর বালা।
শুনিয়া হরিষ দ্বিজ রানির বচনে
লখাইর হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে।
ক খ গ ঘ ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।
অষ্টদশ ফলা পড়ে হরিষত-মন
চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল পঠন।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
. . . .
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তার পর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান

জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।" (বিপ্রদাস/১৫৩)

আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গলে' বিজয় গুপ্তের কাব্যাংশে সেকালের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য পাই সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিবরণে। সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালায় নানা দেশ অর্থাৎ নানা গ্রাম থেকে উৎসাহী ছাত্রেরা পাঠগ্রহণ করতে আসত। অবশ্য সেই পাঠশালা চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত। কবির বর্ণনানুযায়ী –

"ছোট জন নহে চান্দ রাজভোগে ভোলা।
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা॥
নানা দেশে পাঠ সব, নানা দেশে ঘর।
সোমাই পণ্ডিত পাঠ পড়ায় নিরন্তর॥" (বাইশা/১১৪)

সেকালের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায় সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিবরণে। সেখানে "কেহ কাব্যশাস্ত্র পড়ে কেহ ব্যাকরণ।" (বাইশা/১১৪) অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হত। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখীন্দরের গুরুগৃহে পাঠগ্রহণের কথা আছে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের শিক্ষার কথা পাই।

সেকালের পাঠশালার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কথা পাওয়া যায় সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিবরণে। সেকালে শিক্ষককে 'গুরু মশায়' বলা হত। ছাত্ররা গুরু মহাশয়কে ভয়ও করত আবার ভক্তিও করত। গুরু মহাশয়রা ছাত্রদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখত। তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনত —

"একদিন ছয় ভাই পড়ে পাঠশালা।
পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেলা॥
ক্ষুধায় বিকল সোমাই অধিক বাড়ে আশা।
শিষ্যে শিষ্যে পরিহাসে হইল জিজ্ঞাসা॥
'এখন হইল সময় ভুঞ্জিবার তরে।
কোন জনে কেমনে ভুঞ্জিবা গেলে ঘরে'॥" (বাইশা/১১৫)

অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়া কারিগরী শিক্ষা বা চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। একমাত্র উচ্চশিক্ষার বিষয়ে প্রতিটি ছাত্র চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করত। সমাজে পেশাদারী চিকিৎসক বৈদ্যরা ছিল,তারা চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল। চিকিৎসক হিসাবে ওঝা, বৈদ্যরা সাধারণভাবে চিকিৎসা করত, সাধারণ মানুষ চিকিৎসা বিষয়ে তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশে প্রতি বছর সর্পদংশনে প্রচুর লোকের মৃত্যু হত, একারণে সাপের বিষের চিকিৎসা করার জন্য এক শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল, তাদের 'ওঝা' বা 'ধন্বন্তরি' বলা হত। মনসামঙ্গল কাব্যে ধন্বন্তরী সঙ্কর গাড়রী- কথা পাওয়া যায়। এক দল শিষ্য তার কাছে 'ধন্বন্তরিবিদ্যা' শিক্ষা করেছে। অবশ্য এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে হত। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেখা যায় কাশীরাজ মহিষী নানা বিদ্যা শিক্ষার জন্য রাজপুত্রকে গুরুর হাতে দেয় এবং নানা বিদ্যা অর্জনের শেষে রাজপুত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেয় –

"নানাবিধ বিদ্যা শিখি হৈলা বিশারদ।
শিখাইয়া দিলা গুরু বিবিধ ঔষধ॥
শঙ্খ ধন্বন্তরি গুরু দিল তার নাম।

ভূবন বিখ্যাত হল তার গুরু গ্রাম॥"[২৬]

চিকিৎসা শাস্ত্রে রাজপুত্র দক্ষতা অর্জন করে। সেকালে হেকিমি, কবিরাজী, ওঝাবিদ্যা, তুক্‌তাকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। তাই অর্জিত বিদ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে —

"ত্রিভূবন বশীভূত ঔষধের গুণে।
ভাষায় পৌরুষ তার বাখানি কেমনে॥
বৃদ্ধ হইলেক যুবা ঔষধের বলে।
অকালে মরিলে জীবন জিয়ায় সেকালে॥
বন্ধ্যা নারীগণ হয় গর্ভের সম্ভবা।
নীরোগ সকল লোক বৃদ্ধ হয় যুবা।
অন্ধ খোঁড়া গোঁজা মেজা নাহিক সংসারে।
বৃক্ষাদিতে ফলপুষ্প বিলক্ষণ ধরে॥"[২৭]

বিভিন্ন ঔষধগুণযুক্ত লতাপাতা দ্বারা চিকিৎসা করা হত। 'বিশল্যকরণী' এমনই একটি বৃক্ষ, যার বিষনাশক ক্ষমতা আছে। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বিশল্যকরণী বৃক্ষের বিষনাশক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে —

"ওঝা বোলে শুন মোর যত শিষ্যগণ।
এই দুই প্রহর বহি আমার মরণ॥
শালি বিশালি গাছ সাতালি পর্ব্বতে
ঔষধ আনিয়া বাপু দেহ মোর হাতে॥
শিষ্য বোলে গুরু ঔষধ নাহি জানি।
কেমত উপায়ে যাঞা মহা-ঔষধ আনি॥
ওঝা বোলে কুকুড়াক খুয়াঅ গরল।
পর্ব্বতে নিয়া ফির প্রতি গাছের তল॥
যেই গাছের গন্ধে কুকুড়া পায় প্রাণ।
সেই গাছ আন বাপু মোর বিদ্যমান॥
ওঝার বচনে চলে এক শত শিষ্য।
কুকুড়া পক্ষক মারে খুআইঞা বিষ॥
সাতালি পর্ব্বতখান উদ্দেশিয়া যায়।
প্রতি গাছে গাছে মরা কুকুড়া ছোয়ায়॥
কুকুড়া পাইল প্রাণ ঔষধের গন্ধে।
সেই গাছ তোলে শিষ্য পরম আনন্দে॥"   (জগজ্জীবন/২৫১)

রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। সর্পদংশন ব্যতীত, সংজ্ঞাহীন রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা ইত্যাদিতে চড়চাপড় মেরে বিষ নামানোর কথা মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়। লখীন্দরের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য মনসা তার পিঠে চড় মারে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুযায়ী —

"নাগবাচা বিদ্যা দেবি পড়িল আপনি
ঝাটো আসিলেন বিষ কালী নাগিনী।
মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে
ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে।"   (বিপ্রদাস/২২১)

এই বিদ্যাকে মনসামঙ্গলে 'নাগবাচা' বিদ্যা বলা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা নানা তন্ত্র-মন্ত্র তুক্‌তাক্ ইত্যাদি শিখত। বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের তন্ত্র-মন্ত্র শিক্ষার কথা পাওয়া যায় —

"হেনমতে ফিরে সুখে রাজার নন্দন
নানা তন্ত্র-মন্ত্র শিখে ভার-সম্ভারণ।" (ঐ / ১৫৩)

নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না; বলা যায়, চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্যে নারীশিক্ষার কথা নেই। সাধারণত নারীরা ছিল নিরক্ষর। চৈতন্য-পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে অবশ্য নারীশিক্ষার কথা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে সনকাকে নির্দেশ দেয় —

"যদি গর্ভে হয় কন্যা : করিহ কুলের ধন্যা : পুত্র হৈলে পড়াইঅ তারে॥"(ক্ষেমানন্দ/২২৩)

অর্থাৎ মানুষ নারীর শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করত না। যাই হোক, পুথিগত শিক্ষা ছাড়াও নারীরা চিত্র শিল্প, সূচীশিল্প বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্প ও রন্ধনকার্যে পারদর্শিতার পরিচয় দিত। গৃহগত পরিবেশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীদের কাছে তারা এই সমস্ত বিদ্যা অর্জন করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে কাজলা মালিনীর শোলার শিল্পকর্মে দক্ষতার পরিচয় আছে। তাছাড়া গৃহসজ্জা, আলপনা অঙ্কন, নৃত্যগীতে বাঙালী নারীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার বাল্যকাল থেকে নৃত্যগীত শিক্ষার কথা পাই —

"মা-বাপের বাড়ীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার নাচনে অমলা মোহ যায়॥
শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃত্যগীত।" (ক্ষেমানন্দ/২৩৯)

প্রতিটি মনসামঙ্গলে বেহুলার নৃত্যগীত পরিবেশনের কথা আছে। আমরা বিপ্রদাসের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি —

"আপনি মৃদঙ্গ বাহে গীত গাহে রঙ্গে
সুতাল সুচ্ছন্দে নৃত্য করে অঙ্গভঙ্গে।
ক্ষেণেকে রহিয়া রামা করয়ে বিশ্রাম
পুনঃ ছন্দ-বিছন্দে নাচয়ে অনুপাম।" (বিপ্রদাস/২১৬)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও বেহুলার দেবতা প্রশংসিত নৃত্য বর্ণনা আছে —

"দেবতা-সভায় গিয়া : খোল করতাল লয়্যা : নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি : ফিরে যেন নৃত্যশিখী : গায় যেন কুকিলের ধ্বনি॥
... ...
নৃত্যগীতে মন মোহে : যতেক দেবতা কহে : ভাল নাচে বেহুলা নাচনী॥"(ক্ষেমানন্দ/২৭৩-২৭৪)

শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প-সংস্কৃতির সামান্য পরিচয় আছে মনসামঙ্গল কাব্যে। কাব্য, নাটক, গীত-বাদ্যের চর্চা সংস্কৃতির বিষয়। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলপনা অঙ্কন করা, মণ্ডপ সজ্জা করা হত। বেহুলার বিবাহকালে সুন্দর করে আলপনা অঙ্কন করে, ঘট ও আম্রপল্লব দিয়ে ছায়ামণ্ডপ সাজানো হয়েছিল। বরণডালা সজ্জা, ধান, দূর্বা, প্রদীপ সজ্জা, মাঙ্গলিকদ্রব্য সজ্জা, বিবাহাচার পালন ইত্যাদিতে রুচির পরিচয় আছে। অলঙ্কার শিল্পে বাঙালী শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাই, রূপচর্চা, কেশ বিন্যাস ইত্যাদিতে বাঙালী নারীর দক্ষতার পরিচয় পাই।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানঃ অতঃপর আসা যাক্ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ বা প্রহেলিকা প্রধান। মনসামঙ্গল কাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার প্রচুর হলেও ধাঁধাঁ বা প্রহেলিকা জিজ্ঞাসার উল্লেখ দেখা যায় না। তবে বিভিন্ন ধরনের সুপ্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার আছে মনসামঙ্গলে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রবাদগুলির ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। মনসামঙ্গলে বিভিন্ন কবির ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলির একটি তালিকা তৈরী করা যেতে পারে ঃ

বিজয় গুপ্তের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডন কভু না যায়।

২। বিধির নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।

৩। স্ত্রীরে যে আপন বলে সে জন বর্বর।

৪। উর্দ্ধ আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি।

৫। স্বামী না থাকিলে নারীর জীবন কুৎসিৎ।

৬। বিনে শুদ্ধিতে ঘরে গেলে লোকে না বলে ভাল।

৭। পাকনা জামিরে যেন উপাধিক রস।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। জ্বর-পিত্ত মুখে যেন চিনি লাগে তিতো।

২। অতি লোভে ভাল নহে দেখ ত্রিভুবনে।

৩। ইষ্টমিত্র জত দেখ সম্পদ-সময়
পড়িলে আপদকাল কেহ কারো নয়।

৪। আপদে বনিতা বিনা নাহিক সহায়।

নারায়ণ দেবের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। বালকের মুখে জেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে জেন দেখি পাকা বেল॥

২। আপদ করিলে দেখ বল বুদ্ধি ছাড়ে।

৩। আপনে বর্ত্তীলাম আমার রৈল সব সংসার।

৪। মৎস হইয়া কুম্ভিরের সনে কর বাদ।

৫। যে যে গুণি সুজন হয় তার সমান ব্যবহার।
কোনকালে দূষ্য বাক্য মুখে না আইসে তার॥

৬। দুরবুদ্ধি হইলা সাধু পাতিলে জঞ্জাল।
কাকের বাসাতে কুকিল থাকে কত কাল॥

৭। চোরে ভাণ্ডার পাইলে জেন সাত হাতে লোটে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। ভাঙ্গিলে সোনার পাত্র:পুনু গড়া যায় মাত্র:ভাঙ্গিলে না গড়া যায় মন।

২। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেবা অগ্নি করে হাথে।
বিদ্যমানে দেখ হস্ত পোড়া যায় তাথে॥

৩। বাঙন হইয়া চাহ ধরিতে আকাশ।

৪। কালসর্প ধরে যেবা হয়্যা মন্ত্রহীন।
দেবতা তাহারে বৈরী তার দিন ক্ষীণ॥

৫। কাটিলে বৃক্ষের ডাল মূল যদি রয়।
মঞ্জরিতে পূণরপি বহুদিন হয়॥

৬। যেই যারে হয় মিত সেই তারে করে হিত

ইতিহাসে কর অবধান।

৭। বিপত্ত্যের তার কেহ নহে সখা।

৮। জ্ঞান হত পুরুষের: কোন কার্য্য জীবনের: নয়ন থাকিতে সেই অন্ধ

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা।

২। উত্তম হইয়া তুমি হইবে অধম।

৩। যদি কোড়ি দিতে পারি সাজি আসে পরনারী
জাতিকুল না করে বিচার।
যার নাই কোড়িধন প্রিয় নহে পুত্রগণ
নিজ নারী না দেন শৃঙ্গার॥

৪। কোড়ি হৈলে হয় মহাজ্ঞান।

৫। সতত ঘসিলে নাকি অঙ্গার ছাড়ে মৈল।

৬। বৃদ্ধা বলে প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।

বিষ্ণু পালের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। পতিব্রতা ঝি হয় গৌসিংহে সরিষা রয়
ক্রোধ না রয় ততক্ষণ।

২। বাঁউন হইয়া হাথ বাড়াইলি চাঁদে।

৩। জলে বাস করে বাদ কুম্ভীরের সনে হৈল।

৪। হাঁড়ির উমানে কুমারে গড়ে সরা।

এ সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধ্যান- ধারণার প্রকাশ আছে। কখনো মানব চরিত্র সম্পর্কে, কখনো বা নারীর অবস্থা সম্পর্কে, কখনো সামাজিক বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ ব্যবহার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, বাসরযাপন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হলেও মনসামঙ্গলে ধাঁধাঁর ব্যবহার নেই। কবিগণ কাল-নির্ণায়ক প্রহেলিকা দিয়েছেন, তা থেকে কবিদের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসা যাক্ ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। মনসামঙ্গল কাব্যে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার কথা বর্ণিত হয়নি, আসলে গ্রামীণ বাঙালী সমাজে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা খুব একটা হত বলে মনে হয় না, তবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাঙালী বালক-বালিকারা বাল্যকালে যে সমস্ত ক্রীড়া, খেলাধূলা ও দৌড় ঝাঁপ করত তাতেই তাদের শরীর ও মন বিকশিত হত। বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের বাল্যক্রীড়ায় রাজাপাত্র, তেঁপাতিয়া, বাঘচালি, মঙ্গলপাঠান, সতরঞ্চ, চৌপার ইত্যাদি লোকক্রীড়ার কথা আছে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে —

"প্রথমে খেলায় ভাড় পুরিয়া ধূলায়
হুকাহুকি করে কেহ অঙ্গুলি মট্‌কায়।
অঙ্গরি লইয়া সুখে রাজা-পাত্র খেলে
জেই হারে তারে মারে শিশুগণ মেলে।
তেপাঁতিয়া বাঘচালি মঙ্গল-পাঠান
কেহ হারে কেহ জীনে নহে সমাধান।

সতরঞ্চ চৌপাড় খেলায় শিশুসঙ্গে

দণ্ড করি আঠারো সতেরো ডাকে রঙ্গে।" (বিপ্রদাস/১৫৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে 'ভাঁটা', 'টিকডাঁড়ি' খেলার কথা পাই। কাজলা মালিনীর দুই পুত্র সমস্ত দিন ভাঁটা খেলে বেড়ায়। রাখাল বালকদের খেলার বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"কেহ টিকডাঁড়ি খেলে কেহ ভাঁটাকড়ি।" (ক্ষেমানন্দ/৮৮)

এছাড়া পাশা, সতরঞ্চ বা দাবা ইত্যাদি খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল।

সামাজিক অবস্থা ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে তিন বঙ্গের তিনটি ধারায় বাঙালী সমাজের যে রূপ পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়। শুধু আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাস, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদই নয়, সমাজের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কেও জানা যায়। লক্ষণীয়, সমাজ চরিত্রের দিক থেকে তিন বঙ্গের সমাজ ইতিহাসের খুব একটা পার্থক্য নেই। অখণ্ড বাংলাদেশের চরিত্র একই ভাবে গড়ে উঠেছে, তবে কালগত ব্যবধানে এবং অঞ্চলগত ব্যবধানে সামান্য পার্থক্য ঘটে থাকবে।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ ছিল পুরুষশাসিত। মধ্যযুগীয় পুরুষরা ছিল স্বেচ্ছাচারী, শিথিল চরিত্রের। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে তাই পুরুষকে 'ভ্রমরা জাতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যশাসিত কুলীন সমাজের মধ্যমণি শিবঠাকুর স্বয়ং সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত। আবার সে-ই কামপরবশত পরনারী আসক্ত হয়ে পড়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করত। সমাজে পুরুষ চরিত্র কত দুর্বল ছিল তার দৃষ্টান্ত শিবঠাকুর, কেননা নারী দর্শনেই সে কামাসক্ত হয়। পুরুষের এই নৈতিক দুর্বলতা সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতা খুব সীমিত, কিন্তু ভ্রষ্ট চরিত্র পুরুষকেনিয়ন্ত্রণ করতে হত নারীকেই। মনসামঙ্গলে দেখি পার্বতী শিবঠাকুরের আঁচলে আঁচল বেঁধে শুয়েছে। কিন্তু ভ্রমর বৃত্তির পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল না। পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে শিবঠাকুরকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাই লক্ষ করা যায়। মনসামঙ্গলে পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারণ এবং মনসার বার বার ছদ্মবেশ ধারণের কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে— প্রথমতঃ পুরুষের ভণ্ডামীর স্বরূপ প্রকাশ করে লজ্জিত করে তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ সেকালে উচ্চবর্ণের নারী ছিল সম্পূর্ণ পর্দানসীন, গৃহের বাইরে তাদের গতিবিধি ছিল না, তাই ডোমনী বেশ ধারণ করে তাকে বাইরে যেতে হয়েছে। মনসা মালিনী, গোয়ালিনী, কিম্বা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করেছে কারণ নিম্নবর্ণের নারী এবং উচ্চবর্ণের বিধবা ব্রাহ্মণীর গতিবিধি অনেক অবাধ ছিল। তৃতীয়তঃ উচ্চবর্ণের সমাজে নারীকে কখনো কখনো হীন বৃত্তিতে নেমে যেতে হয়েছে। পুরুষ ইন্দ্রিয়াসক্তি ও অকর্মণ্যতা নিয়ে মগ্ন থাকত আর নারীকে অনেক সময় গৃহের ব্যয়ভার বহন করতে হত। বস্তুতঃ দেবদেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও হরগৌরীর সংসারযাত্রার বিবরণে তাই মনে হয়।

শিথিল চরিত্র পুরুষের পরনারী আসক্তিবশত যে সন্তানের জন্ম হত তাকে সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হতে হত। মনসার জন্মবৃত্তান্ত থেকে তাই মনে হয়। পিতা সেই পরিত্যক্ত কন্যাকে চেনে না এটাই স্বাভাবিক। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন – "পুষ্পবনে জন্মিল কন্যা বাপে নাহি জানে।" (বিজয়/২০)। বলাই বাহুল্য কুলীন পুরুষের অবৈধ সন্তান মনসা। বৃদ্ধ শিবঠাকুর যুবতী কন্যা মনসাকে দেখে কামপরবশত আলিঙ্গন প্রার্থনা করে, কিংবা খেয়া পারের যুবতী ডোমনীকে দেখে আলিঙ্গন কামনা করে, এসমস্ত ঘটনা থেকে সমাজে নৈতিকতার বাঁধন কত আল্‌গা ছিল তা বোঝা যায়। অবৈধ সন্তান জন্মদানের পর তাকে পরিত্যাগ করার ঘটনা সমাজে নতুন নয়, মনসাও সে-কারণে পরিত্যক্তা। মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ এসব অবৈধ সন্তানদের আশ্রয় দিত না, ঘৃণার চোখে দেখত। মনসারও সমাজে ঠাঁই হয়নি, তাকে বনবাসে পাঠাতে হয়েছিল।

পুরুষের পাশাপাশি নারীরও নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। নারীদের শিক্ষাদীক্ষা খুব একটা ছিল না, তারা তাদের ক্ষুদ্রতা নিয়ে, কলহ নিয়ে, পরনিন্দা, পরচর্চা নিয়ে দিনাতিপাত করত। নারীদের পতিনিন্দা অংশগুলিতে নারীর

এই সংকীর্ণ মনের ছাপ স্পষ্ট। বিপ্রদাসের কাব্যে নারীর পতিনিন্দায় বলা হয়েছে —

"বৃদ্ধ ভাবিনী জত লখাই দেখিয়া হত
মৃতাবত যৌবনের শোকে
জখন যৌবন ছিলো হেন বর না মিলিল
সর্ব্বক্ষণ বঞ্চিতু কৌতুকে।
জতো বালা অবস্থিতা সেই ভাবে মন-কথা
যৌবন প্রকাশ মাত্র তায়
লখাইর রূপগুণে সেহ হত কামবাণে
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়।" (বিপ্রদাস/১৯০)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অধঃপতন আরো কতটা প্রকটিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে। এখানে দেখা যায় গঙ্গা ও দুর্গা যুক্তি করে গৃহত্যাগ করেছে। নদী পারাপারের সময় দুর্গার রূপ দেখে ব্রহ্মা কামাসক্ত হয়েছে, শেষে দুর্গা গর্ভবতী হয় এবং শেষে নদীতীরে গর্ভপাত করে। কিংবা লখীন্দরের মাতুলানীর শ্লীলতাহানির প্রসঙ্গ সামাজিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। এমন কি পুরুষ কখনো কামপরবশত আপন কন্যার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করত। জগজ্জীবনের কাব্যে দেবখণ্ডে পাই —

"কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জ্জিয়া খাল্যে ফল দোষ কিবা আছে॥
বাপের বচনে কথা কহে তিন ভাই।
উপার্জ্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই॥
গোসাঞি বোলে তিন পুত্র শুন মোর বাণী।
ভগ্নী এক সৃজিল তোমার মনসা-কামিনী॥
তার রূপ দেখি মোর স্থির নাই মন।
বিভা করাইয়া দেহ পুত্র তিন জন॥" (জগজ্জীবন/৯)

নিম্নবর্ণের সমাজেও নারীর এই অধঃপতন দেখা গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে সামাজিক বিধান মেনে নিলেও সুযোগ পেলেই তারা বিধান লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিত। যুবতী ও বিধবারা যে কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারত। জগজ্জীবনের কাব্যে এক যুবতী বিধবার বক্তব্য —

"ঘরমধ্যে যুক্তি করে যুবক সব রাড়ি॥
যুবক রাড়ি বোলে আমার কিবা ডর।
নিভাতারী ভাতার পাব চণ্ডিকার বর॥
যে পাইকে লৈয়া যাবে তার সঙ্গে যাব।
রান্ধিয়া রাঢ়িয়া ভাত সুখে বসি খাব॥"(ঐ/১৮৩)

এ সমস্ত কারণেই নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের জায়গায় ফাটল ধরেছিল। প্রতিটি মনসামঙ্গল কাব্যেই দেখি যে, শিবঠাকুর মনসাকে গৃহে নিয়ে এলে পার্বতী তাকে সতীন বলে সন্দেহ করে। মনসা পার্বতীর কাছে নিজের পরিচয় দিলেও তা বিশ্বাস করা সম্ভব হয়নি —

"না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ।
শিব মোর স্বামী নহে জন্মদাতা বাপ॥

দুর্গা বোলে মালঞ্চে করিলে নানা কেলি।
সঙ্কট দেখিয়া স্বামীকে বাপ বোল বালি॥" (ঐ/৮৪)

জগজ্জীবনের কাব্যে 'কলির ফলাফল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে নারীর এই অধঃপতনের কথা-

"স্ত্রীলোক ছাড়িবে তবে আপনার পতি।
পরের পুরুষ লইয়া ভুঞ্জিবে সুরতি॥" (ঐ/৬)

নৈতিক অধঃপতনের কারণেই নরনারীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একারণেই নারীকে 'গর্ভপত্র' নিতে হত, চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে সনকা চাঁদের নিকট থেকে গর্ভপ্রমাণ স্বরূপ 'গর্ভপত্র' নিয়েছিল। সনকা চাঁদকে বলে –

"পঞ্চ মাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।
লোকধর্ম্মাচারে পাছে হয় অপমান
তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।" (বিপ্রদাস/১৪০)

এ কারণেই পুত্র লখীন্দরকে প্রথম বার আপন গৃহে দেখে সনকাকে চাঁদ প্রশ্ন করে — "পর পুরুষ দেখি কেন পুরীর ভিতর।"(বিজয়/৩১৭)। নারী-পুরুষের সম্পর্ক কতখানি অসুস্থ ছিল অন্যান্য বিবরণেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারী স্বামীর দৃষ্টিতে নারী ছিল ভোগের উপকরণ, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, তাই স্বামী ইচ্ছে করলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারত। জরৎকারু বিবাহ রাত্রেই সামান্য অপরাধে মনসাকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বংশ রক্ষার জন্য পুত্র বর দিয়ে যায়। পুরুষের কাছে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না, তাই চাঁদ সদাগর বার বার সনকাকে উপেক্ষা করে গেছে, তাই শান্তনু এক রাত্রি পরগৃহ বাসের জন্য স্ত্রী গঙ্গাকে পরিত্যাগ করে। লখীন্দর পুরুষ বলেই মায়ের নিষেধ অমান্য করে বিবাহে রাজী হয়। এমন কি স্ত্রীর কাছে গুপ্ত কথা প্রকাশ করাও নিষেধ ছিল—

"রাজস্থানে পুরাণে শুনিল জথা তথা
কদাচিত না কহিব স্ত্রীরে মর্মকথা।" (বিপ্রদাস/ ১০৭)

পুরুষের দৃষ্টিতে নারী যে ভোগের উপকরণ মাত্র ছিল মঙ্গলকাব্যে পুরুষ চরিত্রগুলির আচরণে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শিবঠাকুর ও চাঁদ সদাগর চরিত্রেই তার প্রকাশ দেখি। শিবঠাকুর নারী দর্শন মাত্র কামাসক্ত হয়ে পড়ে, চাঁদ সদাগর সনকার ভগ্নীবেশী মনসাকে দেখে কামাসক্ত হয়ে পড়ে, এমন কি নিজের দুর্বাসনার কথা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতেও লজ্জিত হয় না। বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদ সনকাকে বলে —

"গুপ্তে সনকায় ডাকি বুঝাইয়া বলে
তব ভগ্নি দেখি অঙ্গ দহে কামানলে॥
তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার
কর্ণে হস্ত দিয়া রানী করে হাহাকার॥" (ঐ/৯২)

দেবসভায় নর্তকী বেহুলাকে দেখে শিবঠাকুর বলে —

"দেখিয়া যৌবন তোর কাম-সাগরেতে মোর
ডুবি মন হইল বিকল।" (ঐ/২১৭)

শুধু পুরুষই নয়, নারীর নৈতিক আদর্শের হীনতাপ্রাপ্তি ঘটেছিল; তাই পরস্ত্রীকে নিজের স্বামীর ভোগের জন্য তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করতেও দ্বিধাবোধ করত না। বিপ্রদাসের কাব্যে সঙ্কর গাড়রীর স্ত্রী কমলা ছদ্মবেশিনী মনসাকে বলে —

"সহেয়ার হাব্যাস যদি বাড়ে তব মনে।

রঙ্গে নিশি বঞ্চিহ আমার স্বামী সনে॥" (ঐ/১০৬)

নারীদের পতিনিন্দা সামাজিক অবস্থার ফলশ্রুতি হলেও সুস্থ সমাজ মানসিকতার বিষয় নয়। জগজ্জীবনের কাব্যে ও বংশীদাসের কাব্যে বর্ণিত লখীন্দরের বাসরঘরে নারীদের স্থূল-অশালীন আচরণ এমন কি বৃদ্ধার বিকৃত লালসা আমাদের আহত করে। নরনারী সম্পর্কের মুখ্য উপাদানই হয়ে উঠেছিল কাম। জগজ্জীবনের কাব্যে সেকালের নারী সম্পর্কে পুরুষের মনোভাব এরকম ছিল—

"পরস্ত্রীকে পাইলে পুরুষ নাকি এড়ে।
আহার পাইলে তবে ব্যাঘ্র নাকি ছাড়ে॥
ঘৃত পাইলে যেন অগ্নি উঠে জ্বলি।
কমল দেখিঞা নাকি ক্ষেমা মানে অলি॥
মণ্ডুক দেখিয়া যেন আনন্দ ভুজঙ্গ।
স্ত্রীলোক দেখিয়া যেন কামের তরঙ্গ॥" (জগজ্জীবন/২৭৪)

মনসামঙ্গলে নারী সম্পর্কিত নানা সংস্কার সেকালে নারীর অবস্থানটি স্পষ্ট করে দেয়। নারী কখনোই একরাত্রি গৃহের বাইরে বসবাস করতে পারত না, তাহলে তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করা হত। বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখতে পাই ধর্মযজ্ঞে দেবতাদের রন্ধনের জন্য শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাকে শিবঠাকুর নিয়ে যেতে চাইলে শান্তনু জানিয়ে দেয় —

"আমার সহিত তবে এহ কর পণ।
গঙ্গারে লইয়া তবে করিবা গমন॥
দিবসে লইয়া যাবে, আনিবে দিবসে।
অস্তগত দিবাকর না লইব বাসে॥" (ক্ষেমানন্দ/১২)

বস্তুত শান্তনু গঙ্গাকে গ্রহণ করেনি, এমন কি নারী বাড়ির বাইরে রাত্রিবাস করলে স্বামী তার হাতে জল স্পর্শ করত না। বেহুলা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য দেবলোকে যাত্রা করলেও লখীন্দর প্রাণ ফিরে পেয়ে বেহুলার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করে। বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দর বেহুলাকে জানায় বেহুলার হাতে তার অন্নগ্রহণ সম্ভব নয় —

"কোথা যাও প্রিয়া তুমি শুনহ বচন।
কিমতে রন্ধন তব করিব ভোজন॥
ছয়মাস ভাসিয়া আসিছ দেবপুরে।
পরীক্ষা হইলে হস্তে পারি খাইবারে॥" (বংশীদাস/২৩৮)

গৃহের বাইরে রাত্রি বাসের কারণে বেহুলাকে নারায়ণ দেব, বংশীদাস এবং জগজ্জীবনের কাব্যে গৌরীকে পরীক্ষার দ্বারা সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কারণ সমাজ; চাঁদ সদাগর স্নেহবশত বেহুলাকে গ্রহণ করলেও সমাজ জ্ঞাতিবর্গকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনেই চাঁদ বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়—

"এক কথা মনে ভাবিএ কুশ্চিত॥
ছএ মাস ভাসিল বেউলা জলের উপরে।
জ্ঞাতিবর্গ সুনিয়া হাসিব আমারে॥
সাবধানে পণ্ডিত কবে আমার উর্থর।
পরিক্ষা করিয়া বধূ চলি জাউক ঘর॥" (নারায়ণ /২৮৫)

পুরুষশাসিত সমাজ কোন ভাবেই নারীর কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে চায়নি, তাই অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ করে

রাখতে চেয়েছে। দেবীদের পূজা প্রচার আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নারীও এই সংগ্রামে নারীর পক্ষ অবলম্বন করেনি। চৈতন্য-পরবর্তীকালে নারী সমাজে খানিকটা প্রতিষ্ঠা পেলেও পুরুষ সহজে স্বীকার করেনি, তবে পুরুষের মনোভাব অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। তাছাড়াও আরও নানা বাঁধন ছিল। নারীকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল, যেমন পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রাণী ও হস্তিনী ইত্যাদি। অবশ্য পুরুষকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, অশ্ব, শশ, বৃষ ও মৃগ। কোন জাতীয় পুরুষের সঙ্গে কোন জাতীয় নারীর বিবাহ হওয়া উচিত তা স্থির করে বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। বংশীদাসের বর্ণনানুসারে —

"হস্তিনী শঙ্খিনী আর চিত্রাণী পদ্মিনী।
অশ্ব শশ বৃষ মৃগ চারি জাতি গণি॥
যে জাতি পুরুষে শোভে সেই জাতি নারী॥
তার ভেদ কহিতে আগে শুন লো সুন্দরী॥
হস্তিনী নারীতে ইচ্ছে অশ্বক পুরুষ।
বৃষক পুরুষ পাইলে শঙ্খিনী সন্তোষ॥
মৃগ জাতি পুরুষে চিত্রাণী বাসে ভাল।
শশক পদ্মিনী সঙ্গে বঞ্চে চিরকাল॥" (বংশীদাস/১৮৩)

নারী সম্পর্কিত আরো নানা সংস্কার ছিল। নারীকে সুলক্ষণা-অলক্ষণা বিচার করা হত তার শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে, যেমন - উঁচু দাঁত, উঁচু কপাল, ফাঁকা দাঁতের গঠন যুক্ত নারী অলক্ষণা বলে বিবেচিত হত। বাসর ঘরে লখীন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু হলে তাই সকলেই বেহুলাকে দোষারোপ করে —

"বিষম সাধুর হটে : আমা সভে কিবা ঘটে : ভাল রীত নহে যে তাহার॥
যতেক কুলের ধনী : বেহুলার কথা শুনি : আপন শ্রবণে দেই হাথ।
চিরণ চিরণ দাঁতী : বিভার মঙ্গল রাতি : বাসরে খাইলে প্রাণনাথ॥"(ক্ষেমানন্দ/২৬১)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও দেখি লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার অলক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে —

"অতি কুলক্ষণী বেটি মটুক কপালী।
মারিলে সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী॥
দন্ত তোর দীঘল চিরণ মাথার চুল।
কুলক্ষণী ডুবাইলে বানিয়ার কুল॥" (জগজ্জীবন/২৪৩)

সাংসারিক মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য নারীকে দোষারোপ করা হত। লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকা বলে—

"সোনাই বলে বেউলা তুমি লঘুচর জাতি।
বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি॥" (বিজয়/৪৩৫)

নারী নিজেও এসম্পর্কে বিশ্বাস করত, বস্তুত বিবাহের রাতে স্বামীর মৃত্যু বড়ই অমঙ্গল বলে বিবেচিত হত। লোকেও তাকে উপহাস করত —"বিহার রাত্রে স্বামী মরে লোকে উপহাস্য।" (বিজয়/৪৩৯)।

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও দেখি বেহুলা তার ভাইদের বলেছে —"বিভা রাত্রে পতি মরে বড় অকুশল।" (ক্ষেমানন্দ/২৬৪)। এমন কি বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি চাঁদের নৌকাডুবির জন্য চাঁদ সনকার অলক্ষণকে দায়ী করেছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের কারণে নারীকেই দোষারোপ করা হত। জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দর মাতুলানী কৌশল্যার শ্লীলতাহানি করলে, লখীন্দর পুরুষ হওয়ার কারণে রক্ষা পায়, কিন্তু কৌশল্যাকে দোষারোপ করে গহনা-অলঙ্কার দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। কবি লিখেছেন-

"কে তোকে করিল বল   করিস শিশুর ছল

সবারে বুঝিতে বেড়ায় মন।
যে হৈল সে হৈল মাও   চুপে চাপে ঘরে যাও
পিন্ধিয়া সুবর্ণ আভরণ॥"   (জগজ্জীবন/১৬৮)

কৌলীন্যশাসিত সমাজে বহুবিবাহের মত সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীগণের পতিনিন্দা অংশটি কৌলীন্য প্রথাও বাল্যবিবাহের ফলশ্রুতি বলে মনে করি। কৌলীন্য প্রথা শেষ পর্যন্ত বংশগত প্রথাতে পরিণত হয়েছিল। ফলত, কুলীন কন্যার বিবাহ কুলীন পাত্র ছাড়া সম্ভব ছিল না। কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে বৃদ্ধ, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, রোগগ্রস্ত যে কোন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করত। তাই বালিকা মনসার বিবাহ হয় বৃদ্ধ জরুৎকারুর সঙ্গে। তাইতো এয়োগণ বেহুলার বিবাহসভায় রূপবান লখীন্দরকে দেখে স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেছে। যেমন —

"এক যুবতী বোলে মাও মোর কপাল পোড়া।
মুই হেন সুন্দরী রামা মোর স্বামী খোঁড়া॥
....
আর যুবতী বোলে সখী মোর কথা শুন।
আমার কালুয়া স্বামী দুই চক্ষে উন॥
...   .
আর যুবতী বোলে কথা মিথ্যা নাই তোর।
আমি হেন সুন্দরী নারী স্বামী কুজা মোর॥
...   .
আমি হেন সুন্দরী রামা গোদা স্বামী বুড়া।
দুই পায়ে দুই গোদ যেন ধানের পুড়া॥" (ঐ/১৮৯-১৯০)

অনেক সময় কন্যার পিতা কড়ির বিনিময়ে অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করত –

"আমার বাপ মাও তবে দুই চক্ষ ধরে।
কড়ি খায়া দেলে মোকে সড়া পচার ঘরে॥" (ঐ/১৮৯)

কখনো বাল্যকালেই নারীর বিবাহ দেওয়া হত, তাই বিপ্রদাসের কাব্যে এক কুলীন কন্যার আক্ষেপ শুনি—

"আর আইয় ভাবে দুঃখ   চাহিয়া লখাই-মুখ
শিশুকালে বিভা হইল কেনি
আমি হেন-রূপ হই   বিবাহে কুরূপ পাই
চক্ষু খাইল জনকজননী।"   (বিপ্রদাস/১৯০)

বস্তুত নারীকে রজঃস্বলা হবার আগেই বিবাহ দেওয়া বিধি ছিল। তাই ঘটক ব্রাহ্মণ যুবতী বেহুলাকে দেখে সায় সদাগরকে বলে —

"ব্রাহ্মণ বলেন বাণ্যা শুন তোরে কহি।
এত বড় যুগ্য কন্যা আছে অবিবাহী॥
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
কন্যা দেখি কেমনে উদরে দেহ ভাত॥" (ক্ষেমানন্দ/২৪১)

বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় কুলীন পাত্রেরা একাধিক বিবাহ করত। মনসামঙ্গলের শিবঠাকুর কুলীন সমাজের সমাজপতি, তার গঙ্গা ও গৌরী নামের দুই স্ত্রী। প্রধানত কুলীন সমাজেই বহুবিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বোধ

হয়। নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে পথে গোদার পরিচয় পাই, সে সত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তার চার স্ত্রী। সে বেহুলাকে বলে—

"তোর রূপে তেজিব ঘরের চাইর নারি।
রত্ন অলঙ্কার দিব দুই হস্ত ভরি॥" (নারায়ণ/৯৮)

বিপ্রদাসের কাব্যে বেহুলাকে জুয়ার বলেছে —

"আছয়ে তেইশ মাগু রূপে অনুপমা।
তা সবার রূপ মনে নাই লএ আমা।" (বিপ্রদাস/ ২১২)

জগজ্জীবনের কাব্যে শিবঠাকুর বেহুলাকে বলেছে —

"দুই স্ত্রী ছাড়িব পার্ব্বতী আর গঙ্গা।
তুমাকে লইয়া আমি হইব অর্দ্ধ অঙ্গা॥" (জগজ্জীবন/২৯৮)

এই অংশগুলিতে হাস্যরসের অবতারণা হলেও নির্মম সমাজ সত্যের প্রকাশ আছে। পুরুষ বহুবিবাহ করলেও সকল স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করত না, সামান্য কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করত। কখনো বংশ রক্ষার প্রয়োজনে, কখনো উপার্জনের কারণে বিবাহবৃত্তি গ্রহণ করত। নারীর বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত না থাকলেও জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি শান্তনু পরিত্যক্ত গঙ্গাকে শিবঠাকুর গ্রহণ করেছে, হয়ত পৌরাণিক প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে এই ঘটনা মনসামঙ্গলে প্রবেশ করেছে। আবার যুবতী বিধবাদের উক্তিতে বহুপতি গ্রহণের প্রবণতা ধরা পড়েছে।

মধ্যযুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; মনসামঙ্গলে সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময় সদ্যবিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত, অনেক সময়ই সতীদাহ বলপূর্বক করা হত। প্রধানত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীন সমাজেই সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের সমাজেও সতীদাহ প্রথা প্রবেশ করেছিল। চৈতন্য-পূর্বযুগের মনসামঙ্গলে সতীদাহের উল্লেখ কম। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি বিষ পানে শিবের মৃত্যু হলে দেবগণ পার্বতীকে সহমরণে যাবার অনুরোধ করেছে —

"শিব সঙ্গে যাও মাতা না কর অন্যথা।
তবে বশ হইয়া চলিল জগতের মাতা॥
শিব সঙ্গে শ্মশানে শুইয়া ভগবতী।
তাহা দেখি আনন্দিত দেবী পদ্মাবতী॥" (বিজয়/১০৯)

চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই সতীদাহ প্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ হ্রাস পেলেও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে আচার-বিচারের কঠোরতা জগদ্দল পাথরের মত সমাজের বুকে এঁটে বসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখণ্ডে মনসাকে স্বেচ্ছায় সতী হতে দেখি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলপূর্বক সতী হতে বাধ্য করা হত। তাই বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি পার্বতী সতী হতে গিয়ে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়েছে নদীর জলে—

"অগ্নির তেজ দেবী সহিতে না পারে।
ঝাপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের মাঝারে॥" (ঐ/১১০)

আবার জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি লখীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ সদাগর জ্ঞাতিগণকে নির্দেশ দিয়েছেন পুত্রবধূকে নিয়ে গগড়িএ্যা যেতে। বেহুলা তখন স্বামীর চিতায় তাকে না পুড়িয়ে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে অনুরোধ করেছে —

"না মার শ্বশুর মোকে পোড়াএ্যা আনলে।
ভাসাইয়া দেহ মোকে সাগরের জলে॥" (জগজ্জীবন/২৫৪)

মনসামঙ্গল কাব্য পাঠে মনে হয় মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে নিম্নবর্ণের সমাজে নারীর স্বাধীনতা ও সম্মান যথেষ্ট

বেশি ছিল। নিম্নবর্ণের সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না, ফলে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সহযোগিনী হতে পারত। ডোমনী, পাটনী, ফুলওয়ালী, পসরাওয়ালী, গোয়ালিনী জাতীয় চরিত্রগুলি দেবদেবীর ছদ্মবেশ হলেও বোঝা যায় এদের গতিবিধি সর্বত্র ছিল, আর ছিল বলেই দেবী তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রি করত। মনসামঙ্গলের শেষ পর্যায়ে বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণ করে চাঁদ সদাগরের গৃহে গমন কিংবা যোগিনী বেশ ধারণ করে সায় বেণের বাড়ী গমন সামাজিক বাধা নিষেধের কারণেই। গৃহের বাইরে নারীর গতিবিধি নিষিদ্ধ ছিল বলেই সমাজ তাদের গ্রহণ করত না। আবার চাষী পরিবারের বচাই জননী কিংবা জালু-মালুর জননী নারী হলেও তাদের নির্দিষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। জালু-মালু মায়ের কথা ও সম্মান নষ্ট করতে পারেনি। বোধ হয় নিম্নবর্ণের সমাজ ছিল খানিকটা মাতৃতান্ত্রিক। তাই সেখানে নারীর সম্মান ছিল এবং এই সমাজে নারী দেবতার পূজাও হত। উচ্চবর্ণের সমাজে নারী অন্তঃপুরে বার-ব্রত নিয়ে মগ্ন থাকত, দাম্পত্য জীবনে তাদের সম্মান ছিল না, তাই নারী দেবতার পূজাও সম্ভব ছিল না। তাই চাঁদ সদাগর অনায়াসে সনকার বুকভাঙ্গা হাহাকারকে অস্বীকার করে গেছে। পার্বতী, গঙ্গা, সনকা, চাঁদের ছয় পুত্রবধূ, বেহুলা একই সমাজেরই প্রতিনিধি চরিত্র। এমন কি দেখা যায় স্ত্রীর মৃত্যুতে বিলাপ করাও কাপুরুষতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে পার্বতীর মৃত্যুর পর শিবঠাকুর বিলাপ করলে নারদ শিবঠাকুরকে বলে—

"স্ত্রীর জন্য বিলাপ কর নহে বাস লাজ।" (বিজয়/৫৯)

এমন কি স্ত্রী স্বামীর সহকর্মী হতে পারত না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাওয়াও সমাজে নিন্দিত হত। জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি পুষ্পবনে যাত্রাকালে দুর্গা শিবের সঙ্গে যেতে চাইলে শিবঠাকুর জানিয়ে দেয়-

"শিব বোলে স্ত্রী লয়া যাইব কেমনে।
শুনিয়া ভর্চ্ছিবে মোকে যত দেবগণে॥" (জগজ্জীবন/৭১)

ব্রাহ্মণ্যসমাজের বিধবা ব্রাহ্মণীরা যেমন সর্বত্র যেতে পারত, তেমনি মনে হয় অভিজাত ঘরের নারীরা অনেক সময় দাসদাসী পরিবেষ্টিত হয়ে নগরের বাজারে যেতে পারত। অবশ্য চৈতন্য-পূর্বকালের কাব্যে এই প্রসঙ্গটি নেই। জগজ্জীবনের কাব্যে মেনকা দাসীকে নিয়ে হাটে যায় —

"হাট করিতে সাজে মেনকা পেটে বান্ধি ধামা।
... ...
দাসী সঙ্গে জনা চারি হাট করিতে যায়।
যতেক নগরের নারী বসিয়া রয়া চায়॥" (ঐ/১৭)

বিষয়টি অভিনব, সুতরাং নগরের নারীরা দেখে বিস্মিত হয়। মনে হয় মোগল হারেম থেকে প্রসঙ্গটি এসেছে। বেশীর ভাগ নারী ছিল অশিক্ষিত, তাদের মুখের ভাষা ছিল অসংযত। শিব-গঙ্গা-গৌরী ও অন্যান্য নারীরা যে ভাষায় বাক্-বিতণ্ডা করেছে তা কোন শিক্ষিত সমাজের নয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় বাঙালীর পারিবারিক চিত্র পাওয়া যায়। সে সময় পারিবার ছিল একান্নবর্তী এবং পুরুষ হত পরিবারের কর্তা। গৃহকর্ত্রী হিসেবে নারীর প্রতিষ্ঠা খুব একটা ছিল না। পুরুষরা গৃহের বাইরে উপার্জন করত এবং পারিবারিক নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করত। নারী স্ত্রী হলেও অনেকটা দাসীর মত আশ্রিতা ছিল; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খুব একটা মূল্য দেওয়া হত না। মনসামঙ্গলে স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করার প্রবণতা খুব বেশী। শিবঠাকুর, চাঁদ সদাগর, সঙ্কর গাড়রী প্রত্যেকেই স্ত্রীকে অত্যন্ত অবহেলা করত, এমন কি স্ত্রীর নিকটে কদর্য বাসনা প্রকাশ করতেও সঙ্কোচ বোধ করত না। সাধারণ বাঙালী পরিবারে পিতা-মাতা-সন্তানাদি নিয়ে একত্রে বসবাস করা হত। ধনী পরিবারে দাস-দাসী, ঝি-চাকর নিয়ে একত্রে পরিবারের মত বসবাস করত। তবে পারিবারিক আদর্শ বলতে যা বোঝায় তা খুব একটা ছিল না, কেননা পুরুষ সংসারে কর্তৃত্ব করলেও গৃহিণীর কোন

মর্যাদা ছিল না। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের পরিবার একটি বৃহৎ উচ্চবিত্তের পরিবার, শিবঠাকুরের পরিবার উচ্চবর্ণের নিম্নবিত্তের পরিবার, আর জালু-মালু কিংবা বচাই এর পরিবার নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের পরিবার। নিম্নবর্ণের পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব থাকত অনেক বেশী।

মনসামঙ্গলে মধ্যযুগীয় বাঙালীর পারিবারিক সম্পর্কের দিকটিও লক্ষ করার মত। সমাজে বহুবিবাহ ও ঘরজামাই প্রথা প্রচলিত থাকায় একান্নবর্তী পরিবার বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত থাকত। সপত্নী সমস্যা প্রবল থাকায় সপত্নী কলহ অনিবার্য ছিল। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুরের দুই পত্নী গঙ্গা-গৌরীর কলহ বর্ণনা একটি অন্যতম বিষয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় শিবঠাকুর মনসাকে গৃহে নিয়ে এলে গৌরী সতীন ভেবে মনসাকে প্রহার করতে থাকে এবং গঙ্গা এই কার্যে বাধা দিলে গঙ্গা-গৌরী কলহ সৃষ্টি হয়। গৌরী গঙ্গাকে বলে—

"অনুচিত আমি করি শাস্তি দিবে ত্রিপুরারি
তুমি নহে শাস্তির ভাজন।" (বিজয়/৫১)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছবি আছে।সেখানে শিবের প্রথমা স্ত্রী গঙ্গা জানিয়েছে-—সে বৃদ্ধা হওয়ায় রূপ যৌবনহীনা হয়েছে, তাই শিব বৃদ্ধকালে সতীন এনে দিচ্ছে—

"গঙ্গা বোলে গোসাঞি বয়সে হৈলু হীন।
বৃদ্ধকালে দিলে প্রভু দারুণ সতিন॥" (জগজ্জীবন/৪০)

গঙ্গা শিবঠাকুরকে সপত্নী কলহের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিবকে সাবধান করে দিয়েছে –

"গঙ্গা বোলে শুন স্বামী কহিতে বুঝিনু আমি
যে ধন পাইলা গুণমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হৈনু নির্ঘিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সতিনী॥
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবধি দ্বন্দ্ব কাচাল।
প্রথমে যুবতীর মুখ দুইতে না হবে সুখ
অবশেষে হইবে জঞ্জাল॥" (ঐ/৫২)

সপত্নী কলহের জ্বালায় অনেক পুরুষ গৃহত্যাগ করত। শিবঠাকুর গঙ্গা-গৌরীর কলহের জ্বালায় গৃহত্যাগ করেছে-

"শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে।
সাজ নন্দী বৃষ আমি যাবো পুষ্পবনে।" (ঐ/৭০)

কামুক, অকর্মণ্য পুরুষ সংসারের দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হত না। এমন কি সংসারের খবরাখবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না। সন্তানের জন্মদান করে তার প্রতি দায়িত্ব পালন করত না। গোয়ালিনীবেশিনী গৌরীর গর্ভে শিবের সন্তান জন্মালে সেই সন্তানের খোঁজ না নেওয়ায় গৌরীর আক্ষেপ —

"দ্বাদশ বৎসর হৈল আমার গণেশ।
তথাপি শঙ্কর দেব না কৈল উদ্দেশ॥" (ঐ/৭৫)

সপত্নীজাত সন্তানের সঙ্গে বিমাতার সুসম্পর্ক কখনোই হত না। মনসাকে গৌরী ভাল চোখে দেখেনি; মনসা সতীন নয় জেনেও সে তাকে প্রহার করে এবং তার এক চোখ কানা করে দেয়। শুধু তাই নয়, গৌরীর কারণেই জরৎকারু মনসাকে বিবাহ রাত্রেই পরিত্যাগ করে, শিবঠাকুর মনসাকে বনবাসে দেয়, এমন কি চাঁদ সদাগরকে মনসার বিরুদ্ধে উত্যক্ত করে প্রতিষ্ঠায় বাধা দান করে। বাস্তবে সপত্নীজাত সন্তানের প্রতি ছিল বিমাতার এমনি ক্রোধ। শিব বিষপানে অচেতন হলে নারদ দেবগণের অনুরোধে মনসাকে আনতে গেলে মনসা দুঃখ করে বলে —

"পিতা বর্তমানে সতা রহিতে না দিল তথা
কেমনে জাইব তার লক্ষে
কে পালিবে আমা সভা কেবা আর দিবে বিভা
কান্দে দেবী ভাবি মন-দুঃখে।" (বিপ্রদাস/৩৭)

এখানে মনসা চরিত্রের বাস্তবতা ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্যে সপত্নী কন্যার প্রতি বিমাতার ব্যবহারের সুন্দর চিত্র আছে। এর মধ্যে দিয়ে বাঙালী নারীর মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। মনসা শিবঠাকুরকে বাঁচাবার জন্য যেতে চায়, কিন্তু নারদকে জানিয়ে দেয় একখানি ভাল বস্ত্র না হলে সে যেতে পারছে না। তার বিমাতা যদি একখানি বস্ত্র নিয়ে আসে তবে সে শিবকে বাঁচাতে যাবে।মনসার কথা নারদের মুখে শুনে চণ্ডী বেছে বেছে একটি অতি সাধারণ বস্ত্রমনসার জন্য নেয়—

"শুনি চণ্ডী শীঘ্র গেলা আপনার ঘরে
ভালো বস্ত্র লৈতে সত্ত কিছু নাহি পুরে।
হাত পাঁচ কাচা-খানি কাঁকতলে থুয়্যা
চলিল সত্বরে দেবী সখীগণ লৈয়া।" (ঐ/৩৮)

মনসা দেবসমাজে বিমাতার এই ব্যবহারের কথা প্রকাশ করে দেয় —

"দেখ দেখ অপরূপ সকল দেবতা
যত্নে এই বস্ত্র মোরে দান কৈল সতা॥" (ঐ)

মনসা চরিত্রের এই ব্যক্তিত্বের দিকটিকে বিপ্রদাস সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চণ্ডী মনসার প্রতি ক্রোধবশত-

"ক্রোধে চণ্ডী উঠিল তেজিয়া লাজ-ভয়
মারিবারে মনসারে মুষ্টিক উঠায়।" (ঐ)

বিজয় গুপ্তের কাব্যেও মনসার পারিবারিক জীবনের ছবি আছে। মনসার বিষে চণ্ডী ঢলে পড়লে দেবগণের অনুরোধে মনসা চণ্ডীর প্রাণদান করে। চণ্ডী লজ্জিত হয়ে মনসাকে স্বীকার করে নেয়, বৃদ্ধ জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। জরুৎকারু মনসার পিতাকে অপমানসূচক কথা বলে – "ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান।" (বিজয়/৮৫)। মনসার বিষে জরৎকারু অচেতন হলে শেষপর্যন্ত সে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু মনসা জরৎকারু কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে—

"অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙ্গা পায়ে।
স্ত্রী লোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হয়ে॥" (বিজয়/৯১)

জগজ্জীবনের কাব্যে গঙ্গা ও গৌরী শিব-কন্যা মনসাকে অনেক সহজভাবে মেনে নিলেও শিবের ব্যবহারে এবং মনসার কারণে ঘরদুয়ার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গৃহত্যাগ করতে চায়। গৌরী বলেছে—

"মররে ভাঙ্গড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
বারম্বার দুঃখ দিস করিয়া অকাজ॥
মনেত জানিস কন্যা হয় বিষহরি।
লুকায়া আনিস কেনে করণ্ডিত করি॥
তোর যত ঘরদ্বার পোড়ায়া ফেলাব।
গঙ্গা দুর্গা দুই জনে দেশান্তরি যাব॥
... ...
দুর্গা বোলে গঙ্গা আমার বচন।

ঝিউ লৈয়া ঘর করোক ত্রিলোচন॥
বাপের সহিত ঘর করোক বিষহরি।
তুমি আমি দুই জনে যাই দেশান্তরি॥" (জগজ্জীবন/৮৮-৮৯)

শেষ পর্যন্ত শিবঠাকুর মনসাকে বনবাস দেয়, মনসা এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করে –

"ব্রাহ্মণী গেল এক ব্রাহ্মণের বাড়ী।
ব্রাহ্মণের ঘরে রহে হৈয়া নিজ চেড়ী॥
সফল দিনে দেবী কর্ম্মকার্য্য করে।
এক মুষ্টি অন্ন পায় ব্রাহ্মণের ঘরে॥" (ঐ/৯০-৯১)

এদিকে গঙ্গা ও গৌরীর শোকে শিব সমুদ্রমন্থনজাত বিষ ভক্ষণ করে অচেতন হয়ে পড়ে, মনসা শিবের বিষনাশ করে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু গর্ভবতী মনসাকে সামান্য কারণে জরৎকারু পরিত্যাগ করে। পথে মনসার পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়, অসহায় মনসা রাখালগণের কাছে দুধ, জেলেদের কাছে মাছ চেয়ে ছেলেকে খাওয়ায়, এ ভাবে বার বার পরিবার ও সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। মনসার পুত্রসন্তান জন্ম হলে চণ্ডী মনসার দুগ্ধ হরণ করে। সপত্নী কন্যা ও বিমাতার কলহে শিব বিষ পান করে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য শিব মনসাকে বনবাসে দেয়। আবার বিমাতার প্রতিও সপত্নী সন্তানের সুস্থ মানসিকতা ছিল না। মনসা বিমাতার দ্বারা বার বার লাঞ্ছিত হয়ে তার প্রতি বিরূপ হয়। প্রথমে সে চণ্ডীকে দংশন করে অচেতন করে। আবার বিষপানে শিবের মৃত্যু হলে চণ্ডী সহমরণে যেতে চাইলে মনসা অগ্নিকার্য করতে এসে চণ্ডীর মুখে অগ্নিসংযোগ করে —

"অগ্নি হাতে লইয়া পদ্মা আসিলা কৌতুকে।
শিবের মুখ এড়িয়া অগ্নি দিল দুর্গার মুখে॥" (বিজয়/১০৯)

মনসার বিষে চণ্ডী ঢলে পড়ে, শিব বিলাপ করলে মনসা তাকে আশ্বস্ত করে —

"মনসা বলেন বাপু মনে দেহ ক্ষেমা
আর একশত বিভা করাইব তোমা।" (বিপ্রদাস/৩৯)

বিজয় গুপ্তের মনসা বলে —

"মরিয়া গেল বাপু তোমার বালাই লইয়া।
আর এক ঋষির কন্যা করাইয় বিয়া॥" (বিজয়/১১০)

আবার জগজ্জীবনের কাব্যে সপত্নী পুত্ররা মায়ের পরামর্শে বিমাতা পার্বতীকে নদীতে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছে -

"মধ্য নদীত দুই ভাই করে ঠারাঠারি।
মায়ের সতিন দুর্গাক ডুবাইয়া মারি॥" (জগজ্জীবন/৪২)

আবার মনসামঙ্গলে শাশুড়ী, পুত্রবধূ, ননদ-ভাজের সম্পর্কও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বাঙালী ঘরে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না, তাই লখীন্দরের মৃত্যুর জন্য সনকা বেহুলাকেই দায়ী করেছে। ননদ-ভাজের সম্পর্কও মধুর ছিল না। মৃত লখীন্দরকে নিয়ে দেবলোকে যাত্রাকালে বেহুলার ভাইরা তাকে ফিরিয়ে নিতে গেলে বেহুলা জানায় —

"বেউলা বলে ভাই তুমি না বল উচিত।
স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত॥
চাউল দিবা কাষ্ঠ দিবা আর দিবা হাঁড়ি।
তোমার বধূয়ে বলিব বেউলা কাঁচা রাঁড়ি॥" (বিজয় /৪৫৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলা ভাইদের বলেছে—

"বেহুলা কহিল আমি হই কড়্যা রাঁড়ী।
কত-না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি॥
মা-বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাউজ-সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬৪)

স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের সুস্থতা ছিল না পূর্বে সে কথা উল্লেখ করেছি। অনেক সময় দুশ্চরিত্র পুরুষ পরনারীর কারণে স্ত্রী ও মাতাকে মারধর করে তাড়িয়ে দিত। জগজ্জীবনের কাব্যে গোদার বৃত্তান্তে সে কথা পাই —

"শীঘ্রগতি গেল গোদা আপনার বাড়ি।
লাথি দিঞা ভাঙ্গিল ভাতের যত হাঁড়ি॥
দুই ভার্য্যাকে বোলে তোরা বাহিরাঞা যাঅ।
দুই পুত্র লৈয়া তোরা ভিক্ষা মাঙ্গি খাঅ॥
তরাসে পলায়ে কাণী আর খুঁড়ী।
শয্যা হৈতে পলায় গোদার মাঅ বুড়ি॥" (জগজ্জীবন/২৭১)

পরিবারে সন্তান এবং নারীরা একান্তভাবে পিতা ও স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীরা শ্বশুরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হত। চাঁদের ছয় বিধবা পুত্রবধূ তার পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করত। লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার দেবলোকে যাত্রার সংকল্পের কথা শুনে সনকা জানায়—

"শিশু যুবা অবলা যাহার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬১)

বস্তুত স্বামী ছাড়া নারীরা একান্ত অসহায় ছিল, তাই বংশীদাসের কাব্যে জরৎকারু মনসাকে পরিত্যাগ করলে মনসার অসহায়তা ও কাতরোক্তি সে সময়ে নারীর অবস্থান নির্দেশ করে —

"পতি ধন পতি প্রাণ, পতি স্ত্রীর জীবনধন,
পতি বিনে নারী নিরূপায়॥
তুমি প্রভু সুপুরুষ, অবলা নারীর দোষ,
একবার ক্ষমিতে জুয়ায়।" (বংশীদাস/৫৮)

মনসামঙ্গল কাব্যে যে দেবদেবী ও মানব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তা বাঙালী চরিত্রের অনুবর্তন মনে করি। সমাজ চরিত্রের প্রকাশ ও বিবর্তন মানব চরিত্রের মধ্যে দিয়েই ঘটে থাকে, তাই মঙ্গলকাব্যে মানব চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলে গণ্য করি। প্রথমে মনসা চরিত্রের কথাই বলা যাক। ব্রাহ্মণ্যশাসিত মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় জাত মনসা ধীরে ধীরে খল হয়ে উঠেছিল। কুলীন পুরুষের অবৈধ সন্তান মনসা, আবাল্য পিতৃমাতৃ স্নেহবঞ্চিত, পুরুষের লালসার শিকার, বিমাতার দ্বারা লাঞ্ছিত, বিবাহ রাত্রে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত, সমাজ থেকে বহিষ্কৃত মনসা ধীরে ধীরে ক্রুর হয়ে ওঠে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসা বনবাসে গিয়ে দাসীবৃত্তি করেছে, কিন্তু দাসত্বের অন্নে তার রুচি হয়নি। বিপ্রদাসের মনসা সমাজের কাছে বিমাতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে, এখানে তার ব্যক্তিত্বের দিক লক্ষণীয়। জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা চেয়েচিন্তে পুত্র পালন করেছে এবং সবশেষে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে নারীর এই প্রতিষ্ঠা সুগম হয়নি। চাঁদের দ্বারা বার বার সে লাঞ্ছিত হয়েছে, এমন কি নারীও তাকে সমর্থন করেনি। কিন্তু তার পূজা প্রচার আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সহজে যা পাওয়া যায় না তাকে কেড়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা। গৌরী ঈর্ষাপরায়ণ গ্রাম্য বধূ, শিবঠাকুর নৈতিক চরিত্রহীন গ্রাম্য বৃদ্ধ, চাঁদ সদাগর দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার, বণিক

সমাজের মধ্যমণি ও অর্থকৌলীন্যের মূর্ত রূপ। যদিও তার চরিত্র মধ্যযুগীয় বাঙালীর চরিত্র নয়, তার উগ্র ব্যক্তিত্ব মধ্যযুগের মানব চরিত্রে লক্ষ করা যায় না। সনকা সন্তান বৎসল বাঙালী জননী, সনকা চরিত্রে দুঃখসহনীয় রূপ ও বাঙালী নারীর অসহায়তা ফুটে উঠেছে। লখীন্দর অর্থবান পিতার অকর্মণ্য সন্তান। বেহুলা বাঙালী ঘরেরই পুত্রবধূ, পিতামাতা, ভায়ের আদরে প্রতিপালিত বাঙালী ঘরের কন্যা। স্বামীর মৃত্যুতে সকলেই তাকে দোষারোপ করলে বেহুলা অবশ্য ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। জগজ্জীবনের বেহুলা সনকাকে বলেছে —

"মরিল পুত্র তুমার মোর কুলক্ষণে।
আর ছয় পুত্র তুমার মারিল কেমনে॥" (জগজ্জীবন/২৪৩)

স্বামীর মৃত্যুতে বাঙালী বধূর অবস্থা বেহুলা জানত বলেই কারো অনুরোধ-নিষেধ না মেনে দেবলোকে অনির্দেশ্যলোকে যাত্রা করে। সেখানে সে সমাজের কামুক চোখকে উপেক্ষা করে সকলকে সন্তুষ্ট করেছে, স্বামী, শ্বশুরের ঘর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। কাপুরুষের মত অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। বাঙালী বধূর দুঃখ সহনীয় রূপ ও সংগ্রামী মানসিকতা তার চরিত্রে প্রকাশিত। চাঁদের হাতে মনসাপূজা হয়ত পুরুষের হাতে নারীর স্বীকৃতি। বেহুলা ও মনসা একই বাঙালী পরিবারের দু'টি সদস্যের মত, একজন কন্যা, একজন বধূ। বাঙালী পরিবারের কন্যারা অনেকাংশে অবহেলিত হয়, বধূরা হয় লাঞ্ছিত; দু'জনেই স্বামী হারা, দ'জনেই প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং দু'জনেই বিদ্রোহিনী। একজন বঞ্চিত হয়ে অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছে, একজন আদরে প্রতিপালিত হলেও সমাজে ও পরিবারে তার অবস্থানগত সত্যকে বুঝতে পেরেছিল এবং এর মধ্যে থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। সুতরাং মনসা ও বেহুলা দু'জনেই বাঙালী সমাজের প্রতিভূ নারী চরিত্র। মনসা বিদ্রোহ করতে গিয়ে জঙ্গী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, আর বেহুলা আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে গেছে। উভয়েই বহু পুরুষের লালসার শিকার হয়েছে। দু'জনেই এক সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বেহুলা ছাড়া মনসার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না, বেহুলা বাঙালী সমাজে নারীর অবস্থানগত সত্য বুঝেছিল তাই নারীর স্বভাবজ ধর্মকে গ্রহণ করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মনসামঙ্গলে বাঙালী নারীর মানসিকতা ও স্বভাব-চরিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, যা থেকে সেকালের বাঙালীর স্বভাবগত দিকটিও জানা যায়। যেমন গ্রামীণ নরনারীর প্রবণতাগুলি—চণ্ডী মনসাকে প্রহার করলে প্রতিবেশী মহিলারা সকলেই ধীরে ধীরে জমায়েত হয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। চণ্ডী মনসাকে প্রহার করলে গঙ্গা বলে,— এতে পাড়া প্রতিবেশী সকলেই হাসবে, তাই মনসা জমায়েত সকলকে লক্ষ করে বলে —

"বাপু ঘরে আসিলে কহিয় সত্য কথা॥
সুচরিত্রা বসুমতী জয়া বিজয়া।
সবাই যাও ঘরে কেন মারে মহামায়া॥" (বিজয়/৫৪)

আবার ক্রুদ্ধ পদ্মাকে দেখে ভয়ে সকলেই পালিয়ে যায় –

"যত পরনারী সব আছিল বিস্তর।
পদ্মার মুখ দেখিয়া সকল দিল লড়।" (ঐ/৫৫)

আবার চণ্ডী অচেতন হয়ে পড়লে –

"চণ্ডী ঢলিল হেন সবে দেখিল লক্ষণ।
বায়ুবেগে আইল সবে পুরনারীগণ॥" (ঐ / ৫৭)

বিবাহকালে পুরনারীরা কিভাবে উৎসুক হয়ে বর বা কনে দেখতে আসে. বিবাহ বাসরে উপস্থিত নারীগণের হাস্য পরিহাস, আচরণ সবই বাঙালী সমাজের নিজস্ব। তারা উৎসব অনুষ্ঠানে সকলেই সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করত, সাহায্য-পরামর্শ করত, বিপদেআপদে পাশে দাঁড়াত। আবার পল্লীসমাজের ক্ষুদ্রতার রূপটিও এই কাব্যেই আত্মপ্রকাশ

করেছে বেহুলা বা পার্বতীর পরীক্ষা দানের অংশগুলিতে। আবার চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা বা চৌদ্দ ডিঙা ডুবানো অংশগুলিতে বাঙাল মাঝির আচরণ, কথাবার্তা বাঙালী সমাজের নিজস্ব বিষয়, যা বাঙালী সমাজ ব্যতীত অন্যত্র লভ্য নয়। এভাবে বাঙালীর মৌলিক বিশেষত্ব মনসামঙ্গলে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মনসামঙ্গলের ঘটনাগতক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের নানা উপাদান পাওয়া যায়। যেমন, দেবদেবীদের ঘন ঘন ছদ্মবেশ ধারণ, নারীদের সহেলা পাতানো ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি। ছদ্মবেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে যেমন সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ করে, তেমনি সই পাতানো বা সহেলা পাতানো গ্রামীণ বাঙালী সমাজেরই একটি বিশেষ প্রবণতা। যেমন নিজের নামের সঙ্গে মিলে গেলে কিংবা স্বামীর নামের সঙ্গে মিলে গেলে সহেলা পাতানোর রীতি আজও দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি ডোমনীবেশিনী চণ্ডী খেয়া পারের পাটনীকে বলেছে-

"একই নাম জানিয়া বোলে তুমি আমারই সই।" (বিজয়/২৭)

বিপ্রদাসের কাব্যে দধি পসারিনী বেশে মনসা ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করে সঙ্কর গাড়রীর শিষ্যদের ভোলায় এবং পরে তার স্ত্রী কমলাকে মোহিত করে। সঙ্কর গাড়রীর স্ত্রী কমলা নামের মিল পেয়ে খুশি হয় এবং —

"নিজ নাম কমলা শুনিয়া কুতূহলে।
সহি সহি বলিয়া মনসা কৈল কোলে॥" (বিপ্রদাস/১০৫)

আনুষ্ঠানিক ভাবে সহেলা পাতানোর জন্য অনেক সময় একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত এবং নানান দ্রব্য ভেট দেওয়া হত—

"সহেলা করিবে দুহে সানন্দ বদনে
নানা দ্রব্য আনিয়া আনিল আইয়গণে।
নানা দ্রব্য গন্ধপুষ্প আনিল কমলা
পরম সানন্দে দুহে করিল সহেলা।" (ঐ)

এছাড়া বোন, দিদি, মাসী পাতানো, ভাই পাতানো ইত্যাদি বাঙালী সমাজেরই বিশেষ প্রবণতা। এর মধ্যে দিয়ে বাঙালী নারীর সহজ সরল রূপ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এর জন্য তাদের অনেক সময় কঠিন মূল্য দিতে হত, মনসামঙ্গলে সে বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে।

জাতি-বৃত্তি ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় জাতি বৃত্তির পরিচয় পাই। সেকালে চার বর্ণের প্রাধান্য থাকলেও ছত্রিশটি জাতি তৈরী হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হত। সামাজিক জাতি বিন্যাস অনুসারে গ্রামে বসতি স্থাপন করা হত। প্রধানত ব্রাহ্মণরা নগরের কেন্দ্রে এবং তারপর বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়রা বসবাস করত, আর অপেক্ষাকৃত নগরের বাইরের দিকে অন্যান্য জাতি ও অন্ত্যজরা বসবাস করত। চর্যাপদে যে জাতি বিন্যাসের চিত্র পাই তারই অনুবর্তন মনসামঙ্গলে দেখা যায়। তবে চৈতন্য-পূর্ব যুগে মুসলমানগণের সঙ্গে হিন্দুর সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তারা স্বতন্ত্র এলাকায় বসবাস করত। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজেরই বিভিন্ন জাতের মানুষরা অনেক সময় স্বতন্ত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করত, যেমন - রাখালগাছি, হাসনহাটি, মালাপাড়া, বারুইপুর ইত্যাদি গ্রামের নামের দ্বারা বোঝা যায় ঐ সকল জাতির মানুষ সেখানে বসবাস করত। হাসনহাটি মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাম। বিপ্রদাস সিজুয়াতে মনসার বসতি স্থাপনের বিবরণ দিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আগে বিপ্রদাসের কাব্যেই বসতি স্থাপনের বর্ণনা পাই। বিপ্রদাসের বর্ণনায় চার বর্ণ ব্যতিরেকে ছত্রিশ জাতির বসতি স্থাপনের কথা পাই। তবে এই বর্ণনায় মুসলমান জনবসতির বিবরণ নেই। কবির বর্ণনানুসারে —

"প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্রনীত
ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কাএস্থ হরষিত।

ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার
পঞ্চ বণিক বৈসে আর কর্মকার।
বাদ্যপূরক কলু কুশলি কাঠুর‍্যা
শাঁখারি কাঁসারি বৈসে তামলি সেকরা।
তাঁতি জুগী মালাকার রজক নাপিত
ছুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরষিত।
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদীকূলে
হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতুহলে।" (ঐ /১৯)

বিজয় গুপ্ত ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রাকালে নানা জাতির মানুষের সমাগম দেখা যায়। লখীন্দরের বরযাত্রায় ভীত সকল শ্রেণীর মানুষের পলায়নের চিত্র পাওয়া যায়, তাতে নানা জাতির, নানা বৃত্তির মানুষের পরিচয় পাই। বিজয় গুপ্তের কাব্যে গন্ধবণিক, ব্রাহ্মণ, ভাট, মালী, বৈদ্য, ওঝা, তেলী, ধোপা, গোয়ালা, সুবর্ণবণিক, জেলে, ডোম, কামার, কুমার, নাপিত, নটী, যোগী বা জুগী, গণক, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ছুতার, করাতি, তাঁতি শ্রেণীর কথা আছে, এরা প্রত্যেকেই বৃত্তিজীবী শ্রেণী। এরা বিভিন্ন বৃত্তিতে থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। বিজয় গুপ্তের বিবরণে —

"চৌদ্দশত চলিয়াছে কুলীন সজ্জন।
তিন শত ভাট চলে নয় শও ব্রাহ্মণ॥
. . . .
দুই শত ছুতার চলে তিন শত করাতি।
তিন শত কারিকর চলে এগার শত তাঁতি॥"(বিজয়/৩৬৮-৩৬৯)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বিবরণ পাওয়া যায় —

"পলায় ব্রাহ্মণ ফেলায়া পুঁথির ভার।
ক্ষেত্রী জাতি পলায় বিকি কিনি যার॥
বৈশ্য জাতি গোয়াল পলায় বনে ঝাড়ে।
চাষা শূদ্র পলায় কৃষিকর হাল ছাড়ে॥
ঠেটারী পশারি পলায় কামার সোনার।
চারি জাতি পলায়া যায় ঘোড়াপিড়া আর॥
সুতাহার পলায় আর কুম্ভার জাতি।
মালি জাতি পলায় হাতে লৈয়া কাতি॥
ভাট ভিখারী পালায় আর ব্রাহ্মণ জাতি।
কোলের ছাওয়াল ছাড়ি পলায় পুয়াতি॥" (জগজ্জীবন/১৮২-১৮৩)

হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ব্যবধান ছিল অনেক বেশি; ছোঁয়াছুয়ি, বাছ-বিচার তো ছিলই, নিম্নবর্ণের অন্ন-জল পর্যন্ত বর্ণহিন্দুদের কাছে অগ্রহণীয় ছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না এবং তাদের অত্যন্ত নীচু নজরে দেখত। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই ব্যবধান ছিল বেশী, তবে পরবর্তীকালে এই ব্যবধান অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি ডোমনী বেশধারী চণ্ডীকে দেখে শিবঠাকুর মুগ্ধ হলে ডোমনী শিবঠাকুরকে বলেছে —

"ডোমনি বোলে তুমি ব্রাহ্মণের বেটা।

ব্রাহ্মণ হইয়া ডোম হরিবা কূলের রবে খোটা॥" (বিজয়/ ৩৭)

তাই ছদ্মবেশিনী চণ্ডী শিবকে বলেছে, তুমি যদি আমার হাতে ভাত খাও তবে তোমায় আলিঙ্গন দিব, কেননা চণ্ডী জানে ডোমের অন্ন ব্রাহ্মণের অগ্রহণীয়। তাই চণ্ডী বলেছিল —

"স্বরূপে আমারে লইয়া বঞ্চিতে থাকে মন।
আমি রন্ধন করি তুমি করহ ভোজন॥" (ঐ/৩৯)

নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগর মনসাকে যে কথাগুলি বলে তাতে দেখা যায় উচ্চবর্ণের লোকেরা সকলের ঘরে আহার করত না। এমনকি উচ্চবর্ণের লোকে নিম্নবর্ণের ঘরে আহার করলে সমাজে পতিত হত। কবির বর্ণনায়—

কষ্ট করহ জে জদি সত্য কহিতে উচিত।
হও তোমি সিবের কন্যা হইয়াছ পতিত॥
জাতিহিন জাতি তোমি না করি বিচার।
জেই পূজা পূজে তোমি জাও খাইবার॥
পঞ্চ কোলিন মধ্যে আমি যে কোলিন।
কোন কালে কোন কর্ম্ম না করিচি হিন॥" (নারায়ণ/২৮০)

বিপ্রদাসের কাব্যেও ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর নৌকায় পার হতে গিয়ে শিব ডোমনীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। তখন গৌরী বলে —

"আমি মলমূত্রধারী অতিহীন জাতি
আমা পরশিলে তোর রহিবে অখ্যাতি।" (বিপ্রদাস/১০)

এর মধ্যে দিয়ে বর্ণহিন্দুর ভ্রষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসের কাব্যে সকল জাতির মানুষ লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে, সেখানে জাতিগত ভেদাভেদ রক্ষিত হয়নি। মনে হয় চৈতন্য-পূর্ব যুগেই জাতিগত সংমিশ্রণের প্রবণতা শুরু হয়েছিল— তারই পরিচয় বহন করে এ সমস্ত বর্ণনা। চৈতন্য-পরবর্তীকালে এই ভেদাভেদ অনেক সহজ হলেও জাতিভেদ ছিল। সমাজে জেলে, মালো, ডোম সমাজের মানুষরা অস্পৃশ্য ছিল, ক্ষেমানন্দের কাব্যে জালুমালু মনসাকে বলেছে —

"কেমত তোমার প্রাণ : হেথায় মৎস্যের ঘ্রাণ : দাণ্ডাইতে নাহি বাস ঘৃণা।
... ...
ছাড়িয়া আমার ঘর : যাহ তুমি স্থানান্তর : অনোচিত হেথায় বিশ্রাম।
পবিত্র তোমার দেহ : পাছে আস্যা দেখে কেহ : দাণ্ডাইলে ধীবরের ঘরে॥
... ...
মোর ভাঙ্গা ঘর গোটা : চৌদিগে মৎস্যের কাঁটা : চরণ রাখিতে নাই ঠাঁই॥ (ক্ষেমানন্দ/১৪৫-১৪৬)

রাজনৈতিক চালচিত্র : মনসামঙ্গলে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক চালচিত্র খুব একটা পাওয়া যায় না, তবে কোথাও কোথাও ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের কবিগণ প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক জীবন সংস্পর্শের বাইরে সুদূর গ্রামে বসবাস করতেন। সুতরাং রাজনৈতিক তরঙ্গ ভঙ্গ সাধারণ মানুষের ও কবিদের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারত না। রাজনৈতিক ওঠাপড়া তাদের জীবনে যেটুকু প্রভাব ফেলেছে সেটুকুই তাঁরা অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছেন। কখনো কখনো কবিরা স্থানীয় শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন বা দূর থেকেই তাদের প্রত্যক্ষ করেছেন, এভাবেই কবিরা কাব্যে সন-তারিখ উল্লেখ করতে গিয়ে শাসকের নাম উল্লেখ করেছেন, কখনো প্রশংসা করেছেন, তার বেশী কিছু বলেননি। বস্তুত আধ্যাত্ম চেতনায় আস্থাশীল বাঙালী নিজস্ব

ধর্মাচরণ নিয়ে থাকত, ইহলৌকিক প্রসঙ্গে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করত না। মনসামঙ্গলের দুজন কবি বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই কাব্যে হুসেন শাহের নামোল্লেখ করেছেন। বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের প্রশংসা করে বলেছেন —

"সমরে দুর্জ্জয়ে রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম॥
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে (অ)ধিক।
মূলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গ রোর (া) (তম)সিক॥" (বিজয়/৮)

একইভাবে অন্যান্য কবিগণ রাজা বা জমিদারের নামোল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা অন্য তথ্য পাওয়া সম্ভব না হলেও বোঝা যাচ্ছে হুসেন শাহের আমলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রজারা সুখেশান্তিতে ছিল। মনসামঙ্গলে তুর্কী আক্রমণ অব্যবহিত পরবর্তীকালের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দিক থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু সমাজপতিগণ সমাজ রক্ষার প্রয়োজন থেকেই নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজকে আপন করে নিচ্ছিল। আর এযুগে সুগঠিত রাষ্ট্রশক্তি বলতে কিছু ছিল না, রাষ্ট্রীয় অরাজকতা এবং এদেশীয় হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করতে এসে তারা ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করত মাত্র, অবশ্য এবিষয়ে তাদের অন্যতম হাতিয়ার ছিল ধর্মপ্রচার। সুশাসন কায়েম ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য তাদের আগ্রহ দেখা যায়নি। মনসামঙ্গলে 'হাসন-হোসেন' পালায় সেকালের স্থানীয় মুসলমান শক্তির বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই হাসন-হোসেন পালা বর্ণনা করেছেন, নারায়ণ দেব তার অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এবং দ্বিজ বংশীদাস হাসন-হোসেন পালা বর্ণনা করেছেন, অবশ্য মনে হয় পূর্ববর্তী কবিদের লক্ষ রেখেই এই বর্ণনা তাঁরা করেছেন। ভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয়চেতনাযুক্ত দু'টি সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের ধর্মাচরণ ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা পেয়ে বিধর্মী হিন্দুর প্রতি মুসলমানরা অত্যাচার শুরু করেছিল। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে হাসন-হোসেন ও কাজীর সাম্প্রদায়িক মনোভাব ধরা পড়েছে। মুসলমান কাজী বিনা কারণেই রাখালগণের পূজা নষ্ট করে, এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিজয় গুপ্ত মুসলমান কাজীর মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন—

"শুনিয়া কুপিল কাজি এক দৃষ্টে চায়॥
এমত কিহে হিন্দুয়ান বেটা এতেক গুমান।
শালা হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান॥
কোন আক্কল হিন্দুয়ান বেটা নহে দেখে হেড়া।
হেড়া কাটিয়া আজি খিলামু চামড়া॥" (ঐ/১২৬)

সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অভাবেই এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠেছিল, এই ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থারই ফলশ্রুতি বলা যায়। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিনের সহাবস্থানের কারণেই পারস্পরিক বৈরিতার অবসান ঘটে।

মনসামঙ্গলে বাহ্যিক রাজনীতি অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ রাজনীতিই অধিক প্রকটিত। গ্রাম্য কবিগণের রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশী না থাকলেও তারা স্থানীয় শাসনকর্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসকগণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত, কেন্দ্রীয় শাসককে প্রাদেশিক শাসকদের মাঝে মাঝে দমন করতে হত; সুতরাং তার প্রতিক্রিয়া হত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার উপর। মনসামঙ্গলের মনসা বা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী শাসকেরই প্রতিভূ। মনসামঙ্গলে বর্ণিত হাসান-হোসেন পালা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনসামঙ্গলের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

প্রকৃতপক্ষে ভিলেজ-পলিটিক্স মাত্র। মনসা নারী হলেও একজন দক্ষ রাজনীতিকের মত কাজ করেছে। তার পরামর্শদাত্রী হল নেতা ধোপানী। প্রতিপত্তি বিস্তার করতে মনসা নেতার পরামর্শ মত কাজ করেছে। হাসন-হোসেনের কাজী রাখালগণের মনসাপূজায় বাধা দিয়ে মধ্যযুগীয় শাসকের মত হিন্দুর ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করেছে। মনসার নেতৃত্বে সর্পসৈন্যগণের লড়াই হিন্দুর ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনসা প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে প্রথমে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের সমাজে সহায় ও সম্পদের প্রলোভনে আনুগত্য আদায় করেছে। মনসা পূজার বিনিময়ে মানুষকে ধন-ঐশ্বর্য প্রদান করল, অর্থাৎ ধর্ম পরিবর্তনের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধা ও ধন-সম্পদ প্রদান মধ্যযুগীয় রাজনীতির কৌশল। ক্ষেমানন্দের কাব্যে নেতা মনসাকে পূজা প্রচারের কৌশল সম্পর্কে বলেছে —

"ধনপুত্র বর : দিবে গ বিস্তর : যে জন তোমারে সেবে।
উপদেশ ভাষা : শুন গ মনসা : যদি না জানহ তবে॥
. . . .
এ তিন ভুবনে : পূজে যেইজনে : তারে আমি করি দয়া॥
তার যত ঐরি : আমি দূর করি : ঠেকাইয়া কাল সাপে।
যে জনা না পূজে : বিপরীত বুঝে : তারে দিব মনস্তাপে॥" (ক্ষেমানন্দ/৮৫)

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে আশ্রয় করার প্রবণতা সমাজে বিশেষভাবে দেখা যায়।সাধারণ মানুষের ক্ষমতাশালী শাসকের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি ছিল না, তাই মনসার ঘটবারি জালুজননীর নিকট থেকে সনকা নিতে চাইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বলতে হয় —"রাজরাণী কি করিতে পারি।"(বিপ্রদাস/৮৮)। আবার সমাজ চরিত্র পরিবর্তনের ফলেই বংশীদাসের মনসামঙ্গলে সনকাকে অর্থ দিয়ে ঘটবারি নিতে হয় এবং সনকার মধ্যেও একটা আপোষের মনোভাব দেখা যায় —

"কোন মুখে কহিব লইতে ঘটবারি।
বল করি লহ যদি কি করিতে পারি॥
শুনাই বলেন কহ তুমি গাবরালি কথা।
বল করি লব কেনে লহত মান্যতা॥
শতপণ সুবর্ণ আগে লহত বুঝিয়া।
ঘটবারি দেহ মোরে সানন্দিত হৈয়া॥" (বংশীদাস/৭২)

ক্ষমতাবানের সঙ্গে মানুষ আপোষ করেই চলতে চায়, শাসক ও প্রজার সম্পর্কের এ দিকটি মনসামঙ্গলে প্রকাশিত। জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ সদাগরকে স্বয়ং শিব মনসাপূজা করতে বললে চাঁদ উত্তর দেয়—

"ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দো শুন শূলপাণি।
এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি॥
গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্য জল খাই।
বটবৃক্ষ ছাড়ি কেন সহড়াতলে যাই॥" (জগজ্জীবন/১১৪)

মনসা কূটনীতি প্রয়োগে রাজনীতিবিদের মত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মধ্যযুগীয় শাসকগণ বিপক্ষীয়কে স্বপক্ষে আনতে ধন-সম্পদ ও উচ্চপদ প্রদান করত - মনসাও এই নীতি গ্রহণ করে। তবে উচ্চবর্ণের সমাজে তার স্বীকৃতিলাভ সহজ হয়নি। সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষের স্বীকৃতি না পেলে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন, তাই চাঁদের মত মানুষের পূজা প্রয়োজন ছিল। এজন্য অর্থের দ্বারা বশীভূত করতে না পেরে বার বার আঘাত করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বশে আনা হত। মনসা চাঁদের সর্বনাশ করে মনোবল ভেঙ্গে দেয় এবং পরে বেহুলার মধ্যস্থতায় সমর্থন আদায় করে।

মধ্যযুগে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। এর ফলে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা থাকত না। যে পথে শাসকের সৈন্যদল গমন করত সে পথে গ্রাম নগরাদি ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে জনসাধারণ সৈন্য আগমনের সম্ভাবনা দেখলেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করত। মনসামঙ্গলে লখীন্দরের বিবাহের শোভাযাত্রা, হৈচৈ, আলোক, মশাল, বন্দুকের আওয়াজ শুনে সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে –

"বিল পাড়া দিয়া জায় চাঁদো নৃপবর
সম্মুখে দেখিল রাজ্য ধাহলি নগর।
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি বিবিধ বাজন
দেখিয়া সকল প্রজা হইল ত্রাস-মন।
ধনপুত্র গোধনাদি সকল তেজিয়া
পলায় সকল লোক স্ত্রী পুত্র লইয়া।" (বিপ্রদাস/১৮৫)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও এই একই বিবরণ পাওয়া যায়–

"বানিয়ার পরদল কৌতুকে হৈল পার।
হরসাধুর দেশত হৈল চমৎকার॥
পালায় সহরিয়া লোক মুক্ত মাথার কেশ।
কুন রাজা যুঝিতে আইল মোর দেশ॥
বৃদ্ধ যুবক যত পলায় ছাওয়াল।
সৈন্য সহিতে পলায় নগরের কোটাল॥" (জগজ্জীবন/১৮২)

সাধারণ মানুষের জীবনে নতুন নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটত অর্থাৎ শাসকের উৎপাত ঘটত, তাই সাধারণ মানুষ ভয় পেত। জালু-মালুর গৃহে ছদ্মবেশী মনসার আবির্ভাব ঘটলে জালু-মালু বলে –

"দেখ্যা মনে বাসি ভয় : দেহ মোরে পরিচয় : তোমার চরণ যুগে পড়ি।" (ক্ষেমানন্দ/১৪৫)

এ সমস্ত ঘটনা মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার অভাবে প্রজার ধনপ্রাণের নিরাপত্তা তো ছিলই না এমন কি পথঘাটও নিরাপদ ছিল না। চোর, ডাকাত, দস্যুদের অত্যাচার ছিল। নারীদের নিরাপত্তা ছিল না, তাই বিদেশী পুরুষরা নদীপথে ভাসমান বেহুলাকে দেখে নানারূপ অশালীন মন্তব্য করে। শিবঠাকুর একাকিনী মনসাকে পুষ্পবনে দেখে বলেছিল –

"এ বনে অসুর চরে নারী নাহি তুমি পরে
হেন রূপ বেশ কে না লোভ করে।" (বিজয়/২২)

বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে পথের বিপদের কথা ভেবে জ্ঞাতিগণ শঙ্কিত হয়। বংশীদাসের কাব্যে পথের বিপদের কথা ভেবে বেহুলাও শঙ্কিত হয়েছে –

"স্ত্রী আমি নারী জাতি যথা তথা ভয়।
জাতি কুল সত্যধর্ম্ম রহে বা না রয়॥" (বংশীদাস/২০৪)

বেহুলা সরোবরে স্নানে যেতে চাইলে তাই তার মা ভীতা হয়েছে –

"ঠগঠামন চোর সব সরোবরে থানা।
ধরিয়া হরিবে তোকে রাখে কুন জনা॥" (জগজ্জীবন/১৭০)

অনেক সময় মুসলমানগণ ধর্মবিদ্বেষের কারণেও হিন্দুর বাড়িতে চুরি ডাকাতি করত। নারায়ণ দেবের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগর মুসলমান চোর, ডাকাত, দস্যুদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে –

"হুসেন হাসনের নিকটে আমার পুরি।

না জানি রাজ্যেত কিবা হইল ডাকা চুরি ॥" (নারায়ণ/৫৫)

বস্তুত মধ্যযুগের নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে রাজা-মহারাজা বা সম্রাটের কোন সম্পর্ক থাকত না। যুদ্ধবিগ্রহ হলে তাদের জীবনে প্রভাব পড়ত। তাছাড়া কর আদায়ের সময়ে জমিদারের কর্মচারীরা গ্রামে আসত কর আদায় করতে। প্রজাদের নিকট থেকে পথ কর, জল কর, সম্পদ কর আদায় করত। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে জল কর আদায়ের কথা পাওয়া যায়। জেলেরা মাছধরে বিক্রি করলে জমিদারকে জল কর দিতে হত, কিন্তু সকলের পক্ষে নিয়মিত কর দেওয়া সম্ভব হত না। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায়—

"গোপাল গোবিন্দ দাস : মৎস্য ধরে বারমাস : সাধুরে না দেই জলকর।" (ক্ষেমানন্দ/১৩৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর মধ্যযুগীয় জমিদারের মত অত্যাচারী, তাকে নিয়মিত কর দিতে না পারলে প্রজাদের বেগার শ্রম দিতে হত। অনেক সময় অত্যাচারের ফলে প্রজারা ভিটামাটি পরিত্যাগ করে চলে যেত। জালুমালু চাঁদ সদাগরকে সে কথাই বলেছে—

"ধীবর-তনয় বলে শুন সদাগর।
এতদিনে ছাড়িলাঙ তোমার নগর॥
একভাই করি তব কোটালি বিষয়।
পাকা খন্দে মাহিনা না দেহ মহাশয়॥
আর ভাই বটি তব সঙ্গের চাকর।
নিত্য নিঞা মৎস্য খাঅ ডাগর ডাগর॥
তোমার আরতি হৈল মৎস্য শতভার।
নগরে থাকিতে তবে না পারিব আর॥" (ক্ষেমানন্দ/১৩৭)

ক্ষেমানন্দও মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত আত্মবিবরণী দিয়েছেন, তাতে উল্লিখিত হয়েছে বারা খাঁর মৃত্যুর পর কবির পিতা শাসকের অত্যাচারে দেশত্যাগ করেছিলেন—

"রণে পড়ে বারা খাঁ : বিপাকে ছাড়িব গাঁ : যুক্তি করে জননী-জনক।
দিনকথ ছাড়্যা যাই : তবে সে নিস্তার পাই : দেয়ানে হইল বড় ঠক॥
শ্রীযুত আস্কর্ণরায় : অনুমতি দিল তায় : যুক্তি দিল পলাবার তবে।
শুনহ মণ্ডল তুমি : উপদেশ কহি আমি : গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে॥"(ঐ /৫)

কিন্তু নগর পরিত্যাগ করাও সহজ ছিল না, কারণ অবাধ্য হলে প্রজাদের নিপীড়ন করা হত —

"এইখানে অঙ্গীকার কর দুইভাই।
মৎস্য নাহি দিবে যদি গাড়ি একুঠাঁই॥
এত শুনি জালু মালু ভয়ে কম্পমান।
জালু বলে মালু ভাই নাহি পরিত্রাণ॥" (ঐ/১৩৭)

এ সকল বর্ণনা শাসকের নিপীড়নকেই নির্দেশ করে। বিশেষত স্থানীয় জমিদারগণ প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করত ক্ষেমানন্দের সমসাময়িক কালের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তার পরিচয় আছে। সুতরাং স্বল্প হলেও সেকালের রাজনীতির প্রভাব পড়েছে জনজীবনে, যাকে সমাজ ইতিহাসের বিশেষ প্রসঙ্গ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক চালচিত্র : মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি; তাছাড়া পাশাপাশি বাণিজ্য ও শিল্প কিছুটা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। তুর্কী বিজয়ের পর রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থার ফলে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে মনসামঙ্গলে তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ সুলতানি আমলে এবং মোগল যুগে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলক নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আলাউদ্দিন খলজি মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যমান নির্ধারণের জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। মোগল আমলে মোটামুটি শেরশাহ প্রবর্তিত মুদ্রা ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র এই তিন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। দৈনন্দিন জীবনে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সর্বনিম্ন মুদ্রামান ছিল 'কড়ি'। মনসামঙ্গল কাব্যে কড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কড়ি হিসাব নিকাশের জন্য 'কড়া', 'গণ্ডা', 'পোণ', 'কাহন' ইত্যাদি একক ব্যবহার করা হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে কড়ি গণনার একক হিসেবে 'পোণ' বা পণের ব্যবহার পাই। চাঁদ সদাগর চার 'পোণ' কড়ি দিয়ে কি করবে তার হিসাবে দিয়েছে —

"এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন॥
এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু॥
এ(ক) পোন দিয়া আমি নটী নৃত্য চাব।
এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব॥' (বিজয়/২৯২)

বিপ্রদাসের কাব্যেও কড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চাঁদ সদাগর কড়ি দিয়ে কি করবে, তার পরিকল্পনা করেছে–

"কচুর পাতায় কড়ি লইল বাঁধিয়া।
ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করে গিয়া॥
এই কড়ি দিয়া আজী কিনিব বসন।
আর কাষ্ঠ আনি অন্ন করিব ভোজন॥"(বিপ্রদাস/১৫৯)

নারায়ণ দেবের কাব্যে কড়ি পরিমাপক বা গণনার একক হিসাবে 'বুড়ি'র ব্যবহার আছে। 'বুড়ি' হল 'কুড়ি' সংখ্যার কথ্য রূপ। 'বুড়ি' হল পাঁচ গণ্ডা বা এক পোণের চার ভাগের এক ভাগ। নারায়ণ দেবের বর্ণানুসারে —

"এক বাড়ি নিল মৎস্য আড়াই বুড়ি হইল।
আর বাড়ি নিল মৎস্য এক পোন হইল॥
তথায় না দিয়া মৎস্য নিল আর বার।
ছয় বুড়ি পাইয়া মৎস্য বেচিল সদাগর॥" (নারায়ণ/২১০)

আবার কয়েক 'পোণ' (পণ) কড়ি মিলে এক 'কাহন' হত। বংশীদাসের কাব্যে পাই –

"ডোমনী বলে হের দেখ নানা চিত্র ফুল।
পঞ্চ কাহন কড়ি হয় বিউনির মূল॥
আড়াই কাহনে বেচি এক গোটা খারি।
বেচিবারে আনিয়াছি তোমার বলয়ারি॥" (বংশীদাস/২৪৩)

রূপার মুদ্রাকে বলা হত 'তঙ্কা' বা টাকা। স্বর্ণমুদ্রাকে মোহর বা আশরফি বলা হত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার খুব কমে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ কখনো স্বর্ণমুদ্রা চোখেও দেখেনি এমন তথ্য পাওয়া যায়, জগজ্জীবনের কাব্যে এক যুবক বলেছে –

"এক যুবক বোলে শুন যত যুবক ভাই।
সোনার মোহর আমরা কভু দেখি নাই॥" (জগজ্জীবন/৩৩৮)

তাছাড়া এযুগের আদানপ্রদানের অন্যতম মাধ্যম হল 'বস্তুবদল' প্রথা। মনসামঙ্গলে চাঁদের বাণিজ্য বিবরণে বস্তুবদলের কথা পাই। ব্যবসা-বাণিজ্যও বিনিময় বা বদল প্রথায় চলত তার সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে। একালে

দৈনন্দিন জীবনে জিনিসপত্র পরিমাপে 'সের', 'আধ সের', 'পোয়া' ইত্যাদি একক ব্যবহৃত হত। পরিমাপক যন্ত্র ছিল প্রধানত তরাজু বা দাঁড়িপাল্লা, তাছাড়া 'কাঠা' বা 'খুচি' পরিমাপেও আদান-প্রদান করা হত।

মধ্যযুগীয় সমাজে কাঞ্চন মূল্য স্বীকৃত ছিল না, কিন্তু কাঞ্চন কৌলীন্যে বণিক সম্প্রদায় সমাজের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুদ্রা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং মুষ্ঠিমেয় কিছু লোকের হাতে তা জমে উঠেছিল। সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে কাঞ্চন কৌলীন্য ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং মুদ্রাই সমস্ত কিছুর পরিমাপক হয়ে ওঠে। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের বর্ণনানুযায়ী –

"এই কোড়ি মাতাপিতা   এই কোড়ি জন্মদাতা
এই কোড়ি সংসার-সংহতি।
এই কোড়ি রহে যার   সংসারের পূজা তার
কোড়ি হেতু সব বশ ধন।
জগতমোহিনী নাম   কোড়ি বড় অনুপাম
নিকড়িয়া নিষ্ফল জীবন॥" (ঐ/১২৯)

কৃষি : মধ্যযুগীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। দেশের বেশীর ভাগ মানুষ কৃষিকাজ করত। বাংলার ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, কৃষকরা স্বল্প শ্রমে প্রচুর শস্য উৎপাদন করত। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুর কৃষক সমাজের দেবতা এবং মনসা ও সাপ উর্বরতা শক্তির সঙ্গেই সম্পর্কিত। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধান। বাংলার ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের ধান উৎপন্ন হত, সেগুলি ছিল বিভিন্ন স্বাদে গন্ধে ভরপুর; বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ধান ছাড়াও পাট, শন, তিল, সরিষা, রাই, আখ, কার্পাস চাষ হত। নানা রকম মসলা— হলুদ, মরিচ, আদা, জয়িত্রী, জিরা, লবঙ্গ, পোস্ত উৎপন্ন হত। মনসামঙ্গলে ঐ সমস্ত ফসলের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ধরনের ফল— আম, নারিকেল, কলা, জাম, কাঁঠাল, তাল, বেল, সুপারি, পান প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হত। প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি হত; চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা ও বস্তুবদল বর্ণনায় ঐ সকল কৃষিজাত দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে বাংলাদেশের চাষ পদ্ধতির পরিচয় আছে এবং চাষবাসে কি পরিমাণ শ্রমদান করতে হত তার কথা পাই জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কাব্যে শিবঠাকুরের চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। জগজ্জীবনের কাব্যে শিবঠাকুরের চাষবাসের বর্ণনানুযায়ী—

"লাঙ্গল জুড়িয়া এক চাষ দিল আগে।
প্রথম দিনের চাষ হাল নাহি লাগে॥
আর বার দিল দেব দুই তিন চাষ।
চার চাষে ভূমিখানের উপাড়িল ঘাস॥
পঞ্চচাষ দিল হর ছয় চাষ হইল।
সাত চাষে শুকায়া সকল ঘাস মৈল॥
আট চাষ দিল আর দিল চাষ নয়।
চাষে চাষে ভূমির থুকুড়া হৈল ক্ষয়॥
দশ চাষ চষিয়া এগার চাষ দিল।
বার চাষে ভূমিখান প্রচ্ছিন্ন করিল॥
বার পাট মোই দিল দেশের ঠাকুর।
থুকুড়া বাছিয়া দেব ঢেল কৈল চূর॥
কস্তুরি কেতুকির চারা ফেলিলে ঠাকুর।

ঈশ্বর ঠাকুরের ফুল মেলিল অঙ্কুর॥" (ঐ/২২-২৩)

জগজ্জীবন শিবঠাকুরের ফুল চাষের বর্ণনা দিয়েছেন, মধ্যযুগে ফুল চাষও কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। মনসার মালিনী বেশে ফুল বিক্রির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় বিভিন্ন মনসামঙ্গলে। ধান চাষের কথাও পাই মনসামঙ্গলে। ডিঙা ডুবির ফলে চাঁদের দুর্দশা ঘটলে চাঁদ সদাগর কৃষাণ বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে ব্রাহ্মণের ধান চাষের প্রসঙ্গ আছে, বিজয় গুপ্তের কাব্যে জগাই মণ্ডলের ধান চাষের কথা আছে, ধান চাষের পরিচর্যার কথা আছে। যেমন—

"এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।
ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি॥
ধান্য নিড়ায় চান্দ মনে বাসে ভাল।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা পাতিল জঞ্জাল॥
ধান্য না চিনে চান্দো সবে চিনে দুর।
ধান্য কাটিয়া চান্দো কৈল ভুর ভুর॥" (বিজয়/২৯৫)

নারায়ণ দেবের কাব্যে কলাই বা ডাল চাষের প্রসঙ্গ পাই—

"মন স্থির করি চান্দো পথ মেলিল।
গৃহস্থের কালাই খেত সমুখে দেখিল॥
এক মুষ্টি কালাই তবে লইল উপারি।
গৃহস্তে খেদায়া নিল হাতে করি নড়ি॥" (নারায়ণ/২১২)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে শন চাষের কথা পাই এবং কিভাবে শন থেকে আঁশ নিষ্কাশন করা হত তার বিবরণ পাওয়া যায়-

"সাজ শণ বুন গিয়া সাজ হব গাছ।
সাজ তার জাল বুন্যা ধর্যা আন মাছ॥
মনসার এত কথা জালু মালু শুনে।
তখনি লাঙ্গল জুড়্যা সাজ শণ বুনে॥
সাজ শণগাছ হৈল দেবীর কৃপায়।
সাজ সেই শণ কাট্যা জলেতে পচায়॥" (ক্ষেমানন্দ/২৭৭)

বাংলাদেশে প্রচুর পাট উৎপন্ন হত, পাট থেকে বিভিন্ন রকম বস্ত্র তৈরীর বিবরণ আছে বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মটর, মসুরি, মাষকলাই, অড়হর, মুগ; বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি, যা রন্ধন তালিকাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাংলাদেশের কৃষিজ পণ্য। নদী-নালা-খাল-বিলে পরিপূর্ণ বাংলাদেশে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিভিন্ন প্রকার মাছের বিবরণ পাই। মনসামঙ্গলে জালু-মালুর কাহিনীতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কথা আছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার পশুপালন করা হত। গৃহপালিত পশু থেকে প্রচুর দুধ উৎপন্ন হত। তাছাড়াও হাঁস, মুরগী (কুকুড়া) পালন করা হত। বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা হাঁস, মুরগী পালন করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসন-হোসেনের কাহিনীতে পীরের দরগায় মোরগ দানের প্রসঙ্গ পাই। কৃষিজাত পণ্যকে নির্ভর করে বাঙালী সমাজে নানা বৃত্তিজীবীতার সৃষ্টি হয়েছিল। মনসামঙ্গলে কৃষিজীবী সমাজের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

বাণিজ্য : মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার চিত্র আছে। পণ্ডিতদের অনুমান চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিষয় নয়, অনেক পূর্ববর্তীকালের বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে। চণ্ডীমঙ্গলে রাজার নির্দেশে

বাণিজ্যযাত্রার কথা পাওয়া যায়। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ এবং বিদেশী বণিকদের অংশ গ্রহণের ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল। যাই হোক বাঙালী বণিকরা একদা সিংহলে বাণিজ্য করতে যেত তার বিবরণ মনসামঙ্গলে আছে। বাঙালী বণিকগণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিত। দিক্ নির্দেশক কোন যন্ত্র ছিল না, তবে 'মালুম গাছ' বলে এক প্রকার দিক নির্দেশক যন্ত্রের কথা পাই বিভিন্ন মনসামঙ্গলে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমনে 'মালুম গাছ' ব্যবহারের কথা পাই। যেমন বিজয় গুপ্তের বর্ণনানুসারে —

"প্রভাত সময়ে হইল উদিত দিবাকর।
ধনা বলে সদাগর মোর বচন ধর॥
মালুম গাছ তুলিয়া দেও ডিঙ্গার উপর।
মালুম গাছটা তুলিয়া দিল মধুকর উপর॥
মালুম দিষ্টে বোলে শোন সাধু সদাগর।" (বিজয়/২৪৫)

নারায়ণ দেবের কাব্যে 'মালুম কাঠ' ব্যবহারের কথা পাই। বাঙালী বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় বড় বাণিজ্যতরী তৈরী করাত। বিপ্রদাসের বর্ণনানুযায়ী যে সপ্তডিঙার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে একেকটি বাণিজ্যতরী বিরাটকায়, প্রচুর ধন-সম্পদ তাতে ধরত। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকেও বাঙালীর বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রার কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য ও বস্তুবদলের যে তালিকা আছে তাতে অতিরঞ্জন থাকলেও তার বাস্তবতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কবিদের কাব্যে যে সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল— নারিকেল, সুপারি বা গুয়া, পান, খয়ের, পীপুল, জোয়ানি, ফুলবড়ি, কালজিরা, হরিতকী, আমলকি, শুক্তাপত্র, নিম্বপত্র, তেজপাতা, শুঁটকি মাছ, ঘি, কস্তুরী, বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জি, বিভিন্ন ধরনের ফল, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার কলাই বা ডাল, পোস্ত ইত্যাদি। তাছাড়াও কাঠ ও বাঁশজাত দ্রব্য যেমন— কাঠের বারকোশ, কৌটো, পিঁড়ি, ডালা, কাঠা, আড়ি, খুচি, কুলা ইত্যাদি। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে— মূল্যবান পাথর, মণি-মুক্তা, প্রবাল, সীসা, সোনা, রূপা, শঙ্খ, কার্পাস, কর্পূর, হাতির দাঁত, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়িত্রী, গুড়গুক, হিং ইত্যাদি। বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা অংশের বর্ণনায় পাই-

"প্রচুর করিয়া লএ ঝুনা নারিকেল
খোম-ধুতি খাসা আদি বসন সকল।
নিম্বপত্র সুক্তাপাত আর কাল্যা জীরা
মেথী পাড়ু কুমুড়া জোয়ানী কৈল ভরা।
তৈল ঘৃত মাষ মুগ কলাই সকল
জতনে প্রচুর করি লইল তণ্ডুল।" (বিপ্রদাস/১৪০)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বস্তু বদলের চিত্র পাওয়া যায় —

"কাঁচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ সুকুতা।
ইহার বদলে নিব পাটনে গজমুক্তা॥
মাসকালাই আদার সুট আর তোলে জিরা।
মরিচ লবঙ্গ দিয়া বদল নিব হীরা॥
যতন করিয়া নেহ কিছু ফুলবড়ি।
এক ভারের বদল নিব দশ ভার কোড়ি।
লক্ষ তিন ভার লেহ কদলীর খার।

এক ভার বদল নিব নোন তিন ভার॥
করুয়া সানকি লেহ লক্ষ দুই চারি।
ইহার বদল নিব সুবর্ণের ঝারি॥
নারিকেল তাল বেল আর কাঠাল আম।
এই সব ফল নেহ আছে বড় কাম॥
দশ শঙ্ক বদল নিব নারিকল।
তাড়িপত্র বদল নিব তালের বদল॥
আমের বদলে নিব অমৃতের ফল।
সুবর্ণের ঘড়া নিব কাঁঠাল বদল॥
পাটের ধকড়া মেঘলা আর যত শাড়ি।
যতন করিয়া লেহ কাপড়েত জড়ি।
নানা রঙ্গ শাড়ি লেহ করিয়া যতন।
ইহার বদলে নিব পাটের বসন॥
জামির বদলে নিব জায়ফল জাম।
গুবাক বদলে নিব সারি সুয়া নাম॥
শ্বেত চামর নিব দিয়া পাট সন।
ভাড়িয়া আনিব গিয়া দক্ষিণ-পাটন॥" (জগজ্জীবন/১২৪)

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্য বিনিময়ের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় —

"দুলাই কাড়ারি বলে রাজা বিদ্যমান।
যে বস্তু বদল করি কর অবধান॥
উত্তম বারকুশ যোড়া তাতে হিঙ্গুলাল।
এ সহ বদলে দিবা সোণা রূপার থাল॥
কাঠের কটুক লেহ লেখা জোখা করি।
এসব বদলে দিবা লোটা গাড়ু ঝারি।
সনক পেয়ালা হেন এক এক গুটি।
এ সহ বদলে দিবে সুবর্ণের বাটি॥
বড় বড় চাড়িগুলা অধিক সুন্দর।
ইহার বদলে দিবা সোণার ডাবর॥
বড় বড় পিঁড়িগুলা মান্দারের সার।
সুবর্ণের সিংহাসন বদল ইহার॥
ডালা কাঠা আড়ি খুচি বড় বড় কুলা।
ইহার বদলে দিবা সীসা রঙ্গের তুলা॥
যত সব হাড়ি পাগ লইয়া গুণিয়া।
এ সকল নিবা যে পিতল থাল দিয়া॥
আদার বদলে দিবা সোণার গাঠেয়া।
বাঁসুড়ি বদলে দিবা সোণার মাঠেয়া॥

পোস্তের বদলে দিবা সোণার ঘুংঘুর।
কহিব পোস্তের যত গুণ হে প্রচুর॥

. . . .

বাখর বদলে দিবা কর্পূর জোখিয়া।
ঝুরি গুয়া দিবা তুমি জাতিফল দিয়া।
তৈল বদলে দিবা যত শিলারস।
মধুতে কুঙ্কুম দিবা ভরিয়া কলস॥
চান্দ বলে এখনে বদলের কার্য্য নাই।
বস্ত্রাদি বদল কিছু করিবারে চাই॥" (বংশীদাস/১৩৪-১৩৫)

বিভিন্ন প্রকার পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র বিদেশে আমদানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত বাংলার বণিকগণ। তাছাড়া বাংলার বণিকগণ ও সাধারণ মানুষ অন্তর্দেশীয় হাট-বাজারে বাণিজ্য করত এবং দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বেচাকেনা চলত। জগজ্জীবনের কাব্যে হাটের উল্লেখ আছে, ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসনহাটি হাটের কথা আছে। জালু-মালু দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছে, তারা হাটে সুতা বিক্রি করে, মাছ ও শুঁটকি মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

শিল্প : মনসামঙ্গলে কোন বৃহৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে ক্ষুদ্রশিল্পে বাংলার গ্রামগুলি সমৃদ্ধ ছিল। কুটীরশিল্পে বাংলা কতটা সমৃদ্ধ ছিল মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠে তা জানা যায়। বস্ত্রশিল্প, অলঙ্কার শিল্প, অলঙ্করণ শিল্প, সূচীশিল্প, শোলার কাজ, গৃহনির্মাণ শিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে।
বস্ত্রশিল্পে বাংলা কতটা সমৃদ্ধ ছিল তার নানা পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে। বাংলার মসলিন এক সময় জগৎ বিখ্যাত ছিল। সোনা ও রূপার সূক্ষ্ম সুতোতে শাড়ী নির্মাণ হত, তা এত মোলায়েম ছিল যে শত হাত শাড়ী মুঠিতে গুটিয়ে রাখা যেত। পাট, শন ও কার্পাস থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য বস্ত্র, মশারি, দুলিচা, বিছান, পাছড়া, চাঁদোয়া, সামিয়ানা, পালঙ্ক-পোষ, বালিশ তৈরী হত। বিপ্রদাস, ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ও বংশীদাসের কাব্যে তার সুন্দর পরিচয় পাই। ক্ষেমানন্দের কাব্যে শন থেকে জেলেদের জাল তৈরীর কথা পাই। অলঙ্কার শিল্পের সুন্দর পরিচয় আছে মনসামঙ্গলে। বাংলার স্বর্ণ শিল্পীগণ বিভিন্ন রকম উত্তম গহনা প্রস্তুত করত, গহনা, বস্ত্র ও শাঁখার উপরে নানা অলঙ্করণ করত। বাংলার মেয়েরা শোলার কাজ করত, সূচীশিল্পের কাজ করত। ছুতোররা কাঠ কেটে গৃহস্থালীর নানা উপকরণ খাট, পালঙ্ক, কুর্সী, পিঁড়ি, চৌদোল, নৌবাণিজ্যের উপযোগী বড় বড় বাণিজ্যতরী তৈরী করত তার পরিচয় পাওয়া যায়। ডোমরা বাঁশ ও বেতের কাজ করত, অলঙ্করণ যুক্ত চুপড়ি, ঝুরি, ডালা, করণ্ডি, চালুনী, কুলা, খুচি, আড়ি, ব্যজনী বা পাখা তৈরী করে বিক্রি করত। মনসামঙ্গলে বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণ করে বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র বিক্রির কথা পাওয়া যায়। কামারগণ গৃহস্থালী ও কৃষিকার্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরী ছাড়াও লোহার পাত ও রড কাজে লাগিয়ে লোহা পিটিয়ে গৃহনির্মাণ করত, লখীন্দরের বাসরঘর নির্মাণে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কুমাররা কাদামাটির হাঁড়ি-কুড়ি, চাড়ি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, দগড়ি ও প্রতিমা নির্মাণ করত। বিপ্রদাসের কাব্যে কুমারের হাঁড়ি-কুড়ি তৈরীর প্রসঙ্গ পাই চাঁদের দুর্গতি অংশগুলিতে। চাঁদ সদাগর কিভাবে কুমারের হাঁড়ি ভেঙ্গে ছিল তার বর্ণনায় –

"শিরে বোঝা চাঁদো রাজা হইল কাতর
কাষ্ঠ-বোঝা ফেলে হাঁড়ি-পাখই উপর।
দশ বিশ হাঁড়ি ভাঙ্গে কুমার কুপিত
দাড়ি ধরি টানিয়া বেড়ায় চারি ভিত।" (বিপ্রদাস/১৫৯)

শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বলেই নয়, এই সমস্ত কুটীরশিল্পের উপর বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মধ্যযুগে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, কুটীরশিল্পের যতই উন্নতি হোক না কেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুফল ভোগ করত মুষ্ঠিমেয় ধনীরা। ব্রাহ্মণরা সমাজের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হবার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বারা বণিকরা সমাজের শীর্ষদেশে উঠে এসেছিল। বণিক, জমিদার, মহাজন ও রাজকর্মচারীরাই মূলত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করত। দেবী মনসা বণিক চাঁদ সদাগরের পূজালাভের প্রয়াসী হয়েছিল, কারণ বণিকরা অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। গোটা মনসামঙ্গলের ধারায় বণিক শ্রেণীর প্রাচুর্যের চিহ্ন আছে। তারা নিজেদের উদ্যোগে বাণিজ্য করত, বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ আহরণ করত। তারা প্রধানত কোঠাবাড়িতে বসবাস করত, প্রচুর দাসদাসী, আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত, অনেকে লাঠিয়াল ও সৈন্যবাহিনী রাখত। তারা পুত্রকন্যার জন্মোৎসবে, অন্নপ্রাশনে, বিবাহে, পিতামাতার শ্রাদ্ধবাসরে প্রচুর ব্যয় করত, দানধ্যান করত, পূজা-পার্বণে জৌলুস ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দিত। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস বা পরবর্তীকালের ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন, তন্ত্রবিভূতি, দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে গোটা গ্রাম, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই অংশ গ্রহণ করেছে। পাইক, পেয়াদা থেকে শুরু করে গ্রামবাসী ও আত্মীয় পরিজনেরা উৎসবে মেতে উঠেছে। বিবাহের শোভাযাত্রায় বিবিধ বাজনা বাজত, বাজী পোড়ানো হত, বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হত। নারী পুরুষ উভয়েই উত্তম পোশাক ও বিভিন্ন রকম সোনা-রূপার গহনা পরিধান করত, উত্তম আহারের আয়োজন হত। মনসামঙ্গলে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগরের মনসাপূজায় ঐশ্বর্যের ছাপ আছে—

"নানা উপহার জথ   তাহা বা কহিব কথ
  লৈক্ষে লৈক্ষে হংস কৈতর।
য়গুর চন্দন দিআ   কনক কমল পাইআ
  হরসিতে পূজে অধিকারি ॥" (নারায়ণ/২৮৩-২৮৪)

কিংবা, বংশীদাসের বর্ণনায় সনকার মনসাপূজার বিবরণ —

"সঁড়ি বান্ধিয়া ঘট স্থাপিল আসনে।
নানা উপহারে পূজে অগুরু চন্দনে॥
শত শত মহিষ কাড়া ছাগল গাড়র।
শত শত মৃগ আর হংস কবুতর॥" (বংশীদাস/৭২)

এসমস্ত চিত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

দেশের বেশীর ভাগ জনসাধারণ ছিল দরিদ্র। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলে ধনীর ঐশ্বর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যের বিবরণ পাওয়া যায়, তবে তা করুণ নয়। রাষ্ট্রীয় কুশাসনের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়লে সাধারণ জনজীবনে তার খুব প্রভাব পড়ত না বলেই বোধ হয়। কারণ মানুষের গ্রামীণ জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘটার প্রভাব পড়ত না, কেননা কৃষি ও শিল্পের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হত। তাছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কম থাকায় দরিদ্রদের অভাব ও হতাশা কম ছিল, তবে শাসকের উৎপীড়নে জনসাধারণ দুর্দশার শিকার হত। চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে জনগণের আর্থিক দুর্গতির চিত্র পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার রাষ্ট্রনৈতিক ঘনঘটার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, তার পরোক্ষ ফল ছিল প্রজাশোষণ ও দুর্গতি। ক্ষেমানন্দ যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাতেও শাসকের অত্যাচারের কথা আছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগরের প্রজাশোষণের চিত্র পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর

জাল-মালুর ভাইদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নিত। প্রজারা প্রাণ ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করতে চাইলেও কিন্তু সহজ ছিল না। শাসকের অত্যাচারকে ক্ষেমানন্দ চাঁদ সদাগরের অত্যাচার রূপে দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে জালু-মালুর পরিবারের দুর্দশার বর্ণনা আছে। তারা দুই ভাই মাছ ধরে বিক্রি করে, তাদের জননী পরের বাড়ী 'ভাড়া ভানে' অর্থাৎ ধান ভানে, শুঁটকি মাছ বিক্রি করে, সুতা কাটে, পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে সংসার নির্বাহ করে। কবির বর্ণানুযায়ী –

"চালেতে শুকাল্য মীন : অনুবৃত্তি অনুদিন : মৎস্য ধরি কুলাই ওদন।
জননী কাটনা কাটে : সুতা নিঞা বেচে হাটে : তবে হয় তৈল্য লবণ॥
গিয়া বর্ণিকের পাড়া : জননী ভানএ ভাড়া : চালু খুদ পায় গুটি গুটি।
জালু মালু দুই জেল্যা : বড় দুখিনীর ছেল্যা : মৎস্যকুটা বলে কাঁকতুটি॥
খালই পলই জাল : পাথি পাটা সর্ব্বকাল : ইহা বিনু নাহি সম্ভাবনা।
... ...
হের দেখ জালে তোলা : কমঠ মৎস্যের খোলা : বালুকার বোদালের দাঁড়া।
জালু মাল দুই ভাই : মৎস্য ধর্যা অন্ন খাই : জননী পরের ভানে ভাড়া॥" (ক্ষেমানন্দ/১৪৫)

সনকার উক্তিতেও জালু-মালুর পরিবারের দারিদ্র্যের কথা পাওয়া যাচ্ছে। জালুর জননী দেবীর কৃপায় ধনলাভ করলে সনকা বিস্মিত হয়ে বলেছে –

"অতি বড় দুঃখী ছিল জালু মালু দাস।
চালেতে না ছিল খড়, পরিবারে বাস॥
মোর বাড়ী ভাড়া ভান্যা আন খুদকুড়া।
মৎস্য কুটিয়া আন তার পোঁটা মুড়া॥
তৈল্য লবণ মাগ্যা আন চিরদিন।
আজি কেনি দেখি তোর সম্পদের চিন॥" (ঐ/১৪৭-১৪৮)

জগজ্জীবনের কাব্যে বেহুলার দেবলোক যাত্রাকালে 'গোদা' বেহুলাকে তার গৃহস্থালীর বর্ণনা দিয়েছে তাতে তার দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট —

"আমার গৃহের কথা কি কহিব পতিব্রতা
দক্ষিণ দুয়ারে ঘরখানি।
মাঝিয়াত নাই মাটি চতুর্দ্দিগে নাই টাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি॥
ঘরে আছে সর্ব্বস্ব ভাঙ্গ আছে দলা দশ
মৎস্যের সুকুটা দলা সাত।
এই ঘাটে মারি মাছ বেচি শ্রীগোলার হাট
দিবা অন্তে এক সন্ধ্যা ভাত॥" (জগজ্জীবন/২৭০)

বিজয় গুপ্তের কাব্যেও ধনা-মনার দারিদ্র্যের বিবরণ আছে। উৎসব, পূজা-পার্বণের বিবরণেও ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বোঝা যায়; চাঁদের মনসাপূজা কিংবা হাসন-হোসেনের মনসাপূজায় ঐশ্বর্যের ছাপ থাকলেও জালুমালুর ও রাখালের মনসাপূজায় দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছে। বিজয় গুপ্তের বর্ণনানুসারে-

"দিব্য মণ্ডপ ঘর করিয়া গঠন।

তাহাতে স্থাপিল ঘট বিচিত্র লিখন॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিধানে করিয়া।
পুষ্প দূর্বা চন্দন গন্ধ ছাগ বলি দিয়া॥
গীত বাদ্য মহাস্বর করে সর্ব্বজন।
হেন কালে ধেনু বৎস্য দিল দরশন॥" (বিজয়/১২০)

তৎকালীন অনেক কবিরাই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করতেন। মনসামঙ্গলের অপর এক কবি জীবন মৈত্র অর্থাভাবে প্রদীপের তেলটুকু সংগ্রহ করতে পারেননি। কবি নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে দুঃখ করে বলেছেন —

"শ্রীমিত্র জীবন কবি ঘরে বসি রৈল।
একদিন লিখিতে তাড়ির তৈল ফুরাইল॥" [২৮]

কবি আরও বলেছেন —

"কবির খরচ কিছু নাই
তত্ত্ব ছিল পুর দ্বারা সকল বুদ্ধি লইল হারা
পুথি বাঁধি হাটে চলি যাই॥"[২৯]

আবার অনেকে জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হত; বিপ্রদাসের কাব্যে জুয়া খেলার ফলে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার চিত্র পাই। কবির বর্ণনায় —

"অনিষ্ট পাপিষ্ট দুষ্ট জুয়ার প্রবল
জুয়া খেলাইতে তার মজীল সকল।" (বিপ্রদাস/২১২)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে অর্থ কৌলীন্য ও অর্থলালসা প্রবল হয়ে ওঠে, ভোগ ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, আর সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাই কবিরা নিরুপায় হয়ে পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে অর্থই অনর্থের মূল এই সত্য উপলব্ধি করেন। ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবনের কাব্যে এই উপলব্ধির প্রকাশ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অর্থাভাব ও অন্নাভাব আরও গভীরভাবে প্রকটিত হয়েছিল।

মধ্যযুগে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তারা স্বীয় বৃত্তিতে থেকে জীবিকা অর্জন করত। কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, জেলে, মালো, কাঠুরিয়া, গোয়ালা, মালী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষরা বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণী। তাছাড়া অন্ত্যজরা পশুপালন, বাঁশ ও বেতের কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা গৃহে উৎপাদিত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বা 'গাওয়ালে' বিক্রি করত। বংশীদাসের কাব্যে ছদ্মবেশিনী চণ্ডী শিবঠাকুরকে বলেছে —

"ডোমনী বলে মোর ডোম গিয়াছে গাওয়ালে।
একাকিনী খেয়া দেই এই ঘাটকূলে॥" (বংশীদাস/৪৩)

জেলেরা মাছ ধরত, কাঠুরিয়ারা কাঠ কেটে বিক্রি করত, কুমাররা হাঁড়ি-পাতিল গ্রামে বা নগরে ফেরি করে বিক্রি করত। চাঁদ সদাগরের ডিঙা ডুবির ফলে বিপর্যয় ঘটলে সে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছে— বিভিন্ন মনসামঙ্গলে এই দৃশ্য দেখা যায়। নারীরাও অনেক সময় উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত; বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দু নারীরা মাথায় করে বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে ফেরি করত। গোয়ালা নারীরা দধি-দুগ্ধের পসার নিয়ে যেত, মালিনীরা মধু, ফুল, ফুলের মালা গেঁথে বিক্রি করত। ধনা-মনা মালির পুত্র, ধনা-মনার জননী বলেছে – "পুষ্প বেচি খাব পুত্র না কর বড়াই।" (বিপ্রদাস/১১৮)। মনসামঙ্গলে দেখি মনসা কখনো মালিনী বেশ ধারণ করে ফুল বিক্রি করেছে, আবার কখনো গোয়ালিনী বেশ ধারণ করে দধি-দুগ্ধ বিক্রি করছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীরা খেয়া পারের পাটনীর কাজ করত, আবার ঝাঁটা, কুলা, ডালা ইত্যাদি গ্রামে গ্রামে ফেরি করত। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই শ্রেণীর মানুষের খুব একটা অস্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও পরবর্তীকালে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়েছিল। নারীরা অনেক সময় নটীবৃত্তি গ্রহণ

করত, ধনী গৃহে নাচ দেখিয়ে এরা উপার্জন করত। অনেক সময় এরা দেহোপজীবীতাকেও গ্রহণ করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা নটীবৃত্তি গ্রহণ করে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করেছিল। চতুঃবর্ণ প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের জীবিকা জ্ঞানচর্চা হলেও নিরঙ্কুশ জ্ঞানচর্চা দ্বারা ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহ হত না। মনসামঙ্গলে সোমাই পণ্ডিতের শিক্ষকতা বৃত্তি দেখা যায়। তাছাড়াও দৈবজ্ঞ, গণৎকার, যজমানি, ঘটকবৃত্তি গ্রহণ করত ব্রাহ্মণরা। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি শিক্ষকতার পাশাপাশি সোমাই পণ্ডিত বিধানদাতা ব্রাহ্মণের কাজও করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণরা কৃষিকার্যকেও স্বীকার করেছিল। মনসামঙ্গলে ব্রাহ্মণের কৃষিকার্যের পরিচয় আছে। বিপ্রদাসের কাব্যেও ব্রাহ্মণের কৃষিকার্যের কথা পাই। এক শ্রেণীর মানুষ অন্যের গৃহে দাসীবৃত্তি ও মাহিন্দারী বৃত্তি করত, রাখালরা গৃহস্থের গরু চরাত, মাহিন্দাররা গৃহস্থের ক্ষেতে কাজ করত। কখনো ধনী গৃহে দাস-দাসীর কাজ করত। চাঁদ সদাগরের গৃহে নারীগণের দাসী ও পুরুষগণের দাস রাখার কথা আছে —

"জলক্রীড়া করি সভে উঠিল ডাঙ্গায়।
আস্তে ব্যস্তে সহচরী বসন জোগায়॥

... ...

ছয় ভাই স্নানে গেল হরষিত হইয়া।
জলক্রীড়া করিয়া সানন্দে কৈল স্নান
জার সেই যোগ্য বস্ত্র দাসেতে জোগান।" (বিপ্রদাস/১২৯)

সনকার ঝাউয়া দাসীর কথা মনসামঙ্গলে সুপরিচিত। দাস প্রথা বোধ হয় প্রচলিত ছিল, কেননা বিবাহকালে দাসদাসী উপহার দেওয়ার রীতি দেখা যায়। তাছাড়া চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় সঙ্গী মাঝিমাল্লাগণ ছিল তার দাস। এক শ্রেণীর দরিদ্ররা মুটে বৃত্তি করত, তারা গৃহস্থের জিনিসপত্র মাথায় বহন করত। চাঁদ সদাগরের মুটে বৃত্তির কথাও আছে মনসামঙ্গলে। চৈতন্য-পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, অন্যান্য বৃত্তি ও কৃষিবৃত্তিকে হারিয়ে ব্রাহ্মণরা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করেছিল। বিশেষত চৈতন্য-পরবর্তীকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের মিশ্র বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই এই মিশ্রবৃত্তির প্রতিবেশ গড়ে উঠেছিল। বৃত্তি হিসাবে চাকুরী গ্রহণের প্রবণতা সাধারণ জনসমাজে ছিল না, তবে কিছু লোক সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত।

মনসামঙ্গলে মধ্যযুগের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জানা যায়। পর্যটকদের বিবরণ থেকেও জানা যায় সেকালে দ্রব্যমূল্য কত কম ছিল। মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়— এক বোঝা কাঠের দাম মাত্র চার পোণ কড়ি। বিজয় গুপ্তের বর্ণানুসারে চাঁদ সদাগর বিপর্যয়কালে চার পোণ কড়িতে একবোঝা কাঠ বিক্রি করেছে – "এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন।" (বিজয়/২৯২) আবার চার পোণ কড়ি দিয়ে চাঁদ সদাগর কি কি করবে তার বিবরণ দিয়েছে। সেকালে এক পোণ কড়িতে এক ভাঁড় দধি পাওয়া যেত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসাকে বলেছে –

"বল বল গোয়ালিনী দধির কিবা মূল।
ধর ধর পোন কৌড়ি দধির যেবা মূল॥" (বিজয়/১৭১)

বিপ্রদাসের কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে এক ভাঁড় দধির মূল্য মাত্র পঞ্চাশ কাহন কড়ি। চার পোণ কড়িতে এক খানি বস্ত্র পাওয়া যেত, কুমারের নারী চাঁদকে চার পোণ কড়ি দিলে সে কি কি করবে তার বিবরণ দিয়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যের বিবরণে পাই এক বোঝা কাঠের দাম মাত্র সাত-আট পোণ কড়ি—

"নগরে বেচিলে বোঝা পাই পণ আট।
জাতি অনুসারে মোরা নিত্য বেচি কাঠ॥" (ক্ষেমানন্দ/২৩৫)

তাছাড়াও রাখালগণের মনসাপূজার আয়োজনে কত পোণ কড়ি দিয়ে কি কি দ্রব্য কেনে তার বিবরণ আছে –

"হাসনহাটির হাট : কড়ি সে কাহন আট : গমন করিল বাসু হর‍্যা।
কিনিল নৌতন ডালা : ছড়াসনে চাঁপাকলা : মূল্য দিল তিন কড়া কর‍্যা॥

. . . .

নিজ মন পরিতোষে : বস্ত্র কিনে অবশেষে : শতেক কাহন মূল্য যার॥" (ঐ/৯৬-৯৭)

এই বিবরণ অনুসারে খুব কম দ্রব্যমূল্যের কথা পাওয়া যায়। অবশ্য বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব অপেক্ষা বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের কাব্যে অধিক দ্রব্যমূল্যের কথা পাওয়া যায়। জগজ্জীবনের কাব্যে পাই আট-দশ পোণ কড়ি নিয়ে মেনকা দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে হাটে যাচ্ছে। তৎকালীন যুগে একজন শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল মাত্র এক টাকা। চাঁদসদাগর বিপ্রকে বলেছে –

"আমি ত কৃষাণ বড় ক্ষেত্রকর্মে অতি দড়
থাকিবো তোমার গৃহবাসে।
ত্রিসন্ধ্যা ভোজন করি চারিখানি বস্ত্র পরি
এক তঙ্কা লই এক মাসে।" (বিপ্রদাস/১৬২)

মধ্যযুগে বিনিময় প্রথার মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয় চলত। বস্তুবদল অংশগুলিতে কবি কল্পনার আতিশয্য থাকলেও দ্রব্যমূল্য কত কম ছিল তা বোঝা যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কড়ির দুষ্প্রাপ্যতা হেতু মূল্য বৃদ্ধি বলে মনে হত, আসলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল।

ধর্মজীবন ঃ নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত ছিল বাঙালীর কৌম জীবন, সুতরাং তাদের আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনাগত ভিন্নতা ছিল। আবার আর্থসামাজিক কারণে তাদের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত বেশী। মনসামঙ্গলে বাঙালী সমাজের ধর্মীয় পরিচয়ে দু'টি প্রধান রূপ দেখা যায়, তা হল হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দুদের কথা নিয়ে রচিত এবং হিন্দু কবিদের দ্বারাই রচিত তাই হিন্দুধর্মই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধারা তখন লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম, নাথধর্ম বৈদিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং লৌকিক ধর্মাচারগুলি মিশ্রিত হয়ে গেছে। তখন সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং নিম্নতর পর্যায়ে অনার্য প্রভাবিত লৌকিক হিন্দুধর্ম চর্চা হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। ইসলামের সমর্থকরা তরবারিকে আশ্রয় করলে ইসলামের সর্বগ্রাসিতা থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্ম মিশ্রণের সুযোগ পেল। পৌরাণিক বৈদিক ধর্ম মানুষের বাসনা নিবৃত্তিতে ব্যর্থ হলে মনসা, চণ্ডীর মত লৌকিক দেবীরা সমাজে জায়গা করে নিতে থাকল। বাংলার লৌকিক অনার্য সংস্কৃতিতে পালা-পার্বণ, বার-ব্রত প্রচলিত ছিল, যা উচ্চবর্ণের সমাজ সহজে মেনে নেয়নি। মনসাপূজা বহু পূর্ব থেকেই ব্রত আকারে প্রচলিত ছিল। জালু-মালুর ঘরে মনসাপূজা তারই ইঙ্গিত বহন করে। মূলত জেলে, মালো, গোয়ালা চাষীর ঘরেই ব্রতাকারে এই পূজা প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে জালু-মালুর মনসাপূজা, কবির বর্ণনায় –

"রত্নময় সিংহাসনে মনসা বসায়
দুই বধূ লইয়া মঙ্গলগীত গায়।" (বিপ্রদাস/৮৭)

মনসার পূজা প্রচারিত হবার আগেই যে ব্রতাকারে মনসাপূজা হত এখানে সে কথা পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে জালু-মালুর ঘরে মনসা পূজা প্রসঙ্গে মনসার উক্তি –জালু-মালুর জননী মনসার ব্রতদাসী, সুতরাং মনসা আগে তার পূজা নিতে যাচ্ছে। এভাবে ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের নারীর অন্তঃপুরে লৌকিক দেবীর প্রবেশ ঘটে। ক্ষেমানন্দ বেহুলার গুণপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে–

"বার মাসে বার ব্রত : পুণ্যতিথি করে কত : দেব কার্য্য করে অবিশ্রাম।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৩)

মূলত নারীরাই ব্রতাচারগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকত; কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ স্ত্রীদেবতায় আস্থাশীল ছিল না। তাই সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকগণ এবং নাথধর্মের গুরু আচার্যরা নারী বিদ্বেষী ছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মে নারী যুক্ত হয় এবং ব্রতকথাগুলি মঙ্গলকাব্যাকার ধারণ করলে পুরুষও ব্রতের দেবীর সঙ্গে যুক্ত হল। শৈব পুরুষ শক্তি দেবীর প্রাধান্য স্বীকার করে নিল। চাঁদ সদাগরের মত ঘোর শৈবও বাম হাতে অনিচ্ছা সত্বেও অর্ঘ্য নিবেদন করল। কারণ চণ্ডীর মুখ নিসৃত বাণীতে মনসা ও ভগবতীর অভেদত্ব স্বীকৃত হয়েছে —

"তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্ত্তি আমি সেই নাহি অন্য পর॥
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর॥
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি।
এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী॥" (বিজয়/৫৩৫)

সুতারাং চাঁদ স্বীকার করল —

"জগতজননী পদ্মা আদ্যের দেবতা।
মুই নহে জানি পদ্মা জগতের মাতা॥" (ঐ/৫৩৬)

পরবর্তীকালের বিশেষত জগজ্জীবন ঘোষাল, ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর অনেক বেশী নতজানু। হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় গত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনাটি চৈতন্য-পূর্ব যুগেই শুরু হয়েছিল। এভাবে অন্যান্য লৌকিক দেবীরাও সমাজে জায়গা করে নিয়েছিল। তাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বহু লৌকিক দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে বহু লৌকিক দেবদেবী, যেমন বিক্রমপুরের আদ্যা, মৌলার রঙ্কিনী, বালিডাঙ্গার সর্বমঙ্গলা, দশঘরার বিশালাক্ষী, বারাসতের সবেশ্বরী সর্বজয়া, কৃষ্ণনগড়ের গড়েশ্বরী, বালিয়ার সিংহবাহিনী, কালীঘাটের কালী, পুরটের ঘাটু, বেতরে বেতায় আমতার মেলাই, হিজলীর কালুরায়, সেয়াখোলার, উত্তরবাহিনী বন্দীপুরের বিনোদিনী, সিমিলার সুরেশ্বরী, জাজপুরের বিশালাক্ষী, সানিহাটের রক্তবিমলার, ক্ষীরগ্রামের যোগেশ্বরী, কাঙুরের কামিক্ষা বন্দনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গলে তন্ত্রধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু, সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞরা তন্ত্রচর্চার দ্বারা তুক্‌তাক ঔষধীকরণ, বশীকরণ করত। তন্ত্রচর্চার দ্বারা তারা অসাধ্য সাধন করত। তাই পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর পাশাপাশি ভূত- প্রেত, দৈত্য-দানো বন্দনাও করা হয়েছে। আসলে বাঙালীর কোন নির্দিষ্ট ধর্মবোধ ছিল না, প্রত্যেক দেবদেবীর উপাসনাই তারা করত, বস্তুত বাঙালী পঞ্চোপাসক; তাই মঙ্গলকাব্যে বহু দেবদেবীর বন্দনা লক্ষ করা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বৈষ্ণবধর্মের প্রবল স্রোতে ভেসে যায় বাংলাদেশ। চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্মকে নতুন মাত্রা দিলেন। বৈষ্ণবধর্ম অন্য ধর্মকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, তাই কবিরা বৈষ্ণব বন্দনা ও চৈতন্য বন্দনা করেছেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে তুলসী মাহাত্ম্য বর্ণনা, চৈতন্য বন্দনা করা হয়েছে। জগজ্জীবন ও বংশীদাসের কাব্যেও বৈষ্ণব বন্দনা আছে। জগজ্জীবনের কাব্য শুরু হয়েছে— "হরি বোলরে ভাই সংসার সকল জলময়।" এই ধুয়া দিয়ে। বংশীদাসের কাব্যে বৈষ্ণব বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, তুলসী বন্দনা আছে —

"নীলাচলে বন্দি প্রভু দেব জগন্নাথ॥
পুষ্প মধ্যে গাই আদ্যে প্রধান তুলসী।
ব্রতমধ্যে প্রধান গাই ভৈমী একাদশী॥" (বংশীদাস/১৩)

তাছাড়া বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত ধুয়া ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

১। হরি বোলরে ভাই সংসার সকল জলময়। ২। আর কি করে ওহো ও। শ্যাম রূপ দেখিতে মধুর॥

৩। হরিমাধব রে হরি বল রাম। ৪। বৃন্দাবন মাঝে কানাই বাঁশী বাজায়। জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখি চাঁদ সদাগর অনান্য তীর্থ ও দেবপূজার পাশাপাশি চৈতন্যতীর্থে পূজা ও বন্দনা করেছে। –

"ঘাটদহে ঘাটেশ্বর পূজে উপহারে।
নবদ্বীপে দেখিল চৈতন্য অবতারে॥" (জগজ্জীবন/১২৮)

চৈতন্য-পরবর্তী বাঙালী সমাজের মুখ্য ধর্ম হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবধর্মে রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পেল। এ ভাবে বৈষ্ণবধর্মেও শাক্ত দেবীর প্রতিষ্টা লাভ ঘটে। তাই দেখা যায় চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে দেবীদের প্রতিষ্ঠার পথ অনেক সুগম।

মনসামঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সমাজের নামকরণগত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাধারণত দেব-দেবীর নামের দ্বারা নামকরণ করা হত। তবে লৌকিক শব্দবন্ধেও নামকরণ করা হত, যথা – সনকা, বেহুলা, চাঁদ, বচাই, ইত্যাদি। লৌকিক ভাষা ও জীবনের ছোঁয়া এতে আছে। চাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূদের নামকরণ করা হয়েছে কখনো পৌরাণিক দেবতার নামানুসারে, কখনো লৌকিক শব্দবন্ধে। যেমন , শ্রীধর – তারা, বাচস্পতি - সীতা, ভগীরথ - মন্দোদরী, মধুকর - জয়া, দুর্গাবর – বিজয়া, ষষ্ঠীবর - মহামায়া, লখীন্দর-বেহুলা ইত্যাদি। লক্ষণীয় এখানে পৌরাণিক ও লৌকিক শাক্ত দেবীর নাম গৃহীত হলেও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ নেই। এই নামকরণগুলি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য (পৃ:৬৯) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়— যে সময়ে মনসামঙ্গল কাব্য গঠিত হয়েছে তখন সমাজে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ছিল না। ধর্মগত প্রবণতায় উচ্চস্তরে শৈব এবং লৌকিক স্তরে শাক্ত ধর্মই প্রধান ছিল। বেদ ও পুরাণ কাহিনীর প্রভাব জনজীবনে ছিল তা এই সমস্ত তথ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে।

মুসলমান সমাজ ঃ মনসামঙ্গলে মুসলমান সমাজ সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে দেবকথা নির্ভর মঙ্গলকাব্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য নেই। তাছাড়া মধ্যযুগীয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস মূলত হিন্দুর ইতিহাস, কেননা নবাগত মুসলমানগণ শাসনকার্য ও সাম্রাজ্যের লড়াই নিয়েই এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে মুসলমানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তখনো সম্ভব হয়নি। তাদের যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তার অনেকটাই তুর্কী সমাজের অনুরূপ। ধীরে ধীরে মুসলমানগণ এদেশে বসতি স্থাপন করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। হাসনহাটি কাজিহাটি, জোলাহাটা এই নামের ভিতর দিয়েই বোঝা যায় ঐ স্থানগুলি মুসলমান অধ্যুষিত ছিল। এখানকার মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠিত অভিজাত। তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যেমন অভিজাত সমাজে পান-সুপারির বিশেষ প্রচলন হয়েছিল, তাদের পান জোগাবার জন্য দাসী বা বাঁদী থাকত, পুরুষের খাস চাকর থাকত। বাঁদীরা পান তৈরি করত, সালন চাখত, বেশবাস করাত। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে —

"চাঁপা বিবি করয়ে করুণা
প্রাণের অধিক মোর সাত বাঁদি ছিল ঘর
বিপাকে মরিল সর্বজনা।
... ...
জাফরি মরিয়া গেল পান জোগাইত ভাল
নিবারিতে নারি আর মনে।" (বিপ্রদাস/৭৭)

মুসলমান সমাজে বোধ হয় আফিম ও তামাক খাওয়ার প্রচলন ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে তামাক ও হুকার উল্লেখ পাওয়া যায় –

"কর্পূর তাম্বুল খায় কস্তুরি-চন্দন গায়
গোলামে জোগায় ঘনে ঘন।
... .

কেহ আনন্দিত হৈয়া সুবর্ণের হুকা লৈয়া

তমাকু ভরিয়া দেয় আগে।" (ঐ/৬৭)

পোশাক হিসাবে মুসলমান পুরুষরা ব্যবহার করত ইজার। তাছাড়া গায়ে চাদর, মাথায় টুপি, পরিধানে পাজামা ব্যবহার করত –

"মাথায় পরেছে টুপী পিঙ্গল ইজার।
গায়েতে চাদর দিয়া আসা হাতে তার॥" (বংশীদাস/৬১)

তৎকালীন মুসলমান সমাজের প্রধান খাদ্য ছিল রুটি, তাছাড়া ভাতও তারা খেত। মুসলমানরা 'হেড়া' সম্ভবত মাংস ভক্ষণ করত, কেননা বিপ্রদাসের কাব্যে হিন্দুর মুখে 'হেড়া' ঘষে দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে। তাছাড়া তারা পেঁয়াজ, রসুন ও মুরগীর মাংস খেত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই –

"হেড়া আর রুটি : করি পরিপাটি : ছিল পিঁয়াজের কোষা।
পূর্ণিত সানকি : রৈল খানা কি : খাইতে মিঞার আশা॥" (ক্ষেমানন্দ/১২৮)

মুসলমানরা বিছানায় বসে ভোজন করত। যেমন –

"সৈয়দ হাসন কাজি বসি বিছানাত।
লাড়কা করিয়া সনে সুখে খায় ভাত।" (বাইশা/৭০)

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে বদনা বা গাড়ু, সানকি ইত্যাদি ব্যবহার হত। মুসলমানদের জীবিকা ছিল প্রধানত কৃষি। বিপ্রদাসের কাব্যে গোরা মিনা নামে এক মুসলমানের চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। তাছাড়া তারা হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন করত, ছাগল পালন করত, মনসামঙ্গলে এসমস্ত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। হিন্দুসমাজের মত মুসলমান সমাজে বৃত্তিধারী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন কাজীরা বিচার করত, জোলারা তাঁত বুনত, পট আঁকত পটিদাররা, নৃত্য করত নটীদাররা, দর্জিরা কাপড় সেলাই করত, মখদমরা মাংস কাটত, হাজমরা সুন্নত করত। বিপ্রদাসের বর্ণনায় পাই –

"বুড়ো জোলা এক মনে তাঁত বোনে ঘনে ঘনে

ঘাড়া নাড়া দিয়া অতিশয়।" (বিপ্রদাস/৮০)

কিংবা, বংশীদাসের বর্ণানুযায়ী –

"হাসেন হোসেন কাজি গোষ্ঠী তারা জোলা।
পড়িয়া হয়েছে খল করে কাজিয়ালা॥
কাপড় বুনিয়া খায় এই বৃত্তি ছিল।
জীবন উপায় এই তারে ছাড়ি দিল॥" (বংশীদাস/৬০)

আবার ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাই –

"নগর বাজারে : মৈল পটিদারে : পট লয়্যা মাগে যেবা।
নিজ ঘরে জোলা : মরিয়া ত গেলা : তাঁত বুনে আর কেবা॥
... ...
হাজমে হাজত : কৈল অবিরত : রহে সুন্নতের খুর।
বিঘত্যার বিষে : মরিল নিমিষে : শূন্য হৈল তার পুর॥
মৈল মখদম : নিল তারে যম : কাটিত বকরি গলা।
গাএত কম্বল: খাইত আম্বল: আফিঙ্গ আঠার তোলা॥" (ক্ষেমানন্দ/১২৭-১২৮)

মুসলমান সমাজে দৈবজ্ঞ, আউলিয়া, দরবেশদের প্রভাব ছিল এবং এদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল। তাই মনসা দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে হাসনের বিবিকে ছলনা করতে যায় –

"হাসন বেড়িল নাগে বিবি ছলিবার যোগে
চলিলা দৈবজ্ঞ-রূপ হৈয়া।
... ...
এই বাড়ি জানা পথে এখনি আসিব ভূতে
অগ্নি জ্বালি দিহ তার গায়।" (বিপ্রদাস/৭৬)

পাঁজি, পুথি দৈত্য-দানো, ভূত-প্রেতের প্রতি ভয় ও বিশ্বাস ছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ লম্বা দাড়ি রাখত, নিয়মিত রুজু-নামাজ- রোজা করত, কিতাব-কোরাণ পাঠ করত, বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে -

"কাজি মজলিস করি কেতাব কোরান ধরি
খাতাগুলা তজবিজ করে।
সোয়ার পেয়াদা কত মজুদাত শত শত
সদা পাঁচ হাতিয়ার ধরে।
কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
রুজু করি করয়ে নছাব
জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।" (ঐ/৬৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যের বর্ণনায় ও মুসলমান সমাজের এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় —

"বেলা হৈল অবসান : কাজী মোচড়ায় কান : নমাজ করএ উঠি পড়ি।
সৈয়দ সুন্নেক যত : কোরাণে গাহেন গীত : দরবেশ বাজায় দগড়ি॥" (ক্ষেমানন্দ/১২০)

মুসলমান ফকির ও মোল্লারা মসজিদে বা ফকিরের মোকামে সন্মিলিত হয়ে থাকত, সেখানে তারা কোরাণ পাঠ করত, কলন্দর গাইত। আউলিয়া দরবেশরা পীরের মোকামে বসবাস করত, তারা ছিল সংসার ত্যাগী, ভিক্ষোপজীবী। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায়—

"কপি লয়্যা কুলি কুলি : মারাঠা মাগিয়া বুলি : চালু কড়ি প্রতি ঘরে ঘরে।
পীরের মোকাম ঘরে : কলিমা ফয়তা পড়ে : আউল্যা দরবেশ বলি তারে॥"(ঐ/১২১)

এই শ্রেণীর মুসলমানগণ হিন্দুসমাজের কাছে শ্রদ্ধা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য অনেক কাজী, মোল্লারাই ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন। দাড়ি রাখা, সুন্নত করা মুসলমানগণের কাছে পবিত্র কর্ম ও ধর্মাচার বলে গৃহীত হত। সাধারণ মানুষ পীরের দরগায় কামনা-বাসনা পূরণের জন্য মোরগ, ছাগল উৎসর্গ করত, তাছাড়া কোরবানী প্রদান তাদের কাছে পবিত্রকর্ম বলে গণ্য হত। ক্ষেমানন্দের বর্ণনানুসারে —

"টাক্যায় বুলায় হাথ রক্ষা কর আল্লা।
বারেক দেশেরে যদি নিঞা যায় তাল্লা॥
দুইটি মোরগ দিব পীরের নিয়ড়ে।" (ঐ/১১৬)

মুসলমান সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে হাসনের শত বিবির কথা পাই. আবার নারীরও বহুপতি গ্রহণের কথাও পাওয়া যায়। বোধ হয় নারীর বহুপতি গ্রহণ মুসলমানদের সামাজিক দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল না। কবিরা কৌতুককর ঘটনা হিসাবে শ্লেষের ভঙ্গীতে ব্যক্ত করলেও তা সত্যমূলক তথ্য। ক্ষেমানন্দের বর্ণনানুসারে –

"কালিয়া কম্বল গায় মরিল শেখানী।
আঠার শেখেতে তারে কব্যাছে কামিনী॥
মর্যাছে আঠারজন সে নব যৌবনে।
একেক দিবস লয়্যা থাকে একজনে॥" (ঐ/১২৫)

ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ কবরস্থ করা হত। কবরের চার কোণে কলাগাছ পুঁতে মৃতের শিয়রের দিকে জলপূর্ণ কলস রাখা হত। ক্ষেমানন্দের বর্ণনানুযায়ী —

"মাটি কুড়ি কুড়ি হাদিরা বনান।
চারিদিগে দিল চারিগাছি মান॥
হেড়া রুটি দিয়া পড়িল কোরাণ।
মাটি দিল তবে যত মুছলমান॥
... ...
চারিদিগে চারি রুপিল কলা।
হক্‌ক আল্লাহ জপে রসুল্লা॥
বুক কুড়ি কুড়ি কবর বেঢ়ি।
গাগরি পূরিয়া শিয়রে এড়ি॥" (ঐ/১২৯)

মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালায় তৎকালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সমগ্র মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে চিত্র পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে, অন্যান্য কাব্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। অতিরঞ্জন থাকলেও তার ঐতিহাসিক সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। দু'টি ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস শুরু করলেও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পরধর্ম বিদ্বেষী ছিল। বিশেষত নবাগত মুসলমানগণ শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাপুষ্ট হয়ে হিন্দুর উপর অত্যাচার করত। বিজয় গুপ্ত থেকে বংশীদাস পর্যন্ত সকলেই কম বেশী এই চিত্র বর্ণনা করেছেন। কাজীরা তৎকালীন মুসলমান শাসকের নিযুক্ত বিচারক। কিন্তু তারা বিচারেরক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারত না। মনসামঙ্গলের বিবরণ অনুসারে কাজির প্ররোচনায় মোল্লারা হিন্দুর উপর অত্যাচার করে দেব-দেউল ভেঙ্গে দেয়। বিজয় গুপ্তের বর্ণানুসারে —

"একখান ঘর দেখে বন চারিভিতে।
মনের হরিষ মোল্লা গেল ছায়া লইতে॥
ঘরখানি বেড়িয়া রাখালে খেলায়ে।
জয়ে জয়ে বলিয়া সানন্দে গীত গায়ে॥
কেহ ঢাক ঢোল বাজায়ে মৃদঙ্গ ঘন ঘন।
মধ্যে মধ্যে ঘন্টা বাজায়ে বিচিত্র লিখন॥
ঠাই ঠাই দেখিলেক ছাগলের রক্ত।
কাজির প্রতাপে বেটা বড়হি দুরন্ত॥
আল্লা আল্লা বলিয়া যায়ে ঘট ভাঙ্গিবার।" (বিজয়/১২৩)

হাসন-হোসেন শাসক হয়েও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিল না, অনুচরের মুখে হাসনহাটিতে মনসাপূজার কথা শুনেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—

"এই ত হাসনহাটি হাসনের পাট।
তাহে অবতার হৈল হিঁদুয়ার ঠাট॥
যবনের পুরে আইল হিন্দুর দেবতা।

হাসন হুসন দূত-মুখে শুনে কথা॥

... ...

মার মার শব্দ ঘন ডাকে দুইভাই।

সকল নগরে হৈল মহা ধাওয়াধাই॥" (ক্ষেমানন্দ/১০৫)

বংশীদাসের কাব্যেও পাই মোল্লাগণ অকারণে রাখালগণের পূজার ঘটবারি ভেঙ্গে দেয় –

"সেই মোল্লা গেল তবে গোয়ালার বাড়ি।

মণ্ডপ ঘরেতে দেখে পূজে বিষহরি॥

তার কাছে গেল মোল্লা দেখিবার ছলে।

পূজা দেখি মোল্লা তাই বিছমোল্লা বলে॥

বিছমোল্লা বলিয়া মোল্লা ধরে দুই কান।

সৈদের মাটিতে ভাই কিসের হিন্দুয়ান॥

এতেক বলিয়া মোল্লা না করিল আন।

আসার বাড়িতে ঘট কৈল খান খান।" (বংশীদাস/৬১)

কাজী ও মোল্লার আত্মীয়রাও নিজেকে ক্ষমতাবান বলে মনে করে হিন্দুর উপর অত্যাচার করত। মদ্যপ অবস্থায় ব্রাহ্মণদের অপমান করত, তুলসী গাছ অপবিত্র করত –

"তুলসীর পত্র পায়ে যাহার মাথাতে।

চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাতে॥

সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।" (বিজয়/১২২)

অকারণেই তারা হিন্দুর জাতি নষ্ট করার ভয় দেখাত। সেকালে হিন্দুদের গরুর মাংস খাইয়ে, কলমা পড়িয়ে, সুন্নত করিয়ে কিংবা মুসলমানের সঙ্গে নিকা করিয়ে বলপূর্বক মুসলমান করার ভয় দেখাত। বিজয় গুপ্তের কাব্যেও এরকম প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্যে ছদ্মবেশী মনসাকে 'হেড়া' খাইয়ে মুসলমান করার কথা পাই —

"সহিতে না পারি জ্বালা বলে সভা প্রতি

বিষম বামনি বুড়ী ধর শীঘ্রগতি।

হেড়া খাওয়াইয়া দিব দেহ পাখড়িয়া

দরবেশে নিকা দিব কলিমা পড়াইয়া।

... ...

ফকিরের মুসলমাত করাইব তায়

শুনিয়া কুপিল অতি দেবী মনসায়।" (বিপ্রদাস/৭১)

বিপ্রদাসের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগরকেও মুসলমান করার চেষ্টা ও জাতিনাশ করার কথা—

"কেহ দুষ্ট ভাত লইয়া জাচায় রাজায়

কেহ মুখে ঝুটা পানি দিতে চাহে গায়।

আর দরবেশ মাতোয়ালা হইয়া জায়

চামড়ার বাড়ি মারে চাঁদোর মাথায়।

আর দরবেশ তৈকা মাথে দেয় তুলি

উসারিয়া জায় রাজা শিব শিব বলি।" (ঐ/১৬৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও অনুরূপ প্রসঙ্গ পাই –

"মারিয়া চামের দড়া : গিলাবে গরুর হেড়া : থুব দিয়া করিবে যবন।"(ক্ষেমানন্দ/১০৭)

হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করার কথা ঐতিহাসিক সত্য। মনসামঙ্গলে সদ্য ধর্মান্তরিতকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়-

"হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান
শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।
নিকা-বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদা খোসালিত অতিশয়
মোকাদিমে লৈয়া জায় কালিমা কোরান তার
ফএতা পড়িয়া সাঙ্গ হয়।" (বিপ্রদাস/৬৭)

অনুরূপ কথা পাই আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশাতে —

"পূজা ভাঙ্গি ঘটবারি ভাঙ্গিয়া ফেলায়।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য পাড়ে দুই পায়॥
ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করিবার ছলে।
কর্ণেও কলিমা পড়ে যবন সকলে॥" (বাইশা/৭১)

শুধু তাই নয়, তারা অবাধ্য হিন্দুর গৃহদাহ পর্যন্ত করত। যেমন—

"ভাই বলে, 'হিন্দু মারিয়া কার্য নাই।
আগুন লাগায়্যা ঘর পুড়ি কর ছাই'॥" (বাইশা/৬৯)

হিন্দুর দেবদেবীকে মুসলমানরা ভূতপ্রেতের সঙ্গে তুলনা করেছিল। মুসলমান ঘরের মেয়েরাও হিন্দু বিদ্বেষী ছিল —

"দেখিয়া পদ্মার মায়া বলে রুষ্ট বাণী
বোজা মাসে ভূত কেন পূজিস ডাইনি।" (বিপ্রদাস/৬৬)

মুসলমানের দৃষ্টিতে হিন্দুরা ছিল বিধর্মী কাফের। মুসলমানের এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুরা শুধু প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল তাই নয়, হিন্দুর কাছে মুসলমানরা ছিল যবন, অস্পৃশ্য; তাদের সহ্য করাও হিন্দুদের কাছে সম্ভব ছিল না। তাই হিন্দুর অধিকৃত এলাকায় মুসলমানদের অকারণেই নিগ্রহ করা হত। বিপ্রদাসের কাব্যে দেখি নির্দোষ গোরামিনার গোলাম রাখালগাছিতে এলে গোয়ালাগণ অকারণেই তাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। বিপ্রদাসের বর্ণনায় —

"জেখানে রাখালগণ পূজে মনসায়
দৈবযোগে সে গোলাম তথাকারে জায়।
ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুড়ুক দেখিয়া
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া।
একেলা গোলাম সবে রাখাল বিস্তর
পালাইয়া গেল গোরা মিনার গোচর।
সভয় কম্পিত অতি সব কথা কয়
বিনি দোষে রাখাল মারিতে মোরে ধায়।" (বিপ্রদাস/৬৩)

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল; বস্তুত মুসলমানগণের বিধর্মীর প্রতি অত্যাচার দেখে হিন্দুরাও মারমুখী হয়ে উঠেছিল। ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখি হাসনের দূতগণ রাখালগণের মনসাপূজার দ্রব্য লুন্ঠন করলে রাখালগণ মারমুখী হয়ে ওঠে। বংশীদাসের কাব্যেও দেখি রাখালগণ প্রতিরোধ হিসাবে মুসলমানদের লাঞ্ছিত করে —

"তাহা দেখি গোয়ালা সব ধায় তরবড়ি।
বেড়িয়া ধরিল সবে তার লম্বা দাড়ি॥
দাড়িতে ধরিয়া কিল মারে শতে শতে।

চড় লাথি গলাধাক্কা না পারি কহিতে॥
নয়া ধাড়ীতে নিয়া দিল মার্গ ছোেচারণ।
মিনতি করিয়া বলে ধরিয়া চরণ॥" (বংশীদাস/৬১)

মনসা হিন্দুশাসকের প্রতিভূ, হিন্দু নেতৃত্বের প্রতিভূ। মনসার সর্পসৈন্যদের দ্বারা মুসলমানরা পরাভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুর কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়, হিন্দুর দেবদেবীর স্তবস্তুতি করে। হাসন- হোসেনও মনসাপূজা করলে দেবী হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে-

"যাহা ইচ্ছা থাকে বর মাগ নরপতি
ছত্রিশ আশ্রম লৈয়া করহ বসতি।
শুনিয়া হাসন রাজা দ্রবিদ-হৃদয়
ক্ষিতি লুটি অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কয়।
অপরাধ ক্ষেম মোরে জগত-জননী
পাপ মুখে কতেক বলিল মন্দ বাণী।
জগত-ঈশ্বরী তুমি আদি নিরাঞ্জন
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।" (বিপ্রদাস/৮১)

বংশীদাসের কাব্যেও দেখি হাসনের জননী নবলক্ষের পূজা দিয়ে স্তবস্তুতি করেছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মানুষকে আপন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও অন্য ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করায়। নবাগত মুসলিমরা হিন্দুসমাজে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রচার চালাতে থাকে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বলা হয়েছে-

"বাসুরে, হিন্দুভূত কেন পূজ্যা মর।
লক্ষ লক্ষ পীর কাছে : লক্ষেক পীরানী আছে : তার সেবা কেন নাই কর॥
কোরাণে কাজীর পাশ : শুন তার ইতিহাস : খোদায় জপন বড় ধন।"(ক্ষেমানন্দ/১০৭)

এভাবে ধর্মান্তরিত সম্ভব না হলে দৈহিক নির্যাতন ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু শুধু মাত্র ভয় দেখিয়ে হিন্দুর ধর্মান্তরিতকরণ খুব একটা হয়নি। হিন্দুরাও আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছিল। হাসন-হোসেন ও মনসার দ্বন্দ্বে হাসনের পরাজয় ও মনসার জয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলে মনে করা যায়। নারায়ণ দেব কাব্যে হাসন-হোসেন পালা বর্ণনা না করলেও হাসন-হোসেনকে চোর, ডাকাত বলে উল্লেখ করেছেন; আসলে মুসলমানগণ ধর্মবিদ্বেষ বশত অনেক সময় হিন্দুর ধনসম্পদ লুন্ঠন করত। তাই নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগর মুসলমানদের শুধু মাত্র চোর-ডাকাতই বলেননি প্রথমে দেবীর শত্রু ও পরে পূজক রূপে চিহ্নিত করেছেন। কবির এই মনোভাব ধরা পড়েছে কালনাগিনীর প্রতি দেবী মনসার উক্তিতে —

"হাসন হুসেন দুই ভাই আমি গেলাম তার ঠাই
দিল্লিপের হয়ে রাজা।
আমার রাখাল মারি ভাঙ্গিছিল ঘট বাড়ি
ভয়ে দিল নবলক্ষের পূজা॥" (নারায়ণ/৬৮)

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান শক্তি অনেকক্ষেত্রেই হিন্দুশক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে এবং ভীত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে। বস্তুত হাসন-হোসেন পালা হিন্দু নরপতি ও মুসলমান নবাবের দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু শক্তিকে পরাভূত করে মুসলমান শক্তি বিজয়ী হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে হিন্দু শক্তির কাছে পরাভূত হয়। ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতি আত্মীকৃত হয়ে যায়।

মনসামঙ্গলে বর্ণিত এই সমস্ত চিত্রাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয়— বিশেষত, চৈতন্য-পূর্ব যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একেবারেই সুস্থ ছিল না। মুসলমানের অত্যাচার হিন্দুসমাজকে আক্রান্ত করেছে, মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে হিন্দুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে এই সমস্ত বর্ণনা অনেকটা গতানুগতিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিজয় গুপ্ত মুসলমানদের অত্যাচারের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন— পরবর্তীকালের কবিরা, বিশেষত

চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবিরা অনেকটা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তবে একথাও বলা যায় যে, চৈতন্য-পরবর্তীকালের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে চিত্র পাওয়া যায় তা একেবারে অলীক নয়, কেননা মুকুন্দ চক্রবর্তী যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা সর্বৈব চিত্র নয়। বিভিন্ন সময়েই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগের কবিগণ মোটামুটি কয়েকটি উদ্দেশ্য প্রতিপূরণের জন্য এই চিত্র তুলে ধরেছেন। সেগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে-

প্রথমত : নবাগত মুসলমান শ্রেণী তথা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শাসিত শ্রেণীর জনমানসকে প্রতিরোধ চেতনায় উদ্দীপিত করে তোলা।

দ্বিতীয়ত : ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের ভাঙন রোধে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা এবং অন্য ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয়ত : দেবীর মুখ নিসৃত বাণীতে জনমানসে আস্থা অর্জন ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা।

চতুর্থত : মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু রূপে চিহ্নিত করে রক্ষণশীল সমাজের সীমারেখা বজায় রাখা।

প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গলে হাসন-হোসেনকে অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে অসুররা যে অর্থে অশুভ শক্তির প্রতীক, মনসামঙ্গলে 'যবন'রা সে অর্থেই স্থান গ্রহণ করেছে। জনমানসে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই অনুকৃতি মঙ্গলকাব্যগুলি।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৫৫-১৬০।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৭২।

৩। ঐ, পৃঃ ২৪৯-২৫৮।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৯১।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১৫।

৬। ঐ, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪।

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৭।

৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৯৭।

৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২৩।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৯।

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৭৯।

১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৯।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৫১।

১৪। ঐ, পৃঃ ৪০২।

১৫। ঐ, পৃঃ ৪০৭।

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৬১।

১৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৪৫।

১৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১২।

১৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৬১।

২০। ঐ, পৃঃ ৪১১।

২১। ঐ, পৃঃ ৩৭০।

২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ২৪৩।

২৩। ঐ, পৃঃ ২৪২।

২৪। ঐ।

২৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৬৪।

২৬। 'পদ্মাপুরাণ', সুকবি নারায়ণ দেব ও পণ্ডিত জানকীনাথ, উদ্ধৃতিটি 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ', মুহম্মদ আবদুল জলিল থেকে গৃহীত, পৃঃ ১০৩।

২৭। ঐ, পৃঃ ১০৩।

২৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল। পৃঃ১৮৯।

২৯। ঐ।

তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

তৃতীয় অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে মনসামঙ্গল কাব্যধারা সর্ব প্রাচীন হলেও সর্বপ্রধান ধারা অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল। মনসামঙ্গলের মতই চণ্ডীমঙ্গল দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী সমাজে প্রচলিত এবং জনপ্রিয়তার বিচারেও তা বিশিষ্ট স্থানাধিকারী ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের মতই তিনটি ধারায় বিভক্ত করে নিতে পারি, যথাক্রমে— (১) উত্তরবঙ্গীয় ধারা (২) পূর্ববঙ্গীয় ধারা এবং (৩) দক্ষিণ বা পশ্চিমবঙ্গীয় ধারা। উত্তরবঙ্গীয় ধারার প্রধান কবি মানিক দত্ত, পূর্ববঙ্গীয় ধারার কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য এবং দ্বিজ রামদেব এবং দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী।

চণ্ডীপূজার প্রচলন ঃ দেবী মনসার মতই চণ্ডীও কোন পৌরাণিক দেবী নয়, লৌকিক দেবী; এবং মঙ্গলকাব্যের দেবীগণের মধ্যে তার অবয়ব সর্বাপেক্ষা জটিল। দেবী চণ্ডীর প্রকৃত নাম 'অভয়া' এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ কাব্যের নাম দিয়েছেন 'অভয়ামঙ্গল'। অভয়া বা চণ্ডী মহিষাসুর বিনাশিনী চণ্ডী নয়, সে অরণ্যবাসিনী, বিন্ধ্যবাসিনী।[১] দেবী চণ্ডী লৌকিক দেবী, ব্রতকথার দেবী; সে পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হয়েছে। দেবী চণ্ডী সম্পর্কিত ব্রতকথার কাহিনী-ধারা লক্ষ করে এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম সমাজ বিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী-ধারা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট কাহিনী, এখানে ধনপতি সংক্রান্ত কাহিনীই মুখ্য, পরবর্তীকালে এর সঙ্গে কালকেতুর কাহিনী যুক্ত হয়েছে। সম্ভবত কালকেতুর কাহিনী ধনপতির কাহিনীর চেয়ে প্রাচীন। তবে ঠিক কোন সময়ে লৌকিক চণ্ডীপূজা প্রচলিত হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতভেদ বিদ্যমান। সাহিত্যিক প্রমাণ থেকেই দেখা যায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই চণ্ডীপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীর কালপর্বেই চণ্ডী মঙ্গলকাব্যের দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ - ষোড়শ শতাব্দীতে সংকলিত পুরাণগুলিতে দেবী চণ্ডীর উল্লেখ আছে। আবার ডঃ সুকুমার সেন আরো জানিয়েছেন, 'ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিনী' যদি পদকর্তা বিদ্যাপতির রচিত হয় তাহলে মঙ্গলচণ্ডীর গান যে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মিথিলায় প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা যায়।[২] চৈতন্যদেবের সময়কালে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে মঙ্গলচণ্ডীর গীত ও পূজা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ থেকে। এখানে বলা হয়েছে —

> " 'ধর্ম্মকর্ম্ম' লোক, সভে এইমাত্র জানে।
> মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
> দম্ভ করি বিষহরী পজে কোন জন।
> পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধন॥ (বৃন্দাবন দাস/১১)

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর গীত এত জনপ্রিয় হলে অনুমান করা যায় চণ্ডীপূজা আরো বেশ কিছু দিন আগেই প্রচলিত হয়েছিল। চণ্ডীপূজার আগে মনসাপূজা প্রচলিত হয়ে থাকবে, বৃন্দাবন দাস শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে মনসা বা বিষহরি দেবীরও উল্লেখ করেছেন।কিন্তু চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালের রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়নি।

চণ্ডীমঙ্গলের কবি ও কাব্য ঃ বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই সর্বাপেক্ষা গঠন পরিপুষ্ট কাব্য। মঙ্গলকাব্যের নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য সকলই চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত চণ্ডীমঙ্গলেও দু'টি খণ্ড—দেবখণ্ড ও নরখণ্ড । দেবখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব, নীলাম্বরের অভিশাপ প্রাপ্তি, হরগৌরীর সংসারযাত্রা পর্যন্ত বর্ণিত; নরখণ্ডে দু'টি কাহিনী-আখেটিক খণ্ড বা ব্যাধখণ্ড অর্থাৎ কালকেতুর উপাখ্যান এবং বণিক খণ্ড অর্থাৎ ধনপতি-

শ্রীমন্ত উপাখ্যান। দেবী চণ্ডী প্রকৃতপক্ষে ব্যাধ সম্প্রদায়ের দেবী হিসাবে পূজিত হলেও পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের সমাজে তার পূজা প্রচলিত হয়। অনার্য নিম্নবর্ণের সমাজ থেকে উচ্চবর্ণের সমাজে চণ্ডীপূজা প্রচারিত হল অর্থাৎ প্রকারান্তরে দেবী প্রথমে নিম্নবর্ণের সমাজ এবং পরে উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেল। উচ্চবর্ণের সমাজে প্রতিষ্ঠা না পেলে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। মনসার মতই দেবী চণ্ডী বণিক সম্প্রদায়কে আশ্রয় করে, কারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তখন ক্ষমতাচ্যুত এবং বণিক সমাজ অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজের শিরোমণি হিসাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আমরা চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান প্রধান কবিদের পরিচয় এবং সময়কাল সম্পর্কে আলোচনায় আসব। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে আমরা অবশ্যই সময়ানুক্রমকে অনুসরণ করব।

আঞ্চলিক বিভাজন অনুযায়ী মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারার কবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত; যদিও তাঁর প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা সংশয় আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং মানিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-ধারার আদি কবি হিসাবে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দো কালীদাস।
কর জুড়ি বন্দিব পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
মাণিক দত্তকে করিয়ে পরিহার।
বড়ু সর্ব্বানন্দকে করিল নমস্কার।"[৩]

মঙ্গলকাব্যের অনেক কবির মতই মানিক দত্ত আত্মপরিচয় দিয়ে কিছু বলেননি। তাঁর কাব্য পাঠে জানা যায় কবি একই সঙ্গে কানা ও খোঁড়া ছিলেন। সহচরী পদ্মার পরামর্শে দেবী চণ্ডী ফুলফুল্যা নগরের মানিক দত্তকে গীত রচনার নির্দেশ দিয়েছেন। কবি নিজে গায়েন ছিলেন, দল গঠন করে তিনি গান গাইতেন।ডঃ সুনীলকুমার ওঝা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের ভূমিকা অংশে লিখেছেন— "তিনি ১২০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লোক হইতেই পারেন না বরং তাহার অন্ততঃ ১৫০ শত বৎসরের পরের যে কোন সময়ে তাঁহার বর্তমান থাকাই স্বাভাবিক।"[৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—সম্ভবতঃ মানিক দত্তই চণ্ডীমঙ্গলের ধারাটির প্রবর্তক।[৫] আবার ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন— মানিক দত্তের রচনার কোন পুথিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে রচিত নয়।[৬] পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে মনসামঙ্গল কাব্য ধারার সৃষ্টি, কিন্তু ঐ সময়ে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সমালোচকদের আলোচনায় মানিক দত্তের সময়কাল হিসাবে ষোড়শ শতকই প্রাধান্য পেয়েছে।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পালাভিত্তিক রচনা।মোট ষোল দিনে গীত পালাগান ষোলটি পালায় রচিত। পালাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বিন্যস্ত—

প্রথম পালাঃ মঙ্গলবার নিশা পালা- এই পালায় বর্ণিত হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, দুর্গার সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং কার্তিক-গণেশের জন্ম।

দ্বিতীয় পালাঃ বুধবার দিবা পালা- দেবরাজের নিকট দুর্গার পঞ্চদাসী প্রাপ্তি, মর্ত্যে পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা, সুরথকে পূজার নির্দেশ, মানিক দত্তকে গীত রচনার নির্দেশ।

তৃতীয় পালাঃ বুধবার নিশা পালা- দেবীর পশু সৃজন, নীলাম্বরের জন্ম ও বিবাহ।

চতুর্থ পালাঃ বৃহস্পতিবার দিবা পালা- নীলাম্বরের অভিশাপ প্রাপ্তি, ব্যাধ হয়ে কালকেতুর জন্ম, বিবাহ, পশুশিকার, পশুদের দেবীর নিকট প্রার্থনা।

পঞ্চম পালাঃ বৃহস্পতিবার নিশা পালা- দেবী কর্তৃক কালকেতুকে ছলনা, ধন

দান ও অবশেষে পূজা প্রচারের নির্দেশ দান।

ষষ্ঠ পালাঃ শুক্রবার দিবা পালা - গুজরাট নগর পত্তন, কলিঙ্গরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ, বন্দি ও পরে মুক্তি প্রার্থনা।

সপ্তম পালাঃ শুক্রবার নিশা পালা- দেবীর কৃপায় কালকেতুর মুক্তি প্রাপ্তি এবং পরে দেবীর কৃপায় কালকেতু ফুল্লরার পুত্রলাভ ও স্বর্গে গমন। এই পর্যন্ত মানিক দত্তের কাব্যে 'আখেটিক খণ্ড' এবং এর পরে 'বণিক খণ্ড' সূত্রপাত।

অষ্টম পালাঃ শুক্রবার নিশা পালা- দেবীর চক্রান্তে ধনপতি, লহনা, ফুল্লরার মর্ত্যে জন্মগ্রহণ। ধনপতি-লহনা এবং পরে ধনপতি-খুল্লনা বিবাহ।

নবম পালাঃ শনিবার দিবা পালা- শুক-শারী প্রসঙ্গ, ধনপতির গৌড় গমন ও অবস্থান, লহনা কর্তৃক খুল্লনার লাঞ্ছনা এবং দেবীর সহায়তায় মুক্তিলাভ।

দশম পালাঃ শনিবার নিশা পালা- ধনপতি-খুল্লনা মিলন, শ্রীমন্তের জন্ম ও খুল্লনার পরীক্ষার আয়োজন।

একাদশ পালাঃ রবিবার দিবা পালা- খুল্লনার পরীক্ষা ও জ্ঞাতি ভোজন।

দ্বাদশ পালাঃ রবিবার নিশা পালা- ধনপতির দক্ষিণ পাটন গমন, পথের বিড়ম্বনা, কমলেকামিনী দর্শন ও শেষে বন্দিদশা।

ত্রয়োদশ পালাঃ সোমবার দিবা পালা- ধনপতির প্রতি দেবীর দয়া, খুল্লনার সাধভক্ষণ, শ্রীমন্তের জন্ম, শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাটন গমন।

চতুর্দশ পালাঃ সোমবার নিশা পালা- শ্রীমন্তের বিড়ম্বনা, কমলেকামিনী দর্শন, রাজার নিকট কমলেকামিনী বর্ণনা, বন্ধন ও দক্ষিণ মশানে শিরঃচ্ছেদের ব্যবস্থা, শ্রীমন্তের তর্পণ।

পঞ্চদশ পালাঃ মঙ্গলবার দিবা পালা- শ্রীমন্তের প্রার্থনা ও পরে রাজসৈন্যের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ।

ষোড়শ পালাঃ মঙ্গলবার নিশা পালা- সিংহলরাজের পরাজয়, কমলেকামিনী দর্শন, শ্রীমন্তের বিবাহ, স্বদেশে প্রত্যাগমন, সকলের স্বর্গে গমন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন দ্বিজ মাধব; কবির প্রকৃত নাম মাধবাচার্য। দ্বিজ মাধবের কাব্য বাংলা সাহিত্যে সর্ব প্রথম সন-তারিখ যুক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কবির বাসস্থান গঙ্গাতীরবর্তী সপ্তগ্রাম, পরবর্তীকালে কবি সম্ভবত সপ্তগ্রাম ত্যাগ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তবে কবির বাসস্থান পূর্ববঙ্গ না পশ্চিমবঙ্গ সে বিষয়ে মতানৈক্য আছে। কবির আত্মবিবরণীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নাম থাকলেও সেখানে চণ্ডীমঙ্গলের পুথি পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই মঙ্গলচণ্ডীর গীতের পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কবির রচিত গান ঐ অঞ্চলেই সমধিক প্রচারিত ছিল।[৭] কবি কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবির পিতা পরাশর। আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে তিনি বলেছেন—

"পরাশর-সুত জান মাধব যে নাম।
কলিকালে হইল জগত অনুপাম॥" (দ্বিজ মাধব/৭)

কাব্যে কবি দ্বিজ মাধব বা মাধবানন্দ এই ভণিতাই বেশী ব্যবহার করেছেন। অনেকে কবির নাম মাধবাচার্য

ব্যবহার করার পক্ষপাতি নন, কারণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতাও মাধবাচার্য। ইনিও আত্মপরিচয় সূত্রে 'পরাশর' পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যের রচয়িতা মাধবাচার্য বা দ্বিজ মাধব একই ব্যক্তি কিনা, এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা বিতর্ক আছে।[৮] দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে বলেছেন—

"ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা-চরিত॥ (দ্বিজ মাধব/২৯৬)

কবিশশাঙ্ক অনুযায়ী ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি কাব্যরচনা করেছেন। কবি মোগল সম্রাট আকবর এবং তার সুশাসনের কথা কাব্যে উল্লেখ করেছেন; যদিও ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশা ছিলেন এবং ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিদ্রোহী সুলতান দাউদ খাঁকে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় করেন সুতরাং বলা যায় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে দ্বিজ মাধব কাব্যরচনা করেন।[৯] অনেকে অবশ্য কবি প্রদত্ত শ্লোকটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন দ্বিজ মাধব প্রদত্ত কালজ্ঞাপক শ্লোক নিয়ে নানাতর আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে, দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনাকাল ১৬৪৪-১৬৪৫-১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ[১০]। ডঃ সেনের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে আকবর বাদশার সঙ্গে সঙ্গতি মেলে না, সুতরাং অনেক পণ্ডিত সুকুমার সেনের মন্তব্য গ্রহণ করেননি।[১১]

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। কবি নিজের কাব্যকে কোথাও 'সারদামঙ্গল' কোথাও বা 'সারদাচরিত' বলে উল্লেখ করেছেন। সেকালে সম্ভবত 'গীত' বলতে পাঁচালীকেই বোঝানো হত। দ্বিজ মাধবের কাব্য মানিক দত্তের কাব্যের মতই পালাভিত্তিক রচনা। সমগ্র কাব্যটি ষোলটি (১৬) পালায় রচিত। প্রতিটি পালার পৃথক নামকরণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি পালা খণ্ড খণ্ড গীতে রচিত। প্রতিটি গীতের উপর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত কাব্যখানি নিম্নরূপে বিন্যস্ত—

প্রথম পালাঃ বন্দনা; এই পালায় আছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা, কবির আত্মপরিচয়, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পালাঃ মঙ্গল-চণ্ডী; এই পালায় আছে মঙ্গল দৈত্যের তপস্যা, বর লাভ, স্বর্গরাজ্য অধিকার, দেবীর মঙ্গলদৈত্য বধ ও মঙ্গলচণ্ডী নাম গ্রহণ।

তৃতীয় পালাঃ মর্ত্য-লীলার সূচনা; এই পালায় আছে দ্বিতীয় বার বন্দনা, ইন্দ্রের ব্যাধি-খণ্ডন, ইন্দ্র কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডী পূজা ও দেবীর পঞ্চকন্যা লাভ, কলিঙ্গরাজকে পূজা করতে নির্দেশ, কলিঙ্গরাজ কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডী পূজা।

চতুর্থ পালাঃ কালকেতু; এই পালায় আছে নীলাম্বরের অভিশাপ, কালকেতুর জন্ম ও বিবাহ।

পঞ্চম পালাঃ সুবর্ণগোধিকা; এই পালায় আছে ধর্মকেতুর মৃত্যু থকে গুজরাট রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত।

ষষ্ঠ পালাঃ ভাঁড়ুদত্ত; এই পালায় আছে গুজরাট নগরে বসতি স্থাপন, কালকেতুর যুদ্ধযাত্রা, কালকেতুর কারাবাস ইত্যাদি।

সপ্তম পালাঃ শাপমুক্তি; কালকেতু কর্তৃক দেবীর স্তব, কারামুক্তি, ভাঁড়ু দত্তের শাস্তি এবং কালকেতুর স্বর্গযাত্রা পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত।

অষ্টম পালাঃ উজানী ও ইছানী; এই পালায় আছে শিবের মধ্যস্থতা থেকে শুরু করে ধনপতির বিবাহ বার্তা পর্যন্ত।

নবম পালাঃ লহনার কুমতি; এই পালায় আছে ধনপতির বিবাহের কথা শুনে লহনার বিলাপ থেকে শুরু করে ধনপতির গৌড়যাত্রা. খুল্লনার ছাগল চরানোর প্রস্তাব পযন্ত।

দশম পালাঃ	খুল্লনার দেবী পূজা; এখানে আছে খুল্লনার ছাগল চরানো থেকে শুরু করে খুল্লনার দেবী পূজা, ধনপতির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত।
একাদশ পালাঃ	মিলন; স্বামীর সহিত খুল্লনার মিলনের জন্য গমন থেকে শুরু করে মিলন পর্যন্ত।
দ্বাদশ পালাঃ	অগ্নিপরীক্ষা; খুল্লনার সন্তান সম্ভাবনা থেকে শুরু করে জ্ঞাতিগণের গুয়াপান গ্রহণে অসম্মতি, খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান এবং মালাধরের অভিশাপ পর্যন্ত।
ত্রয়োদশ পালাঃ	কমলেকামিনী; ধনপতির সিংহলযাত্রা থেকে আরম্ভ করে শ্রীমন্তের জন্ম পর্যন্ত এই পালায় বর্নিত।
চর্তুদশ পালাঃ	শ্রীমন্তের বাল্যলীলা; শ্রীমন্তের বাল্যকথা বর্ণনা থেকে শুরু করে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের দুর্ব্যবহার এবং শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত।
পঞ্চদশ পালাঃ	শ্রীমন্তের মশান; শ্রীমন্তের যাত্রাপথ বর্ণনা, কমলেকামিনী দর্শন, সিংহলরাজের কাছে কমলেকামিনী বর্ণনা, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে যাওয়া, দেবীর সহিত সিংহল- রাজের সৈন্যের যুদ্ধ, পিতাপুত্র পরিচয়, সুশীলা-শ্রীমন্তের বিবাহ এবং স্বপ্নদর্শন পর্যন্ত এই পালায় বর্ণিত হয়েছে।
ষোড়শ পালাঃ	প্রত্যাবর্তন; এই পালায় আছে ধনপতি শ্রীমন্তের স্বদেশযাত্রা থেকে শুরু করে স্বর্গে গমন পর্যন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ববঙ্গীয় ধারার অপর একজন কবি হলেন দ্বিজ রামদেব। দ্বিজ রামদেব বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত থাকলেও অনেক পরবর্তীকালে তাঁর কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে। কবি সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ ছিলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই তাঁর কাব্য রচিত।[১২] দ্বিজ রামদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ; কাব্য ভণিতায় কবি মায়ের নাম, বাসস্থান উল্লেখ করেননি, কেবল মাত্র কৌশলে পিতৃনাম ব্যক্ত করেছেন। ভণিতা অংশে কবি বারবার 'কবিবিধুসুত' এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন। এই অংশটি থেকে অনুমান করা হয়েছে কবির পিতার নাম কবিচন্দ্র। কাব্যের উপসংহার অংশে কবি কাল-নির্ণায়ক শ্লোক দিয়েছেন—

"ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সন জিত।
রচিলেক রামদেবে সারদা চরিত॥" (দ্বিজ রামদেব/৪০৯)

গ্রন্থ সম্পাদক ডঃ আশুতোষ দাসের গণনা অনুসারে, ইন্দু-১, বাণ-৫, ঋষি-৭, বাণ-৫, অর্থাৎ ১৫৭৫ শকাব্দ; 'বেদ সনজিত' এর অর্থ এখানে চার অঙ্ক বেশী হয়েছে অর্থাৎ (১৫৭৫-৪)=১৫৭১ শকাব্দে কবি কাব্য রচনা করেন।[১৩] আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বেদ সনজিত' কথাটিকে 'শক নিয়োজিত' ধরেছেন এবং ডান দিক থেকে গণনা করে ১৫৭৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজ রামদেবের কাব্য রচনাকাল বলে স্থির করেছেন; [১৪] যদিও শ্লোকটির প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দ্বিজ রামদেব কাব্যে ফিরিঙ্গি ও মগদের কথা বলেছেন। ফিরিঙ্গি ও মগরা সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে। সুতরাং সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে দ্বিজ রামদেব তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[১৫] দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যটি পালাভিত্তিক রচনা নয়; চারটি উপাখ্যান সংযোগে আখ্যানকাব্যটি তৈরী। এই চারটি উপাখ্যান হল—
১। মঙ্গলদৈত্য বধ। ২। চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারাভিযান ও কালকেতু উপাখ্যান। ৩। ধনপতি উপাখ্যান। ৪। শ্রীপতি উপাখ্যান। প্রতিটি উপাখ্যান ছোট ছোট পদ বা খণ্ড কবিতার সমষ্টি এবং প্রতিটি কবিতার উপর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।

দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার কবি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী; তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি; যদিও 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ডঃ সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম 'মুকুন্দরাম' এই নামের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করেন। কবিকঙ্কণের ভণিতায় কোথাও 'রাম' অর্থাৎ

'মুকুন্দরাম' নামটি না থাকায় ডঃ সেন ঐ নামে আপত্তি করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের নাম আসলে 'অভয়ামঙ্গল', এই নামটিই কবি অধিকাংশ ভণিতায় ব্যবহার করেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন; তাঁর আত্মপরিচয় পাঠে জানা যায় কবি বর্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতা হৃদয় মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র। 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে কবি লিখেছেন-

"সহর শিলিমাবাজ তাহাতে সুজনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥"(মুকুন্দ/৩)[১]

আরও জানা যায় মুসলমান কুশাসনের এক বিশেষ পর্বে ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে কবি সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়েছেন। পথে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের পর মেদিনীপুর জেলার আড়রায় বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া রায় তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে রঘুনাথ রায়ের আদেশেই তিনি কাব্যরচনা করেন। কবি মুকুন্দ কাব্যের শেষাংশে কাল-নির্ণায়ক শ্লোক দিয়েছেন–

"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥" (মুকুন্দ/২৪৩)[২]

এই শ্লোক অনুসারে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য রচনাকাল ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ (১৪৬৬+৭৮)১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। আবার 'নব রস' ধরলে ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ (১৪৯৯+৭৮)১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। কবি কাব্যে মানসিংহের কথা উল্লেখ করেছেন। মানসিংহ বাংলা-উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ডঃ সুকুমার সেন কাব্যে উল্লিখিত শ্লোক দুটিকে উপেক্ষা না করে বলতে চেয়েছেন-প্রথমত ঃ 'নয়' অর্থে 'রস' শব্দের ব্যবহার সে সময় ছিল না। দ্বিতীয়ত ঃ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ রায় আড়রায় রাজা ছিলেন। সুতরাং তার অনেক আগেই কবি গৃহত্যাগ করে ছিলেন, কবি যখন আড়বায় উপস্থিত হন তখন রঘুনাথ রায় বালক হবেন, কেননা কবি বাঁকুড়া রায়ের নির্দেশে তার পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ছিলেন।[১৬] সুকুমার সেনের মতে— "১৫৪৪ অব্দের কিছুকাল পরে মুকুন্দের দেশত্যাগ ঘটনা ধরিলে কোনই অসঙ্গতি হয় না। আসল কথা কালনির্ণয় প্রসঙ্গে মানসিংহকে উপেক্ষা করিতেই হয়।অণ্টমঙ্গলায় প্রাপ্ত কাল সব সংশয় নিরাশ করিয়াছে এবং ১৪৬৬ শকাব্দকে সমর্থন করিয়াছে।"[১৭]

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' মঙ্গলকাব্যে আদর্শ স্থানীয় সৃষ্টি, মঙ্গলকাব্যের সমস্ত বৈশিষ্টই এই কাব্যে আছে। কাব্যে দ'ুটি প্রধান কাহিনী— কালকেতু উপাখ্যান এবং ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যানে দুটি খণ্ড, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে আছে পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ আর নরখণ্ডে কালকেতুর কাহিনী ও ধনপতির কাহিনী। কবিকঙ্কণই সমগ্র মধ্যযুগে প্রথম কবি যিনি কাব্যে বহু বিচিত্র উপাদানের সমাহার ঘটিয়েছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীই সর্বাধিক প্রচারিত, সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় চার জন প্রধান কবি ছাড়াও আরও অনেক অপ্রধান কবি আছেন, তাঁরা হলেন বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ, মুক্তারাম সেন, হরিরাম, ভারতচন্দ্র, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস প্রমুখ। মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য পাঠে লক্ষ করা গেল কাহিনীগত ভাবে চারজন কবির কাব্যে কোন পার্থক্য নেই তবে কবি প্রতিভার তারতম্য অনুযায়ী কাব্য দেহ গঠন ও পরিকল্পনার পার্থক্য আছে। দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেব দু'জন কবিই দেবীকে দিয়ে মঙ্গলদৈত্য বধ করিয়েছেন এবং মঙ্গলদৈত্য বধ করে দেবী মঙ্গলচণ্ডী নাম ধারণ করেছে। চরিত্র পরিকল্পনার দিক থেকে কবি প্রতিভার তারতম্য অনুযায়ী পার্থক্য লক্ষ করা

যায়। মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রত্যেকেই মুরারী শীল নামে একটি ঠক, প্রবঞ্চক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজ রামদেব ঐ চরিত্রটির নাম দিয়েছেন সুশীল এবং চরিত্রটির কাব্যে বিশেষ ভূমিকা নেই এবং সে ধূর্তও নয়; তাছাড়া কাহিনী-ধারা মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে।

সমাজবৃত্ত ঃ দেবী চণ্ডী পূজা প্রচার করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য দেবদেবীর মতই প্রথমে অন্ত্যজ-অনার্যদের আশ্রয় করেছে। ফলে চণ্ডীমঙ্গলে দু'টি স্বতন্ত্র কাহিনী-ধারা সৃষ্টি হয়েছে 'আখেটিক খণ্ড' ও 'বণিক খণ্ড'। 'আখেটিক' কথার অর্থ ব্যাধ। দেবী চণ্ডী অরণ্যচারী ব্যাধ সম্প্রদায়ের দেবী। সেই দেবী ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের সমাজে জায়গা করে নিয়েছে। বণিক খণ্ড অপেক্ষা আখেটিক খণ্ড প্রাচীন বলেই মনে করা হয়, কারণ এখানে ব্যাধ সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার কথা আছে, যা অপেক্ষাকৃত আদিম মানব জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যাইহোক, চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস অন্বেষণ করতে গেলে প্রথমে অনার্য-অন্ত্যজ বাঙালীর জীবনকথা পাই এবং পৃথক ভাবে উচ্চবর্ণের বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের তথ্য পাই। কবিগণ আপন সমাজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সেই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।এখানে লক্ষ করা যায় নিম্নবর্ণের জীবনাচার যেমন উচ্চবর্ণের সমাজ জীবনের প্রবেশ করেছে তেমনি উচ্চবর্ণের জীবনাচারও নিম্নবর্ণের সমাজে প্রবেশ করেছে এবং এই ভাবে সমাজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি সমীকরণ তৈরী করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের মতই আমি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত সামাজিক ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ

খাদ্য ও পানীয় ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সামাজিক ইতিহাসের বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই খাদ্য ও পানীয়ের কথায় আসা যাক্। মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় পাচ্ছি তাই নয়, সেই সঙ্গে রন্ধন প্রণালীর বর্ণনাও পাই। যেহেতু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা দ'টি খণ্ডে দ'টি পৃথক সমাজের ছবি পাচ্ছি সুতরাং তাদের পৃথক খাদ্যাভ্যাসের পরিচয়ও পাই। একদিকে অনার্য-ব্যাধ সমাজের খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যদিকে বর্ণহিন্দু বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস। আমরা প্রথমে উচ্চশ্রেণীর বাঙালী হিন্দুর খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় নেব।

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতো স্বর্গীয় অমৃতভোগী দেবতা নয়; বরঞ্চ বলা যায় বাঙালী খাদ্যাভ্যাসের ভিতরেই তারা অমৃতের স্বাদ পেয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী, কিন্তু সে ভোজন বিলাসী বাঙালী। উপায় ভিক্ষামাত্র সম্বল, কিন্তু সে স্ত্রী পার্বতীকে মনোমত রন্ধনের ফরমাশ করে। আর মঙ্গলকাব্যের কবি শুধু খাবারের নামই করেননি, রন্ধন প্রণালীও শিখিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে 'হরপার্ব্বতীর কোন্দল', 'খুল্লনার সাধভক্ষণ', 'খুল্লনার রন্ধন', অংশগুলিতে রন্ধনের বিবরণ পাই। বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি মধ্যযুগে খাদ্য হিসাবে জনপ্রিয় ছিল, যেমন— শিম, বেগুন, কুমড়ো, খঞ্জ, পলাকড়ি, মূলা, কাঁঠাল বিচি, ডুমুর, থোড়, মোচা, সজনেখাড়া, মুখীকচু ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার শাক, যথা— পুঁই, পালং, হেলেঞ্চা, সরষে, বাথুয়া, নিম,কলমী, লাউডগা, গীমা, নটে, কচু ইত্যাদি; নিরামিষ খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, মসুর, অড়হর, বরবটি, ছোলা, মাষ কলাই ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। আমিষ জাতীয় খাদ্যের তালিকায় আছে বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাংস, যেমন— পুঁটি, চিংড়ি, বোয়াল, রুই, কাতলা, শোল, পাঁকাল, খলিসা ইত্যাদি; মাংস হিসাবে খাসীর মাংস, পাঁটার মাংস প্রচলিত ছিল। মিষ্টান্নের মধ্যে ছিল দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য, যথা— দুধ, দই, পায়েস, ক্ষীর, ছানা; নানা রকম পিঠে, যথা— কলাবড়া, মুগসাউলী, ক্ষীরখোয়া, ক্ষীরপুলি, দুধলাউ, খুদজাউ, নারকেলের ছাঁচ ইত্যাদি অতি লোভনীয় খাদ্যদ্রব্য। বাঙালীর প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে— ডাল, সুকুতা, শাক ও শাকের ঘন্ট, মাছের ঝোল-ঝাল, বড়া, চচ্চড়ি, টক বা অম্বল ইত্যাদি। আমড়া, কুল, করঞ্জা, তেঁতুল, আমের আমসি ইত্যাদি দ্বারা টক জাতীয় ব্যঞ্জন তৈরী হত। তাছাড়া বাঙালী রমণীগণের হাতে তৈরী ফুলবড়ি বা কলাই বড়ি অতি উপাদেয় খাদ্য। শুকনো খাদ্যদ্রব্য হিসাবে খই, মুড়ি, চিড়া, চালভাজা, গুড় ইত্যাদি ব্যবহৃত হত, ফলার ভোজনে রসনাপ্রিয় বাঙালী দুধ, দই, মহিষা

দই, সন্দেশ ব্যবহার করত। রন্ধনকার্যে বিভিন্ন প্রকার তেল— বিশেষত, তিল তেল, সরিষার তেল, ঘি ব্যবহৃত হত। রসনাপ্রিয় বাঙালী রান্নায় নানা প্রকার মসলা, যেমন— মরিচ, আদা, ঘি, ডাবের জল, জামিরের রস, জিরা, মেথী, কালজিরা, কর্পূর, লবণ, লবঙ্গ, কাসুন্দি, সরিষা, হিঙ্গ, জোয়ান, চই, তেজপাতা, মুহুরী, হলুদ ইত্যাদি ব্যবহার করত। বাঙালীর রন্ধনে নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ যে রন্ধন বিদ্যায় সম্যক পারদর্শী ছিলেন তার পরিচয় পাই মঙ্গলকাব্যে। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণের মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রন্ধন বর্ণনা দিয়েছেন। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে যে রন্ধনের বর্ননা পাই তা অত্যন্ত সরল, মানিক দত্তের কাব্যে বর্ণিত খুল্লনার রন্ধনের কিছু অংশ—

"অগ্নি জালি কাষ্ঠ দেএ নাই করে হেলা।
রন্ধন করিল অন্ন চড়াঞা পাএলা।
তৈলে বার্ত্তাকী ভাজে কই মচ্ছের পোড়া।
কলা দিঞা রন্ধন করিল কলা বড়া॥
রূহিত মচ্ছের ভাজা কিছু কৈল ঝোল।
নানা জাতি মচ্ছ্য ভাজে চিতলের কোল॥
দালির আম্বল করি কটয়া ভরিল।
নানা জাতি বেঞ্জন রন্ধন করিল॥" (মানিক/২৩৪)

রন্ধনকার্যে বাঙালী রমণীগণ প্রথমে নিরামিষ ব্যঞ্জন, তারপর আমিষ এবং শেষে টক বা অম্বল ব্যঞ্জন এবং মিস্টান্ন রন্ধন করত। যেমন দ্বিজ মাধবের কাব্যে লহনার রন্ধনের বিবরণ—

"শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে॥
মুগ ব্যঞ্জন রাঁধে ঘৃতেত আগল।
জাতি কলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল॥
নিরামিষ ব্যঞ্জন রান্ধি থুইল একুভিতে।
আমিষ রান্ধিতে লহনা দিল চিতে॥
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাছ।
দূরিতা মিশালে রান্ধে উরিচা আনাজ॥
জলপাই অম্বল রান্ধে হরষিত হইয়া।
সম্ভারি ওলাইল তাহে সউর্ষ পোড়া দিয়া॥
বড় বড় শুরুল মৎস্য ভাজয়ে বিশেষে।
সুগন্ধি তণ্ডুল অন্ন রান্ধে অবশেষে॥" (দ্বিজ মাধব/১৫৬)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 'হরগৌরীর কোন্দল' অংশে নিরামিষ রন্ধনের বিস্তৃত তালিকা আছে—

" আজি গৌরী রান্ধিয়া দিবেক মনোমত।
নিম শিম বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
. . . .
গোটা কাসুন্দিতে দিবা জামিরের রস।
এবেলার মত রান্ধ এ ব্যঞ্জন দশ॥" (মুকুন্দ/২৩)°

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বণিক খণ্ডে 'খুল্লনার রন্ধন' অংশে নিরামিষ-আমিষ-মিষ্টান্ন সকল প্রকার রন্ধনের বিবরণ আছে। এখানে শাকসব্জি, মাছ-মাংসের বিচিত্র ব্যঞ্জনের পরিচয় পাই, যথা—

প্রভুর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
স্মরিলা সর্ব্বমঙ্গলা।
তৈল ঘি লবণ ঝাল আদি নানা বস্ত্রজাল
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা॥
. . . .
অন্ন রান্ধে সব শেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশ॥" (ঐ/১২৭)[৪]

দ্বিজ রামদেবের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যেও খুল্লনার রন্ধনের বিবরণ পাই —

"মহানন্দে খুলনাএ চড়াএ রন্ধন।
. . . .
পাঅস পিষ্টক কথ সাধুর বাঞ্ছিত।
দুবলার আদেশ রামা পালে সমাহিত॥" (রামদেব/১৯৬-১৯৭)

আহারকালে খাদ্য পরিবেশনে বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙালী সাধারণত মেঝেতে আসন বা পিঁড়ি পেতে আহার করত। প্রথমে জলছড়া দিয়ে আহারের স্থান শুদ্ধ করা হত, তারপর আসন পেতে পাশে জলের পাত্র স্থাপন করা হত এবং থালায় অন্ন, বাটিতে বিবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে থালার চারিদিকে স্থাপন করা হত। বাঙালী গৃহিণীরা আচমনের জলপাত্র তৈরী রাখতে ভুলত না। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে আমরা এক সুন্দর আহার চিত্র পাই—

"স্থলশুদ্ধি করি পাতে কাঞ্চনের আসন॥
সুবর্ণের থালা দিল রজতের বেড়ি।
সুবাসিত বারিপূর্ণ দিল হেম ঝারি॥
কাঞ্চনের খোরা যথ পাতের চারিভিত।
খড়িহা দিলেক সেবক আধার সহিত।
হেম বাটি ভরি রাখে নবনী চারু।
রজত ডাবর দিল আচমনি গাড়ু॥ (রামদেব/১৯৭-১৯৮)

আহারকালে পরিবেশনে বা আহারের নিয়ম অনুসারে প্রথমে তিক্ত তারপর আমিষ এবং শেষে মিষ্টান্ন ও ফলমূল পরিবেশন করা হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"ভোজনে বসিল তবে জ্ঞাতি বন্ধুজন।
খুল্লনা কনকথালে যোগায় ওদন॥
প্রথম সুক্তার ঝোল দিল ঘন্ট শাক।
. . . .
দধি পিঠা খাইল সবে মধুর পায়স।
রসাল পনস-কোষ রসালের রস॥" (মুকুন্দ/১২৭)[৫]

আহারান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করা বাঙালীর অভ্যাস। মঙ্গলকাব্যে তাম্বুল বা পানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও পানের ব্যবহারের কথা পাই—

"একস্থানে বসিলেন জত জ্ঞাতিগণ।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥" (মানিক/২৫৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলেও এই তথ্য পাই। যেমন—

"ভোজন করিয়া আর মনকুতুহলে।
কর্পূর তাম্বুল খায় হাসি খল খলে॥" (মুকুন্দ/১২৮)[৬]

বাঙালী অতিথিপরায়ণ, সুতরাং প্রথমে অতিথিকে ভোজন করিয়ে শেষে গৃহস্থ ভোজন করত—

"সাধু বলে দুয়ারে ভুঞ্জাও বন্ধুজন।
অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন॥"(ঐ/১২৭)[৭]

শুধু তাই নয়, গৃহস্থ বাড়িতে প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠরা ভোজন করত এবং তারপর অন্যান্যরা ভোজন করত । ব্যাধ সমাজেও উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর এই রীতি প্রচলিত হয়েছিল। কালকেতুর জননী নিদয়া তাই বলেছে—

"নিদয়ার আজ্ঞা ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে।
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন॥" (ঐ/৩৯)[৮]

চণ্ডীমঙ্গলে শুধু উচ্চশ্রেণীর কথাই নেই নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ সম্প্রদায়ের বাঙালীর খাদ্য রীতির কথাও পাওয়া যায়। ব্যাধ শ্রেণীর বাঙালীর আহার ও খাদ্যদ্রব্য ছিল খুব সাধারণ। তারা সাধারণত পান্তা-আমানি, ভাত, খুদ-জাউ, বিভিন্ন প্রকার ডাল; বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি— বন-পুঁই, কলমী, বন-ওল, করঞ্জা, আমড়া, কচু; বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণীর মাংস— হরিণ, সজারু, বন-মোরগ, শূকর, নেউল, গুইসাপ ইত্যাদি, এমন কি গিরগিটির মাংসও খেত। তাছাড়া দুধ ও দধি খেত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর যে ভোজন চিত্র পাই তার বর্ণনা নিম্নরূপ-

"পাত লইয়া ভোজনে বসিল বীরমণি।
অন্ন পরিবেশন করে ফুল্লরা ব্যাধিনী॥
বারে বারে ফুলরায়ে অন্ন দিয়া যায়ে।
ফিরিয়া চাহিতে নারে খাইয়া ফেলায়ে॥" (দ্বিজ মাধব/৪৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে ব্যাধ সমাজের খাদ্যের সুন্দর চিত্র পাই 'কালকেতুর ভোজন' অংশে—

"চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ-জাউ।
ছয় হাঁড়ি মসুর মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খায় বন-ওল পোড়া।
বন-পুঁই ভার দুই কলমি কাঁচড়া॥
. . . .
এনেছি হরিণ দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খায় বীর ভাত তিন কাঁড়ি॥ (মুকুন্দ /৪০)[৯]

'নিদয়ার সাধভক্ষণ' অংশে বিস্তৃত খাদ্যতালিকা পাই। যেমন—

"আপনার মত পাই তবে গ্রাস দুই খাই
পোড়া মাছে জামিরের রস।
.. ..
মূলা বেগুনেতে সিম তাহে রান্ধ দিয়া নিম
তাহে দেও উড়ুম্বর ফল॥" (ঐ/৩৫)[১০]

ব্যাধ সমাজের দারিদ্র্যময় জীবনযাত্রায় ভাত-জলই সম্বল মাত্র। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে ব্যাধ সমাজের যে আহারের চিত্র পাই তা এরকম—

"বাসি অন্ন আনে রামা দিআ তরাতরি।

জল সমে ঢালে অন্ন পাতে শীঘ্র করি॥
আছে বা না আছে অন্ন পূর্ণ বাসি জলে।
স্থালীসঙ্গে আনি তাহা বীরের পাতে ঢালে॥" (দ্বিজ রামদেব/৫৭)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ব্যাধ ঘরের রন্ধন প্রক্রিয়ার বাস্তব চিত্র পাই। যেমন—

"পাবক জ্বালয়ে রামা হয়ে হরষিত।
পাকা কলার মূল রান্ধে লবণ বর্জিত॥
পাকা পুঁইর শাক রান্ধে পিঠালের মেলে।
সম্ভারি তুলাইল তাহা শুকরের তৈলে॥
কৃষ্ণসারের মাংস রান্ধে হরষিত মন।
ক্ষুদ্র তণ্ডুলের অন্ন জোগায় তখন॥" (দ্বিজ মাধব/৪০)

অনার্য ব্যাধ সম্প্রদায়ের মানুষ সাধারণত মৃৎপাত্র, নারকেলের খোল, মানকচুর পাতা, কলাপাতা ইত্যাদিতে আহার করত। যেমন এরকম চিত্র পাওয়া যাচ্ছে—

"ফুলরা রন্ধন করে বীরে খাইতে ভাত।
তরাতরি আনিলেক মানকচুর পাত॥"(ঐ/৪৫)

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'কালকেতুর ভোজন' অংশে এই চিত্র পাই—

"সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া॥
মোকা নারিকেলেতে পূরিয়া দিল জল।
ঝাঁটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল॥
. . . .
সম্ভ্রমে ফুল্লরা দিল মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নূতন খাবরা॥" (মুকুন্দ/৩৯)[১১]

গৃহস্থালী দ্রব্য ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাঙালীর লৌকিক জীবনে ব্যবহৃত গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় নানান জিনিসপত্র ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়, যেমন— হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, , ঘটি, জাঁতা, চুপড়ি, সাজি, ঝাঁটা, ডাবর, খাট, পালঙ্ক , ছাতা, প্রদীপ ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়েও যেগুলির ব্যবহারগত কোন পরিবর্তন ঘটেনি, এমন কি আজও সেগুলি সমান ভাবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। হাঁড়ি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর উপকরণ, তার সুপ্রচুর ব্যবহার আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, যেমন—

"নিদ্রার কারণে কিছু না শুনে খুলনী।
মুখেতে ঢালিয়া দিল ভাঙ্গা হাড়ীর পানি॥" (দ্বিজ মাধব/১৪৩)

কিংবা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে রন্ধনপাত্র হিসাবে হাঁড়ির ব্যবহার দেখা যায়—

"বেসাতি দুর্ব্বলা জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মেগে লয় ভারে কিছু ভাট॥" (মুকুন্দ/১২৬)[১২]

মাটির হাঁড়ি ছাড়া ঘট, সরা, কলসী ইত্যাদির ব্যবহার করা হত। তাইতো উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর কথা বলতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবি হাঁড়ির মুখে সরার উপমা দিয়েছেন—

"সেই বর-যোগ্যা কন্যা তোমার ফুল্লরা।
চাহিয়া পাইলা যেন হাঁড়ি আর সরা॥" (ঐ/৩৭)[১৩]

সাধারণত জলপাত্র হিসাবে ঘট ব্যবহার করা হত, তাছাড়া পূজা-পার্বণে ঘটের ব্যবহার করা হত। কবিকঙ্কণের

কাব্যে ঘটের ব্যবহার পাই, সমৃদ্ধি বোঝাতে এখানে হেম-ঘটের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

"রঙ্ক দুঃখী নাহি জানি হেম ঘটে পিয়ে পানী
নাট গীত সবাকার ঘরে॥" (ঐ/৭৩)[১৪]

কলস একটি অতি প্রয়োজনীয় জলপাত্র। সাধারণত মাটির কলসই ব্যবহৃত হত। চণ্ডীমঙ্গলে তার ব্যবহার আছে-

"হেনকালে মায়া তবে করিল ভবানী।
কলসে আছিল জল সুখাইল আপনি॥" (মানিক/১৯৮)

গাড়ু নলযুক্ত এক প্রকার পাত্র, জল ঢেলে ব্যবহার করার কাজে এটি অতি উত্তম—

"এক গাড়ু জল রম্ভা ভরাইল।
খুল্লনার হাতে জল পণ্ডিতকে দিল॥" (ঐ/১৯৯)

ব্যবহার্য পাত্র হিসাবে থালার ব্যবহার অতি সুবিদিত। আহার করার জন্য থালা, বাটি ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। ধনীর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য বোঝাতে সোনার থালা ও বাটির ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন-

"অন্নব্যঞ্জনে বামা রন্ধনে বসিল।
সুবর্ণের থালে বেঞ্জন সম্বরিল॥" (ঐ/২৫৬)

কিংবা মুকুন্দের কাব্যে কালকেতুর অবস্থার উন্নতি বোঝাতে ভাঁড়ু দত্তের বক্তব্য—

"ভাণ্ডে পূর্ব্বে পিত বারি এবে তার হেম ঝারি
বাটি ঘটি থালা হেমময়॥" (মুকুন্দ/৭৩)[১৫]

মাটির থালা, বাটি, খাবরা ইত্যাদি ব্যবহার হত সাধারণ মানুষের ঘরেও। মাটির থালাকে 'পাথরা' বলা হত; কালকেতুর ঘরে মাটির পাথরা আর খাবরাই সম্বল। সাজি ফুল তোলার কাজে ব্যবহার করা হত, ধর্মপ্রাণ বাঙালীর তাই সাজির প্রয়োজন হত। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবপূজার ফুল তুলতে গিয়েছিল—

"সাজি আঁকুড়ি হাতে চলিল কানন-পথে
সোঙরিয়া ভবানীশঙ্কর।" (ঐ/৩০)[১৬]

ডালা বা চুপড়ির ব্যবহার হত। সাধারণত বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরী হত ডালা, চুপড়ি ইত্যাদি। তৈজসপত্র রাখার জন্য বা বিভিন্ন জিনিসপত্র বহন করার জন্য ডালা ব্যবহার হত। মানিক দত্তের কাব্যে দেখি ফুল্লরা ডালায় মাংস বেচাকেনা করে—

"মাথায় মাংসের ডালি নগর বাজারে জাব
কম্পিত হৈবে মহাজন॥
ফুলরার রূপ হৈল বিরহালী মাথায়ে মাংসের ডালি
. . . . . নগর বাজারে। (মানিক/৭১)

অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ডালাকে চুপড়ি বলা হয়। তার ব্যবহারও লক্ষ করা যায় চণ্ডীমঙ্গলে যেমন—

"চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা।" (মুকুন্দ/৭৩)[১৭]

ঝুরিও ডালা বা চুপড়ির মতই বাঁশ ও বেত নির্মিত এক প্রকার নিত্যব্যবহার্য উপকরণ। কালকেতুর আহারের কথা বলতে গিয়ে ঝুড়ি ব্যবহারের কথা এসেছে। দেউটি বা প্রদীপ বাঙালীর নিত্যব্যবহার্য উপকরণ, মধ্যযুগে বাঙালীর ঘরে প্রদীপের আলোই একমাত্র সম্বল ছিল। তাছাড়া মাঙ্গলিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রদীপ বা দেউটি । যেমন—

"দুই দিকে দেউটি জ্বলয়ে সারি সারি।
অগুরু চন্দন বামা নিল বাটি পূরি॥ (ঐ/১২৯)

পানের বাটা, ডাবর বাঙালীর ঘরে ব্যবহার্য একটি উপকরণ, মধ্যযুগে তার ব্যবহার হত। ডাবর হল পিকদানী বা

আচমন পাত্র—

"নিরামিষ অন্ন দোঁহে করিল ভোজন।
ফিরিয়া ডাবরে সাধু কৈল আচমন॥" (ঐ/১৩৭)[১৮]

বাটা হল পান রাখার পাত্র। মধ্যযুগে বাটা একটি প্রয়োজনীয় বাসন হিসাবে ব্যবহৃত হত; চণ্ডীমঙ্গলে তার উল্লেখ পাই—

"এক বাটা পান লইয়া জামাতা ভেট তুমি।" (মানিক/১৯৮)

এছাড়া পিঁড়ি ও ঢেঁকি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে । সাধারণত বাঙালী ঘরে পিঁড়ি বা আসন পেতে আহার করার রীতি ছিল। ধনপতির গৃহে আহারকালে পিঁড়ির ব্যবহার দেখি—

"স্বর্ণ থালা পিড়ি আনি জোগায়ে দুবা দাসী॥" (দ্বিজ মাধব/১৫৬)

অনার্য ব্যাধেরা পশুর চামড়ার আসন ব্যবহার করত। উচ্চশ্রেণীর বাঙালী ঘরে সুদৃশ আসন ব্যবহার হত, কালকেতুর ঘরে হরিণের চামড়ার আসনে কালকেতুকে বসতে দেওয়া হয়েছে। ঢেঁকির ব্যবহার প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই দেখা যায়, ধান ভেঙে চাল তৈরীর কাজ বাঙালী মেয়েদের ; তাই স্বাভাবিক ভাবে বাঙালী জীবনের উপকরণ হিসাবে ঢেঁকির কথা এসেছে। মানিক দত্ত অকর্মণ্য ব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে ঢেঁকির উপমা দিয়েছেন। যেমন—

"চাষাগুলা ভাঙ্গ মরিবারে খায়।
ঢেঁকির মত পড়িয়া চখোয়ার মত চায়॥" (মানিক/৪৫)

ঢেঁকির উপযোগিতার জন্যই বাঙালী ঘরে ঢেঁকির জন্য ঢেঁকিশাল থাকত। আমরা চণ্ডীমঙ্গলে দেখি খুল্লনাকে ঢেঁকিশালে শুতে দেওয়া হয়েছে—

"দিন অবসানে খুদের অন্ন খাই।
ঢেকিশালে খঞিয়া পাতি রজনী গোঁয়াই॥" (দ্বিজ মাধব/১৪৪)

প্রতিটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই ঢেঁকি এবং খুল্লনার ঢেঁকিশালে বাস করার প্রসঙ্গটি পাওয়া যায়। এসমস্ত উপকরণগুলি ছাড়া ডালা, কুলা, ডোল, ছাতা, দড়ি, চাক, চামর, আসন, পাটি, ধূচুনি, ঝারি,তরাজু ইত্যাদি নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের কথা ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে আছে। ওজন পরিমাপের জন্য তরাজু ব্যবহার হত—

মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ি থলী
হড়পী তরাজু করি হাতে॥"(মুকুন্দ/৫৮)

জিনিসপত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিন্দুক ব্যবহার হত। চণ্ডীমঙ্গলে তার ব্যবহার আছে-

"সিন্দুক হৈতে বেণে গুণে দেয় টাকা।" (ঐ/৫৯)[১৯]

ডোল হল শস্য সংরক্ষণের নিমিত্ত বাঁশের তৈরী এক প্রকার বড় পাত্র। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই শস্য সংরক্ষণের ডোলের কথা। শৌখিনদ্রব্য হিসাবে খাট, পালঙ্ক, চামর, বিয়নী; রূপচর্চার উপকরণ হিসেবে দর্পণ, চিরুণী ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব সুখের সংসারে এসবের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রসাধনে সহায়ক উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও দর্পণ, চামর, শঙ্খ ইত্যাদি দ্রব্যগুলি বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এগুলির প্রয়োজন হত—

"রজত দর্পণ হেম স্বস্তিক সিন্দূর ক্ষেম
কজ্জ্বল গোরোচনা যথাবিধি॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
পূর্ণপাত্র প্রদীপ ভূষিত॥" (ঐ/৯৯)[২০]

যুদ্ধাস্ত্রগুলি ছাড়াও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের অস্ত্র ব্যবহার হত।যেমন, ক্ষুর, বঁটি, কাটারি, কুঠার বা পরশু, জাঁতি ইত্যাদি। ক্ষুর ব্যবহার করত নাপিতরা চুল-দাড়ি কামাবার জন্য। ভাঁড়ু দত্তকে অপদস্ত করে শেষ পর্যন্ত তার মাথা কামানো হয়েছিল—

"হরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের হরিষে ক্ষুর আনে মুড়াধার॥
. . . .
চামাটি থাকিতে পদতলে ঘসে ক্ষুর।
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুড় দুড়॥" (ঐ/৮৮)[২১]

কৃষিজীবী সমাজে কোদাল, খন্তা, লাঙল, জোয়াল, ফাল ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি। মানিক দত্ত চাষের যন্ত্রপাতির উল্লেখ করেছেন—

"জোয়াল নাঙ্গল ভাসে কোদালি আর ফাল।" (মানিক/১২৯)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলে দেবী প্রদত্ত ধন তুলতে গিয়ে কালকেতু ঐ সমস্ত অস্ত্রাদি ব্যবহার করেছিল—

"অভয়া বলেন বাছা লহ শিকা ভার।
লহ ঝুড়ি কোদালি খনতা ক্ষুরধার॥
কোদালি খনতা মাতা না পাব নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা দিলে ধন খুঁড়িব চিয়াড়ে॥" (মুকুন্দ/৫৭)[২২]

'শিকা-ভার' কৃষিজীবী সমাজ সম্পর্কিত ব্যবহার্য উপকরণ। একটি বাঁশের বাঁকে দ্'দিকে দড়ির তৈরী শিকাতে ঝুলন্ত ডালায় জিনিসপত্র পরিবহন করা হয়, লোকে কাঁধে করে ভার বহন করে। বঁটির ব্যবহার আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে,বঁটি গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় অস্ত্র। ফুল্লরা গোধার মাংস কাটার জন্য বঁটি ধার করতে সইয়ের বাড়ী গিয়েছে—

"গোধিকা কারণে রামা চিন্তিত অন্তর।
কিমতে কাটিমু গোধা বঠি নাই ঘর॥ (রামদেব/৬৩)

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বটির প্রসঙ্গ আছে। কাটারি একটি প্রয়োজনীয় অস্ত্র, গৃহস্থালীর নানা কর্মে কাটারির প্রয়োজন হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার ব্যবহার আছে—

"জয়২ খুলুনা ভূমিষ্ট হইল।
সুবন্ন কাটারি দিয়া নাড়ি ছেদ কৈল॥" (মানিক/১৯১)

জিজ্ঞির বা শেকল একটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, বন্দিদের বেঁধে রাখার জন্য শেকল ব্যবহার করা হত। বন্দি কালকেতুকে কারাগারে শেকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল-

"লোহার শিকলে বান্ধে হাত আর পায়ে।" (দ্বিজ মাধব/৯৪)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ বর্ণনা তেমন নেই; তবু দেখা যায় মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীমঙ্গলেও সামান্য যুদ্ধ বর্ণনার প্রসঙ্গ এসেছে, যেমন কালকেতুর কাহিনীতে কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ এবং বনিক খণ্ডে সিংহলরাজের সৈন্যদের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ। এই যুদ্ধ বর্ণনা গতানুগতিক হলেও এতে সেকালে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল যে যুগে রচিত হয়েছিল সে সময় সামাজিক জীবনে যুদ্ধের প্রভাব অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এখানে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের কথা কম। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের কথা পাই যা সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে, যেমন- তীর, ধনুক, চিয়াড়, ভূষণ্ডী, ডাঙ্গস, কামান, বন্দুক, শোল, টাঙ্গী,মুদ্গর, মুসল ইত্যাদি।

মঙ্গলকাব্যে যুদ্ধ বর্ণনা যেমন গতানুগতিক তেমনি যুদ্ধাস্ত্রগুলিও প্রাচীন, তবে চণ্ডীমঙ্গলে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান ও বন্দুকের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বন্দুকের ব্যবহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম যুগেও হয়েছিল। মানিক দত্তের কাব্যে বন্দুকের ব্যবহার দেখা যায়—

"ধনুকের ছটপটি পাইকে ডাক ছাড়ে।
বন্দুকের শব্দে পৃথিবী টলমল করে॥" (মানিক/১৪০)

এছাড়া কামানের ব্যবহারও দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। যেমন—

"ধানুকি পিষ্টেত টোন ধনুকে চড়াইয়া গুণ
কামানি কামান করে সাজ।
চামুকি সাজাএ যে চমকে আনল যে
ছোটে গুলী ছোটের আওয়াজ॥" (রামদেব/৯১)

এছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ছিল অধিক, যেমন— তবক, বেলক, টাঙ্গী, কৃপাণ, মুদ্গর ইত্যাদি। মুকুন্দের কাব্যে পাই—

"তবক বেলক টাঙ্গি কামান কৃপাণ।" (মুকুন্দ/৭৬)[২৩]

অথবা—

"দেয়াড় চিয়াড় বাণ করবাল খরশাণ
ভূষণ্ডী ডাঙ্গস চক্রবাণ।" (ঐ)[২৪]

সাজসজ্জা ঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস বা লৌকিক ইতিহাসের একটি অন্যতম উপকরণ পোশাক-পরিচ্ছদ। মধ্যযুগীয় বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় জানা যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে। বাঙালীর সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবে বিভিন্ন ধরনের শৌখিন বস্ত্র, গহনা-অলঙ্কার, ব্যবহার করত তার মোটামুটি পরিচয় পাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে। বাঙালী গড়পরতা পোশাক হিসাবে পুরুষরা ধুতি পরিধান করত আর নারীর পোশাক হল শাড়ী বা পট্টশাড়ী। তাছাড়া পুরুষরা জামা, জুতা বা পাদুকা, পাগড়ী, টুপি ব্যবহার করত। উৎসব অনুষ্ঠানে নারীগণ পাটশাড়ী নামে শৌখিন শাড়ী ব্যবহার করত । দরিদ্র নারী পুরুষ কোন রকমে ছেঁড়া কাপড়ে (খুঞার বসন) লজ্জা নিবারণ করত। সাধু-সন্ন্যাসীরা পশুর চামড়ার তৈরী এক জাতীয় পোশাক ব্যবহার করত।

বাঙালী নারীর সাধারণ পোশাক হল শাড়ী। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই শাড়ীর ব্যবহার লক্ষণীয়। বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠানে পট্টশাড়ী বা পাটশাড়ীর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। খুল্লনা বিবাহ কালে পট্টশাড়ী পরিধান করেছিল-

"বাছিয়া পরিল রামা দিব্য পট্ট শাড়ী। (দ্বিজ মাধব/১২৬)

ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করার জন্য দিন নির্ণয়ের আগে প্রথমা স্ত্রী লহনাকে পাটশাড়ী ও গহনা দিয়ে সন্তুষ্ট করে ছিল—

"পরিতোষে লহনাকে দিয়া পাটশাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি॥" (মুকুন্দ/৯৮)[২৫]

খুল্লনাকে ছাগল চরাতে পাঠাবার সময় লহনা পাটশাড়ী খুলে নিয়ে খুঞার বসন পরিয়ে দিয়েছিল—

"খুঞা পরাইয়া পাটশাড়ী কৈল দূর" (ঐ/১১২)[২৬]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তসর নামে এক প্রকার বসনের উল্লেখ পাই সুশীলার বারমাস্যা বর্ণন অংশে—

"পৌষে তুলী পাতি তৈল তাম্বুল তপনে।

শীত নিবারণ দিব তসর বসনে॥" (মুকুন্দ/২২৫)[২৭]

আবার খুল্লনাকেও তসরের শাড়ী পরিধান করতে দেখি—

"খুল্লনার হাতে দিল আভরণ-পেড়ি।
দোছোটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী॥ (ঐ/১২৩)[২৮]

কবিকঙ্কণের কাব্যে 'মেঘডম্বরু'কাপড়ের কথা পাই—

"বাছিয়া পরিল মেঘ-ডম্বরু কাপড়" (ঐ/১২৪)[২৯]

নারীরা বক্ষাবরণ হিসাবে কাঁচুলি পরিধান করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর কাঁচুলি চিত্রন একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। দেবী চণ্ডী ছদ্মবেশ ধারণের পূর্বে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কাঁচুলি নির্মাণ করিয়ে নেয়—

"পারি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী কাঁচুলি নির্ম্মাণে মতি
বিশ্বকর্ম্মায় কৈলেন স্মরণ॥" (ঐ/৪৯) [৩০]

বাঙালী পুরুষের সাধারণ পোশাক হল ধুতি। বালক, যুবক নির্বিশেষে ধুতি পরিধান করত।কবিকঙ্কণের কাব্যে আমরা ভাঁড়ু দত্তকে ধুতি পরিহিত দেখি—

"ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম লম্বমান॥"(ঐ/৬৭)[৩১]

বিবাহ বা কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ধুতি পরিধান করা বিধেয় ছিল। তাই শিবঠাকুরকে বিবাহকালে ধুতি পরিহিত দেখি, এমন কি নারীকেও ধুতি পরানো হত—

"পার্ব্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিল আসনে।" ((ঐ/১৮)[৩২]

'গামছা' বাঙালীর একটি বহু ব্যবহৃত বস্ত্র। শুধু গা মোছার জন্য নয়, ধুতি পরিহিত বাঙালী পুরুষের কাঁধে গামছা শোভা পেতে দেখা যেত। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে গামছার ব্যবহার ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে গামছার ব্যবহার দেখা যায়-

"ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া॥" (দ্বিজ মাধব/৭০)

এগুলি ছাড়াও পাগরী, ইজের ইত্যাদি পুরুষের পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হত। পাদুকা বা জুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সাধারণত ব্রাহ্মণরা খড়ম বা 'পানই' ব্যবহার করত। তবে চণ্ডীমঙ্গলে পাদুকা বা জুতা, খড়ম, মোজা ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগরের পাদুকা ব্যবহারের কথা পাই। যেমন—

"চরনে পাদুকা দিয়া করিল গমন।" (মুকুন্দ/৯৭)

কম্বল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। কম্বল শীত নিবারনের জন্য ব্যবহৃত হলেও কম্বলের আসন ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে আমরা দেখি রম্ভাবতী ধনপতিকে কম্বলের আসনে বসতে দিয়েছেন—

"বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।" (ঐ/১০০)[৩৩]

চণ্ডীমঙ্গলে পাই কালকেতু বন্যায় বিপর্যস্ত বুলান মণ্ডলকে কম্বল, অন্ন,বস্ত্র সাহায্য দিয়েছে—

"আইস বুলান ভাই ধর হে কম্বল।
যত চাহ দিব টাকা ভক্ষণ সম্বল॥" (ঐ/৬৭)

ধনীরা শয্যা নির্মাণের উপকরণ হিসাবে খাট, পালঙ্ক, মশারি ইত্যাদি ব্যবহার করত। দুর্বলার সজ্জা রচনার বর্ণনায়

আছে—

"ধবল চামর বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
প্রতি চালে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে নানা পাট ডোরা॥ (ঐ/১২৮)[৩৪]

সমৃদ্ধির প্রকাশক হিসাবে ঐ উপকরণগুলি ব্যবহার করা হত। ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের কথা শুনে লহনা বলে তার সমৃদ্ধির সংসার অপরকে দিতে হবে। তাই তার আক্ষেপ—

"বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাম খাট পিঁড়ি
সগল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া কুঙ্কুম কস্তূরী চুয়া
কারে দিব মন্দির মশারি॥" (ঐ/৯৭)[৩৫]

'চান্দা' বা চাঁদোয়া এক প্রকার বস্ত্রখণ্ড। পূজা-পার্বণে উৎসবে খোলা জায়গায় 'চান্দা' টাঙ্গিয়ে তার নিচে উৎসবের আয়োজন করা হত—

"শুভবার্ত্তা পাইয়া হইয়া আনন্দিতা।
উঠানে টাঙ্গায় চান্দা আম্রশাখাযুতা॥" (ঐ/৯০)[৩৬]

অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের জীবন ছিল দুঃখ কষ্টে ভরা, তারা সামান্য বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করত। মুকুন্দের কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরাকে খুঁঞার বসন (গাছের বাকল নির্মিত) অর্থাৎ সামান্য বস্ত্র, ধড়া অর্থাৎ সামান্য কটিবাস পরিধান করতে দেখা যায়। এইসব বর্ণনায় দারিদ্র্যময় জীবনযাত্রার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়াও অনার্য- ব্যাধ জাতির পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয়ও পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। কালকেতু শিকারযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রার সময় সামান্য ধড়া পরিধান করে—

"প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙ্গা ধড়া।"(ঐ/৪১)[৩৭]

কলিঙ্গরাজের সৈন্যরা যুদ্ধযাত্রাকালে ধড়া বা কটিবস্ত্র পরিধান করেছিল—

"পরিধান পীতধড়ী মাথায় জালের দড়ি
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি।"(ঐ/৭৫)[৩৮]

ফুল্লরা লজ্জা নিবারণের জন্য খুঁঞার বসন পরিধান করত। তার বারমাস্যা অনুযায়ী—

"পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন॥" (ঐ/৫৪)[৩৯]

সাধু-সন্ন্যাসীরা পশুর চামড়ার তৈরী পোশাক, আসন ইত্যাদি ব্যবহার করত, পায়ে খড়ম পরত। এ সমস্ত বর্ণনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ পাওয়া যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরেই আসে অলঙ্কারের কথা;. অলঙ্কারপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে বাঙালীর শখ-শৌখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালী রমণীরা অলঙ্কার প্রিয়। মধ্যযুগের কাব্যগুলিতে বাঙালী ব্যবহৃত বহু অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে দিয়ে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানগত দিকটি যেমন ফুটে ওঠে তেমনি শিল্পবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহারের কথা পাওয়া যাচ্ছে. যথা— হার. কুণ্ডল. অঙ্গুরীয়. মঞ্জীর. শঙ্খ. নূপুর. কঙ্কণ. পাসুলী. বউলি. পলা. রুলি. চুড়ি. তার. মল ইত্যাদি। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি ধনপতি বিবাহে কারিগরকে দিয়ে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার তৈরী করিয়ে নিয়েছে—

"অলঙ্কার গড়ে বাণিয়া সাধুর কুমার

উচল পিড়াতে বসিল কারিগর ॥
উপর কানের চাকি গড়ে নাস্ত কর্ন্নের কড়ি।
বাঁকমল গড়িয়া গড়ে পায়ের পাছলি ॥
গলার গণিয়া গড়ে শতেশ্বরী হার।
দুই বাহায় গড়িল জাম্ফল দুই তার ॥
উঝটিয়ান গড়ে লেখা নাই তারে।
নাসার বেশর পড়ে ঝলমল করে ॥
রত্নের য়ঙ্গুরি সব গড়িল থরে২।
নানাজাতি অলঙ্কার গড়িল তাহারে ॥
দুই হস্তের শঙ্খ গড়ে শ্রীরামলক্ষণ।
শঙ্খের মুখেতে শোভে মানিক কঙ্কন ॥
মানিক গজরাজ গড়ে করে ঝলমল।
নানাবর্ণ চিত্র কৈল অতি মনোহর ॥" (মানিক/২০৫)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে আমরা 'খুল্লনার বিবাহসজ্জা' অংশে নানা ধরনের অলঙ্কারের পরিচয় পাই—

"শ্রুতিমূলে শোভা করে রত্নকুণ্ডল।
অরুণ সমান যার জ্যোতি ঝলমল ॥
মণিময় মুক্তা শোভে নাসিকা উপর।
কণ্ঠে কণ্ঠমণি হার অতি মনোহর ॥
করপল্লবে শোভে রত্ন-অঙ্গুঠি।
অলক্ষিতে পুষ্প যেন ফুটে গাঠি গাঠি ॥
মঞ্জু মঞ্জীর দুই পদ করে শোভা।
পদ-অঙ্গুলে শোভে রজতের আভা ॥
বাহুযুগে তার শোভে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
লাবণ্য প্রবাল শঙ্খ কৈল পরিধান ॥" (দ্বিজ মাধব/১২৫-১২৬)

বিভিন্ন মণি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি মূল্যবান পাথর গহনাতে ব্যবহার করা হত—

"পীত তড়িত বর্ণে হেম-কুণ্ডলিকা কর্ণে
কেয়-মেঘে পড়িছে বিজুলী
রতন পাশুলি ছটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু-বিভূষণ ঝলমলী ॥
পরে দিব্য পাটশাড়ী কনকের পরে চুড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত-কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক ॥" (মুকুন্দ/১২৯)[৪০]

বিবাহকালে কনেকে নানা রকম মূল্যবাণ গহনা উপহার দেওয়া হত। চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী কালকেতুকে সাত ঘড়া মোহর ও একটি সুবর্ণ অঙ্গুরীয় উপহার দিয়েছিল —

"বীরহস্তে দিলা চণ্ডী মাণিক্য অঙ্গুরী। (ঐ/৫৭)[৪১]

শুধু নারী নয়, পুরুষরাও মধ্যযুগে কিছু কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করত। শিবের বিবাহে শিবঠাকুর মদনমোহন রূপ ধারণ করলে তার কণ্ঠের অস্থিমালা রত্নহারে পরিণত হয়—

"অস্থিমালা ছিল যত হইল রত্নমাল।" (ঐ/১৯)[৪২]

মনে হয় মধ্যযুগেই পুরুষের গহনা পরিধান করার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল। তবে নিম্নশ্রেণীর অনার্য পুরুষরা কানে কুণ্ডল, হাতে তারবালা পরিধান করত তাই কালকেতুকে অলঙ্কার পরিধান করতে দেখা যাচ্ছে—

"দুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাণ্ডাগুলি ভাঁটা
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল॥" (ঐ/৩৬)[৪৩]

রূপচর্চার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের কথা পাই চণ্ডীমঙ্গলে, যথা— তেল, আমলকি, হরিদ্রা, চন্দন, চুয়া, কুমকুম, সিন্দুর, কাজল, অগুরু, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি।রূপচর্চার সহায়ক ব্যবহার্য উপাদান হল চিরুণী ও দর্পণ। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দর্পণ ও চিরুণী ইত্যাদির দ্বারা রূপচর্চার কথা পাওয়া যায়—

"গৃহে থাকি সুশীলা করিছে নানা বেষ।
বান্ধিল বিচিত্র খোপা আচুড়িয়া কেশ॥
কেশ বান্ধি বেষ কৈল পহ্নিলেক শাড়ী।" (মানিক/৩৫৭)

কবিকঙ্কণের কাব্যে চিরুণী ও দর্পণ সহযোগে প্রসাধন করার কথা পাই—

"দুর্ব্বলা মাজয়ে কেশ লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম-দণ্ড রসাল দর্পণী॥
আঁচড়িল কেশ তার নানা পরিবন্ধে।
গন্ধতৈলযুত হয়ে পরে তার স্কন্ধে॥
কবরী বান্ধিল রামা নামে গুয়া-ঠাঁটি।
দর্পণে নেহালে রামা যেন গুয়া গুটি॥
মেছেতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পড়িল মেঘ-ডম্বরু কাপড়॥ (মুকুন্দ/১২৪)[৪৪]

কাজল বা কজ্জল একটি উত্তম প্রসাধনী। নারীরা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাজল ব্যবহার করত-

"নয়ানে কজ্জ্বল পহ্নে বেশর নাসাতে।" (মানিক/৩৫৭)

বিবাহিত নারীরা হাতে শঙ্খ বা শাঁখা এবং কপালে সিন্দুর পরত। হিন্দুর রীতি অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যে এয়োস্ত্রীগণের শাঁখা-সিন্দুর ব্যবহারের প্রসঙ্গ পাই। যথা—

"কপালে সিন্দুর পহ্নে কর্ন্নে পহ্নে কড়ি।
. . . .
গলে হার বাহে তার শঙ্খ পহ্নে হাতে॥" (মানিক/৩৫৭)

মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর কাব্যেও এয়োস্ত্রীগণের সিন্দুর ব্যবহারের কথা পাই—

"যতনে পরয়ে রামা কজ্জ্বল সিন্দূর।
মার্জ্জনা করিয়া পরে মণিকর্ণপুর।" (মুকুন্দ/১২৪)[৪৫]

হরিদ্রা, কুমকুম, চন্দন, চুয়া ইত্যাদি প্রসাধনী দ্বারা রূপচর্চা করা হত এবং গায়ের ময়লা দূর করা হত-

"হরিদ্র কুঙ্কুম লয়ে ঘরে ঘরে ভ্রমি চেয়ে
করিতে অঙ্গের মলা দূর।" (ঐ/১২৫)[৪৬]

কিংবা–

"হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিলা দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়ে দুর কৈল মলা॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন॥" (ঐ/১২০)[৪৭]

মৃগমদ, কুঙ্কুম, চন্দনের দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলা হত, যেমন—

"দুর্ব্বলা বুঝিয়া কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দন॥" (ঐ/১২৮)[৪৮]

কেশ প্রসাধনের জন্য 'নারায়ণ তৈল' নামে এক প্রকার সুগন্ধি তেল ব্যবহারের কথা পাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমলা তেল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়—

"করে লয়ে আমলা সুগন্ধি তৈলবাটি।
সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী।" (ঐ/২২৫)[৪৯]

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বর-কনেকে চন্দন দ্বারা সুসজ্জিত করা হত—

"তৈল কুড় দিল বরের কপালে চন্দন। (মানিক/৩৫৭)

চুয়া, চন্দন, কস্তুরী ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য হিসাবেও ব্যবহার করা হত। বঙ্গনারীগণ নানা ছাঁদে কবরী বা খোপা বাঁধতে পারত, তারা খোপায় পুষ্পহার দিয়ে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলত। মুকুন্দ চক্রবর্তী 'গুয়াঠুটি' খোপার উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় যে, মঙ্গলকাব্যে এই সমস্ত আয়োজনই কিন্তু বিত্তবানদের জন্য। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল প্রায় নিরানন্দময়। প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষমতা তাদের ছিল না, তাই কালকেতুর ফুল্লরার বিবাহে কোন রকম প্রসাধন ব্যবহারের কথা নেই, তাদের বিবাহে ব্যবহৃত বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রসাধন যৎসামান্য । অনার্য-ব্যাধ সমাজেও হিন্দুরীতি অনুযায়ী সিন্দুর ব্যবহারের কথা আছে। সিন্দুর পরিধান রীতি সম্ভবত অনার্য সমাজ থেকেই আর্য সমাজ গ্রহণ করেছিল। কালকেতুর বিবাহে কবি বর্ণনা অনুসারে—

"পাঁচ গণ্ডার কিনিলেক দুইগাছি ধড়া।
একখানি খইয়া লইল দিয়া পাঁচ কড়া॥
দশ কড়ার খড় কিনি হরিষ প্রচুর।
পাঁচ কড়ার কিনিলেক মাটিয়া সিন্দুর॥ (দ্বিজ মাধব/৩৮)

বাদ্যযন্ত্র ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উপকরণ হল বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। চণ্ডীমঙ্গলে চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, তারের বাদ্যযন্ত্র, ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের কথাই আছে, যেমন—মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডম্বরু, যোড়া, দামা, পড়া, ডিণ্ডিম, ডম্ফ, জয়ঢাক, দগড়, ভেড়ি, পখোয়াজ, জোড়া, দুন্দুভি, ঢাক, ঢোল, রায়বাশ, বাঁশী, ভেউর, কারনাল, তাম্বুর, রণকাড়া, কাড়া, খোল, করতাল, খঞ্জরি, দোতারা, ঘাগর, ঘুঘুরা, সারিন্দা, বেণু, রবাব, সপ্তস্বরা, পিনাকিণী, বল্লকী, খমক, শঙ্খ, শিঙ্গা, মহুরী, সানাই, তুরি, কাঁসর, ঘন্টা, মন্দিরা, বেণী, দোখণ্ডী, ঠনক, মঙ্গল ইত্যাদি। বিবাহ, পূজা-পার্বণ ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। তাছাড়াও যুদ্ধযাত্রাকালেও এক ধরনের রণবাদ্য বাজানো হত। মানিক দত্তের কাব্যে খুল্লনার বিবাহে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন দেখি—

"দুন্দবি বাদ্যের রোল বাজে ঘনে ঘন॥
ভেউর করনাল বাজে আর বাজে কাড়া।
কাঁসি বাঁশি বাদ্য বাজে মৃদঙ্গ দগড়া॥" (মানিক/২০৯)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতির বিবাহে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলি হল—

"মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল-নিশান।
ভেউর ঝাঁঝরি বাজে অনেক সন্ধান॥
ঢাকরিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল॥" (দ্বিজ মাধব/১২৭)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল কাব্য। এখানে প্রচুর বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করি। কবিকঙ্কণের কাব্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ—

১। ভেরী তূরী বাজে ভাল কাংস্যবাদ্য করতাল
পটহ দুন্দুভি বাজে বীণে॥
রামা দেয় জয়ধ্বনি সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বাজে নানা মঙ্গল-বাজন॥" (মুকুন্দ/৪)

২। "বরযাত্রী পড়ে পাড়া ঢেমছা দগড় কাডা
বর বেড়ি বাজায় বাজন॥
কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল॥" (ঐ/৩৮)[৫০]

৩। দেখিলাম অপরূপ সুগন্ধি অগুরু ধূপ
সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন॥
প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীণা বেণী।
কাঁসর মহুরি পড়া জগঝম্প বাজে কাড়া
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সানি॥" (ঐ/৭৫)[৫১]

৪। তাথিনি তাথিনি থিনিমৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে তরন কঙ্কণ॥
হয়ে মুনি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীণা-গুণে তরল অঙ্গুলি।
ডিমি ডিমি ডম্বরু বায় ডমরুের বাজনা তায়
নারদ পিনাকী কুতূহলী॥" (ঐ/৯১)[৫২]

৫। পটহ মৃদঙ্গ সানি দগড় কাঁসর বেণী
শঙ্খ বাজে দোথণ্ডী বিল্লকী।
খমক টমক ভেরী জগঝম্প বাজে তূরী
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী॥" (ঐ/৯৯)[৫৩]

আবার কতকগুলি রণবাদ্য হিসাবে, যুদ্ধ যাত্রাকালে বাজানো হয়েছে, যেমন—

১। চৌদিকে ধাঁ ধাঁ বাজয়ে দামামা
তবকী তবকে বোল।
পাই দেয় উড়া পাক ঘন বাজে জয়ঢাক
কারো কেহ নাহি শুনে বোল॥
ডিম ডিম ডম্বর পূরয়ে অম্বর
নানা শব্দে বাজে জগঝম্প।

বাজয়ে সানি　　　　　　রণজয় বেণী
গুজরাটে উঠিল কম্প ॥" (ঐ/৭৭)[৫৪]

২।　　সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা॥

.. ..

রামবীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা।
দগড় দোগড়ী বায় শত শত জনা॥
হস্তীর গলায় ঘন্টা শুনি ঠনঠনি।
কাংস্য করতাল বাজে বিপরীত শুনি॥
জয়ঢাক বীরঢাক রাজসী বাজনা।
প্রলয় সমর যেন পড়ে ঝনঝনা॥"(ঐ/২০৯)[৫৫]

শিল্পকর্ম ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানুষের সৌন্দর্য ও শিল্পবোধের পরিচয় আছে। বাংলার লৌকিক জীবনে ব্যবহৃত নানান উপকরণের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে, তা যেমন একদিকে মানুষের সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক, তেমনি মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণেও সাহায্য করেছে, যেমন— বাঁশ ও বেতের কাজ, সূচীশিল্প, রং-তুলির কাজ বা চিত্রকলা, গহনা শিল্প, মৃৎশিল্প, আলপনা অঙ্কন ইত্যাদি। দেবীর কাঁচুলি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বস্ত্রশিল্প ও চিত্রকলা শিল্পের কথা জানা যায়। মানিক দত্তের কাব্যে চণ্ডীর কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ আছে—

"বস্ত্র চিরিয়া তবে কৈল খান খান।
দেব কাচুলী তার করেন নির্মান॥
চিত্র বিচিত্র করে কাচুলী নির্মান।
দেখি সুছন্দ অতি দেব মোহজান। (মানিক/৮৩)

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও দেবীর কাঁচুলি চিত্রন কথা আছে—

"অলঙ্কারে পূর্ণ বেশ হইলা মহামায়ে।
কঞ্চুলী নির্ম্মিইতে দেবী বিশাইরে আনায়ে॥
দেবী বোলে বিশ্বকর্ম্মা বলিরে তোহ্মারে।
বিচিত্র কঞ্চুলী নিম্মাই দেয়ত আমারে॥

. . . .

সে কাঞ্চুলী দিয়া অঙ্গে বসিলা ভবানী
বিশাই চলিল তবে করিয়া মেলানি॥" (দ্বিজ মাধব/৪৯-৫০)

কবিকঙ্কণের কাব্যেও কাঁচুলি চিত্রন প্রসঙ্গ আছে, সেখানে শুধু কাপড় কেটে কাঁচুলি নির্মাণের কথাই নেই, এতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও শাস্ত্রের বিভিন্ন কাহিনী চিত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বাংলার চিত্রশিল্প ও সূচীশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

গহনা শিল্প বাংলার অন্যতম শিল্প। মূল্যবান পাথর ও ধাতু নির্মিত গহনার পরিচয় জানা যায় চণ্ডীমঙ্গলে। অলঙ্কারের উপর নানা কারুকার্য করা হত. এতে বাঙালী অলঙ্করণ শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় আছে। বাঙালী রমণীগণ সুন্দর আলপনা আঁকতে পারত। তারা উৎসব অনুষ্ঠানে, বিবাহকালে মেঝেতে, পিঁড়িতে সুন্দর আলপনা আঁকত। কালকেতুর বিবাহে আলপনা অঙ্কনের কথা পাই—

"গোময়ে লেপিয়া মাটি　　　　আলিপনা পরিপাটি

চতুর্দ্দিকে বান্ধবের মেলা॥" (মুকুন্দ/৩৮)[৫৬]

গ্রামীণ বাঙালী নারীপুরুষ বাঁশ ও বেতের কাজ, শোলার কাজ করত। রূপচর্চা বা প্রসাধনে বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রন্ধনকার্যেও বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পেও বাঙালীর উৎকর্ষতার পরিচয় আছে, তাঁত, তসর প্রভৃতি উন্নতমানের বস্ত্র নির্মাণের কথা আছে চণ্ডীমঙ্গলে—

"পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট শাড়ি
দেখি বড় বীরের হরিষ।"(ঐ/৭১)[৫৭]

শঙ্খবেণেরা শাঁখা তৈরী করত, কাঁসারি বাসনপত্র নির্মাণ করত—

"শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ কেহ করে নবরঙ্গ
মণিবেণে বসে গুজরাটে।
কাঁসারি পতিয়া শাল গড়ে ঝারি খুরি থাল
ঘটি বাটি বড় হাঁড়ি সীপ॥
ডাবর চুনাতি বাটা সাপড়া ঘাঘর ঘন্টা
সিংহাসনে গড়ে পঞ্চদীপ॥" (ঐ)[৫৮]

দর্জিরা কাপড় সেলাই করত—

"দরজী কাপড় সিঁয়ে বেতন করিয়া জীয়ে
গুজরাটে বসে এক পাশ।" (ঐ)[৫৯]

বাংলার মৃৎশিল্প উন্নত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলে—

"কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি-কুঁড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।
শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি ধুতি বোনে জোড় গড়া॥" (ঐ)[৬০]

এই সমস্ত শিল্পকর্মে বাঙালীর দক্ষতা ছিল, যা তাদের জীবিকায় সহায়ক হত।

যানবাহন ঃ অতঃপর আসি যানবাহনের কথায়। ষোড়শ শতাব্দীতে যানবাহন ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। লোকে সাধারণত পায়ে হেঁটেই যাতায়াত ও মাল পরিবহণ করত। পশুর পিঠে চড়ে যাতায়াত ও মাল পরিবহণ করা আদিম ব্যবস্থা , মধ্যযুগ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। হাতি, ঘোড়া, গাধার পিঠে চড়ে যাতায়াত করা হত। আধুনিক কাল পর্যন্ত এ সমস্ত পশুই বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগের যানবাহনগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে— স্থলযান ও জলযান। স্থলযান হিসাবে ব্যবহৃত হত গরু বা ঘোড়ার গাড়ী, দোলা. চতুর্দোল, পালকী, রথ ইত্যাদি, আর জলযান হিসেবে ব্যবহৃত হত নৌকা, ভেলা ইত্যাদি। চণ্ডীমঙ্গলে দোলা বা পালকীর ব্যবহার সব চাইতে বেশী দেখা যায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখা যায় সাধারণ মানুষ দোলায় চড়ে চলাফেরা করছে। আবার রাজপুরুষরাও দোলা ব্যবহার করত। তাছাড়া হাতি, ঘোড়া চলাফেরার কাজে ব্যবহার করা হত। কালকেতু গ্রামের মণ্ডলকে যাতায়াতের জন্য হাতি ও দোলা উপহার দিয়েছে-

"দোল ঘোড়া দিল বীর মণ্ডলের তরে।" (দ্বিজ মাধব/৬৪)

রাজা-মহারাজা, রাজপুরুষরা হাতি ঘোড়ার পিঠে যাতায়াত করত, যেমন—

"কংস-নদীর তটে রাজা দিল দরশন।
হস্তী হইতে নামি রাজা ভূমিতে গমন॥" (ঐ/২৬)

ধনপতির বিবাহে বরযাত্রী সহ বর সুসজ্জিত দোলায় চড়ে যাত্রা করেছিল—

"খরোয়ারে বোলে দোলা কর রে সাজন।
সাধুর দোলায়ে সাজে খারুয়া ষোলজন॥

. . . .

দোলা লইয়া আইল খারু সাধুর গোচর।
নিজ পরিচ্ছদে দোলায়ে উঠে সদাগর॥" (ঐ/১২৬)

নারীরাও দোলায় বা চতুর্দোলে যাতায়াত করত। খুল্লনাকে বিবাহের সময় চতুর্দোলায় বের করা হয়েছিল—

"ধনপতি রহে গিয়া চান্দোয়ার তলে।
খুলনা বাহির কৈল করি চতুর্দোলে॥" (ঐ/১২৯)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দোলার ব্যবহারই সব চাইতে বেশী, এখানেও আছে ধনপতি দোলায় চেপে বিবাহ করতে যাচ্ছে। তাছাড়া ধনী ব্যক্তিরা চলাফেরার কাজে দোলা ব্যবহার করত—

কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
দোলায় চাপিয়া চলে বেণের নন্দন॥"(মুকুন্দ/১০১)[৬১]

যানবাহন হিসাবে ঘোড়ায় টানা গাড়ী বা রথ ব্যবহার করত ধনী ব্যক্তিরা—

"বায়ুবেগে রথ ধায়   উর্দ্ধমুখে সবে চায়
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে।

. . . .

যায় বীর দিব্য-রথে   মাতলি সারথি সাথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা॥" (ঐ/৮৯)[৬২]

মালপত্র পরিবহণের কাজে হাতি, ঘোড়া, গাধা ব্যবহার করা হলেও সাধারণ মানুষ যেমন পায়ে হেঁটে যাতায়াত করত তেমনি মালপত্র ভারীরা ভারে করে বহন করত। ধনপতির বিবাহে প্রেরিত মালপত্র ভারীরা ভারে করে বহন করেছিল এমন তথ্য পাওয়া যায়—

"লয়ে বিবাহের সাজ   চলিল ঘটকরাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগু পাছে সারি সারি   সজ্জা লয়ে যায় ভারী
গায়নে মঙ্গল গায় গীত॥" (ঐ/৯৯)[৬৩]

জলযান হিসাবে নৌকার ব্যবহার অতি প্রাচীন। মঙ্গলকাব্যে জলযান নৌকার ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগে যোগাযোগ, মালপত্র পরিবহণ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নৌকা-ই ব্যবহার করা হত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্ভর করেছিল জলপথের উপর। প্রাচীন বণিকগণ দূরবর্তী স্থানে বাণিজ্য করতে যেত সওদাগরি নৌকায়। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্তের নৌবাণিজ্যের কাহিনী আছে। যেমন মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার কিছু অংশ—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর।
সুবর্ণে নির্ম্মাণ সে ডিঙ্গার ছৈঘর॥

. . . .

সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে॥" (ঐ/১৫২)[৬৪]

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় জলপথে 'ভেলা' বা 'ভুরা' ব্যবহার হত। বন্যার সময় পথঘাট জলে ডুবে গেলে লোকে

যোগাযোগের জন্য 'ভুরা' বা 'ভেলা' ব্যবহার করত। কলিঙ্গ রাজ্যে বন্যা হলে ভাঁড়ু দত্ত সপরিবারে ভেলায় আশ্রয় নিয়েছিল—

"সগোষ্ঠি সহিতে ভাড়ু ভেলাতে চড়িল।

ভেলাতে চড়িয়া ভাড়ু চলিতে লাগিল ॥" (মানিক /১৩১)

মধ্যযুগে আকাশ পথ ব্যবহার সম্ভব ছিল না। তবে দেব দেবীগণ অলৌকিক সুদিব্য বিমানে আকাশ পথে চলাফেরা করত এটা কবি কল্পনা মাত্র, ঐতিহাসিক সত্য নয়।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ কিন্তু অনার্য নন, তারা অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ আপন আপন সমাজ অভিজ্ঞতা অনুসারে তাদের নিজস্ব সামাজিক আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসকে বর্ণনা করেছেন। বাঙালী চিরকালই দৈববাদী ও অদৃষ্টবাদী; ঝাঁড়ফুক, তুক্‌তাক, মারণ-উচাটন-বশীকরণ, হাঁচি টিক্‌টিকির বাঁধন এসবের প্রতি এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাই বাঙালীর জীবন নানান সংস্কার ও বিধিনিষেধে আবদ্ধ ছিল। অদৃষ্টবাদী ইহজীবন বিমুখ বাঙালীর সাহিত্য তাই দেবাশ্রয়ী। ক্রমাগত বিপর্যয়ে সেদিন বাঙালী আত্মশক্তিহীন হয়ে পড়েছিল বলেই অদৃষ্টের বন্ধনকে অমোঘ বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর এই জীবন সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে। গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার-ব্রত, বিভিন্ন ধরনের অতিলৌকিক ক্ষমতা, মিথ, কর্মবাদ ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। তাইতো অনার্য-ব্যাধ কালকেতুর মুখেও শোনা যায় দৈববাদের কথা। দ্বিজ মাধবের কাব্যে অনার্য বাঙালীর হাহাকার শুনি-—

"সব ব্যর্থ হইল মোর পাপ কর্ম্মফলে।" (দ্বিজ মাধব/৪৭)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতুর খেদোক্তি—

"সুকৃতি-পুরুষ জীয়ে সুখ-ভোগ হেতু।

দুঃখ-ভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু ॥"(মুকুন্দ/৪৭)[৬৫]

কিংবা ফুল্লরার মত রমণীর কন্ঠে শুনি দৈব-পরিহাসের কথা—

"দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি

পড়িনু সম্বল-চিন্তা-ফাঁদে ॥ (ঐ/৪৮)[৬৬]

গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এগুলি যেমন শুভ ফলদায়ক, তেমনি আবার অশুভও। গোধূলি লগ্ন বা 'ভদ্রাকালে' যাত্রা অমঙ্গল, তাই পঞ্জিকা দেখে শুভলগ্ন বিচার করে যাত্রা করা হত। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে শুভলগ্ন অতিক্রম করেছিল—

"জাত্রার লগন ভাল সেহ বহিআ গেল।

ভদ্রাকালে ধনপতি জাত্রা করিল ॥" (মানিক/২৬৫)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও তিথি, মাস বিচার করে যাত্রালগ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে—

"না যাইঅ সিংহলে সাধু বাক্য শুন মোর।

পঞ্চম মঙ্গল সাধু গণিলুম তোর ॥

সর্ব্বদাএ সিংহলে পাইবা অপযশ।

জন্মস্থ হইল গুরু ভানু যে দ্বাদশ ॥

. . . .

তিথি বার দগ্ধা আর মাস দগ্ধা হয়।

আজুকা গমনে সাধু জীবন সংশয়।."(দ্বিজ রামদেব/২৬৬-২৬৭)

খুল্লনার গর্ভসঞ্চারের পূর্বে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে শুভলগ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে—

"খুল্লনার স্বয়ম্ভু-কুসুম পরকাশ॥
রবিবার মৃগশিরা তিথি ত্রয়োদশী।
শুভলগ্ন শুভযোগ শুভস্থানে শশী॥" (মুকুন্দ/১৩৬)

কিংবা, শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রাকালে শুভ তিথি হল—

"শুভযোগ মৃগশিরা মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা
ভাগ্যযোগে তাহে রবিবার।
বণিজ দশমী তিথি বাণিজ্য করণ ইথি।
ইহা বিনা যাত্রা নাহি আর॥" (ঐ/১৭৭)[৬৭]

শ্রীমন্তের জন্মলগ্নে গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, রাশি অনুযায়ী সমস্ত অবস্থান শুভ ছিল—

"মকরে ধরণী-সুত বৃষে চাঁদ গুরুযুত
মেষে লিখে প্রচণ্ড-কিরণে।
তুঙ্গ ঘরে বৈসে রাহুসূচয়ে কল্যাণ বহু
বুধ লিখে গুরুর ভবনে॥
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলা রাশে ভৃগুবর
মঙ্গল সূচন করে কেতু।
শুভ যোগ কাল দণ্ড ইথে জাত নহে ছণ্ড
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু॥"(ঐ/১৬৭-১৬৮)[৬৮]

এছাড়া ছিল পশুপাখি-কেন্দ্রিক সংস্কার, সময় বিশেষে বিভিন্ন পশুপাখির আচরণ কখনো শুভ আবার কখনো অশুভ বলে বিবেচিত হত।যাত্রাকালে পেঁচার ডাক শোনা, শকুনি-গৃধিনী উড়ে যাওয়া, টিকটিকি ডাকা এবং গায়ে পড়া অশুভকর চিহ্ন। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দেখেছিল—

"জাত্রা করি ধনপতি রহিল পুরের বাহিরে।
মোসানীতে ঠুঁটা বানর নাচায়ে॥
আকাশতে সর্ব্ব কয়ে মার কাট।
সম্মুখে গৃধিনী পাখার মারে সাট॥
বামে সর্প দেখিল সাধু ডাহিনে জাম্বকি।
জাত্রাকালে য়মঙ্গল দেখি মনে হৈল দুখি॥"(মানিক/২৬৫)

বাদিয়ার বানর নাচানো দেখা, যোগিনীর ভিক্ষা করা দেখা, বামে কালসাপ , ডানে শৃগাল পথ অতিক্রম করা, তেলীর তেল বিক্রয় দেখাও অমঙ্গল সূচক—

"যাত্রা করি বাহির হইতে সদাগর।
মধ্য নগরে বাদিয়া নাচায়ে বানর॥
তাহারে দেখিয়া সাধু চলয়ে তৎকাল।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা করে লইয়া থাল॥
তাহাকে দেখিয়া যাত্রা না করিল ভঙ্গ।
পন্থে যাইতে দেখে বামে কাল-ভুজঙ্গ॥

বাম দিক হোতে শিবা দক্ষিণে সে যায়ে।
তৈল লৈবা লৈবা তেলীয়ে বোলায়ে॥
খুলনায়ে বোলে প্রভু শুনহ বচন।
এত অমঙ্গল দেখি না যাও পাটন॥" (দ্বিজ মাধব/২০১)

পায়ে হোঁচট লাগা, মাথায় ডোমচিল ওড়া, কাপড়ে সেয়াকুল কাঁটা লাগা, কাঠুরের মাথায় কাঠের ভার দেখা, শুকনো ডালে কোকিল ডাকা, জেলের হাতে কচ্ছপ দেখা যাত্রাকালে অমঙ্গল সূচক—

"পথে যাইতে সদাগর লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সেয়াঁকুল কাঁটা॥
যাত্রার সময় ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরে কাঠের ভার লয়ে যায় পথে॥
শুকানো ডালেতে বসি কু-বোলয় কাউ।
যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা আধখানি লাউ॥
কচ্ছপ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলীরা বেড়ায়॥
চলিলেক সদাগর মনে কুঁতুহলী।
বাম দিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী॥" (মুকুন্দ/১৫৫)[৬১]

যাত্রাকালে শূন্যকুম্ভ দেখা অশুভ নির্ণায়ক—

"গমনকালেতে দেখে অনিষ্ট সূচন।
শূন্য কুম্ভ লইয়া আইসে সীমন্তিনীগণ॥
দক্ষিণে শ্রীগালি দেখে অনুপাম যাএ।
তৈলের পসারি দেখে ডাকিআ বেড়াএ॥
বাদিয়াএ সর্প ধরি সম্মুখে খেলাএ।
বানরিআ ওঝাগণ বানর নাচাএ॥"(দ্বিজ রামদেব/২৬৯)

আবার কিছু কিছু পশুপাখি দেখা শুভসূচক ছিল; মাস, বার, তিথি, কোন কোন গ্রহ, নক্ষত্রও শুভসূচক বলে মনে করা হত। শ্রীমন্তের যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ অনুকূল গণনা করে রমাই ঘটক শ্রীমন্তের যাত্রাকাল নির্ধারণ করে—

"শুভক্ষণে রমাই খড়িতে দিল রেখ।
তিন যাত্রা গণিয়া পাইল পরতেক॥
আকাশের কাক যখন ভূমিতে নাহি পড়ে।
হেনহি সময়ে ঈশ্বর মহাদেব লড়ে॥
দুই দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে পাই।
রাজা মারিয়া ভাই রাজ্যপাট লই॥
তিন দণ্ড উদিল যাত্রা করিবারে চাহি।
রাজা না হইলে হয়ে রাজার জামাই॥ (দ্বিজ মাধব/২৩০)

আবার যাত্রাকালে কাক, শকুন ডাকা, কোকিল ডাকা, গোয়ালিনীর দধি বিক্রয় দেখা, পূর্ণকুম্ভ দেখা, সবৎসা গাভী, সদ্যকাটা মাংস, মালীর পুষ্পমালা বিক্রয়, বামদিকে শৃগাল দেখা শুভকর—

"শ্রীমন্তের জাত্রাকালে কাক ডাকে কুতূহলে

কোকিল ডাকে ডালে বসিয়া।

সুন্দর গোয়ালিনী মাথে দধির পসার

জাইছে শ্রীমন্তের আগ বাড়িয়া॥" (মানিক/২৯৭)

দ্বিজ মাধবের কাব্যেও এরকম তথ্য পাওয়া যায়—

"পাটনে যাইতে সাধু দিব্য বিপ্র দেখে।

সীমান্তিনীগণ দেখে পূর্ণ-ঘট কাঁখে॥

পাটনে চলিয়া যায়ে সদাগরের বালা।

নগরে উঠিতে মালী যোগায়ে পুষ্পের মালা॥

চলিয়া যাইতে সাধু ভ্রমরার ঘাটে।

গাভী প্রসবে বৎস দেখয়ে নিকটে॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত লইয়া ডাকে চারিভিতে।

সদ্য-মাংস দেখে সাধু নৌকায়ে চড়িতে॥"(দ্বিজ মাধব/২৩০)

আবার, নর্তকী দেখা, মাহুত সহ হাতি দেখা, মধু বিক্রয় দেখা শুভকর—

"বাহির হইয়া দেখে মঙ্গলসূচন।

পূর্ণকুম্ভ লইয়া আইসে সীমন্তিনীগণ॥

বামেতে শ্রীকালি দেখে ধাএ যুতে যুতে।

মুরজ লইয়া আইসে নটসুতে॥

মাহুত চালাএ দেখে মত্ত করিবর।

সদ্য মৃগমাংস আনে বেচিতে নগর॥

মালা লৈয়া উপনিতি হৈল মালাকার।

আশীর্ব্বাদ করে তানে দৈবজ্ঞকুমার॥

দধি লৈবা দধি লৈবা ডাকে গোয়ালিনী।

মধু লৈবা মধু লৈবা ডাকে মধুআনী॥

আগে আগে পবনে উড়াই লৈ যাএ রেণু।

ডাইনে পলটি দেখে বৎস সমেত ধেনু॥

দেখএ খঞ্জনযুগ খেলে শতদলে।

দ্বিজ রামদেবে গাহে দেবীপদতলে॥" (দ্বিজ রামদেব /৩২৪-৩২৫)

উচ্চবর্ণের বাঙালী সমাজ নয়, নিম্নবর্ণের ব্যাধ সমাজেও এরকম অনেক অশুভ-শুভ নির্ণায়ক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যেমন- যাত্রাকালে গিরগিটি (গোধা) দেখা অশুভ বলে বিশ্বাস করা হত। কালকেতু বন যাত্রাকালে গিরগিটি দেখে অশুভ মনে করে এবং একারণে সারা দিনে সে একটি শিকারও পায়নি-

"গোধিকা দেখিয়া বোলে তর্জন-বচন।

তোমারে দেখিয়া আজু না পাইলু পশুগণ॥" (দ্বিজ মাধব/৪৮)

কালকেতু বন যাত্রাকালে যেমন শুভকর ঘটনা দেখে তেমনি অশুভকর লক্ষণ দেখে প্রচুর—

"সুবর্ণ-গোধিকা দেখি মহাবীর হৈল দুঃখী

অযাত্রিক পাপ দরশনে।

দেখিনু মঙ্গল যত সকল হইত হত

দৈব দুঃখ দেন সবে গণে॥

গোধিকা যাত্রিক নয়　　　　সকল শাস্ত্রেতে কয়

কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক॥" (মুকুন্দ/৪৫)[৭০]

কচ্ছপ, গণ্ডার, শশক, শল্লক দেখা যাত্রাকালে অযাত্রা হিসাবে চিহ্নিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনগত কিছু কিছু সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। যেমন- নারীর বামাঙ্গ স্পন্দন সর্বকালেই শুভ বলে বিবেচিত, ফুল্লরা ঘরে ফিরে আসার সময় তার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়; এটা মঙ্গলসূচক, কারণ কালকেতু এর পর দেবীর বর লাভ করে—

"বামবাহু স্পন্দে তার স্পন্দে বাম আঁখি।" (ঐ/৫১)[৭১]

কখনো বা বাম অঙ্গ স্পন্দন অহিতকর, শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে গেলে দেবীর বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়-

"মশানেতে শ্রীয়মন্তে ভাবে মহামায়ে।

সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়ে॥" (দ্বিজ মাধব/২৬৭)

আবার নারীর ডান অঙ্গ স্পন্দন, খাবার সময় জিহ্বায় দাঁত লাগা, বিষম লাগা অমঙ্গল সূচক—

"কপালে টনক পড়ে　　　　অলক ধৃতি নাহি উড়ে

স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি।

হেন মনে অনুমানি　　　　কিবা মোর হয় হানি

আজি বড় অমঙ্গল দেখি॥

মন উচাটন এবে　　　　খাইতে দন্ত লাগে জিভে

চলিতে উছট পদে লাগে।

ভোজনে বিষম খাই　　　　মনে বড় দুঃখ পাই

কালপেঁচা ডাকে চারিদিকে॥" (মুকুন্দ/২০৩)[৭২]

মানিক দত্তের কাব্যেও দেবী ঐ সকল অমঙ্গল চিহ্নগুলি দেখতে পেয়েছিল। এছাড়া যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা অমঙ্গল, আবার পুরুষের ডান অঙ্গ স্পন্দন হিতকর ও মঙ্গলসূচক—

"গুরুবারে দক্ষিণ স্বরে রজনী প্রভাতে।

এহার কারণে মোর স্পন্দিল দক্ষিণ হাতে॥

এহার কারণে খঞ্জন দেখিনু কমলে॥" (দ্বিজ মাধব/৪৭)

এছাড়া ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কিছু সংস্কার-বিশ্বাস ছিল, যেমন অপুত্রক জনের মুখদর্শন পাপ। আবার খাদ্যাখাদ্য বাধক কিছু সংস্কারও ছিল।

স্বপ্ন দর্শনকেও বিশ্বাস করা হত। অনেকক্ষেত্রেই স্বপ্ন দর্শন সত্য বলে বিবেচিত হত। কালকেতুকে বন্দি করার পর কলিঙ্গরাজ দুঃস্বপ্ন দেখে এবং বিশ্বাস অনুযায়ী কালকেতুকে মুক্ত করে দেয়। আবার দেখি শ্রীমন্তকে মশানে নিয়ে গেলে দেবী সিংহলরাজকেও স্বপ্নে দর্শন দেয় এবং এগুলি সত্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং স্বপ্নদর্শনে এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল।স্থানাশ্রয়ী বিশ্বাস আজও আছে, মধ্যযুগের বাঙালী সমাজেও প্রচলিত ছিল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাই। বিভিন্ন তীর্থস্থানের মহিমা, দেবস্থানের মহিমার কথা অত্যন্ত সুবিদিত ছিল। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রাকালে যাত্রাপথে সকল তীর্থাস্থানে পূজা করেছে। নবদ্বীপ সে সময়ে তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল তাই ধনপতি নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করে—

"নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।

চৈতন্য-চরণে সাধু করিল বন্দন॥" (ঐ/১৫৬)

তীর্থের জল পূণ্য ও পবিত্র বলে বিবেচিত হত, তাই নবজাতককে নানা তীর্থের জলে স্নান করানো হত। শ্রীমন্তের

জন্মের পর —

"নানা তীর্থের জল দিয়া স্নান করাইল॥ (মানিক/২৮৫)

গঙ্গাজলের পবিত্রতার কথা মধ্যযুগে বিশেষভাবে ছিল, তাই গঙ্গাস্নান পূণ্যকর্ম বলে মনে করা হত। বিভিন্ন তিথি উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করার রেওয়াজ ছিল—

"তৈল্য আঙ্‌লা খুলনা দিল শিরে।
স্নান করে রামা জাঞা গঙ্গা তীরে॥" (ঐ/২৮৯)

মৃত্যুর পর তীর্থস্থানে বা গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন একটি বিশেষ প্রথা, মনে করা হত গঙ্গায় অস্থি বিসর্জনে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি হয়ে থাকে, তাই গঙ্গাজলে স্নান-তর্পণ করা হত। ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে গঙ্গায় স্নান-তর্পণ করে-
-

"স্নান-তর্পণ যদি কৈল সদাগর।
কুলেত উঠিয়া পূজে দেব গঙ্গাধর॥" (দ্বিজ মাধব/২০৩)

ত্রিবেণী একটি পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে ধর্মপ্রাণ বাঙালী নানা সংস্কার পালন করত—

"বাম ভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু-কুলের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কত করে দান॥
রজতের সীপে কেহ করয়ে তর্পন।
গর্তের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে॥" (মুকুন্দ/১৫৬) [৭৩]

বস্তু-কেন্দ্রিক কিছু সংস্কারও ছিল, তাই গোবর হিন্দু বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র। সে কারণে পূজা পার্বণের স্থান গোবর দিয়ে পবিত্র করা হত—

"গোময় আনিঞা পবিত্র কৈল মাটি।
আগর চন্দন আর দিল ছড়া ঝাটি॥" (মানিক/২৮৯)

এপ্রসঙ্গে আশীর্বাদ বা অভিশাপের কথাও বলা যেতে পারে। দেবতার আশীর্বাদ লাভ, গুরুজনদের আশীর্বাদ পরম ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হত। শ্রীমন্ত তাই পিতার খোঁজে যাবার আগে মায়ের এবং দেবীর আশীর্বাদ নিয়েছিল—

"পিতার উদ্দিশে জাই দক্ষিণ পাটন।
তোমার আশীর্ব্বাদে পাই পিতার চরণ॥
চণ্ডীপূজা কৈল সাধু হয়ে সাবধান।
আপন হস্তে ছাগ মহিষ দিল বলিদান॥
প্রতিজ্ঞা করিলাম মাতা তোমার চরণ।
তোমার আশীর্ব্বাদে পাই পিতা দরশন॥" (ঐ/৩০২)

ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধা-ভক্তি সুবিদিত। ব্রাহ্মণকে দান পূণ্যকর্ম. ধনপতি তাই বাণিজ্য যাত্রার আগে ব্রাহ্মণকে দান করে সন্তুষ্ট করে—

"ব্রাহ্মণেরে স্বর্ণ দিয়া সাধু উঠে নায়ে।
মহানন্দে সদাগরে গঙ্গা বাহি যায়ে॥"(দ্বিজ মাধব/২০৩)

ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের আশীর্বাদ লাভ ফলদায়ক, তাই খুল্লনা বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পাদ্যার্ঘ্য দান করে এবং ব্রাহ্মণ তাকে আশীর্বাদ করে—

"খুলুনার হাতে জল পণ্ডিতকে দিল।
আগে জল থুইয়া রামা প্রনাম হইল।
পুত্রবধূ বলি পণ্ডিত আশীর্ব্বাদ দিল॥ (মানিক/১৯৯)

খুল্লনা-ধনপতির বিবাহের পর রম্ভাবতী কন্যা জামাতাকে আশীর্বাদ করেছিল। গুরুজনদের প্রণাম করাও বাঙালী সমাজের বিশেষ রীতি, তাইতো ধনপতি বিদায় কালে শ্বশুরকে প্রণাম করেছে।

দেবতার অর্ঘ্য দেওয়া পুষ্প, দূর্বা, ধান এসবের অসম্ভব শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করা হত। মঙ্গলকাব্যে 'অষ্টম' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ আর দেবী চণ্ডীর অর্ঘ্য 'অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল' শক্তিশালী এবং অসম্ভব সাধন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হত। তাই শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রাকালে 'অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল' সঙ্গে দিতে ভোলেনি জননী খুল্লনা-

"হের ধর অষ্ট-দুর্ব্বা মোর স্থানে নেঅ।
আপনে বুঝাইয়া তুহ্মি ছিরা স্থানে দেঅ॥
যখনে দেখয়ে ছিরা বিপদ অপার।
এহা শিরে করি স্মরণ কবির আমারে॥
. . . .
পুত্র বুঝাইতে রামা করিলা গমন॥
অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল দিয়া বুঝাইয়া বোলে।
বিপদে ভাবিয় দুর্গা এহা লইয়া শিরে॥" (দ্বিজ মাধব/২২৮)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও মায়ের কথায় শ্রীমন্ত অষ্ট-দুর্ব্বা তণ্ডুল পাগে বেঁধে নিয়েছে—

"মায়ের বচনে সাধু হইয়া তরাতরি।
শিরপাগে অষ্ট দুর্ব্বা বান্ধে ভিড়ি ভিড়ি॥
মাএরে সান্তাএ শিশু হইয়া যুগপাণি।
প্রণতি করিল আর বিমাতা জননী॥" (দ্বিজ রামদেব/৩২৪)

বাঙালী সমাজে পিতামাতা দেবতুল্য তাইতো পিতামাতার আশীর্বাদ কাম্য। পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা সন্তানের কর্তব্য, হিন্দুশাস্ত্রের এই বিশ্বাস বাঙালী সমাজে বিশেষভাবে মান্য করা হত—

"পিতা স্বর্গ পিতা মর্থ পিতা সকল তীর্থ
পিতা বিনে জীবন বিফল॥" (মানিক/২৮৮)

ঠিক একই ভাবে হিন্দু বাঙালী নারীর কাছে স্বামী গুরুজন এবং সুখ-মোক্ষ দাতা— এজাতীয় বিশ্বাসে বাঙালী নারী প্রতিপালিত ছিল।

আশীর্বাদের বিপরীতে অভিশাপের প্রতিও বিশ্বাস বাঙালীর সহজাত। মঙ্গলকাব্যের দেবতাগণ অভিশাপ দিয়ে দেবসভার নর্তকী বা অপ্সর-অপ্সরীদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাত। বাঙালী বিশ্বাস করত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ এক অভিশাপের ফল। ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবের অভিশাপে পৃথিবীতে ব্যাধ রূপে জন্মগ্রহণ করে। ক্রুদ্ধ শিব পার্বতীকে জানায় যে নীলাম্বরকে রক্ষা করতে চাইলে সে তাকেই অভিশাপ দিবে—

"নীলাম্বর রাখিবারে যে কহিব মোরে।
নীলাম্বর এড়ি আজি শাপ দিমু তারে॥(দ্বিজ মাধব/৩২)

সুতরাং নীলাম্বরের প্রতি অমোঘভাবে নেমে আসে অভিশাপ—

"করিলাম লঘু পাপ দিলা নিদারুণ শাপ
ব্যাধ কুলে জনম নিশ্চয়॥" (মুকুন্দ/৩২)[৭৪]

সমাজে সতীত্বের মূল্য ছিল। সতীত্বও একটি সংস্কার মাত্র, সতী নারী সমাজে বন্দিত ও অসতীরা নিন্দিত হত। আমরা দেখি ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডীকে বিতারিত করার জন্য ফুল্লরা সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিয়ে ছিল। আমরা জানি রামায়ণে সীতার সতীত্ব পরীক্ষাদানের প্রসঙ্গ আছে। মঙ্গলকাব্যেও সতীত্ব পরীক্ষার প্রশ্ন এসেছে। খুল্লনাকে সমাজের চাপে বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ দিতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তার সতীত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

পুরুষের পক্ষে পুত্রসন্তান আবশ্যক; পুত্রসন্তান না থাকলে নরকবাস হয়, পরকালে পিণ্ড-জল দানের কেউ থাকে না এরকম সংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল। পুরুষের এক স্ত্রীর পুত্রসন্তান থাকলে সকলের মুক্তি লাভ সম্ভব; শুধু তাই নয়, ভাগ্যবান পুরুষই বহুবিবাহ করে থাকে বলে বিশ্বাস ছিল, তাই সন্তান লাভের জন্য বহুবিবাহ করা হত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান যার পতি
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী সবার উত্তম গতি
সাতিনের পুত্র নহে ভিন॥
বিভা কৈনু পুত্রহেতু স্বর্গ পাইতে ধর্ম্মসেতু
পরলোকে জল-পিণ্ড-দাতা।
যার যত উপচার পুত্র বিনা অন্ধকার
নরকে নাহিক পরিত্রাতা॥" (ঐ/১৪৩)[৭৫]

অপুত্রক ব্যক্তি (আঁটকুড়া) সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তার মুখ দেখা অশুভ বলে বিবেচিত হত—

"অপুত্রক যার গারী তার ধনে রাজা বৈরী
পরে লয় আবাস নিবাস।
লোকে নাহি দেখে মুখ এই ত পরম শোক
প্রথম বাসরে উপবাস॥" (ঐ)[৭৬]

আবার বাঁজা, অপুত্রক বা সন্তানহীনা নারীরাও সমাজে নিন্দনীয় ছিল, তাই ধনপতি লহনাকে তিরস্কার করে বলে-

"তুই পাপমতি বাঁঝি হইলি অযশভাজী
কহ মোরে কেমন উপায়।" (ঐ)[৭৭]

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস ছিল, যেমন— ভাশুর-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক নিয়ে, স্বামীর নাম না ধরা, জামাইয়ের সামনে শ্বাশুড়ীর ঘোমটা দেওয়া ইত্যাদি। বিধবার আমিষ ভোজন সামাজিক মতে নিষিদ্ধ ছিল। ধনপতির মৃত্যুর কথা প্রচারের পরও খুল্লনা এয়োতি ধারণ করেছে, মাছ খেয়েছে, তাই শ্রীমন্তের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বলেছে—

"মরে গেল ধনপতি শুনি বহুদিন।
মায়ের আয়তি হাতে আমিষ ভোজন॥" (ঐ/১৭২)[৭৮]

এয়োস্ত্রীর হাতে শাঁখা ও সিঁথিতে সিন্দুর ধারণ সামাজিক সংস্কার, তাই লহনা খুল্লনার সব খুলে নিলেও হাতের শাঁখা খুলে নিতে পারেনি—

"দুই গাছি শঙ্খ মাত্র দুই করে থুইয়া।

বিশেষ ছাগল তুহ্মি লওত গণিয়া ॥" (দ্বিজ মাধব/১৩৭)

বৈশাখ মাসে বাঙালী বর্ণহিন্দুরা নিরামিষ ভোজন করত, এটি একটি সংস্কার, তাই ফুল্লরার আক্ষেপ—

"বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥"(মুকুন্দ/৫৪)[৭৯]

শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি বাঙালী সমাজে শুভকর্ম বলে সূচিত হত। শুভকর্ম উপলক্ষে নারীগণ শঙ্খধ্বনি করত,উলুধ্বনি দিত। ধান, দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার প্রথাও প্রাচীন, বাঙালী সমাজে তা পালিত হত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই সমস্ত সংস্কার বিশ্বাসের কথা আছে।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল— তুক্‌তাক্‌, ঝাড়ফুঁক, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, তান্ত্রিকতা, অলৌকিকতার প্রতি এক জাতীয় সহজাত বিশ্বাস ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর চিত্র আছে। অলৌকিক ঘটনাগুলি সামাজিক ইতিহাসের বিষয় নয় কিন্তু বাঙালী চরিত্রের বিশেষত্ব হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। দৈববাদী বাঙালী চমৎকারিত্বে আত্মতৃপ্তি পেত, তাই মঙ্গলকাব্যে এসবের প্রতি কবির আনুগত্য দেখি। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে নিমগাছে ওড় পুষ্প দেখে মুগ্ধ হয়, তীর্থের মহিমা তার মনে সঞ্চারিত হয়—

"নিমাই দত্তের ঘাটে গেল সাধুর নন্দন।
নিম গাছে ওড় পুষ্প অপূর্ব্বলক্ষণ ॥" (দ্বিজ মাধব/২০৪)

ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যে আমরা কনিষ্ঠের বা কনিষ্ঠার অলৌকিক ক্ষমতা দেখি। খুলনা (ধনপতির কনিষ্ঠা স্ত্রী) দেবীর কৃপায় অসাধ্য সাধন করে সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সতীত্বের মহিমায় আগুন শীতল চন্দনে পরিণত হয়। তাই কবি লিখেছেন—

"খুল্লনার হাতে অগ্নি তুষারশীতলে।" (মুকুন্দ/১৪৭)[৮০]

মারণ-উচাটন-বশীকরণ এগুলিও এককেটি লোকায়ত করণ-প্রক্রিয়া; কন্যার বিবাহে বাঙালী জননীগণ অনাগত আশঙ্কায় জামাতা বশীকরণের ঔষধ করত। আবার স্ত্রীরাও স্বামী বশীকরণের জন্য ঔষধ করত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখি খুল্লনার জননী মালিনী-তেলিনী সইয়ের পরামর্শে জামাতা বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহ করেছে। তার উপকরণ এরকম—

"আইসানি চাউলানি চিলের ভাষার খড়ি
আর খুলুনার চুলের তেলে।
চাপা কলাত করি জামাইকে খাওয়াইলে
ভালবাসিবে চিরতকালে ॥" (মানিক /২০৩)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখি ধনপতি পিঞ্জর আনয়নার্থ গৌড়ে গমন করলে লহনা সই ব্রাহ্মণীর পরামর্শে সপত্নী বিতারণের ঔষধ করতে উদ্যত হয়, এর মধ্যে লৌকিক বিশ্বাস ও ক্রিয়া প্রকাশিত। তার পদ্ধতি নিম্নরূপ—

"অমাবস্যা মঙ্গলবারে পূর্ণবেলা দুই প্রহরে
কালা কুকুরী মারিমু।
. . . .
উড়াইয়া দিমু তাইরে রহিতে নারিব ঘরে
সতিনীর ঘুচাইমু ঝগড়া ॥ "(দ্বিজ মাধব/১৩৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে আমরা একইভাবে ঔষধীকরণ দেখি। যেমন খুলনার বিবাহে জামাতা বশীকরণের ঔষধীকরণ নিম্মরূপ—

"কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।

দূর্গার প্রদীপ পুঁতে রেখেছিল চেড়ী॥
সাধুর কপালে যাবে দিব পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাকবিন্ধা পশু॥
আনিল পাকড়ি ডাল হাঁই আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে মধ্য রাতি॥
সাপের আঁটুলি আনে খুঁজে বেদের ঘরে।
কই মৎস্য-পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে॥
কাপাসের ক্ষেত হৈতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইয়া রবে সাধু তায় দুই দণ্ড॥
খুল্লনা করয়ে যদি সাধুর অপমান ।
মৌনে রবে সাধু যেন গোমুণ্ড সমান॥"(মুকুন্দ/৯৯-১০০)[৮১]

লীলাবতীর পরামর্শে লহনা স্বামী বশীকরণ এবং সতীন বিতাড়ানের ঔষধ করে—

"পত্রিকার কলাগাছ রোপিয়া অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে রাত্রি দিনে॥
. . . .
ঔষধ প্রবন্ধে কহে মুকুন্দ বিশারদ।
বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥" (ঐ/১০৮-১০৯)[৮২]

বস্তুত বাঙালী সমাজের নারীপুরুষরা এই সমস্ত তুক্-কর্মে সিদ্ধ হস্ত ছিল, মুকুন্দ চক্রবর্তী নিজেও বোধ হয় নানান ঔষধীকরণ জানতেন। শুধু কি তাই, অপুত্রবতীর সন্তান ধারণের জন্য ঔষধীকরণ হত। আমরা দেখি নিঃসন্তান নিদয়াকে ভগবতী সন্তান ধারণের ঔষধ দিয়েছে—

"শুনহ নিদয়া তুমি ঔষধ জানি আমি
মিথ্যা নহে বচন আমার।
স্নান করহ তুমি ঔষধ দিব আমি
বংশধর হইবে তোমার॥" (ঐ/৩৪)[৮৩]

মারণ-বশীকরণ-ঔষধীকরণ ছাড়া জলপড়া, তেলপড়া, ধুলোপড়া, হাত চালনা, বাটি চালনা, সাপের বিষঝাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার করণ-প্রক্রিয়া মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে ছিল।বিভিন্ন কবির কাব্যে উল্লিখিত সংস্কার-বিশ্বাসের ক্ষেত্র থেকে আমরা দেখি সমগ্র বাংলাদেশের জনসমাজ একই রূপ সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল, তবে কবিদের অঞ্চল ভেদে বা কাল ভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ এক স্থানে যা শুভ দ্যোতক অন্যত্র তা অশুভ আবার এক স্থানে যা অশুভ অন্যত্র শুভকর ছিল।তন্ত্র-মন্ত্র, ঔষধীকরণ বা বশীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কবিই ঔষধীকরণ বা তুক্তাক্ রীতি বর্ণনা করেছেন তবে তার ভিতরে একটা পার্থক্য আছে অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চল বা কালভেদে বিভিন্ন রকম করণ-প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। অন্যভাবে বলা যায় সমাজ বিবর্তনের ধারায় সকল লোকাচার বা বিশ্বাস-সংস্কারই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত করণ-প্রক্রিয়া ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে সমাজের অভ্যন্তরীণ গঠন ধরা যায়। যে সমাজে জটিলতা নেই কিংবা যেখানে বাধা নেই সেখানে এসমস্ত করণ-প্রক্রিয়া নিস্প্রয়োজন ছিল। কালকেতুর ব্যাধ সমাজ সরল বিশ্বাসী, তাই কালকেতুর বিবাহে ফুল্লরার জননী ঔষধীকরণের প্রয়োজন বোধ করেনি। আবার শ্রীমন্তের বিবাহে আমরা ঔষধীকরণের কথা পাইনি, কারণ শ্রীমন্ত পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং তার উপর দেবীর আশীর্বাদ পুষ্ঠ।

অতঃপর আসা যাক্ আচার-বিচারগত বা অনুষ্ঠানগত ঐতিহ্যের কথায়। বাঙালী সমাজ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান লোকাচারে আচ্ছন্ন ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ আপন অঞ্চলের লোকাচার, যথা— নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত লোকাচার, প্রসূতির গর্ভকালীন লোকাচার, বিবাহকালীন লোকাচার এবং মৃত্যুকালীন লোকাচারসমূহ নিজ নিজ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রথমে আমরা আসি প্রসূতির প্রসবকালীন সংস্কারের কথায়। প্রসবের পূর্বে প্রসূতিকে নিয়ে কতকগুলি আচার পালিত হত, যেমন— পঞ্চামৃত ভক্ষণ ও সাধভক্ষণ। এই অনুষ্ঠানে প্রসূতির পাঁচ মাস গর্ভকালে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করানো হত, তবে উল্লেখযোগ্য আচার হল সাধভক্ষণ। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির সাধ অনুযায়ী পরিতোষপূর্বক আহার করানোই সাধভক্ষণ । এই আচারে সাধ্য অনুসারে সাধ পূরণ করা এবং সেই সঙ্গে প্রসূতিকে নানা উপহার দেওয়া হত। সাধারণত সাত মাস গর্ভকালীন অবস্থায় প্রসূতিকে সাধভক্ষণ করানো হত। মানিক দত্তের কাব্যে পাই—

"ছয়মাসের গর্ভ রামা বাড়িল তখন।
সপ্তমাসে সাধ খায় খুলুনা নারিগণ॥"(মানিক /২৮২)

এর পরেই খুল্লনার সাধ অনুযায়ী কি কি আহার করানো হল তার বিবরণ আছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'খুল্লনার সাধভক্ষণের ইচ্ছা' অংশে তার সাধের বিবরণ পাই—

"লহনা দিদি ল নিবেদহু তুয়া পায়ে।
সাধ খাইতে ইচ্ছা হইছে আম্মায়ে॥
পাকা চোলঙ্গ পাম যদি।
কামরাঙ্গা খাউ নিরবধি॥
অখনে পাম পাকা বদরী।
হেন ইচ্ছা বদনেতে পূরি॥
দ্বিজ মাধবে রস গায়ে।
সাধের শাক তুলিতে দুবা যায়॥" (দ্বিজ মাধব/২১৩)

কবিকঙ্কণের কাব্যে নিদয়ার সাধভক্ষণ ও খুল্লনার সাধভক্ষণের কথা আছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী অনেকক্ষেত্রেই ব্যাধ সমাজের কথা বলতে গিয়ে নিজ সমাজ বাস্তবতার চিত্র এঁকেছেন। দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও খুল্লনার সাধভক্ষণের চিত্র আছে—

"খুলনাএ বোলে দিদি কি বলিমু আর।
সদাএ খাইতে শ্রদ্ধা অমূল্য দ্রৈর্ব্ব সার॥
লহনাএ বুঝিলেক সতার ইঙ্গিত।
শাক আনিতে দুবা পাঠাএ তুরিত॥" (রামদেব/২৮৯)

সাধভক্ষণের কথা বলতে গিয়ে কবিগণ বিস্তৃত খাদ্য তালিকা তুলে ধরেছেন। সামাজিক ইতিহাসে. সাধভক্ষণ অংশের গুরুত্ব এই, এর মধ্যে সেকালের খাদ্য তালিকার বিস্তৃত বিবরণ পাই। আমিষ-নিরামিষ, পিঠা পায়েস এমন কি বিভিন্ন প্রকার শাকের বিবরণও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। সাধভক্ষণে শাক বোধ হয় অত্যন্ত আবশ্যক ছিল, তাই মুকুন্দ চক্রবর্তী ছাড়া সকল কবিই দুর্বলার শাক তোলার বিবরণ দিয়েছেন। তা থেকে কত বিচিত্র শাক খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত তার বিবরণ পাওয়া যায়। লক্ষণীয় বিষয়, শাকগুলি কিন্তু গ্রামের আনাচ-কানাচ থেকে সংগ্রহ করা। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়. কবিকঙ্কণ নিদয়ার সাধভক্ষণের চিত্র তুলে ধরেছেন, কিন্তু আর কোন কবিই নিদয়ার সাধভক্ষণের কথা বলেননি। মনে হয় ব্যাধ-অন্ত্যজ সমাজে সাধভক্ষণের মত ঘরোয়া অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না। এখানে কবিকঙ্কণ যে বিস্তৃত খাদ্য তালিকা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ধর্মকেতুর মত দরিদ্র ব্যাধের পক্ষে তা সংগ্রহ

করা সম্ভব ছিল না; সুতরাং ঐ চিত্র ব্যাধ সমাজের বাস্তব চিত্র নয়, ব্যাধ সমাজের ইতিহাসের উপকরণ নয়। নবজাতকের জন্মের পরও বিভিন্ন রকম আচার পালিত হত এবং আচারগুলি হল ক্রমান্বয়ে— নাড়িকা ছেদন, পাঁচ দিনে পাঁচুটা, ছয় দিনে ষেটেরা, আট দিনে আটকলাই, নয় দিনে নত্তা, একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি। শ্রীমন্তের জন্মকালে এবং জন্মের পর ক্রমান্বয়ে যে অনুষ্ঠান আচার পালন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ—

"সুবন্ন কাটারি দিয়া নাড়ি ছেদ কৈল।
ব্রহ্মা হুতাশন দিয়া পবিত্র করিল।" (মানিক/২৮৫)

এবং তারপর—

"তিনদিনের ছ্যালা ধূল বাড়াইল॥
পঞ্চ দিনের ছ্যাল্যা পাচটি করিল।
পুত্র কোলে করি খুলনা দুয়ারে বসিল॥
ষষ্ঠী পূজিতে জদি খুলনা নড়িল।
আইহগণ আসি তথা জয়ধ্বনি দিল॥
. . . .
একমাসের হৈল জদি সাধুর নন্দন।
তবে তারে করাইল ই নামকরণ॥
. . . .
ক্ষেনে হাসে ক্ষেনে কান্দে সাধুর নন্দন।
ছয়মাসে হৈল তার অন্ন পরাশন॥" (ঐ/২৮৫-২৮৬)

ধনপতি ও খুল্লনার জন্মকালেও একই ধরনের আচার পালিত হয়। এর পরবর্তী স্তরে নবজাতকের পাঁচ বছর বয়সে চূড়াকরণ ও হাতেখড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠান হত। যেমন —

"পঞ্চ বৎসরের কালে কৈল চূড়াকরণ।"(ঐ/১৮১)

কিংবা, শ্রীমন্তের বাল্যকালে—

"শুভক্ষণ গণিঞা ছাল্যাকে দিল খড়ি।" (ঐ/২৮৬)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতির জন্মকালেও অনুরূপ আচার পালন করা হয়। তবে দ্বিজ মাধবের কাব্যে আচারসমূহ অপেক্ষাকৃত স্বল্প। দেশাচার ভিন্ন দেশে ভিন্ন হয়, তাই দ্বিজ মাধবের কাব্যে আচার একটু পৃথক এবং স্বল্প—

"ছয় দিনে পূজা কৈল ষষ্ঠী দেবতারে।
ছয় মাস আসিয়া হইল উপনীতি।
অন্ন দিয়া পুত্রের নাম থুইল ধনপতি ॥
. . . .
পঞ্চম বরিষ হইল সাধুর নন্দন।
কর্ণ বেধ করাইল চূড়াকরণ॥" (দ্বিজ মাধব/১১৫-১১৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যেও আমরা ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে পালিত আচার পাই। যেমন খুল্লনার জন্মকালে পালিত আচারসমূহের বিবরণ—

"হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাঁচন॥
ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা কৈল জাগরণে।

অষ্ট-কলাই তারপর কৈল অষ্ট দিনে॥
নত্তা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥
খুল্লনা থুইল নাম পরিপূর্ণ মাসে।
. . . .
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ রামা দিবসে দিবসে॥" (মুকুন্দ/৯২)[৮৪]

নবজাতকের জন্মকালে বাঙালী সমাজে প্রসূতিকে আঁতুর ঘরে রাখা হত। সন্তানের মঙ্গল কামনায় এবং কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেখানে আগুন জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হত এবং দুয়ারে গোমুণ্ড স্থাপন করা হত-

"চালের ফাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।
গোমুণ্ড দুয়ারে আনি পূজে ষষ্ঠীবুড়ী॥"(ঐ)[৮৫]

ব্যাধ সমাজের আচার-বিচার বর্ণনা করতে গিয়ে নবজাতকের জন্মকালে পালিত সংস্কার-সমূহের বিবরণও কবিগণ দিয়েছেন।কালকেতুর জন্মকালে পালিত আচারসূমহ বিভিন্ন কবির কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের সমাজে পালিত আচারসমূহের কোন পার্থক্য নেই, তবে অনেকক্ষেত্রেই পালিত আচারসমূহ সংক্ষিপ্ত।

যৌবনকালে পালিত আচারসমূহের মধ্যে প্রধান বিবাহকালীন আচার। বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে কতকগুলি আচারের মধ্যে দিয়ে পালিত হত, যেমন— গায়েহলুদ, অধিবাস, মঙ্গলসূত্র বন্ধন, নান্দীমুখ, ক্ষৌরকর্ম, জামাতা বরণ, সাতপাক, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান, বাসর-যাপন, শয্যাতুলুনি, বাসিবিয়ে, কনে বিদায়, বধূবরণ, কালরাত্রি, ফুলশয্যা, ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যে সকল স্তরের আনুপূর্বিক বর্ণনা না থাকলে উল্লিখিত আচারসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। অঞ্চল ভেদে বিবাহাচারে যে ভিন্নতা ছিল চণ্ডীমঙ্গলের তিন প্রধান কবির বর্ণনা থেকে তা বোঝা যাবে।

মানিক দত্তের কাব্যে বিবাহাচার শুরু হয়েছে 'জলসওয়া' নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে—

"জায় রম্ভা জল সাধিবারে।
জল সাধে প্রতি ঘরে ঘরে।" (মানিক/২০৬)

এবং সেই সঙ্গে পান-সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রণ করার রীতি পালিত হত। বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হলে তাকে পাদ্যার্ঘ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হত। ছায়ামণ্ডপে বর-কনেকে নিয়ে প্রথমে 'সাতপাক' পরে ক্রমান্বয়ে স্ত্রীআচারসমূহ পালিত হত। যেমন—

"হেটমুণ্ড হইয়া রামা খুলুনা বারাইল।
স্বামীকে বেড়িয়া রামা সপ্তপাক দিল॥
হরিধ্বনি দিঞা মালা গলে তুলি দিল।" (ঐ/২০৯)

এরপর কন্যা সম্প্রদানের পূর্বে জামাতাকে নানান দ্রব্য উপহার দেওয়ার রীতি এবং শেষে কন্যা সম্প্রদান ও বাসরযাপন করা হত। পরদিন এয়োদের নানা রকম স্ত্রীআচার পালন করার পর বর-কন্যাকে বিদায় দেওয়া হত। নববধূকে শ্বশুর বাড়ীতে বরণ করে নেওয়া হত এবং জ্ঞাতি ভোজনের মধ্যে দিয়ে বিবাহ শেষ হত—

"সকলিকে ধনপতি ভোজন করাইঞা।
বিদায় দিলেন সাধু পুরস্কার দিয়া॥"(ঐ/২১২)

দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে পূর্ববঙ্গীয় বিবাহাচার দেখা যায়। এখানে 'অধিবাস' নামক আচারের মধ্যে দিয়ে বিবাহের সূত্রপাত—

"উজানীর সমাচার পাইয়া সদাগর।

শুভক্ষণে অধিবাস কৈল্ল খুলনার॥"(দ্বিজ মাধব/১২৩)

তারপর নারীরা জলসইত এবং নানা রকম স্ত্রীআচার পালন করত। কলাগাছ পুঁতে ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হত। ছায়ামণ্ডপের নিকট পুকুর কেটে হল জলপূর্ণ করা হত। তারপর নানা রকম ঔষধ, হলুদ, চন্দন একত্রিত করে গায়ে মাখানো হত এবং শেষে এয়োগণ জল ঢেলে বর বা কনেকে স্নান করিয়ে দিত। এরপর কনে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে থাকত আর বর বরযাত্রী নিয়ে কন্যাগৃহে উপস্থিত হত। যেমন—

"মঙ্গল পোখরী কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ।

রামকদলী তরু রুয়িল চারি কোণ॥"

. . . .

খুলনা লইয়া তবে যথ বন্ধুগণ।

বিবাহের বেশ সবে করায়ে তখন॥ (ঐ/১২৪-১২৫)

এদিকে কনের পিতা ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা দান ও নান্দীমুখ সমাপন করত। বর কন্যাগৃহে উপনীত হলে পাদ্যার্ঘ দিয়ে, বস্ত্রালঙ্কার দিয়ে বরণ করে নেওয়া হত। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করা হত। বিবাহ শেষে অগ্নিপূজা বা হোম এবং বাসরযাপন, পরদিন কন্যা বিদায়। এ ভাবে একটি পরিপূর্ণ আচার শেষ হত—

"সম্প্রদানের বাক্য সাধু উচ্চারে বদনে।

. . . .

নিজ গৃহে আসিবারে করিল মেলানি।

মায়ের অঞ্চলে ধরি কান্দয়ে খুলনী॥ (ঐ/১৩০)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে বিবাহরীতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে 'অধিবাস' নামক আচার পালিত হত। মুকুন্দ চক্রবর্তী অধিবাসের প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং অধিবাস পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা দান, নান্দীমুখ ইত্যাদি—

"ঘৃত দিয়া সাত ডোরা   কাঁথে দিল বসুধারা

কৈল নান্দীমুখের বিধান।" (মুকুন্দ/৯৯)[৮৬]

কন্যাগৃহে বর ও বরযাত্রীদের আগমন হলে বরের দুয়ার ধরা হত, যেমন—

"দুই দলে ঠেলাঠেলি চুলাচুলি গালাগালি

বরাত দেউড়ি নাহি ছাড়ে।" (ঐ/১০০)[৮৭]

কবিকঙ্কণের কাব্যে কনের মাতা সুতা দিয়ে বরের অধর ও হাত পরিমাপ করে এবং সেই সুতা সাত ফের করে কনের আঁচলে বেঁধে দেয়, যাতে বর কনের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ে এবং বশীভূত থাকে। এদিকে স্ত্রীআচারসমূহ পালিত হত এবং কনের পিতা যথারীতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করত। সেই দিন রাত্রে বাসরযাপন ও পরদিন শয্যাতুলুনি—

"শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিলা ধনপতি॥

শয্যাতোলা কড়ি চাহে পরিহাস্য জন।" (ঐ/১০১)[৮৮]

এর পরের দিনের অনুষ্ঠানের শেষে নানান মঙ্গলবাদ্য বাজনের মধ্যে দিয়ে বর-কনেকে নানান দ্রব্য উপহার দিয়ে বিদায় দেওয়া হত। এদিকে জ্ঞাতি ভোজনের মধ্যে দিয়ে বিবাহ শেষ হত—

"যৌতুক দিলেন রত্ন বস্ত্র বন্ধুগণ।

নানা উপচারে সাধু করায় ভোজন॥"(ঐ/১০১)"

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও অনুরূপ আচারসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল ধনপতি খুল্লনার 'পুনর্বিবাহ'। যুবতী খুলনা পথেঘাটে ছাগল চরাবার জন্য কলঙ্ক রটে, গ্রামীণ সমাজে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য খুল্লনার 'পুনর্বিবাহ' হয়—

"মহোৎসবে গেল যদি দিন পঞ্চদশ।

পুনর্বিবাহ করিবারে সাধু হইল রস॥" (দ্বিজ রামদেব/২২৯)

মঙ্গলকাব্যের কবি 'ব্যাধখণ্ডে' কালকেতুর বিবাহ প্রসঙ্গে বিবাহাচারের বর্ণনা করেছেন—

"কালকেতুর অধিবাস বাদ্যি বাজে রাইবাশ

বাদ্য বাজে দামা দগড়া।

. . . .

তাম্বুল অভাবে তেত্তার ছাল দিল

পদে ২ করিয়া জিজ্ঞাসা।" (মানিক/৬৬)

এই বর্ণনা ব্যাধ সমাজের বাস্তবতাকে বহন করে। কবিকঙ্কণ কালকেতুর বিবাহাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের অনুরূপ, এই বর্ণনা কিন্তু ব্যাধ ঘরের বিবাহের বর্ণনা নয়। আবার দ্বিজ রামদেব কাব্যে কালকেতুর বিবাহাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ব্যাধ সমাজের অভিজ্ঞতা বহন করে—

"বিবাহ নির্ব্বন্ধ দিন কৈল বুধবার।

ব্যাধপত্নীসবে করে উৎসব আচার॥

ইটাল সিন্দূর আনি ঘসি দিল শিরে।

পঞ্চ জন তুষ্ট করে এক এক বারে॥

. . . .

জ্ঞাতির ভোজন হেতু গেল অর্দ্ধ রাত্রি।

পরিণয় করে কেতু ফুলরা যুবতী॥"(রামদেব/৫১)

মুকুন্দ চক্রবর্তী ছাড়া অন্যান্য কবিদের কালকেতুর বিবাহাচার বর্ণনা সমাজ বাস্তবতাকে বহন করেছে।

মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে বিবাহ উপলক্ষে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাছাড়াও বর-কনেকে নানান দ্রব্য উপহার দেওয়া হত। মানিক দত্তের কাব্যে পাই ধনপতির বিবাহে কি কি যৌতুক দেওয়া হয়েছিল—

"জামাতাকে দিল দান রজত কাঞ্চন।

মণিমুক্তা প্রবাল দিল বহুমূল্য ধন॥"(মানিক/২১০)

শ্রীমন্তের বিবাহে সিংহলরাজ কন্যাকে নানা দ্রব্য যৌতুক দিয়েছিল, যেমন—

"সুশীলা কন্যারে দিল অর্দ্ধরাজ্য ধন।

ধবল চামর দিল বিচিত্র পাটন॥

. . . .

দুই শত হস্তী দিল বৎসসহিত॥" (দ্বিজ মাধব/২৮৩)

সেকালে জামাতাকে কন্যার সহিত দাসী উপহার দেবার প্রথাও ছিল—

"সুশীলা-সেবনহেতু পরম রূপসী।

রত্নে বিভূষিত দিল দুই শত দাসী॥" (ঐ)

কবিকঙ্কণের কাব্যেও জামাতা ধনপতিকে যৌতুক দেওয়া হয়েছে বহুমূল্য সম্পদ—

"নানা রত্নে জামাতার কৈল পুরস্কার।

দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার॥" (মুকুন্দ/১০১)[১০]

উচ্চবর্ণের সমাজের মত ব্যাধ সমাজেও দান ও যৌতুক প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে দানের বিষয় ছিল অতি সামান্য। মানিক দত্তের কাব্যে কালকেতুর বিবাহে দান দেওয়া হয়েছে 'দেড় বুড়ি কড়ি', 'ছিড়া কাল দড়ি', 'শুকতের টোনা', আর কিছু কাঁসা-পিতল। দ্বিজ মাধবের কাব্যে পণ নিয়ে পাত্র ও পাত্রী পক্ষকে দরাদরি করতে দেখা যায়, কিন্তু পণ অতি যৎসামান্য ছিল—

"পণ নিয়ম করি তুহ্মি যাহ ঘর।

সর্ব্বথায়ে দিব বিহা আন গিয়া বর॥

. . . .

ধর্ম্মকেতু বোলে সখা করি দরাদরি।

একখান খঞ্জিয়া দিমু কড়ি নয় বুড়ী॥" (দ্বিজ মাধব/৩৮)

তাছাড়া বিবাহে কালকেতুকে দানে দেওয়া হয়েছিল—

"ভাঙ্গা নারিকেল দিল পুরান ধনুখান।

বসিবারে মৃগচর্ম্ম দিল বিদ্যমান॥" (ঐ/৩৯)

দানের মত বিবাহের উপচারও যৎসামান্য এবং এতে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান—

"গণ্ডা তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে॥

. . . .

চা'র কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন।

তিন কড়ার মরিচ কিনে দুই কড়ার নুন॥"(ঐ/৩৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যেও দেখি পণ নিয়ে দরাদরি করতে—

"পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।

ঘটকালি ওঝা তুমি পাবে বার পোণ।

পাঁচ গণ্ডা গুয়া পাবে গুড় দুই সের।

ইহা দিলে আর কিছু না করিও ফের ॥"(মুকুন্দ/৩৭)[১১]

আর যৌতুক হিসাবে দেওয়া হয়েছিল—

"যৌতুক ধনুক খান তিন তীর খরশাণ

আরো দিল যে ছিল বিধান॥" (ঐ/৩৮)[১২]

বাঙালীর বিবাহে ঘটক-প্রথা প্রচলিত ছিল, ঘটক হল বিবাহের যোজক। ঘটকের দ্বারা দুই পক্ষ একত্রিত হয়ে বিবাহ সংঘটিত হত।কালকেতুর বিবাহে ঘটক হল সোমাই ওঝা। ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে ঘটক জনাই পণ্ডিত। ধনপতি জনাই পণ্ডিতকে ঘটক করে খুল্লনার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে ছিল—

"জনাই পণ্ডিত সাথে করিয়া বিচার।

বলে সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার॥

এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।

ত্বরা করি গেল লক্ষপতির সদন॥"(ঐ/৯৪)[১৩]

সমাজে এই ঘটকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এই ঘটকরা পাত্রপাত্রী উভয় পক্ষ থেকে অর্থ পেত। ব্যাধ সমাজেও ঘটক সোমাই ওঝা বিবাহের যোজক হিসাবে কাজ করার বিনিময়ে অর্থ পেয়েছে। বিবাহের পূর্বে পাত্রপক্ষ কন্যা

দর্শনে যেত এবং শেষে কন্যাকে 'দর্শনী' দেওয়া হত—

"গোলহাটে পণ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যার দর্শনী দিয়া করিল লগন॥" (ঐ/৩৭)[১৪]

মধ্যযুগে রজঃস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ দেওয়ার নিয়ম ছিল এবং অবিবাহিত কন্যা সম্পর্কে স্মৃতিশাসিত সমাজে নানা বিধি প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ্যশাসিত কুলীন সমাজের বিধি অনুসারে অষ্টম বৎসরে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত। মানিক দত্তের বর্ণনায়—

"ক্রোধ হৈয়া পণ্ডিত বলে রম্ভাবতীর তরে।
অষ্ট বৎসরের কন্যা বৈসে তোমার ঘরে॥
. . . .
সাত বৎসরের হৈলে ছুত হয়ে নারী।
দশ বৎসরের হৈলে পূর্ন কুমারী॥
এগার বৎসর হৈলে চঞ্চল হয়ে চিত।
বার বৎসর হৈলে পুষ্প বিগশিত॥
তোমার খুলুনা হৈল সপ্ত বৎসরে।
এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে॥"(মানিক/১৯৯-২০০)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে বলা হয়েছে নবম বৎসরের কন্যার বিবাহ দিলে ধর্ম-কুল সবরক্ষা পায়, না হলে নরকবাস হয়। সমাজে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল—

"বার বৎসরের সুতা তব ঘরে অবস্থিতা
কেমনে আছহ সুস্থমতি।
সপ্তম বৎসরের কন্যা বিয়া দিলে হয় ধন্যা।
তার পুত্র কুলের পাবন॥
. . . .
নর দেখি অভিরাম কন্যা যদি করে কাম
পায় পিতা নরকে যন্ত্রণা॥"(মুকুন্দ/৯৫)[১৫]

মৃত্যুতে মানব জীবনের পরিণতি, তাই মৃত্যুর পরও নানান আচার পালিত হত। হিন্দু বাঙালীর মৃত্যুর পর প্রথম আচার হল মৃতদেহ সৎকার করা। বাঙালী হিন্দুরা মৃতদেহ দাহ করে থাকে।কাঠের চিতায় মৃতদেহ শুইয়ে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়ে থাকে, একে বলে 'অগ্নিসংস্কার'।প্রথম অগ্নিসংযোগ করাকে বলে মুখাগ্নি। মৃত্যুর পর অশৌচ পালন করা হত, সাধারণত এক মাসের অশৌচান্তে 'মৃতাকার্য' অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সম্পন্ন করা হত। যেমন ধনপতির পিতার মৃত্যুতে—

"কাল পরিপূর্ন হইল জয়পতি মৈল॥
জ্ঞাতি গোত্র ধনপতি অনিল ডাকিয়া।
মৃতদাহন করে সাধু ভোমরাতে যাইয়া॥
এক মাসে মৃতা কার্য্য সমাধা করিয়া।
গৃহেত বসিল সাধু শোকাকুলি হৈয়া॥" (মানিক /১৮৫)

ব্যাধ সমাজেও মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহকরা হত।

উচ্চবর্ণের কুলীন হিন্দুসমাজে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। সতীদাহ অনার্য-ব্যাধ সমাজেও প্রবেশ করে

গিয়েছিল বোধ হয়, তাই তো দেখি ধর্মকেতুর মৃত্যুর পর নিদয়া সহমরণে গমন করে। স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবাকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে হত্যা করাই সতীদাহ। মধ্যযুগে অনেকক্ষেত্রেই স্ত্রীরা স্বামীর চিতায় ইচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করত—

"কি করিব কোথা যাইব স্থির নহে মতি।
আমিহ পুড়িয়া মরিম প্রভুর সঙ্গতি॥
কংস নদীর তটে আছে বড় রম্য স্থল।
নানা কাষ্ঠ কুড়াইয়া জ্বালিল আনল॥
প্রদক্ষিণে অগ্নি দিল মুখের উপর।
মাও বাপ নমস্কারি বীর আইল ঘর॥" (দ্বিজ মাধব/৪২)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও দেখি কালকেতুর পিতার মৃত্যুর পর তার জননী অনুমৃতা হয়েছে—

"তটিণীর তটে বীর হুতাশন জ্বালি।
পাবকে চড়াইয়া পিতার দেহ দিল তুলি॥
মৃত সহ অনুমৃতা গেল তার মাতা।
লোটাইয়া কান্দে কেতু হাহা মাতা পিতা॥" (দ্বিজ রামদেব/৫৩)

উচ্চবর্ণের সমাজে সতীদাহ আবশ্যিকভাবে পালিত হত। মৃত্যুর পরে যথাশাস্ত্র প্রেতকর্ম ও শ্রাদ্ধাদি করা বিধেয়। শ্রাদ্ধ ও ক্রিয়াকর্মে পুরোহিত আবশ্যক হত। কালকেতু পুরোহিতের ব্যবস্থায় পিতামাতার ক্রিয়াকর্ম, শ্রাদ্ধাদি, তর্পণ সকল-ই সম্পন্ন করে—

"সেই কালে কালকেতু লইয়া পুরোহিত।
জননীজনকের করে ঔর্দ্ধদেহিক॥
প্রেতকর্ম্ম সঙ্কলিআ ব্যাধের নন্দন।
করুণা বিলাপে কান্দে বসিআ তখন॥" (ঐ)

স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্যবিধবার হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির সিন্দুর মুছে দেওয়া হত এবং হাতে আম্রডাল দেওয়া হত। অনুমৃতা হতে ইচ্ছুক নারীকে শেষবারের মত সিন্দুর পরানো হত—

"সুন্দর সিন্দুর ভালে চরুণী কুন্তলজালে।
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল॥"(মুকুন্দ/১৭)[৯৬]

ধর্মকেতুর মৃত্যুর পরেও নিদয়া আম্রডাল ধারণ করেছিল—

"পুত্রের বচনে রামা বাহিরায় তৎকাল।
শোকে ব্যাকুল হ'য়া ভাঙ্গে চূত ডাল॥"(দ্বিজ মাধব/৪২)

হিন্দু বাঙালীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি অত্যন্ত আবশ্যকভাবে পালিত হত। শ্রাদ্ধকর্ম না হলে মৃতের আত্মার সদ্‌গতি হয় না এবং শুধু তাই নয়, তার গৃহে পড়শী, আত্মীয়-কুটুম্বাদি জলগ্রহণ করে না। ধনপতির পিতার মৃত্যু হলে ধনপতির অনুপস্থিতির জন্য এক বৎসর কাল শ্রাদ্ধাদি হয়নি। সুতরাং পুরোহিত এক বৎসর পর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দেয়—

"পিঞ্জর গড়াতে গেলা করিয়া পাশার খেলা
একবর্ষ গোঙাইলে তথা।
বৎসর তোমার বাসে জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আসে
ইথে নাহি কহ কোন কথা।
. . . .

আমি তব পুরোহিত অনুক্ষণ চাহি হিত

পির্তৃকার্য্যে দেহ ভায়া মন।" (মুকুন্দ/১৩৯)[৯৭]

ধনী ব্যাক্তিরা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণ, ভাট, পুরোহিতকে অন্ন, বস্ত্র, সুবর্ণ দান করত এবং জ্ঞাতি ভোজন করিয়ে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হত—

যথাবিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ করি সমাধান

ব্রাহ্মণেরে করে বহুমান।

. . . .

চন্দন কুসুম মালা ভরিয়া কনক থালা

সাধু চলে বান্ধব পূজনে॥" (ঐ/১৪০)[৯৮]

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে সন্ন্যাসী, ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞ, ঘটকদের প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। অদৃষ্টবাদী বাঙালী দৈবজ্ঞের কথা ও গণৎকারের গণনায় বিশ্বাস করত। সাধু-সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করত, ফলে দেখা যায় দেবদেবীরা বারবার ছদ্মবেশ ধারণ করেছে; তারা কখনো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কখনো দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করেছে। সহজ সরল বাঙালীর দুর্বলতর এই বিশ্বাসের দিকটি মঙ্গলকাব্যে আছে।সন্তানের জন্মকালে দৈবজ্ঞ বা গণৎকারেরা ভাগ্য গণনা করত, কোষ্ঠী রচনা করত।সে সবের প্রতিও মানুষের বিশ্বাস ছিল—

"দুর্ব্বলা গণক জনে সম্ভ্রমে ডাকিয়া আনে

দেখে তারা দীপিকা ভাস্বতী।

পুরোধা পণ্ডিত জন অবধানে দেই মন

দেখে তারা শিশুর জাওয়াতি॥"(ঐ/১৬৭)[৯৯]

তাছাড়া যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয় করত দৈবজ্ঞ পণ্ডিত ও গণৎকাররা। স্বর্গের দেবদেবীগণও এই সংস্কারের বাইরে নয়। স্বর্গে দেবী চণ্ডী নানা রকম কু-লক্ষণ দেখে সখী পদ্মাবতীকে গণনা করার নির্দেশ দেয়—

"বিচার করিঞা পাইল নগর উজানি।

সাধুর রমনী পূজে সুন্দর খুলুনি॥"(মানিক /২৬৩)

মশানে শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ করলে দেবীর বাম অঙ্গ কম্পিত হয়, সখী পদ্মাবতী পাঁজি-পোথা নিয়ে খড়ি পেতে গণনা করে জানতে পারে শ্রীমন্ত দেবীকে স্মরণ করেছে—

"মর্ত্ত্য-মণ্ডল গণি খড়িতে দিল রেখ।

শ্রীয়মন্তের খড়িতে পাইল প্রত্যেক॥" (দ্বিজ মাধব/২৬৮)

জ্যোতিষ, পাঁজি এসবে বাঙালীর অটুট বিশ্বাস ছিল।দৈবজ্ঞ বা গণৎকাররা পাঁজি-পুথি দেখে দিনক্ষণ নির্ণয় করত।ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের সময় পুরোহিত ঠাকুর পাঁজি দেখে শ্রাদ্ধের সময় নির্ধারণ করেছিল-

"কি কর কি কর ভায়া পাঁজি দেখি আইনু ধায়া।

শুনহ আমার নিবেদন।

এই সিত ত্রয়োদশী খুড়া হইলা স্বর্গবাসী

বলিবারে তার প্রয়োজন॥" (মুকুন্দ/১৩৯)[১০০]

বিবাহকালে ওঝা দৈবজ্ঞ বা গণৎকাররা বিবাহের শুভলগ্ন নির্ধারণ করত—

"নিবেদয়ে দ্বিজ তারে নিজ প্রয়োজন॥

গ্রহ ওঝা করে মেষরাশির কল্যাণ।

সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজিখান॥" (ঐ/৯৮)[১০১]

অনার্য-ব্যাধ বা নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজেও ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রভাব ছিল; কালকেতুর বিবাহে সোমাই ওঝা দিন নির্ণয় করে লগ্ন স্থির করে—

সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ।
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদ-সরসিজ।" (ঐ/৩৭)[১০২]

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও মধ্যযুগীয় সমাজের এই প্রবণতাগুলি লক্ষ করা যায়। কালের ব্যবধানে রচিত হলেও বাঙালী সমাজে এই বিশ্বাস-সংস্কারের খুব রদবদল ঘটেনি। তবে সময়ের পরিবর্তনে দৈবজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি ধীরে ধীরে মানুষের শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।দ্বিজ মাধবের কাব্যেই আমরা দেখি দৈবজ্ঞের গণনাকে ধনপতি উপেক্ষা করেছে—

"ধনপতি বোলে গণক মিথ্যা কহ যে।
হর বিনে ভাল মন্দ বলিতে পারে কে॥ (দ্বিজ মাধব/২০০)

নিম্নশ্রেণীর বাঙালী সমাজেও দৈবজ্ঞ, গণৎকার বা ব্রাহ্মণের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিবাহ বা শুভ উৎসবে দিনক্ষণ নির্ণয় বা আয়োজন করার সময় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে ডাকার প্রয়োজন হত, সেখানে লোভী ব্রাহ্মণের সঙ্গে জ্ঞাতিবর্গের বিবাদ নিশ্চিত ছিল—

"আসিয়াছে জ্ঞাতিগণ হইয়া সানন্দিত মন
তা সভারে দেয়গী আসন।
বিপ্রের আদেশ পাইআ পুষ্পকেতু আসি ধাইআ
বসাইল জ্ঞাতি সমুদিত।
সেই সভাএ জ্ঞাতি সাথে বচনে বিবাদ পাতে
গণ্ডিশর এড়িয়া ভূমিত॥
ব্যাধ বোলে বিপ্র মনা মনে ছাড় সে বাসনা
মোর বাক্য না ভাবিঅ আন।
বসুপণ কর্বর্দ্দ এক দুইখানি খইয়া লেক
তবে সে ফুলরা দিমু দান॥" (দ্বিজ রামদেব/৫০)

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ, ওঝা ও গণৎকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কতটা কমে গিয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাই রামদেবের কাব্যে। কালকেতুর বিবাহের শেষে ব্রাহ্মণের দান-দক্ষিণা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়, সুতরাং—

"কর্ম্ম সাঙ্গ দান মাগে ব্রাহ্মণ রুষিল।
এহার কারণে বিপ্র খাইল কত কিল॥
বোলাবুলি ঠেলাঠেলি কত কটু বাণী।
বিবাদ করিল বিপ্র সমস্ত যামিনী॥" (ঐ /৫১)

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ মঙ্গলকাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উপকরণ হল ভাব-কেন্দ্রিক উপকরণ অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা মধ্যযুগের বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় পাই। মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ধনী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায়। এই পর্বের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল টোল-কেন্দ্রিক। টোল বা পাঠশালাগুলিতে শিশুরা শিক্ষালাভ করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাই এবং সেকালে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত তার বিবরণ পাই। সেকালে মূলত বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণ, অভিধান, শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করানো হত। মানিক দত্তের কাব্যে শ্রীমন্ত গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়ত তার

পাঠ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

"ক খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।
বার ফলা পড়ি সাধু শাস্ত্রপাট করে॥
পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।
অভিধান পড়িয়া শব্দের পাল্য অন্ত॥" (মানিক/২৮৬-২৮৭)

দ্বিজ মাধবের কাব্যে শ্রীমন্ত সরস্বতীপূজা করে পাঠ আরম্ভ করেছে; সে বর্ণমালা ও ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করে—

"পুণ্য তিথি গুরুবারে কঠিনী লইয়া করে
পূজা করিয়া সরস্বতী॥
'ক'-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতি-তল
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দ্দন।
. . . .
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পারগ হইল ব্যাকরণ॥" (দ্বিজ মাধব/২১৭-১৮)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দেখি শ্রীমন্তের নানা বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন আছে, সেখানে পাঠ্য বিষয়গুলি হল— শাস্ত্র, দর্শন, ব্যাকরণ, টীকা, কোষ, নাটিকা, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যতত্ত্ব, সাহিত্যদর্পণ, বৈদ্যবিদ্যা, জ্যোতিষ ইত্যাদি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সুস্থিত বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিতে নানা বিদ্যাচর্চার দুয়ার খুলে গিয়েছিল তা বোঝা যায় এই বিবরণ থেকে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে শ্রীমন্ত যে সমস্ত বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করে তার বিবরণ নিম্নরূপ—

"পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝায়ে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রি দিন করিয়া ভাবনা।
. . . .
বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।"(মুকুন্দ/১৭১)[১০৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও শ্রীমন্তকে ঐ বিষয়গুলি পাঠগ্রহণ করতে দেখা যায়—

"কবর্গাদি লিখে যত বিশেষ চিনএ কত
ফিরি ফিরি পঠে খানি খানি।
. . . .
দ্বাদশ বৎসর শিশু গুরুমুখে পাইয়া কিছু
শাস্ত্রেতে সাগর হএ পার॥"(দ্বিজ রামদেব/২৯৯)

সাধারণত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা শিক্ষা দিত। অনেকক্ষেত্রেই পণ্ডিতরা নিজেরা টোল খুলে পড়াত, তবে কখনো ধনী ব্যক্তির গৃহের আটচালায় বা চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা চালাত। শিক্ষক পণ্ডিতরা পাঠদানের বিনিময়ে অর্থমূল্য কিংবা মোহর পেত—

"লেখিঞা সুন্দর কৈল সকল অক্ষর।
পণ্ডিতে দক্ষিনা দিল সোবন্ন মোহর॥" (মানিক/২৮৭)

সেকালে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ভাল থাকলেও যে সব সময় ভাল ছিল তা নয়। অনেক সময়ই গুরু-শিষ্য সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিত— শ্রীমন্তের পাঠশালার বিবরণ থেকে তা জানতে পারি। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল না। নিম্নশ্রেণীর বাঙালী ও দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষার তেমন চল ছিল না, তবে ধনী বা অবস্থাপন্নরা

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখাত—

"মুক্ষ হঞা বাড়ে পুত্র সাধু নাই ঘরে।
সাধু আসিঞা মন্দ বলিবে আমারে॥
দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।
শুভক্ষণ গনিঞা ছ্যালাকে দিল খড়ি॥" (ঐ /২৮৬)

মুকুন্দের কাব্যে খুল্লনা ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডিতমশাই নিযুক্ত করে—

"আচার বিনয় দীক্ষা যত্নে করাইবে শিক্ষা
যাক ছিরা তোমার নিলয়॥
দ্বিজ শ্রীমন্তের করহ কল্যাণ।
যত চাহ দিব ধন নিবিষ্ট করাও মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান।" (মুকুন্দ/১৭০)

নারীশিক্ষার খুব একটা চল না থাকলেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ দেখা যায়। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলে ব্রাহ্মণী, লীলাবতী, খুল্লনা এ সমস্ত নারীরা লেখাপড়া জানে। লহনা তার সই ব্রাহ্মণীকে ধনপতির নামে মিথ্যা পত্র লিখতে অনুরোধ করেছে এবং ব্রাহ্মণী মিথ্যা পত্র লিখে দিয়েছে-

"ধর্ম্ম সাক্ষী করি রামা কলম ধরিল।
পত্র মসালী লইয়া লেখিতে লাগিল।"(দ্বিজ মাধব/১৩৭)

মুকুন্দের কাব্যে লীলাবতীও লেখাপড়া জানে, তাই সে লহনাকে মিথ্যা পত্র লিখে দিয়েছে। লীলাবতী লহনাকে বলেছে তাদের নামের প্রথম অক্ষরে মিল আছে, সুতরাং তারা পরস্পর সখী হয়—

"জীবন যৌবনে আর বড়ই পীরিত।
আদির অক্ষরে দেখি দুইজনে মিত॥" (মুকুন্দ/১১০)[১০৪]

লীলাবতীর পত্র রচনা সেকালের পত্ররীতির একটা উদাহরণ হতে পারে। খুল্লনাও শিক্ষিতা রমণী, সে ধনপতির অক্ষর ও অন্যের অক্ষরের পার্থক্য বুঝতে পারে—

"লহনার বচনে খুল্লনা পড়ে পাতি।
হাসয়ে খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি॥
খুল্লনা বলেন দিদি নাহি গো তরাস।
কে মোরে লিখিয়া পাতি করে উপহাস।
প্রভুর অক্ষর নহে দেখি ভিন্ন ছন্দ।
কেবা এ লিখিল পত্র করিয়া প্রবন্ধ॥" (ঐ)[১০৫]

শিক্ষার উপকরণ হিসাবে সেকালে তালপাতা ব্যবহার করা হত। কাগজের প্রচলন হয়নি কিন্তু তুলট কাগজের ব্যবহার ছিল, তাছাড়া কলম, খড়ি, মসী, মসীপাত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির পরিচয় আছে। মধ্যযুগের বাঙালীর শিক্ষাদীক্ষা, ধ্যান-মননের প্রকাশ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।ব্রতকথার দেবী চণ্ডী মঙ্গলচণ্ডীতে রূপান্তরিত হল এবং বৃহৎ সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবীতে পরিণত হল। বাংলার বার-ব্রত, পালাপার্বণ ধর্ম-কর্ম, বোধ-বুদ্ধি সমস্ত কিছু নিয়ে কবির লেখনীতে আত্মপ্রকাশ করল। কবিগণ উপাস্য দেবীর মাহাত্ম্যকথা বলতে গিয়ে দেবীকে যেমন মানবী করে তুলেছেন তেমনি দেবকথা বলতে গিয়ে মধ্যযুগীয় বাঙালীর কথাকে তুলে ধরেছেন। বাঙালীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান আচার পালিত হত, এর মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব সৌন্দর্য ও শিল্পবোধ প্রকাশিত।বাঙালীর শিল্পকর্ম,

সজ্জারীতি, আলপনা অঙ্কন, পূজা-পার্বণ, বার-ব্রত ইত্যাদির মোটামুটি পরিচয় আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম হল দুর্গাপূজা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দুর্গাপূজা বাঙালী সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মানিক দত্তের কাব্যে আমরা দুর্গাপূজার উল্লেখ পাই, যেমন—

"আশ্বিন মাসেত নরে পূজে দশভুজা।" (মানিক /৯৮)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে অম্বিকা পূজার কথা পাই; পূজা উপলক্ষে বলিদান করা হত, লোকে উত্তম বসন পরিধান করত, উত্তম আহার করত। কবির বর্ণনায়—

"আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।" (মুকুন্দ/৫৪)[১০৬]

দোল রঙের উৎসব, বাঙালী সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্ব। এই সময় লোকে রঙের খেলায় মেতে উঠত। তাছাড়া শিবের গাজন বাঙালীর একটি বিশিষ্ট উৎসব। শিবের গাজন উপলক্ষে ভক্তরা পিঠে বা জিহ্বায় কাঁটা ফুটিয়ে চড়ক করত, মুকুন্দ তার বর্ণনা দিয়েছেন—

"চৈত্রমাসে শিব পূজে নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে॥
জিহ্বা ফোঁড়ে জিহ্বা কাটে করয়ে চড়ক।
অভিমত স্বর্গে যায়, না যায় নরক॥" (ঐ/২৮)[১০৭]

বাঙালী সমাজে মধ্যযুগেই কৃষ্ণকথা, নানা ধরনের দেবকথা পালাগান আকারে গীত হত। সুশীলা ও সখীগণ মিলে শ্রীমন্তকে কৃষ্ণলীলা শোনাতে চেয়েছে—

"ফাগু দোল করিয়া গোঁয়াব নিত নিত॥
সখী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত।
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত॥" (ঐ/২২৫)[১০৮]

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান প্রবাদ-প্রবচন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লিখিত প্রবাদ-প্রবচনগুলির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন- মানিক দত্তের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। "পুরুষ বিনা নারীর যৌবন মরা।
চন্দ্র বিনা উজ্জ্বল করিতে নারে তারা॥
২। পীপীড়ার পাখা হয়ে মরিবার তরে।
৩। ঠগঠামন হৈতে অনেক কর্ম্ম হয়ে।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নারি খণ্ডাইবারে।
২। সৎপন্থেতে থাকিলে আপদ নহে তার।
৩। বিধির নির্ব্বন্ধ কভো না যায় খণ্ডন।
৪। বামন হইয়া বীরবর চান্দোরে বাড়াও কর।
এহা তোমার উচিত না হয়ে।
৫। দৈবের নির্ব্বন্ধ তান না যায়ে খণ্ডন।
৬। পতি গুরুজন সেই যে আপন
জিজ্ঞাসিয়া চাহ সর্ব্বজন।

৭। মিথ্যা বচন জান জলের তিলক।

৮। পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রীধর্ম হৈয়া।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা।

২। পিপীড়ায় পাখা উঠে মরিবার তরে।

৩। নফরের হাতে খাঁড়া বহুড়ি জনের ভাড়া
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ।

৪। খর্ব হইআ ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।

৫। আপনি রাখিলে রহে আপনার মান।

৬। নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহুধন।

৭। প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।

৮। জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।

৯। দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ।

১০। শুখানের মৎস আর নারীর যৌবন।
ত্রিপান্তরে পায় যদি রজত কাঞ্চন॥

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন —

১। না জানিয়া বিষবৃক্ষ করিছি বপন
আপনে রোপিয়া কেহো না করে ছেদন।

২। বীর কোলে দুঃখ সুখ কর্মের অধীন।

৩। পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাঠারী॥

৪। জনম লভিলে তবে অবশ্য মরণ।

৫। সুখ দুঃখ যত হয়ে কর্মের অধীন।

এই প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সামাজিক আদর্শ, ন্যায়বোধ, নৈতিকতা, মানব চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আবার প্রতিটি যুগের পৃথক আদর্শবোধ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে প্রায় একই রকম সামাজিক আদর্শ প্রকাশিত। এখানে কবি একই কথা একটু ভিন্ন ভাষাতে প্রকাশ করেছেন মাত্র, সুতরাং বোঝা যায় প্রবাদগুলি প্রায় সমসাময়িক সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রবাদ-প্রবচন ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কতকগুলি বিশিষ্ট বাক্‌রীতি আছে এবং এগুলি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যুগের পরিবর্তনে কিছু কিছু বাক্‌রীতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেখানে নতুন বাক্‌ভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলিতে ধাঁধাঁ একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। বাঙালী কথাবার্তায় প্রচুর ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি ব্যবহার করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ধাঁধার ব্যবহার আছে, এগুলিতে বাঙালীর চিরন্তন জীবন বৈশিষ্টের পরিচয় আছে। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বাইরের রূপের পরিবর্তন ঘটে গেলেও আচারগতক্ষেত্রে সমাজ ইতিহাসে এর ব্যবহারগত তাৎপর্য আছে। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে. যেমন—

"রাত্রে জনম জার দিবসে মরন।
জার ঘরে জন্মে তাকে করাএ ক্রন্দন॥

. . . .

সাগরে জনম তার নগরে বিকায়।

জন্ম অবধি তাকে নাই ছুত্র মাএ ॥

শুন ২ পণ্ডিত কথা অদ্‌ভুত।

মাএ ছোইলে তার মরি জায় পুত॥" (মানিক/২১৭-২১৮)

মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যেও এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে। শুকপাখি এসব ধাঁধাঁ বলেছে আর পণ্ডিতরা তার মীমাংসা করেছে, যেমন—

"বিধাতা-নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার।

যোগেন্দ্র পুরুষ তায় আছে নিবাহারে॥

যখন পুরুষবর হয় বলবান।

বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥

. . . .

জন্ম হৈতে গাছ বায় রুধির ভক্ষণ।

দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ।

মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।

শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিঁয়ালির সার॥" (মুকুন্দ/১০৩-১০৪)[১০৯]

মঙ্গলকাব্যে লোকসাহিত্যের উপকরণ হিসাবে ছড়ার ব্যবহারও আছে। ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া চিরকাল বাঙালী জননী ও সন্তানের হৃদয়ে কল্পনার পাল তুলে দিয়েছে। ছড়া শুনিয়ে মা কখনো ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে, কখনো বা দুরন্ত ছেলেকে ভোলাচ্ছে— এসব লোকায়ত ছড়ার মধ্যে দিয়ে লোকজীবনের প্রকাশ ঘটেছে। পরিবর্তিত সমাজে ছড়ার বিষয়গত পরিবর্তনও ঘটেছে নিঃশব্দে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে জননী খুল্লনা শ্রীমন্তকে ঘুম পাড়িয়েছে এই ছড়াটি শুনিয়ে—

"আয় আয়রে বাছা আয়।

কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়॥

আনিব তুলিয়ে গগনফুল।

এক্কৈক ফুলের লক্ষৈক মূল।

সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার।

সোনার বাছা কেঁদোনা আর॥

খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া।

কর্প্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥

রথ গজ ঘোড়া কৌতুক দিয়া।

বাজার দুহিতা করাব বিয়া॥

শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়।

কুঙ্কুম কস্তুরী মাখাব গায়॥

পালঙ্কে নিদ্রা যাবে চামর বায়।

শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত গায়॥" (ঐ/১৬৮)[১১০]

এই ঘুমপাড়ানি ছড়াটির মধ্যে সেকালের সমাজ ইতিহাসের বহু ক্ষুদ্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায় আসি। বাংলার লোকসমাজে অজস্র লোকক্রীড়া ছড়িয়ে আছে। মঙ্গলকাব্যে সামান্য হলেও কিছু কিছু লোকক্রীড়ার ব্যবহার আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও কিছু কিছু লোকক্রীড়ার উল্লেখ পাই । এই সমস্ত লোকক্রীড়ার বিনোদনগত, শরীরচর্চাগত অর্থাৎ ব্যবহারগত মূল্য আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকক্রীড়ার একটা সাধারণ পরিচয় এখানে আছে। মানিক দত্তের কাব্যে পাই—

"নগরিয়া লোকের সঙ্গে করিছে খেলা।"(মানিক/৬৪)

খেলার বিবরণ কবি দেননি। কবিকঙ্কণ শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়ার বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে সেকালে প্রচলিত লোকক্রীড়াসমূহের নাম জানতে পারি যেমন—

"নগরিয়া শিশু সঙ্গে খেলা করি ফিরে রঙ্গে
খেলে চিকা গুলি দাঁড়া ভাটা।
পাশাতে হইয়া বশ ডাকে সদা দশ দশ
বিপঞ্চিকা খেলায় শকটা॥
পাতি খেলে বাঘ চালু জুয়া খেলে কুলিকুলি
সামরুল শুনাইতে কথা।
কোলে কোলে নেত্রবন্ধ খেলিতে সদাই দ্বন্দ্ব
না জানি দিবসে থাকে কোথা॥
ঝালি খেলে চড়ি গাছে জলে খেলে হয়ে মাছ
জীবন মরণ নাহি গণে।" (মুকুন্দ/১৭০)[১১১]

চিকা, গুলিদাঁড়া বা ডাণ্ডাগুলি , ভাটা , পাশা, শকটা, বিপঞ্চিকা, বাঘচালি, নেত্রবন্ধ বা কানামাছি, ঝালি, জলমাছ ইত্যাদি খেলার কথা এখানে আছে। শিশুদের ঐ সমস্ত ক্রীড়া ছাড়াও আছে বাটুল খেলা; বাটুলে গুলতি দিয়ে পশুপাখি হত্যা শিশুদের মজার ক্রীড়া। শিশুদের ক্রীড়া ছাড়া আছে বড়দের পাশাখেলার কথা। স্ত্রীপুরুষ একত্রে ঘরে বসে পাশা খেলা হত। গৌরী ও পদ্মাবতীর পাশা খেলার প্রসঙ্গ পাই চণ্ডীমঙ্গলে—

"কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিলা পার্ব্বতী।
আপনি দিলেন রাঙ্গি কালি পদ্মাবতী।
হাতে পাষ্টি করিয়া ডাকেন দশদশ।
এ কালে মেনকা আসি করিল বিরস॥" (ঐ/২২)[১১২]

পায়রা ওড়ানো সেকালে অর্থশালী ব্যক্তিদের একটি বিশেষ ক্রীড়া। পায়রা ওড়ানোর প্রতিযোগিতার কথা আমরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই—

"সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় সদাগর।
ছাড়িয়া পাটের দোলা সবে করে পাখী-খেলা
পড়ে খসি ভূষণ অম্বর।
. . . .
পায়রা রাখিয়া যাতে উড়াইল পারাবতে
আগে আইলে তার হবে জয়॥" (ঐ/৯৪)[১১৩]

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আমোদপ্রমোদমূলক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

সামাজিক অবস্থা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিনটি ধারায় প্রধান কবিদের কাব্যে সমসাময়িক বাঙালী সমাজের একটা সামগ্রিক ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সমাজ ইতিহাসের বহিরাঙ্গিক উপাদানগুলিই নয়, এর মধ্যে সমাজ ইতিহাসের অন্তর্ধর্মের পরিচয় আছে। যদিও চণ্ডীমঙ্গল রচনার অন্তবর্তীকালে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা হয়েছে, তবু লক্ষণীয় বিষয়, এসব মনসামঙ্গলের সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী ধর্ম ব্যতিরেকে সমাজ চরিত্রের একটা সাযুজ্য চোখে পড়ে। অতঃপর আমরা চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত অন্তরালবর্তী সমাজ ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা করব।

বলাই বাহুল্য যে মধ্যযুগীয় সমাজ পুরুষশাসিত; নারী পরান্নজীবী, অসহায়; তারা জীবনের বিভিন্ন সময়ে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন। নারীসত্বা বিকাশের অবকাশ কোথাও ছিল না। কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা সমগ্র সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা বহুবিবাহের কবলে নারীর দুরবস্থার চিত্র পাই। ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডী ফুল্লরাকে পরিচয় দিতে গিয়ে তার স্বামীর বহুবিবাহ অর্থাৎ তার সপত্নী সমস্যার কথা বলে। বস্তুত ধর্মকথার মোড়কে পরিবেশন করা হলেও এটাই ছিল সে সময়কার বাস্তব সত্য। ফলতঃ সপত্নী কলহে স্বামী সোহাগে কোন স্ত্রীর পাল্লা ভারী হত আর কেউ হত লাঞ্ছিতা। বস্তুত এই সকরুণ অবস্থা শুধুমাত্র গৌরীর নয় মধ্যযুগীয় কৌলীন্যশাসিত হিন্দুসমাজের। স্বামীর এই পক্ষপাতিত্ব গৌরীর মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।" (ঐ/৫২)[১১৪]

ভ্রমরা জাতি পুরুষ নারীর কামনা-বাসনা বা চাওয়া-পাওয়াকে মূল্য দেয়নি বলেই বণিক খণ্ডে ধনপতি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও খুল্লনাকে বিবাহ করে, শ্রীমন্ত সুশীলাকে বিবাহ করার পরেও আবার বিবাহ করে। বহুবিবাহের ফলে সপত্নী সমস্যা একটা জ্বলন্ত সমস্যায় পরিণত হয়। বাঙালী সমাজে দুই সতীনের সম্পর্ক কখনোই ভাল ছিল বলে মনে হয় না।তাইতো ফুল্লরাকে পরিচয় দিতে গিয়ে চণ্ডী বলেছিল-

"সাত সতিনীরা মারে বুঝিয়া না শান্তি করে
সাত সতা পরাণের বৈরী।" (ঐ/৫২)

ফুল্লরাও দেবীকে তাই সতীন প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা দিয়েছে তার চিন্তাভাবনা অনুসারে—

"সতিনে কোন্দল করে দ্বিগুণ শুনাবে তারে
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী।
কোপে কৈলে বিষপান আপনি ত্যজিবা প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥" (ঐ/৫৩)[১১৫]

বস্তুতপক্ষে, চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডের মূল সমস্যাই সপত্নী সমস্যার উপর দাঁড়িয়ে । এখানে বিগত যৌবনা পত্নী আর নবীনা পত্নীর অবস্থানগত দ্বন্দ্বকে চণ্ডীর মধ্যস্থতায় পরিবেশন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ-ব্যাধ সমাজে পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণের সমস্যা খুব একটা ছিল না। অন্তত ফুল্লরা-কালকেতু সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে একথাই বোঝা যায়। আসলে কৌলীন্যশাসিত সমাজে কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে কন্যা রজঃস্বলা হবার আগেই পাত্রস্থ করার কথা ভাবত সুতরাং সপত্নী সমস্যার কথা মাথায় রেখেও কন্যা বহুপত্নীক পুরুষের হাতে দিতে দ্বিধা করত না। তাই দেবীর উক্তি—

"দেখিয়া দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হইনু বিমুখী॥"(ঐ/৫২)[১১৬]

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম সংস্কার— বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রথার ফলেও নারীকে সপত্নী সমস্যার যাতনা স্বীকার করতে হত।নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের অনুশাসন প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গল

বণিক খণ্ডে লক্ষপতিকে ঘটক যে কথাগুলি বলেছে তা থেকে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আবার পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণও অনেক সময় সমাজ পরিবেশগত চাপের ফল। পুত্রহীন নারী ও পুরুষ সামাজিক দৃষ্টিতে আঁটকুড়া এবং অপয়া, সুতরাং তার মুখদর্শনও পাপ বলে বিবেচিত হত। মানিক দত্তের কাব্যে দেখি রাজা ধনপতিকে আঁটকুড়া বলে রাজসভায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে—

"আটকুড়া ধনপতি আছে নগর ভিতর।
তাহাকে পুরিতে য়াসিতে না দিহ সত্তর॥" (মানিক/১৯২)

সুতরাং ধনপতিকে সন্তানলাভের জন্য দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে হয়েছিল। রাজার নির্দেশ ছিল—

"রাজা বলে শুনহ লক্ষের সদাগর।
দ্বিতীয় বিবাহ করি বংশ রক্ষা কর॥" (ঐ)

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষের নারী সম্পর্কিত মানসিকতা ছিল অস্বাভাবিক। সমাজ যেমন পুত্রহীনের মুখদর্শন করত না, তেমনি নারীকে পুত্রসন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলেই ভাবত। ধনপতির পুত্র না থাকায় সে নিজেকে অভাগ্য বলে গণ্য করে এবং রাজসভায় যেতে লজ্জা পায়। তবু তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হয়েছিল। বিবাহের এগার বৎসরেও লহনা অপুত্রক থাকায় ধনপতি আবার স্ত্রী গ্রহণ করে। লহনার কাতরোক্তি—

"আর চারি বৎসর থাক প্রভু চিত্তে খেমা দিয়া।
না হয়ে লহনার ছাইলা করিহ দ্বিতীয় বিহা॥" (ঐ/১৯৩)

কিন্তু পুরুষ নারীর মানসিক কাতরোক্তির মূল্য দেয়নি। ধনপতি অপুত্রক স্ত্রীর কথা শুনতে রাজী নয়, কারণ লহনা 'বাঞ্ঝি' বা বাঁজা।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবারে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক ভাল ছিল না; অধিকাংশ বাঙালী পরিবারে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের মত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুরুষের নারী সম্পর্কিত এই মানসিকতার ছবি পাওয়া যায়। বস্তুত পক্ষে স্ত্রীরা ছিল সম্পূর্ণ স্বামীর অধীন, সুতরাং স্বামীই স্ত্রীর ধন, জন, বিধাতা ও দণ্ডদাতা। তাই স্বামী স্ত্রীর সামান্য দোষে নাক পর্যন্ত কেটে নিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এ সকল তথ্য পাওয়া যায়। ফুল্লরা চণ্ডীকে উপদেশ দিতে গিয়ে যে কথা বলেছে তা সামাজিক ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ—

"সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ড রাজা বনিতার পতি॥" (মুকুন্দ/৫৩)[১১৭]

ফুল্লরার কথা মিথ্যা হলে কালকেতু ফুল্লরার নাক কেটে শাস্তি দিতে চেয়েছে—

"মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥" (ঐ/৫৫)[১১৮]

নারীকে সমাজের পৈশাচিক বিধানে নানাতর যন্ত্রনা সহ্য করতে হত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে নারীর প্রতি পুরুষের এই মানসিকতা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"পুরুষ কঠিন জাতি হীরার কাটারি।
একেতে মজিলে মন অন্য যায় ফিরি॥
অবলা অধম জাতি পদে পদে অপরাধ।
একেতে শরণ লইলে অন্যাতে বিবাদ॥" (দ্বিজ রামদেব/১২৫)

পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর ভালবাসা, সেবা পরায়ণতা সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে সহজেই প্রতারণা করত। রামদেবের কাব্যে ধনপতি সম্পর্কে লহনার মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে—

"পতিজাতি অতিছাড় মরম না পাইলুম তার
বচনে ছলিল অভাগীরে॥" (ঐ/১২৪)

ধনপতি দ্বিতীয় বিবাহে লহনাকে কিভাবে ছলনা করেছিল তার বিস্তৃত পরিচয় আছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে। অভিমানাহত লহনাকে ধনপতি প্রবোধ দেয়—

"রন্ধনের তরে তব করে দিব দাসী॥" (মুকুন্দ/৯৭)[১১৯]

কিন্তু ধনপতির কপট প্রবোধে লহনা ভোলেনি। তখন ধনপতি স্ত্রীর সম্পর্কে তার স্পষ্ট মানসিকতা জ্ঞাপন করে—

"স্ত্রী গত-যৌবনে পুরুষ নির্ধনে
কিবা আদরের চিন।' (ঐ/৯৭)[১২০]

তা সত্ত্বেও লহনাকে অর্থ, সোনা এবং কাপড়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মতি নিতে হয়। বাংলার নারীরা চিরকালই বস্ত্রালঙ্কারের বশীভূত, তাই প্রতারণা দ্বারা লহনাকে বশ করে সম্মতি আদায় করতে অসুবিধা হয়নি। মুকুন্দ চক্রবর্তী এসম্পর্কে লিখেছেন—

"পরিতোষে লহনাকে দিয়া পাটশাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মম মনে।
যেমন আছিলা পূর্ব্বের বিবাহের দিনে॥
রত্নপেয়ে যত্ন নিল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥ (ঐ/৯৮)[১২১]

নারীর অবস্থানগত হীনতার আরও একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল গর্ভপত্র নেওয়া; বস্তুতপক্ষে হীন চরিত্র পুরুষ অনেক সময়ই নারীর উপর অর্থাৎ স্ত্রীর উপর আস্থা স্থাপন করত না, ফলে খুল্লনার ছয় মাস গর্ভাবস্থায় ধনপতির বিদেশ যাত্রাকালে গর্ভপত্র নিতে হয়েছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে—

"তোরে আশীর্ব্বাদ মোর পরম পীরিত।
সন্দেহ-ভঞ্জন-পত্র হইল লিখিত॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস॥"(ঐ/১৫২)[১২২]

শুধু কি তাই, বাঙালী পরিবারের সকলেই ঘরের স্ত্রীর উপর অত্যাচার করত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনা বলেছে—

"মোর মনে লয় তথা হবে বহুকাল।
তোমার বান্ধব জন বিষম করাল॥
শঠতা করিয়া তারা যদি ধরে ছল।
সেই কালে কেবা মোর হবে অনুবল॥ (ঐ/১৫৬)[১২৩]

অনেক সময় সামান্য কারণে নারীর নানা রকম শাস্তি বিধান করা হত। খুল্লনাকে জ্ঞাতি বন্ধুজনের সম্মুখে নানা রকম অন্যায় পরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে অনুমৃতা হতে হত। কেননা নারীর পিতার সম্পত্তিতে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকত না, ফলে সহমরণে আত্মবিসর্জন ভিন্ন উপায় থাকত না। অবশ্য মুসলমান সমাজে এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বোধ হয় অনেকখানি বেশী ছিল। পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে ফুল্লরা স্বামী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী সহকারে জীবন নির্বাহ করেছে। কালকেতু ফুল্লরাকে দিয়েছে সম্মান। কালকেতুর উক্তিতে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী দেবী চণ্ডী সম্পর্কে কালকেতুর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে কালকেতু নারী সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞাপন করে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কালকেতু বলেছে—

"এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বোলে বাণী।
পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী॥" (ঐ/৫৫)

অবশ্য কালকেতুর মধ্যে দিয়ে কবি তার আদর্শ সমাজ, আদর্শ পরিবার গঠনের স্বপ্নকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। শাশুড়ী, ননদ ও সতীনের জ্বালায় বাঙালী ঘরের বধূর গৃহত্যাগ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। ছদ্মবেশিনী দেবী ফুল্লরাকে জানায় স্বামী ও সতীনের জ্বালায় সে গৃহত্যাগ করেছে, কথাটি অন্যভাবে ব্যক্ত হলেও তাতে সামাজিক সত্য নিহিত আছে। দেবী বলেছে—

"যে ঘরে সতিনী রয় হিংসানলে প্রাণ দ'য়
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম না গণিনু পরিণাম
বনবাসী হইনু একেলা॥" (ঐ/ ৫২)

নারীর পক্ষে সতীনের ঘর করা কতখানি দুষ্কর ছিল তা বোঝা যায় দ্বিজ রামদেবের কাব্যে লহনার উক্তি থেকে। সতীন সম্ভাবনার কথা জেনে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, কারণ স্বামী বিমুখ হলে নারীর দাঁড়াবার জায়গা থাকত না। লহনা বলেছে—

"ভগিনী সতার তাপ নিশি দিশি হইল জাপ
ঝম্প দিমু জলধি মাঝারে।
দুবা কি বুদ্ধি বলিবা বোল আনি দেহ হলাহল
বঞ্চিতে নারিমু এই ঘরে॥
প্রাণনাথ হৈল বৈরী ছিড়িল প্রেমের দড়ি
কি বুঝি রহিতে বোল আর।
পুরুষ ভ্রমরাজাতি পাইল যুবতী অতি
কি আর যাইমু তার ঘর॥" (দ্বিজ রামদেব/১২৪)

এমন কি নারী এক রাত্রির জন্য পরগৃহে বসবাস করলে সমাজ তাকে গ্রহণ করত না, একারণে তার শাস্তি বিধান করা হত। ফুল্লরার উক্তিতে সমাজ মানসের এই দিকটি ফুটে উঠেছে—

"অধম অবলা জাতি যদি থাক এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
লোকে ব্যভিচারী বলে জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে
অবিচারে কৈলা অনুচিত॥" (মুকুন্দ/৫৩)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে বাঙালী সমাজে সাধারণ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সুন্দর চিত্র পাই ফুল্লরার উক্তিতে।ফুল্লরা জানিয়েছে ক্ষুধার্ত স্বামী ফিরে এসে খেতে না পেলে তাকে প্রহার করবে—

"দিনান্তে আসিবে পতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
শীঘ্র না পাইলে ভক্ষ্য মারিবে ধরিআ॥" (দ্বিজ রামদেব/৬৩)

এটাই ছিল বাস্তব চিত্র। মুকুন্দের কালকেতু-ফুল্লরার আদর্শ পরিবার চিত্র আদর্শায়িত বিষয়। মধ্যযুগীয় পারিবারিক আদর্শের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল বধূ। তাকে নানা ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হত, আর বধূর জীবনেই অঙ্কিত হত কলঙ্ক তিলক। তাই স্বামীগৃহে প্রেরণের আগে মা কন্যাকে নানা উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করত। মানিক দত্তের কাব্যে খুল্লনাকে তার মা উপদেশ দিয়েছিল—

"রম্ভা কান্দিয়া বলে শুনহ খুল্লনা।

ভালমতে মানাইহ সতিন লহনা ॥
ইষ্টমিত্র সাধুর আসিবে সর্ব্বজন।
তার আগে তুমি না ডাগুাবে সর্ব্বক্ষণ ॥
গৃহে বাসি কর্ম্ম করি স্নানকে যাইবে।
চতুর্দিগে দেখি তুমি স্নান করিবে ॥
সকলিকে খাওাইহ করিয়া রন্ধন।
অবশেষে জেবা পায় করিহ ভোজন ॥" (মানিক/২১১)

ব্যাধ কালকেতুর পারিবারিক জীবনেও কবি এই আদর্শের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছেন, তাইতো—

"নিদয়ার সুখ বড় বধূ গৃহ কর্ম্মে দড়
কুল যশ রক্ষণের হেতু ॥" (মুকুন্দ/৩৯)[১২৪]

অথচ মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষরা নারীকে যথার্থ সম্মান দেয়নি। মধ্যযুগীয় পুরুষ 'ভ্রমরা জাতি' বলে চিহ্নিত। মনসামঙ্গলে যে শিথিল চরিত্র পুরুষ সমাজের কথা পাওয়া যাচ্ছে চণ্ডীমঙ্গলে তারা অলস, অকর্মণ্য, ছিদ্রান্বেষী হলেও ততটা শিথিল চরিত্রবিশিষ্ট নয়। বোধ হয় চৈতন্য প্রভাবে সমাজে পুরুষ চরিত্র খানিকটা সংযত হয়েছিল। তাই এখানে ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের প্রতিভূ শিবঠাকুর ভিখারী ও অকর্মণ্য হলেও ইন্দ্রিয়লোলুপ নয়; আবার চাঁদ সদাগর চরিত্রের নারী আসক্তি ধনপতি বা কালকেতুর চরিত্রে নেই। কিন্তু পুরুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। বস্তুতপক্ষে, পুরুষশাসিত সমাজ চিরদিন নারীকে অবদমিত করে রেখেছিল। কুলীন পিতা বৃদ্ধ-অন্ধ-অশক্ত পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করত— কন্যার আকাঙ্ক্ষার মূল্য তারা দিত না। এমন কি লহনার খুড়ো জেনেশুনেও খুল্লনাকে সতীনের ঘরে বিবাহ দিয়েছে, তাই লহনার খেদোক্তি—

"খুড়া হয়ে দেয় সতা কারে কব দুঃখকথা
কারে বা করিব অভিমান ॥ (ঐ/৯৭)[১২৫]

পুরুষ নারীর মূল্য দেয়নি বলেই খুল্লনার পিতা রম্ভাবতীর নিষেধকে হেলায় দূরে সরিয়ে দেয়। রম্ভাবতী বার বার লক্ষপতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে—

"হিতাহিত নাহি গণনা লব কন্যার পণ
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি।" (ঐ/৯৬)[১২৬]

কিন্তু অদৃষ্টবাদী অশিক্ষিত বাঙালী সমাজ পুরোহিত ও গণৎকারের দ্বারা প্রতারিত হত। সাধুপত্নী তাই ঘটককে প্রতারণার জন্য তিরস্কার করে—

"সাধুপত্নী বোলে বিপ্র কহ বারে বারে।
তোহার কারণে কৈন্যা আনলেত পড়ে ॥" (দ্বিজ রামদেব/১২৯)

রম্ভাবতী অদৃষ্টে বিশ্বাসী, তই পুরুষের প্রতারণা বোঝার ক্ষমত বা ইচ্ছা তর নেই। লক্ষপতির কথা—

"গণকে কয়েছে মোরে দিবে দোজবেরে বরে
বিচারিয়া বিধবা-লক্ষণ ॥" (মুকুন্দ/৯৬)[১২৭]

নারীগণের পতিনিন্দা অংশে নারীর দুরবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায়, নারী সম্পর্কিত সমাজ মানসিকতাই এর জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা যায়।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারী শুধু বধূ হিসাবেই নয়, পারিবারিক জীবনে পুরুষের যথার্থ সহধর্মিনী, সহকর্মিনী হয়ে ওঠার চেষ্টা করত। নিজের কামনা-বাসনা পরিহার করে স্বামী-পুত্রের কল্যাণ কামনায় নারী ছিল নিবেদিতপ্রাণা। ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনার চণ্ডীপূজা স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্যই। শুধু তাই নয়, নারী

অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহায়তার দ্বারা জীবিকা অর্জনে সাহায্য করত। নিম্নবর্ণের সমাজে নারী খেয়া দিয়ে, পসরা দিয়ে অর্থ উপার্জন করত। ফুল্লরা সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য মাংসের পসরা সাজিয়ে বিক্রি করে, দুর্বলা দাসী ধনপতির গৃহে পরিচারিকা বৃত্তি গ্রহণ করে। মঙ্গলকাব্যের মূল সুরটিও এখানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, এই সুরটি হল- শাক্ত দেবতা তথা পুরুষ শক্তির জীর্ণতায় নারী শক্তির উত্থান। বস্তুতঃ ব্যাভিচার অকমর্ণ্যতা, অনৈতিকতার ফলে পুরুষ তার শক্তি ও সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছিল, তাই নারী শক্তির উত্থান প্রয়োজন হয়েছিল। পুরুষশাসিত সমাজ তাদের কর্তৃত্বের মুঠি শিথিল করতে চায়নি, তাই পুরুষ সমাজের আপত্তি স্ত্রী শক্তির উত্থানের বিরুদ্ধে। তাই ধনপতি খুল্লনাকে জানায়—

"কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘটবারি।
স্ত্রীদেবতার আমি পূজা নাহি করি॥" (ঐ/১৫৩)[১২৮]

কিংবা—

"মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি হইলি কুলের কালী
মেয়ে দেব পূজি হইলি অরি॥" (ঐ/১৫৪)[১২৯]

নারীই আসলে নারী শক্তির উত্থান কামনা করেছিল। যেভাবে মনসা আপন প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল তেমনি ভাবে চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী অকর্মণ্য শিবঠাকুরের সংসারের দারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল। আর সাধারণ নারীগণ মেনে নিয়েছিল— "যে হোক সে হোক স্বামী নারীর ভূষণ।"(ঐ/২০)। কিন্তু সখী পদ্মার পরামর্শে দেবী আত্মপ্রতিষ্টার সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েছিল। কেননা স্বামী বিড়ম্বিতা কন্যা পিতৃগৃহে সম্মান পেত না। তাই দেবী পিতৃগৃহে না গিয়ে পুরুষশাসিত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতিভূ কলিঙ্গরাজকে কঠোর স্বপ্নাদেশ দেয় এবং কলিঙ্গরাজই প্রথম চণ্ডীমঙ্গলে স্ত্রীদেবতার কর্তৃত্ব স্বীকার করে। এভাবে ক্রমাগত নিম্নবর্ণের সমাজ থেকে উচ্চবর্ণের সমাজে স্ত্রীদেবতা তথা নারী শক্তি প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে।

চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালী সমাজের বহুবিধ প্রবণতার কথা আছে, যেমন— ধর্মপ্রাণ বাঙালীর তীর্থ পর্যটন একটি বিশিষ্ট বিষয়। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার সময় বহু তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায় এবং দেখা যায় ধনপতি প্রতিটি তীর্থে পূজা করে। বৃদ্ধ বয়সে তীর্থবাস বাঙালী হিন্দুর বিশেষ প্রবণতা। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে তীর্থবাস উচ্চবর্ণের সমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু হয়ত কবি আপন সমাজের সত্যকে নিম্নবর্ণের সমাজে চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন অথবা নিম্নবর্ণের সমাজেও ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের সমাজের এই রীতি প্রবেশ করেছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন-

"মুক্তি-পথে দিয়া মন শিব চিন্তে অনুক্ষণ
শুনয়ে পুরাণ উপাখ্যান।
জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিল প্রস্থান॥" (ঐ/৩৯)[১৩০]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় সমাজের বাঙালী মানসিকতার বহু পরিচয় আছে, যার মধ্যে দিয়ে বাঙালী চরিত্রের অন্তর্ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, যা আজও সম্পূর্ণ রূপে অবসান হয়নি। যেমন বাঙালী ঘরের কন্যাগণ পতিগৃহে আসার পর দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে যেতে পারত না, পাড়া প্রতিবেশী সকলকে নিয়েই সুখে-দুঃখে তাদের দিন কেটে যেত। পার্বতী কৈলাসে আসার পর আর একদিনের জন্য কোথাও যেতে পারেনি। এখানে তার সখী বা বান্ধবী কেউ নেই, তাই সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে যজ্ঞ দেখতে যেতে চায়। সতী মহাদেবকে জানায়—

"পর্ব্বত কাননে বসি নাহিক পাড়া পড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একতিল কোথা যাই জুড়াইতে নাহি ঠাঁই

বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী॥

সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাম তব ঘরে

পূর্ণ যে হইল বর্ষ সাত॥" (ঐ/৯)[১০১]

শিবঠাকুর জানায়, বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া অনুচিত; কিন্তু নারীর পিতৃগৃহে যেতে নিমন্ত্রণ দরকার হত না। কন্যা পিতৃগৃহে ফিরে এলে মা ও বোনেরা সকলে মিলে দেখতে আসে, মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করে, পিতামাতা তাকে মঙ্গল আশীর্বাদ করে। সতী পিতৃগৃহে এলে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে অনুরূপ মানসিকতার পরিচয় পাই—

"পাইলা বাপের গ্রাম শুনিয়া সতীর নাম

প্রসূতি ধাইল বেগবতী॥

কোলেতে লইয়া সতী প্রসূতি পুলকবতী

কৈলা চণ্ডী মায়ের প্রণতি॥

.. ..

জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে

যান দেবী যজ্ঞের সদন॥" (ঐ/১০)[১০২]

পিতামাতাকে প্রণাম করা বাঙালী সমাজের বিশেষ প্রবণতা এবং পিতামাতা বিবাহিতা কন্যাকে আশীর্বাদ করে— 'স্বামী চিরজীবী হোক' কিংবা 'এয়োতে জীবন অতিবাহিত হোক' বলে।সতী প্রণাম করলে দক্ষ প্রজাপতি তাকে আশীর্বাদ করে বলে—

"দক্ষের চরণে সতী করিল প্রণতি।

হেট মুখে আশিস্ করিল প্রজাপতি॥

এয়োতে যাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।

চিরজীবী হোক স্বামী সুস্থির সুমতি॥" (ঐ)[১০৩]

আবার মধ্যযুগীয় বাঙালীর বিচিত্র মানসিকতার ছবি ধরা পড়েছে চণ্ডীমঙ্গলে 'নাগরিদিগের বর দর্শনে গমন' অংশে। বিয়েবাড়িতে নতুন বর দেখতে যাওয়ার বিচিত্র প্রবণতা দেখা যায় চণ্ডীমঙ্গলে। কবিকঙ্কণ সুন্দরভাবে তার চিত্র অঙ্কন করেছেন, যেমন—

"ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।

এলোকরি ধায় কেহ নাহি বান্ধে কেশ॥

. . . .

চড়িয়া জাঙ্গালে এয়ো দিল বাহু নাড়া।

আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া॥" (ঐ/১৯)

আবার প্রথার দায়ে ষোড়শী কন্যার বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হলে কনের মাতা বা সখীদের কিছুই করার থাকত না কিন্তু তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে গালিগালাজ করত। এখানে বাঙালী নারীর বিশিষ্ট মনোভঙ্গী ও বাক্রীতির প্রকাশ বাঙালীর নিজস্ব বিষয়।বৃদ্ধ শিবঠাকুরকে দেখে উপস্থিত নারীগণ গৌরীর পিতাকে তিরস্কার করে এই কথাগুলি বলে—

"বর দেখি এয়োগণ করে কানাকানি।

চক্ষু থাক্ পিতা চক্ষে পড়ুক ছানি।

হেন বরে কন্যা দেয় কি দেখি সম্পদ।

বাপ হয়ে মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।"(ঐ)[১০৪]

কিংবা মেনকার বাক্‌রীতি বিশেষত্বপূর্ণ—

"মর মর হেমন্ত তোমারে কব কি।
এ বুড়া পাগল বরে দিলা হেন ঝি॥" (ঐ)

আবার শিবের মদনমোহন রূপ দেখে তারাই নিজ নিজ স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে পতিনিন্দা করেছে। এরকম বিচিত্র বাঙালী মানসিকতার প্রকাশ আছে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানব চরিত্রগত অনুবর্তন লক্ষণীয়। বস্তুতপক্ষে মনসা চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালের দেবী, আর চণ্ডী চৈতন্য-পরবর্তীকালের দেবী বলে চিহ্নিত করলে লক্ষ করা যায় মনসামঙ্গল থেকে চণ্ডীমঙ্গলে আচার-বিচার-সংস্কারগত বিষয়টি ব্যতিরেকে মনসাই ক্রমাগত চণ্ডীতে রূপান্তরিত হয়েছে। মনসা থেকে চণ্ডীর উত্তরণ বস্তুতপক্ষে সমাজের উত্তরণ। প্রথম যুগে রচিত মনসামঙ্গলে মনসার যে লোলুপতা ও ক্রূরতা দেখা যায় পরবর্তীকালের কাব্যে তা দেখা যায় না, পক্ষান্তরে চণ্ডী অনেক বেশী মমতাময়ী। মনসার কখনো মাতৃসুলভ আচরণ দেখা যায়নি অথচ জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা পীরিতের পূজা কামনা করে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে চেয়েছে, আর চণ্ডীর কালকেতুর সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। বণিক খণ্ডে চণ্ডী নারী দেবতা হিসাবে শৈব সমাজে জায়গা করে নিতে একটু সময় নিয়েছে মাত্র। খুল্লনা, শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর ভক্ত; ধনপতির চণ্ডী বিরোধিতার ভিত্তি খুব শক্ত নয়, চাঁদের মত দৃঢ়তা তার চরিত্রে নেই; যদিও বন্দিশালে দেবী ধনপতিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে চণ্ডী পূজার পরামর্শ দিলে ধনপতি জানায়—

"যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥"(ঐ/১৬৫)[৩৩]

আসলে ধনপতির চণ্ডী বিরোধিতার প্রত্যক্ষ কোন কারণ নেই। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে মনসার ক্রূরতা হ্রাস পেয়ে কোমল হয়েছে। চণ্ডী অনেক বেশী মাতৃপ্রতিম, কালকেতুকে বর দিয়ে কৌশলে পশু সমাজকে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। কালকেতুর অনিষ্ট নয়— কারণ পশুগণ ও কালকেতু সবাই তার ভক্ত। তাই লক্ষণীয়, মনসামঙ্গলে রাখালগণ, মুসলমান কাজী, চাষাভূষা বচাই, জালুমালু প্রত্যেকেই মনসার বিরোধিতা করে শেষে ভক্ত হয়েছে; এমন কি সনকা মনসার ভক্ত নয়, দেবীর ঐশ্বর্যের কথা শুনেই সে ভক্ত হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীর পূজা প্রচারের পথ অনেক মসৃণ; একমাত্র ধনপতি ছাড়া সবাই দেবীর অনুকূলে। তাই চণ্ডী সহজেই ধনপতির পূজা আদায় করতে পেরেছে, তাকে ক্রূর হতে হয়নি, অন্যায় বা নীচতা প্রদর্শন করতে হয়নি। তাছাড়া মধ্যযুগে নারীই নারী শক্তির প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে। মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায় চণ্ডী, কিন্তু চণ্ডীর প্রতিষ্ঠায় নারী অনুকূল, এইভাবে সমাজচরিত্রগত বিবর্তনটি ধরা পড়েছে। ব্যাধ কাহিনী বাদ দিলে চণ্ডীমঙ্গলে বণিক খণ্ডের সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনীগত একটা সম্পর্ক আছে। ধনপতি-চাঁদসদাগর, লহনা-সনকা, খুল্লনা-বেহুলা, শ্রীমন্ত-লখীন্দর বিবর্তিত চরিত্র হতে পারে। সনকা যেখানে চাঁদের লোলুপতা ও ক্রূরতাকে নীরবে সহ্য করে গেছে, লহনা ধনপতির প্ররোচনায় ভুলে গেলেও নিজের দাবী সহজে ছাড়তে চায়নি। বেহুলা শুধু মাত্র দৈবপ্রত্যাশী বাঙালী গৃহবধূ কিন্তু খুল্লনা নিজ পুত্রকে তৈরী করেছে নিজের অনুকূলে। সে ও অবশ্য বাঙালী গৃহবধূ, বাঙালী মা। লখীন্দর যেখানে নিষ্ক্রিয় চরিত্র, সেখানে শ্রীমন্তের ব্যক্তিত্ব অনেকটাই জাগ্রত। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন যেটুকু ব্যক্তি চেতনার জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল তা চণ্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলিতে রয়েছে। অন্যান্য কতকগুলি গৌণচরিত্রে.মধ্যযুগীয় ব্যক্তিত্বহীনতার ছাপ আছে, যেমন ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর সেকালের অলস, অকর্মণ্য জমিদার পুত্র, বাপের আদরে, সে মায়ের স্নেহে পালিত। পিতার আদেশে ফুল তুলতে গিয়ে ধর্মকেতুকে শিকার করতে দেখে নিজের প্রতি তার ধিক্কার জেগেছে, কারণ পিতার শিবপূজা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত তার খাওয়ার উপায় নেই। মধ্যযুগে এক শ্রেণীর ধনী জমিদারপুত্ররা আরামে-আয়েসে দিন যাপন করত। নীলাম্বর নিজের সম্পর্কে বলেছে—

"না করিনু কোন কর্ম্ম বিফল দেবতাজন্ম

বিদ্যার না কৈনু অন্বেষণ।

না করিলু ধনুশিক্ষা কেমনে পাইব রক্ষা

যদি হয় দেবাসুরে রণ॥" (ঐ/৩২)[১৩৬]

শিব চরিত্রেও পরিবর্তন দেখা যায়। মনসামঙ্গলের শিবঠাকুর হীন চরিত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজপতি, এবং চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী; মনে করা যায় মনসামঙ্গলের শিব চরিত্রেরই অনিবার্য পরিণতি চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর।

জাতিবৃত্তি ঃ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গঠন সমৃদ্ধ ও তথ্য সমৃদ্ধ কাব্য চণ্ডীমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে পরিব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতায় কবিকঙ্কণ চণ্ডী অনন্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন অংশে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের অখণ্ড চিত্র আছে। প্রত্যেক কবিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালী সমাজের জাতি-বৃত্তিগত বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ চণ্ডী অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। 'মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থের 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধে ডঃ সুমঙ্গল রাণা লিখেছেন- "নব-নির্মিত গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির সমাগম উপলক্ষে বাঙ্গালী সমাজের একটি অখণ্ড চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেবলমাত্র সমাজসচেতনতার কথা নয়, সমাজতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করেন বিষয়টি তাঁদের কাছেও সবিশেষ মূল্যবান। কারণ জাতিভেদ অবলম্বন করেই বাঙ্গালী সমাজের কাঠামো। কেবল বাঙ্গালী সমাজ নয়, জাতিভেদ সমগ্র ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি।বর্ণবিন্যাস আর্য-সমাজব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন ছিল। আর্যগণ এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে এদেশের সমাজব্যবস্থাতেও বর্ণবিন্যাস প্রবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র আর্য সংস্কারের এই মূল চারটি বর্ণ ছাড়াও অব্রাহ্মণ যে ছত্রিশটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি ওই চার বর্ণের সংসর্গজাত সন্তান থেকে সৃষ্ট। - - -মুকুন্দের কাব্যে সেকালের সমাজে কোন্ কোন্ জাতি কি কি কর্মে নিযুক্ত থাকতো তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।"[১৩৮] এ মন্তব্য বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ছত্রিশটি বর্ণের উল্লেখ থাকলেও একচল্লিশটি বর্ণের নাম আছে, অর্থাৎ প্রথমে ছত্রিশটি বর্ণ থাকলেও পরে পাঁচটি উপবর্ণ যুক্ত হয়েছে তালিকায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও ছত্রিশটি জাতির কথা আছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নতুন নতুন সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে সমাজে নতুন নতুন বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এই জাতি-বৃত্তির বিস্তৃত পরিচয় আছে এবং কোন্ কোন্ জাতি বা বর্ণের মানুষ কোন্ বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত থাকত তার পরিচয় আছে। অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতেও তার সামান্য পরিচয় আছে। মানিক দত্তের কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরে জনবিন্যাসের পরিচয় রয়েছে। এখানে জন্মভিত্তিক ও বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর উল্লেখ আছে, যথা- জন্মভিত্তিক শ্রেণীতে পড়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কোচ, দোসাউদ,ডোম, ব্যাধ, যবন, চাঁই, কেওট, হাড়ি, কাড়ি, কৈবর্ত, গুড়ি, পরি, কুড়ি, বারুই, তিওর, চাঁড়াল, পাঠান, ইত্যাদি। আবার বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীর মধ্যে তেলী, নবনিয়া, গোপ, বাণিয়া, আহীর, সূত্রধর, করাতি, তাম্বুলী, নাটুয়া, ভাট, পালী, বায়ন, নাপিত, গুনী, জুগী, চাষা, সন্ন্যাসী, বৈদ্য, বেরুণিয়া, ভাণ্ডারিয়া, গোয়ালা, মালী, কামার, কুমার, জালিয়া., তাঁতি, মোদক, হালুই, পক্ষবেচা, মাছুয়া, ঢালী, বন্দুকী, লস্কর, পাইক, ধানুকী, ভারী, কারিগর, বাদিয়া, দাই, কাহার, পাচতি ইত্যাদি। মানিক দত্তের বর্ণনানুসারে—

"কত জাতি ব্রাহ্মণ বৈসে লেখা নাহি তারে॥

কাএস্ত বসিয়া গেল বৈদ্য আশি ঘর।

. . . .

তেলী মালী বসি গেল কুমার কামার।

ছত্রিশ জাইত প্রজা বৈসে বীরের বাজার॥"(মানিক/১৩২)

স্থানের নামকে ভিত্তি করে কিছু জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যথা— উড়িয়া, বাঙালী, তৈলঙ্গা, রোহিলা ইত্যাদি। ব্যবসা-বাণিজ্য বা যুদ্ধবিগ্রহের কারণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। চণ্ডীমঙ্গলে বিভিন্ন জাতির গাঁঞি-গোত্র সমেত পরিচয় আছে। বিভিন্ন উপাধিধারী ব্রাহ্মণের বিভিন্ন গোত্র। বিভিন্ন গোত্রের ব্রাহ্মণের মধ্যে কাস্যবংস, সাবর্ণিক সম্ভবত পঞ্চ গোত্রের প্রধান; তাছাড়া শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নিম্নগোত্রের ব্রাহ্মণ। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে আছে—

"কাস্যবংস যত আইসে সাবর্ণিক লইয়া বৈসে
বৈসে পঞ্চ গোত্রের প্রধান॥
. . . .
বসিল শাণ্ডিল্যধারা ভরদ্বাজে বান্ধে পাড়া
কাশ্যপ বসিল স্থানে স্থান॥" (দ্বিজ রামদেব/৭৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের উপাধি সমেত পরিচয় দিয়েছেন, এগুলি হল— মুখুটি, চাটুতি, বন্দ্য, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল, গাঙ্গুলী, হড়, কেশর, গুড়, পূতিতুণ্ডি, বড়াল, মতিলাল, পিপ্‌লাই ইত্যাদি। কবি কঙ্কণের বর্ণনানুসারে—

"কুলে শীলে নহে নিন্দ্য মুখুটি চাটুতি বন্দ্য
কাঞ্জিলাল গাঙ্গুলী ঘোষাল।
. . . .
বটগ্রামী নন্দী-গাঁই ভাটাতি সিদ্ধলদায়ী
নায়েবী কোয়াবী মতিলাল॥" (মুকুন্দ/৬৯)

ব্রাহ্মণের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন— বরেন্দ্রী, রাঢ়ী ইত্যাদি। বরেন্দ্রীরা বোধহয় অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কেননা তাদের গাঁই নাই গোত্র আছে। মুকুন্দ লিখেছেন—

"গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বীরের কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সাত শত॥" (ঐ)

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ নামে এক ধরনের ব্রাহ্মণের কথা আছে দ্বিজ মাধবের কাব্যে; এরা সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সুস্পষ্ট উচ্চ-নীচ ব্যবধান ছিল চণ্ডীমঙ্গলে তার পরিচয় আছে। কেননা গুজরাট নগরে ব্রাহ্মণগণও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বাসস্থান পায়—

"বিপ্রবর্গ যত আইসে বীরের নগরে বৈসে
যার যে জানিয়া যোগ্য স্থান॥"(দ্বিজ রামদেব/৭৬)

ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল প্রধানত যজন-যাজন, পূজাপাঠ, অধ্যাপনা; শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরা সাধারণত পূজাপাঠ, হোম, বেদপাঠ করত। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ অধ্যাপনা করত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে আছে—

"শ্রেত্রিয় যথেক বৈসে নিত্য চারি বেদ পঠে
জপ হোম করয়ে তৎকাল॥
আর আর দ্বিজগণ কেহ করে অধ্যাপন
যজন-যাজন বহুতর।
উচ্চারি প্রণব দ্বিজকুল সম্ভব
হুতাশনে হোমে নিরন্তর॥" (দ্বিজ মাধব/৬৫)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ ধর্মচর্চা, শাস্ত্রচর্চা, অধ্যাপনা পূজাপাঠ নিয়েই থাকত। গ্রহ-বিপ্রগণ শাস্ত্রবিচার করে কুলজি, ঠিকুজি রচনা করত। আবার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী হয়ে ধর্মচর্চা করত—

"গুজরাটে এক পাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে
বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্র বিচার করে
বালকের লেখে জন্মপাতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কপালী ঘটা
ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চিন্ ভিক্ষা করি অনুদিন
এক পাশে তারা সব বৈসে॥" (মুকুন্দ/৬৯)[১৩৭]

এক শ্রেণীর শিক্ষাদীক্ষাহীন ব্রাহ্মণ যজমানিবৃত্তি অবলম্বন করে ঘরে ঘরে দেবপূজা করে, ভিক্ষা করে, শ্রাদ্ধশান্তি, ঘটকবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কবিকঙ্কণের বর্ণনায়—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান
. . . .
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥" (ঐ)[১৩৮]

চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে মনে করা যায়। চণ্ডীমঙ্গলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা পাই, সম্ভবত ব্রাহ্মণরাই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল; যদিও চৈতন্যদেব আচণ্ডাল বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এরা সাধারণত সর্বদা হরিনাম সংকীর্তন করত—

"সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইমান
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।" (ঐ)[১৩৯]

পরবর্তীকালে বৈষ্ণবগণ বোধ হয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য হয়েছিল, তাই মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের অংশেই বৈষ্ণবদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া ক্ষত্রিয়রা সাধারণত শাসনকার্য পরিচালনা করত, এদের মধ্যে মল্ল, রাজপুতরা সেনাবাহিনীতে কাজ করত, যুদ্ধবিগ্রহ করত।বৈদ্যরা চিকিৎসা করত, এদের উপাধি হল— গুপ্ত, সেন, দাস, দত্ত, কর ইত্যাদি। কায়স্থগণের মধ্যে প্রধান হল ঘোষ, বসু ও মিত্র, তাছাড়া পাল, নন্দী, পালিত, সিংহ, দেব, কর, নাগ, সোম, চন্দ্র, ভঞ্জ, বিষ্ণু রাহা, বিন্দ ইত্যাদি উপাধিধারীগণ। এরা সাধারণত বিদ্যাচর্চা, রাজদ্বারে চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করত অর্থাৎ এরা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে গণ্য হত। দ্বিজ মাধব লিখেছেন—

"কা'স্ত বৈসে নগরে করেতে কলম ধরে
কেহ কেহ বৈসে রাজ-দ্বারে॥" (দ্বিজ মাধব/৬৬)

মুকুন্দ চক্রবর্তী 'অগ্রদানী' বলে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এরা পতিত ব্রাহ্মণ। এদের বৃত্তি মৃতের শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ—

"বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানীগণ বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেয় বৈতরণী ধেনু লয়
হেম রজত লয় তিলদান॥" (মুকুন্দ/৭০)[১৪০]

বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অম্বষ্ঠ ও করণ দুই বর্ণ সঙ্কর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এরা ব্রাহ্মণের পরেই মর্যাদা পেয়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী এদের জাতি ও বৃত্তির উল্লেখ করেছেন। বণিক ও নবশাখ সম্প্রদায় বৈশ্য; এদের জাতি ব্যবসা বা জাতিগত বৃত্তি ছিল। এরা হল গোপ, তেলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, নাপিত, কামার, কুমার, তন্তুবায়, মোদক, সরাক, কাঁসারি, শাঁখারি, সুবর্ণ বণিক ইত্যাদি। এদের বৃত্তিরও উল্লেখ আছে, যেমন— গোপরা কৃষিকার্য করত, তেলীরা তেল বিক্রয় করত, কামাররা লোহার জিনিসপত্র তৈরী করত, তাম্বুলীরা পান-সুপারি বিক্রয় করত, কুমারগণ মাটির হাঁড়ি তৈরী করত, মালীরা ফুল বিক্রয় করত, বারুইরা পান চাষ করত, নাপিত ক্ষৌরকর্ম করত, মোদক মিষ্টান্ন তৈরী করত, সরাকগণ তাঁতি না হলেও কাপড় বুনত, গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করত গন্ধবেণেরা, শাঁখারিগণ শাঁখা তৈরী করত, কাঁসারীগণ কাঁসার জিনিসপত্র তৈরী করত, সুবর্ণ বণিকগণ গহনার কাজ করত। এই বৃত্তিধারীরা ব্রাহ্মণদের কাছে একেবারে জলঅচল ছিল না। এদের মধ্যে তেলী, তাম্বুলী, বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কামার, কুমার, তন্তুবায়, মোদক নবশাখ বলে চিহ্নিত। এদের পরেই বিভিন্ন শ্রেণীর বণিকদের স্থান। এর পরে আসে বিভিন্ন অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য জাতির মানুষ, যেমন- কলু, বাইতি, বাগদী, মাছুয়া বা জেলে, কোচ, ধোবা, দরজি, সিউলি, ছুতার, পাটনি, ভাট, চৌদুলি চুনারি, মাঝি, কোরঙ্গা, ধোয়ারা, ধাজি, মাল, চণ্ডাল, কোয়ালি, মারহাটা, পুলিন্দ, কিরাত, কোল, জায়াজীবী, কেওলা, হাড়ি, শুঁড়ি, চামার, ডোম ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের বৃত্তিগত অবস্থান আছে, এরা মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় সেবক শ্রেণীর অন্তর্গত। জেলে বা মাছুয়ারা এবং কোচরা জাল বুনত ও মাছ ধরত, কলুরা ঘানি দিয়ে তেল তৈরী করত, বাইতি বাজনা বাজাত, বাগদীরা পাইক ও বরকন্দাজের কাজ করত, পাটনী নৌকা পারাপার করত, ধোবা কাপড় ধুত, সিউলিগণ খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরী করত, দরজি কাপড় সেলাই করত, ছুতাররা মুড়ি-চিড়া ভাজত ও চিত্র নির্মাণ করত, চৌদুলিরা দোলা বহন করত, চুনারী চুন তৈরী করত, মাঝিরা খেয়া দিত, কোরঙ্গাগণ কাপড়ে মাড় দিত, কোয়ালিগণ গোহাল্যা গীত গাইত ও গোয়ালপূজা ক'রে ভিক্ষা করত, চণ্ডালরা লবণ বিক্রয় করত, মারহাটারা চোখের ছানি ও প্লীহা কাটত, হাড়িরা ঘাস কেটে বিক্রয় করত, পুলিন্দ, কিরাত ও কোলরা হাটে ঢোল দিত ও সংবাদ বহন করত, শুঁড়িরা মদ চোলাই করত, চামার জুতা সেলাই করত, ডোমরা বাঁশ ও বেতের কাজ করত। কবিকঙ্কণের কাব্যে বারবধূদের উল্লেখ আছে, সমাজে তাদের ও স্বতন্ত্র বাসস্থান ছিল, কিন্তু এরা অস্পৃশ্য ছিল। বণিকরা অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজে স্থান করে নিতে পেরেছিল। যাই হোক, গুজরাট নগরের জনবিন্যাস থেকে স্পষ্ট যে সমাজে ধীরে ধীরে নতুন নতুন জাতি সৃষ্টি হয়ে সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। তাই বারবধূরাও পৃথক শ্রেণী হিসাবে বাসস্থান পেয়েছে। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত বাঙালী হিন্দুসমাজের অনেক জাতি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন— রাঢ়, সরাক, সিউলি, কোরঙ্গা, কোয়ালি, চুনারি, চৌদুলিয়া ইত্যাদি। 'রাঢ়' একটি অঞ্চল বিশেষ হলেও জাতি বাচক শব্দ। কবিকঙ্কণ রাঢ়বাসীদের কথা বলেছেন কালকেতুর মুখে-

"ব্যাধ হিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়
এই স্থান শ্মশান সমান।
আমি কহি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরানী
প্রবেশিলে উচিত হও স্নান॥"[১৯ / ১৪১]

'রাঢ়' জাতির বৃত্তি ছিল শিকার ও পশুহত্যা, এরা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। সরাকগণ ছিল জৈন শ্রাবক, এরা নিরামিষ ভোজী এবং এরা পশুহত্যা করত না। এদের বৃত্তি তন্তুবয়ন কিন্তু এরা তাঁতি নয়।[২০]

চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের মধ্যে দিয়ে বাঙালী হিন্দুর সমাজ সংগঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের মধ্যমণি সুতরাং তারা বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিল এবং তারা নগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। মানিক দত্ত লিখেছেন- "ব্রাহ্মণ টোলা বসিল নগর মাঝারে।"(মানিক /১৩২)।

কবিকঙ্কণের বর্ণনা অনুসারে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক, ইতর জাতি, এমন কি বেশ্যাগণও গুজরাট নগরে স্থান পেয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সমাজে এদের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল। কবির অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সকলেই বাস করার অধিকার পেয়েছে। আসলে সে যুগে সমাজ সংগঠনের ফলে হিন্দুর গ্রামে সকলেরই প্রবেশাধিকার ঘটেছিল, এমন কি মুসলমানরাও গ্রামের নির্দিষ্ট এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। মানিক দত্তের বর্ণনানুসারে ষোড়শ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় প্রথমাবধি এ সকল বিভিন্ন জাতির মানুষের সহাবস্থান সম্ভব হলেও প্রত্যেকের সুসম্পর্ক বজায় ছিল তা নয়, বরঞ্চ বলা যায় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়গুলির নৈতিক, সংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক যোগেযোগ ছিল না। মানিক দত্ত গুজরাট নগরের জনগণ সম্পর্কে বলেছেন—

"কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহ নাহি জাএ।
কাহার পুষ্কনির জল কেহ নাহি খাএ॥" (মানিক/১৩৩)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে নবাগত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুসমাজের সংঘর্ষের চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে বিবরণ অনুসারে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান সম্ভব হয়েছিল।

হিন্দুসমাজের মত মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন মানিক দত্তের কাব্যে আছে পাঠান, খোজা, মীর, কাজী, ফকির, মোল্লা, সেক, মীরবাখর ইত্যাদি শ্রেণীর মুসলমানের কথা। মানিক দত্ত লিখেছেন—

"গাও দশ খোজা বৈসে এ মরা নগরে।
কাজি মোল্লা জত সব বসিল থরে থরে॥
সেক ফকির বৈসে গেল শানকি বোঝা ২।
এক সাথে বৈসে গেল আশি হাজার খোজা॥" (ঐ/১৩২)

এদেশে আগত মুসলমানদের নানান বিভাগ ছিল, যথাক্রমে— সৈয়দ, মোগল, পাঠান, কাজী, মোল্লা, ইত্যাদি। পাঠানদের মধ্যেও নানা বিভাগ ছিল যথা- সাবানি, লোহানি, লোদানি, সুরয়ানী ইত্যাদি। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে-

"আইসে চড়িয়া তাজী সৈয়দ মোগল কাজী
খয়রাতে দিল বীর বাড়ি।
. . . .
সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার
পাঠান বসিল নানা জাত॥" (মুকুন্দ/৬৮)[১৪২]

মুসলমানদের নানান বৃত্তি ছিল, যথা— কাজীরা বিচারকার্য পরিচালনা করত, মোল্লারা ধর্মাচরণ করত, কলমা পড়ে নিকাহ বা বিয়ে দিত, মক্তব বা পাঠশালা করে শিক্ষাদান করত—

"মোল্লা পড়ায়ে নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
. . . .
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব স্থান
মখদম পড়ায় পঠনা।" (ঐ)[১৪৩]

হিন্দুর জাতিব্যবস্থার পীড়নে অন্ত্যজ হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হল কিন্তু বৃত্তি বদল হল না, নতুন নামে শ্রমজীবী উৎপাদক শ্রেণী হিসাবে মুসলমান সমাজেরই নিম্নকোটিতে স্থান পেল। হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে মুসলমানদের মধ্যেও নানা

বৃত্তিজীবী উপশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন— গোলা, জোলা, বেনটা মুকেরি, পিঠারি, সানাকর, কাবাড়ি, গরসাল, তাঁতি, তীরকর, কাগচী, কলন্দর, রঙরেজ, হাজাম, দরজি ইত্যাদি। ডঃ আহম্মদ শরীফ এসম্পর্কে লিখেছেন— "তাই তাঁতী মুসলিম হয়ে হল জুল্‌হা; হাড়ি-ডোম-বাগদি-চাঁড়াল-ব্যাধ নামান্তরে হল জেলে, নিকেরী, কাহার, কসাই, মুলঙ্গী, রঙরেজ, মুজারী, কাগজী, মণ্ডল, বিশ্বাস, সর্দার প্রভৃতি না ঘুচল তাদের অশিক্ষা, না ঘুচল তাদের দারিদ্র্য।"[২১] মুকুন্দের বর্ণনা অনুসারে গোলারা নিয়মিত রোজা-নমাজ করত, জোলারা তাসন করত (তক্ষন বা বোনা বা বয়ন), বলদের গাড়ী চালাত মুকেরিরা, পিঠা বিক্রয়কারীরা পিঠারী, সানা নির্মাণ কারীরা সানাকর, কাবাড়িরা মাছ বিক্রয় করত, পট আঁকা ও বিক্রি করা তাঁতিদের কাজ, তীরকরগণ তীর তৈরী করত, কাগচীরা কাগজ তৈরী করত, রঙরেজরা কাপড় রং করত, হাজামরা সুন্নত করাত, দরজি কাপড় সেলাই করত, নেয়াল (মশারীর একজাতীয় ফিতে) বুনত বেনটারা। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দের বর্ণনা অনুসারে গুজরাট নগর পত্তনে জনবিন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। আসলে মুকুন্দ চক্রবর্তী একটি আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তাই কালকেতুর গুজরাট নগরে হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমানগণ স্বতন্ত্র হাসনহাটি গ্রাম স্থাপন করে বসতি স্থাপন করে। দ্বিজ মাধবের কাব্যেও এই কথা পাই—

"বৈসয়ে মুসলমান পড়ে কিতাপ কোরান
নমায়াজ পড়ে পাঁচবার।
সোলেমানী মালা করে খোদার নামে জিগির কাঢ়ে
সৈদ কাজী বোসিল অপার॥" (দ্বিজ মাধব/৬৮)

কালকেতুর গুজরাট নগরের মুসলমান প্রজারা ধর্মপরায়ণ, তারা আপন আপন ধর্মাচরণ নিয়েই থাকে। কবিকঙ্কণের কাব্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রোজ ভোর বেলা উঠে পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়ে, সোলেমানি মালা জপে, পীরের মাজারে বাতি জ্বালে, সিরনী বাঁটে, নিয়মিত রোজা করে, কোরাণ পাঠ করে। মোল্লারা বিবাহ বা নিকাহ দেয়,তাদের ধর্মীয় প্রভাবের কারণে মুসলমান সমাজে তারা যথেষ্ট প্রতিপত্তি ভোগ করত। সাধারণ মানুষ তাদের দান- খয়রাত করত। উৎসবে মোল্লারা মুরগী ও বক্‌রী জবাই দিত, বিনিময়ে তারা মাথা অংশটি লাভ করত। তাছাড়া মুসলমান সমাজে শিক্ষার দায়িত্বও তারা পালন করত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা বুক আচ্ছাদিত করে দাড়ি রাখত, মাথায় টুপি ব্যবহার করত, নারীগণ বোরখা, ইজার পরিধান করে চলাফেরা করত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের কাছে অসহিষ্ণু ছিল, কিন্তু বাংলাদেশে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে তারা ধীরে ধীরে সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করতে থাকে। সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে সমকালের সমাজ ইতিহাসের এই প্রসঙ্গগুলিই কম বেশী মূর্ত হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ জীবনে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ, ওঝা, বৈদ্য, সমাজপতিদের যেমন যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল, ঠিক তেমনি মুসলমান সমাজে কাজী, গাজী, মোল্লা, পীর, সৈয়দদের প্রভাব ছিল। অনেকক্ষেত্রে পরধর্ম বিদ্বেষী তো বটেই আপন প্রভাববশত তারা সমাজে নানান অপকর্ম ও কুকর্ম করত। হিন্দুরা মুসলমানদের ধর্মকর্ম, আচার-আচরণ, এমন কি আহার-বিহারের প্রতিও কটাক্ষ করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবি অসম্প্রদায়িক মনোভাবে মুসলমানদের অনাচার ও অধর্মের নিন্দা করেছেন, অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন। ভাঁড়ু দত্তের মত মানুষরা আপন প্রতিপত্তিবশত সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করত। আবার মুকুন্দ মূর্খ বিপ্রদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— তারা ভিক্ষা করে, শ্রাদ্ধশান্তি করে, যজমানের কাছে বলপূর্বক দক্ষিণা আদায় করে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"গুজরাট নগরে নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে

গ্রামযাজি হয় অধিষ্ঠান।

সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়   কাহন দক্ষিণা হয়

হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥" (মুকুন্দ/৬৯)[১৪৪]

সাধারণ মানুষের গ্রামীণ সমাজের রূপটি চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উচ্চবর্ণের মানুষরা বংশগৌরব এবং উচ্চবর্ণের সমাজে জন্মগ্রহণ করার জন্য অহংকার ও গৌরব বোধ করত। বংশমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে পল্লীসমাজে বিভিন্ন উপলক্ষে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে রীতিমত লড়াই হত। কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে রীতিমত মর্যাদার লড়াই হয়, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কুরুচিকর গ্রাম্য দলাদলি ও বচসা-বিবাদ করে। ভাঁড়ু দত্তের মধ্যে এমনিতর মনোভাব দেখি। শঠ এবং অনাচারী হলেও নিজের বংশমর্যাদা সম্পর্কে সে সগর্ব উক্তি করে। শুধু তাই নয়, উচ্চবংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ, উচ্চবংশে কন্যা সম্প্রদান, উচ্চবংশীয় কুলীন ব্যক্তিদের নিজ গৃহে আহার করানো মর্যাদাকর বলে গণ্য হত। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে–

"যতেক কায়স্থ দেহ   ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ

কুল শীল বিচার মহত্বে।

কহি আপনার তত্ত্ব   আমলহাঁড়ার দত্ত

তিন কুলে আমার মিলন।

ঘোষ ও বসুর কন্যা   দুই নারী মোর ধন্যা

মিত্রে কৈল কন্যার গ্রহণ॥

গঙ্গার দুকূল পাশে   যতেক কায়স্থ বসে

মোর ঘরে করয়ে ভোজন॥" (ঐ/৬৭)[১৪৫]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান উপলক্ষে সমবেত গ্রাম্য সমাজপতিদের কথোপকথনে যে গ্রাম্য দলাদলি ও নিম্নরুচির পরিচয় পাওয়া যায় তা সমাজ ইতিহাসে বাস্তব তথ্যসম্মত। সাধারণত ব্রাহ্মণগণ অন্য সম্প্রদায়ের ঘরে অন্নগ্রহণ করত না, তা নিয়েও সমাজে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হত। খুল্লনার পরীক্ষাদানের সময়ে গ্রাম্য সমাজপতিদের বাস্তব ছবি পাই। এযুগে অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজে কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটেছিল, বিশেষতঃ বণিক সম্প্রদায় অর্থ কৌলীন্যের জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। একারণে প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই প্রায় বণিক সম্প্রদায়ের আধিপত্য, এবং দেবী স্বয়ং প্রতিষ্ঠার জন্য বণিক সম্প্রদায়কে বেছে নিয়েছে। গ্রামীণ সমাজ খুল্লনার পরীক্ষা নিতে চাইলে ধনপতি অর্থ দিয়ে সমাজের মুখ বন্ধ করতে চায়। ধনপতি খুল্লনাকে বোঝায়—

"তোরে বলি প্রিয়ে   বসে থাক গৃহে

পরীক্ষায় নাহি কাজ।

ঠেকিলে পরীক্ষে   না দেখিব চক্ষে

ভুবন ভরিবে লাজ॥

.. ..

দূর কর শঙ্কা   দিব লক্ষ তঙ্কা

বান্ধবে করিব বশ।

আর যে বিপক্ষ   তারে দিব লক্ষ

ধন থাকে দিন দশ॥"(ঐ/১৪৩-১৪৪)[১৪৬]

কবি কঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের কাব্যেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যেমন—

"সাধু বলে পরীক্ষাএ কোন প্রয়োজন।
লক্ষ তঙ্কা পাইলে জ্ঞাতি করিবে ভোজন॥" (মানিক/২৪৯)

বস্তুতপক্ষে অর্থ কৌলীন্যের বলেই বণিক হলেও গ্রামীণ সমাজে ধনপতির প্রতিষ্ঠা ছিল। ব্রাহ্মণরা ধনপতির গৃহে অন্নগ্রহণ করত। খুল্লনার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব; সে অর্থগৃধ্নু সমাজপতিদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিল, তাই সে পরীক্ষা দ্বারা সতীত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কেননা সে জানত-

"অবধান প্রাণনাথ বলি হে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে রঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক।"(মুকুন্দ/১৪৪)[১৪৭]

মুসলমান সমাজেও মৌলবী, মোল্লা ও কাজীদের ভণ্ডামীর পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে মুসলমান কাজীদের ভণ্ডামীর পরিচয় আছে। তারা সাধারণ মানুষের প্রতি সুবিচার করত না। মুসলমানরা অনাচারী ছিল তাই খাবার পর কাপড়ে হাত মুছত। মৌলবী, মোল্লারা একাধিক বিবাহ করত; শুধু তাই নয়, তারা অর্থগৃধ্নু বলে সাধারণ মানুষের কাছে মুরগী জবাই করে কড়ি এবং বক্‌রী জবাই করে তার মাথা অংশ আদায় করে নিত—

"করে ধরি খর ছুরী মুরগী জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বখরী জবাই যথা মোল্লারে দেহ মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥" (ঐ/৬৮)[১৪৮]

মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের এমনিতর নানা অপকর্ম ও নিম্নরুচির পরিচয় আছে।

নগর পরিকল্পনা ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর গৃহনির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত সুরম্য পুরীর কথা পাওয়া গেলেও বাস্তবে তা মাটির তৈরী বাড়ি মাত্র। বাঙালীর বাড়িঘর তৈরী হত সাধারণত কাদামাটি, বাঁশ, কাঠ, খড়, দড়ি ইত্যাদি দিয়ে। তার সঙ্গে পাথর ও ইট দিয়ে ধনীরা বাড়ি তৈরী করত। উপরে ছাউনি চালা হিসাবে থাকত সাধারণত খড়, ছন ইত্যাদি। কবিকঙ্কণ 'কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণ' অংশে গুজরাট নগরে গৃহনির্মাণের বর্ণনা করেছেন—

"বীরের তুলিতে ঘর হয়ে সাবধান॥
আওয়াস তুলিল এক ক্রোশ পরিমাণ।
আপনি কোদালি ধরে বীর হনুমান॥
.. ..
কাদা তুলে দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালকূড় সম হনুমান তোলে ঢেলা॥
এমন প্রাচীর দিল হৈল চারি পাট।
বাউটি পাথর তায় দিল ঝনঝাট॥
তাল তরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর।
পাথরের দাঁত্যা দিল হনুমান বীর॥
মূড়লী রচিয়া তথি আরোপিলা কাট।
চারি হালা খড়ে বিশাই ছায় চারি পাট॥

পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা।
মাঝে আড়চাল পিঁড়া বান্ধে দিয়া শিলা॥" (ঐ/৬২)[১৪৯]

কালকেতুর পূর্ব বাসস্থান তৈরী হয়েছিল 'নাড়া' দিয়ে অর্থাৎ ধান কাটার পর মাঠে পরিত্যক্ত ধান গাছের কাণ্ড দিয়ে। সাধারণ দরিদ্র মানুষের গৃহনির্মাণ হত সাধারণ ভাবে।তাদের থাকত একটি বা দুটি ঘর। কালকেতু গৃহনির্মাণকালে 'নাড়া'র কুঁড়েঘর ভেঙে কোঠাবাড়ি তৈরী করে- "ভাঙ্গিয়া ফেলিল মহাবীর নাড়ার কুড়ীয়া।" (মানিক/১১৭)। কালকেতুর পুরী নির্মাণ আসলে সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহনির্মাণ, যেখানে আছে আশঘর, পাশঘর, শয়নঘর, ভাণ্ডারঘর, রন্ধনশালা, দেবগৃহ ইত্যাদি। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য অন্তঃপুরের বাহিরে পৃথক ঘর থাকত। প্রতিটি ঘরে পিঁড়া বা বারান্দা থাকত; আড়চাল দিয়ে মূল গৃহের সংলগ্ন বারান্দা নির্মিত হত। মানিক দত্তের কাব্যে কালকেতুর গৃহনির্মাণে বিভিন্ন প্রকার ঘরের কথা পাই—

"গহীন ২ বীর গহীন কৈল বাড়ি।
দুই পহরের পথে কাশের কড়কড়ি॥
বাড়ি বেড়িয়া বান্ধে বীর একশত ঘর।
য়ওারি চৌয়ারি বান্ধে উত্তরা মহল॥
আশ ঘর পাশ ঘর শয়ন মন্দির।
ভাণ্ডারিয়ার বাসা বান্ধে অন্তঃপুরীর বাহির॥" (মানিক/১১৮)

ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির গৃহে, জমিদার বাড়িতে পৃথক মন্ত্রণা কক্ষ বা দেওয়ানি কক্ষ থাকত। মানিক দত্ত লিখেছেন—

"দেওানি করিতে টঙ্গ বান্ধে ভালমতে। (ঐ)

দেবগৃহ বা মন্দির, পুকুর ইত্যাদি বাঙালীর মূল বাসস্থানের একটি সম্পৃক্ত অঙ্গ হিসাবে নির্মিত হত। যেমন—

"বান্ধিল দেহরা ঘর পুরীর ভিতরে।
বলি দিয়া করে পূজা শনি মঙ্গল বারে॥" (ঐ)

কিংবা—

"সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
নানাচিত্র লিখে বিশাই হয়ে অনুকূল॥" (মুকুন্দ/৬২)[১৫০]

স্নান ও গৃহস্থালীর কার্যে ব্যবহারের জন্য মূল অন্তঃপুরের সঙ্গে পুকুর থাকত, পুকুরে শান বাঁধানো ঘাট তৈরী করা হত—

"অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্ম্মাণ।
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান॥" (ঐ)[১৫১]

মূল অন্তঃপুর প্রাচীর ঘেরা থাকত এবং বাইরে যাবার জন্য সিংহদুয়ার ছাড়াও ছোট ছোট দুয়ার থাকত। প্রতিটি দুয়ারে দ্বারী থাকত। ধনী গৃহে অন্তঃপুরের বাইরে পাঠশালা থাকত, সেখানে গৃহের শিশুরা পড়াশুনা করত। মানিক দত্ত এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এরূপ বর্ণনা পাই—

"উত্তরে খিড়কী সিংহদ্বার পূর্ব্বদেশে।
পাষাণে রচিত পাঠশালা চারিপাশে॥"(ঐ)[১৫২]

অন্তঃপুরে কঠোর নিরাপত্তা রক্ষিত হত, বিনা অনুমতিতে কেউ অন্তঃপুরে যেতে পারত না—

"চারিদ্বারে রাখে বীর চারিটা জে দ্বারী।
বিনা হুকুমেত কেহ না জাএ তার পুরি॥" (মানিক/১১৮)

চণ্ডীমঙ্গলে গৃহনির্মাণের পাশাপাশি নগর নির্মাণের চিত্রও পাওয়া যায়। নিরাপত্তার জন্য নগর নির্মাণের সময় এলাকার চারিদিকে জাঙ্গাল বা বাঁধ দেওয়া হত, যেমন মানিক দত্তের বর্ণনায়— "উত্তর দক্ষিনে বীর দিলেন জাঙ্গাল।"(মানিক/১১৭)। কালকেতুর গুজরাট নগরের চারিদিকে উঁচু প্রাচীর এবং প্রবেশ দ্বারে কবাট লাগানো ছিল। নগরে প্রতিটি সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য সুব্যবস্থা থাকত।হিন্দুসমাজের ব্যবহার্য দুর্গা মন্দির, নাটশালা, জলাশয়, পাঠশালা, প্রতিটি গৃহে কূপের ব্যবস্থা, স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য নাছদুয়ার, জলটুঙ্গি, কুমারের বাসস্থানে পোয়ান থাকত। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে নমাজ গৃহ, মসজিদ থাকত। কবির বর্ণনানুসারে—

"চারি চৌরী চতুঃশালা   মাঝে পিঁড়ে কাঁচ ঢালা
    পাষাণে রচিল নাছ বাট।
নির্ম্মাণ করয়ে তথি   রূপে জিনি দ্বারাবতী
    পাঠশালা পুরট কবাট॥

.. ..

পশ্চিমদিগেতে সেহ   তুলিন নমাজ গৃহ
    দলিজ মস্‌জিদ নানা ছান্দে॥" (মুকুন্দ/৬৩)[১৫৩]

নগররে অভ্যন্তরে থাকত হাট বা বাজার, যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেচাকেনা হত। হাটের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন রকম দ্রব্য বেচাকেনা করা হত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'ভাঁড়ুর বেসাতি' অংশে বাজার ব্যবস্থার চিত্র আছে। মানিক দত্তের কাব্যেও হাট বসার কথা পাই। হাটের একেকটি অংশের নাম হত একেক রকম, যেমন— গোহাটা, মোদকি হাটা, কামার হাটা, চাল হাটা, মাছ হাটা, ইত্যাদি। মানিক দত্তের কাব্যে তিয়র হাটের কথা পাই। তিয়র বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত (বালুরঘাট শহর থেকে ১০-১২ কিলোমিটার)। কবির বর্ণনানুসারে-

"মোদকি হাটা হালুই হাটা খাজা কাটে জারা।
পুড়ি হাটা কুড়ি হাটা খিড়া বেচে তারা॥
কামার হাটা বসি গেল কোদালি ফাল গড়ে।
হাড়ি পাতিল বেচে কুমারের বাজারে॥

.. ..

তিয়র হাট বসি গেল বাজারে বেচে ছাচ।
চাড়াল হাটা মাছুয়া হাটা বাজার বেচে মাছ॥" (মানিক/১৩৩)

কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপনের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের সমাজ ইতিহাসে নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায়।

রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ মঙ্গলকাব্যগুলি রাজনৈতিক তথ্যসমৃদ্ধ কাব্য নয়;তবু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমকালের রাজনৈতিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক জীবনের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কবিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে রাজনৈতিক ঘটনা এবং তৎকালীন শাসনপ্রণালীর বর্ণনা দিয়েছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ধর্মের অলৌকিক গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করলেও তার মধ্যে থেকেই সেদিনের রাজনৈতিক পটভূমি বুঝে নিতে খুব অসুবিধা হয় না। বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গদেশ বিজয়ের পর বাংলায় মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হল; এরপর প্রায় তিন'শ বছর এদেশ তুর্কী-আফগানদের দ্বারা শাসিত হয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ের একমাত্র এদেশীয় হিন্দু শাসকরা হলেন রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ।[২২] ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশীয় শাসনব্যবস্থায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বাংলার শাসনব্যবস্থায় তার কোন স্থায়ী প্রভাব পড়েনি। আকবরের শাসনকালে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ খাঁ কররানি আকবরের সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত ও মৃত্যুবরণ করলে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে এবং মোগল আধিপত্য শুরু হয়; কিন্তু ১৫৭৬-১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

অর্থাৎ মানসিংহের এদেশে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়নি।[২৩] ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ বাংলার সুবাদার হলে অশান্ত বাংলাদেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মোগল অধিকৃত অঞ্চলে বারভূইঞাগণ বিক্ষিপ্ত ভাবে অধিকার কায়েম করেছিল।[২৪] মানসিংহ বাংলার সুবাদার হয়ে এলে এদেশে শাসনব্যবস্থায় দুঃসময়ের অবসান ঘটতে থাকে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর মুখে তাই মানসিংহের প্রশংসা শোনা যায়—

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।"(মুকুন্দ/৩)[১৫৪]

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম উনিশ বছর বাংলার জনগণ রাজকর্মচারীদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছিল, তাই কবি আকবরের প্রশংসা করেননি। মানসিংহের বাংলায় আগমনেই বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুকুন্দের প্রায় সমকালের অপর কবি দ্বিজ মাধব কিন্তু তাঁর 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে আকবরের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। মুহম্মদ আবদুল জলিল দ্বিজ মাধবের এই আকবর প্রশংসার কারণ অনুসন্ধান করে বলেছেন[২৫]— প্রথমত ঃ কবির কাব্যরচনা কালে মোগল শাসকদের দুঃশাসনে সমাজ মানস অস্থির হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত ঃ কবি যে অঞ্চলের মানুষ সে অঞ্চলে হয়ত মোগল শাসকের অত্যাচার ছিল না।

আকবরের রাজত্বকালের প্রথম উনিশ বছর (১৫৭৬-১৫৯৪ খ্রীঃ) বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। ইতিহাসে তার বহুল প্রমাণ আছে। এই পর্বে অন্তত সাত জন সুবাদার বাংলায় এসেছিলেন, এঁদের শাসনকাল ছিল গড়ে দুই থেকে তিন বছর। ঘন ঘন শাসক পরিবর্তনে.স্থিতিশীলতার অভাব ঘটে এবং দূরত্বের কারণেও সম্রাট একজন শাসককে দীর্ঘদিন বাংলায় রাখতে সাহস পাননি। আকবর জীবনের শেষ পর্বে এসে মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুতরাং মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনের প্রাক্কালে এদেশে মানুষ শাসকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।[২৬] সুতরাং অত্যাচারী শাসক ডিহিদার মামুদ শরীফের নামের সঙ্গে মানসিংহের নামও যুক্ত হয়ে যায়-
—

" সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ॥ "(ঐ)[১৫৫]

কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর তথ্যানুযায়ী, তিনি গোপীনাথ নন্দীর তালুকে বসবাস করতেন। গোপীনাথ নন্দীর মত সজ্জন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বন্দি করা হয়। হয়ত মুসলমান ডিহিদার মামুদ শরীফের হিন্দু প্রজা হিতৈষী গোপীনাথ নন্দীকে ভাল লাগেনি, তাই অন্যায় বিপাকে তাকে বন্দি করা হল। মামুদ শরীফের অধীনস্থ কর্মচারীদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি, তাই কবি এমতাবস্থায় দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। চণ্ডীবাটী গ্রামের শ্রীমন্ত খাঁয়ের পরামর্শে কবি দেশত্যাগ করেন। সে সময়ে প্রজারা কিভাবে উৎপীড়িত হত তার তথ্যচিত্র কবি তুলে ধরেছেন—

"উজীর হলো রায়জাদা বেপারিয়ে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনের কাঠায় কুড়া
নাহি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হৈল কাল বিলভূমি লিখে মাল
বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিনপ্রতি॥" (ঐ)[১৫৬]

এরূপ অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রজারা ভিটেমাটি বিক্রি করে অন্যত্র পালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না, কারণ যাতে প্রজারা পালাতে না পারে এজন্য পেয়াদা পাহারা দিত।

অপরদিকে অন্যায় খাজনা পরিশোধ করতে হত, তাই টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রি করতে প্রজারা বাধ্য হত। শুধু কি তাই, সকলেই কেবল বিক্রি করতে চায় কিন্তু ধান, গরু, বাছুর, কেনার মত লোকের অভাব ছিল। কবির প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী—

"ডিহিদার আবোধ খোজ টাকা দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
.. ..
পেয়াদা সভার নাছে প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা ॥
প্রজারা ব্যাকুলচিত্ত বেচে ধান্য গরু নিত্য
টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥"(ঐ/৩-৪)[২৭]

বলাই বাহুল্য কবি এই অত্যাচারের শিকার, এবং কবি অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে আড়রায় বাঁকুড়া রায়ের জমিদারীতে উপস্থিত হন। বাংলা সম্পর্কিত এরূপ বাস্তব তথ্য সম্পর্কে ডঃ এম. এ. রহিম বলেছেন—"আকবরের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গের অংশমাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সমগ্র পূর্ব বঙ্গ বারভূইঞা নামে পরিচিত জমিদারদের অধীনে ছিল। ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দে টোডরমল যখন তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রচলন করেন এবং সাম্রাজ্যের সুবাসমূহের রাজস্ব তালিকা তৈরি করেন, তখন পূর্ব বঙ্গ এমন কি উত্তর-পশ্চিম বাংলাও অশান্ত অবস্থায় ছিল।"[২৭] অতঃপর বাংলার ইতিহাস সম্পর্কিত কবি প্রদত্ত তথ্যের পরিচয় নেওয়া যাক ঃ

১।ডিহিদার ঃ ডিহি অর্থাৎ গ্রাম; ডিহিদার গ্রামের প্রধান বা অঞ্চল প্রধান। গ্রামের রাজস্ব আদায় থেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব সবই ডিহিদার বা অঞ্চল প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকত, এবং এলাকায় খুন খারাবি হলে, চুরি-ডাকাতি হলে তাকেই কৈফিয়ত দিতে হত।'Provincial Govt. of the Mughals' গ্রন্থের লেখক সরণ (Saran) লিখেছেন-—"The Mughal and the earlier Muslim rulers used the headman of the old village community as'not only an agent for revenue realisation, but also used him officially responsible for policing the rural areas"[২৮] কবিকঙ্কণের তথ্য অনুযায়ী ডিহিদার মামুদ শরীফকে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায়নি। নতুন পদাধিকার ও উপরওয়ালাদের কঠোর দৃষ্টি এর কারণ হতে পারে।

২।উজির হল্য রায়জাদা ঃ সুবাদারের পরেই সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি উজীর; সে রাজ্যের আয়-ব্যয় ও প্রশাসনের দায়িত্বে থাকত। আসলে উজীর দেওয়ান শব্দের প্রতিশব্দ। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের পর উজীর পদের প্রবর্তন হয়েছিল। পত্রদাস নামে এক ব্যক্তি 'রায়রাঁয়া' খেতাব নিয়ে টোডরমলের সঙ্গে বাংলায় আসেন এবং কিছু দিন পরে আবার ফিরে যান। মানসিংহের সময়ে পত্রদাস আবার বাংলায় আসেন এবং ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, উড়িষ্যার সুবাদার হয়ে টোডরমলের নতুন বিধান প্রবর্তন করেন।পত্রদাস খুব খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন এবং তার পুত্র কিসু দাস রায়জাদা হলেন।[২৯]

৩।পনের কাঠায় কুড়া ঃ কুড়া শব্দের অর্থ বিঘা, জমি পরিমাপের একক। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কুড়ি কাঠায় এক বিঘা। কিন্তু টোডরমল প্রবর্তিত নতুন নিয়মে পনের কাঠায় এক বিঘা হল। কারণ পূর্বেকার ইস্কিন্দারী গজ অপেক্ষা টোডরমলের ইলাহী গজ প্রায় এক আঙুল কম। আইন-ই-আকবরী অনুসারে—"Akbar in his wisdom seeing that the variey of measures was a source of inconvenience to his subjects and regarding it as subservient only to the dishonest, abolished them all and bought a medium gaz of 41 digits into general use."[৩০]

৪।খিল ভূমি লেখে লাল ঃ খিল ভূমি অর্থাৎ অনুর্বর পতিত জমি (untilled land) অনুর্বর জমিকে উর্বর জমি

লেখা হল। কারণ, উর্বর জমির রাজস্ব বেশী, বেশী রাজস্ব আদায়ের জন্য এই ব্যবস্থা। আকবরনামা অনুযায়ী জমিতে যাতে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় এবিষয়ে আকবরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অনাবাদী ফেলে না রেখে যাতে চাষীরা ফসল ফলায় তার জন্য এই ব্যবস্থা।[৩১]

৫।টাকা আড়াই আনা কম : আফগান আমলের টাকার ধাতব মান নতুন মুদ্রা থেকে কমে যায়; অর্থাৎ নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়, ফলে টাকায় আড়াই আনা বাট্টা দিতে হত। এছাড়া পুরাতন মুদ্রা বদল করে নেওয়ার সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে প্রতিদিন এক পাই করে জরিমানা দিতে হত।[৩২]এই আকস্মিক পরিবর্তিত নতুন নিয়মের মুদ্রা ব্যবস্থা প্রজাদের সহসা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

৬।মাপে কোণে দিয়া দড়া : জমির প্রচলিত মাপ পরিবর্তন করে জমির পরিমাপকে কাগজে কলমে বাড়িয়ে দেওয়া হল, ফলে কোণাকোণি মাপে জমি জরিপ হত। বস্তুত এর উদ্দেশ্যও ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা।[৩৩]

এছাড়া 'বিনা উপকারে খায় ধুতি' অর্থাৎ বিনা কারণে ঘুষ খাওয়া, চড়া হারে সুদ আদায় বীভৎস আকার ধারণ করেছিল, আর সব কিছুর উদ্দেশ্য অধিক রাজস্ব আদায়। ফলে মুকুন্দের মত সাধারণ প্রজাদের ভূমিস্বত্ব বিঘ্নিত হয়েছিল, তারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। নতুন ভূমি ব্যবস্থায় জমি পরিমাপের নতুন পদ্ধতি চালু হয়, ফলে জমির পরিমাণ কমে যায়, কুড়ি কাঠার বদলে পনের কাঠায় এক বিঘা চিহ্নিত হয় এবং অনুর্বর জমিকে উর্বর বলে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়। এই নতুন ব্যবস্থা প্রজাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেকালে প্রজাদের জমি সরকারি পক্ষ থেকে পাট্টা অর্থাৎ স্থায়ী স্বত্ব করে দেওয়া হত এবং নিশান দিয়ে চিহ্নিত করা হত।

মুকুন্দ চক্রবর্তী প্রজা শোষণের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা ঐতিহাসিক সত্য এবং সবটাই সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ফল।সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষমতাপ্রিয় মানুষ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বাহক ছিল, যেমন ভাঁড়ু দত্তের মত মানুষরা। নতুন শাসনব্যবস্থায় রাজা কালকেতুর কাছে থেকে ভাঁড়ু দত্ত সুবিধা মত নিজের জন্য হাল, গরু, বীজ ধান আদায় করে এবং মোড়লি বা মণ্ডলির পদ দাবী করে। বস্তুতপক্ষে স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করে নিজের ধন ভাণ্ডারকে স্ফীত করে তোলার শাসক ভাঁড়ু দত্তের মত ক্ষমতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ। ভাঁড়ু দত্ত কালকেতুকে যে পরামর্শ দিয়েছিল তাতে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নগ্ন রূপ প্রকাশিত—

"জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে প্রজা যেন লয়॥
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবা বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় যেন জন
অবশেষে নাহি পাবে দাগা॥
.. ..
নফরের হাতে খাঁড়া বহুড়ি জনের ভাড়া
পরিণামে দেয় বড় দুঃখ॥" (ঐ/৬৮)[১৫৮]

চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিভূ এবং শাসকের প্রতিরূপ। চণ্ডী কেন্দ্রীয় শাসকের ন্যায় পশুসমাজকে শৃঙ্খলা দেয়, সে সিংহকে পশুরাজ নিযুক্ত করে, এবং অনুরূপভাবে কালকেতু ব্যাধকেও রাজা করে। চণ্ডীমঙ্গলের পশু সমাজ মধ্যযুগীয় নিপীড়িত-অত্যাচারিত-শোষিত জনসমাজ। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসক বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকে আর কর্মচারীগণ প্রজা শোষণ করে, অত্যাচার করে, কিন্তু বহিঃশত্রুর হাত থেকে প্রজাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে না। বিজুবনের পশুরা পশুরাজের কাছে আবেদনে

অভিযোগ জানিয়েছে, তারা রাজ্য পরিত্যাগের কথা বলেছে—

"শুন শুন রায় মাগিয়ে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি
বিপাকে ত্যজিব জীবন॥
নারীগণ সঙ্গে থাক লীলা রঙ্গে
না কর দেশের বিচার॥" (ঐ/৪০)[১৫৯]

একই চিত্র আমরা পাই দ্বিজ রামদেবের কাব্যে। দ্বিজ রামদেবের কাব্য অনেক পরবর্তীকালে রচিত এ সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজকীয় বিলাস -ব্যসন বেড়ে গিয়েছিল এবং এই অবসরে কার্যত শাসক ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছিল। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কলিঙ্গরাজের এই সামন্ততান্ত্রিক রূপ প্রকাশিত। কবির বর্ণনানুসারে—

"রাজনীতি ছাড়ে যদি কলিঙ্গরাজন।
প্রজাসবে না মানএ কাহার বচন॥
নিশি দিশি বসি রাজা আন নাহি মন।
মহিষী সহিতে রাজা করএ ক্রন্দন॥
যার যেই নীতি ধর্ম্ম ছাড়িল সকল।
বিপ্রগণে ছাড়ে বেদবিধির মঙ্গল॥" (দ্বিজ রামদেব/৩৩)

ফলে শাসকের অগোচরে তার রাজ্যের অভ্যন্তরে অন্য রাজ্য গড়ে ওঠে। 'পশুগণের রোদন' অংশে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের ইঙ্গিত আছে। পশুগণ বীর হলেও কালকেতুর উন্নত যুদ্ধবিদ্যার কাছে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়।চণ্ডীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। সে সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রীয় শাসক; পশুগণ ও কালকেতু উভয়েই তার অনুগত, সুতরাং কালকেতুকে ধন-সম্পদ দিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যেই নতুন রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দেয়। কলিঙ্গরাজ তার অনুগত হলেও বিভিন্ন বিষয়ে দেবী তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না, ফলে তার জঙ্গী অনুচরবৃন্দ— মেঘ, বৃষ্টি, বন্যা দিয়ে কলিঙ্গ রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে কালকেতুর নতুন গুজরাট নগরকে প্রতিষ্ঠা দিল। এভাবে কলিঙ্গ রাজ্যের অংশ ভেঙ্গে নতুন রাজ্য গড়ে উঠল। যেখানে কালকেতু কবির স্বপ্নের আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করল। 'বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা' গ্রন্থে ডঃ গীতা মুখোপাধ্যায় কালকেতুকে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আকবর চরিত্রের গুণাবলী ও দোষত্রুটিগুলি কালকেতুর চরিত্রে লক্ষ করেছেন। বস্তুতপক্ষে গুজরাট নগরে কালকেতু সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বন্যা ও ঝড়ে বিপর্যস্ত প্রজাদের বাড়িঘর, জমিজমা, চাষবাসের অর্থ, বীজ ধান দিয়ে ঘোষণা করল— প্রজাদের তিন সনের কর মকুব করা হবে। বুলান মণ্ডলকে কালকেতু বলেছিল-

"শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব কনক-কুণ্ডল॥
আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা না করো কাহার শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥

খন্দে নাহি নিব বাড়ি　　রয়ে বসে দিব কড়ি
　　ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামী কি বাঁশগাড়ী　　নানা বাবে যত কড়ি
　　না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বণী পঞ্চক যত　　গুয়া লোণ সানাভাত
　　ধানকাটি কলম-কসুরে।
যত বেচ চাল ধান　　তার না লইব দান
　　অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥
যত বৈসে দ্বিজবর　　কারু না লইব কর
　　চাষীজনে বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণ-দাস　　পূরাব সবার আশ
　　প্রতি জনে সাধিব সম্মান॥" (মুকুন্দ/৬৭)[১৬০]

সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থনীতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্ক অনেকটা প্রভূ-ভৃত্যের হত। সামন্তরাজ বা জমিদার জমির মালিক, সে যাবতীয় স্বত্ব ভোগ করে থাকে। সম্রাটের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমান বার্ষিক রাজস্বের বিনিময়ে সামন্তরাজ জমিদারী সনদ পেয়ে থাকে। প্রজারা জমি চাষ করলেও জমির প্রকৃত মালিক তারা নয়, তাই তাদের জমির অধিকার থাকলেও বিক্রি করার অধিকার ছিল না। এমন কি তারা ইচ্ছে মত জমিদারী পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পারত না। মোটের উপর তাদের অবস্থা ভূমিদাসের মতই ছিল।মুকুন্দ চক্রবর্তী দামুন্যাতে ডিহিদারের অত্যাচারে প্রজাদের নাভিশ্বাসের বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু অদৃষ্টবাদী কবি শাসকের এই অত্যাচারকে প্রজার পাপের ফল বলে বর্ণনা দিয়েছেন। টোড়রমলের নতুন ভূমি ও মুদ্রা সংস্কার আইনে প্রজার জীবনের স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয়েছিল, এমতাবস্থায় প্রজারা পালিয়ে বাঁচতে বাধ্য হয়েছিল। কালকেতুর গুজরাট নগর শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ-অর্থনীতির পরিচয় দেয়। বুলান মণ্ডলরা বাস্তব ইতিহাসে কবির স্বগোত্রীয়, কেননা কলিঙ্গ রাজ্যে তাদের অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা নেই। কৃষিজীবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রজা মুরারী শীলের মত ধূর্ত মহাজন, ভাঁড়ুর মত প্রবঞ্চক মণ্ডলদের দ্বারা শোষিত হত। সমাজের অভ্যন্তরে মহাজনরা সুদে টাকা খাটিয়ে মানুষকে শোষণ করত, তাছাড়া অর্থশালী ব্যক্তিরাও সুদের বিনিময়ে টাকা খাটাত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে দেখি ফুল্লরার সখী তাকে টাকা ধার দিয়েছে সুদের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় ফুল্লরাকে ভৎর্সনা করেছে—

সখী জানি কর্জ্জ দিলুম পঞ্চ বুড়ি কৈড়ি।
লাভ দিলা মূলধন নাহি দিলা ফিরি॥" (দ্বিজ রামদেব /৬৫)

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে প্রদেয় কর থেকে প্রজার রেহাই ছিল না। তাই প্রজাদের খেদ—

"বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে রোদন।
দুই চক্ষে বহে যেন ধারার শ্রাবণ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
চাহিয়ে প্রথম মাসে এক তেহাই কড়ি॥"(মুকুন্দ/৬৬)[১৬১]

বুলান মণ্ডল বাস্তবে বঙ্কিমচন্দ্রের পরাণ মণ্ডল ও রামা কৈবর্তদের স্বগোত্রীয়। বন্যা, খরা, মহামারী হলেও রাজস্ব

মকুব করা হত না, বরঞ্চ তিন গুণ বেশী কর দিতে হত। তাই প্রজারা মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত শোষণহীন শান্তিপূর্ণ সমাজের আকাঙ্ক্ষা করবে এটাই স্বাভাবিক। কালকেতুর গুজরাট নগর কবির আদর্শায়িত সমাজ হলেও তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। সে এক আদর্শ রাষ্ট্র, যেখানে সকলের সহাবস্থান ও স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকবে, কর হবে অত্যন্ত কম— হাল পিছু এক টাকা মাত্র এবং তাও প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর দিতে হবে। জমিদার পাট্টার নিশান দিয়ে জমি বিলি বন্দোবস্ত দিলে জমি থেকে প্রজার উচ্ছেদের আশঙ্কা থাকত না। জমিদার আরোপিত বিভিন্ন ধরনের কর প্রজাকে সর্বস্বান্ত করত— সেলামি বা প্রণামী কর, বাঁশগাড়ি বা দখল নেওয়ার সময় জমির উপর পতাকা যুক্ত কঞ্চি পুঁতে দেওয়ার জন্য কর, গুড়া বা গুড় তৈরীর কর, সানাভাত বা 'সানাউত' বা পূর্বেকার মুদ্রা ব্যবহারের জন্য প্রদেয় কর, পার্বণী বা উৎসব কর, পঞ্চক বা পাঁচ জনের বিচার বিভাগীয় কর, ধান্যকাটি কর, বিক্রয় কর, দান কর, লোণা বা লবণ তৈরীর কর, তাছাড়াও স্বত্ব কর, নজরানা ইত্যাদি— আদর্শ রাষ্ট্রে এসব কিছুই থাকবে না। এভাবে মানবতাবাদী কবি মানুষের মূল্য দিলেন, সম্মান দিলেন। তিনি কালকেতুর মুখে ঘোষণা করলেন দেশে ডিহিদার দেবেন না। মানসিংহের আগমনে বাংলার বুকে এই সুন্দর শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল, কবি কালকেতুর রাজ্যে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সেখানে জাতিভেদহীন, বৈষম্য-বিদ্বেষহীন, শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন থাকবে— যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষ নির্বিবাদে ধর্মাচরণ করতে পারবে, সে এক সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সমাজ।বাস্তবে সমাজের অভ্যন্তরে যে কুটিলতা ছিল তা সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বণিক খণ্ডে খুল্লনার পরীক্ষা অংশে, ভাঁড়ুদত্তের আচরণে। কিন্তু গরীব-দুঃখী প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি ছিল। দ্বিজ মাধবের কাব্যে তাই কবি লেখেন—

"দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি।
কনক কলসী ভরি প্রজা খায়ে পানি॥"(দ্বিজ মাধব/৬৯)

ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার 'চণ্ডীমঙ্গলের সমাজতাত্ত্বিক সংকেত' প্রবন্ধে মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাসের এই প্রসঙ্গটিকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— "মধ্যযুগের বিস্তৃত বিচলিত সমাজ পরিবেশ এবং এর সমস্ত ধ্বংসপ্রবণতা-ধর্মী প্রভাবের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এবং সেই পরিবেশে নিজের অকুতোভয় সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ এই সীমাহীন শক্তির কামনা করেছে। আর, সেই কামনাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে চণ্ডীতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে আমরা লৌকিক জীবনের স্পন্দন অনুভব করেছি। এই কামনা ও কল্পনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করেছে অন্য এক ভাবে, অধ্যাসের রঙীন আলোয় পুনরায় সৃষ্টি করেছে নিজেকে, জীবনের হয়েছে নব রূপায়ণ।"[৩৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় বিচার ও শাস্তি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর রাজ্যে কিছুটা ন্যায়বিচারের কথা আছে। বস্তুতপক্ষে সাধারণ মানুষের জন্য কোন রকম ন্যায় বিচার ছিল না, মুকুন্দের দেশ ত্যাগই তার প্রমাণ। তবে অন্যায়কারীকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়া হত, তার মধ্যে ছিল কারাবাস, বন্ধন, প্রহার, সম্পদ অপহরণ, শিরচ্ছেদ ইত্যাদি। কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজ্যের কারাগারে শিকলে বেঁধে কঠিন পাথর খণ্ড বুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ধনপতিকে মিথ্যা বলার জন্য বাণিজ্যের সম্পদ অপহরণ ও কারারুদ্ধ করা হয়, একই অপরাধে শ্রীমন্তের শিরচ্ছেদের আয়োজন হয়। সাধারণত অপরাধীকে অনেক সময় মাথা মুড়িয়ে, চুনকালি মাখিয়ে অপমানিত করে বিতাড়িত করা হত। এটা সম্পূর্ণ গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা বলে মনে হয়। মধ্যযুগে গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থা ও শাসনকার্য পরিচালনা করত স্থানীয় রাজা বা জমিদার। মামলা-মোকদ্দমা কিংবা সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করত গ্রামীণ সমাজপতিগণ। গ্রামীণ সমাজ ঘটিত বিষয়ে অনেক সময় রাজা বা জমিদারের হস্তক্ষেপ থাকত। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার শাস্তি বিধান করেছিল সমাজ, সেই অনুসারে খুল্লনার পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখি সমাজপতিদের নির্দেশে খুল্লনার পরীক্ষা হয়েছে, কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখি জ্ঞাতিগণের

নির্দেশে খুল্লনা পরীক্ষা দিতে সম্মত হলেও রাজ আজ্ঞার প্রয়োজন হয়েছে- "সতীত্ব পরীক্ষায় রাজ সম্মতির প্রয়োজন।" (দ্বিজ মাধব/১৮৭) কিন্তু সমাজ ঘটিত ব্যাপারে রাজা হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—

"দণ্ডধরে বোলে শুন বণিক-সমাজ।
করাও পরীক্ষা কন্যা যেমতে হয়ে কাজ॥
জাতির উপরে আহ্মি নহি অধিকারী.
পরীক্ষা দিয়া শুদ্ধ করাও সুন্দরী॥" (দ্বিজ মাধব/১৮৭)

স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় শাসকের বিচক্ষণতার পরিচয় আছে এখানে। রাজা বা জমিদারগণ যেমন প্রজা কল্যাণের কথা ভাবত তেমনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিত। বস্তুত মধ্যযুগে প্রজাহিতৈষী জমিদারের অভাব ছিল না। কালকেতুর রাজত্ব বা রাজ্য আসলে মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক শাসকের মত অর্থাৎ জমিদারের মত। মুকুন্দ চক্রবর্তী দামুন্যা ত্যাগ করে আড়রায় ব্রাহ্মণ ভূমিতে আশ্রয় নিলেন। কৃষিনির্ভর কবি এখানে আড়রার ব্রাহ্মণ অধিপতি বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন, কবি বুদ্ধিজীবী শিক্ষক হলেন। কবি বাঁকুড়া রায়কে রাজা বললেও তিনি জমিদার মাত্র। মধ্যযুগে জমিদারদের রাজার মত মর্যাদা ছিল। এই সময়ে জমিদারদের কাজ ছিল শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়। জমিদারী উচ্ছেদের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসক বা বাদশাহের হাতে থাকত। নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্বের বিনিময়ে জমিদার বা জমিদারের উত্তরাধিকারীকে বাদশাহের সনদ নিতে হত। জমিদারকে বাদশাহের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে হত।[৩৫] চণ্ডীমঙ্গলে পশুরাজ্য স্থাপন এবং কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙ্গে গুজরাট নগর পত্তনে এই সমস্ত ঘটনার প্রতিরূপ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করা যায়। মধ্যযুগের জমিদারগণ রাজার মতই ক্ষমতার অধিকারী ছিল। জমিদারী পরিচালনার জন্য তাদের পাইক, পেয়াদা, পাত্র, রাজদূত, মণ্ডল অর্থাৎ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গঠনগত কাঠামো থাকত। দেবী পশুদের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সিংহকে পশুরাজ, হাতিকে মন্ত্রী, শরভকে কুল পুরোহিত এবং অন্যান্য পশুদের যোগ্যতা অনুসারে পদ দান করে। ঠিক কালকেতুর রাজ্যেও যোগ্যতা অনুসারে পদ দেওয়া হয়। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে গুজরাট নগরের শাসন সহায়ক পাত্র, মণ্ডল ইত্যাদি পদের কথা পাওয়া যাচ্ছে। বুড়ন মণ্ডল গুজরাট নগরের মহাজন, কেতু হয় মুখপাত্র ইত্যাদি। কবির বর্ণনানুসারে-—

"শুনরে বুড়ন মণ্ডল শুতি আছ কি।
তোর তরে স্বপ্ন কহি হেমন্তের ঝি॥
গ্রামের প্রধান তুহ্মি হও মহাজন।
এথাতে রহিয়া প্রজা নাশ কি কারণ॥
গুজরাটে কালকেতু করিছে পত্তন।
তথা গিয়া রহ তুহ্মি লইয়া প্রজাগণ॥
কর নাহি দিঅ তথা দ্বাদশ বৎসর।
মুখ্য পাত্র হও তুহ্মি কেতু দণ্ডধর॥" (দ্বিজ রামদেব/৭৫-৭৬)

মধ্যযুগে রাজা থেকে জমিদার প্রত্যেকের নিরাপত্তার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখতে হত। তাই কালকেতু নগরপত্তনকালে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্রও ক্রয় করেছে। সেখানে হাতি, ঘোড়া, পদাতিক বাহিনী থাকত, মল্ল, পাইক, গুপ্তচর থাকত। 'রাজকুমারের যুদ্ধ গমন' অংশে এরূপ বর্ণনা পাই—

"আগু দলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি॥
ডানি দিগে ধাইল কোটাল ভীম মল্ল।
রাজার জামাতা ধায় নামে বীর শল্য॥

.. ..

পথে পথে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট॥

চারি দিকে বেড়িল নগর গুজরাট॥"(মুকুন্দ/৭৬)[১৬২]

শত্রুপক্ষের হাত থেকে নগর রক্ষার জন্য নগর নির্মাণকালে নগরের চারিদিকে পরিখা কাটা হত, সেখানে হিংস্র জলজ প্রাণী পালন করা হত। উঁচু প্রাচীর দিয়ে নগর ঘেরা থাকত, সেখানে বিভিন্ন গুপ্ত স্থানে কামান ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র রাখা হত, পথের মাঝে মাঝে গুপ্ত কূপ খনন করে রাখা হত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর নগর রক্ষার ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় শাসন প্রণালীর নগর রক্ষার বন্দোবস্তের ছবি পাওয়া যায়। কবির বর্ণনানুসারে—

"কালকেতু রিপু-সেনা ত্বরিতে জিনিতে।

চণ্ডীপুরে দিয়া থানা কাটিয়া গহন খানা

গড় করিল চারি ভিতে॥

.. ..

রক্ষী থুইল পদাতিকহয় গজ অধিক

বাহিরে সৃজিল সিজগড়া॥" (দ্বিজ মাধব/৬৮)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার কথা পাই—

"প্রথমে পরিখা কাটি তুলিল প্রাচীর।

পরিখার জলে খেলে মকর কুম্ভীর॥

চৌদিকে দলদলি কাটি কৈল দুর্গস্থল।

পৰ্ব্বতিআ নন্দি বান্ধে পূর্ণ করি জল॥

থরে থরে পাতি কথ করিআ সন্ধান।

কোঠের উপরে তোলে বিশাল কামান॥

চণ্ডীপুর করিআ রাখিল এক থানা।

বিপক্ষ আসিতে তার প্রাণে দিতে হানা॥" (দ্বিজ রামদেব/৭৯-৮০)

এই চিত্র মধ্যযুগীয় আবর্তসঙ্কুল রাজনৈতিক পরিবেশের বাস্তব ঐতিহাসিক চিত্র বলে মনে করা যায়।

তখনকার দিনে পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দুর্বলতায় শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামো ভেঙ্গে পড়লে দুর্নীতিতে সমাজ ভরে গিয়েছিল। তেমনি জলপথ, স্থলপথ কোনটিই মানুষের কাছে নিরাপদ ছিল না; যদিও দ্বিজ মাধবের কাব্যে কালকেতুর রাজ্যে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল না বলেই উল্লেখ-

"রাজ-বিঘ্ন নাই তাতে নাই দস্যুভীত।

দুর্গার প্রসাদে লোক থাকে হরষিত॥" (দ্বিজ মাধব/৬৯)

কিন্তু এটা সম্ভবত পরবর্তীকালের কথা। দ্বিজ মাধব ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন আর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের শাসনকাল শুরু হয়। এর প্রায় সমসাময়িক কালে মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দের কাব্যে পথেঘাটে চোর, ডাকাত, বাটপার, জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা পাই। মুকুন্দের আত্মবিবরণী অনুসারে রূপ রায় কবির সর্বস্ব অপহরণ করে। সম্ভবতঃ রূপ রায় কোন বাটপার দলের সর্দার ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"ভাই নহে উপযুক্ত রূপরায় নিল বিত্ত

যদুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।" (মুকুন্দ/৪)[১৬৩]

মুকুন্দের কাব্যে আরো পাওয়া যায় পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদের ভয়ের কথা। ধনপতি 'ফিরাঙ্গির' দেশ রাত্রে অতিক্রম করল হারমাদের ভয়ে—

"ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বাহে ডিঙ্গা হারামদের ডরে॥ (ঐ/১৮৮)

পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদরা জলপথে দিনের বেলায়ও ডাকাতি করত। 'হার্মাদ' শব্দটির প্রকৃত রূপ 'Armada'; স্প্যানিশ আর্মাডার মত নৌবহর। মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা পাই। রোষাঙ রাজসভার কবি আলাওল বাল্যকালেই পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্থলপথে ঠগী পিণ্ডারীদের মত বাটপারের উপদ্রব ছিল। তাছাড়া দেখা যায় দস্যুদের অত্যাচার এত মাত্রাতিরিক্ত ছিল যে সাধারণ মানুষ বিদেশী বা অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করত না। শ্রীমন্ত সিংহলে উপনীত হলে তাকে সেখানকার লোকে সহজে বিশ্বাস করেনি—

"সাধু নহ চোর তুই মিথ্যা তোর ভরা।
সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবে পারা॥"(ঐ/১৯৪)[১৬৪]

মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত এই সমস্ত তথ্য তৎকালীন সময়ের বাস্তব যুগচিত্র।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ প্রধানত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কালপর্বে চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল সুতরাং ঐ পর্বের রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক চালচিত্র ধরা পড়েছে এখানে। আমাদের মনে রাখা দরকার ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ মোগল অধিকৃত এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থনীতি পরিচালিত। বাংলার এই পর্বের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর হলেও শিল্প ও বাণিজ্য অন্যতম দুটি দিক।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ মোগল আমলের বাংলাদেশে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর শেরশাহ প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থাকেই সর্বত্র কার্যকর করেন এবং ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটি ঐ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।[৩৬] স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা মোগল যুগে প্রচলিত থাকলেও সাধারণ মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করতে পারত না। স্বর্ণমুদ্রাকে বলা হত মোহর। ধনী বা জমিদারদের কাছে মোহর থাকত। দেবী চণ্ডী কালকেতুকে যে সাত ঘড়া ধন দিয়ে ছিল তা বাস্তবে স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর। রৌপ্যমুদ্রা হল টাকা বা 'টঙ্ক' বা 'তঙ্কা'। মধ্যযুগে কাগুজে টাকা ছিল না, রৌপ্যমুদ্রাই টাকা নামে প্রচলিত ছিল।[৩৭] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে টাকার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'ভাঁড়ুর বেসাতি' অংশে 'তঙ্কা' বা টাকার ব্যবহারের কথা পাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুরারী শীলের সঙ্গে কালকেতুর অঙ্গুরীয় বিক্রয় প্রসঙ্গে টাকার ব্যবহার আছে—

"সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরীর মূল।
দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হয়ে অনুকূল॥
অকপটে সাত কোটি টাকা দেহ বীরে।
বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে॥" (ঐ/৫৯)[১৬৫]

অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গলেও টাকার ব্যবহার দেখা যায়।টাকার পরে মুদ্রার ক্ষুদ্রতম মান হল 'কড়ি'। এগুলি সাধারণত তামার তৈরী হত। দৈনন্দিন জীবনে লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কড়ির ব্যবহারই ছিল বেশী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও কড়ির ব্যবহার হত। লোকে লেনদেনের জন্য 'তঙ্কা' বা টাকা ভেঙ্গে 'কড়ি' করত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে 'ভাঁড়ুর কপট বেসাতি' অংশে আছে—

"ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া।
ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দিলেক তুলিয়া।
.. ..
ভাঁড়ু দত্তে বোলে ধনা চাউল দেয় মোরে।
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে॥"(দ্বিজ মাধব/৭০)

দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কড়ির ব্যবহারের কথা আছে। ভাঁড়ু দত্তের উক্তিতে পাই—

"দধিভাণ্ড নেম বিপ্র করাইতে ভোজন।

টঙ্কা ভাঙ্গাইআ কৈড়ি দিমু এহি ক্ষণ॥"(রামদেব/৮৩)

কখনো কখনো বাজারে অপ্রচলিত মুদ্রা বা মেকী মুদ্রাও ব্যবহৃহ হত, তাকে 'কানাকড়ি' বলা হত। দুর্বলা বাজারে রাজভাটকে কৌশলে কানাকড়ি দিয়েছিল—

"ইচ্ছিয়ে তোমার যশ তারে দিনু পণ দশ

কড়ি কাণ্য পড়িল পণ সাত।" (ঐ/১২৬)

কড়ির মূল্যমান সর্বদা সমান থাকত না। তবে চণ্ডীমঙ্গলে স্থিতিশীল বাজারের পরিচয় আছে 'দুর্বলার হাটে গমন' অংশে। দুর্বলার বাজার করার বিবরণে তৎকালীন সময়ে কড়ির ব্যবহার, মুদ্রামান ও বাজার ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে জানা জানা যায়। সাধারণ মানুষ হিসাব করার জন্য বিভিন্ন গ্রামীণ পরিভাষায় একক ব্যবহার করত। যেমন মুরারী শীল কালকেতুকে অঙ্গুরীর মূল্য, ধারে মাংস ও কাঠের মূল্যসমেত হিসেব দিয়েছে আট পণ আড়াই বুড়ি কড়ি। কবির বিবরণে—

"রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।

দুধানের কড়ি আর পাঁচ গণ্ডা ধর॥

অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।

মাংসের পিছিলা বাকী ধারী দেড়বুড়ি॥

একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।

চাল ক্ষুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি॥" (মুকুন্দ/৫৮)[১৬৬]

বড় একক হিসাবে 'পণ' ও 'কাহন' ব্যবহার করা হত, এবং ছোট একক হিসাবে 'গণ্ডা' ব্যবহৃত হত। ধনপতি দুর্বলাকে বাজার করার জন্য পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়েছে—

"পাণ দিয়া দুর্ব্বলারে সাধু দিল ভার।

কাহন পঞ্চাশ লয়ে চলহ বাজার॥

কিনিতে তোমার যদি নাহি আঁটে কড়ি।

টাকা দুই চারি লবে বণিকের বাড়ী॥"(ঐ/১২৫)[১৬৭]

সাধারণ মানুষ কড়ির অভাবে দ্রব্য বিনিময় করত। মুরারী শীল কালকেতুর কাছে চাল, ক্ষুদ ইত্যাদির বিনিময়ে মাংস, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করত। শুধু মুদ্রা গণনায় নয়, ওজন পরিমাপক এককের কথাও পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলে। মূল্যবান ধাতু সোনা, রূপা ইত্যাদির পরিমাপে ক্ষুদ্রতম একক 'রতি' ব্যবহার করা হত। আবার তেল, ঘি, চাল, ডাল ইত্যাদি 'সের' পরিমাপে ওজন করা হত। যেমন দুর্বলার বাজার অংশে—

"চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী

তৈল সের দরে দশ বুড়ি।" (ঐ)

কিংবা, দ্বিজ মাধবের কাব্যে ভাঁড়ু দত্তের বেসাতি অংশে—

"এথেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া।

সের অষ্ট দশ চাউল লইল মাপিয়া॥" (দ্বিজ মাধব/৭০)

অপেক্ষাকৃত কম ওজনের জন্য পোয়া বা 'পাবা' ব্যবহৃত হত (এক পোয়া এক সেরের চার ভাগের এক ভাগ)। যেমন—

"ক্রোধ না কর ভাঁড়ু মোর দিকে বাহ।

এক পাবা তৈল দেম বাকিতে লইয়া যাহ ॥" (ঐ/৭১)

পান-সুপারি ইত্যাদির গণনায় একক হিসাবে 'পণ' ও 'বিড়া' ব্যবহৃত হত। যেমন—

"বারুই বোলে ভাঁড়ু দত্ত আইলা এথায়।
পাঁচ বিড়া পান নেয় কড়ির নাঞি দায় ॥" (ঐ/৭২)

অথবা—

"বিশা দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাৎ চিনি
গণে পণ-মূলে পাণ নিলে ॥" (মুকুন্দ/১২৫)[১৬৮]

কৃষি ঃ মোগল যুগে অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। শ্রমের বিনিময়ে কৃষি থেকে বিপুল সম্পদ সংগৃহীত হত। অথচ এই কৃষিই আবার শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বাংলদেশের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর। তাই অল্প শ্রমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। কৃষিজাতদ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হল ধান। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত, সুতরাং কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান চাষের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। বাংলাদেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদে-গন্ধে ভরপুর বিভিন্ন রকম ধান উৎপন্ন হত, তার পরিচয় মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। ধান ছাড়াও গম, পাট, কার্পাস, আখ; বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, মসুর, মাষ ইত্যাদি চাষ হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে মেনকা শিবঠাকুরকে অলস ও কর্মকুন্ঠ বলে তিরস্কার করলে গৌরী জানায়—

"জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমিদান।
তথি ফলে মসুর কাপাস মাষ ধান ॥" (ঐ/২২)[১৬৯]

বাংলার ভূমিতে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হত, সাধারণ মানুষ ডোল ভর্তি করে কার্পাস রাখত। কবিকঙ্কণের কাব্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

"দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভেসে গেল মোর কাপাসের ডোল ॥" (মুকুন্দ/৬৬)[১৭০]

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন প্রকার মসলা— জয়িত্রী, হলুদ, আদা, জিরা, লবঙ্গ, তেজপাতা, রসুন, মরিচ উৎপন্ন হত; বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ, পান, সুপারি ইত্যাদি উৎপন্ন হত। ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণে, বস্তুবদল অংশে তার বিবরণ আছে। বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি, নিম, শিম, বেগুন, মূলা, কলা, লাউ,কুমড়ো; বিভিন্ন প্রকার শাক, বিভিন্ন প্রকার ফলমূল— আম, কাঁঠাল, নারিকেল, বেল, লেবু, জামির, তাল ইত্যাদি উৎপন্ন হত। বাণিজ্যযাত্রা অংশে ও রন্ধন বর্ণনা অংশে তার বিবরণ পাওয়া যায়। পশুপালনও বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির একটি অন্যতম দিক। সেকালে ধনীরাও পশুপালন করত। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনার ছাগল চরানোর বৃত্তান্ত সেই কথাই প্রমাণ করে।মানিক দত্তের কাব্যে পাই কলিঙ্গরাজ্যে অকালে ঝড়বৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহপালিত পশুপাখিও ভেসে গিয়েছিল—"ছাগল ভেড়া মনিষ্য ঘোড়া গোরু পালেপাল।"(মানিক/১২৯)। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীনালায় প্রচুর মাছ পাওয়া যেত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত।

বাংলাদেশের চাষ পদ্ধতি ছিল প্রাচীন ও সাধারণ এবং চাষের উপকরণও ছিল যৎসামান্য, আর চাষ পদ্ধতি ছিল গতানুগতিক। সাধারণত গরু বা মহিষ টানা লাঙলেই জমি চাষ হত. তাই কালকেতু তার রাজ্যে আগত প্রজাদের বলদ গরু, হাল উপহার দিয়েছিল। চাষবাস ছিল প্রধানত প্রকৃতি নির্ভর; অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলে ফসল নষ্ট হয়ে যেত. তখন প্রজার দুর্দশার সীমা থাকত না। বুলান মণ্ডলের উক্তিতে একথা জানা যায়—

"বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল ক্ষেতের শস্য তাহে না ডরাই ॥" (ঐ/৬৬) [১৭১]

কৃষিই বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলেও কিন্তু কৃষকের অবস্থা ভাল ছিল না। কারণ কৃষকরা শাসকের শোষণের

শিকার হত। শাসক থেকে জমিদার, মহাজন সকলের ক্রুর দৃষ্টি পড়ে থাকত কৃষকের কষ্টোপার্জিত ফসলের উপর, কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষ কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল।

বাণিজ্য : মধ্যযুগের অর্থনীতি বাণিজ্য নির্ভর ছিল না।দেশের সাধারণ মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে খুব আগ্রহী ছিল না বলেই মনে হয়। ধনপতি বা চাঁদ সদাগরের বহির্বাণিজ্য তৎকালীন ইতিহাসের অনুষঙ্গ বহন করে না, তবে দেশের অভ্যন্তরেই অন্তর্বাণিজ্য চলত তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতে বণিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর কাঁচা পয়সা হয়েছিল, তারা অর্থনৈতিক কারণে সমাজের সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছিল। কবির কল্পনা হলেও এই সমস্ত বিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। লহনার উক্তিতে ধনপতির পিতৃপিতামহের আমলে বহির্বাণিজ্যের কথা পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের কাব্যে—

"শ্বশুর আছিল রঙ্ক   আনিতে চন্দন শঙ্খ
    সাজন করিয়া সাত নায়।
বেচি কেনি হৈল ধনি   ইহা সব আমি জানি
    কি বুঝাব অবলা তোমায়॥" (ঐ/১৫১)[১৭২]

নৌ-শক্তি ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বহির্বাণিজ্যে বাঙালী সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। চাঁদ সদাগরের মত ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল না, চণ্ডীমঙ্গলে স্থানীয় রাজার পৃষ্ঠ- পোষকতায় ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার কথা পাই। এই বাণিজ্যের কারণে বাঙালী বণিকরা অর্থশালী হয়ে উঠেছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে সপ্তগ্রামের বণিকদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা আছে—

"সপ্ত-গ্রামের বেণে সব কোথায় না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥" (ঐ/১৫৬)[১৭৩]

সপ্তগ্রামের বণিকদের সম্পর্কে এই তথ্য ঐতিহাসিক সত্য। মুহম্মদ আবদুল জলিল্ "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন- "সপ্তগ্রামের বণিকেরা ঘরে বসে যে প্রচুর ধন অর্জন করতো তার পরিচয় সমসাময়িক বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়।"[৩৮] মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যে বাঙালীর এই বাণিজ্যের পরিচয় আছে। এমন কি বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটলেও বাঙালী বণিকদের বাণিজ্যের আগ্রহ হ্রাস পায়নি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেকালের বাণিজ্যের আমদানি- রপ্তানি দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রপ্তানি দ্রব্যের বেশীর ভাগই বাংলার কৃষিজাত ও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য। এখানে যে সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের উল্লেখ পাই সেগুলি হল-— হরিণ, ভেড়া, পায়রা, কাঁচ, চিনি, লবণ, পাট, বিভিন্ন প্রকার ফল, মসলা ইত্যাদি। অপরদিকে বিভিন্ন আমদানি দ্রব্যগুলি হল, যেমন হাতি, ঘোড়া, বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর, যথা- নীলা, মুক্তা, মাণিক্য, শঙ্খ ইত্যাদি। কবিকঙ্কণের কাব্যে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে দ্রব্য বিনিময় অংশে সেকালের আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিচয় আছে—

"বলদ আসে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
অষ্ট দিক্ হৈতে দ্রব্য আনে করি ত্বরা॥
কুরঙ্গ বদলে   তুরঙ্গ পাব
    নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে   লবঙ্গ পাব
    শুঠের বদলে টঙ্ক।
প্লবঙ্গ বদলে   মাতঙ্গ পাব
    পায়রা বদলে শুয়া

গাছ্ ফল বদলে জায়ফল পাব
বহড়ার বদলে গুয়া ॥
পাটশণ বদলে ধবল চামর পাব
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
জোয়ানী বদলে জীরা।
কন্দ বদলে মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা।
চইয়ের বদলে চন্দন পাব
ধুতির বদলে গড়া।
শুক্তা বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।
মাষ মসুরী তণ্ডুল ধুসরি
বাটলা চক চিনা।
বলদ শকটে তৈল ঘৃত বটে
সদাগর আনিছে কিনা ॥
গোধূম কিনে যব খুঁজিয়া সরবপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর পূরিল বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা ॥" (ঐ/১৫৫)[১৭৪]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশের কবি দ্বিজ রামদেবের কাব্যে এরূপ দ্রব্য বিনিময়ে আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিচয় পাই—

"সিংহলের লাভালাভ না জিজ্ঞাস মোরে।
উজানি কাঞ্চনমএ যদি আইস ঘরে ॥
লোহা সীসা লঅ সাধু যত বাস মন।
এহার বদলে পাইবা নির্ম্মল কাঞ্চন।
গুয়াফল লঅরে সাধু কি কহিমু আর।
এহার বদলে পাইবা গজমতি হার ॥
ঘৃণা তেজি লঅ সাধু পাটের পাছরা।
এহার বদলে পাইবা মুকুতার ছড়া ॥
পারাবত লঅরে সাধু যে আছে ধবল।
এহার বদলে পাইবা চামর গঙ্গাজল ॥
বংশের কামান লও তথা অতি সুচারু।
এহার বদলে পাইবা চন্দন দেবদারু ॥" (রামদেব/২৬৫)

দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ রামদেবের কাব্যে রপ্তানি দ্রব্য হিসাবে সোনা, রূপা, সীসা, লোহা, তামা, পিতল, কাপড়, এমন কি গঙ্গাজলও রপ্তানি করার কথা পাই—

"সোনা রূপা লোহা সীসা রাঙ্গা কাপড়।
তামা পিত্তল তোলে চামর গঙ্গার জল॥
বহুবিধ বস্ত্র লৈল বস্থা বস্থা বান্ধি।
ধাতুদ্রব্য লইল সাধু নাহিক অবধি॥" (দ্বিজ মাধব/২২৭)

এসমস্ত তথ্য বাংলার শিল্প ও কৃষি সম্পদের সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। কবির বর্ণনায় বাহুল্য থাকলেও তার বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। এযুগের অর্থনীতিতে বহির্দেশীয় বাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল। সে সময় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করার নানা প্রমাণ আছে। তবে যাই হোক, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল গ্রামীণ হাট বা বাজার। দেশের উৎপাদিত কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামীণ হাটেই বিক্রি হত। মানুষ হাট থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। কালকেতু গুজরাট নগরে তাই হাট প্রতিষ্ঠা করতে ভোলেনি। বিদেশী বণিকগণ এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা নামধারী জমিদারগণ এই গ্রামীণ হাটকে কেন্দ্র করে ব্যবসা- বাণিজ্য করত। মানিক দত্ত কালকেতুর নগর পত্তন ও প্রজা স্থাপন সম্পর্কে লিখেছেন-

"আর জত বসিল লোক কি কহিব তরে।
নগর মধ্যে হাট পড়ে শনি মঙ্গল বারে॥
প্রথমে কৈবর্ত্ত বৈসে বাজারে বেচে ধান।
বারই ভাই বসিল তারা বেচে পান॥
বাণিয়া হাট বসি গেল অন্য২ পসার।
গোওাল হাট বসি গেল মধুর বাজার॥
তৈলঙ্গা হাট বসি গেল বাজারে বেচে ভুণি।
বীরের বাজারে বেচে ভোট কম্বল খানি॥
হস্তী ঘোড়া খরিদ হএ বীরের বাজারে।
চারি রাজ্যের রাজা আইসে বাণিজ্য করিবারে॥" (মানিক/১৩২-১৩৩)

মানিক দত্ত জানিয়েছেন হাটে 'ভোট কম্বল' বিক্রি হত। সম্ভবত ভুটান থেকে আমদানি করা কম্বলকে ভোট কম্বল বলা হত। দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণের কাব্যে হাট বা বাজারের চিত্র আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে গোলাহাটের কথা আছে, যেখানে কালকেতু নগর স্থাপনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করে। কবিকঙ্কণের বিবরণ অনুসারে গোলাহাটের নগর বাজারে সকল প্রকার জিনিসপত্র— এমনকি যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির কথাও আছে। আবার বণিক খণ্ডে দুর্বলার বাজার করার দৃশ্য আছে। সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ সকল হাটের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।চাকুরীকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার ঝোঁক এযুগে মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। তবে কিছু কিছু মানুষ রাজসেবায় অর্থাৎ রাজকার্যে ও সেনাবাহিনীতে যোগদান করত।

শিল্প ঃ কৃষির পরেই বাংলার অর্থনীতিতে এযুগের অন্যতম ভিত্তি ছিল শিল্প। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও বাংলার ক্ষুদ্রশিল্পের পরিচয় আছে। বৃহৎশিল্প তৎকালীন বাংলাদেশে ছিল না। ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে অন্যতম হল তাঁত বা বস্ত্রবয়ন শিল্প। বাংলার ঘরে ঘরে হস্তচালিত তাঁত ছিল, তাই মেয়েরাও সুতা কাটত। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এর উল্লেখ আছে। নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এক নারী বলেছে-

"প্রভুর দোসর নাহি উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত জোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে॥" (মুকুন্দ/২০)

ষোড়শ শতাব্দীতে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, বাংলার তাঁত শিল্পীরা অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে থাকে। কালকেতু প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরে তাঁতিদের আগমন ঘটে, দ্বিজ মাধবের কাব্যেও তাঁতিদের আগমনের কথা পাওয়া যায়। মুকুন্দের কাব্যে পাই—

"শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি ধুতি বোনে জোড় গড়া।" (ঐ/৭১)[১৭৫]

মধ্যযুগের সাহিত্যে বাংলার উৎকৃষ্ট বস্ত্র— বুটিদার, তসর, মেঘডম্বর ইত্যাদি শাড়ির উল্লেখ আছে। তাছাড়া গামছা, চাদর, দুলিচা, চাঁদেয়া, মশারি, বিছানা, ইজার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলাদেশে লবণ, চিনি ইত্যাদি উৎপাদিত হত। মোদকের কারখানায় চিনি ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হত। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনে যে সমস্ত বৃত্তিধারী জাতির আগমন হয়েছিল তাদের বেশীরভাগ কুটীরশিল্প বা হস্তশিল্প উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেমন— শঙ্খশিল্প, লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঁসা-পিতলের শিল্প, স্বর্ণশিল্প বা অলঙ্কার শিল্প, চর্মশিল্প; তাছাড়াও চুন, তেল, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদিত হত। চর্মকাররা জুতা, খড়ম তৈরী করত। কবিকঙ্কণ লিখেছেন—

"মোজা পানই আব জিন নিরময়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে।" (ঐ/৭২)[১৭৬]

বাংলার মৃৎশিল্প, চিত্রশিল্প, অলঙ্কার শিল্প, শঙ্খশিল্প বিখ্যাত ছিল। বিদেশেও এসকল শিল্পদ্রব্যের জনপ্রিয়তা ছিল। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা অংশে তার পরিচয় আছে।

বাংলাদেশ বনজ সম্পদে চিরদিনই সমৃদ্ধ ছিল, বনে বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্ট কাঠ, বাঁশ, বেত ও বিভিন্ন ধরনের পাতা উৎপাদিত হত। 'কালকেতুর বনকর্তন' অংশে বন কাটার সময় বাংলার কাষ্ঠ সম্পদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বনজ সম্পদকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ধরনের কাঠের আসবাব তৈরী করত সূত্রধরগণ। তারা খাট, পালঙ্ক, পিঁড়ি, চৌদল, কুর্সী ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব তৈরী করত। তাছাড়া নৌকা, সাঁকো ইত্যাদি তৈরীর প্রসঙ্গও পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। মাল পরিবহনের উপযোগী নৌশিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। সূত্রধরগণ বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের পরিবহন যোগ্য নৌবহর তৈরী করত। তাদের গঠন ও আকৃতি বিভিন্ন রকম, তাদের নামও ছিল বিভিন্ন। বাংলার কাষ্ঠ শিল্পীগণ কাঠ থেকে সুন্দর খেলনা তৈরী করত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে বাঁশের কামানের কথা পাই— "বংশের কামান লও তথা অতি সুচারু।" (দ্বিজ রামদেব/২৬৫)। তাছাড়া নিম্নশ্রেণীর ডোম, পাটনী প্রভৃতি অন্ত্যজরা বাঁশ ও বেত দিয়ে ডালা, কুলা, ঝুড়ি, ঝাঁপি, মাথাল বা টোকা তৈরী করে বিক্রি করত। মধ্যযুগে কাগজ শিল্প না থাকলেও দেশীয় পদ্ধতিতে কাগজ তৈরী হত, কেননা এযুগে দেশীয় কারিগরদের তৈরী তুলট কাগজের প্রচলন ছিল। বাঁশ, কাঠ, কার্পাস, গাছের বাকল থেকে কাগজ তৈরী করে এক শ্রেণীর মানুষ 'কাগজী' নামে পরিচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বৃহৎশিল্প হিসাবে লোহা ও সীসা শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিল্পক্ষেত্রে বাংলার সমৃদ্ধির কথা মঙ্গলকাব্যে সুবিদিত।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার যথেষ্ঠ উন্নতি হয়েছিল এযুগে, কিন্তু এই উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলভোগ করত দেশের প্রধানত বণিক সম্প্রদায়, জমিদার, মহাজন, রাজকর্মচারী, সামন্তরাজ ইত্যাদি কতিপয় উচ্চবিত্তের মানুষ। আপামর সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ধনীরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, অন্নপ্রাশন বা বিভিন্ন পূজা-পার্বণে প্রচুর ব্যয় করত, দানধ্যান করত। কবিকঙ্কণের কাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বণিক সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির পরিচয় আছে। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার প্রাক্কালে খুল্লনা ধনপতিকে জানায়, ঘরে প্রচুর ধনসম্পদ আছে

তাই বাণিজ্যযাত্রা নিষ্প্রয়োজন—

"ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতঙ্ক
রাজ স্থানে পাইবে প্রসাদ॥
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা রসান নিকর শিলা
মাণিক বিদ্রুম মরকত॥
যত আছে নিজগারে দেহ লয়ে নরবরে
সুখে থাক জায়া-অনুগত॥" (মুকুন্দ/১৫১)[১৭৭]

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত বণিকদের আগমন ঘটে তাদের ধন-ঐশ্বর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়-

"বর্দ্ধমান হৈতে বেণে আইসে ধূসদত্ত।
সর্ব্বজনে গায় যার কূলের মহত্ব।
.. ..
একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি-ধাম॥" (ঐ/১৩৯-১৪০)[১৭৮]

ধনীরা আহার-বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, গহনা-অলঙ্কারে প্রচুর ব্যয় করত। দ্রব্যমূল্য কম থাকায় সাধারণ মানুষের খাওয়া পরার অভাব হত না, কিন্তু দরিদ্রের হাতে কাঁচা পয়সা না থাকার ফলে ক্রয় মূল্য দিয়ে কেনার ক্ষমতা মানুষের কম ছিল। তৎকালীন দ্রব্যমূল্য থেকেও মানুষের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রব্যমূল্য কত কম ছিল তার প্রমাণ আছে কালকেতুর বিবাহের কেনাকাটায়। দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেখি কালকেতুর বিবাহে মাত্র তেরো গণ্ডা কড়িতেই বিবাহের কেনাকাটা সম্পূর্ণ হয়েছে। কবির বর্ণনা অনুসারে—

"গণ্ডা তের কড়ি লইয়া বীর গেল হাটে॥
পাঁচ গণ্ডার কিনিলেক দুইগাছি ধড়া।
একখানি খইয়া লইল দিয়া পাঁচ কড়া॥
দশ কড়ার খড় কিনি হরিষ প্রচুর।
পাঁচ কড়ার কিনিলেক মাটিয়া সিন্দুর॥
চা'র কড়ার পান কিনে এক কড়ার চুন।
তিন কড়ার মরিচ কিনে দুই কড়ার নুন॥" (দ্বিজ মাধব/৩৮)

কবিকঙ্কণের কাব্যে দুর্বলার বাজার করার মধ্যে দিয়ে সেকালের দ্রব্যমূল্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

দরিদ্ররা যৎসামান্য আয়ে সংসার নির্বাহ করত, হরগৌরীর সংসারযাত্রা ও ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে তার সুন্দর বিবরণ আছে। গ্রামীণ জনসাধারণ অভাবে প্রতিনিয়ত মহাজনের শরণাপন্ন হত, আর মহাজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে চাল, ক্ষুদ ইত্যাদির বিনিময়ে কিংবা সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাদের সর্বস্বান্ত করত। কাজেই দারিদ্র্য সাধারণ মানুষের নিত্য সহচর ছিল। তাই অভাব যেমন কিরাত কালকেতুর ঘরে, তেমনি ব্রাহ্মণ শিবঠাকুরের ঘরেও। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভিখারী শিবের খেদোক্তি—

"দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।" (মুকুন্দ/২৩)[১৭৯]

'কালকেতুর অন্নচিন্তা' অংশে উল্লিখিত কিরাত পাড়ায় বসবাসের কারণে ধার বা ঋণ মেলে না—

"কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধু জন নাহি সহে কেহ ভার॥" (ঐ/৪৭)[১৮০]

শিবের উক্তি আর কালকেতুর উক্তিতে সাজুয্য আছে। ডঃ সুমঙ্গল রাণা 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন— "ফুল্লরার মুখে— 'কিরাত নগরের বসি না মিলে উধার।' আক্ষেপোক্তি নিতান্তই অর্থহীন।" ৩১ -এই মন্তব্যকেও তেমনভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল বলেই কিরাত সমাজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ হবে এমন কথা ভাবা যায় না। ফুল্লরার বারমাস্যাতে ফুল্লরার উল্লিখিত দারিদ্র্যের চিত্র বর্ণনা শুধু মাত্র সপত্নী সমস্যাকে কেন্দ্র করেই তা নয়, কারণ পূর্বে কালকেতুর মুখে তার অন্ন চিন্তার কথা শোনা যায়। কিরাতের স্ত্রী ফুল্লরার মাংস বেচে সংসার চলে, কিন্তু বৈশাখ মাসে লোকে মাছ-মাংস খায় না, তাই মাংস বিক্রি না হওয়ায় তার ঘরে অন্নাভাব দেখা দেয়, সুতরাং ফুল্লরার মত দরিদ্রেরা বৈশাখের রোদে পোড়ে, আষাঢ়ের জলে ভিজে, তাদের শীতের বস্ত্র জোটে না। ফুল্লরার 'জানু ভানু কৃশাণু' মাত্র সম্বল। এই বর্ণনা নিছক সপত্নী বিতাড়নের মন্ত্র নয়, এর ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালের জীবন মৈত্রের 'পদ্মাপুরাণ', তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়নে এই চিত্র পাওয়া যায়। মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যায় আছে অনুরূপ বর্ণনা—

"শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে ঝিমানি।
মাথা থুইতে ঠাই নাই ঘরে আঠু পানি॥
শীতের কারণে ঘরে বেড়াই চারি কোণে।
মানের পাত মুণ্ডে দিয়া বঞ্চি দুই জনে॥
ভাদ্র মাসেত রামা বিদ্যুৎ ঝঙ্কার।
হেনকালে চলি আমি মাথায়ে পসার॥" (দ্বিজ মাধব/৫৪)

দ্বিজ রামদেবেরর কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। বিদেশীদের বিররণে এযুগের সমৃদ্ধির চিত্র বর্ণিত হলেও নিরন্ন ঘরের চিত্র তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। দ্বিজ মাধব কালকেতুর প্রজাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাস্তবে এ চিত্র কালকেতুর আদর্শায়িত রাম রাজ্যের চিত্র। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অর্থনীতির চিত্র আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্মজীবন ঃ একটি মাত্র মঙ্গলকাব্য শাখাকে আশ্রয় করে বাঙালী সমাজের ধর্মজীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব।বস্তুত বাঙালী সমাজ বহুধা বিভক্ত ছিল, ফলে তার আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার পৃথক ছিল। বর্ণাশ্রম প্রথা কবলিত বাঙালী সমাজে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ছাড়াও হিন্দু সমাজেই এত রূপভেদ ছিল যে তার স্বরূপ অন্বেষণ অত্যন্ত জটিল বিষয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, তান্ত্রিক, সহজিয়া, বৈষ্ণব সমাজের ধর্ম, কর্ম. চরিত্রের অনৈক্য প্রবল ছিল। আর্থসামাজিক কারণেও তাদের ব্যবধান অত্যন্ত বেশী ছিল, চণ্ডীমঙ্গলে তার ছায়াপাত ঘটেছে।

বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে যে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগে বিভিন্ন সাহিত্য শাখায়। বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীই সমাজে অধিক ছিল, বৈষ্ণবধর্ম তখনো সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি। উচ্চবর্ণের মানুষ এযুগে লৌকিক দেবদেবীকে স্বীকার করে নিয়েছিল, মঙ্গলকাব্যগুলি তার পরিচয় বহন করে। তাইতো ব্যাধ কালকেতুর উপাস্য দেবী চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডী বরাভয়দাত্রী দেবী দুর্গায় পরিণত হয়েছে। বস্তুত কালকেতুর দেবী চণ্ডী আর খুল্লনার ব্রতের দেবী পৃথক হলেও তারা ধীরে ধীরে এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে। এরূপে বহু দেবদেবীর রূপান্তর ঘটেছে তার পরিচয় আছে মধ্যযুগের সাহিত্যে। কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা করেছেন এবং তাছাড়াও বহু দেবদেবীর বন্দনা পাই, যেখানে পৌরাণিক বা লৌকিক কেউই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। গণেশ. সূর্য, সরস্বতী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রামচন্দ্র, মনসা, চণ্ডী এবং সর্বদেবদেবীর বন্দনা বিভিন্ন কাব্যে আছে। কবিকঙ্কণ চৈতন্য বন্দনা করেছেন, কারণ চৈতন্যদেব তখন দেবতা রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আবার কবি যে দেবীর বিজয়গাথা রচনা করেছেন কবি যে স্বয়ং ঐ দেবীরই ভক্ত ছিলেন তা নয়। স্বয়ং

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের ধর্মমত কি ছিল এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও সম্ভবত তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয়। কবিকঙ্কণের কাব্যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব আছে, ধনপতি বাণিজ্য যাত্রাকালে নদী পথে যে সমস্ত তীর্থস্থান পড়ে সেগুলিতে পূজা ও তর্পণ করে। নবদ্বীপ সে সময় তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। বেদ পুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্থাদির কত প্রভাব বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যত্রতত্র। সামাজিক আদর্শ ও ন্যায়নীতিবোধে বাঙালী চিরকাল উদ্দীপ্ত হয়েছে। সমাজের নিম্নকোটিতে অবস্থিত ব্যাধপত্নী ফুল্লরাকেও তাই শাস্ত্রের নীতি, আদর্শ ও উপদেশ উচ্চারণ করতে শুনি, হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে যা ছিল সিদ্ধ রসের মত। দ্বিজ রামদেবের কাব্যের যত্রতত্র বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গকে ধুয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

কবিকঙ্কণের কাব্যে হরিনাম মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দুধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ খুব একটা দেখা যায় না, আসলে ধর্মকলহ চৈতন্যদেবের প্রেম সাধনার স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। তবুও এক শ্রেণীর মানুষ কঠোরভাবে স্বীয় ধর্মাচরণ করত। উপাস্য দেবতার পূজা না করে জলগ্রহণ করত না। শৈব-শাক্তের যে উৎকট দ্বন্দ্ব চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালের মনসামঙ্গলে আছে চণ্ডীমঙ্গলে ততটা নেই। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দক্ষরাজ ও শিবের যে দ্বন্দ্বের কথা আছে তা ব্রাহ্মণশাসিত বৈদিক ধর্ম ও লৌকিক শৈবধর্মের দ্বন্দ্বের রূপচিত্র। মঙ্গলকাব্যগুলিতে যুগ লক্ষণের কথা ধরলে বলতে হয়, এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসের জয় হয়েছে। তবে চণ্ডীমঙ্গলে এই ধর্মদ্বন্দ্ব অপেক্ষাকৃত কম। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধর্মকলহ জনিত সংশয় দৃষ্টি স্তিমিত, যুগপরিবর্তনের ফলে এই সংশয় দৃষ্টি আরো অবলুপ্ত হয়েছে। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে এই সংশয় সামান্যতমও দেখা দেয়নি। আবার ধনপতির শাক্ত দেবী বিদ্বেষ উৎকট না হলেও বিদ্বেষের বীজ আছে, তাইতো ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে চণ্ডীর ঘট পদদলিত করে যায়—

"ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥" (মুকুন্দ/১৫৩)[১৮১]

ধনপতি শেষ পর্যন্ত শিবঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে ছিল, আর শ্রীমন্ত যেমন মাতৃভক্ত তেমনি মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরেই স্ত্রীদেবতা চণ্ডীর আরাধনা করেছে। বস্তুত শ্রীমন্তের মধ্যে দিয়েই শাক্ত দেবীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধনপতিও শেষ পর্যন্ত শাক্ত দেবীর মাহাত্ম্য স্বীকার করে নেয়, দ্বিজ মাধবের কাব্যে ধনপতি তাই বলে—

"ধনপতি বোলে মোর ব্যাধি যদি খণ্ডে।
শিবের ঘরিণী মুই পূজিমু এই দণ্ডে॥" (দ্বিজ মাধব/২৯৩)

সমাজের বহু দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল ও নানা বার-ব্রত প্রচলিত ছিল। তাই মানিক দত্তের কাব্যে বিশ্বকর্মা দেবীর কাঁচুলি চিত্রনে লৌকিক অন্যান্য দেবী, মনসা ও ষষ্ঠীকে চিত্রিত করতে ভোলেনি। বাঙালীর ঘরে ঘরে সারা বছর ধরে নানা বারব্রত পালিত হত। কবি লিখেছেন—

"বৈশাখ মাসেত নরে নানা ব্রত করে।
কেহো করে দান পুন্য ভব তরিবারে॥" (মানিক/৯৯)

বস্তুত বৈশাখ মাস ধর্ম মাস হিসাবে চিহ্নিত, তাই এসময় লোকে নানা ব্রত পালন করত। লৌকিক দেবদেবীর মত তান্ত্রিকধর্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মও তন্ত্রচর্চার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থে তন্ত্রচর্চার কথা আছে, তাদের বিচিত্র আচরণের কথা আছে। মদ্য, মাংস, বলি সহযোগে তন্ত্রের দেবীর পূজা হত। মারণ, উচাটন, বশীকরণে মানুষ তান্ত্রিকের আশ্রয় নিত। সপত্নী বিতাড়নের জন্য লহনা তন্ত্রচর্চা ও তান্ত্রিকের আশ্রয় নেয়। লৌকিক দেবদেবীর পূজায় মদ্য, মাংস, ব্যবহৃত হত; বলিদান প্রথাও প্রচলিত ছিল—

"শনিবারের পূজা শুনহ সন্ধান।

ছাগ মহিষ মেষ দিঞা বলিদান॥" (মানিক/৩৭৫)

যাই হোক, এযুগে ধর্মীয় বাতাবরণে সকল ধর্মের সমন্বিত রূপই প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই কালকেতুর গুজরাট নগরে সকল জাতির বসবাস; শুধু তাই নয়, কবির চিন্তায়, মানুষের মননে ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা এসেছে। কবি তাই বলেন—

"শিবপূজা করে যেবা দেবীপরায়ণে।

আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মীনারায়ণে॥" (মুকুন্দ/২৩৯)[১৮২]

সমাজের মধ্যে পাপ, অনাচার লুক্কায়িত থাকায় মুকুন্দ চক্রবর্তী 'কলির মাহাত্ম্য' বর্ণনা করতে গিয়ে অনাগত সম্ভাবনার ইঙ্গিত করেছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার ফলশ্রুতি লক্ষ করা যায়।

চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর চরিত্রগত রূপটিও প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, লোকসমাজে মানব চরিত্র গঠনে দেবদেবীর প্রভাব তো ছিলই এবং দেবদেবী চরিত্রের বিবর্তনে মানব বিবর্তনের চিত্রই পাওয়া যায়।দেবী চণ্ডী মনসার মত ক্রূর নয়, সে অনেক বেশী কোমল। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে দেবীর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে, তাই চণ্ড বিনাশিনী চণ্ডী, দ্বিজ মাধবের মঙ্গলাসুর নিধনকারিনী চণ্ডী মুকুন্দের কাব্যে মাতৃমূর্তি পেয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দেবী আরও পরিবর্তিত হয়েছে।ধর্মের প্রভাবে সমাজে মানব চরিত্রের কমনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই ধনপতি চরিত্রে চাঁদের মত উৎকট দেব বিরোধিতা নেই। মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হলেও তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গলে। খুল্লনা সনকার মত মাতা হলেও স্ত্রী হিসাবে সনকা অপেক্ষা অনেক বেশী সক্রিয়। শ্রীমন্ত লখীন্দরের মত ব্যক্তিত্বহীন নয়, সে মায়ের সম্মান ও নিজের আত্মপরিচয় উদ্ধারে সিংহলযাত্রা করে। তবে সমাজে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীলের মত ঠক-প্রবঞ্চক, মুরারী পত্নীর মত দুর্নীতিপরায়ণ, দুর্বলার মত প্ররোচনাকারী দাসী, লীলাবতীর মত সাধারণ মানুষরা বসবাস করত, যারা মিথ্যাচারীতা, ছলচাতুরী ও অভিনয় দ্বারা মানুষের সর্বনাশ করতে উদ্যত হত। সামাজিক ন্যায়নীতি আদর্শবোধ তাদের পীড়িত করত না।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১২।

২। ঐ, পৃঃ ৪১৫।

৩। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, পৃঃ ।

৪। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত (ভূমিকা অংশ)।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৭৫।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯।

৭। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, দ্বিজ মাধব, সুধীভূষণ আচার্য সম্পাদিত। (ভূমিকা অংশ, কবি-প্রসঙ্গ)।

৮। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১০।

৯। মঙ্গলচণ্ডীর গীত, দ্বিজ মাধব, সুধীভূষণ আচার্য সম্পাদিত, (ভূমিকা অংশ, কবি-প্রসঙ্গ)

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯-৪৬০।

১১। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১১।

১২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৪১।

১৩। অভয়ামঙ্গল, দ্বিজ রামদেব, আশুতোষ দাস সম্পাদিত, (ভূমিকা অংশ, কবি পরিচয়)।

১৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৪১।

১৫। ঐ, পৃঃ ৫৪৩।

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২৩।

১৭। ঐ।

১৮। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৬।

১৯। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, পৃঃ ১৭৪।

২০। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৬।

২১। বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন, আহম্মদ শরীফ, পৃঃ ৯২।

২২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১০।

২৩। ঐ, পৃঃ ১০।

২৪। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৩।

২৫। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১১।

২৬। ঐ, পৃঃ ১০।

২৭। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এম. এ. রহিম, ২য় খণ্ড, মোহাম্মদ অসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি কর্তৃক ইংরেজী থেকে বাংলায় অনূদিত, পৃঃ ১০৫ ।

২৮। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, (ভূমিকা অংশ) পৃঃ ৩০-৩১।

২৯। ঐ, পৃঃ ৩১।

৩০। ঐ, পৃঃ ৩১।

৩১। ঐ, পৃঃ ৩২।

৩২। ঐ, পৃঃ ৩২।

৩৩। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৩।

৩৪। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'চণ্ডীমঙ্গলের সমাজ তাত্ত্বিক সংকেত' প্রবন্ধ, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩১।

৩৫। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ, পৃঃ ৩৫।

৩৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৬০।

৩৭। ঐ।

৩৮। ঐ, পৃঃ ১৭১।

৩৯। 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা' গ্রন্থে 'মুকুন্দের সমাজ চেতনা এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালীন সমাজ' প্রবন্ধ, সুমঙ্গল রাণা— আশিস্‌কুমার দত্ত ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৫।

এই অধ্যায়ে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্ধৃতিগুলি বসুমতী সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে, এখানে— 'কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত পুঁথির পাঠ নিম্নে সংযোজিত হল ঃ-

১) "সহর সেলিমা বাজ তাহাতে সজ্জন রাজ

- - - - - - - - - - - -

মিরাস পুরুষ ছয় সাত।" (পৃঃ ৩)

২) "শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।" (পৃঃ ৩১১)

৩) "আজি গণেশের মা রান্ধিবেন মোর মত
এবেলা আমরা মত রান্ধ বেঞ্জন দশ।" (পৃঃ ২৬)

৪) "পতির আদেশ ধরি রান্ধেন খুল্লনা নারী

- - - - - - - - - - - -

অনুচরী জোগায় দুবলা।" (পৃঃ ১৬০)

৫) "শিব স্মঙরিআ কৈল দুই আঁচমন

- - - - - - - - - - - -

রসাল পনস-কোষ রসালের রস।" (পৃঃ ১৬১)

৬) "ভোজন সঙ্কলি আঁচমন কুতূহলে

কর্পূর তাম্বুল যায় হাসে খলখলে।" (পৃঃ ১৬১)

৭) "সাধু বলে দুয়ারে ভুঞ্জাও বন্ধুজন

অবশেষে গৃহস্থের উচিত ভোজন।" (পৃঃ ১৬১)

৮) "আজ্ঞা নিদয়ার ঘরে ফুল্লরা রন্ধন করে

আগে ধর্মকেতুর ভোজন।" (পৃঃ ৪৪)

৯) "চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

তাহা দিআ খাও বীর ভাত তিন কাঁড়ি।" (পৃঃ ৪৬)

১০) "আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই

- - - - - - - - - - - -

আর দেহ ডুম্বুরের ফল।" (পৃঃ ৪০)

১১) "সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া

- - - - - - - - - - - -

বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা॥" (পৃঃ ৪৫)

১২) "বেসাত্য দুবলা জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে

মাগ্যা লয় তার কিছু ভাট।" (পৃঃ ১৫৮)

১৩) "সেই বর - জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা

খুঁজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুণ্ডের সরা।" (পৃঃ ৪২)

১৪) "রঙ্ক দুঃখী নাহি চিনি হেম ঘটে পিয়ে পানি

নাট গীত সভাকার ঘরে।" (পৃঃ ৮৬)

১৫) "পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেম ঝারি

বাটী ঘটী সব হেমময়।" (পৃঃ ৮৬)

১৬) "সাজী আঁকুড়ি হাথে প্রবেশে কাননপথে

স্মঙরণ করিয়া শঙ্কর।" (পৃঃ ৩৪)

১৭) "চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলির মোচা।" (পৃঃ ৮৫)

১৮) "নিরামিষ্য অন্ন দুঁহে করিল ভোজন

উলটি ডাবরে সাধু কৈল আঁচমন।" (পৃঃ ১৭৪)

১৯) "মনে বড় কুতুহলি কান্দেতে কড়ির থলি

হরপি তরাজু করি হাথে।" (পৃঃ ৬৬)

২০) "রজত দর্পণ ক্ষেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম

- - - - - - - - - - - -

পূর্ণপাত্র প্রিদ্দিপ সহিত।" (পৃঃ ১২৬)

২১) "হরিআ নাপিতে বীর দিল আখি ঠার

- - - - - - - - - - - -

দেখিআ ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর।" (পৃঃ ১০৬)

২২) "অভয়া বলেন কালু লহ সিকা ভার

- - - - - - - - - - - -

তুমি আজ্ঞা দিলে মাতা কোড়িব চেয়ারে।" (পৃঃ ৬৪)

২৩) "তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ।" (পৃঃ ৮৮)

২৪) "দোয়াড়ি চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান

ভূষণ্ডি ডাবুস চক্রবাণ।" (পৃঃ ৮৯)

২৫) "পরিতোষে লহনার দিল পাট সাড়ী

পাঁচ পল সোনা দিল পড়িবারে চুড়ি।" (পৃঃ ১২০)

২৬) "খুঞ্যা পরাইআ পাট সাড়ী কৈল দূর।" (পৃঃ ১৩৮)

২৭) "তুলি তুলবাটী তৈল তাম্বুল তপনে

তরুণী তপন তসর তোয় বসনে।" (পৃঃ ২৯৩)

২৮) "খুল্লনার হাথে দিল আভরণ – পেড়ি

দোছটি করিআ পরে তসরের সাড়ি।" (পৃঃ ১৫৪)

২৯) "বাছিআ পরএ মেঘ ডম্বরু কাপড়।" (পৃঃ ১৫৫)

৩০) "ধরি নানা আভরণে অবশেষে পরে মনে

- - - - - - - - - - - -

স্বর্গের বিশাইয়ে স্মঙরণ।" (পৃঃ ৫৬)

৩১) "ফোঁটা পাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব

শ্রবণে কলম খরসান।" (পৃঃ ৭৭)

৩২) "পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাজুত ধৃতি

পরিয়া বসিলা আসনে।" (পৃঃ ২০)

৩৩) "বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।" (পৃঃ ১২৪)

৩৪) "ধবল চামর বান্ধা উপরে টানায় চান্দা

- - - - - - - - - - - -

তার মাঝে নানা পাট ডোরা।" (পৃঃ ১৬১)

৩৫) "বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাঙ খাট পাড়ি

- - - - - - - - - - - -

কারে দিব মন্দির মশারি।" (পৃঃ ১১৯)

৩৬) "পুত্রের বারতা পায়্যা শচী আনন্দিতা

উঠানে খাটাল্য পাট-কথুবার চাঁন্দা।" (পৃঃ ১০৯)

৩৭) "প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙা ধড়া।" (পৃঃ ৪৭)

৩৮) "পরিধান বীর-ধড়ি মাথাএ জালের দড়ি

অঙ্গে লেপিত রাঙ্গা মাটি।" (পৃঃ ৮৮)

৩৯) "পা পোড়ে খরতর রবির কিরণ

শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।" (পৃঃ ৬১)

৪০) "পীত তড়িত বর্ণে হেম কুণ্ডলিকা কর্ণে

- - - - - - - - - - - -

কলেবরে মলয়জলঙ্ক।" (পৃঃ ১৬২)

৪১) "বীর হস্তে দেন দেবী মাণিক-অঙ্গুরী।" (পৃঃ ৬৪)

৪২) "হাড়মাল হইল কণ্ঠরত্নমাল।" (পৃঃ ২১)

৪৩) "দুই চক্ষু জেন নাটা খেলে টিকা কোট ভেঁটা
কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল।" (পৃঃ ৪১)

৪৪) "দুবলা মার্জএ কেশ লয়্যা প্রসাধবনি
- - - - - - - - - - - -
বাছিআ পরএ মেঘডম্বরু কাপড়।" (পৃঃ ১৫৫)

৪৫) "জতনে পরএ রামা অঞ্জন সিন্দুর
মার্জন করিআ পরে মণিকর্ণপুর।" (পৃঃ ১৫৫)

৪৬) "হরিদ্রা কুমকুম লয়্যা ঘরে ঘরে বুলি চায়্যা
করিতে অঙ্গের মলা দূর।" (পৃঃ ১৫৭)

৪৭) "হরিদ্রা চন্দন তৈল আনিল দুবলা
খুল্লনার অঙ্গে দিআ দূর কৈল মলা।" (পৃঃ ১৫০)

৪৮) "দুবলা বুঝিআ কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুমকুম চন্দনে।" (পৃঃ ১৬২)

৪৯) "করে ধরি আগুলা সুগন্ধি তৈল বাটী
সাধু বিদ্যমানে আইল পাটরাণির চেটি।" (পৃঃ ২৯৪)

৫০) "বরযাত্রী পড়ে সাড়া ঢেমচা দগাড়ী পড়া
বর বেড়ি করএ গমন।" (পৃঃ ১৫০)

৫১) "দেখিলাঙ অপরূপ সুগন্ধি অগৌর ধূপ
- - - - - - - - - - - -
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীণা বেনি।" (পৃঃ ৮৭)

৫২) "তাতিনি তাতিনি তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
- - - - - - - - - - - -
পিনাক বাজায় কুতূহলি।" (পৃঃ ১১০)

৫৩) "পটহ মৃদঙ্গ সানি দগড় কাসর বেণি
- - - - - - - - - - - -
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নৃত্তকী।" (পৃঃ ১২২)

৫৪) "চৌদিকে ধাঁ ধাঁ বাজায় দামামা
- - - - - - - - - - - -
কার কেহ নাঞি শুনে বোল।" (পৃঃ ৯১)

৫৫) "সাজ সাজ বলিআ দামায় পড়ে ঘা
- - - - - - - - - - - -
জয় ঢাক বীর ডাক ব্যালিষ বাজনা।" (পৃঃ ২৭১)

৫৬) "গোমএে লেপিআ মাটি আলিপনা পরিপাটী

চারিদিকে বান্ধবের মেলা।" (পৃঃ ৪৩)

৫৭) "পাইয়া ইনাম বাড়ী   বুনে নেত পাট সাড়ী

দেখি বড় বীরের হরিস।" (পৃঃ ৮২)

৫৮) "শঙ্খ বান্যা কাটে শঙ্খ   কেহ তার করে রঙ্গ

- - - - - - - - - - - -

সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।" (পৃঃ ৮২)

৫৯) "দরজি কাপড় শিঞে   বেতন করিয়া জিঞে

গুজরাটে বৈসে এক পাশে।" (পৃঃ ৮৩)

৬০) "কুম্ভকার গুটরাটে   হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে

- - - - - - - - - - - -

ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।" (পৃঃ ৮২)

৬১) "কিঙ্কর করিআ দিল দোলার সাজন

আগে পাছে লইআ পাকি শতশত জন।" (পৃঃ ১২৫)

৬২) "বায়ু-বেগে রথ জায়   উভমুখে প্রজা জায়

- - - - - - - - - - - -

জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।" (পৃঃ ১০৮)

৬৩) "অধিবাসের লইআ সাজ   চলিল ঘটক রাজ

- - - - - - - - - - - -

গায়নে মঙ্গল গায় গীত।" (পৃঃ ১২১)

৬৪) "প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর

- - - - - - - - - - - -

গোঁজে বান্ধ্যা এড়ে ডিঙ্গা লোহার সিকলে।" (পৃঃ ১৯৫)

৬৫) "সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু

দুঃখ ভোগ করিবারে জিএ কালকেতু।" (পৃঃ ৫৪)

৬৬) "দারুণ দৈবের গতি   সকলে দরিদ্র পতি

পড়িনু সম্বলচিন্তা ফাঁদে।" (পৃঃ ৫৪)

৬৭) "শুভযোগে মৃগ শিরা   মেরু শৃঙ্গে জেন হীরা

- - - - - - - - - - - -

ইহা বিনু যাত্রা নাহি আর।" (পৃঃ ২৩০)

৬৮) "মকরে ধরণীসুত   বুধে চান্দ গুরুজুত

- - - - - - - - - - - -

পিতার উদ্দিশ হয় হেতু।" (পৃঃ ২১৭)

৬৯) "বাহির হইতে সাধু বাজিল উছটা

- - - - - - - - - - - -

বামে ভুজঙ্গম দেখে দক্ষিণে শৃগালী।" (পৃঃ ২০১)

৭০) "সুবর্ণ-গোধিকা দেখি   চিত্তে বীর হইলা দুখী

\- - - - - - - - - - - -

কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক।' (পৃঃ ৫২)'

৭১) "বামবাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি।" (পৃঃ ৫৮)

৭২) "কপালে টনক নড়ে সুক্ষ্ম ধৃতি নাগ্রিঃ উড়ে

\- - - - - - - - - - - -

কালপেচা ডাকে চারি ভিতে।" (পৃঃ ২৬৩)

৭৩) "বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবিণী

\- - - - - - - - - - - -

সন্ধ্যাকালে কোন নর দেহ ধূপদীপ।' (পৃঃ ২০১)'

৭৪) "অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর সাঁপ

ব্যাধকূলে জনম নিশ্চয়।" (পৃঃ ৩৭)

৭৫) "ধনবান জার পতি সেই জায়া ভাগ্যবতী

\- - - - - - - - - - - -

নরকে নাহীক পরিত্রাতা।" (পৃঃ ১৮৩)

৭৬) "অপুত্রক জার গারি তার ধনে রাজা বৈরী

প্রথম বাসরে উপবাস।" (পৃঃ ১৮৩)

৭৭) "তুহু পাপমতি বাঁজি হইলি অপযশ পাঁজি

কহ মোরে কেমন উপায়।" (পৃঃ ১৮৩)

৭৮) "মর্যা গেল ধনপতি হইল বহু দিস

মায়ের আইয়ত হাতে ভোজন আমিস।" (পৃঃ ২২৪)

৭৯) "বৈশাখ হইল মোরে বিষ

মাঁস না বিকায় সভে করে নিরামিষ।" (পৃঃ ৬১)

৮০) "খুল্লনার হাথে অগ্নি তুষার তুষার শীতলে।' (পৃঃ ১৮৮)'

৮১) "কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি

\- - - - - - - - - - - -

মৌনে রহিব সাধু গোমুণ্ড সমান।" (পৃঃ ১২৩)

৮২) "পত্রিকার কলাগাছ রূপিবে অঙ্গনে

\- - - - - - - - - - - -

বুড়ারে না করে গুণ মোহন-ঔষধ।" (পৃঃ ১৩৫-৩৬)

৮৩) "স্নান করহ তুমি ঔষধ খুঁজি আমি

হইব বংশধর তোর।" (পৃঃ ৩৯)

৮৪) "হুলাহুলি দিআ কইল নাড়ির ছেদন

\- - - - - - - - - - - -

মনোহর বেশ কন্যা দিবসে দিবসে।" (পৃঃ ১১১)

৮৫) "ফেড়িআ চালের খড় জালিল আতুড়ি

গোমুণ্ড স্থাপিআ দ্বারে পুজে ষষ্ঠি-বুড়ি।" (পৃঃ ১১১)

৮৬) "ঘৃত দিআ সাদ ডোরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দিমুখের বিধান।" (পৃঃ ১২৩)

৮৭) "দুই দলে আলাআলি চুলাচুলি গালাগালি
বরযাত্রী দেউটী না ছাড়ে।" (পৃঃ ১২৪)

৮৮) "শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিল ধনপতি।

- - - - - - - - - - - -

শয্যা তোলা কড়ি মাগে পরিহাসী জন।" (পৃঃ ১২৫)

৮৯) "ব্যেবহার কৈল তাঁরে দিআ নানা ধন।

- - - - - - - - - - - -

বিদায় করিআ সাধু জ্ঞাতি বন্ধুগণে।" (পৃঃ ১২৫)

৯০) "কৌতুকে জৌতুক দেই জত বন্ধুগণ

- - - - - - - - - - - -

জত বন্ধুগণে সাধু করাল্য ভোজন।" (পৃঃ ১২৫)

৯১) "পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন

- - - - - - - - - - - -

ইহা নিআ আর কীছু নাঞি দিবে ফের।" (পৃঃ ৪২)

৯২) "জৌতুক ধনুকখান খর তিন গোটা বাণ
মুর্গাগুণ অঙ্গুলির তান।" (পৃঃ ৪৩)

৯৩) "দনাই পণ্ডিত সঙ্গে করিল বিচার

- - - - - - - - - - - -

ত্বরা করি যান লক্ষপতির ভবন।" (পৃঃ ১১৫)

৯৪) "গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন
কন্যা দরশনি দিআ করিল লগন।" (পৃঃ ৪২)

৯৫) "বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অস্থিতা

- - - - - - - - - - - -

পায় পিতৃ নরকে যন্ত্রণা।" (পৃঃ ১১৫-১৬)

৯৬) "সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে চিরণি কুন্তল জালে
সঘনে নাড়েন আম্র-ডাল।" (পৃঃ ১৭)

৯৭) "পঞ্জর গড়াইতে গেলা করিআ পাশার খেলা

- - - - - - - - - - - -

পিতৃকার্যে দেহ ভায়্যা মন।" (পৃঃ ১৭৭)

৯৮) "জথা বিধি পিণ্ডদান শ্রাদ্ধ হইল সমাধান

- - - - - - - - - - - -

সাধু চলে বান্ধব পূজনে।" (পৃঃ ১৭৯)

৯৯) "দুবলা গণকগণে সম্ভ্রমে ডাকিআ আনে

- - - - - - - - - - - -

লিখে তারা শিশুর জাওয়াতি।" (পৃঃ ২১৭)

১০০) "কি কর কি কর ভায়্যা পাঁজি দেখ্যা আইনু ধায়্যা

\- - - - - - - - - - - -

রবিবার তার প্রয়োজন।" (পৃঃ ১৭৭)

১০১) "নিবেদয়ে দ্বিজ তারে সব বিবরণ

\- - - - - - - - - - - -

সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজি খান।" (পৃঃ ১২১)

১০২) "সঞ্জম কেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ
বরিল সঞ্জম তাঁর পদসরসিজ।" (পৃঃ ৪২)

১০৩) "পড়ে দত্ত শ্রীয়পতি সন্ধিমূল সন্ধিবৃত্তি

\- - - - - - - - - - - -

একে একে পড়িল শ্রীপতি।" (পৃঃ ২২৩)

১০৪) "জীবনে যৌবনে বড়ই প্রীত
আদ্যের অক্ষরে দুই জনে মিত।" (পৃঃ ১৩৫)

১০৫) "লহনার বোলেতে খুল্লনা পড়ে পাতি

\- - - - - - - - - - - -

কে লিখিল পাতি কপটবন্ধ।" (পৃঃ ১৩৭)

১০৬) "আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা প্রতি ঘরে ঘরে
মহিষ ছাগল মেষ দিআ উপাচারে।" (পৃঃ ৬১)

১০৭) "চৈত্রমাসে পূজে হর নানা উপহারে
ঢাকঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।" (পৃঃ ৩২)

১০৮) "ফাগুদোলে আনন্দে গোঙাব নিতে নিত।

\- - - - - - - - - - - -

আনন্দে শুনিবে নাথ শ্রীকৃষ্ণচরিত।" (পৃঃ ২৯৩-২৯৪)

১০৯) "বিধাতা নির্মাণ ঘর নাত্রিক দুয়ার

\- - - - - - - - - - - -

হেঁয়ালি প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে।" (পৃঃ ১২৭-১২৮)

১১০) "আয় বাছা আয় আয় আয়

\- - - - - - - - - - - -

শ্রী কবিকঙ্কণ মুকুন্দ গায়।" (পৃঃ ২১৮)

১১১) "নগর্য়া বালক সঙ্গে সদাই খেলে কড়া ডাঙ্গে

\- - - - - - - - - - - -

জীবন মরণ নাহি গণে।" (পৃঃ ২২২)

১১২) "কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী।

\- - - - - - - - - - - -

হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।" (পৃঃ ২৫)

১১৩) "সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি

\- - - - - - - - - - - -

আগে জার আইসে তার জয়।" (পৃঃ ১১৪)

১১৪) "কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা

স্বামী তারে ধরিল মস্তকে।" (পৃঃ ৫৯)

১১৫) "সতিনি কন্দল করে দুগুণ বলিবে তারে

\- - - - - - - - - - - -

সতিনির কি হইবে হানি।" (পৃঃ ৬০)

১১৬) "দেখিআ দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা

পিতৃকূলে হইলাঙ বিমুখি।" (পৃঃ ৫৯)

১১৭) "সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে

দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।" (পৃঃ ৬০)

১১৮) "মিথ্যা বাক্য হইলে কাটিব তোর নাসা।" (পৃঃ ৬২)

১১৯) "রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।" (পৃঃ ১১৯)

১২০) "স্ত্রী গত যৌবনে পুরুষ নির্ধনে

কী বা আদরের চিন।" (পৃঃ ১২০)

১২১) "পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি

\- - - - - - - - - - - -

পুর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।" (পৃঃ ১২০)

১২২) "তোরে আশির্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি

\- - - - - - - - - - - -

সেইকালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস।" (পৃঃ ১৯৪)

১২৩) "মোর মনে লয় তথা হবে বহুকাল

\- - - - - - - - - - - -

সেইকালে কেবা মোর হব অনুকূল।" (পৃঃ ১৯৪)

১২৪) "নিদয়ার সুখ বড় গৃহকার্যে বধূ দড়

কুলযশ রক্ষণের হেতু।" (পৃঃ ৪৪)

১২৫) "খুড়া হইআ দেই সতা কারে কব দুঃখ কথা

কারে বা করিব অভিমান।" (পৃঃ ১১৯)

১২৬) "হিতাহিত মনে গণ নাঞি লব কন্যা পণ

কেন ঝিয়ে করাবে দুর্গতি।" (পৃঃ ১১৭)

১২৭) "গণক কহিল মোরে দিবে দ্বিতীয় বরে

বিচারিএ বিধবা-লক্ষণ।" (পৃঃ ১১৭)

১২৮) "কেমন দেবতা এই পূজিস ঘটবারি

স্ত্রী লিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহী করি।" (পৃঃ ১৯৮)

১২৯) "মোর ব্রত ভঙ্গ করি হইলী কুলের কালী

মায়্যা পূজা হইলী মোর ঐরি।" (পৃঃ ১৯৯)

১৩০) "মুক্তিপদে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ

- - - - - - - - - - - -

বারাণসী করিল পয়ান।" (পৃঃ ৪৪)

১৩১) "পর্বত কাননে বসি নাঞি পাট-পড়সি

- - - - - - - - - - - -

কন্যাগণে করিবেন বেভার।" (পৃঃ ১১)

১৩২) "পাইল বাপের গ্রাম শুনিঞা সতীর নাম

- - - - - - - - - - - -

শুনিয়া চণ্ডীর আগমণ।" (পৃঃ ১১)

১৩৩) "দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি

- - - - - - - - - - - -

চিরজীবী হৌক স্বামী সুস্থির সুমতি।" (পৃঃ ১১)

১৩৪) "হেন বরে গৌরী দিল কি দেখি সম্পদ

- - - - - - - - - - - -

আস্ত যাউক কন্যার পিতার চক্ষে পড়ুক ছানী।" (পৃঃ ২১)

১৩৫) "জদি বন্দীশালে মোর বারয়্য় পরাণী

মহেশ ঠাকুর বিনু অন্য নাহি জানি।" (পৃঃ ২১৪)

১৩৬) "না করিল কোন কর্ম বিফল দেবতা জর্ম

- - - - - - - - - - - -

যদি হব দেবাসুরে রণ।" (পৃঃ ৩৬)

১৩৭) "গুজুরাট একপাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে

বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি।" (পৃঃ ৮০)

১৩৮) "মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে

- - - - - - - - - - - -

জাবদ না পায় পুরস্কার।" (পৃঃ ৭৯)

১৩৯) "সদা লয় হরিনাম ভুমি পায় ইনাম

বৈষ্ণব বসিল গুজুরাটে।" (পৃঃ ৮০)

১৪০) "বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ বৈসে

- - - - - - - - - - - -

হেমগর্ভ তিল লয় দান।" (পৃঃ ৮১)

১৪১) "ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়

- - - - - - - - - - - -

ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।" (পৃঃ ৬২)

১৪২) "আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী

পাঠান বসিল নানা জাত।" (পৃঃ ৭৮)

১৪৩) "মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা

\- - - - - - - - - - - -

মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।" (পৃঃ ৭৮)

১৪৪) "গুজুরাট নগরে ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ করে

\- - - - - - - - - - - -

হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরান।" (পৃঃ ৭৯)

১৪৫) "জতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ

\- - - - - - - - - - - -

মোর ঘরে করয়ে ভোজন।" (পৃঃ ৭৭)

১৪৬) "তোরে বলি প্রিয়ে বসি থাক গৃহে

\- - - - - - - - - - - -

ধন রহে দিনা দশ।" (পৃঃ ১৮৩)

১৪৭) "অবোধ পরাণ নাথ বলি হে তোমারে

\- - - - - - - - - - - -

ভুবন ভরিআ মোর রহিব কলঙ্ক।" (পৃঃ ১৮৪)

১৪৮) "করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি

\- - - - - - - - - - - -

দরে পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি।" (পৃঃ ৭৮)

১৪৯) "বীরের তোলেন ঘর হইআ সাবধান

\- - - - - - - - - - - -

নানা চিত্র লিখে বিশাই হইআ অনুকূল।" (পৃঃ ৭১)

১৫০) "সপ্ত মহলে তোলে চণ্ডিকার দেউল
নানা চিত্র লিখে বিশাই হইআ অনুকূল।" (পৃঃ ৭১)

১৫১) "অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।" (পৃঃ ৭১)

১৫২) "উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে।" (পৃঃ ৭১)

১৫৩) "চারি চৌরি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো ঢালা

\- - - - - - - - - - - -

দলিজ মসিদ নানা ছান্দে।" (পৃঃ ৭২)

১৫৪) "ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ।" (পৃঃ ৩)

১৫৫) "অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।" (পৃঃ ৩)

১৫৬) "উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা

\- - - - - - - - - - - -

পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।" (পৃঃ ৩)

১৫৭) "ডিহিদার অবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ

\- - - - - - - - - - - -

টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা।" (পৃঃ ৩)

১৫৮) "জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া

\- - - - - - - - - - - -

পরিণামে দেই মহাদুঃখ।" (পৃঃ ৭৭-৭৮)

১৫৯) "সুন সুন রায় করিহে বিদায়

\- - - - - - - - - - - -

না কর দেশের বিচার।" (পৃঃ ৪৬)

১৬০) "শুন ভাই বুলান মণ্ডল

\- - - - - - - - - - - -

জনে জনে সাধিব সম্মান।" (পৃঃ ৭৬-৭৭)

১৬১) "বিষাদ ভাবিআ প্রজা করয়ে ক্রন্দন

\- - - - - - - - - - - -

প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি।" (পৃঃ ৭৬)

১৬২) "আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি

\- - - - - - - - - - - -

চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট।" (পৃঃ ৮৮-৮৯)

১৬৩) "ভেলিঞাতে উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত

যদু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা।" (পৃঃ ৪)

১৬৪) "সাধু নহয ঢঙ্গ বেটা মিছা তোর ভরা

সাধুরূপে প্রবেশিআ ডাকা দিবি পারা।" (পৃঃ ২৫৩)

১৬৫) "সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরির মূল

\- - - - - - - - - - - -

বাড়িবে তোমার ধন অভয়ার বরে।" (পৃঃ ৬৭)

১৬৬) "রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর

\- - - - - - - - - - - -

চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।" (পৃঃ ৬৬-৬৭)

১৬৭) "পান দিআ সদাগর তারে দিল ভার

\- - - - - - - - - - - -

তঙ্কা দুই চারি লৈয় বণিকের বাড়ি।" (পৃঃ ১৫৭)

১৬৮) "কিলিঞা নবাত ফেনি বিশা দরে কিনে চিনি

পান কিনে সহস্রের দরে।" (পৃঃ ১৫৭)

১৬৯) "জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান

তায় ফলে মাষ সরিসা তিল কাবাস ধান।" (পৃঃ ২৫)

১৭০) "দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল

সভে ভাস্যা গেল মোর কাপাস সাত ডোল।" (পৃঃ ৭৭)

১৭১) "বুলন মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই
হাজিল বিলের শস্য তাহে না ডরাই।" (পৃঃ ৭৭)

১৭২) "সসুরা আছিলা রঙ্গ আনিতা চন্দন শঙ্খ

- - - - - - - - - - - -

কি বুঝাব অবলা তোমায়।" (পৃঃ ১৯৪)

১৭৩) "সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহ না জায়
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।" (পৃঃ ২৩৮)

১৭৪) "বদলাশে নানা ধন নায়ে দেই ভরা

- - - - - - - - - - - -

কিনিঞা বহুতর পুরিল মধুকর লবণের পাতিয়া গোলা।" (পৃঃ ১৯৫-১৯৬)

১৭৫) "শত শত এক জায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি খুনি ধুতি বোনে গড়া।" (পৃঃ ৮২)

১৭৬) "মোজা পানঞি জিন নিরময়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে।" (পৃঃ ৮৩)

১৭৭) "স্বকীয় চন্দন শঙ্খ দিআ হব নিরাতঙ্ক

- - - - - - - - - - - -

সুখে থাক নিজ জায়া সাথে।" (পৃঃ ১৯৩)

১৭৮) "বর্ধমান হৈতে বান্যা আইল ধূসদর্ত

- - - - - - - - - - - -

সাতশয় বান্যা আইল ধনপতির ধাম।" (পৃঃ ১৭৮)

১৭৯) "কতেক ঘরে আনি লেখা নাঞি জানি
ডেরি অন্ন নাহি থাকে।" (পৃঃ ২৭)

১৮০) "কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সএ ভার।" (পৃঃ ৫৩)

১৮১) "ভূতলে পড়িআ বারি গড়াগড়ি জায়
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়।" (পৃঃ ১৯৮)

১৮২) "শিবপূজা করে জেবা দেবী পরায়ণ
আপনী সহায় তারে লক্ষ্মীনারায়ণ।" (পৃঃ ৩০৯)

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে তৃতীয় অন্যতম ধারা ধর্মমঙ্গল কাব্যধারা। ধর্মমঙ্গল মূলত রাঢ় বঙ্গের কাব্য। ধর্মপূজা, ধর্মঠাকুরের প্রভাব, ধর্মমঙ্গল কাব্য ও তার প্রচার সকলই রাঢ়বঙ্গের বিষয়। রাঢ়বঙ্গের কবিগণই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন এবং কাব্য প্রচারিত ছিল রাঢ়বঙ্গের মধ্যেই। ধর্মমঙ্গলের যে সমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে সবগুলি পাওয়া গেছে রাঢ়বঙ্গেই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রচার ও বিস্তার সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি ছিল না।ধর্মমঙ্গল মূলত রাঢ়বঙ্গের জীবন কথা। রাঢ়বঙ্গের মানুষ, তার চরিত্র ধর্ম নিয়ে, যাবতীয় বিশেষত্ব নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটা লক্ষ করেই কেউ কেউ ধর্মমঙ্গলকে 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' বলতে চান। ধর্মপূজা চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত থাকলেও সম্ভবত ধর্মমঙ্গল কাব্য চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়নি। আবিষ্কৃত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি মূলত চৈতন্য-পরবর্তীকালেই রচিত বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। সুতরাং ধর্মমঙ্গলে চৈতন্য-পরবর্তীকালের সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছে। বস্তুত মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত সমাজের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সমাজ এক নয়, তা এখানে সহজে লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ধর্মমঙ্গলে অনেক বিবর্তিত-পরিবর্তিত সমাজ আত্মপ্রকাশ করেছে তা বলাই বাহুল্য।

ধর্মঠাকুরের সুনির্দিষ্ট রূপ ও ধর্মপূজা সম্ভবত চৈতন্য-পূর্ব কালে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত কাব্য রচনাও চৈতন্য-পূর্ব কালেই সূত্রপাত হয়েছিল, তবে ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত যে সকল কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে তার কোনটিই সম্ভবত চৈতন্য-পূর্ব কালের রচিত নয়, তাই চৈতন্য-পরবর্তীকালের কাব্য হিসাবেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের আলোচনা হয়ে থাকে। কাব্য হিসাবে ধর্মমঙ্গলের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপ্তি খুব বেশী নয়, তবে পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে ধর্মমঙ্গলই প্রধান; যদিও পুরুষ দেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচনার প্রবণতা খুব বেশী দেখা যায় না, এবিষয়ে ধর্মমঙ্গল ব্যতীত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলই অন্যতম। ধর্মমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা কম হবার কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে-প্রথমত ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা হলেও ধর্মঠাকুরের পূজা এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি, উত্তরে ময়ূরাক্ষী ও দক্ষিণে দামোদর নদের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড রাঢ় অঞ্চল নামে চিহ্নিত । বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া. পুরুলিয়া, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদের একাংশ, চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুরের একাংশ, বিহারের একাংশ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। অঞ্চলভিত্তিক হওয়ার জন্য ধর্মমঙ্গল কাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

দ্বিতীয়ত ঃ কাব্যোৎকর্ষের দিক দিয়ে ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা নিকৃষ্ট। মনসামঙ্গলের বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপিলাই কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিজ মাধব ও কবিকঙ্কণের মত প্রথম শ্রেণীর কবির আর্বিভাব ধর্মমঙ্গলে হয়নি।

তৃতীয়ত ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতা মূলত স্ত্রী দেবতা, ধর্মঠাকুর পুরুষ দেবতা। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যে ধীরে ধীরে নারী শক্তির উত্থান ঘটেছে, তাই মনসা ও চণ্ডী সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল ধর্মঠাকুর তা পারেনি।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ঃ রাঢ়বঙ্গের আদিম অধিবাসী, যারা আদি অস্ত্রাল বা প্রোটো অষ্ট্রালয়েড জাতির শাখাভুক্ত, ধর্মঠাকুর তাদের আরাধ্য দেবতা।[১] ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'ধর্ম' শব্দটি প্রাচীন অষ্ট্রিক 'কুর্ম' বাচক শব্দের সংস্কৃত রূপ।[২] 'কূর্ম' বাচক অষ্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' থেকে 'ধর্ম' শব্দটি সৃষ্টি।[৩] ডোম জাতি অষ্ট্রিক জাতির একটি শাখা। ধর্মঠাকুরের নামের সঙ্গে 'রায়' কথাটি যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে, ধর্মঠাকুরের নাম তাই 'কালুরায়',

'বুড়া রায়', 'বাঁকুড়া রায়' ইত্যাদি। সম্ভবত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ ডোম জাতির দেবতাকে বলত 'ডোম রায়'। 'ডোম রায়' শব্দ থেকেও 'ধর্ম' শব্দটির সৃষ্টি বলে মনে করা হয়, যেমন ডোম রায় > ডোমরা > ডোরমা > ধর্ম।[৪] কালক্রমে ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং ইসলামিক প্রভাবে মিশ্র দেবতায় পরিণত হয়। সূর্য, বরুণ, শিব, বিষ্ণু, যম ইত্যাদি নানা রূপে পূজারীগণ ধর্মঠাকুরের ধ্যান করে থাকে। তা সত্বেও ধর্মঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-ই সর্ব প্রথম ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ধর্মদেবের স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর মতে ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। তিনি আরো জানিয়েছেন ধর্ম শব্দের অর্থ বুদ্ধ।[৫] ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনও এই মতের সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীকালেও ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, আরো বিভিন্ন পণ্ডিতগণ গবেষণা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন- ধর্মঠাকুর প্রকৃতপক্ষে সূর্যদেবতার লৌকিক রূপ। ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

প্রথমত ঃ ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় লৌকিক সূর্যদেবের প্রভাব আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ করে বলা যায়, ধর্মপূজার সঙ্গে সূর্যপূজার ভাবনাগত মিল আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কখনো বৌদ্ধ প্রভাব এবং কখনো পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে ধর্মদেব কখনো বুদ্ধ, কখনো শিব, কখনো বিষ্ণুর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য এই একীকরণ সম্পূর্ণ বহিরাঙ্গিক বিষয় হয়েই থেকেছে।

তৃতীয়ত ঃ ধর্মঠাকুর সম্ভবত ডোম সম্প্রদায়ের রণদেবতা, অন্তত ধর্মমঙ্গল কাব্য পাঠে এই ধারণা জন্মায়। এর সঙ্গে অবশ্য আদিম প্রস্তর পূজা, প্রতীক পূজা, প্রজনন শক্তির উপাসনা এবং নানা গ্রামীণ সংস্কার ও গ্রাম দেবতার ভাবনা মিলে ধর্মদেবের অবয়ব তৈরী। ধর্মঠাকুর যে পৌরাণিক দেবতা নয়, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ধর্মঠাকুর ডোম সমাজের দেবতা, ডোম পুরোহিতের দ্বারাই পূজিত। তার পূজা পদ্ধতিও লৌকিক অর্থাৎ পৌরাণিক বিধিসম্মত নয়। মনসা, চণ্ডীর মত লৌকিক দেবতা হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মদেব সমাজের উচ্চ কোটিতে স্থান পায়নি। ধর্মঠাকুর মিশ্র দেবতারূপেই স্থান পেয়েছে, পৌরাণিকীকরণের প্রচেষ্টা হলেও তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।

ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি নেই। ধর্মদেবের প্রতীক রূপে একখণ্ড শিলা পূজিত হয়। অবশ্য প্রতীক পূজা হিন্দুসমাজে নতুন নয়, শালগ্রাম শিলা কিংবা শিবলিঙ্গ প্রতীকের দৃষ্টান্ত। শালগ্রাম শিলা বা শিবলিঙ্গের মত ধর্ম শিলার কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। গোলাকার, ডিম্বাকার, চৌকাকার, কোথাও বা কূর্মাকৃতি, কোথাও বা কাঁকড়া বিছের মত আকৃতি বিশিষ্ট শিলাখণ্ড পূজা করা হয়। পাথরের গায়ে পিতলের পেরেক বা কাচের টুকরো লাগিয়ে চোখ তৈরী করা হয়। সাধারণত পণ্ডিত উপাধিধারী ডোম পুরোহিতরা ধর্মঠাকুরের পূজক হলেও ব্রাহ্মণ পুরোহিত কদাচিৎ লক্ষ করা যায়। প্রজনন শক্তি বা উর্বরতা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বলেই অনাবৃষ্টির সময়ে বর্ষণ কামনায়, দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান কামনায়, মৃতবৎসা রমণী সন্তানের আরোগ্য কামনায় ধর্ম ঠাকুরের কাছে মানৎ করে, পূজা দেয়। হাঁস, মুরগী, শূকর, ছাগল বলি দেওয়া ধর্ম পূজার অঙ্গ। রাঢ়বঙ্গের অন্ত্যজ ডোম জাতির জীবনাচারের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজা সম্পর্কিত আচার-আচরণের নিবিড় যোগ রয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন কোন গ্রন্থে শুধু মাত্র হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। যেমন, যদুনাথের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ।আবার কোন কোন গ্রন্থে হরিশ্চন্দ্র পালার সঙ্গে লাউসেনের পালা স্থান লাভ করেছে। কালক্রমে হরিশ্চন্দ্র পালার কাহিনী নিতান্তই গৌণ হয়ে পড়েছে এবং লাউসেনের কাহিনীই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী খানিকটা সংক্ষিপ্ত ও পুরাণ কেন্দ্রিক এবং এটিই ধর্মমঙ্গলের মূল আখ্যানভাগ বলে অনুমিত হয়। কাহিনীটি নিম্নরূপঃ

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তার স্ত্রী মদনা নিঃসন্তান ছিল; একারণে লোকসমাজে তারা নিন্দনীয় ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং রানী মদনা মনের দুঃখে রাজধানী পরিত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে বল্লুকা নদীর তীরে উপস্থিত হয়। তারা সেখানে দেখে ধর্মঠাকুরের ভক্তেরা ঘটা করে ধর্মপূজা করছে। রাজা ও রানী তাদের কাছে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকথা শুনে ধর্মপূজা করে পুত্র বর লাভ করে এবং এতে শর্ত হয় যে, পুত্র লাভ করলে রাজারানী পুত্রকে ধর্মদেবের কাছে বলি দেবে। রাজারানী এই শর্তে রাজী হয় এবং রানী মদনা যথাসময়ে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে। পুত্রের নাম রাখা হয় লুইধর বা লুইচন্দ্র। এদিকে পুত্রের মুখ দেখে রাজারানী তাদের শর্তের কথা ভুলে গেল। বালক লুইচন্দ্র একদিন বাটুলের আঘাতে ধর্মঠাকুরের বাহন উলুককে আহত করে, উলুক শ্রীধর্মদেবের কাছে তার দুরবস্থার কথা নিবেদন করে। পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজারানীর কাছে উপস্থিত হয়ে লুইচন্দ্রের মাংস দিয়ে একাদশীর পারণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাজারানী দুঃখ পেলেও শেষ পর্যন্ত লুইচন্দ্রকে কেটে মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণকে খেতে দেয়। ধর্মঠাকুর হরিশচন্দ্র ও মদনার সততা ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে লুইচন্দ্রকে পুনরায় জীবিত করে দেয়। এভাবে রাজারানীর প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হয়। প্রথম কাহিনী এখানেই শেষ। পণ্ডিতগণ মনে করেন লাউসেনের কাহিনী রাঢ়বঙ্গের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এই কাহিনীর নায়ক লাউসেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত পূজা প্রচারের প্রয়োজনে দেবসভার নর্তকী জাম্বুবতীকে শাপগ্রস্ত করে মর্ত্যলোকে নিয়ে আসা হয়। রমতি নগরের বেনু রায়ের স্ত্রীর গর্ভে জাম্বুবতী জন্মগ্রহণ করে রঞ্জাবতী নামে। রঞ্জাবতী মহামদের ভগিনী এবং গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা। গৌড়েশ্বরের সামন্ত রাজা কর্ণসেন ছিল ঢেকুরগড়ের অধিপতি। রাজকর প্রদানকে কেন্দ্র করে ইছাই ঘোষ ঢেকুরগড় আক্রমণ করে এবং কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে হত্যা করে ঢেকুরগড় জয় করে নেয়। পুত্রের মৃত্যুতে কর্ণসেনের স্ত্রী আত্মহত্যা করে এবং পুত্রবধূরা সহমরণে গমন করে। বৃদ্ধ কর্ণসেনের দুরবস্হার কথা ভেবে গৌড়েশ্বর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দেয় এবং ময়নাগড়ের অধিপতি করে পাঠায়। রঞ্জাবতীর দাদা মহামদ গৌড়েশ্বরের পাত্র। সে এই বিবাহে সম্মত ছিল না। তার অজান্তে বিবাহ হওয়ায় মহামদ ভগ্নী ও ভগ্নীপতির প্রতি রুষ্ট হয়ে শত্রুতা করে, এবং 'আঁটকুড়া' (অপুত্রক) বলে গালিগালাজ করতে থাকে। রঞ্জাবতী অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে পুত্র কামনায় কঠোর কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে দিয়ে ধর্মঠাকুরের ব্রত পালন করে এবং ধর্মদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্র বর দেয়। যথাসময়ে রঞ্জাবতী এক পুত্রসন্তান প্রসব করে, তার নাম লাউসেন।এদিকে মহামদ নানা ভাবে বালক লাউসেনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে, কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন সুরক্ষিত থাকে এবং রঞ্জাবতী আরো একটি পুত্র লাভ করে , তার নাম হয় কর্পূর। লাউসেন বড় হয়ে নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। এরপর লাউসেন ও কর্পূর গৌড়েশ্বরের রাজসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে কামদল বাঘকে হত্যা করে, জালন্দার গড়ে কুম্ভীর বধ করে এবং সুরিক্ষা নটীর অহঙ্কার খর্ব করে গৌড়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু সেখানে মাতুল মহামদের ষড়যন্ত্রে লাউসেনকে কারারুদ্ধ করা হয়। লাউসেন বীরত্ব প্রদর্শন করে কারামুক্ত হয় এবং গৌড়েশ্বরের পুরস্কার লাভ করে দেশে ফিরে আসে। পথে কালু ডোমের সঙ্গে মিত্রতা হয় এবং কালু লাউসেনের প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করে। এদিকে মহামদ লাউসেনকে হত্যা করার নতুন নতুন ছক কষতে থাকে। প্রথমে কামরূপরাজের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠানো হয়। লাউসেন কামরূপরাজকে পরাস্ত করে তার কন্যা কলিঙ্গাকে লাভ করে; এরপর শিমূলরাজ হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার কন্যা কানড়াকে লাভ করে। মহামদ মহাশক্তিশালী ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠায় সেখানে ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হয়। মহামদ শেষ পর্যন্ত গৌড়েশ্বরকে দিয়ে আদেশ দেয় যে লাউসেন সূর্যের পশ্চিমোদয় ঘটাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। লাউসেন হাকন্দে ধর্মদেবের কঠোর সাধনায় মগ্ন হয়। এদিকে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করে। কালু ডোম, লখ্যা ডোমনী, শাখা-সুখা ও কলিঙ্গা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। আর লাউসেনের সাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্মদেব সূর্যের পশ্চিম উদয়ের অনুমতি দেয়। ধর্মঠাকুরের

কৃপায় সকলেই পুনর্জীবন লাভ করে আর মহামদের কুষ্ঠরোগ হয়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মহামদ লাউসেনের কৃপায় আরোগ্য লাভ করে। এইভাবে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হল। লাউসেন পুত্র চিত্রসেনের হাতে ময়নাগড়ের দায়িত্ব অর্পণ করে স্বর্গারোহণ করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা ধর্মমঙ্গল কাব্যে কতকগুলি বিষয়ে বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়—

প্রথমতঃ নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বিশিষ্টতা, ধর্মমঙ্গলে কলিঙ্গা, কানড়া, লখাই ডোমনীর বীরত্ব কথা স্মরণীয়।

দ্বিতীয়তঃ ডোম সৈন্যদের বীরগাথা ধর্মমঙ্গল কাব্যের মূল বিষয়।

তৃতীয়তঃ পাল রাজাদের ইতিহাস বিশ্রুত কোন গৌরবময় কাহিনী ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে লুকিয়ে আছে।

চতুর্থতঃ করুণ রস নয়, বীর রসই ধর্মমঙ্গলের অঙ্গীরস, এদিক থেকে কাব্যে মহাকাব্যের স্বাদ আছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ও কবিগণ ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা কে, তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা সংশয় রয়েছে। রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্মপূজা বিধান এবং শূন্যপুরাণে মার্কণ্ডেয় মুনি ও হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম পূজার কথা আছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের সম্পূর্ণ কাব্যের আদি কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের কথা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্তত চব্বিশ জন কবির কথা পাওয়া যায়, এদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলীই অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য কবিগণের মধ্যে শ্যাম পণ্ডিত, খেলারাম চক্রবর্তী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক প্রমুখ কবিগণ প্রখ্যাত। অনেকে অবশ্য শ্যাম পণ্ডিতকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলে মনে করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবির মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে ময়ূরভট্টকে। ধর্মমঙ্গলে পরবর্তীকালের কবিদের অনেকেই ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবির মর্যাদা দিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।যেমন-

১। ময়ূরভট্টের পদ মনে অনুমান হৃদ
দ্বিজ রূপরাম রসগান॥(রূপরাম/১০)

২। 'ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।" (ঘনরাম/১০)

কিংবা— "ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়। (ঐ/৭৯)

ধর্মদেব মানিকরাম গাঙ্গুলীকে ময়ূরভট্টের কথা শুনিয়েছে—

"আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।
ময়ূরভট্টের কথা মন দিএ শুন ॥
বৈকুণ্ঠে রেখেচি তারে বিষ্ণুভক্তি দিএ।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিএ॥ (মানিকরাম/২৩)

ময়ূরভট্ট 'হাকন্দপুরাণ' নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ,দুর্ভাগ্যবশত ময়ূরভট্টের হাকন্দ পুরাণের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' গ্রন্থটির প্রামাণিকতা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে পণ্ডিতের মত। ডঃ সুকুমার সেন সংস্কৃত সূর্যশতক প্রণেতা ময়ূরভট্ট ও ধর্মমঙ্গল রচয়িতা ময়ূরভট্টকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন।[৬] বাস্তবে ময়ূরভট্টের নামটি ছাড়া আলোচনার তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রকৃত পরিচয় উদ্ধারের উপায় নাই, তবে তাঁর কাব্য কীর্তি লুপ্ত তাও নয়, কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিরা তাঁর নাম স্মরণ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ময়ূরভট্টের কাব্যের পুথি দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করলেও গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' গ্রন্থটিকে ডঃ সুকুমার সেন অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা বলে মনে করেন।[৭] তিনি আরো জানিয়েছেন ময়ূরভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্টের সমসাময়িক।[৮] কথিত আছে ময়ূরভট্ট কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং সূর্যবন্দনা করে সূর্যশতক

কাব্য রচনা করলে কুষ্ঠরোগ মুক্ত হন। কারো কারো মতে ময়ূরভট্ট চৈতন্য-পূর্ব যুগসন্ধি কালের কবি।[৯] ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলে অনুমান করেছেন এবং ১১৭৯/১১৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের মানুষ বলে মনে করেছেন।[১০] কেউ কেউ খেলারাম চক্রবর্তীকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলে মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন এই মত সমর্থন করেন না।[১১] তবে তাঁদের কাব্যেরও কোন পুথি পাওয়া যায়নি, সবটাই রাঢবঙ্গে প্রচারিত কিংবদন্তীর মত।

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ ডঃ সুকুমার সেনের মতে রূপরাম চক্রবর্তীই ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রথম কবি। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যই সন -তারিখ যুক্ত প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং তিনিই প্রথম কবি, যাঁর কাব্যের অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়েছে। অনেকে আদি রূপরাম বলে আরেক জন রূপরামের কথা বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রনিধাণযোগ্য—"যতদূর জানা যায় তাহাতে তাঁহার আগে লেখা আর কোন ধর্মমঙ্গল পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গল রচয়িতা-অনেকেই তাঁহাকে 'আদি রূপরাম' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"[১২] রূপরাম চক্রবর্তীই সম্ভবত ধর্মমঙ্গলের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে পরিপূর্ণ কাব্যে পরিণত করেন। রূপরাম চক্রবর্তী কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আত্মপরিচয় পাঠে জানা যায় কবির নিবাস বর্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর-

"অনেক দিবস বাড়ী কাইতি শ্রীরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর।" (রূপরাম/৭)

কবির পিতা পরম পণ্ডিত ছিলেন। কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতা দময়ন্তী। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বর এবং কনিষ্ঠ রামেশ্বর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক কবি গৃহ থেকে বিতাড়িত হন এবং বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর কবির বিদ্যালাভ ও ধর্মঠাকুরের কৃপা লাভের কাহিনী। কবি শেষ পর্যন্ত গোয়ালা ভূমের রাজা গণেশ রায়ের আনুকূল্য লাভ করেন এবং কাব্য রচনা করেন। রূপরামের কাব্য রচনার কাল নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে কাব্যে উল্লিখিত কালজ্ঞাপক শ্লোকের সাহায্যে—

"শাকে সিমে জড় হৈলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়॥
রসের উপর রস তায় রস দেহ।
এই শাকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা লেহ।(ঐ/৩৬৮)

পয়ারটির আবার পাঠান্তর আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য কবি প্রদত্ত কাল নির্ণায়ক শ্লোক অনুসারে স্থির করেছেন রূপরামের কাব্য রচনাকাল ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ।[১৩] আবার ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ১৫৭১ শকাব্দ বা (১৫৭১+৭৮) ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।[১৪] রূপরামের কাব্যে শাজাহান পুত্র শাহাজাদা সুজার উল্লেখ আছে—

"রাজমহলের অঙ্কে যবে ছিল শুজা।
পরম কল্যাণে তার বৈসে যত প্রজা॥" (ঐ/৯)

সুতরাং ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দকেই যুক্তিসঙ্গত কাল বলে ধরা হয়ে থাকে।

রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য পালাভিত্তিক রচনা। সমগ্র কাব্যটি সর্বমোট ২৫টি পালায় রচিত।যথা-

(১) বন্দনা পালা (২) স্থাপনা পালা (৩) আদ্যঢেকুর পালা (৪) রঞ্জারবিভা পালা (৫) হরিশ্চন্দ্র পালা (৬) শালেভর পালা (৭) লাউসেন জন্ম পালা (৮) লাউসেন চুরি পালা (৯) আখড়া পালা (১০) ফলানির্মাণ পালা (১১) মল্লবধ পালা (১২) বাঘজন্ম পালা (১৩) বাঘবধ পালা (১৪) জামতি পালা (১৫) গোলাহাট পালা (১৬) হস্তীবধ পালা (১৭) কাঙুরযাত্রা পালা (১৮) কলিঙ্গাবিভা পালা (১৯) লৌহগণ্ডার পালা (২০) কানড়াবিভা পালা (২১) অনুমৃতা পালা (২২) ইছাই বধ পালা (২৩) অঘোর বাদল পালা (২৪) জাগরণ পালা (২৫) স্বর্গারোহণ পালা।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে ঘনরামের কাব্যই সর্ব প্রথম মুদ্রণ-সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ঘনরাম কাব্যে অন্যান্য ধর্মমঙ্গলের কবিগণের মত আত্মপরিচয় বর্ণনা করেননি। বন্দনা অংশের পর কবি সরাসরি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। কবির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় কবি প্রদত্ত ভণিতা অংশগুলি থেকে। কবি বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—

"কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।" (ঘনরাম/৬৮৬)

বিভিন্ন ভণিতায় কবি তাঁর বংশ পরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা য়ায় কবির পিতামহ ধনঞ্জয়, পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা দেবী—

"মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥" (ঐ/৭০)

সম্ভবত ঘনরাম বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্যে বিভিন্ন ভণিতায় রাজার মঙ্গল কামনা করেছেন। কাব্যে ঘনরাম বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ করলেও কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা অবশ্য জানা যায় না। কীর্তিচন্দ্রের আদেশেই যে কবি কাব্য রচনা করেছেন একথাও জানা যায় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—সম্ভবত ঘনরাম কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের প্রজা ছিলেন এবং হয়ত ব্যক্তিগত কোন কারণে ঘনরাম কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা উপকৃত ছিলেন বলেই কীর্তিচন্দ্রের নাম কাব্যের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।[১৫] ঘনরাম কাব্যে আরেক জনের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন কবির গুরুদেব। সম্ভবত তাঁর নাম শ্রীরাম দাস। বিভিন্ন ভণিতায় কবি গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন—

১। "গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
নূতন মঙ্গল রস গান।" (ঐ/১৩৭)

২। "রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্বে রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।" (ঐ/১৩২)

এই রামচন্দ্র সম্ভবত কবির গুরুদেব। ঘনরাম এই গুরুর আদেশেই কাব্যরচনা করেন এবং গুরুই কবিকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন। ঘনরাম শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কাব্যের সর্বত্রই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে শ্রদ্ধাবনত, তাছাড়াও তাঁর কাব্যে রামায়ণের সুপ্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঘনরামের কাব্যের নাম 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'; বিভিন্ন ভণিতায় কবি ঐ নাম ব্যবহার করেছেন—

"চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥" (ঐ/৩৫০)

অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি 'অনাদিমঙ্গল' বা 'অনাদ্যমঙ্গল' এই নাম ব্যবহার করেছেন—

"গায় দ্বিজ ঘনরাম অনাদিমঙ্গল।
পুর নায়কের বাঞ্ছা ভকতবৎসল॥" (ঐ/১৪০)

ঘনরাম আরবী, ফারসী ভাষায় পাঠগ্রহণ করেছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্য বৈদগ্ধের ছাপ সুস্পষ্ট। ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন, ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য কবি তিনি। কাব্যের শেষে কবি উল্লেখ করেছেন কাব্য আরম্ভন কাল স্মরণ নাই, তবে কাব্য সমাপ্তির কাল সম্পর্কে 'কবিশশাঙ্ক' দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় কবি ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। ধর্মমঙ্গল ব্যতীত

তিনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন।

ঘনরামের কাব্য পালাভিত্তিক রচনা এবং সমগ্র কাব্যটি মোট চব্বিশটি পালায় বিভক্ত। পালাগুলি হল যথাক্রমে—

(১) স্থাপনা পালা (২) হরিশ্চন্দ্র পালা (৩) ঢেকুর পালা (৪) রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা (৫) শালেভর পালা (৬) লাউসেনের জন্ম পালা (৭) আখড়া পালা (৮) ফলানির্ম্মাণ পালা (৯) গৌড়যাত্রা পালা (১০) কামদল বধ পালা (১১) জামতি পালা (১২) গোলাহাট পালা (১৩) হস্তীবধ পালা (১৪) কাঙুরযাত্রা পালা (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালা। (১৬) কানড়ার স্বয়ম্বর পালা (১৭) কানড়ার বিবাহ পালা (১৮) মায়ামুণ্ড পালা (১৯) ইছাই বধ পালা (২০) অঘোরবাদল পালা (২১) পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা (২২) জাগরণ পালা (২৩) পশ্চিম উদয় পালা (২৪) স্বর্গারোহণ পালা।

রূপরামের কাব্য অপেক্ষা ঘনরামের কাব্যে কাহিনীগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। রূপরামের কাব্য ২৫টি পালায় বিভক্ত, ঘনরামের কাব্য ২৪টি পালায় বিভক্ত। রূপরাম বন্দনা অংশকে পৃথক পালা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং স্থাপনা পালা থেকে কাব্য কাহিনীর অগ্রগতি। ঘনরাম 'স্থাপনা পালা'কে দুভাগে ভাগ করেছেন, প্রথমত, বন্দনা অংশ এবং দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিপত্তন কাহিনী ও শাপভ্রষ্ট অপ্সরার ধর্মপূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে আগমন কাহিনী। 'স্থাপনা পালা' ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর ভূমিকা অংশ। রূপরামের কাব্যে হরিশ্চন্দ্র পালাটি রঞ্জাবতীর বিবাহ পালার পরে, আর ঘনরামের কাব্যে আগে। তাছাড়া পালাভিত্তিক নামকরণের ক্ষেত্রে রূপরাম ও ঘনরামের কাব্যে পার্থক্য দেখা যায়।

মানিকরাম গাঙ্গুলী ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন বিশিষ্ট কবি হলেন মানিকরাম গাঙ্গুলী। অন্যান্য কবিদের মতই মানিকরাম কাব্যে বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠে জানা যায়—কবিরা 'বাঙ্গাল' গাঙ্গুলী গাঁই এর অন্তর্গত। কবির পিতামহ অনন্তরাম, পিতা গদাধর, মাতা কাত্যায়নী। মানিকরাম সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কুলীন পরিবারের সন্তান ছিলেন। কবির ভাইরা সকলেই কোন না কোন কারণে বিখ্যাত হয়ে ছিলেন। কবি বর্তমান হুগলী জেলার বেলডিহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—

"বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই বেলডিহায় ঘর।
পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর।" (মানিকরাম/২৮)

কবিরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছিলেন। আত্মপরিচয় অংশ বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়া কবি কাব্যে চৈতন্য বন্দনাও করেছেন। মানিকরামের কাব্য রচনাকাল নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন পণ্ডিতগণ। কবি প্রদত্ত পয়ার অনুসারে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন স্থির করেছেন মানিকরামের কাব্য রচনা সমাপ্ত হয় ১৪৬৯ শকাব্দ বা ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে।[১৬] অধিকাংশ পণ্ডিত অবশ্য এই মত মেনে নেননি। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মানিকরামের কাব্য রচনার সমাপ্তির কাল নির্ণয় করেছেন ১৭০৩ শকাব্দ বা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।[১৭] ডঃ সুকুমার সেন এই মতকে সমর্থন করেছেন।[১৮] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে মানিকরামের কাব্য রচনা সমাপ্ত হয় ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রদত্ত মতের সঙ্গে তিনি একমত।[১৯]

মানিকরামের কাব্য পালাভিত্তিক রচনা, সমগ্র কাব্য ১২ টি পালায় বিভক্ত, তবে প্রতিটি পালার পৃথক নামকরণ করা হয়নি। কাব্যের নাম 'বারমতি' (বার্মাতি), অর্থাৎ কাব্য বারো দিনে গীত হত। মধ্যযুগের কাব্যে একমাত্র মানিকরামের কাব্যেই দু'বার দেব বন্দনা লক্ষ করা যায়। প্রথমে দেব বন্দনা করে কবি কাব্য রচনা শুরু করেছেন এবং পরে প্রথম পালার শুরুতে আবার দেব বন্দনা করেছেন তারপর আত্মপরিচয় দিয়ে কাব্য প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছেন। কাব্য কাহিনীতে রূপরাম বা ঘনরামের কাব্যের চেয়ে নতুনত্ব কিছু নেই। মানিকরামের কাব্য

স্থূলায়তন, ঘনরামের মতই মানিকরামের কাব্যেও পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা প্রচুর।

ধর্ম সংস্কৃতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল 'শূন্যপুরাণ'। শূন্যপুরাণ মঙ্গলকাব্য নয়। মঙ্গলকাব্যের কোন বৈশিষ্ট্যই শূন্যপুরাণ নামক গ্রন্থখানিতে নেই। ধর্ম সংস্কৃতির দু'টি রূপ, প্রথমত, ধর্মপূজা পদ্ধতি বা ধর্মপুরাণ এবং দ্বিতীয়ত, ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মপূজা পদ্ধতি বা ধর্মপুরাণই শূন্যপুরাণ নামে পরিচিত। এই নামকরণ অবশ্য গ্রন্থ-সম্পাদক কৃত (নগেন্দ্রনাথ বসু)। শূন্যপুরাণ আসলে কোন পুরাণ নয়, এটি ধর্মপূজা পদ্ধতি মাত্র। গ্রন্থের সম্পাদক বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের পরিচয় পেয়েই গ্রন্থটির নামকরণ করেন শূন্যপুরাণ। শূন্যপুরাণের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত।গ্রন্হ-সম্পাদকের মতে -- "ইনি ধর্মপূজার আদি পুরুষ।"[২০] অনেকেই মনে করেন রামাই পণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে পারেন এবং তাঁরা রামাই পণ্ডিতকে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ের মানুষ বলে মনে করেন।[২১] ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শূন্যপুরাণের রচনাকাল ধরলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর সংযোজন হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেনের মত পণ্ডিত অবশ্য একজন রামাই পণ্ডিতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেছেন— "ধর্মপূজার ছড়া ও নিবন্ধগুলি ধর্মপূজার প্রবর্তক কোন একটিমাত্র 'শ্রীরামাই' পণ্ডিতের লেখা হইতে পারে না।"[২২] এবং তিনি গ্রন্থখানিকে তত প্রাচীন বলেও মনে করেন না। শূন্যপুরাণ গ্রন্থটিতে প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ অংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা। এই অংশটি থেকেই সম্ভবত ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর সম্পর্ক। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী কিভাবে ধর্মমঙ্গলে প্রবেশ করল তা বলা যায় না। অবশ্য লাউসেনের কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর সম্পর্ক খুব ক্ষীণ।

মনসা বা চণ্ডীমঙ্গলের ব্রতকথার কাহিনীতে দেবী ও কাব্য কাহিনীর একটি বিশিষ্ট রূপ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের সে রকম কোন ব্রতকথা জাতীয় কাহিনী প্রচলিত ছিল না, যা থেকে মূল কাব্যের জন্ম হয়েছে। সম্ভবত হরিশচন্দ্রের কাহিনীই প্রাচীন ধর্ম কাহিনীর রূপ। চণ্ডী বা মনসামঙ্গলের যেমন, ব্রতকথার কাহিনীর উপর মঙ্গলকাব্যের ভিত গড়ে উঠেছে, ধর্মমঙ্গল তেমনি হরিশচন্দ্রের কাহিনীর উপর গড়ে না উঠলেও ধীরে ধীরে লাউসেনের কাহিনীর সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। ব্রত কথার দেবদেবীর মতই ধর্মঠাকুরও হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার দেবতা, অসাধ্য সাধনের দেবতা, রোগ-ব্যাধি মুক্তির দেবতা, দুষ্ট দমনের দেবতা, উর্বরতা সম্পর্কিত বিষয়ের দেবতা।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা মূলত নারী। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি প্রধান মঙ্গলকাব্যে এবং অন্যান্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারী দেবতার কথাই প্রধান। শিবায়ন বা শিবমঙ্গলকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলা যায় না, আর ধর্মমঙ্গল কাব্য মঙ্গল সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও এর দেবতাটি কিন্তু নারী নয়, পুরুষ দেবতা। সম্ভবত ধর্মদেব নারী দেবতা হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ধর্মদেব কখনো সূর্য, কখনো বিষ্ণু, কখনো রামচন্দ্র, কখনো বা বুদ্ধদেবের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ায় পুরুষ দেবতায় পরিণত হয়েছে। মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মঠাকুরের মৌলিক রূপ নেই। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি হওয়ায় মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মদেবের পরিচয় বা উপস্থিতি কোনটাই কাব্যে নেই। তাছাড়া পূজা প্রচারে মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মদেবের কোন কঠোর প্রয়াস নেই। এখানে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর অনুরূপ। যাই হোক, ধর্মঠাকুর যে সমাজে পূর্ব থেকেই খানিকটা প্রতিষ্ঠিত তা বোঝা যাচ্ছে হরিশ্চন্দ্র কাহিনীতে। সুতরাং পূজা প্রচার করতে গিয়ে তাকে তেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। সে স্বর্গ থেকেই কলকাঠি নেড়েছে, পৃথিবীতে খুব বেশী বার নেমে আসতে হয়নি, অনুচরদের দিয়েই কার্যসিদ্ধি করেছে। তাকে বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবিলাও করতে হয়নি, তবে কোথাও কোথাও দেবী পার্বতীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ দেবতা হবার সুবিধাটুকু অবশ্য সে ভোগ করেছে। তাছাড়া একটা

সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তার পূজা প্রচারিত হওয়ায় সম্প্রদায়গত বিরোধ এখানে প্রায় নেই। ডোম শ্রেণীর দেবতা উচ্চশ্রেণীতে জায়গা করে নিতে গিয়ে নিজের অলৌকিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভক্তদের চমকিত করেছে মাত্র, মনসা বা চণ্ডীর মত প্রতিষ্ঠা আদায় করতে গিয়ে তাকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। তার পূজা প্রচার সহজ প্রতিষ্ঠা মাত্র। উচ্চশ্রেণীর কাছে ধর্মদেব মনসা বা চণ্ডীর মত গ্রহণযোগ্য হয়নি কোন কালেই। আসলে ধর্মমঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি হওয়ায় কাব্যে ধর্মদেবের প্রভাব কম, তার রূপ অনেক বেশী কোমল এবং তার সঠিক কোন মূর্তি তৈরী হয়নি। নিরাকার হলেও মুসলমান শাসনকালে ধর্মঠাকুরের রূপগত পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে সময়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য তৈরী হয়েছে সে সময়ে দৈব শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছিল। ভক্তি বা বিশ্বাসের জায়গায় স্থান পেয়েছিল অবিশ্বাস ও সংশয়। রূপরামের কাব্যে 'শালেভর পালা'য় শালেভর দিতে গিয়ে রঞ্জাবতীর সংশয় প্রকাশিত হয়েছে। এতে জীবনের মূল্যও কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। রূপরামের কথায়—

"আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর।
কার তরে সাক্ষাত হবেন মায়াধর॥
সভে জানে মরিলে জীবন নাঞি পায়।
তোমার বচন শুনি প্রাণ উড়্যা যায়॥" (রূপরাম/৬০)

রাঢ় অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকেই অনার্য অধ্যুষিত ছিল, এবং সমগ্র বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হলেও রাঢ়দেশে আর্য প্রভাব অনেক পরবর্তীকালে প্রবেশ করে। প্রথমে আর্য-অনার্য শক্তির দ্বন্দ্ব ও পরবর্তীকালে উভয়ে কিছুটা সহনশীল হয়ে ওঠে, এমতাবস্থায় মনসা বা চণ্ডীর মত লৌকিক দেবীরা পরিমার্জিত হয়ে, সংস্কৃত হয়ে আর্য-সমাজে প্রবেশ করে এবং বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে অভিষিক্ত হয়। ধর্মঠাকুরও আর্য-সমাজে গৃহীত হল বটে কিন্তু সংস্কার কম হওয়ায় অনেকটা আদিম রূপেই আর্য-সমাজে প্রবেশ করে, ফলে অন্যান্য দেবদেবীর মত শ্রদ্ধার আসনে প্রবেশাধিকার পেল না। আসলে হয়ত ধর্মঠাকুর সম্পর্কে সংস্কার আর্য জনমানসে এতটাই বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে পরবর্তীকালের কোন সংস্কারই জনমানসের পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। চণ্ডী ও মনসা নারীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেও ব্রাহ্মণ পূজারী তাদের পূজক, কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজক হিসাবে রয়ে গেল ডোম পুরোহিতগণ, অনেক পরবর্তীকালে অবশ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতও পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে স্থান গ্রহণ করেছে। যখন ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারা গড়ে উঠেছে তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাদের স্বীকার করতে হয়েছে যে—

"জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
সুপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥" (মানিকরাম/২৩)

ব্রাহ্মণ পূজারী ও ব্রাহ্মণ কবিগণ অবশ্য ধর্মঠাকুরকে চতুর্ভূজ নারায়ণে পরিণত করেছেন, কিন্তু আর্যীকরণ সম্পূর্ণ হয়নি। আজও ধর্মপূজায় অনার্য বিধি পালিত হয়। ধর্মমঙ্গলের কাব্য কাহিনী মূলত লাউসেনের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী। তাহলেও এখানে ডোম সম্প্রদায়ের বীরত্বের কাহিনী বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে রাঢ়বঙ্গ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং বিপর্যস্ত হয়েছে, মানুষ যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল। ফলতঃ ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে তারা যুদ্ধবিগ্রহে বীরত্বের রস আস্বাদন করত।

সমাজবৃত্ত ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্য যেহেতু রাঢ়ভূমির কাব্য, তাই ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সমাজ মূলত রাঢ়বঙ্গের সমাজ। এখানকার মানুষের ইতিহাস ও এখানকার সমাজের ইতিহাসই ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত সামাজিক ইতিহাস। এই ইতিহাস এখানকার মানুষ, মানুষের চরিত্র, ধর্মবোধ, সামাজিকতা, ব্যবহার্য সামগ্রী, তাদের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-

আচরণ নিয়েই গড়ে উঠেছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ কবিদের দ্বারা কাব্য রচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ সমাজের আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস এখানে স্থান পেয়েছে সহজেই। তবে উচ্চবর্ণের সমাজের আচরণ শুধু নিম্নবর্ণকে প্রভাবিত করেনি এর বিপরীতক্রমও এখানে সত্য। অবশ্য নিম্নবর্ণের সমাজ অনেকক্ষেত্রেই উচ্চবর্ণের আচরণ, ক্রিয়াকলাপকে তাদের সমাজ জীবনে গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে 'আখেটিক খণ্ডে' কালকেতু বৃদ্ধ পিতামাতাকে তীর্থে পাঠাচ্ছে এই বিষয়টি উচ্চবর্ণের সমাজের বিষয়। কিন্তু এটি নিম্নবর্ণের প্রতি আরোপিত বলে মনে করা হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। বৃদ্ধ পিতামাতার পুত্র, পুত্রবধূকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে ধর্মাচরণে গমন প্রাচীন রীতি, তেমনি বৃদ্ধ পিতামাতাকে তীর্থদর্শন করানো সন্তানের কর্তব্য। এই বিষয়টি ধীরে ধীরে অনার্য সমাজেও প্রবেশ করেছিল।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ পূর্বোক্ত আলোচনার মতই আমি এখানেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত সামাজিক ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

খাদ্য ও পানীয় ঃ প্রথমে আসি ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে খাদ্য ও পানীয়ের কথায়। মানব জীবনের মৌলিক চাহিদাগত উপাদান হল খাদ্য ও পানীয়। রাঢ়বঙ্গ যেহেতু অনার্য অধ্যুষিত ছিল, তাই অনার্যদের খাদ্যরীতি এবং আর্যদের খাদ্যরীতির পার্থক্য ধর্মমঙ্গলে দেখা যায়। রাঢ়বঙ্গের কবিগণ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনাকালে খাদ্য তালিকা বা রন্ধন প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দেননি। যদিও 'হরিশ্চন্দ্র পালা' কিংবা সুরিক্ষার কাহিনীতে 'গোলাহাট পালা'য় এই সুযোগ ছিল। কবিরা আপন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী খাদ্যরীতি, রন্ধন প্রণালীর বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তা চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গলের তুলনায় নিষ্প্রভ। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বঙ্গের যে আহার্য বস্তুর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমিষ, নিরামিষ, মিষ্টান্ন, টক ইত্যাদি বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্যের কথা আছে। যেমন— নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শাকসব্‌জির ব্যঞ্জন, যথা— ভাজা, সুক্তা, ঝাল, ঝোল, বিভিন্ন প্রকার ডাল ইত্যাদি; আমিষ বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন, যথা— বিভিন্ন প্রকার মাংস ও মাছের ব্যঞ্জন; বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন যথা— পিঠা, পায়েস, দধি, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, দই, ক্ষীর, ক্ষীরখণ্ড, ছানা, পুর দিয়ে তৈরী বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন, লুচি-পুরি ইত্যাদি ; টক ব্যঞ্জনের মধ্যে আমের অম্বল (টক), মাংসের টক, মাছের টক ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, ফলমূল নিরামিষ রান্নায় ব্যবহার করা হত, যথা- বেগুন, মূলা, নিম, শিম, পানিফল, কাঁচা আম, মানকচু, কেসুর, নারিকেল, পটল, বকুল ফল, করলা, থোড়, অপক্ক পনস (ইঁচড়), ওল, কলা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার শাক, যথা— নালতে, পালং, পলাকড়ি, কচুশাক, সুষনি, কলমী ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার ডাল যথা— মুগ, বিউলি ইত্যাদি। মিষ্ট ব্যঞ্জনের জন্য চালের গুঁড়ি, দধি, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, গুড়, নারিকেল, দই ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন প্রকার মাছ, যথা— কই, শফরী, চিংড়ি, রুই, কাতলা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার মাংস যথা— মহিষ, ছাগ, হরিণের মাংস, শূকরের মাংস জনপ্রিয় ছিল। ধর্মমঙ্গলে মহামাংস অর্থাৎ নরমাংস ব্যবহারের কথা থাকলেও হয়ত জনসমাজে নরমাংস তখন আহার্য হিসাবে গ্রহণ করা হত না। অবশ্য কোন কোন আদিম জনসমাজে নরমাংস ব্যবহার করা হত। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেবের নরমাংস গ্রহণের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা সম্ভবত পৌরাণিক কাহিনীর যথার্থতা বজায় রাখার জন্য।

ধর্মমঙ্গলে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার ধান-চালের মধ্যে উড়ি ধানের চালের কথা বিশেষভাবে পাওয়া যাচ্ছে। যথা—

'উদুখল এরণ্ডে ভাজিবে উড়ি ধান।' (ঘনরাম/২৯৪)

কিংবা- 'উড়ি ধানে আতব তণ্ডুল সমাধিল।' (রূপরাম/১৭৪)

কিংবা- 'উড়িধান্য ভানিঞা তণ্ডুল কৈল সায়।' (মানিকরাম/২৬৭)

রান্নায় বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করার রীতি সকল মঙ্গলকাব্যেই দেখা যায়। বাঙালী ব্যঞ্জনে বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করত, যথা— জিরা, ধনে, কর্পূর, হিঙ, আদা, মরিচ, তেজপাতা, কালজিরা ইত্যাদি। বাঙালী ভোজন রসিক তাই মসলাযুক্ত ব্যঞ্জন আহারে অভ্যস্ত। ধর্মমঙ্গলে ব্যবহৃত মসলার উল্লেখ পাচ্ছি বিভিন্ন কবির কাব্যে। যেমন রূপরামের কাব্যে বাটা মসলার কথা পাওয়া যায়—

"হিঙ্গ জিরা লঙ্কা দিল ধন্যার বাটনা।" (রূপরাম/৫১)

কিংবা, ঘনরামের কাব্যের বিবরণে—

"ব্যঞ্জন রন্ধনে জিরা মরিচ কর্পূর ॥
সুরসাল দিয়া ঝাল হেম থালে ঢালে।
তবে রান্ধে বেসারু ব্যঞ্জন ঝোল ঝালে ॥" (ঘনরাম/২৯৮)

রন্ধনকার্যে গোটা মসলা ও বাটা মসলা উভয়ই ব্যবহার করা হত। বাঙালীর রন্ধনে আহার্য হিসাবে আর একটি সুস্বাদু দ্রব্য ব্যবহার হত, তা হল কুমড়ো বড়ি। অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট কুমড়ো বড়িকে বলা হত 'ফুলবড়ি'। রূপরাম ও মানিকরামের কাব্যে বড়ির ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে।

তাছাড়া রন্ধনকার্যে তেল, ঘি ইত্যাদির ব্যবহার হত। তেলের মধ্যে মূলত সরষের তেলের ব্যবহার প্রধান। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জনের নাম ও রন্ধন প্রণালী উল্লিখিত হয়েছে 'গোলাহাট পালা'য়। যথা—

"রসউল্যা ব্যঞ্জনে করেন ঝোল ভাজা।
মুগডালি সান্তানিল ব্যঞ্জনের রাজা।
বার্তাকু নিমেতে সিম করিল সুপাক।
তৈলে টলটলি করে বাথুয়ার শাক ॥
রান্ধিল পুতিকা শাক দিয়া ফুলবড়ি।
চুঁয়া চুঁয়া ঘৃতে ভাজা করে পলা কড়ি ॥
মানের বেসারি রান্ধে ব্যঞ্জন রসাল।
ঘটে নিস্নারিয়া নিল আদ্রকের ঝাল ॥
দশ গোটা লইয়া ভাজিল নারিকল।
ভিন্ন ভিন্ন রান্ধিল কেসুর পানিফল ॥" (রূপরাম/১৭৪)

ঘনরামের কাব্যেও 'গোলাহাট পালা'য় বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জনের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে–

"মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে বসে ভাজে ভাজা
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা ॥
কুটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে।
নির্জল করিয়া রামা তপ্ত ঘৃতে ঢালে ॥
কল কল সম্বরে ঘৃতের শুনি সাড়া।
নীরস করিয়া ভাজে দিয়া নাড়া ঝাড়া ॥
মানকচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব।
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জব জব ॥
ভাজিল বেগুন শিম নিম দিয়া ফোড়।
মূল আদা বটিকা করলা গর্ভ থোড় ॥

নারিকেল অপক্ক পনস পানিফল।
বিশেষ যতির ভক্ষ্য হবিষ্য নির্ম্মল॥
ফুল মূল অপর অনেক ভেজে তোলে।
তিক্ত রসে সুক্তা রামা রান্ধে ঝালে ঝোলে॥" (ঘনরাম/২৯৮)

বিভিন্ন ধর্মমঙ্গল কাব্যে নানা প্রকার আমিষ রান্নার বিবরণ পাওয়া যায়, যেমন ঘনরামের কাব্যে 'হরিশ্চন্দ্র পালা'য় মদনার রন্ধন—

"সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোনার থাল ঢাকিল উপরে॥
উড়ি চূর্ণের মাথার মজ্জায় তোলে বড়া।
বুকের কালিজা ভাজে চড়াইয়া কড়া॥
নাড়া ঝাড়া দিয়া ভাজে ঘৃত জবজব।
পরিপাটি মাংসের রন্ধন হৈল সব॥" (ঐ/৪৫)

কিংবা— "রোহিত মৎস্যের জুস যতনে রান্ধিয়া।
রান্ধিল লুয়ার মাংস যতন করিয়া॥" (মানিকরাম/৬৮)

আবার, রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণে বাঙালীর রন্ধন প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে আমিষ ও নিরামিষ বিভিন্ন প্রকার রান্নার কথা আছে—

"শুসুনির শাক এনে সম্বরিবে তৈলে।
শেষে দিবে সর্ষপের বাটনা সিদ্ধ হলে॥
অল্প জ্বালে অল্প অল্প আসিবেক ফুটে।
দৃঢ় করে দিয়ে কাটি দিয় তাকে ঘেঁটে॥
গুঁড়া করে গোটা দশ দিবে তায় বড়ি।
অল্প লবণ দিয়ে ওলাইবে হাঁড়ি।.
কটু তৈল কিছু দিয়ে সম্বরিয়া পুন।
প্রচুর পিঠালি দিবে পাক হয় যেন॥

--- --- --- ---

আর এক আছে সাধ আনি পুঁই খাড়া।
যথোচিত জল দিয়া জ্বাল দিবে বাড়া॥
সিদ্ধ হৈলে শেষে দিবে শোভাঞ্জনি ফুল।
কিছু কিছু দিবে তায় কচু কলা মূল॥
ঝোল রেখে ঝাল দিয়া জ্বাল দিও পরে।
সেই ব্যঞ্জনের সার শুনে মুখ সরে॥
চিংড়ী চাঁদ কুড়া মীন চাঁপা নটে শাকে।
অধিক লবণ দিয়া পাক কর্য্য তাকে॥
তায় দিবে গোটা দশ পনসের বীচ।
প্রচুর করিয়া দিবে পিঠালি মরিচ॥
ঝোলে দিয়া কৈ মাছ করে চড়বড়ি।

তৈলতে ভাজিয়া তায় দিও ফুলবড়ি॥
নীরস অত্যন্ত হলে তায় দিও নীর।
কাঠি দিয়া করে দ্রব যেন হয় ক্ষীর॥

- - -   - - -   - - -   - - -

শফরীর পেট চিরি বারি করে পোঁটা।
পোড়াবে যতনে যেন থাকে গোটা গোটা॥
লবণ সর্ষপ তৈল কিছু দিবে তায়।
শুনে মুখে সরে জল খাবার নাই দায়॥" (মানিক/১০০-১০১)

অম্বল বা টক ব্যঞ্জন বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয়। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেব লুয়ার মাথার টক রান্না করতে আদেশ দিয়েছে। সুরিক্ষা লাউসেনকে আপ্যায়িত করার জন্য আমের টক রান্না করেছে—

"বার তিন তিক্ত হাঁড়ি ধুয়ে সীমন্তিনী।
আমের অম্ল রান্ধে দিয়া দধি চিনি॥" (ঘনরাম/২৯৮)

ভোজনরসিক বাঙালী মিষ্টান্ন, পিঠা, পায়েস, ক্ষীর, লুচি ইত্যাদির রসিক—

"সঝাল বল্লাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া॥
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা॥
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে॥" (ঐ)

রাঢ়বঙ্গে মধ্যযুগে ঘি ও দুধের প্রাচুর্য ছিল, তাই রাঢ়বাসী অতিথি আপ্যায়নের জন্য মিষ্টান্নের পাশাপাশি ঘরে পাতা দইয়ের আয়োজন করতে ভুলতো না। রাজা হরিশ্চন্দ্রও ব্রাহ্মণ অতিথির জন্য ঘরে পাতা দইয়ের আয়োজন করেছে। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে পাওয়া যায়—

"গাভী দুয়্যা দিল রাজা বসাইল কড়া॥
নির্মাণ করিল পিঠা অতঃপর মজা।
সাজ দই চলিয়া ঢাকন্য দিল রাজা॥" (রূপরাম/৫১)

বাঙালীর রন্ধন প্রণালী, পরিবেশনাদিতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জনে আমিষ ও নিরামিষ স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধন করা হত এবং ব্যঞ্জন তালিকায় এক সঙ্গে তিক্ত, টক বা অম্বল, ঝালঝোল, মিষ্টান্ন সকলই থাকত। পরিবেশনকালে প্রথম তিক্ত, তারপরে যথাক্রমে ঝাল-ঝোল, টক ও সবশেষে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হত। আবার বাঙালী মেঝেতে উঁচু পিঁড়ি পেতে আহার করতে অভ্যস্ত। আহার স্থলের ডানদিকে নির্দিষ্ট স্থানে জলপাত্র রাখা হত—

"ভোজন করিতে স্থল করিল রাজন॥
উচ পিঁড়া আনি রাখে সংযোগ পুরট।
রাখিল জলের ঝারি দক্ষিণ নিকট॥" (ঐ)

রাঢ়বঙ্গের বাঙালী চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, সন্দেশ, নাড়ু খেতে অধিক অভ্যস্ত, অবশ্য বাঙালী মাত্রই ঐ সমস্ত শুকনো খাবারে অভ্যস্ত। তাইতো, গৌড় যাত্রকালে রঞ্জাবতী লাউসেন ও কর্পূরকে মুড়ি, মুড়কি, চিড়া বেঁধে দিয়েছে—

"মুড়ি চিড় সদাই আঁচল ভর্য়া দিবে।" (ঐ/১১৮)

অথবা "খুধা না সহিতে পারে খাওয়াবে সকালে।

নাড়ু মুড়ি মুড়িকি চিড়া মুনাম মিসালে॥" (মানিকরাম/১৬৮)

ধর্মমঙ্গলে 'চিড়াভাজা'র কথা পাওয়া যায়। শুকনো খাবার হিসাবে চিড়াভাজা ব্যবহৃত হত—

"নাড়ু চিনি কিন্যা দিব আর চিড়াভাজা॥

আর দিব সন্দেশ মুড়কি পাকা কলা।" (রূপরাম/১৫৮)

রাঢ়বঙ্গের বাঙালীরাও পানের বহুল ব্যবহার করত, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তারও পরিচয় আছে। তাছাড়া পান-সুপারির দ্বারা আমন্ত্রণ জানানো হত এবং কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যসিদ্ধির জন্য প্রেরণ করা হলে পান-সুপারি দেওয়া হত। যেমন—

"পান ফুল দিয়ে বলে সাধ প্রয়োজন॥

পান বন্দ্যা প্রণাম করিয়া গেল মাল।" (ঘনরাম/১৮৫)

কিংবা, পান গ্রহণ করার অর্থ হত কার্যে রাজী হওয়া বা মত দান করা। যেমন—

"হেনকালে ইন্দামেটে উঠাইল পান।" (ঐ/৫৮৯)

খাওয়ার পর পান খাওয়ার অভ্যাস অতি প্রাচীন, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার উল্লেখ দেখা যায়। গোলাহাট পালায় সুরিক্ষা লাউসেনকে আহারের পর পান খাবার কথা বলেছে—

"গা তোল গা তোল রায় করিতে ভোজন।

কর্পূর তাম্বুল খায়্যা করহ শয়ন।" (রূপরাম/১৭৫)

পান-সুপারি অনেক সময় সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হত। 'জাগরণ পালা'য় মহামদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায় লখাই ডোমনী সনকা ডোমনীর সাহায্য প্রার্থনা করলে সনকা ডোমনী তার ভাগ্য বিড়ম্বনা ও লখ্যার সুখের কথা বলে—

"ভাতারের ধন খায়্যা পাটাপারা বুক।

কোন লাজে আলি মাগী আমার সমুখ॥

গাগা গুয়া খাইলে যবে গুছিলেখা পান।

বনি বলি নাগ্রি দিলে চিব্যা অর্ধখান॥" (ঐ/৩২৮)

কিংবা, ঘনরামের কাব্যে সনকার উক্তি—

"মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।

দাসীতে জোগান পান গালে পোটা গুয়া॥" (ঘনরাম/৬২২)

এছাড়াও রাঢ়বঙ্গের মানুষ বিভিন্ন প্রকার পানীয়, যথা— দুধ, মদ বা উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করত, কবিগণ তার উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে পানীয় হিসাবে প্রচুর মদ্য ব্যবহৃত হত। তাছাড়া ডোম সমাজে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে মদের প্রয়োজন হত। ডোমেরা যথেচ্ছ মদ্যপান করত, তার প্রমাণ কালু ডোম চরিত্রটি। তাছাড়া নেশাকর দ্রব্য হিসাবে গাঁজা, ভাঙ, সিদ্ধির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-

"ভাঙ্গ পোস্ত ভাজা ভুজা ভুঞ্জে পাঁচ রস।

মেটে বলে মদ খাব যেয়ে কোশ দশ॥" (ঐ/১২৯)

কিংবা, "চিড়া মুড়ি লাড়ু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত।

দেখে বলে কেলে সোনা হের দেখ দোস্ত॥" (ঐ/১২৮)

ধর্মমঙ্গলে পোস্ত ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে নেশার উপকরণ হিসাবেও পোস্ত ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে তমাকের প্রচলন হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে

তামাকের ব্যবহার দেখা যায়—

"যুগল তামুলি আছে তামুক জোগায়্যা।
চিত্তের সন্তোষ পায় চাঁদমুখ চেয়্যা॥" (মানিকরাম/২৪৭)

মদ্যপানের জন্য ডোমরা শুঁড়ি বাড়ি ভিড় করত। ঘনরাম শুঁড়িখানায় মদ্যপানের চিত্র অঙ্কন করেছেন-

"মদমাংসে মজিয়া মাতিল ডোম যত।
মনে করে উঠেছি ইন্দ্রের ঐরাবত॥
. . .   .
পুনরপি শুঁড়ি বাড়ি লাগাইয়া লেঠা।
আরে তারে যেয়ে বলে মদ দেরে বেটা॥
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাই মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলি টানে॥ (ঘনরাম/৬০১)

গৃহস্থালী দ্রব্য ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ়বঙ্গের মানুষের ব্যবহৃত গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত গৃহস্থালীদ্রব্যের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। ধর্মমঙ্গলে কলসী, থালা, বাটি,ঘটি, জাঁতা, চুপড়ি, প্রদীপ, বাটা, ডাবর, খাট পালঙ্ক, ছাতা ইত্যাদির সুলভ উল্লেখ চোখে পড়ে। রন্ধনকার্যে হাঁড়ি, থালা, বাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। পানীয় জল আনার জন্য কিংবা জল রাখার জন্য কলস ও ঘড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। যেমন ধর্মমঙ্গলে 'গোলাহাট পালা'য় লাউসেন সুরিক্ষাকে কাঁচা হাঁড়িতে রন্ধন করার আদেশ দিয়েছে—

"রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।" (ঐ/২৯৪)

সাধারণত রন্ধনকার্যে মাটির হাঁড়িই ব্যবহার করা হত যা কুমারের চাকে তৈরি হত, তাছাড়া কুম্ভ বা কলসী, ঘড়া, সরা ইত্যাদি মাটির তৈজসপত্র কুমারের চাকে তৈরি হত। তাইতো সুরিক্ষার প্রতি লাউসেনের নির্দেশ— "কাঁচা কুম্ভ কেবল কুমার চাকে লবে।" (ঐ/২৯৪)। হাঁড়ির মুখে মিলিয়ে ব্যবহারযোগ্য সরা (ঢাকনী) ব্যবহার করা হত। অবশ্য এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগে মৃৎশিল্পের উৎকর্ষতার পরিচয় পাই। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর উপমা দিতে গিয়ে কবিগণ হাঁড়ির মুখে সরার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন—

"বর নয় বনি গো সে গগনের তারা।
হাঁড়ি যোগ্য বিধাতা গড়িল যেন সরা।"(রূপরাম /২৪৭)

রন্ধনে বিভিন্ন তরিতরকারি রাখার পাত্র হিসাবে বাটি ও থালার ব্যবহার করা হত। তাছাড়া আহারের সময় থালা ও বাটির ব্যবহার হত। বিবিধ ব্যঞ্জন বাটিতে থরে থরে পরিবেশিত হত এবং এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। যেমন—

"ঘরে জ্বলে প্রদীপ বাহিরে সাজে আলা।
দূর হত্যে দেখে চোর ঘটি বাটি থালা॥ (ঐ/৮২)

কিংবা— "স্নান করা স্বর্ণ থালে থ্যাতায় ওদন॥
শাকাদি ব্যঞ্জন সব সুবর্ণ বাটীতে।
থরে থরে থেথায় থালার চারি ভিতে॥" (মানিকরাম /২৬৮)

মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গেও পানীয় জল হিসাবে সাধারণত নদী বা পুষ্করিনীর জল ব্যবহৃত হত। বাঙালী রমণীগণ কলসী কাঁখে পানীয় জল আনত। ঘনরাম লিখেছেন—

"কাঁকে কাঁচা কলসী গমনে বহে ঝড়॥

ত্বরাতরি উপনীত তারাদিঘী ঘাটে।" (ঘনরাম/২৯৬)

তাছাড়া পানীয় জলের জন্য কূপের জলও ব্যবহার করা হত। পানীয় জল কলসী ও ঘড়াতে সংরক্ষণ করা হত। পানীয় জল, পা ধোবার জল, মদ ইত্যাদি ঝারিতে রাখা হত। ঝারি নলযুক্ত এক প্রকার পাত্র বিশেষ। যথা—

"দক্ষিণে জলের ঝারি খুরি বাটি থালা।" (রূপরাম/১৭৫)

কিংবা, শুঁড়ির দোকানে ঝারিতে মদ পরিবেশনের চিত্র পাওয়া যায়—

"উঠ শিবা ভাল মদ দেরে ঝাড়ি কুড়ি।
ঘন ডাকে ঘোর ঘুমে বারি হোল শুঁড়ি॥" (ঘনরাম/৫৯৯)

পান ও বাটার বিভিন্ন রকম তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করা যায় বাঙালী সমাজে। ধর্মমঙ্গলে পান ও বাটার প্রতীকী ব্যবহার লক্ষণীয়। রঞ্জাবতী-কর্ণসেনের বিবাহদানের পর গৌড়েশ্বর সম্মানপূর্বক পানবাটা প্রদান করে কর্ণসেনকে ময়নার অধিপতি নিযুক্ত করে —

"লালবন্দী বত্রিশ কাহন কর আঁটা।
হাতে হাতে কর্ণসেনে দিল পান পাটা॥" (ঐ/৭৭)

কিংবা— "বিপাক পড়িল বড় না দেখি উপায়।
দিদির পানের বাটা গড়াগড়ি যায়॥" (রূপরাম/৩৪৬)

বাঙালী পরিবারে মূলত মাটিতে চুলা বা উনুন পেতে রান্নার কাজ হত। এবিষয়ে অবশ্য বাঙালী রমণীগণও বিশেষ পারদর্শী ছিল। ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষা তিন খাঁজ যুক্ত বালির চুলায় রন্ধন করে অসাধ্য সাধন করেছিল—

"নির্ম্মাণ বালির চুলা চাপাইল হাঁড়ি।
দেবীর দোহাই দিয়া জ্বালিল তিহড়ি॥" (ঘনরাম/২৯৭)

রাঢ়বঙ্গের বাঙালী সমাজে ঢেঁকির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বাঙালী রমণীরা ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল সংগ্রহ করত, তার উল্লেখ আছে ধর্মমঙ্গলে। রূপরামের কাব্যে তার উল্লেখ পাই—

"ভেরান্ডার ঢেঁকিতে ভাঙ্গিল উড়িধান।
ভগবতী আপনি সাক্ষাত অধিষ্ঠান॥" (রূপরাম/১৭৪)

তাছাড়াও গৃহকর্মের সহায়ক বিভিন্ন গৃহস্থালির দ্রব্য, যথা- ধুচুনি, চুপড়ি, চালুনি, ঝুড়ি, ডালা, কুলা, ছাতা, প্রদীপ, আসন, পাটি ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। ধুচুনি, চুপড়ি, ঝুড়ি, ডালা, কুলা গৃহস্থালীর দ্রব্য হিসাবে অপরিহার্য ছিল। কবি লিখেছেন—

"কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বন্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া ছাতাছাতি॥" (ঘনরাম/৩৪৭)

মেয়েরা গৃহকর্মের উপযুক্ত চাটাই, তলপাতার পাটি বুনে নিত—

"মউরা মলিন-মুখী বোনে তালপাত।" (রূপরাম/২০৪)

প্রদীপ বাঙালীর মাঙ্গলিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। পূজা-পার্বণাদি শুভকর্মে তেল বা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হত. প্রত্যহ গৃহে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো বাঙালীর সংস্কৃতির একটি অংশ। যথা—

"উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধুনা ধুমে অন্ধকার॥" (ঘনরাম/১২৫)

পূজা-পার্বণাদিতে এবং গ্রীষ্মকালে অর্থশালী ব্যক্তিরা চামর ও পাখা বা বিজনী ব্যবহার করত। যেমন-

"চামর বিয়নী পাখা সভাকার হাথে।
চলিল নাগর সব সুরীক্ষার সাথে॥" (রূপরাম/১৬৯)

চোররা তাদের সহায়ক অস্ত্র সিঁদকাটি গৃহস্থের গৃহে গর্ত খননকার্যে ব্যবহার করত। ধর্মমঙ্গলে ইন্দামেটের চুরি প্রসঙ্গে বারবার সিঁদকাটির প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন—

" মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাঠি।" (ঘনরাম/১২৬)

সৌখিন দ্রব্য ও রূপচর্চার উপকরণ হিসাবে দর্পণ, চিরুণী, খাট, পালঙ্ক ব্যবহৃত হত। ধনীরা শয্যানির্মাণে খাট, পালঙ্ক ব্যবহার করত— ধর্মমঙ্গলে তার ব্যবহার পাওয়া যায়। তাছাড়া সুসদৃশ আসন, কম্বল ইত্যাদি ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। যথা—

"নিকুঞ্জ মন্দির শোভা সুন্দর সদন॥
তায় খাট পালঙ্ক অনেক রূপ দেখি।
একেক নাগর সঙ্গে চারি পাঁচ সখী॥
... ...
বসিতে আসন দিল অরুণ কম্বল
সুবর্ণ ঝারিতে দিল পরিপূর্ণ জল। (রূপরাম/১৬২)

নিরুপদ্রব সমৃদ্ধ জীবন বোঝাতে খাট, পালঙ্ক, চামর পাখা বা বিয়নী এই সমস্ত প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা সাধনার উপকরণ হিসাবে কমণ্ডলু, চামর ইত্যাদি ব্যবহার করত। শীতলপাটি বোধ হয় বাংলাদেশ ভিন্ন কোথাও ব্যবহৃত হত না। শয্যার উপকরণ হিসাবে খাট বা পালঙ্কের উপর শীতলপাটি বিছানো হত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে শীতলপাটির ব্যবহার আছে—

"পাত্তিল শীতলপাটি পরিসর পান।
তায় পুন রাখিল সুবর্ণ খাটখান॥" (ঐ/৬৯)

বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ প্রদীপ, ধূপ-ধুনা, ধুনাচি, কমণ্ডলু, চন্দন, আতপ তণ্ডুল, যোগপাটা ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"ধূপ ধুনা ধুনচী ধবলাসন ধুতি।
চন্দন অঙ্গুরী অর্ঘ্য হেন পুষ্পযুতি॥" (ঘনরাম/৫৬৮)

কিংবা— "কমণ্ডলু কমল লইয়া করতার।
অঞ্জলি করিয়া অঙ্গে দিলা তিনবার॥" (মানিকরাম/৮৭)

ধবলাসন, ধুতি, যোগপাটা অবশ্য রাঢ়বঙ্গের ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ধর্মমঙ্গলে এসব উপকরণের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এভাবে দেখা যায় বাংলার লোকায়ত ইতিহাসের নানান চিহ্ন ও দ্রব্যাদি ধর্মমঙ্গল কাব্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

ধর্মমঙ্গলে জীবন-জীবিকার সাহায্যার্থে গৃহস্থালীর উপকরণ হিসাবে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, যেমন- বঁটি, ক্ষুর, বঁড়শি, কাটারি বা কাতি (কর্তরিকা থেকে জাত- কর্তরিকা> কত্তরিআ > কাটারি) কুঠার, জাঁতি, বাটালি বা বাটাল, পাখুরী, সাঁড়াশি, নেহাই, হাতুড়ি ইত্যাদি। শাকসবজি কাটার জন্য বঁটি এবং নাপিত চুল, দাড়ি কামানোর জন্য ক্ষুর ব্যবহার করত। ঘনরামের কাব্যে দেখি রঞ্জাবতী চাঁপাইয়ে শালেভর দিতে গিয়ে বঁটি, ক্ষুর ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রের উপর ঝাঁপ দিয়েছে—

"সুমঞ্চে সন্ন্যাস কাটি গাড়ে চন্দ্রবান বঁটি
ঘোরমুখী ক্ষুর খরসান।" (ঘনরাম/৯৬)

কাটারি বা 'কাতি' গৃহকর্মে ব্যবহৃত অস্ত্র বিশেষ। হরিশ্চন্দ্র লুইচন্দ্রকে কাটার সময় 'কাতি' ব্যবহার করেছে–

"কান্দিতে কান্দিতে রাজা কাতি ধরে হাতে।

পূর্বাস্য হইয়া বসে পুত্রেরে কাটিতে॥" (মানিকরাম/৬৬)

কুঠার একটি বহু ব্যবহৃত গৃহস্থালীর অস্ত্র বিশেষ, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার ব্যবহার আছে। গৃহস্থালীর কার্য ছাড়া যুদ্ধাস্ত্র হিসাবেও কুঠার ব্যবহার করা হত। কাঠ কাটার কাজে, কঠিন অস্থিযুক্ত মাংস কাটার জন্য কুঠার একটি সুবিধাবহুল অস্ত্র—

"কুঠারে কাটিয়া মজ্জা করিল বাহির।" (ঐ/৪৪)

দেবী প্রদত্ত অস্ত্রের ফলা নির্মাণ করার জন্য কামিল্যা কুঠার নিয়ে অরণ্যে গাছ কাটার জন্য গিয়েছিল-

"কুঠার কুড়ালি আগুলিল বাস করে।
পুনরপি চোট হানে বকুল উপরে॥" (রূপরাম/১০৩)

ছুতোর মিস্ত্রিরা কাঠের জিনিসপত্র নির্মাণ করার জন্য তাদের সহায়ক অস্ত্র বাটালি, করাত ইত্যাদি ব্যবহার করত। যথা–

"বাম হাথে নিল বাস পাখুরি বাটালি।
পথে যাত্যে স্মরণ করিল ভদ্রকালী॥" (ঐ)

কিংবা— "নেহাই হাতুড়ি জাঁতা লয়্যা লঘুতর।" (মানিক/৩৮১)

করাত কাঠ ছেদনের অস্ত্র বিশেষ। লাউসেনকে হাতি চুরির মিথ্যা অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। লাউসেনকে যেখানে শাস্তি দিয়ে রাখা হয়েছিল তার এক পাশে শেল অন্য পাশে করাত বসানো ছিল। কবির বর্ণনায়–

"বাম পাশ নাড়িতে পঞ্চম শেল ফুটে।
ডানি পাশ নাড়িতে করাতে মাংস কাটে॥" (রূপরাম/১৮৭)

কিংবা, হরিশ্চন্দ্র ও রানী মদনা করাতে স্বীয় পুত্রের দেহ ছেদন করেছিল–

"জায়া পুত্র যার শিরে ধরিল করাত।
অর্দ্ধ অঙ্গ কেটে দিল কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥" (ঘনরাম/৪৩)

গৃহকর্মের উপকরণ হিসাবে কখনো কখনো পূজা-পার্বণে বলিদানের জন্য খাঁড়া বা খড়্গ ব্যবহার করা হত। যথা—

"সাধুর সাহস শুনি খড়্গ নিল হাতে।
পুত্রে বলি দেন রাজা ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥" (ঐ)

ছুরি কাটারির চাইতে ক্ষুদ্র অস্ত্র বিশেষ। আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে তা ব্যবহার করা হত। আবার নাপিত, চুলদাড়ি কামানোর জন্য ধারালো ছুরি ব্যবহার করত। কানড়া মিথ্যাবাদী ভাটের শাস্তি দেওয়ার জন্য নাপিত ডেকে মাথা কামিয়ে নিয়েছিল —

"জামাজোড়া কাড়্যা নিল ছুরি যমধর।
নাপিত আনিঞা মাথা মুড়াল্য সত্বর॥" (রূপরাম/২৩৬)

গৃহস্থালীর অস্ত্র জাঁতির ব্যবহার প্রাচীন। পান-সুপারি প্রিয় বাঙালী ঘরে অস্ত্রটি নিত্যপ্রয়োজনীয়। সুপারি কাটার জন্য জাঁতি ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ পাই কাব্যে। এখানে উপমা হিসাবে জাঁতির ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। যথা-

"মনে ভয় মাথা হেঁট মুখে করে আঁট।
কঠিন জাঁতির কাছে গুয়া কত ডাট॥" (মানিকরাম/৩৮৪)

কামারের যাঁতা ও সাঁড়াশি ইত্যাদি যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় ধর্মমঙ্গলে–

"যাঁতা টানে মণ্ডল ভাগিনা সহচরী।

অঙ্গারে আগুন জ্বলে দপ দপ করি॥
সাঁড়াশিতে ধরিয়া সঘনে লোহা পাড়ে।
কালের করাত কাটি শাল কাঁটা গড়ে॥ (রূপরাম/৪২)

মাছ ধরা একটা প্রাচীন উপায়, সভ্য মানুষ মাছ ধরার উপকরণ বঁড়শি ব্যবহার করত। চাড় বা টোপ বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরার কথাও ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। যথা–

"পোড়ায়ে বঁড়সা মুখে জোগাইল টোপ॥
মঞ্চে বসে মৎস্য মারে কালু মহাবল।" (ঘনরাম/৪৯০)

পাখি শিকার, ছোট ছোট বন্য জন্তু শিকারের জন্য বাঁটুল ব্যবহার করত রাঢ়বাসী। ছেলেরা তাদের ক্রীড়ার উপকরণ হিসাবে মূলত শিকারের জন্যই বাঁটুল ব্যবহার করত। ক্রুদ্ধ কালুডোম বাঁটুলের গুলিতে লোহাটাবজ্জরের নৌকায় ছিদ্র করে দিয়েছিল—

"মার্ মার্ বলে ঠেটে বাঁটুল মারিল এঁটে
ফেটে গেল কোটালের লা॥"(ঐ/৪৯২)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহে ভরপুর হল ধর্মমঙ্গল কাব্য। রাঢ়বঙ্গ নানা সময়ে যুদ্ধবিগ্রহে আকীর্ণ ছিল, ফলে বীর রসের কাব্য-কাহিনীর প্রতি রাঢ়বাসীর এক প্রকার আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। রাঢ়বাসীর এই রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে ধর্মমঙ্গল কাব্য। যুদ্ধবিগ্রহময় কাব্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা পাওয়া যাচ্ছে যা রাঢ় বাংলার লোক ইতিহাস, সমাজ ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। অতঃপর আসি যুদ্ধাস্ত্রগুলির কথায়। যুদ্ধের বর্ণনায় ধর্মমঙ্গলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার পাওয়া যায়। তাছাড়া রাজা মহারাজা বা ধনীরা শিকার কার্যেও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। ধর্মমঙ্গলের যুদ্ধরীতির বর্ণনা প্রাচীন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের খুব একটা প্রয়োগ হয়নি। তাই মূলত প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় এখানে, অবশ্য ধর্মমঙ্গল অনেক পরবর্তীকালের কাব্য হওয়ায় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান ও বন্দুকের ব্যবহার পাওয়া যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যগুলির চাইতে ধর্মমঙ্গলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার দেখা যায়। ইঁট-পাটকেল, ঝাটি-ঝকড়া, মুদগর-মুষল, তীর-ধনুক ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার রামায়ণ ও মহাভারতে মুখ্য, কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাঁড়া, খড়গ, কুঠার, টাঙ্গন, টাঙ্গী, তীর, ধনুক, অসি বা তরবারী, কাটারি , ঢাল ইত্যাদি প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার হতই পাশাপাশি অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান, গোলা, বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে যুদ্ধের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে কালুর বীরত্ব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে-

"ঝুপ্ ঝাপ্ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলিশর।
ঢাল খাঁড়া বীর কালু বায়ে করে ভর॥
চৌদিকে চাপিয়া গুলি বাজে দুমাদুম্।
সামালি সমরে সেনা হানে দামদুম্॥
মণ্ডূকমণ্ডলী মাঝে মত্ত যেন সর্প।
কুঞ্জরনিকরে যেন কেশরীর দর্প॥
সেইরূপে সেনামাঝে বীর বান্ধে রিষ।
হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ॥
ঝন্‌ঝান্ ঝাঁকে খাঁড়া টান টান টাঙ্গি।
ঠন্ ঠন পড়ে মাথা পাগ বান্ধা রাঙ্গি॥

শন্ শান্ শুনি শুধু শরের শবদ।
একা কালু এক লক্ষ রণে বিশারদ॥
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায়॥" (ঐ/৩৮৪)

টাঙ্গি বা টাঙ্গন কুঠারের মত এক ধরনের অস্ত্র বিশেষ, যা দূর থেকে নিক্ষেপ করে শত্রুকে ঘায়েল করা যায়। লখাই ডোমনী টাঙ্গি নিক্ষেপ করে কাম্মা ডোমের শিরচ্ছেদ করেছিল—

"সত্বর কুঞ্জর পিঠে উঠে করে ভর।
দেখে পরাক্রম লখে বলে ধর ধর॥
মেলা টাঙ্গি ফেলায়ে কাম্মার হানে শির।
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর॥" (ঐ/৬৩৬)

শেল ও শার্ঙ্গী এক ধরনের নিক্ষেপ করার অস্ত্র বিশেষ। আমরা জানি লক্ষ্মণের শক্তিশেলের কথা, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কামরূপ যুদ্ধপালায় কালুকে শেল নিক্ষেপ করতে দেখি—

"হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে শার্ঙ্গী শেল রাখে
ঝপ ঝাপ্ রাখিছে শর।
তীর গুলি আদি ঢালেতে সমাধি
বীর বায়ে করে ভর॥" (ঐ/৩৮৮)

ঘনরামের কাব্যে কামান, গোলা, বারুদের ব্যবহার পাই। কামরূপরাজ কালু ডোমের সঙ্গে যুদ্ধে কামান ও গোলা ব্যবহার করেছে—

"একাকার ধূম দুড়ুম দুড়ুম
শব্দে ছোটে বড় গোলা।
রাজা বলে মার্ কামানে বেটার
হাড় মাস করে তেলা॥ (ঐ)

রূপরামের কাব্যে বন্দুক ব্যবহারের কথা পাই। লাউসেন কর্ণসেনের অস্ত্রাগারে ফলা খুঁজতে গিয়ে সারি সারি কামান বন্দুক দেখতে পায়—

"সারি সারি নানা অস্ত্র বন্দুক কামান।
দেখিল বিনোদ ফলা অপূর্ব নির্মাণ॥" (রূপরাম/১০২)

অসি বা তরবারি অতি প্রাচীন অস্ত্র। প্রাচীন যুদ্ধপদ্ধতিতে অসির ব্যবহার লক্ষণীয়। ধর্মমঙ্গলে অসির ব্যবহার দেখা যায়—

"উত্তরে অঘোর বাজে অসি দড়মসা।
হইল বিকল কেহ হারাইল দিশা॥" (মানিকরাম/৫১৭)

মধ্যযুগীয় শাস্তি ব্যবস্থায় শূলে দেওয়া একটি বিশিষ্ট রীতি। অপরাধীকে শূলে দিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে শূলের উল্লেখ আছে, অবশ্য কবি এখানে কৌতুক রস সৃষ্টি করেছেন। হরিহর বাইতিকে মহামদ চুরির শাস্তি হিসাবে শূলে দিয়েছে—

"হরিষে দেখিছে পাত্র বাইতির শূলি।
নিদারুণ কোটাল বায়েনে ধরে তুলি॥" (ঘনরাম/৭০০)

মধ্যযুগে যুদ্ধরীতির বর্ণনা প্রাচীন কাব্যগুলির অনুসরণে, সুতরাং মঙ্গলকাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা ও ব্যবহৃত অস্ত্রাদি

প্রাচীন; তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা ধর্মমঙ্গলে নবীনত্ব লক্ষণীয়।

সাজসজ্জা : বাঙালীর ইতিহাসের অন্যতম উপাদান পোশাক-পরিচ্ছদ। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে দিয়ে একটি জাতির মানসিক গঠন ও শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বাসীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, এতে বাঙালীর কৌম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। স্বাভাবিক পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে মানুষ লজ্জানিবারণার্থ যে সকল পোশাক ব্যবহার করে তাকেই বোঝায়। তাছাড়া নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলার জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানে শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ধরনের গহনা-অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করত। রাঢ়বাসী বাঙালী মূলত শাড়ী বা পাটশাড়ী, পট্টবাস, ধুতি, জামা, কাঁচুলি, জুতা, পাগড়ী, টুপি, কোমরবন্ধ ইত্যাদি পরিধান করত। বাঙালী মহিলাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র হল শাড়ী, ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাটের শাড়ী বা পট্টবস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। উৎসব অনুষ্ঠানে পাটের শাড়ী পরিধান করা হত। রঞ্জাবতীর বিবাহকালে উপস্থিত নারীগণ পাটের শাড়ী পরিধান করেছে—

"কার গায়ে কেহ পড়ে নাপান করিয়া।
বিনোদ পাটের শাড়ি যায় লোটাইয়া॥" (রূপরাম/৩৪)

ঘনরামের কাব্যে লাউসেন কালুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে তার নারীদের পাটের শাড়ী পরাবে। রূপরামের কাব্যে গুয়াবুটি শাড়ী নামে এক জাতীয় শৌখিন শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে অতি উন্নত ছিল তার প্রমাণ আছে। বিশেষত বাংলার মসলিনের জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল। রূপরামের সুরিক্ষা পরিহিত শাড়ীটি কি মসলিন ? কবির বর্ণনায় —

"বাছিয়া বসন পরে নাম গুয়াবুটি।
বাইশ হাত বসন বাঁ হাতে হয় মুঠি॥" (ঐ/১৬৯)

তাছাড়া নারীরা উড়নি, অন্তর্বাস হিসাবে বক্ষবন্ধনী বা কাঁচুলি ব্যবহার করত। মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে কলিঙ্গা পুরুষের বেশ ধারণ করে, কিন্তু নারীর চিহ্ন স্বরূপ শঙ্খ, সিন্দুর ও উড়নি পরিধান করে—

"করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দূর।
নারীর নিশান রাখি বেশ করে দূর॥
গায়ে দিল উড়ানী পুড়নি রৈল মনে।
কেমনে বাঁচিবে বাছা অভাগী বিহনে॥" (ঘনরাম/৬৪০)

বক্ষবন্ধনী বা কাঁচুলি নারীগণের বিশেষ পরিধেয়। রূপরামের কাব্য 'জামতি পালায়' বারুই বৌয়ের কাঁচুলি নির্মাণ প্রসঙ্গ পাই–

বিচিত্র কাঁচলিখানি বিশেষ লিখন।
দেখিয়া বারুই বৌ হরষিত মন॥" (রূপরাম/১৫২)

কলিঙ্গা যুদ্ধ যাত্রাকালে কাঁচুলি পরিধান করে নিজেকে আঁটসাট করে তোলে। যেমন–

"বুকে বাঁধে কাঁচুলী কবরী মাত্র কেশে।
তরবড়ি কোমর কসুনি করে শেষে॥" (ঘনরাম/৬৪০)

পুরুষের পোশাক মূলত ধুতি, জামা, ইজার ইত্যাদি। তাছাড়া শীতবস্ত্র চাদর ব্যবহার করা হত। রঞ্জাবতী যখন পুত্র কামনায় চাঁপাইয়ে ধর্ম সেবায় গিয়েছিল তখন অন্যান্য পুরুষগণ ধুতি পরিধান করেছিল—

"ধৌত ধুতি পরি সবে উঠিল আড়াতে।
নানা পদ্য বাদ্য বাজে নাচে বেত্র হাতে॥" (ঐ/৯৩)

পুরুষরা উর্দ্ধাঙ্গে জামা পরিধান করত। ঘনরামের কাব্যে দেখা যায় কলিঙ্গা যুদ্ধ যাত্রাকালে পুরুষের বেশ ধারণ

করলেও পুরুষের পোশাক জামা পরতে রাজী হয়নি—

"মনে নিল সার যুক্তি বলিলে কানড়া।
কিন্তু বুন কখন না পরি জামাজোড়া ॥" (ঐ/৬৪০)

তারা নিম্নাঙ্গে ইজার পরিধান করত—

"তরবড়ি সাজে রামা রাহুতের বেশে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে ॥" (ঐ/৬৫১)

দরিদ্র নারী ও পুরুষরা সাধারণত ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিত, গায়ের কাপড়ও ব্যবহার করত। শৌখিন পোশাক ধনীর প্রাচুর্য এবং ছেঁড়া কাঁথা, চাদর বা গায়ের কাপড় ইত্যাদি দারিদ্র্যের পরিচায়ক। দরিদ্র সোম ঘোষ বাজারে ভিক্ষা করত, সে বসনবিহীন, তার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা মাত্র-

"বাজারে মাগয়ে ভিক্ষা সম্বলের তরে।
চালু কড়ি দেই কেহ দয়া অনুসারে ॥
বসনবিহীন ঘোষ ছিঁড়া কাঁথা গায়।" (রূপরাম/১৯)

গৌড়রাজ কর্ণসেনকে গায়ের কাপড় দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল এবং ময়নানগরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল-

"এত বলি দিল রাজা গায়ের কাপড়।
যাত্রা কৈল কর্ণসেন ময়নার গড় ॥" (ঐ/২৫)

পুরুষের মধ্যে জুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন—

"নাথা নুথা কিলে গুঁতা হিড়িক জুতার।
ভাট বলে মরি মরি গোপ বলে মার ॥" (ঘনরাম/৬৩)

রাজপুরুষেরা পাগড়ী, কোমরবন্ধ, টুপি ও বিভিন্ন ধরনের আঁটসাট পোশাক পরিধান করত। সৈনিকরা যুদ্ধ যাত্রাকালে কোমরে পেটি বা কোমরবন্ধ, পাগড়ী, সরবন্দ বা শিরস্ত্রান পরিধান করত। কানাড়া যুদ্ধ যাত্রাকালে এ ভাবে সুসজ্জিত হয়েছিল—

"পরিপাটী পেটী আঁটি পাগ পরিসরে।
সম্মুখে সাজায়ে বস্ত্র দাসী ধরে করে ॥
শিরে বান্ধে সরবন্দ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দু ইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা ॥" (ঐ/৬৫১)

বিবাহ, উৎসব-অনুষ্ঠানে পাগড়ী সম্মানসূচক উপহার দেওয়া হত, কিংবা বিবাহকালে পাগড়ী পরিধান করার রীতি ছিল। ঘনরামের কাব্যে কানড়ার বিবাহে কালুবীরকে পাগড়ী উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল—

"বীরে করি বক্সিস আনাল মহীপাল।
পুরট পাগড়ী জোর জরি পট্টশাল ॥" (ঐ/৪৭১)

পাগড়ীর সঙ্গে থাকত জরি বাঁধানো। সৈন্যসামন্তরা, রাজপুরুষররা টুপি পরিধান করত। তাতে নানা রকম মূল্যবান মণি-মুক্তা খচিত থাকত। কানড়া যুদ্ধ যাত্রাকালে সুবর্ণ টুপি পরিধান করেছিল—

"শিরেতে সোনার টুপি টেয়া বাঁধা তায়।
সাজ করে সীমন্তিনী রাণীকে সাজায় ॥" (ঐ/৬৫১)

রাজপুরুষরাও টুপি পরিধান করত এবং টুপি তাদের বীরত্বের চিহ্ন স্বরূপ গণ্য হত–

"মল্লডোরমণ্ডিত মাথায় বীরটুপি।
রাজসভা প্রবেশিল রাম নাম জপি ॥" (ঐ/১৪২)

সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করত। তারা খুব সাধারণ পোশাক পরিধান করত। তাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র ছিল ধুতি; তাছাড়া নামাবলি গায়ে ব্যবহার করত, পায়ে কাঠের খড়ম এবং গলায় পৈতে ব্যবহার করত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরে আসে অলঙ্কার ও প্রসাধনদ্রব্যের কথা। বাঙালী চিরকালই অলঙ্কার প্রিয়। অলঙ্কারপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে বাঙালীর শখ-শৌখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বাসীর অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় আছে। ধর্মমঙ্গলে বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের পরিচয় পাই, তবে লক্ষণীয় বিষয়, এর মধ্যে দিয়ে সেকালের ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানগত দিকগুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অংশে অভিজাত রাজবংশের লোকেরা, অর্থশালীরাই বিভিন্ন রকম অলঙ্কার ব্যবহার করেছে কিন্তু রাঢ়ের আদিমতম বাসিন্দা কালু, লখ্যা, সনকারা নিরলঙ্কার। ধর্মমঙ্গলে যে সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় পাই সেগুলি হল— অঙ্গুরী, কঙ্কণ, শঙ্খ বা শাঁখা, পাসুলি, বউলি, পলা, রুলি, বাজুবন্দ, মদনকড়ি, হার ইত্যাদি। রূপরামের কাব্যে বাঙালী ব্যবহৃত অলঙ্কারের সুন্দর উল্লেখ পাই। রূপরামের কাব্যে আখড়া পালায় দেবী পার্বতী লাউসেনকে ছলনা করার আগে লাসবেশ ধারণ করে তার কিছু অংশ—

"নানা অলঙ্কার পরে সিন্দুরে মাজিয়া।
লক্ষেশ্বরী হার গলে দিলেন তুলিয়া॥
পাশুলী বাউলি পলা দোসতি তেসতি।
রসকাঠি পরে কত তাহার সংহতি॥
উপরে তেসতি তার করে কেয়াপাতা।
স্থির হয়্যা ঐমনি বসিলা জগন্মাতা॥
নাসিকা শিখরে মণি পবন হিল্লোল।
চাঁদমণি চকোর হাসিয়া মাগে কোল॥
দুই হাথে পরে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আগু করে রাঙ্গা রুলি সুবর্ণ কঙ্কণ॥
শঙ্খের উপর বাজুবন্ধ ছড়া ছড়া।
নাপান করিতে চান দিয়া হাথ নাড়া॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি।
কৌতুকে পরিল দেবী অপূর্ব কাঁচলি॥" (রূপরাম/৯৭)

নারীরা কানে কুণ্ডল ও নাকে বেশর পরত—

"কানে পরে কুণ্ডল কনককাটা কড়ি।
পরিল বেসর নাকে বেশ হইল বড়ি॥" (ঘনরাম/১১০)

আবার ঘনরামের কাব্যে 'কানড়ার স্বয়ম্বর পালা'য় কানড়ার সাজসজ্জায় বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। যেমন—

"কন্যার কারণে দিল কত অলঙ্কার।
হীরা মণি মুকুতা মণ্ডিত হেমহার॥
কনককিঙ্কিণী কত কঙ্কণ কেয়ূর।
সুচিত্র সুন্দর ধূপ সুরঙ্গ সিন্দূর। (ঐ/৪১৫)

বিবাহকালে নানা রকম অলঙ্কার বা গহনা যৌতুক দেওয়া হত। পার্বতী কানড়ার বিবাহে অঙ্গুরীয় যৌতুক দিয়েছে-

"ভবানী যৌতুক দিল মাণিক অঙ্গুরী।
হাথে হাথে সঁপি দিল কানড়া সুন্দরী॥" (রূপরাম/২৫৯)

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রকার প্রসাধন সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা— তেল, আমলকি, হরিদ্রা, চন্দন, কুমকুম, কাজল, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গলের 'আখড়া পালা'য় দেবী ভবানীর রূপচর্চার প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য–

"নয়নে অঞ্জন দিল কপালে সিন্দূর।
দরশনে রবির কিরণ গেল দূর॥
তার কোলে দিল যদি চন্দনের রেখা।
প্রথম উদয় যেন কুমুদের সখা॥
কজ্জলের বিন্দু কিবা দিল তার কোলে।
নব জলধর ছটা বিষ্ণুপদতলে॥" (ঐ/৯৭)

বাঙালী নারীরা চোখে কাজল ব্যবহার করত—

"কজ্জলে কুরঙ্গ আঁখি করিল শোভন।
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভরণ॥" (মানিকরাম/৪০০)

বাঙালী নারীরা আমলকি , হরিদ্রা, চুয়া চন্দনে অঙ্গ মার্জ্জনা করত, তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার তেল, গন্ধদ্রব্য, অগুরু ইত্যাদি ব্যবহার করত। নারায়ণ তেল মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত একটি গন্ধ তেল; প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই নারায়ণ তেল ব্যবহারের কথা পাই। বাঙালী অভিজাত ঘরের রমণীরা প্রসাধন বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যেমন রঞ্জাবতীর লাসবেশ ধারণকালে সজ্জা—

"বয়স-গরবে বেশ নানা পরিপাটি।
সমুখে যোগায় দাসী সিন্দূরের বাটি।
নারায়ণ তৈল চুয়া চঞ্চল চিরণি।
অলঙ্কার বসন গলায় গজমণি॥
লাসবেশ করে রঞ্জাবতী বিদ্যাধরী।
কুন্তলে চিরণি দিয়া বান্ধিল কবরী॥
রসের খোপনা দিয়া বান্ধিল সুন্দর।
প্রফুল্ল সুবর্ণ চাঁপা তাহার উপর॥" (রূপরাম/৭০)

বাঙালী রমণীগণ নানা ছাঁদে বেণী, খোঁপা বা কবরী নির্মাণ করত। কবরীতে জড়াত নানান সুগন্ধি ফুলের মালা, তাছাড়া বাঙালী রমণীগণ ফুলের মালা ও পাতার নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করত। রূপরাম, ঘনরাম ও মানিকরামের কাব্যে এরকম বিবরণ পাই। যেমন—

"আঁচাড়িয়া চাঁচর চিকুরে চিত্র বেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টালনি॥
কবরী মণ্ডিত মাল্যে মনোহর ফুলে।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রম অলিকুলে॥
পিঠে লোটে পট্টজাদ পুরটের ঝাঁপা।
সারা গায় গন্ধময় গন্ধরাজ চাঁপা॥
দোসূতি তেসূতি পুঁতি হেম কণ্ঠমাল।

কিয়াপাতে গলায় গরব করে ভাল॥

.. . .

রতন মুকুরে রাণী দেখে মুখছবি।

কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি॥" (ঘনরাম/১১০)

কেশ বিন্যাস ও প্রসাধনের অন্যতম উপকরণ হল আয়না, চিরুণী। যেমন মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে 'বারুইপাড়া পালা'য় নয়ানী নাম্মী নারীর সাজসজ্জার বিবরণ–

"চিরুনীতে চিরিয়ে চিকুর বন্ধ কৈল।

তেহেরি চাঁপার মালা তায় বেড়াইল॥

মুকুর হেরিয়ে করে মুখের মার্জন।

সুভালে সিন্দুর ফোটা সুরঙ্গ শোভন॥" (মানিকরাম/২২৮)

সাজসজ্জার উপকরণ টোপর বা মুকুট নির্মাণ একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। কারুকার্যময় সোনার টোপর ছাড়াও শোলার তৈরী টোপর বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হত। দরিদ্ররা সোনা-রূপা মণিরত্নময় অলঙ্কার-গহনা ব্যবহার করতে পারত না। তারা মূলত ফুল, পাতা ও শোলার অলঙ্কার ব্যবহার করত। যেমন ভাজন বুড়ির সাজসজ্জার জন্য গঠিত অলঙ্কারের বিবরণ—

"নিজালয়ে মালিনী শোলার ঝাঁপা গড়ে।

হেন বেলা ভাজনবুড়ী পায় গিয়া পড়ে॥

... ...

একে সে মালীর মেয়্যা তায় দিল কড়ি।

শোলার গঠন দিল অলঙ্কার চুড়ি॥

ধরিল কমল করে কাতা খরস্যান।

ধীরে ধীরে শোলা গড়ে কুন্দের নির্মাণ॥

টাড় বালা পাসুলি বউলি করে সজ।

গড়িল শোলার শঙ্খ সাক্ষাত কবজ॥" (রূপরাম/১৬৩)

মধ্যযুগে এক শ্রেণীর নারীর স্থূল রুচি ও বিকৃত সাজসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। অধোপথগামী দরিদ্র নারীরা বিকৃতভাবে সেজে দেহ ব্যবসায় নেমে যেত। ভাজন বুড়ি ধর্মমঙ্গলের একটি চরিত্র, যার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধার ইতরতা প্রকাশিত। ঘনরাম লিখেছেন—

"মালিনী বলেন সাজ হয়ে গেল আচ্ছা।

উলুবন হতে যেন বার হল পেঁচা॥" (ঘনরাম/২৮৪)

আবার কালু ডোম, তার স্ত্রী সনকা ও লখ্যা ডোমনী, কিংবা শাকা-শুখার স্ত্রীদের সাজসজ্জা অতি সাধারণ, কবি সাধারণভাবেই সে বর্ণনা করেছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, প্রসাধনের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের একটি লোকায়ত দিক আত্মপ্রকাশ করছে।

বাদ্যযন্ত্র ঃ বাদ্যযন্ত্র বাঙালীর সংস্কৃতি তথা সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়েছে তার তালিকা তৈরী করা যেতে পারে। ধর্মমঙ্গলে বোধহয় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সব চাইতে বেশি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র বা 'তত', চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র বা 'আনদ্ধ', ধাতু বা বাঁশ নির্মিত ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বা 'সুষির' এবং ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বা 'ঘন' সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার আছে ধর্মমঙ্গলে। ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল–সপ্তস্বরা, যন্ত্র, মাদল, মৃদঙ্গ, মুরজ,

কাড়া, পড়া, ঢাক, ঢোল, বীরকালী, ছাপড়, খঞ্জরী, কাহাল, মুহরী, সানাই, শঙ্খ, ভুরঙ্গ, তুরী, ভেরী, দামামা, শিঙ্গা, কাঁসি, মন্দিরা, খঞ্জ, মুচঙ্গ, ঝাঁঝড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে বোধ হয় দু'ভাবে দেখা যেতে পারে— উৎসব-অনুষ্ঠানে, যথা— বিবাহ, পূজা-পার্বণে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এবং যুদ্ধকালে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও যুদ্ধায়োজন ছাড়া আমোদ-প্রমোদে বাদ্যযন্ত্র ছিল অঙ্গ বিশেষ। নৃত্যগীত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে রাজসভা, দেবসভা, জনসভা উৎসব মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায় মধ্যযুগের কাব্যে। মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে হীরা নটিনীর নৃত্যগীত উল্লেখযোগ্য। রূপরামের কাব্যে দেবসভায় নর্তকী অম্বুবতীর নৃত্যগীতের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন—

"দণ্ডবত প্রণাম জুড়িয়া দুই হাত।
নাচিতে লাগিল নটী সভার সাক্ষাত॥
রূপ দেখ্যা মদন কোকিল করে চুপ।
বীণা রাখ্যা নারদ দেখিল তার রূপ॥
বাজে খোল করতাল মন্দিরা মধুর।
তালে মানে নাচে নটী চরণে নূপুর॥" (রূপরাম/১৫)

আবার ইছাই ঘোষের পার্বতী পূজায় বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"বাজিছে বিবিধ বাদ্য জয় জয় রোল।
শিঙা কাড়া কাঁসর দগড় ঢাক ঢোল॥
কাঁসি করতাল বাঁশী মুরজ মাধুরী।
মৃদঙ্গ মাদল ডম্ফ জগঝম্প ভেরী॥
গমক খমক আদি শঙ্খ সপ্তসুরা।
মোহন মন্দিরা বাঁশী ডিণ্ডিম ঝাঝরা॥
সুপদ্য দুন্দুভি বাদ্য দেববাদ্য যত।
বেণু বীণা বিশাল বিনোদ বাদ্য কত॥
ঘোর ঘণ্টা করতাল সুরসাল বাজনি।
ডমুরীর শব্দ শিব শঙ্কর ভবানী॥" (ঘনরাম/৫১৪-১৫)

বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বাঙালী হিন্দুসমাজে একটি প্রাচীন রীতি। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে কলিঙ্গার বিবাহকালে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়েছিল তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন কবি-

"খমক খঞ্জরি তুরি ভেরী ঢাক ঢোল।
মার্দ্দল মরুজা বাজে মৃদঙ্গের বোল॥
সানি শঙ্খ মুচঙ্গ ভুরঙ্গ বীণা বাঁশি।
কাঁসর দগড় আর কাড়া পড়া কাঁসি॥" (মানিকরাম/৩৪৬)

কিংবা হীরা নটীর নৃত্য পরিবেশনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি উল্লেখযোগ্য, যেমন—

"নাচে নটিনী হীরা নটিনী হীরা।
সুতান সুযন্ত্র সুচঙ্গ কর্য়া॥
ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘুনুনু বাজে।
অম্বুজলোচনে বঙ্কিম সাজে॥
খোল করতাল খঞ্জরী তুরী।

মুরুজা মঙ্গল ভূরঙ্গ ভেরী॥
বাজে অনিবার তাথেই নাদে।
রুনুনু ঝুনুনু নূপুর পদে॥" (ঐ/৩৬৩)

ঢাক, ঢোল, শিঙ্গা বহুল ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র। ঢাক ও ঢোল পশুর চামড়া আবৃত বাদ্যযন্ত্র। বিবাহ, বিজয়- উৎসবে, পূজা-পার্বণে ঢাক ও ঢোল বাজানো হত। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন পশ্চিম উদয়ের জন্য শালেভর দিতে গেলে হরিহর বাইতিকে ঢাক বাজাবার জন্য নেওয়া হয়েছিল। আবার মহামদের উদ্যোগে গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার আয়োজন করে তখন—

"নানা বর্ণে বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।
ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া বাজে রাত্রিদিনে॥" (রূপরাম/২৯৫)

শঙ্খ বাদ্যযন্ত্র হিসাবে অতি পবিত্র। শঙ্খনাদের সঙ্গে বাঙালীর মাঙ্গলিক বিষয়ের সম্পর্ক। পূজা-পার্বণে, বিবাহে, নবজাতকের জন্মে শঙ্খধ্বনি করা মঙ্গলজনক বলে বিবেচিত হত। লাউসেনের জন্মকালে শঙ্খধ্বনি সহকারে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল—

"এত যদি বলিল দিনের দিবাকর।
ভূমিষ্ঠ হইল বালা তেজিয়া জঠর॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ময়না ভুবন।
সয়াল দেখিয়া শিশু জুড়িল রোদন॥" (ঐ/৭৬)

এছাড়াও বাঙালী সমাজে যে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল তা লক্ষ করা যায় ধর্মমঙ্গলে। তবে সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধবিগ্রহকালে, বিজয় উৎসবে রণবাদ্য বাজানো হত। মঙ্গলকাব্যে প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র যুদ্ধযাত্রাকালে বা বিজয় উৎসবে বাজানোর কথা পাওয়া গেলেও রণবাদ্য হিসাবে মূলত কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা— ঢাক, ঢোল, দামামা, ভেরী, কাঁসি, রণদামামা, শিঙ্গা, রণশিঙ্গা, টমক, টেমাই, কাড়া, নাকাড়া, ধামসা, দুন্দুভি, ডম্বরু ইত্যাদি। ধর্মমঙ্গল যেহেতু বীর রসের কাব্য তাই যুদ্ধবিগ্রহে ভরপুর। ঘনরামের কাব্যের 'পশ্চিম উদয় আরম্ভ' পালায় লাউসেনের চাঁপাই অবস্থানকালে মহম্মদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে ময়নাগড় আক্রমণ করে। তারই চিত্র আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন প্রকার রণবাদ্য বাজানোর মধ্যে দিয়ে—

"পাত্র দিল হুকুম সাজিতে সেনাগণে।
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘনে॥
সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় শুধু সাড়া।
ডিগি ডিগি দগাড়ি সঘনে পড়ে কাড়া॥
ধাও ধাও ধামাসা দামামা দাম দুম।
শিকারে ময়নামহী সাজিতে হুকুম॥" (ঘনরাম/৫৮১-৫৮২)

সুতরাং বলা যায় বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে বাদ্যযন্ত্র সামাজিক ইতিহাসের অঙ্গ।

শিল্পকর্ম ঃ মানুষ সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে আপন কার্যে লাগিয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই। এর মধ্যে দিয়ে মানুষ যেমন সৌন্দর্যঅন্বেষু মনের পরিচয় দিয়েছে তেমনি আপন প্রয়োজনকেও মিটিয়েছে। বাংলার শিল্পবস্তু, বাংলার কুটীরশিল্প বাঙালীর অহংকার। শিল্পকর্মের মধ্যে পড়ে যেমন— গহনা বা অলঙ্কার শিল্প, সূচী শিল্প, বাঁশ-বেত ও তালপাতার নির্মাণ কার্য, শোলার কাজ ইত্যাদি। কুটীরশিল্প হিসাবে গহনা শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য, অলঙ্কার প্রিয় বাঙালী সোনা, রূপা, মণি, মুক্তা খচিত গহনা নির্মাণ করত। মঙ্গলকাব্যে বিচিত্র অলঙ্কারের উল্লেখের মধ্যে দিয়ে

এই পরিচয় পাওয়া যায়। সূচীশিল্প বাংলাদেশে অতি বিখ্যাত ছিল, বাঙালী রমণীগণ সুঁই সুতার সাহায্য চিত্রবিচিত্র নক্‌শীকাঁথা নির্মাণ করত। সূচী কর্মের পরিচয় আছে দেবীর কাঁচুলি নির্মাণ অংশে। শিল্পীরা রঙবেরঙয়ের সুতার সাহায্যে লতা-পাতা-ফুল-পাখি-জীবজন্তু এমন কি বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীর ছবি আঁকত। এর মধ্যে দিয়ে তাদের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।যেমন–

"কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচলির ছাঁদা।
চাইতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা॥" (ঐ/১৫১)

গ্রামীণ বাঙালীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের কাজ করত, ডালা, কুলা, ধুচুনি, নির্মাণ করত। এগুলি নিশ্চয় শিল্পবস্তু হিসাবে গণ্য হতে পারে। কালু ডোমের ঘরের নারীরা ডালা, কুলা, ধুচুনি, শীতলপাটি, তালপাতার পাটি নির্মাণ করে। শোলার কাজ অন্যতম কুটীরশিল্প, অলঙ্করণযুক্ত শোলার টোপর, এমন কি গহনা তৈরীর কথা মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়। এছাড়া ফুলের মালা, পাতার গহনা সাজসজ্জায় অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হত। এগুলিকেও শিল্পবস্তু বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া তাঁতি বস্ত্র তৈরী করত। বাংলার ঘরে ঘরে চরকায় সুতা কাটা হত, ভাজন বুড়ি চরকায় সুতা কাটত বলে উল্লেখ আছে। বাংলার তাঁতিদের তৈরী বস্ত্র কত উন্নত ছিল তার প্রমাণ আছে, ধর্মমঙ্গলে 'গুয়াবুটি' শাড়ীর উল্লেখ পাই, তার কোমলতা ও সূক্ষ্মতা সুবিদিত ছিল। কুমাররা মৃৎশিল্পে নিযুক্ত থাকত। বাংলার মৃৎশিল্পে পোড়ামাটির কাজ কত উন্নত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার অন্যান্য অংশের সঙ্গে রাঢ়বঙ্গও যে শিল্পকর্মে উৎকর্ষলাভ করেছিল ধর্মমঙ্গলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

যানবাহন ঃ অতঃপর আসি যানবাহনের কথায়। মধ্যযুগে বাঙালী সমাজে যে সমস্ত যানবাহন ব্যবহার হত তার মোটামুটি পরিচয় আছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে। যাতায়াত ও পরিবহনের কার্যে যানবাহন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। মধ্যযুগে যানবাহন ব্যবস্থা ছিল একেবারেই অনুন্নত। প্রধানত পায়ে হেঁটেই মানুষ যাতায়াত করত। তাই আমরা দেখতে পাই লাউসেন কর্পূর সহকারে পায়ে হেঁটেই ময়না থেকে গৌড় এসেছে, ইন্দামেটে বা অন্যান্য দূতরা পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেছে। পশুর পিঠে আরোহণ করে যাতায়াত করাও প্রাচীন পদ্ধতি, প্রধানত ঘোড়া, হাতি, মহিষের পিঠেই যাতায়াত ও মাল পরিবহন চলত। যুদ্ধযাত্রায় সৈনিকরা হাতি, ঘোড়া বাহন হিসাবে ব্যবহার করত। কামরূপে যুদ্ধ করতে গিয়ে কামরূপরাজের হাতি, ঘোড়া, উট, গাড়ি দেখে কালু ভয় পেয়েছে–

"কত ঠাঁই হাতী ঘোড়া উঠ গাড়ী থানা।
কালু বলে কিরূপে কাণ্ডুরে দিব হানা॥" (ঐ/৩৮০)

দূরবর্তী স্থানে গমন ও যুদ্ধযাত্রায় পশুকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হত মধ্যযুগ ও অনেক আধুনিক কাল পর্যন্ত। যানবাহনগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করে নিলে দেখা যায়, স্থলযান ঘোড়ার গাড়ী, মহিষের গাড়ী, গরুর গাড়ী, রথ, দোলা বা চতুর্দোল বা পালকী এবং জলযান তরণী বা নৌকা, ডিঙি নৌকা, ভেলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। রূপরামের কাব্যে পাই রঞ্জাবতীর বিবাহের পর কর্ণসেন বলদ-শকট বা গরুর গাড়ী চেপে ময়নাগড় যাত্রা করেছে—

"বলদ-শকটে ধন নিলেক তুলিয়া।"
ধাইল দক্ষিণমুখে মেলানি মাগিয়া॥" (রূপরাম/৩৫)

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তের কাব্য ধর্মমঙ্গলেও রথের ব্যবহার দেখা যায়। ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে বর দিতে এসেছে রথে চড়ে—

"মনুহরে বর দিয়া ধর্মের পয়ান।
চাঁপাই-র সমুখে রাখিল রথখান॥" (ঐ/৬৩)

মঙ্গলকাব্যে যে যানটির ব্যবহার সবচাইতে বেশী সেটি হল দোলা বা চতুর্দোল ও পালকী। বেহারারা কাঁধে করে পালকী বা দোলা বহন করত, ধনীরা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত এবং বিবাহে চতুর্দোল ব্যবহার করত। রূপরামের

কাব্যে দেখি কর্ণসেন ময়না থেকে গৌড় যাত্রা করেছে দোলায়- চেপে--

"গোউর শহরে যাত্যে বাড়াইল পা।
দোলার উপরে সেন হেলাইল গা॥" (ঐ/৩৭)

লাউসেন কলিঙ্গাকে বিবাহ করার পর চতুর্দোলে চড়ে দেশে যাত্রা করেছিল—

"দাসদাসী বেষ্টিত হরিষ হালাহোলে।
বরকন্যা চাপিয়া চলিল চতুর্দোলে॥" (ঘনরাম/৪০৭)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে জলযান নৌকা বা তরণী এবং ভেলার ব্যবহার হত। নৌকা আবার দু'প্রকার হত—বড় নৌকা বা তরণী এবং ডিঙি। ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতী ও লাউসেন চাঁপাই যাত্রা করেছিল নৌকায় চেপে—

"সাবধানে তরণী বাহিল দারিকেশ্বর।
চাঁপাই ভুবনে পাইল এ দুই প্রহর॥" (রূপরাম/৫৫)

ঘনরামের কাব্যে ইছাই বধ করতে গিয়ে কালুর সঙ্গে লোহাটাবজ্জরের প্রথম সংগ্রাম হয়েছিল নৌকায়। ধর্মমঙ্গলে ভেলার ব্যবহার আছে। ইছাই বধ করতে গিয়ে কালু দুর্দান্ত অজয় নদ ভেলায় হেলায় পার হতে চেয়েছে—

"ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁফালে হব পার।" (ঘনরাম/৪৮৯)

আকাশযানের ব্যবহার মধ্যযুগে সম্ভবত ছিল না, কিন্তু কবির কল্পনায় আকাশযান অসম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের সাহিত্যে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবদেবীগণ সুদিব্য বিমানে আকাশ পথে চলাফেরা করত। এটা নিছক কবির কল্পনা মাত্র, বাস্তব নয়।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ এবার আসা যাক্ সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায়। বাঙালী চিরকাল অদৃষ্টবাদী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাঙালী মাত্রই অদৃষ্টবাদী। ধর্মমঙ্গল কাব্য এই অদৃষ্টবাদী বাঙালী মনোভাবের পরিচয় বহন করে। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণসেনের ধনেপুত্রে নাশ হয়, ফলে কর্ণসেন সংসার বিবাগী হয়ে পড়ে। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে প্রবোধ দেয় এই বলে—

"দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥" (ঐ/৬৯)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের পরাজয়, অক্ষমতা, অকর্মণ্যতা মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে তোলে। ধর্মমঙ্গলে তাই দেখা যায় সর্বস্ব হারিয়ে বৃদ্ধ কর্ণসেন মনে করে—

"অসার সংসার দেখি কৃষ্ণ বড় ধন।
কৃষ্ণভক্তি বিনে কিবা রাজসিংহাসন॥" (রূপরাম/৩০)

গ্রহ, নক্ষত্র, তিথি, বার ইত্যাদি চিরকাল বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। বিভিন্ন ধরনের পৌরাণিক-অপৌরাণিক মিথ ও বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়েছে রাঢ়বাসী বাঙালীর জীবন। বার দোষ. গ্রহ, নক্ষত্র, তিথিগত দোষ ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল—

"মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশা দোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয়॥" (ঘনরাম/৬৮)

—এই দশা অবশ্য গ্রহের দশা। শনি গ্রহ সম্পর্কিত মিথ আমাদের গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে সংস্কারগ্রস্ত করে তোলে। তাইতো দৈবের দোষে নদীর জল বাড়ে—"দৈববলে বাড়ে নদী কূলকূল শব্দে।" (ঘনরাম/৬৬)। আর মহামদ বহুকাল নদীর তীরে অবস্থান করার পরও নদীর জল না কমায় অমঙ্গল সূচক সিদ্ধান্ত করে। কবি লিখেছেন—

"উঠে এল মহাপাত্র ভাবি অমঙ্গল।" (ঐ/৮০)

তাছাড়াও আছে শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি পশুপাখি-কেন্দ্রিক সংস্কার। সময় বিশেষে পশুপাখি দর্শন, পশুপাখির ডাক শ্রবণ শুভ বা অশুভ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। যেমন— যাত্রাকালে বা পথে চলতে মাথার উপর কালপেঁচা ডাকা, শৃগাল-কুকুর আর্তনাদ করা, শকুনি-গৃধিনী উড়ে যাওয়া এবং গায়ে পড়া, তারাখসা দেখা অশুভ। মহামদ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিমূল রাজ্য আক্রমণ করলে ঐ সমস্ত কু-লক্ষণগুলি দেখতে পায় বলে তার যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। মানিকরাম লিখেছেন—

"পথে কত অমঙ্গল দেখে পৃথ্বীধর।
কাল পেঁচা ডেকে বুলে মাথার উপর॥
শৃগাল কুকুর কান্দে উভু কর্যা গলা।
আচম্বিত খসিয়া পড়িল মেঘমালা॥
শকুনী গৃধিনী পক্ষ খাতা খাতা উড়ে।
পাক মের্যা পাখায় রাজার গায় পড়ে॥" (মানিকরাম/৩৭৭)

শুধু কি তাই, যাত্রাকালে মাথায় চাল ঠেকা অমঙ্গল; বাম দিকে কালসর্প দেখা, সম্মুখে আগুন জ্বলতে দেখা, ধোপাকে কাপড় ধুতে নিয়ে যেতে দেখা, চলতি পথে শৃগাল বাম দিক থেকে রাস্তা অতিক্রম করে ডান দিকে যাওয়া অমঙ্গলসূচক। ইছাই ঘোষ লাউসেনের সঙ্গে যুদ্ধ যাত্রাকালে নিম্নলিখিত অমঙ্গলসূচক চিহ্নগুলি দেখতে পায়—

"জাত্রাকালে য়মঙ্গল পড়ে কত আর।
ঘরে হইতে বাহির হইতে মাথে ঠেকে চাল॥
বামে কালসর্প দেখে সমুখে য়ানল।
সন্যকুম্ভ দেখে বির যাত্রা য়মঙ্গল॥
রজক ধুইতে বস্ত্র আগে লঞা যায়।
বামেতে শ্রীকাল আসি দক্ষিনে কাটায়॥
হেন সব য়মঙ্গল দেখে নিরন্তর।
কিছুই নাহিখ মানে ইছাই কোঙর॥" (ময়ূরভট্ট/৯৩)

সুতরাং ইছাই ঘোষের জয়লাভ করা সম্ভব হয়নি। পশুপাখির ডাক অনেক সময় মঙ্গল-অমঙ্গলকে বহন করে। লাউসেন, কর্পূর গাছতলায় রাত্রিযাপন করে শেষ রাতে অমঙ্গলসূচক কালপেঁচার ডাক শুনতে পায়—

"কাল পেঁচা ডাকে সব অবসান রাতি।
এহার লক্ষণ জানি লেই দণ্ড ছাতি॥" (রূপরাম/১৮২)

আবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-কেন্দ্রিক সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল। যাত্রাকালে পুরুষের বাম অঙ্গ স্পন্দন এবং নারীর ডান অঙ্গ স্পন্দন অশুভ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এসবের প্রতি বাঙালীর এক জাতীয় বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধযাত্রার আগে শাকা-শুকার বাম অঙ্গ স্পন্দিত হয়, তাই যুদ্ধে তাদের মৃত্যু হয়। নটী অম্বুবতী নৃত্যের জন্য দেবসভায় যাত্রাকালে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি ঘটে—

"মাথায় ঠেকিল চাল ঘর বাহিরিতে।
বসন বাধিল পায় ডানি আঁখি নাচে।
নটী বলে আমার কপালে কিবা আছে॥" (ঐ/১৫)

আবার দেবতারাও মানুষের মত স্পন্দন চরিত্র মেনে শুভাশুভ বিচার করে, লাউসেনের বিপদের আগেই ধর্মঠাকুর অশুভ ইঙ্গিত পায়, তার বাম অঙ্গ নাচে—

"দশনে অধর কাঁপে কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি মনে মান ভঙ্গ॥" (ঘনরাম/৩২৫)

শুধুমাত্র এগুলিই নয়, মানুষকে কেন্দ্র করেও এ জাতীয় সংস্কার-বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। যাত্রাকালে প্রজননে অক্ষম ব্যক্তি বা সন্তানহীন ব্যক্তির মুখদর্শন অশুভ বলে বিবেচিত হত, তাইতো ধর্মমঙ্গলে সকল পুত্রের মৃত্যুর পর কর্ণসেন আঁটকুড়া বলে চিহ্নিত হয়, রঞ্জাবতী আঁটকুড়া বদনাম ঘোচানোর জন্য ধর্ম উপাসনা করে। বলা চলে ধর্মমঙ্গলে এই বিষয়টি একটা বড় জায়গা দখল করে আছে। সুতরাং রাজা হরিশ্চন্দ্রও বুঝতে পারে—

"আটকুঁড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায়।" (ঐ/২৯)

সকল পুত্রের মৃত্যুর পর কর্ণসেনের মনে হয়—

"কর্ণসেন বলে হায় আর হবে নারী।
আঁটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী॥" (ঐ/৬৯)

বন্ধ্যা রমণী দর্শন এবং আঁটকুড়া পুরুষ দর্শন অশুভ বলেই মহামদ কর্ণসেনকে আটকুঁড়া এবং রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলে গালি দেয়। কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে বলে—

"মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা॥" (ঐ/৮৪)

আবার সকলই অশুভ নয়, কিছু কিছু শুভকর সংস্কার-বিশ্বাস ছিল। মঙ্গলকাব্যে তার প্রচুর উল্লেখ আছে। যেমন পূর্ণকুম্ভ, সবৎসা ধেনু, পতিতা দর্শন পূণ্যকর্ম ও শুভজনক বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। সুরিক্ষা তাই লাউসেনকে কামনা করলে লাউসেন বলে—

"দারীর দর্শনে পূণ্য স্পর্শে মহাপাপ॥
শ্মশানকুসুম সম বর্জ্জনীয়া বেশ্যে।" (ঐ/২৯২)

আবার দেখি, লাউসেন কর্পূরকে উপদেশ দিয়েছে—

"শাস্ত্রসিদ্ধ কথা ভাই কহি সুপ্রলাপ।
নটিনী দরশনে পূণ্য গমনে সে পাপ॥" (মানিকরাম/২৪৯)

খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার করার কথাও বাঙালী সমাজে সুলভ। মাস, বার, তিথি ইত্যাদি বিচার করে কোন্ কোন্ খাদ্য কখন ভক্ষণ করা উচিত তার নিয়ম সমাজে প্রচলিত ছিল। ধর্মদেব রঞ্জাবতীকে পুত্রবর দেয়, কিন্তু লাউ ভক্ষণে নিষেধ করে—

"লাউ নাঞি খায়্য রঞ্জা লাউ নাঞি রুয়্য।
পুত্র হৈলে নাম তার লাউসেন থুয়্য॥" (রূপরাম/৬৬)

খাদ্যাখাদ্য ছাড়াও বিভিন্নক্ষেত্রে নানা সংস্কার ও বিধিনিষেধ পালিত হত, নারী পুরুষ নির্বিশেষে এগুলি পালিত হত, মনে করা হত এগুলি যথাযথভাবে পালিত না হলে ক্ষতি হতে পারে।স্থানাশ্রয়ী বিশ্বাসও আছে; বাঙালী সমাজে দেবস্থান, তীর্থস্থানের অপার মহিমার কথা সুবিদিত। ধর্মমঙ্গলে দেখতে পাই ধর্মসেবকদের কাছে চাঁপাই অত্যন্ত পূণ্যস্থান। তাই বলা হয়েছে—

"তুমি এক মনে পূজা কর নিরঞ্জন।
তীর্থচূড়ামণি এই চাঁপাই ভূবন॥" (ঐ/৫৬)

গয়া ও কাশী বাঙালী হিন্দুর কাছে অতি পবিত্র স্থান, সেখানে পিণ্ডদান করলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি হয়, তাই ইছাই-র মৃত্যুর পর পার্বতী গঙ্গাসাগর সঙ্গমে অস্থি বিসর্জ্জন দেয়—

"দাহন করিল মাতা বেদের বিধানে।

অস্থি পাঠাইলা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥" (ঘনরাম/৫৪৪)

গঙ্গাজলের গুণাগুণ বিচার করে বাঙালী হিন্দুর কাছে গঙ্গাজল অতি পূণ্য ও পবিত্র ছিল। পূজা-পার্বণে তাই গঙ্গাজল অপরিহার্য বলে বিবেচিত হত। রঞ্জাবতী চাঁপাইয়ে ধর্ম সেবার সময় শত ভার গঙ্গাজল নেয়—

"পুরট কলসে শত ভার গঙ্গাজল।

পূজা শেষে ভকিতা করিতে চায় ফল॥" (রূপরাম/৫৪)

শুধু কি তাই, গোবর পর্যন্ত পবিত্র বলে বাঙালী হিন্দুর বিশ্বাস। তাই পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সেই স্থান গোবর দ্বারা পবিত্র করে নেওয়া হত—

"কপিলার গোমএে পবিত্র কৈল মাটি।

তিন বার চন্দনের দিল ছড়া ঝাঁটি॥" (ঐ/৫৬)

আশীর্বাদ বা অভিশাপের কথাও বলা যেতে পারে। দেবতার আশীর্বাদ লাভের কামনা খুব স্বাভাবিক। দেবতার আশীর্বাদ, গুরুজনদের আশীর্বাদ পরম ফলদায়ক। পিতামাতা বাঙালীর কাছে দেবতুল্য বিবেচিত হয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণও বাঙালী হিন্দুর কাছে দেবতুল্য। সুতরাং দেবতা, ব্রাহ্মণ, পিতামাতার আশীর্বাদ সন্তানের পরম কাম্য। কখনো সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করে, কখনো পুত্রসন্তান, ধনসম্পদ লাভের জন্য, কখনো নীরোগ শরীর কামনা করে, কখনো এয়োতি লাভের কামনায় আশীর্বাদ করা হত। প্রসঙ্গত, এই জাতীয় বিশ্বাস যে বর্তমানে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে তা নয়।

বাঙালী হিন্দু সমাজে পতি নারীর কাছে দেবতুল্য, সুতরাং স্বামীর আজ্ঞাবাহী হওয়া নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তাই চাঁপাই যাত্রার আগে রঞ্জাবতী স্বামীর অনুমতি চেয়ে নিয়েছে—

"চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে॥

সাক্ষাৎ দেবতা তুমি আজ্ঞা নাহি দিলে।

প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে॥" (ঘনরাম/৮৯)

পিতামাতা সন্তানের কাছে দেবতুল্য, আর তাদের আশীর্বাদ সন্তানের পাথেয়। পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। তাই রঞ্জাবতী লাউসেনের গৌড় যাত্রাকালে আশীর্বাদ করে—

"আশিস করিনু আমি যদি হই সতী।

সতত করুন রক্ষা শ্রীধর্ম সারথি॥" (রূপরাম/১১৮)

দেবতার আশীর্বাদ চিরকাল কাম্য, মঙ্গলকাব্যের কবি দেবতার কাছে আশীর্বাদ কামনা করত. সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে আশীর্বাদ কামনা করত। ধর্মমঙ্গলে সন্ন্যাসী মদনাকে আশীর্বাদ করেছে, যেমন—

"সন্ন্যাসী চরণ বন্দে লোটায়া অবনী॥

প্রভু কন পূর্ণ হকু মনের বাসনা।" (ঘনরাম/৩৫)

বাঙালী নারীর কাছে বৈধব্য যন্ত্রনা বিশেষ; তাই এয়োস্ত্রী থাকার কামনা সমাজমানসে নিহিত ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ এয়োতি কামনা করা হত, তাই কানড়ার বিবাহে চণ্ডী মাতৃভাবে কানড়াকে আশীর্বাদ করে। যেমন—

"আশিস্ দিলেন চণ্ডী বাড়ুক আয়ত।" (মানিকরাম/৪০০)

স্বামী স্ত্রীর নিকট গুরুজন, তাই স্বামী স্ত্রীকে আশীর্বাদ করতে পারে। কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে পুত্রবতী হওয়ার আশীর্বাদ করেছে—

"পুত্রবতী হও প্রিয়ে আশীর্ব্বাদ বলে।" (ঘনরাম/১০৫)

মানব জীবন নিরঙ্কুশ নয়, সুতরাং আশীর্বাদের পাশাপাশি অভিশাপও দেওয়া হত। কখনো স্বল্পায়ু জীবনের অভিশাপ, কখনো সবংশে নাশ হবার অভিশাপ দেওয়া হত। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের গোড়ায় এক জাতীয় অভিশাপ

কাজ করেছে। দেবসভায় অভিশপ্ত করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দিয়েছে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী। ইহজীবন বিমুখ বাঙালীর কাছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পাপের ফল, তাই দেবতারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিত। বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা এক অভিশাপের মতই। কৌলীন্য প্রথা শাসিত বাঙালী সমাজ বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা নতুন বিষয় নয়, তার ফলও ছিল বিষময়। তাই দেবী অম্বুবতীকে অভিশাপ দেয়—

"লাগিল দেবীর গায়ে চরণের জল।
অভিশাপ দেন মাগ পেয়ে এই ছল॥
. . . .
বুড়ী বলে আমায় করেছ উপহাস।
বুড়া ভাতারের সেবা কর বারমাস॥
এক জন্ম মরে দেখ পুত্রের বয়ান।
এত বলি ঈশ্বরী হইল অন্তর্দ্ধান॥" (ঐ/২১)

এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংস্কার বিশ্বাস পালিত হত, যেমন— বাঙালী হিন্দু সমাজে ভাশুর ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক নিয়ে, শাশুড়ী-জামাতার সম্পর্ক নিয়ে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়েও বিভিন্ন নিয়ম-কানুন পালিত হত। ভাশুর ও ভ্রাতৃবধূর সম্পর্কে দেখা যায়, ভ্রাতৃবধূ ভাশুরের নাম গ্রহণ তো দূরের কথা মুখ পর্যন্ত দর্শন করত না; তার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য ছোঁয়া নিষিদ্ধ ছিল। দেবসমাজেও বাঙালী পালিত এই সংস্কার ছিল, তাই পার্বতী ব্রহ্মার জপমালা ও কাটারি দেখেই লজ্জায় পলায়ন করে—

"মালা দেখি চমকিত (হইল) হৃদয়।
বিস্ময় মানি (এ্যা) চণ্ডি রাজার আগে কয়॥
আমার ভাসুর ব্রহ্মা তার জপ্য মালা।
সম্মুখে রহিল দেখ য়াগুলি দুআরা॥
কেমনে ছুইএ্যা মালা হৈব বাহিরে।
রাখিতে নারিল য়াজি কহিল তোমারে॥" (ময়ূরভট্ট/৩৬)

আবার ভাশুরকে দেখে ভ্রাতৃবধূ ঘোমটা দিত, জামায়ের সম্মুখে এলে শাশুড়ী স্বাভাবিক নয়, কাজেই জামায়ের সম্মুখে এলে শাশুড়ীকে ঘোমটা দেওয়াই বিধি ছিল। দেবী পার্বতী অপত্য স্নেহে কানড়াকে লাউসেনের সঙ্গে বিবাহ দেয়, সম্প্রদান করে শিবঠাকুর, তাই লাউসেন সম্পর্কে দেবীর জামাই। তাই লাউসেনকে দেখে দেবী হলেও সে ঘোমটা দিতে ভোলেনি—

"আমার জামাতা তুমি কানড়ার পতি॥
ময়নার লাউসেন জানিল মরমে।
মাথায় বসন দিল জামাতা ভরমে॥" (রূপরাম/২৯০)

আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কেও একটা নিষেধের বাতাবরণ ছিল, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে মাথায় ঘোমটা দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তাই পার্বতী শিবঠাকুরকে দেখে মাথায় কাপড় টেনে দিয়েছে—

"শঙ্কর সমুখে দেবী লজ্জা পাল্য মনে।
হেঁটমুখে ঈশ্বরী বসিলা ততক্ষণে॥
মাথায় বসন দিল নিজ রূপ ধরি।" (ঐ/২৮৭)

স্বামী স্ত্রীর কাছে দেবতুল্য, সুতরাং স্বামীর নাম ধরা উচিত নয়। অনেক সময় শিক্ষিতা স্ত্রী বানান করে স্বামীর নাম বলত কিন্তু উচ্চারণ করত না, কিংবা প্রয়োজনে কাগজে লিখে জানাত। ধর্মদেব কলিঙ্গার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা

করলে কলিঙ্গা জানায়—

"বড়ই বিষম কর্ম্ম হইল এখন।
স্ত্রি হঞা স্বামির নাম করিব কেমন॥
জদি বা স্বামির নাম পুছিলা য়ামারে।
প্রবন্ধে য়ক্ষর তাতে কহিএ তোমারে॥
নোএ য়াকার মধ্যে উ সেন বোলান সেসে।
এই মোর স্বামির নাম সুনহ বিসেসে॥" (ময়ূরভট্ট/৮৪)

বাঙালী সমাজে বিশেষত নারী মহলে 'কিরাকাটা' বা দিব্য দেওয়া প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রঞ্জাবতী গৌড় থেকে প্রত্যাগত কর্ণসেনকে বিমর্ষ দেখে বলে—

"বিনয়ে বলিল রঞ্জা বেণুরায়ের ঝি।
আমার মাথার কিরা সমাচার কি॥" (রূপরাম/৩৮)

ঘনরাম অনুরূপ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"বাঘ বধ সত্য হয় শিরে হাত দেও।
কিরা করি গিরা তবে আলাইয়া লও॥" (ঘনরাম/২৪৮)

অশিক্ষিত, সামান্য শিক্ষিত মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে তুক্-তাক্, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, ঔষধীকরণ এসবের প্রতি এক জাতীয় সহজাত বিশ্বাস ছিল। এসবের মধ্যে দিয়ে বাঙালী সমাজের মৌল প্রবণতাটি বোঝা যায়। তন্ত্রচর্চা ও তান্ত্রিকতার প্রতি বিশ্বাসও মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে সুলভ ছিল। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে তান্ত্রিকতার একটা সম্পর্ক আছে। শুধু তাই-ই নয়, জাদুবিদ্যা ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বাঙালী আস্থাশীল ছিল, ধর্মমঙ্গল কাব্যে এর প্রয়োগ পাই। ইন্দামেটে লাউসেনকে চুরি করতে ময়নাগড় গিয়ে মন্ত্র পড়ে তান্ত্রিকতার সাহায্যে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। রূপকথার মধ্যে নিন্দালি দেওয়া বা ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করার কথা পাওয়া যায়। এই কাজে অবশ্য কিছু কিছু দ্রব্যগুণযুক্ত পদার্থ, শিকড়-বাকড়, লতা-পাতা, মাটি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। নিদ্রালি লাগানোর অর্থ হল মন্ত্র দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করা। চোর, ডাকাতরা মন্ত্রপূত ইঁদুর-মাটি নগরে ছড়িয়ে দিলে সেখানে যে যেই অবস্থায় আছে সে সেই অবস্থায় নিদ্রা যাবে এরকম বিশ্বাস ছিল। একার্যে এক জাতীয় মন্ত্রোচ্চারণ করা হত। মন্ত্রটি যে সকল সময়ে এক প্রকার হত তা নয়। অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হলেও দেবীর কাছে বর চেয়ে নেওয়া হত। দেখা যায় ইন্দামেটে লাউসেনকে চুরির আগে দেবী কালিকার পূজা করে বর চেয়ে নেয়—

"নগরে না হবে বিঘ্ন লাগিবে নিদুটি।
কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁদ কাটি॥" (ঘনরাম/১২৫)

সুতরাং সে মন্ত্রপূত করে 'ইন্দুর-মাটি' ছড়ায়। এখানে ব্যবহৃত মন্ত্রটি বেশ মজার—

বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুরমাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাঠি।
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর॥
আগম ডাকিনীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিদুটি॥
লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীর ভাগ॥

খাটে বাটে ভূমে পড়ে যেজন ঘুমায়
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায়॥
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদুটি নয়নে তার লাগে॥
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়।
কাঙ্গুরে কামিক্ষাদেবী চণ্ডীর আজ্ঞায়॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে শহরে সবার উঠে হাই॥" (ঐ/১২৬)

রূপরামের কাব্যে ব্যবহৃত নিদালি মন্ত্রটি কিন্তু একটু স্বতন্ত্র এবং দেখা যায় এখানে প্রয়োগগত কিছু কৌশলও আছে—

"পড়া মাটি সিঁদ্‌কাঠি যতনে লইয়া।
ময়না ঈশান কোণে উত্তরিল গিয়া॥
প্রথম নিন্দাটি দেই ময়না ভুবনে।
মহাবিদ্যা জপ করে হরষিত মনে॥
বাম হাথে নিল নিন্দা ইন্দুরের মাটি।
তিন বার পরশ করিল সিঁদকাঠি॥
... ...
শয়নে যেজন জাগে বস্যা যেবা খায়।
কালিকাদেবীর আজ্ঞা ধর গিয়া তায়॥
যুবতীর দুই চক্ষে দড় কর‍্যা ধর।
মনোজ-আগুনে তারা জাগে চারি পর॥
ইন্দুর-মৃত্তিকা তুমি আমি সিঁদাল চোর।
ময়নার ভিতরে পাড়িবে অঘোর ঘোর॥
ছ মাসের নিদ্রা যদি না আস্যে এথাই।
ভোজরাজার আজ্ঞা কুম্ভকর্ণের দোহাই॥" (রূপরাম/৮১)

মন্ত্রগুলির হয়ত কোন মূল্য নেই, কিন্তু প্রচলিত জলপড়া, তেলপড়ার মত মাটিপড়া এবং তার মন্ত্রোচ্চারণ লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বশীকরণ একটি বিশেষ তন্ত্রক্রিয়াগত সংস্কার; আসলে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে এসবের উৎপত্তি। বিবাহকালে জামাতা বশীকরণের ঔষধ করা একটি বিশেষ সংস্কার। কন্যার বিবাহে কন্যাকে অনিশ্চিত- অজানা জায়গায় পাঠানো হত সুতরাং কনের মাতা জামাতাকে বশীকরণের জন্য তুক্‌তাক্ করত আবার স্ত্রীও স্বামী বশীকরণের জন্য তুক্‌তাক ঔষধীকরণ করত যাতে স্বামী স্ত্রীকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখে। রূপরাম বর্ণনা করেছেন—

"আনিল মঙ্গল ঘট কুমারের বাড়ী।
বাড়ী বাড়ী তোলে শাক ব্যঞ্জন বেসারি॥
কেহ আনে গোমুণ্ড কাপাসবাড়ী হৈতে।
পাঁচ আয়ো জড় হয়্যা লাগিল পুতিতে॥
....

অনেক রচিল রামা ঔষধ বিধান।

বিবাহ বাসরে বড় মায়্যার নাপান॥" (ঐ/২২৭)

দেখা যাচ্ছে বরকে বশীভূত করার ঔষধ কখনো পানের সঙ্গে, কখনো খাবারের সঙ্গে খাওয়ানো হত। কখনো চোখের কাজলে, কখনো বা চন্দনের ফোঁটায় ঔষধ দেওয়া হত। এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। বাঙালী সমাজে শাশুড়ী, ননদ, সতীনের সঙ্গে নববধূর সম্পর্ক খুব ভাল থাকত না। সুতরাং কন্যা পীড়নের হাত থেকে রক্ষার জন্যই ছিল কন্যাপক্ষের যাবতীয় আয়োজন। রঞ্জাবতীর বিবাহে মন্থরা ঔষধ করলে রঞ্জার দিদি ভানুমতী জানায়—

"মন্থরা জননী যত্নে আনিল ঔষধি।

রাণী ভানুমতী রাখে মায়েরে প্রবোধি।

কি কাজ ঔষধি আর ঐ একেশ্বরী।

ননদী সতিনী সতা কেহ নাই অরি॥

এ বিষয়ে এসব ঔষধে অর্থ কি।

কোন পীড়া নাহি পাবে তব প্রিয়া ঝি॥" (ঘনরাম/৭৬)

সমাজের মূল প্রবণতাটি কিন্তু এখানেই। বিবাহ সংক্রান্ত কিছু কিছু বিধি নিষেধ ছিল, যেমন পৌষমাস, চৈত্রমাস ও ভাদ্রমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, মলমাসেও বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া মৃতের অশৌচ নিবারণ না হলে বিবাহ হত না, এমন কি মৃত্যুর এক বৎসর কালের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ বলে প্রচলিত ছিল। ঘনরামের কাব্যে কলিঙ্গার বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনরা কাঙুররাজকে বলেছে—

"বিবাহ মঙ্গলময় তাহে মহা দুঃখোদয়

মহাশয় কি করি বিধান॥

জ্ঞাতি বন্ধু রণে নাশ অশৌচান্তে পৌষ মাস

অদ্য অতিচারি বৃহস্পতি।

শুক্র অস্ত বাল্যবৃদ্ধি গুর্ব্বাদিত্য কালাশুদ্ধি

পরে মলমাস কাল গনি॥

বৎসর বিরাম কর নহে নিবেদন ধর

কর কিছু ইহার উপায়।" (ঐ/৩৯৬)

কলিঙ্গাও পিতাকে এরকম উপদেশ দিয়েছে—

"বৎসর অশুচি তুমি শাস্ত্রের লিখন॥

খুড়া জেঠা তোমার মরিল কত রণে।

ইথে কন্যাদান তুমি করিবে কেমনে॥

সপিন্ড নাহিকদিলে বৎসর অশুচি।

মাছি পোক ডাঁশ যেন পুতিগন্ধ রুচি॥" (রূপরাম/২২৫)

এরকম হাজার নিয়ম, সংস্কার-বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ।

অতঃপর আমরা আসছি আচার-বিচারগত বা লোকঅনুষ্ঠানগত অনুষঙ্গের মধ্যে। ধর্মমঙ্গল রাঢ়বঙ্গের কথা হলেও কাব্যে এখানকার স্থায়ী বসবাসকারীদের ঐতিহ্যকথা তেমন স্থান পায়নি, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যশাসিত আচার-অনুষ্ঠানই রাঢ়বাসী বাঙালীর সামাজিক জীবনকে পরিচালিত করেছে। বাঙালীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হত। ধর্মমঙ্গলে কবিগণ তা আপন সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। প্রথমে বলা যাক, নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত আচারগুলির কথা। প্রসূতির গর্ভকালীন অবস্থায়

কিছু আচার পালিত হত, যেমন—পঞ্চামৃত সেবন, সাধভক্ষণ ইত্যাদি। প্রসূতির গর্ভকালীন অবস্থায় প্রথমে অনাগত সন্তানের মঙ্গলের জন্য পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খাওয়ানো হত। দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি এই পাঁচ প্রকার খাদ্যই হল পঞ্চামৃত। এই লোকঅনুষ্ঠানে প্রসূতিকে বস্ত্র, অলঙ্কার উপহার দেওয়া হত। যেমন, রঞ্জাবতীর গর্ভকালে পঞ্চামৃত খাওয়ানোর কথা পাওয়া যায়—

"বস্ত্র অলঙ্কার ভূষা দিবসে দিবসে।
পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চমাসে॥" (ঐ/৭৫)

ছয় মাসে শিশু পূর্ণ শরীর পায় এবং তখন প্রাণের অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সুতরাং তখন নানাবিধ আচার পালিত হত। অনুষ্ঠানটি লোকাচার হিসাবে 'সাধভক্ষণ' নামে পরিচিত। সাধারণত প্রসূতির সাত মাস গর্ভকালে সাধভক্ষণ করানো হত এবং সেইসঙ্গে নানা রকম উপহার দেওয়া হত——

"ছয় মাস নিবড়িল সাতে পরবেশ।
নানা সাধ খায় রামা অপূর্ব সন্দেশ॥
....
মনে যত আছিল খাইল সব সাধ।
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা বিলায় অবাধ॥" (ঐ/৭৫)

নবজাতকের জন্মের পর কতকগুলি আচার পালিত হত। অনুষ্ঠানগুলি ক্রমপর্যায়ে নাড়িকা ছেদন, পাঁচুট্যা, ষেটেরা বা ষষ্ঠীপূজা, আটকলাই বা আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ইত্যাদি। নবজাতকের জন্ম কালে দাইদের তৎপর ভূমিকা থাকত, তারাই মূলত জন্মকালে প্রসূতির পাশে থাকত। জন্মকালে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে নবজাতককে বরণ করে নেওয়া হত, আর দাই নবজাতকের নাড়ীচ্ছেদ করত। যেমন, রঞ্জাবতীর জন্মকালে—

"দূর্বা ধান্য প্রদীপ মঙ্গল আচরণ।
সরসীর নাড়ীচ্ছেদ করিল তখন॥" (ঐ/১৬)

জন্মের পর পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান 'পাঁচুটা' বা 'পাঁচ উঠানি' এবং ছয় দিনে 'সূতিকাষষ্ঠী' বা 'ষেটেরা', আবার কোথাও বা একুশ দিনে 'অরণ্যষষ্ঠী' পূজা করা হত। যেমন রঞ্জাবতীর জন্মকালে পালিত আচারগুলি হল—

"কুলক্রিয়া সকল সাধিল কুলবতী।
ছয় দিনে ষাটেরা পূজিল দিবারাতি॥
ষষ্ঠীপূজা করিলেক একুইশ দিবসে।" (ঐ)

আট দিনের অনুষ্ঠান 'আটকৌড়ি' ; ঐ দিন আট রকমের কলাই ভাজা ও মিষ্টি বিতরণ করে শিশুর মঙ্গল কামনা করা হত, আর নয় দিনে 'নত্তা' পালিত হত। আট দিনে কোথাও ষষ্ঠীপূজা করা হত, আসলে অঞ্চল বিশেষে আচারের এরকম হেরফের ছিল। মানিকরামের কাব্যে পাই——

"সমাহিতে অষ্ট দিনে করি ষষ্ঠীপূজা।
নত্তা কৈল নয় দিনে নৃপতি মহাতেজা॥" (মানিকরাম/৩২)

এরপরে নবজাতকের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ। সাধারণত ছেলের অন্নপ্রাশন ছয় মাসে এবং মেয়ের অন্নপ্রাশন সাত মাসে করার বিধি ছিল। তাই দেখা যায় হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্রের অন্নপ্রাশন হয় ছয় মাসে——

"লয়ে পুরনারীগণ আনন্দ আবেশে।
অরণ্যষষ্ঠীকে পূজে একুশ দিবসে॥
ষষ্ঠ মাসে শশিশুভে সুতিথিএ সাথ।
আত্মজে ওদন দিল অমরার নাথ॥" (ঐ/৫৮)

আবার রঞ্জাবতীর অন্নপ্রাশন সম্পর্কে লিখেছেন—

"সাত মাসে সুদিন করিএ শুক্লপক্ষে।
দিলেক ওদন রাজা দুহিতার মুখে॥" (ঐ/৩২)

শিশু সম্পর্কিত অনুষ্ঠান হল 'হাতেখড়ি'। পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যারম্ভ করা হত—

"পঞ্চম বৎসর প্রাপ্ত হত্যে শুচিপক্ষে।
বিদ্যারম্ভ বালকের কৈল উক্ত ঋক্ষে॥" (ঐ/৫৮)

যৌবনকালের অর্থাৎ মানব জীবনের মধ্য পর্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিবাহ। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কিন্তু ডোম সমাজের বিবাহাচারের কথা বলেননি, উচ্চবর্ণের বাঙালী সমাজের বিবাহাচার বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলে দেখা যায় কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ক্রমিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহাচার পালিত হয়েছে, যেমন গায়েহলুদ, অধিবাস, মঙ্গলসূত্র বন্ধন, নান্দীমুখ, ক্ষৌরকর্ম বা বরকনে কামানো, বরবরণ, সাতপাক, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান, বাসর যাপন, শয্যা তুলুনি এবং পরদিন বাসিবিয়ে, কন্যা বিদায়, বধূবরণ, কালরাত্রি, ফুলশয্যা ইত্যাদি। অঞ্চল বিশেষে এই আচারসমূহ পালনে কিছুটা পার্থক্য ঘটে থাকে। প্রথমে পাত্রের গৃহে অধিবাস, পরে হলুদ মাখানো সূত্র বন্ধন এবং তারপরে পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদলাভের জন্য নান্দীমুখ করা হত। কন্যাগৃহেও এ সব অনুষ্ঠান চলত। কবি এ সব আচারের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন কলিঙ্গার বিবাহ উপলক্ষে গাত্রহরিদ্রা দিয়ে বিবাহের সূত্রপাত—

"সখীগণ হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।" (ঘনরাম/৭৩)

এরপরে— "কাঙুর অধিপতি আনন্দে পূর্ণ মতি বান্ধবে দিল নিমন্ত্রণ।
সারথি সভাজন আগত নিকেতন আনন্দে হরষিত মন॥
টাঙ্গাইল দিব্য চান্দা মাণিক হেম বান্ধা বসিল যত দ্বিজগণ।
ভূপতি অভিলাষে কন্যার অধিবাসে কৈল দিব্য আরম্ভন॥
হরিদ্রাযুত বাস তিমির করে নাশ বরণ জিনি কাচ সোনা।
কলিঙ্গা অভিলাষে পিতার বামপাশে বসিল সুমতি ধারণা॥
অবনী গন্ধ শিলা স্বস্তিক পুষ্পমালা কঙ্কণ শঙ্খ ফল দধি।
যাবক গোরোচনা ধান্য রূপা সোনা হরিদ্রা দিল যথাবিধি॥
প্রশস্ত পাত্র করি তুলিয়া অধিকারী কলিঙ্গা করিল বন্দনা॥
পরশে তিন বার অসিত মণিহার সজল দীপ পরশনা॥
দুহিতা বিদ্যমান নিছনি পেলে পান বনিতা জয় জয় ধ্বনি।
মঙ্গল সূত্র করে কনক সীথি শিরে বান্ধিল যত দ্বিজমণি॥
আনন্দে মহারাজা মাতৃকা করে পূজা ঘৃতে দিল বসুধারা।
নান্দীমুখ আদি করিল যথাবিধি হইয়া শুভ কাম্যতরা॥
সফল বিধি কিবা কলিঙ্গার অজি বিভা আনন্দে নাচে মহাশয়।
কৌতুকে রাজরাণী আইয় সভে আনি ঘরে ঘরে জল সয়॥" (রূপরাম/২২৬)

'জলসওয়া' বাঙালীর বিবাহে একটি বিশেষ স্ত্রীআচার। সাধারণত এয়োস্ত্রীরা পাড়া প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে জলসইতে যেত. বরণ ডালা সাজাত। বরণ ডালায় থাকত বিবিধ উপকরণ, যথা— পান. সুপারি, আমলকি, গোরাচনা. ধান. দূর্বা, কাজল. প্রদীপ ইত্যাদি। এদিকে বর গৃহে এলে বরকে বরণ করে নিত কনের মাতা। যেমন-

"সমুখে উত্থান ডালা ধরিল কিঙ্করী।

বরেরে বরণ করে রাজার সুন্দরী॥
মোহন মুকুটে রাণী দিল দূর্বা ধান।
চরণে ঢালিল দধি অসিত সমান॥" (ঐ/২২৭)

এর মাঝখানে বরকে আশীর্বাদ করা হত, যৌতুক দেওয়া হত এবং জামাই বশীকরণের ঔষধ করা হত। এরপরের অনুষ্ঠানগুলি নিম্নরূপ— বর ও কনেকে ছাদনা তলায় আনা এবং তারপর বিবাহের মূল অনুষ্ঠান সাতপাক, শুভদৃষ্টি ও সম্প্রদান—

"সাজায়ে সাতাস কাটি সর্ব্ব সখী লয়ে।
মঙ্গল আচারে বরে প্রদক্ষিণ হয়ে॥
যতনে আনিল কন্যা রতনে রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা॥
দুহাতে ঘুরায় পান লাজে অধোমুখী॥
বসনে বরের মুখ ঢাকে যত সখী॥
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত।
দুজনে বদলে মালা পাশরিয়া হাত॥
নিছিয়া ফেলিল পান উভ হাত তুলি।
বরে ফেলাইয়া মারে সগুড় চাউলি॥
চারি চক্ষে চঞ্চল চাহিল কন্যাবরে।
কামিনী সকল তায় কত রস করে॥" (ঘনরাম/৪০০)

কন্যার পিতা কন্যা সম্প্রদান করে এবং যৌতুক প্রদান করত। বর কনের সিঁথিতে সিন্দুর দিয়ে দিত এবং তারপর গাঁট ছড়া বেঁধে দেওয়া হত। এরপর অগ্নি সাক্ষী রেখে হোম বা যজ্ঞ সম্পন্ন করে বিবাহ সম্পন্ন হত। ঘনরামের বর্ণনানুসারে——

"বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমর্পিয়া॥

. . . .

সায় হল সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিন্দুর॥
মাথায় বসন দিলা রতন মৌড়ালা।
বেদের বিধান সিদ্ধ বাঁধে গাঁটছড়া॥

. . . .

লাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী॥" (ঐ/৪০১-৪০২)

বিবাহ সম্পন্ন হলে ভোজন শেষে বর ও কনে বাসরযাপন করত —

"ক্ষীরখণ্ডে ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে॥" (ঐ/৪০২)

বিবাহের পরদিন বর কনের 'শয্যাতুলুনি'। নব দম্পতির জন্য রচিত শয্যাতোলার জন্য এয়োগণ 'শয্যাতুলুনি' বা

শয্যাতোলা দক্ষিণা আদায় করত—

"যুবতী মাগিল শয্যাতোলা বাসঘর।
শতেক কাহন আজ্ঞা দিলা নৃপবর॥" (রূপরাম/৩৫)

এরপর বাসিবিয়ে, বধূবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি ক্রমান্বয়ে পালিত হত। রাঢ়বঙ্গের বিবাহ আচারে বোধ হয় বাসিবিয়ে হত না, তাই ঘনরাম, রূপরাম, মানিকরাম কেউই বাসিবিয়ের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেননি। অবশ্য এসব পাত্রপক্ষের অনুষ্ঠান। বিবাহ এখানেই শেষ হত না। পাত্রগৃহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বধূবরণ করে নেওয়া হত এবং আট দিন পর বরকনে 'অষ্টমঙ্গল' করে তবে বিবাহ সমাপ্ত হত—

"আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।
সেন বলে ঠাকুর বিদায় হবো বাড়ী॥" (ঘনরাম/৪০২)

বাঙালীর বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তবে তা এখনকার মত এত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেনি। ধর্মমঙ্গলে দেখতে পাই প্রত্যক্ষভাবে কোথাও পণের প্রসঙ্গ আসেনি, তবে বরপণ হিসাবে জামাতাকে প্রচুর যৌতুক দেওয়া হত। কাঙুররাজ লাউসেনকে বিবাহে কি কি দ্রব্য উপহার দিয়েছিল তার বিবরণ ধর্মমঙ্গলে পাই। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো দাসদাসী পর্যন্ত যৌতুক হিসেবে দেওয়ার রীতি ছিল-

"জামাতাকে যৌতুক যতনে দিল ভূপ।
বাস ভূষা বহু রত্ন বিষয়ানুরূপ॥
কন্যাকে যৌতুক দিল কত রত্ন ধন।
কালিনি পাথর ঘুড়ি কাঞ্চন ভরণ॥
দিল আর দুই দাসী দক্ষিণা দ্রৌপদী।
সারিল সকল ক্রিয়া শেষে যথাবিধি॥" (মানিকরাম/৩৪৯)

মৃত্যু মানব জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করে। মৃত্যুতেও বাঙালী হিন্দু নানা আচার পালন করে থাকে। মৃত্যুর পর প্রথম কর্তব্য মৃতদেহ সৎকার করা। বাঙালী হিন্দু মৃতদেহ দাহ করত। দাহকার্যের প্রধান আচার মুখাগ্নি, মুখাগ্নির প্রথম অধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র, পুত্র না থাকলে স্ত্রী এবং কখনো কখনো মা-ও মুখাগ্নি করতে পারত। ধর্মমঙ্গলে দেখি লাউসেনের কাটা মুণ্ড ভেবে মায়ামুণ্ডকে দাহ করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল লাউসেনের চার স্ত্রী, আবার অপুত্রক ইছাই ঘোষের মৃত্যুর পর তার দাহকার্য সম্পন্ন করে দেবী পার্বতী রূপিনী মাতা। সাধারণত হিন্দুর মৃতদেহ দাহ করা হত শ্মশানে, কোন নদীতীরে। সাধারণত কাঠের চিতায় শবদেহ স্থাপন করে অগ্নিকার্য করা হত, তবে ধনী ব্যক্তিরা চন্দন কাঠের চিতায় ঘি ঢেলে মৃতদেহ দাহ করত। কবির বর্ণনা অনুসারে—

"পদ্মা সনে অজয় তটেতে উপনীতা।
চন্দন কাষ্ঠেতে চারু বিরচিল চিতা॥
পাতায়্যা চামর তায় ঢেল্যা ঢেল্যা ঘি।
শুয়ায়্যা ইছাই অঙ্গে ঢেল্যা দি॥
দাহন করিল মাতা বেদের বিধানে।" (ঘনরাম/৫৪৪)

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাঁ হাতে প্রদীপ নিয়ে পাঁচ বা সাত বার চিতা প্রদক্ষিণ করে উল্টোদিকে মুখ করে চিতায় অগ্নিসংযোগ করতে হত এবং তারপর শ্মশান বন্ধুগণ চিতায় অগ্নিসংযোগ করত। কবির বর্ণনায়—

"বাম করে ব্যজন দক্ষিণ করে মুণ্ড।
পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে অগ্নিকুণ্ড॥" (মানিকরাম/৪৩৫)

ইছাই ঘোষের চিতায় অগ্নিসংযোগ করে মাতা পার্বতী, সুতরাং সম্ভবত পুত্রের চিতায় অগ্নিসংযোগে মায়েরও

অধিকার ছিল—

"পদ্মার বচনে মাতা প্রয়বোধ মানি।
ইছায়ের অগ্নিকার্য করেন আপুনি॥
অজয়ার তীরে চিতা হইল নির্মাণ।
কঙ্কালমালিনী চণ্ডী করিলেন স্নান॥
মৌনযোগে মহামায়া মনের হাইবাসে।
নেড়্যা চেড়্যা আপুনি পড়ায়্যা ইছা ঘোষে॥
কত কোটি তীর্থ যার চরণকমলে।
তথাপি ইছার আস্থি দেন গঙ্গাজলে॥" (ঐ/৪৬৬-৪৬৭)

মৃতদেহ সৎকার করার পর মৃতের অস্থিভস্ম গঙ্গাসাগরে বা গঙ্গাজলে বিসর্জন দেওয়া বিধি ছিল। গয়ায় পিণ্ডদান না করলে মৃতের আত্মার সদ্গতি হয় না এই বিশ্বাসে দেবীও ইছাই ঘোষের আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে সাগরসঙ্গমে অস্থি বিসর্জন দেয়—

"সাগর সঙ্গমে অস্থি রাখিল ভবানী।
গয়ামধ্যে সপিন্ডন করিল আপনি॥
তিল জলাঞ্জলি দিল ইছাইর নামে।" (রূপরাম/২৯১)

মৃৎদেহ সৎকারের পরবর্তী ক্রিয়া হল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত নানা বিধি প্রচলিত ছিল, য়েমন- তেরাত্রি শ্রাদ্ধ, চতুর্থীর শ্রাদ্ধ, অশৌচান্ত শ্রাদ্ধ এবং শেষে পিণ্ডদান ও তিলাঞ্জলি তর্পণ ইত্যাদি। কবির বিবরণ অনুসারে—

"ত্রিরাত্রি করিয়া মাতা রহিলা ঢেকুরে।
করেন চতুর্দ্ধা শান্তি চতুর্থ বাসরে॥
আকুল হইল অঙ্গ অঝোর নয়ান।
প্রিয় ভক্ত উদ্দেশে করেন পিণ্ডদান॥
তবে দেন ত্রিয়াঞ্জলি তর্পণের জল।
ইছাই ঘোষের হল্য জনম সফল॥" (মানিকরাম/৪৬৭)

পুরুষের মৃত্যু হলে মৃতার স্ত্রীকে কিছু কিছু আচার পালন করতে হত। মৃতের স্ত্রীকে অর্থাৎ সদ্য বিধবাকে শেষ বারের মত সাজিয়ে দেওয়া হত। লাউসেনের মৃত্যুর পর তার চার স্ত্রী যে আচারগুলি পালন করে সেগুলি হল-

"কাঞ্চন কাকই কেহ দেই তার চুলে।
কেহবা তাম্বুল দেই বদনকমলে॥
জোড়হাথে কেহবা আশিস মাগ্যা লয়।
কান্দ্যা কান্দ্যা কপালে সিন্দুর কেহ দেয়॥
চারি সতী আনন্দে চড়িল চতুর্দোলে।
অনুমৃতা হত্যে যাম কালিনীর কুলে॥" (রূপরাম/২৭২)

সদ্য বিধবাকে শ্মশান যাত্রাকালে আম্রডাল ধারণ করতে হত এবং তারপর খই ছড়াতে ছড়াতে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হত—

"সবিনয় প্রণিপাত শাশুড়ি শ্বশুরে।
আম্রডাল ভাঙ্গিল আনন্দ অবিসারে॥" (মানিকরাম/৪৩৫)

কিংবা— "চন্দ্রমুখী কলিঙ্গা ছড়ায় খই কলা।

বাহিরিয়া দেখে লোক বিধাতার খেলা॥" (রূপরাম/২৭২)

শ্মশানে সদ্য বিধবার হাতের শাঁখা গুঁড়িয়ে দিয়ে সিঁথির সিন্দুর মুছে দেওয়া হত এবং এরপর সতী রমণী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করত।

বাঙালী সমাজের আচার-বিচারগতক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু নিয়ম পালিত হত। যেমন বাঙালী প্রাচীনকাল থেকেই অতিথিবৎসল। অতিথি বাঙালীর ঘরে দেবতার মত সম্মান পেত। হরিশ্চন্দ্র পালায় আমরা দেখি অতিথির মনোরঞ্জনের জন্য হরিশ্চন্দ্র ও মদনা আপন পুত্রকে কেটে মাংস তৈরী করেছে। অতিথি দেবতা ছদ্মবেশী ধর্মদেবকে দেখে রাজা হরিশ্চন্দ্র—

"বিনয় বচন বলে বুকে জোড় হাত।
অপূর্ব্ব অতিথি দ্বারে দেবতা সাক্ষাৎ॥" (ঘনরাম/৩৫)

ঘরের অতিথি অভুক্ত রাখা পাপ, এ জাতীয় সংস্কার কাজ করায় অতিথিসেবা পরম ধর্ম বলে বিবেচিত হত। তাই অতিথি আগমন ঘটলে তাকে যত্নপূর্বক পা ধুয়ে দেওয়া কর্তব্য এবং তারপর পরিতোষ সাধন করা হত। রানী মদনা ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে অতিথি রূপে দেখে—

"রাজরাণী ঐমনি সম্ভ্রমে তোলে গা।
সেবিতে চলিল সেজ্যা সন্ন্যাসীর পা॥
হেম ঝারি পরিপূর্ণ জাহ্নবীর জলে।
কত নিধি চরণ নিছনি লয়্যা চলে॥" (ঐ)

সন্ন্যাসীঠাকুর, ওঝা, গণৎকার, দৈবাদেশ ইত্যাদির প্রতি বাঙালীর বিশ্বাস ছিল। দেবদেবীদের কখনো গণৎকার, কখনো দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ— সহজ সরল বাঙালী মনের অটুট বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। এ সব আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জাতি হিসাবে বাঙালীর স্বরূপ ও সৌন্দর্যবোধ প্রকাশিত। তাছাড়াও নানান পালা-পার্বণ, পূজা, ব্রত-ব্রত ইত্যাদি বাঙালী জীবনের অঙ্গ। প্রসঙ্গত আসে উৎসবপ্রিয়তার কথাও। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব হল দুর্গাপূজা। সাধারণ মানুষ দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেতে উঠত, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় আছে—

"আশ্বিনে আনন্দ বড় সভাকার ঘরে।
দশভুজা দশদিগে বড় শোভা করে॥
মহা মহা পূজা করে কত ভাগ্যবান।
ছাগ মেষ মহিষ সহস্র বলিদান॥" (রূপরাম/৯৫)

পূজায় বলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল। ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব ইত্যাদি বলিদান করা হত। তাছাড়া সম্বৎসর বিভিন্ন ধরনের বার-ব্রত পালন করা হত, একাদশী উপবাস পালন করা হত। বিভিন্ন রকম মেয়েলি ব্রতকথার পাশাপাশি পরবর্তীকালে পুরুষও মঙ্গলদেবতার ব্রত পালন করেছে। রাঢ়বাসী ধর্ম পূজক সম্প্রদায়ের লোকেরা শুক্রবার দিনে ধর্ম-একাদশী পালন করত। লাউসেন ছদ্মবেশিনী পার্বতীকে বলেছে—

"লাউসেন বলে আমি ধর্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিনে মোর ধর্ম একাদশী॥
শনিবার দিবসে কদাচ জল খাই।
ধর্মের সেবক হৈলে সুখ নাগ্রি পাই॥" (ঐ/৯৯)

একাদশী উপবাসে অন্নগ্রহণ, পরগৃহে গমন, শৃঙ্গার নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তাই নানা রকম সাত্বিকতার মধ্যে দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে আচার পালিত হত। লাউসেনকে সুরিক্ষা নটী নানা রকম প্রলোভন দেখালে লাউসেন তার সংযমের কথা

জানায়—

"আন জনার ঘরে মোরা জল নাঞি খাই॥" (ঐ/১৭০)

রূপরামের কাব্যে 'জামতি পালা'য় লাউসেন জানায়—

"কি করিব পানগুয়া চন্দন শীতল।
গৃহস্থ লোকের হাথে নাহি খাই জল॥
শিশু কাল হইতে আমি ধর্মের তপসী।
শুক্রবার দিনে করি ধর্ম একাদশী॥
শনিবারে নিয়ম ভাঙ্গিলে জল খাই।
ধর্মের সেবক আমি সুখ নাহি চাই॥
বৌদ্ধবংশ কুলে নাই আমিষ্য ভোজন।
ধর্ম রাখ্যা কখন অধর্মে নাই মন॥" (রূপরাম/১৫৩)

একাদশী উপবাস শেষের পরদিন পারণা বা নিয়মভঙ্গের পরই জলগ্রহণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। বেশ্যাগৃহে অন্নগ্রহণও সেকালে মহাপাপ বলে সমাজে প্রচলিত ছিল।

বৃদ্ধ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করে তীর্থবাসে গমন মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে প্রচলিত রীতি। মুকুন্দ চক্রবর্তী ধর্মকেতু, নিদয়ার কাশীবাস করালেও অনার্য সম্পৃক্ত ধর্মমঙ্গলে প্রসঙ্গটি নেই। সম্ভবত মুকুন্দ চক্রবর্তী উচ্চ বর্ণের সমাজে প্রচলিত বিষয়টি নিম্নবর্ণের অনার্য সমাজে আরোপ করেছেন। তবে সংসার বিরাগী হয়ে, বীতস্পৃহ হয়ে তীর্থবাস বা সন্ন্যাস গ্রহণ সাধারণ বাঙালী সমাজে দেখা যেত। মানিকরামের কাব্যে দেখি শিবঠাকুর পার্বতীর আচরণে বিরক্ত হয়ে কাশীবাসের কথা জানিয়েছে—

"হল নাই ঘরে থাকা মোর হরিদাস।
রাক্ষসীর জ্বালায় করিব কাশীবাস॥" (মানিকরাম/১৩৮)

ইচ্ছাপূরণের জন্য বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাবার আশায়, বিশেষত সন্তান কামনায় যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ তীর্থে তীর্থে ধর্না দেওয়ায় বাঙালীর বিশ্বাস ছিল। সন্তান কামনায় হরিশ্চন্দ্রের তীর্থ পরিভ্রমণ, রঞ্জাবতীর চাঁপাইয়ে ধর্মসেবা, পশ্চিম উদয়ের মত অবাস্তব বিষয়কে সত্য করার জন্য (অর্থাৎ অসম্ভব সাধন) লাউসেনের কৃচ্ছ সাধন বাঙালীর অন্তঃস্থলের অন্তঃপ্রবাহী বিষয় হয়ে আছে। দৈববাদী বাঙালী সমাজের এই চিরাচরিত বিষয় উপেক্ষণীয় ছিল না। সাধারণত বাঙালী সমাজ ছিল অশিক্ষিত, ফলে নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকায় ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবের বিশ্বাস ও ভয় ছিল। যেমন রাত্রি বেলা কেউ নাম ধরে ডাকলে ধরে নেওয়া হত নিশি ডাকছে। 'নিশি ডাকা' বলে এক জাতীয় ভীতিকর ধারণা বিশেষতঃ মহিলা মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করত। তাই দেখি লাউসেনের সংবাদ বাহক শুক শারীর ডাক শুনে কানাড়ার মনে হয়—

"দ্বিপ্রহর নিশি ডাকে নাঞি মনকথা॥" (রূপরাম/৩৪৮)

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষা। বাঙালীর শিক্ষানুরাগ ও সংস্কৃতি মনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় পাই। মঙ্গলকাব্য ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য শাখায় মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত টোল-কেন্দ্রিক, গুরু মহাশয়রা টোলে শিক্ষা দিত, শিক্ষার্থীরা পল্লীগ্রামস্থ টোলে স্থানীয় গুরু মহাশয়ের কাছে শিক্ষালাভ করত এবং উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দূরদূরান্তে গমন করত; নবদ্বীপ, বর্ধমান ছিল অনুরূপ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলার বাইরে থেকেও শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য আসত। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্য পাঠে জানা যায় সেকালের

শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার স্তর এবং পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে। রূপরামের পিতা পণ্ডিত ছিলেন, সম্ভবত তাঁর নিজের টোল ছিল এবং কবি তাঁর প্রাথমিক পাঠ পেয়েছিলেন সেখানেই। রূপরাম লিখেছেন—

"পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে।
বিশাশয় পড়ুয়া যাহার বিদ্যমানে॥" (ঐ/৭)

পরবর্তীকালে কবি ভ্রাতাগণের চাপে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গমন করেছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। সেকালে প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান করত। দরিদ্র সন্ধিৎসু শিক্ষার্থীগণ অপরের সাহায্য নিয়েও শিক্ষালাভ করতে উৎসাহ দেখাত। রূপরাম নিজে অপরের সাহায্য নিয়ে বিদেশ (অন্যগ্রাম) গমন করেছিলেন। কবি লিখেছেন—

"মনে হৈল পড়িতে যাইব দেশান্তর॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি॥
পথে যাত্যে সঙ্গে মোর নাই কিছু ধন।
রাজারাম রায় দিল কড়ি বার পণ॥
কাথে লয়্যা খুঙ্গি পুথি জুমর অমর।
পাযন্ডা পড়িতে যাই ভট্টাচার্যের ঘর॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া হৈল মায়া মো॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
যতনে পড়ান পাঠ হরষিত মনে॥" (ঐ/৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, জউগ্রাম উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। গুরু মহাশয় রূপরামকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য যেখানে যেতে বলেছিলেন তা থেকে তৎকালীন উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলির নাম জানা যায়। যেমন—

"নবদ্বীপ যাহ কিবা যাহ শান্তিপুর॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য নবদ্বীপে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥
নহে জউগ্রাম চল কনাদের ঠাঞি।
তার সম ভট্টাচার্য শান্তিপুরে নাঞি॥" (ঐ/৮)

টোলগুলি সাধারণত কোন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ধনী ব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপে বা আটচালা গৃহে বসত। সেকালে ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের মত। শিক্ষকদের বলা হত 'গুরু', তাদের উপাধি হত 'ভট্টাচার্য'। রূপরাম সেকালের কয়েক জন খ্যাতনামা ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেছেন, এঁরা হলেন রঘুরাম ভট্টাচার্য, কণাদ ভট্টাচার্য, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য প্রমুখ।

তৎকালে সম্ভবত বাল্যকালেই বিদ্যারম্ভ করা হত, সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়সে বিদ্যারম্ভ সূচক অনষ্ঠানে হাতেখড়ি দিয়ে বিদ্যারম্ভ করা হত। সাধারণ শিক্ষানুরাগী মানুষ চতুষ্পাঠী বা টোলে শিক্ষালাভ করত, ধনীরা ছেলেমেয়েদের আপন গৃহে গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষা দিত। লাউসেনের শিক্ষারম্ভ হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। মানিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—

পঞ্চম বৎসর যবে হইল বয়স।
বিদ্যারম্ভে উক্ত কৈল্য অপূর্ব দিবস॥

নিবাস নগরে নরোত্তম নামধেয়।
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সকলের পূজনীয়॥
সমাদরে সেন তারে সদনে আনিয়্যা।
সমর্পিলা সুতযুগ্মে সবিনয় কয়্যা॥
নরোত্তম নিত্য ঙিম্রয়ে নিবিষ্টতা বড়ি।
আরম্ভ করাল্য বিদ্যা হাতে দিয়া খড়ি॥" (মানিকরাম/১১৪)

অতঃপর আসা যাক সেকালের পাঠ্যবিষয়সমূহে। সেকালে হাতেখড়ি অনুষ্ঠানে বর্ণপরিচয় দিয়ে পাঠ শুরু করে ধীরে ধীরে বানান শিক্ষা, ব্যাকরণ, গণিত শিক্ষা দেওয়া হত। রূপরাম চক্রবর্তী লাউসেনের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—

"ক খ আদি ইঙ্গিতে চৌষট্টি বর্ণ জানে।
পড়িল আঠার ফলা পরিতোষ মনে॥
তবে আঙ্ক আঙ্ক পড়্যা জানিল বানান।
সিদ্ধিরস্তু পড়িতে ঈষত হৈল জ্ঞান॥" (রূপরাম/৯০)

ব্যাকরণ শিক্ষার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট, পাণিনি পাঠ সেকালে জনপ্রিয় ছিল—

"ব্যাকরণ প্রথমে পড়িল নানামত।
পাণিনি কলাপ ভাষ্য কোষ কতশত॥" (মানিকরাম/১১৫)

সেকালে ব্যাকরণ পাঠে কোন্ কোন্ বিষয় পড়ানো হত তার বিবরণ দিয়েছেন মঙ্গলকাব্যের কবি; সাধারণত পদ প্রকরণ, ধাতু প্রকরণ, প্রত্যয়, সন্ধি, সমাস, কারক বিভক্তি সকলই পড়ানো হত। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে উচ্চশিক্ষার জন্য, শাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, তর্ক, মীমাংসা, অলঙ্কার ইত্যাদি পড়ানো হত। রূপরাম চক্রবর্তী নিজের শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় পাঠ্যবিষয়গুলির কথা। যেমন—

"মাঘ রঘু নৈষদ পড়িল হরষিত।
পিঙ্গল পড়িয়া মনে পাইল বড় প্রীত॥
রামায়ণ ভারথ পড়িল যথাবিধি।
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল নিধি॥" (রূপরাম/৮)

মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে লাউসেনের পাঠচর্চার মধ্যে দিয়ে সেকালের পাঠচর্চার বিবরণ পাই। যথা-

"অষ্টদিন আমূলক পড়্যা অভিধান।
দৃঢ় হৈল্য দোঁহাকার দিব্যান্তরজ্ঞান॥
অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
মুরারি ভারবি ভট্টি নৈষধ পিঙ্গল॥
কালিদাসকৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র॥
ছন্দশাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পরে।
উত্তম হৈল বিদ্যা নয় দশ বৎসরে॥" (মানিকরাম/১১৫)

সেকালে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান চর্চার রেওয়াজ বোধহয় ছিল না। মঙ্গলকাব্যে কোথাও ইতিহাস, বিজ্ঞান পাঠের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। তবে এই যুগে জীবন-জীবিকার তাগিদ বড় ছিল না, জ্ঞান আহরণের জন্যই ধ্রুপদী বিদ্যা চর্চা করা হত। মোগল যুগের শেষ প্রান্তে সপ্তদশ–অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে রাজকার্যে অংশ গ্রহণের জন্য আরবী,

ফারসী ভাষা শিক্ষা শুরু হয়েছিল। স্বয়ং ঘনরাম চক্রবর্তী ফারসী ভাষা শিখেছিলেন বলে জানা যায়। মোট কথা দরবারী জীবনের বাইরে সাধারণ জনসমাজে অন্যান্য বিদ্যাচর্চার রেওয়াজ খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। কাব্যশাস্ত্র চর্চার পাশাপাশি জ্যোতিষ, তন্ত্রচর্চা, লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি, মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদির চর্চা হত। ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞরা সাধারণ লোককে শিক্ষা দিত। অশিক্ষিত জনসাধারণ যে তা শিখত তার পরিচয় পাই ঔষধীকরণ, বশীকরণ ইত্যাদির বহুল ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে । তৎকালে ধনী পরিবারের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি দেহচর্চা, মল্লবিদ্যা ইত্যাদিও শেখানো হত। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে প্রসঙ্গটি উল্লেখ না হলেও ধর্মমঙ্গলের আখড়া পালায় লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চা করতে দেখা যায়। ধর্মমঙ্গলে রঞ্জাবতী সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছে—

"জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই॥" (ঘনরাম/১৪১)

লাউসেন দেহচর্চা, যুদ্ধবিদ্যা সকলক্ষেত্রেই পারদর্শী হয়ে ওঠে, সুতরাং শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাঙালীর দেহচর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা চর্চা অবহেলিত ছিল না।

মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালীর নিজস্ব বিষয়। বাঙালীর সংস্কৃতি বাংলার মাটি ও মানুষের বিষয়, ধর্মমঙ্গল রাঢ়বঙ্গের কাব্য তাই রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিচয় এখানে লভ্য। ধর্মঠাকুর যেহেতু রাঢ়বাসীর দেবতা সেকারণে ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ধর্মসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। ধর্মপূজা বিধান সংক্রান্ত যে সকল আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে তা রাঢ়বাসীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিষয়। ধর্মঠাকুর সংক্রান্ত যে সকল রচনা আছে সেগুলি হল— সৃষ্টিপত্তন, সংজাত পদ্ধতি, ধর্মপুরাণ, ধর্মমঙ্গল এবং ধর্মপূজা বিধান। সংজাত পদ্ধতিতে ধর্মপূজাবিধি জলপাবন, টীকাপাবন, চনাপাবন, দ্বারমোচন, বারমতি ইত্যাদি বিষয়গুলি শুধুমাত্র ধর্ম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ধর্মপূজা বিধান পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করা হয়, কেননা সেখানে হিন্দুর দেবদেবীর পূজাবিধি প্রবেশ করেছে। রঞ্জাবতীর শালেভর পালায় রঞ্জার চাঁপাইয়ে ধর্ম সেবন সংক্রান্ত বিধি, লাউসেনের পশ্চিমোদয় সংক্রান্ত পূজা-বিধিতে হিন্দুর প্রচলিত রীতির সঙ্গে সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে ধর্মপূজা সংক্রান্ত বিধি, ধর্মের গাজন ইত্যাদিতে ধর্মসংস্কৃতি তথা রাঢ়ের কিছুটা নিজস্ব লৌকিক রূপ প্রকাশিত। ধর্মমঙ্গলে ডোম শ্রেণীর জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, তা অবশ্য রাঢ়বাসীর সংস্কৃতির নিজস্বতাকে বহন করে। বাঙালীর বিবাহ সংক্রান্ত আচার-আচরণ, জীবন চর্যার বিভিন্ন উপাদানে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা বহন করে। বাঙালী সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান হল দুর্গাপূজা। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে দুর্গাপূজার অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন, এ চিত্র বাংলাদেশের চিত্র সন্দেহ নেই।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ মঙ্গলকাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম অঙ্গ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান হিসাবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রচুর ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রবাদ ঃ ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যে এরকম প্রচুর প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। লাউসেন মাতুল মহামদের সঙ্গে বিবাদ জেনে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে একটি প্রবাদে বলে—

"গোসিংহে স্বরিসাগুটি রহে কতক্ষণ।
ততক্ষণ ক্রোধ রহে হৈলে শুজন॥"(ময়ূরভট্ট/৯)

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে লাউসেন মাতুলকে প্রথমে তিরস্কার করে কতকগুলি প্রবাদ ব্যবহার করে। যেমন—

"সাস্ত্রের মনস্য কভু বচনের নয়।
হেঙ্গলের পুৎস কভু উজু হবার নয়॥
জাহার চরিত্র সেই না ছাড়ে য়াপনা।
পিতল মাজিলে কভু নাই হএ সোনা॥" (ঐ/১০)

লাউসেনের তিরস্কার শুনে মহম্মদ ক্রুদ্ধ হয় এবং লাউসেনকে প্রহার করতে উদ্যত হয়, তখন কর্পূর লাউসেনকে

প্রবোধ দান করতে চেষ্টা করে যে মহামদ পাত্রের চরিত্র সংশোধন হবার নয়। কর্পূর যে প্রবাদগুলি ব্যবহার করে সেগুলি হল—

১) "চোরে নাহি সুনে কভু ধর্ম্মের বচন।" (ঐ)

২) "বানরের গলে নাই সোভে হেমমালা।" (ঐ)

নির্বোধ কালু ডোমকে লাউসেন যখন ধর্মোপদেশ দিচ্ছিল কালু তার কিছুই বুঝতে পারেনি। কালুর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, কালু তাই নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করে—

"বনের বানর ভক্ষএ পত্রফল
সে জানে কেমন ঘি।
বৃক্ষের উপর পাকিল শ্রীফল
কাকের বাপের কি॥" (ঐ/১৭)

লাউসেনের কাছে কালু আপন দারিদ্র্য, জাতি-বৃত্তির কথা নিবেদন করে, কালু আপন অবস্থার জন্য দুঃখিত নয়, কিন্তু লাউসেন কালুকে বুঝিয়ে দেয় দারিদ্র্য সকল গুণরাশি নাশ করে—

নাসএ সতেক গুণ দারিদ্রের দোসে॥

... ...

কুজনের সঙ্গে যদি বৈসে ভাল জনা।
ভাল বুদ্ধি জায় তার হয় কুমন্ত্রনা॥" (ঐ/২৩)

বৃদ্ধের কামোন্মত্ততা বোঝাতে গিয়ে ময়ূরভট্ট কয়েকটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর কামোন্মত্ত হলে নর্তকী উর্বশীকে কামনা করে, তখন উর্বশী বুঝিয়ে দেয় বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা উপযুক্ত নয়—

"অলপ বএ(স) মোর ভেটি নাহি পতি।
লাঙ্গল দড়াতে কভু মুক্তা নাহি গাথি॥" (ঐ/৪৮)

কিংবা, পরনারী আসক্ত হওয়া কাম্য নয়, তার ফল ভাল হয় না—

"পরনারি দেখে কেনে না পায় সোআস্ত।
মুনিলোভে ফণিমুখে দিতে চাহে হস্ত॥" (ঐ)

রঞ্জাবতী-কর্ণসেন লাউসেনের বার বার যুদ্ধযাত্রার কথায় শঙ্কিত হয়, তাই তারা লাউসেনকে নিয়ে গৌড়েশ্বরের রাজ্যের বাইরে বসতি স্থাপন করতে চায়। লাউসেন বুঝিয়ে দেয় ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধে ভীত হওয়া উচিত নয়, তাই সে বলে—

"ই বোল সুনিঞা সেন কহেন উত্তরে।
মস্তক মুড়াব কত উকুনের ডরে॥" (ঐ/৫৬)

রূপরামের কাব্যে এরকম প্রচুর প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়—

১। মন দড় হয় যদি কৃষ্ণ নাম জপে।
কি করিব গয়া গঙ্গা কি করিব তপে॥

২। পুরুষ থাকিলে মিলে শতেক পরশ।
কেবা নাহি বিভা করে চারি পাঁচ দশ॥

৩। মা বাপের উপায় যেজন বস্যা খায়।
গাধার জাহর বল্যা নাম লেখা যায়॥

৪। রোগ-ঋণ-রিপুশেষ রাখিবারে নাই।

৫।	অবশ্য ভাগিনা ধরে মাতুলের ধারা।

৬।	সর্বকাল নাই থাকে সমুদ্রের জল।
সর্বকাল নাই থাকে পুরুষের বল॥

৭।	কেবা বলে সংসারে সতিনী বড় শুভ।
অঙ্গার ধুইয়া দুগ্ধে কভু নহে ধরো॥

৮।	কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন।

৯।	পুত্র বিনে ধন গারি জীবন অসার।

১০।	ভুজঙ্গ ব্যাকুল যেন হারাইয়া মণি

১১।	জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নাই।

১২।	কপালে ঘটিলে কিবা বলা নাঞি যায়।

১৩।	অসত্য সমান পাপ নাহিক সংসারে॥

ঘনরামের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ—

১।	কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।

২।	"নারী হীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বলি সোনায় সোহাগা॥"

৩।	ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।

৪।	স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।

৫।	মিথ্যা কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়।

৬।	"হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি।

৭।	অশ্বত্থামা হত ইতি গজ বলে শেষে।

৮।	এক গালে কালি তার আর গালে চুন।

৯।	কেবা সে বামন হয়ে হাত বাড়ায় চাঁদে।

১০।	কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে।

১১।	বড় বড় বানরের পুঁড়া পারা পেট।
পবন নন্দন বিনা মাথা করে হেঁট॥

১২।	না পারে খণ্ডাতে লোক কপালের লেখা।

১৩।	সন্তাপে সিমুলা ভাসে সোঁতের সেউলি।
প্রভু বিনা পুরী হলো সোঁতের সেউলি॥

১৪।	সকলি ভোজের বাজি মিথ্যা অনুরাগ॥
অবিশ্বাসে বিশ্বাস মন্দ ফল ফলে।

১৫।	লোকে বলে মাকে চেয়ে মাসী করে প্রীত।

মানিকরামের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ—

১।	কন্যা হত্যে জামাতা জীবন হত্যে বাড়া।

২।	চাকর কুকুর তুল্য তাকে কেন এত।

৩।	কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে।

৪।   না পারে খণ্ডিতে লোক যা থাকে কপালে।

৫।   কুপুত্র হইলে তাকে মা নাহি ফেলে।

৬।   তৈল বিহীন চুলেতে কেবল খুড়ি উড়ে।

৭।   সধর্মে থাকিলে হয় সর্ব ঠাঞি পার॥

৮।   যার ধন তাকে এই শোভা নাহি পায়।

৯।   জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।

উল্লিখিত প্রবাদসমূহের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষশাসিত সমাজ, বহুবিবাহ, ধর্মকথা, উপদেশ ইত্যাদি সমাজ ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণ যার ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

প্রতিটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ছড়া, ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি প্রচলিত আছে, সেগুলিকে লোকসাহিত্য হিসাবে গণ্য করা যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে লোকমানসের কৌতুক প্রবণতা এবং রসসিক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনের বিক্ষিপ্ত নানা উপাদান চয়নে এইসব ধাঁধাঁ তৈরী হয়, জাতির সামাজিক ইতিহাসে সেগুলির মূল্য কম নয়। এগুলি দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে গড়ে ওঠায় এর মধ্যে দিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের চাইতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এজাতীয় ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে। ঘনরামের কাব্যে গোলাহাট পালায় এজাতীয় ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালি আছে। নটী সুরিক্ষা লাউসেনকে বন্দি করার জন্য এজাতীয় কতকগুলি হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করেছিল। তার মধ্যে দু'-একটি উল্লেখ করা হল—

১)   "কটিতে ঘাঘর ঘন রুণু ঝুনু বাজে।
কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে॥
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা॥
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
জনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে॥
সুরিক্ষা কহেন কহ হেঁয়ালির সন্ধি।
বিরল বাটে বন পালাল জলজন্তু বন্দী॥ (জেলেদের জাল)

২)   অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ॥
গৃহস্থজনার মৃত্যু গৃহ সঙ্গে হলে॥ (গুটিপোকা) (ঘনরাম/৩০৪-৩০৫)

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও ধঁধাঁর ব্যবহার দেখা যায়। বিবাহসভায় বরপক্ষ ও কনেপক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে ধাঁধাঁর ব্যবহার করা হত। এর মধ্যে দিয়ে ব্যবহারিক বিভিন্ন জিনিসপত্র বা বিভিন্ন বিষয়ে একটা সাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানের ব্যবহার আছে। লোকক্রীড়া হিসাবে শিশু ও বয়স্ক সকলের জন্যই বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। ধর্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র লুইচন্দ্র শিশুসাথীদের সঙ্গে খেলাধুলা করত তার কথা পাওয়া যায়-

"সাথে সব শিশু সঙ্গে   খেলে বালা নানা রঙ্গে
অঙ্গে শোভা করে রাঙা ধূল।
ফণি মণিহার আর   কত রত্ন অলঙ্কার
হাতে হেম গুলতাই বাঁটুল॥" (ঐ/৩১)

গুলতাই-বাঁটুল নিয়ে পাখি শিকার বালকদের একটি সাধারণ খেলা, ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার উল্লেখ আছে। তাছাড়া

মাছখেলা বা জলকুমীর খেলা, ঝালি খেলার উল্লেখ আছে রূপরামের কাব্যে—

"গুলতাই বাঁটুল লয়্যা ফিরে ধাওয়াধাই।
বিশেষেতে মহাশক্তি হৈল দুইভাই॥
দুই সন্ধ্যা ঝালি খেলে চড়্যা বড় গাছ।
ছোট দিঘীর জলেতে সদাই খেলে মাছ॥" (রূপরাম/৯০)

পাশাখেলার উল্লেখ আছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে। হনুমান যখন পার্বতীর কাছে ধাতু-তত্ত্ব জানতে গিয়েছিল তখন পার্বতী সখীদের নিয়ে পাশা খেলছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চা বা মল্লক্রীড়ার কথা আছে। লাউসেন ওস্তাদের কাছে মল্লবিদ্যা চর্চা করেছিল। মল্লক্রীড়া অনেকক্ষেত্রেই মল্লযুদ্ধ হিসাবেও উল্লিখিত। লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চা প্রকৃতপক্ষে কুস্তি। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার কৌশল হিসাবে মল্লবিদ্যা চর্চিত হত; সাধু-সন্ন্যাসীরা কামজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে দেহচর্চা করত। লাউসেনের মল্লবিদ্যা চর্চার বিবরণ দিয়েছেন ঘনরাম চক্রবর্তী—

"অত:পর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুইজনে॥
উভ কর চরণে মাখিয়া বীরমাটি।
শিখাল সরল শূন্য উলটি পালটি॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধায় ধর্ম্মরাজ।
অমনি মালট মারে নাহি করে ব্যাজ॥
ভূতলে আছড়ে ভুজ মারে মালসাট্।
বীরদাপে ধূলায় ধূসর কৈল বাট॥
বাট বাটী উলটি পালটি মুহুর্মুহু।
করে করে হেলাহেলি ঠেলাঠেলি বহু।
চঞ্চল চরণে চাপি ঘন কসাকসি।
মহাযুদ্ধ মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি॥
চরণে চরণে ছাঁদে অবনী আছাড়ে।
দিনে দিনে বিশেষ বিক্রম বুদ্ধি বাড়ে॥
কাছাড়ে পাছাড়ে পড়ে ছাড়ে সিংহনাদ।
গুরুশিষ্য বিক্রমে বাড়িল বিসম্বাদ॥" (ঘনরাম/১৪৩)

সামাজিক অবস্থা ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাংলার নারী সমাজের স্থান ও অধিকার সম্পর্কে জানা যায়। বাংলার সমাজ পুরুষশাসিত, নারী সেখানে পুরুষের উপর নির্ভরশীলা, অসহায়া ও পরান্নজীবী। বাংলার নারী সমাজের এই অবস্থার পরিচয় পেয়েছি চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার মুখে, সতীনের জ্বালায় অতিষ্ঠ দেবী চণ্ডী সেকালের নারীর প্রতিনিধি। নারীর এই স্বামী নির্ভরশীলতার কারণই হল— অধিকাংশ নারীই ছিল গৃহকোণে আবদ্ধ ও অশিক্ষিত। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা সে যুগে গড়ে ওঠেনি; প্রকৃতিগত কারণে নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল হওয়ায় নারী একান্তভাবে পুরুষ নির্ভর ছিল, কিন্তু নারী ভক্তি, প্রেম, স্নেহের জোরে পিতা-পুত্র, স্বামীর পরিবারের কল্যাণময়ী রূপ ধারণ করেছিল। বাঙালী ঘরের নারীর সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীর সম্পর্ক ছিল। রাঢ়বঙ্গের বাঙালী সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন খুব একটা দেখা যায় না। তবে লক্ষণীয়, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চাইতে

ধর্মমঙ্গল যেহেতু অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি তাই ধর্মমঙ্গলে নারীর অবস্থানগত সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।দাম্পত্য সম্পর্কে ধর্মমঙ্গল কাব্যে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বিশেষত বাঙালী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের মত। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কর্ণসেন, রঞ্জাবতী, লাউসেন,কলিঙ্গা,কানড়া, কালু ডোম, লখ্যা ডোমনীর দাম্পত্য জীবনে অনুরূপ দেখা যায় না। বৃদ্ধ কর্ণসেন স্ত্রী-নির্ভর পুরুষ। বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে বালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়; এখানে কৌলীন্য প্রথার দায়ে কুলীন পিতা কুল রক্ষা করেছে এমন নয়, তবু বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে বালিকার বিবাহ স্বাভাবিক ভাবে প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়। বিবাহে পুরুষের কুল-শীল ইত্যাদি প্রাধান্য পেত, তাই কর্ণসেন—

"সকল গুণের গুণী ধনী ধর্ম্মবান।
কুলে শীলে কেবা আছে সেনের সমান॥
বুড়া বলে কদাচ না ভেব বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন॥
বুড়া নয় খানিক বয়সে বটে বাড়া।
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া॥" (ঘনরাম/৭২)

রঞ্জাবতী বালিকা, তার মতামতের প্রশ্ন আসেনি। বিবাহে নারীর মতামতের গুরুত্ব ছিল না। রঞ্জার দিদি ভানুমতী সামান্য আপত্তি প্রকাশ করে–"কি করে কহিব নাথ কর্ণসেন বুড়া।" (ঐ/৭২)। কিন্তু তার আপত্তি স্থায়ী হয়নি। ধর্মমঙ্গলে নারীর মতামতহীন অবস্থার খানিকটা রূপান্তর হয়েছে; তাইতো কানড়া বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে বিবাহ করতে রাজী হয়নি। পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করে একাই গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নারী পতি নির্বাচনে আপন মতামত প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়িয়েছে, নিজে পাত্রকে যাচাই করে নিতে চেয়েছে। লাউসেনের সঙ্গে বিবাহে কানড়া ও কলিঙ্গা পেয়েছে যথার্থ স্ত্রীর মর্যাদা, কালুডোমের স্ত্রী লখ্যাও অবহেলিতা নয়, কালুর কাছে সে সম্মান পেয়েছে। তারা শুধুমাত্র স্বামীর অঙ্গ শোভা হয়ে থাকেনি, ধীরে ধীরে স্বামীর সহযোগী হয়ে উঠতে চেয়েছে, সহধর্মিণী হয়েছে। লাউসেনের ব্রত উদ্‌যাপন ও ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করতে গিয়ে ধর্মমঙ্গলে নায়িকাগণ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত নায়ক দ্বারা বিপন্ন হয়নি। কানড়া ও কলিঙ্গা বীরাঙ্গনা, শিক্ষিতা; স্ত্রীধর্ম পালনের পাশাপাশি রাজ্য শাসন ও প্রজাপালনে পারদর্শিনী।

ধর্মমঙ্গলে বাঙালীর সুছন্দ পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা সকলকে নিয়ে সুন্দর সংসারযাত্রা নির্বাহ হত। তবু কিন্তু বাঙালী পরিবারে শাশুড়ী পুত্রবধূ, ভাজ-ননদ, দুই সতীনের সম্পর্ক খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্কের নানান পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী পতিগৃহে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলেও তাকে নীরবে সহ্য করতে হত। পিত্রালয়েও তার ঠাঁই হত না। ধর্মমঙ্গলে কিন্তু পুত্রবধূর সঙ্গে শাশুড়ীর সুন্দর সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যুর পর সনকা বেহুলাকে দায়ী করেছে, কিন্তু রঞ্জাবতী তার পুত্রবধূদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করেছে। লাউসেনের মৃত্যু সংবাদ পাবার পরে রঞ্জাবতী হাহাকার করেছে কিন্তু পুত্রবধূদের দোষারোপ করেনি। ডোম সমাজেরও একটা পারিবারিক চিত্র পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে। লখ্যা ও তার পুত্রবধূরা একত্রে একান্নবর্তী পরিবার: সেখানে রয়েছে আনুগত্য ও ভালবাসা। লখ্যা শাখা ও শুকা পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে পাঠালে তাদের স্ত্রীরা কিন্তু শাশুড়ীর কথার অবাধ্য হতে পারেনি।

সমাজে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। পুরুষের বহুবিবাহ দোষাবহ ছিল না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৃদ্ধ কর্ণসেন কন্যার বয়সী রঞ্জাবতীকে বিবাহ করে, বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর কানড়াকে বিবাহ করার জন্য লালায়িত হয় এবং কাব্যের নায়ক লাউসেনকে চারবার বিবাহ করতে দেখি— কলিঙ্গা, অমলা, বিমলা এবং কানড়া তার স্ত্রী।

নিম্নবর্ণের সমাজেও একাধিক পত্নী গ্রহণের দৃষ্টান্ত পাই। কালু ডোমের দুই স্ত্রী— লখ্যা ডোমনী ও সনকা। পুরুষের বহুপত্নী থাকলেও বাঙালী ঘরে যে সপত্নী সমস্যা সৃষ্টি হয় তার তেমন পরিচয় ধর্মমঙ্গলে পাচ্ছি না। আসলে ধনী ঘরের পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলেও তেমন সমস্যা সৃষ্টি করেনি কোনদিন। লাউসেনের স্ত্রীগণ পরস্পর ভগ্নীর মত বসবাস করেছে, কলিঙ্গার মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র চিত্রসেনকে সে কানড়ার হাতে তুলে দিয়েছে। সামাজিক আদর্শবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা ঘটলেও সমাজের মূল প্রবণতা তা নয়; কলিঙ্গা তার মৃত্যুকালে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। কলিঙ্গার মৃত্যুকালে রোরুদ্যমান কানড়াকে কলিঙ্গা বলেছে—

"কেবা বলে সংসারে সতিনী বড় শুভ।
অঙ্গার ধুইয়া দুগ্ধে কভু নহে ধবো।
সতীন বিহনে হবে সোহাগে আগল।
তুমি সতীনের শোকে হয়্যাছ পাগল॥" (রূপরাম/৩৪৬)

এবিষয়ে উঁচুনীচু ভেদাভেদ ছিল না, উচ্চবর্ণের সমাজের মতই নিম্নবর্ণের সমাজেও সতীন চোখের কাঁটা ছিল। কারণ কোন স্ত্রীর পক্ষেই সতীনকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই সমস্যা প্রকট। ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখি বহুপত্নীক পুরুষের কাছে কারও সোহাগের পাল্লা ভারী কারও বা ভাগ্য বিড়ম্বিত। লখ্যা ডোমনী যুদ্ধকালে সতীন সনকার কাছে সাহায্য চাইলে সনকা তার ভাগ্য বিড়ম্বনা ও লখ্যার সৌভাগ্যের কথা বলে। আবার কানড়া দেবীর কাছে আপন সতীনের প্রাণ ফিরে চাইলে দেবী জানায়—

"শুন বাছা সংসারে সতিনী শেল কাঁটা।
বিধি তোর ঘুচাল বুকের শেল জাঠা॥
যে ঘরে সতিনী বসে সেই দুঃখে ভাজা।
সে তাপে ত্যজিল তনু দশরথ রাজা॥" (ঘনরাম/৬৬০)

মানিকরামের কাব্যেও আমরা সপত্নী সমস্যার কথা দেখতে পাই।

বাঙালী হিন্দু পরিবারে বা সমাজে কৌলীন্য প্রথা একটা বিষময় সমস্যা ছিল। কৌলীন্য প্রথার ফলে বর্ণহিন্দু বাঙালী নারীকুলের দুর্ভাগ্যের শেষ ছিল না। কুলীন কন্যার বিবাহ কুলীন পাত্র ছাড়া না হওয়ায় কুলীন পরিবারের মেয়েদের বিবাহ প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কৌলীন্য প্রথা ক্রমশ তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে শুধুমাত্র বিবাহ সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়। ফলে সমাজ মানসিকতা দূষিত হয়ে পড়েছিল। কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গেও কন্যার বিবাহ দিত। 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটি এদিক থেকে নানা ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কুলীন কন্যার কারো স্বামী হত শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধ, আবার কারো বালক মাত্র, কেউ বা রোগগ্রস্ত, কানা, খোঁড়া ও অন্ধ। রূপরাম কুলীন কন্যার মুখ-নিঃসৃত উক্তিতে এই চিত্রাঙ্কন করেছেন—

"আর যুবতী বলে দিদি বুড়া ভাতার কাল।
পাকা পনস কোলে যেন ঘুমায় শৃগাল॥
না জানি কপাল দোষে মোর স্বামী বুড়া।
ঘটকালি কর‍্যাছিল নির্বংশিয়া খুড়া॥" (রূপরাম/১৫০)

ঘনরামের কাব্যে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে আরেকজন কুলীন কন্যার মুখে শোনা যায়—

"অধিক অবুঝ পিঠ ভরা কুঁজ
শুতে গেলে করে উঃ।
ঘাড়ে কুঁজ জুড়ে ভুমে যায় গড়ে
মিনসে রাজ্যের কু॥

কেহ কহে আলো তোর ভর্ত্তা ভাল
বচন শুনিতে পায়।
মোর পতি বুড়া কালা কাণা খোঁড়া
খেপা ঢিপেশোকা তায়॥
বামা বামী রটে স্বামী জুবা বটে
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা।
না করে পরশ অলসে অবশ
ভাবে ভামুরের পারা॥" (ঘনরাম/২৫৯)

কুলীন কন্যার এই অবস্থার ফলশ্রুতি আমরা পাই বারুইপাড়ার গৃহবধূ নয়ানীর চরিত্রে। কৌলীন্য প্রথার ফলশ্রুতি নারী সমাজকে অধঃপতিত করেছিল। কুলীন সমাজের নানা কুকর্মের ফল ভোগ করতে হত নারীকে; সপত্নী কলহ, নারীগণের কুলটা হয়ে যাওয়া, বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলি কৌলীন্য প্রথার ফলশ্রুতি বলে মনে করা যায়। ধর্মমঙ্গলে জামতি পালায় সুরিক্ষা ও অন্যান্য নারীগণের অধোগতির চিত্র প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাস্তব চিত্র।

মধ্যযুগে নারীর সতীত্ববোধের মূল্য ছিল যথেষ্ট। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ বহুগামী হলেও নারীর সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা হত, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও তা দেখতে পাই। রূপরামের কাব্যে আখড়া পালায় লাউসেন ছদ্মবেশিনী দেবীকে উপদেশ দিয়েছে, অসতী লোকের সংস্পর্শ পাপ আর পাতিব্রত্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—

"লাউসেন বলে শুন বচন সুসার।
দুচারিণী মেয়্যার বচন যোল ধার॥
অসতী লোকের সঙ্গে করিলে আলাপ।
একাসনে বসিলে বিস্তর বারে পাপ॥
পতিব্রতা সম ধর্ম নাহি ত্রিভুবনে॥" (রূপরাম/১০০)

ছদ্মবেশিনী দেবীকে তাই ফুল্লরা পতিব্রতা হবার উপদেশ দিচ্ছে। ঘনরাম লাউসেনের মুখে অনুরূপ কথাই শুনিয়েছেন—

"স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।
ঘরে যেয়ে ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি॥
পতিব্রতা সম ধর্ম্ম কহা নাহি যায়।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায়॥
ঘরে বসে পায় সেই চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল॥" (ঘনরাম/২৬৪)

অসতী নারীরা সমাজের চোখে ঘৃণিত ছিল, সমাজ তাদের চারিত্রিক স্খলনের জন্য শাস্তি দিত, তারা পতিতা হিসেবে গণ্য হত; সমাজে, গৃহে কোথাও তাদের ঠাঁই হত না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে গদাধর বারুইয়ের স্ত্রী নয়ানীর পরপুরুষ আসক্তির জন্য নাক, কান কেটে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অসতী স্ত্রীদের অঙ্গচ্ছেদন মধ্যযুগের বিশিষ্ট শাস্তি বিধান রীতি—

"সভা সাক্ষী কর্য়া রাজা কোপে কম্পমান।
বারুই বৌএর লাউসেন কাটে নাককান॥
নাক কান কাটে তার মাথার লোটন।
যেন সূর্পনখার নাককান কাটিল লক্ষ্মণ॥" (রূপরাম/১৫৭)

সমাজের মধ্যে বসবাস করার অধিকার অসতী পতিতাদের ছিল না। সতীত্ব বোধ প্রবল হলেও পুরুষরা নারীর সতীত্বে সদাই সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে। ঘরের স্ত্রী পতিতা হলে তাকে বিনা বিচারে পরিত্যাগ করা হত। সমাজের অনুশাসনের মধ্যে থেকে পতিব্রতার জয়গান গেয়েছে বেহুলা, ফুল্লরারা আবার চারিত্রিক শিথিলতার জন্য ব্রাত্য হয়েছে হীরা মালিনীরা। তবে মনে হয় সামাজিক কঠোরতা যতই হোক, অন্তরালে চলত ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি, পুরুষের চারিত্রিক শিথিলতা। ধর্মমঙ্গলে গোলাহাট পালায় সুরিক্ষা, তার সহকারী নারীগণ এবং তার ছ'কুড়ি নাগর (পুরুষ পতিতা অথবা বিকৃত কামাসক্ত পুরুষ) এর কথা পাই। রূপরাম লিখেছেন-

"এই গ্রাম গোলাহাট বেউশ্যা রাজার পাট নিবসে সুরীক্ষা বাণেশ্বর।
ভূত ভবিষ্যতি বাণী আমি সব এহা জানি যার সঙ্গে ছকুড়ি নাগর॥" (ঐ/১৫৯)

এই 'বেউশ্যা রাজার পাট' আসলে পতিতা পল্লী। শুধু নারী নয়, পুরুষও বারাঙ্গনা বৃত্তি গ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রূপরামের কাব্যে—

"দামামা নিশান সঙ্গে ব্যালিশ বাজনা।
দেবীপূজা করিছে পুরুষ বারাঙ্গনা॥" (ঐ/২৪)

নারী পতিতারা যেমন কার্তিকপূজা করত, পুরুষ বারাঙ্গনারা দেবীপূজা করত।সুরিক্ষার ছ'কুড়ি নাগর পুরুষ বারাঙ্গনা হতে পারে। মধ্যযুগে নারীর সতীত্ব রক্ষা যেমন কঠিন ছিল তেমনি পুরুষেরও চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখা খুব কঠিন ছিল। জামতি পালায় লাউসেনকে নয়ানী নামক নারীর কু-প্রস্তাব গ্রহণের চিত্রটি বাস্তব চিত্র। বাংলার নারীর এই অবক্ষয়ের চিত্র বিভিন্ন ভাবে ফুটে উঠেছে ধর্মমঙ্গলে।

মধ্যযুগের সমাজে যে নারীর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল তা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠে বেশ বোঝা যায়। ধর্মমঙ্গলে বোঝা যায় পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকলে কোথাও তেমন কঠোরভাবে পালিত হত না। তবে উচ্চবিত্ত ঘরে বা সাধারণ হিন্দুঘরে সামান্য হলেও পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাই দেবীও লাউসেনকে দেখে জামাই ভেবে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত ধর্মমঙ্গলে দেখি, ঘরের নারীগণ প্রয়োজনে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, সুতরাং তাদের পর্দানসীন হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। কানড়া, কলিঙ্গা নগর রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রা করেছে। তারা জানে নারী পর্দানসীন, পরপুরুষ পরশে নারীর জাতি যায়– "যবন পরশে জাতি যুবতীর যায় "(রূপ/৩৪০)। কিন্তু পর্দানসীন থাকা বোধ হয় সম্ভব হয়নি। নিম্নবর্ণের সমাজে পর্দাপ্রথা ছিল না। তারা পুরুষের সহযোগী হত ও বৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করত। তাছাড়া দাসদাসী, পতিতার পর্দাপ্রথা ছিল না।

নারী সমাজের আরেকটি মর্মান্তিক দিক হল সমহরণ প্রথা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলেও এই প্রথার কথা পাওয়া যায়। রূপরামের কাব্যে পাই কর্ণসেনের ছয় পুত্র যুদ্ধে নিহত হবার পর ছয় পুত্রবধূ অনুমৃতা হয়েছে—

"ছয়পুত্র মৈল মোর রণে ধনুর্ধর।
ছয়বধূ অনুমৃতা শূন্য হইল ঘর॥" (রূপরাম/৩০)

আবার লাউসেনের মায়ামুণ্ড পেয়ে তার চার স্ত্রী অনুমৃতা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কাব্যে সর্বত্র দেখা যায় স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হবার কথা। হয়ত একথা ঠিক ধর্মপ্রাণা সাধারণ বাঙালী নারী স্বেচ্ছায় অনুমৃতা হত, তবে এটা সর্বত্র ঠিক নয়। জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নারকীয় লীলার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বাঙালী ঘরের অধিকাংশ নারীই ছিল অশিক্ষিত ও সামান্য শিক্ষিত, ফলে চিন্তা চেতনায় তারা ছিল অনেক পিছিয়ে। তাছাড়া নারী জীবনের নানা রকম বাঁধন তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, সুতরাং গৃহকর্ম, সাংসারিক মঙ্গল কামনায় বার-ব্রত নিয়েই তারা থাকত। বাংলার নারীগণ ছিল কর্ম-কুশল; তারা গৃহিণী, অনেকক্ষেত্রেই স্বামীর সহযোগিনী হত। ধনী ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়েরাও অনেক সময় অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত। নিম্নবর্ণের

সমাজে নারীরা খেয়া পারাপার করত, পশুপালন করত, ঝুড়ি-চাটাই বুনত. বাঁশ ও বেতের কাজ করত, পসরা সাজিয়ে বেচাকেনা করত। ধর্মমঙ্গলের ডোম নারীরা শুধু পুরুষের সহকর্মী তাই নয় ,তারা ছিল বীরাঙ্গনা। লখাই ডোমনী যথার্থ ভাবে বীরাঙ্গনা, তার পুত্রবধূরাও বীরাঙ্গনার মত আচরণ করেছে। মঙ্গলকাব্যে বাঙালী নারীর যে অবস্থান লক্ষ করা যায় তা ধর্মমঙ্গলে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। রঞ্জাবতী সনকার মতই স্নেহশীলা বাঙালী মা. কিন্তু কানড়া, কলিঙ্গা, লখাই, ধূমসীরা বীরাঙ্গনা। নারীর ব্যক্তিচেতনা ও চাওয়া-পাওয়ার মানসিকতায় যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা যায় কানড়া চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। সুতরাং নারীর অধিকার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে এটা বোঝা যায়। ধর্মমঙ্গলে কলিঙ্গা পিতার কথামত লাউসেনকে বিবাহ করেছে কিন্তু কানড়া পিতার অবাধ্য হয়েছে। গৌড়েশ্বরের স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে আপন প্রেমকে জয়ী করেছে, নিজস্ব কামনার মূল্য দিয়েছে। কলিঙ্গা ও কানড়া এক হিসাবে মাইকেলের প্রমীলার পূর্বসূরী। ধর্মমঙ্গলের নারী শুধুমাত্র বার-ব্রত নিয়ে অন্তঃপুরে বন্দি থাকতে চায়নি, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে তারা বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারী অনেক বেশী বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ধর্মমঙ্গলের নারীরা কেউ কেউ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন— রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, কানড়া প্রত্যেকেই শিক্ষিতা নারী। এ সময়ের বারবিলাসিনীরা শুধু পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, রূপচর্চা, দেহচর্চা, কামকলাতেও শিক্ষিতা। এযুগের নারীরা শুধুমাত্র রূপবান পুরুষ দর্শনে মনকলা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, তারা কামনা-বাসনাকে মূল্য দিয়েছে। বারুই-বৌ নয়ানী ইপ্সিতকে পাবার জন্য কূলে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, কিন্তু সামাজিক অবস্থান মানুষের তথাকথিত মূল্যবোধ তার কামনা-বাসনার মূল্য দিতে পারেনি। সমাজ-আদর্শগত দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাস্থ্যকর না হলেও কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান।

জাতি-বৃত্তি ঃ মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গ নানা ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। ধর্ম বলতে মূলত হিন্দুধর্ম এবং তা লৌকিক বা অনার্য হিন্দুধর্ম। মুসলমান বা ইসলামের ভক্তরা থাকলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুসলমানদের কোথাও সামান্য নামোল্লেখ ব্যতীত তার জাতি, বৃত্তি, জীবন চর্যার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। রাঢ়বঙ্গ প্রাচীনকাল থেকেই অনার্য অধ্যুষিত এলাকা। এই বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা প্রধানত ডোম শ্রেণীর মানুষ। তবে ডোমগণের মধ্যেও বাস্তবে জাতিজনিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ ধর্মঠাকুরের উপাসক হলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা ধর্মঠাকুর পূজিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন ব্রাহ্মণ কবিগণ। মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গে ব্রাহ্মণ শাসিত হিন্দুসমাজ প্রাধান্য লাভ করলে ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা রাঢ়বঙ্গীয় সমাজে প্রবেশ করেছে। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে এই চার বর্ণের কথাই পাওয়া যাচ্ছে।ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক আচার-আচরণে খুব একটা পার্থক্য ছিল না; কিন্তু শূদ্রদের সঙ্গে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলত না। উচ্চবর্ণের কাছে তারা ছিল সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু নিজেকে অনার্য, অন্ত্যজ. রাঢ় রূপে চিহ্নিত করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা দেখতে পাই রাঢ়বাসীকে এভাবে হিংস্র, বর্বর রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমাজ বিবর্তনের পথেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন প্রধান বর্ণের ভেদাভেদ অনেকটা লোপ পায়, আবার অব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলে ধীরে ধীরে একে অপরের সাথে মিলিত হতে থাকে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণেতর যে ছত্রিশটি জাতির কথা আছে তার অধিকাংশই ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। সামাজিক অবস্থান ও বৃত্তি অনুসারে মানুষের শ্রেণী নির্ধারিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনে গুজরাট নগরে মানুষের যে জাতি ও বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তার প্রায় সবগুলিই ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত। তবে মধ্যযুগীয় সমাজ বিন্যাস অনুসারে যে বিবরণ মুকুন্দ চক্রবর্তী দিয়েছেন তা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছুটা নষ্ট

হয়েছিল। জনজীবন কিছুটা মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল, জন্মগত কৌলীন্যের চাইতে অর্থ বা ক্ষমতাগত কৌলীন্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষত বণিক সম্প্রদায় অর্থ প্রতিপত্তির জোরে যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করত, তার পরিচয় ধর্মমঙ্গলেও আছে। ক্ষত্রিয় সমাজও যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণকে নীচে রেখে সমাজের উপরের স্তরে উঠে এসেছে ধর্মমঙ্গল পাঠে তা জানা যায়। ধর্মমঙ্গলের কবি যে বৃত্তিজীবীতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রে কোন ভেদাভেদ নেই। ঘনরাম তাঁর কাব্যে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠীগড় বা ঢেকুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় নানা জাতি, বৃত্তির মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর কথা মনে হলেও এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই নগরে বসবাস করতে শুরু করেছে। শুধু মাত্র বেশ্যা, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ও মুসলমান ব্যতীত সকলেই নগরের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করছে। ঘনরামের বর্ণনা অনুসারে—

"করিয়া আসন গাড়িল নিশান
সম্মানে বসান পদ্য।
স্বধর্মমণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥

....

করি বন্দোবস্ত বসিল সমস্ত
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র ঘোষ বসু মিত্র
মাজ্জিত মৌলিক যত॥
সিংহ দাস দত্ত আদি যে মহত্ত্ব
বসিল উত্তর রাঢ়ী।
গোপ অবতংশ কত রাজবংশ
কুমার করিল বাড়ী॥
তিন কুল রাজ পুরে সুসমাজ
মহত্ত্ব মর্য্যাদাবান।
গণ্য গোপ যত করিল বসত
পাল ঘোষ কলে পান॥
হয়ে হরষিত বসিল নাপিত
তাপিত আছিল যত।
পসারি তাম্বুলী তাঁতি তেলি মালী
কুতূহলে বসে কত॥
ধার্ম্মিক ধনিক পঞ্চ যে বণিক
যতেক কর্ম্মী কুমার।
উগ্রধর্ম্মধারী বসিল আগুরি
শাঁখারী করমকার॥
মদক বারুই আদরে এ দুই
বসিল সজ্জাতি যত।
এই সবাকার নাহি ব্যবহার

হেন হীন জাতি কত॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পল্লবাদি গোপ

সুবর্ণবণিক কলু।

কেওট কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার ধূর্ত্ত

ছুতার বাইতি জালু॥

তাতালে মদক বসিল রজক

গুড়ি নুড়ি চুড়িকার।

পুরীর প্রান্তরে বেশ্যা থরে থরে

অন্ত্যজ জাতি অপার॥

ডোম হাড়ি শুঁড়ি বৈসে গড় বেড়ি

বিশাল কোটাল কোল।

কিরাত প্রবল রণশিঙ্গা মাদল

নিনাদে নাগরা ঢোল॥

পুরীর অন্তর গড়ে স্বতন্তর

বসিল যবন যত।

পাইয়া মর্য্যাদা কত মীরজাদা

সৈয়দ পাঠান কত॥" (ঘনরাম/৫৭-৫৯)

এখানে দেখা যাচ্ছে মুসলমানগণ পৃথকভাবে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে নানা বিভাগ থাকলেও সকলেই মিলেমিশে একত্রে বসবাস করে। ঘনরাম লিখেছেন—

"সমর কুশল বসিল মোগল

শেখজাদা যত জনা।

পেলে এক রুটী সবে খায় বাঁটি

রণে পাশরে আপনা॥" (ঐ/৫৯)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ বর্ণিত ছত্রিশ প্রকার শূদ্র জাতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণী। এরা হল —করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, গোপ, কর্মকার, কুম্ভকার, তৌলিক, শাঙ্খিক. কংসকার, দাস, বারুজীবী মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত, তাম্বুলী, তক্ষক. রজক, স্বর্ণকার, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবক, শেখর, জালিক, মালগ্রাহী, কুড়র, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, মল্ল ইত্যাদি। এদের মধ্যে অবশ্য উত্তম সঙ্কর, অধম সঙ্কর, অন্ত্যজ ইত্যাদি নানা শ্রেণী ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এ সব বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় আছে, তবে তাদের ভেদাভেদ খুব একটা যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত অর্থ ও ক্ষমতার দ্বারা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই দেখা যায় ইছাই ঘোষ গোয়ালা হলেও এবং কর্ণসেন, লাউসেন বর্ণশ্রেষ্ঠ না হলেও সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে তাদের অবস্থান। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা বিদ্যাচর্চা করত এবং অন্যান্যরা স্ব-স্ব বৃত্তিতে অবস্থান করত। যেমন মহামদ লাউসেনের ময়নানগর আক্রমণ করলে সকল শ্রেণীর মানুষ তাদের বৃত্তি ত্যাগ করে পলায়ন করে। কবির বর্ণনায়—

"তামলি পালায় গুয়া করে হুড়মুড়।

মোদক পালায়্যা যায় পেলি তার গুড়॥

কাএস্ত পালায় পেলি কাগজের গড়া।

ব্রাহ্মণ সকল হৈল চারিবেদ ছাড়া॥
বারুই পলায়্যা যায় তেলি আর তাঁতি।
এতদিনে নষ্ট হৈল ময়না বসতি॥" (রূপরাম/৩১০)

কিংবা মানিকরামের কাব্যের দ্বাদশ (অঘোরবাদল) পালায় বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়-

"ব্রাহ্মণের বেদ ভাসে বৈষ্ণবের মালা।
তাম্বুলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা॥
কামারের জাঁতা ভাসে কুমারের হাঁড়ি।
পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি॥
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট।
তাঁত ভাসে তাঁতির ধোবার ভাসে পাট॥" (মানিকরাম/৪৭৭)

তাছাড়া বাইতি, ধীবর, হাড়ি, শুঁড়ি, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজদের কথা তুলে ধরেছেন ধর্মমঙ্গলের কবিরা। বাইতিরা ছিল বাদ্যকর, বাজনা বাজিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মমঙ্গলে হরিহর বাইতির কথা পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলে বেশ্যা শ্রেণীর কথা আছে, এরা দেহোপজীবী। ধর্মমঙ্গলে সুবিক্ষা পালা বা গোলাহাট পালায় এই শ্রেণীর পরিচয় পাই। জামতি পালায় বারুইপাড়া ও গোলাহাট নগরী প্রকৃতপক্ষে নগরের মূল অংশের বাইরে অবস্থিত পতিতাপল্লী ভিন্ন কিছু নয়। এরা যে মধ্যযুগীয় সমাজে খুব একটা নিন্দনীয় ছিল তা নয়। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এরা নিন্দনীয় হলেও বেশীর ভাগ মানুষের কাছে এরা গ্রহণীয় ও আদরণীয় ছিল। অবশ্য একশ্রেণীর মানুষের কাছে তারা গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ বেশ্যার ঘরে অন্নগ্রহণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল। দেব সেবায় তাদের অধিকার থাকত না, তাই লাউসেন সুরিক্ষার অন্নগ্রহণ করলে ধর্মপূজা প্রচার হবে না বলে ধর্মদেব শঙ্কিত হয়েছে। সমাজের পক্ষে এটি খুব একটা সুস্থ চিন্তার বিষয় না হলেও বেশ্যারা একটি বৃত্তিধারী শ্রেণী। মুকুন্দের কালকেতুর গুজরাট নগরেও বারবধূজনের বসতির কথা আছে। বাস্তবিক পক্ষে নানা জাতি ও বর্ণে বিভক্ত হলেও কিন্তু এরা ছিল-হিন্দু সমাজের অংশ। মনসামঙ্গলে মুসলমানরা যেখানে গ্রামে বসবাস করত, ধর্মকর্ম, বিচারকার্য সম্পাদন করত, কৃষি বা মজুরীবৃত্তি গ্রহণ করত, ধর্মমঙ্গলে সেখানে তারা সামরিক বৃত্তিগ্রহণ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। রাঢ়বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই হয়ত তাদের সামরিক বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রাপ্ত সমাজ মূলত চৈতন্য প্রভাবিত অনেকটা মুক্ত সমাজ। জাতিগত বৃত্তিগত ভেদাভেদ থাকলেও ব্যাপকভাবে প্রকট ছিল বলে বোধ হয় না। আসলে জাতিগত, ধর্মগত ভেদাভেদ হ্রাস পেয়েছিল। তাইতো লাউসেন অনায়াসে কালুডোম ও তার বংশধরদের আপন করে নিয়েছিল। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ মানবতাবাদী ছিলেন, তাঁরা লাউসেনকে দিয়ে ডোমদের অন্ত্যজ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, আসলে অর্থনৈতিক অবস্থাই মানুষকে কৌলীন্য দেয়। কালুডোমের সামরিক বৃত্তি গ্রহণে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে; সমাজে তারা প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। কালু ডোমেরা জানে তারা জাতি-বৃত্তিতে রাঢ় (হিংস্র), তবু আপন বৃত্তিতে তারা কুণ্ঠিত নয়। এখানে লখাই ডোমনীর সগর্ব উক্তি স্মরণযোগ্য—

"জাতিবৃত্তি ভূষণ নগরে বেচি চেটা।
মার্জারের গলে নাকি শোভা করে ঘাঁটা॥" (রূপরাম/৩২২)

কিংবা— "লখে বলে জাতি রত্তি ভূষণ আমার।" (ঘনরাম/৬০৬)

জাতিগত ভেদাভেদ কত ঠুনকো ছিল সেকালে তার প্রমাণও আছে ধর্মমঙ্গলে। যুদ্ধে ও প্রতিহিংসায় জাতিগত ভেদাভেদ লোপ পেয়েছিল। মহামদ ময়নানগর জয় করে লাউসেনের স্ত্রী কানড়াকে হাসন-হসন (মুসলমান) কে দিতে চেয়েছে—

"কলিঙ্গা কানড়া দিব হাসন হুসনে।" (রূপরাম/৩১০)

শুধু তাই নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহামদ কালু ডোমকে কুল পুরোহিতের মর্যাদা দেবার কথাও ভেবেছে—

"নতুবা কালুর সঙ্গে করিব পিরিত।

ইনাম করিব তারে কুল পুরোহিত॥" (ঐ/৩১০)

ধর্মপূজক সম্প্রদায়ের কাছে ডোম শ্রেণীর পুরোহিতই গ্রহণীয় ছিল। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ধর্মঠাকুর পূজা করলেও ডোম পুরোহিতই সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। হয়ত ধীরে ধীরে উচ্চশ্রেণীর সমাজেও ধর্মঠাকুরের পূজায় ডোম পুরোহিত গৃহীত হয়েছিল, এখানে সূক্ষ্ম সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গলে রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ মঙ্গলকাব্য থেকে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় উদ্ধার করা কিংবা তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমি খুঁজে বের করা সহজ নয়, কারণ তথ্যগত অপ্রতুলতা। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ রাজনীতি সচেতন ছিলেন না, তাঁরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক তথ্য পরিবেশন করেননি। ধর্মমঙ্গল মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনঘটাময় কাব্যধারা। ধর্মমঙ্গলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ধর্মপূজা প্রচার হলেও কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনী গ্রহণ করেছেন কবিরা। এরকম যুদ্ধবিগ্রহময় কাহিনী রাঢ়বঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার কারণও ঐতিহাসিক। বস্তুতপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) সহিত উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের যুদ্ধ থেকে বর্গী হাঙ্গামা পর্যন্ত রাঢ়বঙ্গ বারবার যুদ্ধবিগ্রহের শিকার হয়েছে। রাঢ়বাসী বারবার নিগৃহীত হয়েছে, ফলে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে। একারণে ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ধর্মমঙ্গল সাহিত্য গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালের গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র গৌড়েশ্বর, ইছাই ঘোষ, কর্ণসেন, সোম ঘোষ, লাউসেনকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কিন্তু তারা যে ঐতিহাসিক চরিত্র হতে পারে সে নিয়ে সন্দেহ করা চলে না। গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তাতে গৌড়েশ্বরকে কখনো দেবপাল, কখনো বা লক্ষ্মণ সেন বলে অনুমান করা হয়েছে। এরকম প্রসঙ্গ রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে—

"মহিমন রাজন সুধর্মপাল রায়।
গোউড়ে রাজতি করে কৃষ্ণের কৃপায়॥

... ...

পুরীর সহিত রাজা গেল স্বর্গবাস।
তার পুত্র রাজা হয় শুনিতে উল্লাস॥" (ঐ/১৮)

ঘনরামের কাব্যেও আমরা অনুরূপ প্রসঙ্গ পাই—

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥" (ঘনরাম/৫২)

ঢেক্করীর ঈশ্বর ঘোষের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে অনেকেই তাকে ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষের তাম্রশাসন বলে মনে করেন। ঈশ্বর ঘোষই সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। লামা তারানাথ লবসেন নামে একজন গৌড়ের রাজার কথা বলেছেন, কেউ কেউ বলেন ইনিই লাউসেন[৩]। অনেকে আবার মনে করেন ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত গৌড়েশ্বর হলেন দেবপালের ভ্রাতা জয়পাল। ধর্মমঙ্গল কাব্যদেহে রূপায়ণে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাই। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সম্রাট বা রাজা বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ করের বিনিময়ে সামন্ত শাসককে

শাসন ক্ষমতা অর্পণ করত। ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষ ও কর্ণসেন আসলে গৌড়েশ্বরের সামন্ত শাসক। কর দিতে অপারগ হলে সামন্ত শাসকের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হত, তাদের বন্দি করা হত। ধর্মমঙ্গলে আমরা দেখি সোম ঘোষকে কর না দেবার কারণে বন্দি করা হয়েছে—

"সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গত বর্ষে মহারাজে গোচর করিতে॥
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফঃস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দীখানা॥" (ঐ/৫৩)

রূপরামের কাব্যেও আমরা অনুরূপ প্রসঙ্গ দেখতে পাই। গৌড়েশ্বরের পাত্র মহামদ কর দিতে না পারা এবং প্রতারণা করার অভিযোগে সোম ঘোষকে বন্দি করেছে—

"পাত্র বলে শুন রায় আমার বচন।
বৎসরের কর দেই পঞ্চাশ কাহন॥
পঞ্চাশ কাহন দেই সাত কাহন কানা।
তার পাকে রাখ্যাছি গোউর বন্দিখানা॥" (রূপরাম/১৯)

গৌড়েশ্বর সোম ঘোষকে মুক্তি দিয়ে ত্রিষষ্ঠীগড়ের সামন্ত হিসাবে নিযুক্ত করে—

"সোমঘোষে ভূপতি আপনি ডেকে কন।
এখানে তোমার আর নাহি প্রয়োজন॥
বারভুঁঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষষ্টির গড়ে॥
সে মোর পরম বন্ধু বান্ধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইরশাল।
কর্ণসেন উপরে বাড়াব ঠাকুরাল।
ঘোষের দোশালা দিল সরবন্ধ জোড়া।
বকশিশ করেন পুন চড়নের ঘোড়া॥
নাগরা নিশানা দিল লিখন পরয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥" (ঘনরাম/৫৪)

আবার বিপত্নীক বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়ে তাকে ময়নাগড়ের সামন্ত নিযুক্ত করে—

"আপনার ছোট শালী তোরে বিভা দিল।
বিধাতা মনের সাধ সফল করিল॥
... ...
ময়না নগরে গিয়া তোল ঘর বাড়ী।
বৎসরান্তে পাঠাইবে রাজকর কড়ি॥" (রূপরাম/৩৫)

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রনীতির একটা অন্যতম বিষয় বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা পরাজিত নৃপতিকে সামন্তরাজে পরিণত করা। গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী মহামদ কৌশলে লাউসেনকে দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিয়েছে এবং বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা আনুগত্য স্বীকার করিয়ে সামন্তরাজে পরিণত করেছে। লাউসেন কামরূপ জয় করে কর্পূরধলের

কন্যা কলিঙ্গাকে ও শিমূল রাজকন্যা কানড়াকে বিবাহ করে রাজ্যবিস্তার নীতির দ্বারা। ঘনরামের কাব্যে পাই—

"অবনীমণ্ডলে এবে রাজা গৌড়পতি॥
প্রতাপে যতেক দেশ জয় করি ভূপ।
আজ্ঞা দিল আমারে জিনিতে কামরূপ॥
কাগজে বুঝিয়া আন কাঙুরের কর।
লিখে দেহ জয়পত্র ফিরে যাই ঘর॥" (ঘনরাম/৩৯১)

পরাজিত কাঙুররাজ লাউসেনের কাছে স্বেচ্ছায় কর প্রদানে স্বীকৃত হয়—

"শুন রাজা লাউসেন মোর নিবেদন।
অবিলম্বে দূর কর কঠিন বন্ধন॥
দারুণ বন্ধনে প্রাণ হয়্যাছে কাতর।
বার বৎসরের দিব কাঙুরের কর॥
কর দিব বেবাক কলিঙ্গা দিব দান।
দশ গুণে রূপবতী শচীর সমান॥" (রূপরাম/২২৪)

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগল সম্রাট আকবর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা পররাজ্য গ্রাস করে সামন্তরাজে পরিণত করেছেন এবং নিজ সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হল কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সামন্তরা স্বাধীন হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। ঢেকুরের সামন্তরাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং কর দিতে অস্বীকার করে। ইছাই ঘোষকে দমন করতে গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে পাঠিয়ে ছিল। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়। তাছাড়া ইছাই পরাক্রান্ত হয়ে গৌড়েশ্বরের রাজ্যে অত্যাচার শুরু করেছিল, এবং সে গৌড় শহরে রাজকর দিতে নিষেধ করে দিয়েছিল—

"গুলতাই বাঁটুল বাঁশ করে বীরপনা।
রাজকর গোউর শহরে হইল মানা॥
... ...
হেনকালে ভাটরায় রাজকর লয়্যা।
গোউর শহরে যায় দোলায় চাপিয়া॥
গোউর শহরে যায় লয়্যা ইরসাল।
রাজকর লুট্যা নিল ব্যালিশ চন্ডাল॥
... ...
ভাটের বিষম দশা ঢেকুরের গড়ে।
রাজকর যাত্যে মানা গোউর শহরে॥
... ...
ইছাই বলিল মোর ঐরি কোন ধাতা।
খেদাড়িয়া কর্ণসেনে লব দন্ড ছাতা।
পরিবার মারিব লুটিব মালমাত্তা।
গউড়ের কর লবে কাহার যোগ্যতা॥" (ঐ/২৩-২৪)

শুধু তাই নয়, গৌড়েশ্বর কর সংগ্রহের জন্য গৌড়ে এলে সোম ঘোষ আপন প্রতাপবশত কর প্রদানের জন্য

উপস্থিত হয়নি—

"জিজ্ঞাসায় জানিল মাহুদ্যা মহীক্ষিপ।
আসে নাই সোমঘোষ ঢেকুরের নৃপ॥" (মানিকরাম/৩৬)

ইছাই ঘোষ আপন ক্ষমতা বলে ত্রিষষ্ঠীগড়ের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'ঢেকুরগড়'। কবি এসম্পর্কে লিখেছেন- "ত্রিষষ্টি ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর।" (ঘনরাম/৬১)। সুতরাং গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করে।

মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার মোটামুটি একটি পরিচয় পাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে। অনেক সময় রাজা বা সম্রাটগণ শাসনকার্যে অবহেলা করে বিলাস-ব্যসনে সময় কাটাত, তারা চলত মন্ত্রী ও পারিষদদের পরামর্শে। এই রকম গৌড়শ্বরের মহামন্ত্রী ছিল মহামদ বা মাহুদ্যা পাতর। অধিকাংশ সময় রাজা বা সম্রাট কোন বিবেচনা ছাড়া মন্ত্রী ও অমাত্যগণের কথামত শাসনকার্য পরিচালনা করত, ফলে জনসাধারণ রাজার অগোচরে নিপীড়িত হত। ধর্মমঙ্গলে আমরা গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহামদকে শাসন করতে দেখি, ফলে লাউসেন বারবার মহামদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে ডোম সম্প্রদায়ের মত সাধারণ মানুষগুলি। মহামদ লাউসেনকে মিথ্যা কথা বলে তাকে বিপদে ফেলবার জন্য, তার সর্বনাশ করার জন্য নানা ফন্দি এঁটেছে। সে লাউসেনের পিতামাতাকে বন্দি করেছে । বিবাহ করতে গিয়ে মহামদের প্ররোচনায় স্বয়ং গৌড়েশ্বর হেনস্তা হয়েছে।স্বয়ং ধর্মঠাকুর এই মধ্যযুগীয় অপদার্থ সামন্ততান্ত্রিক শাসকের প্রতিভূ।মনসা বা চণ্ডীর মত ধর্মঠাকুর স্বয়ং প্রতিষ্ঠা আদায়ে সচেষ্ট হয়নি বটে. কিন্তু অনুচরদের দিয়ে কার্য সম্পাদন করেছে।মনসা, চণ্ডী পূজা প্রচারে অবতীর্ন হয়ে নিজে স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুর নিস্পৃহ থেকে ভীম, হনুমান ও অন্যান্যদের দিয়ে কার্য সম্পাদন করেছে। মাঝে মাঝে স্বয়ং গৌড়েশ্বর ও ধর্মঠাকুরকে একই ব্যক্তি বলেই মনে হয়, কারণ গৌড়েশ্বর অন্যায় জেনেও অবিবেচকের মত মহামন্ত্রীর পরামর্শ মত কার্য করেছে, আর ধর্মদেবও ভক্তের নিপীড়নের কথা জেনেও তার প্রতিকারের কথা ভাবেনি। ধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরের অবিবেচক, নিস্পৃহ, শাসনক্ষমতাহীন রূপ প্রকাশিত হলেও সে অত্যাচারী ছিল না, তার রাজত্বে প্রজারা সুখে শান্তিতে থাকত। সে পুত্রের মত প্রজা পালন করত—

"ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্রপ্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥" (ঘনরাম/৩৭০)

ধর্মপাল গৌড়েশ্বর ঐতিহাসিক ধর্মপাল কিনা তা বড় কথা নয়, মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সে সুশাসন কায়েম করেছিল তা জানা যায়।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কাব্য রচনা করেছিলেন, সম্ভবত ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা সমাপ্ত করেছিলেন। এসময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়নি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, অনেক পরবর্তীকালের কাব্য বলেই হয়ত ধর্মমঙ্গল কাব্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনা নয় কিন্তু নিজ জাতি প্রীতি, সেই সঙ্গে প্রজার কল্যাণ চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মত ধর্মমঙ্গলের কবিগণ শুধুমাত্র পারিবারিক আদর্শ. সামাজিক আদর্শের কথাই বলেননি, বিশেষত ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে চিন্তার ঔদার্য প্রকাশিত। বাস্তব চেতনার মহৎ মানবাদর্শে ধর্মমঙ্গল কাব্যখানি অভিষিক্ত হয়েছে। তাইতো পৌরাণিক দেবীও যুদ্ধযাত্রা করে ভেবেছে কোন উপলক্ষ ছাড়া মানবের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করা যায় না। দেবীর কালগত বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রনীতিগত ক্ষেত্রে যেখানে আদর্শহীনতা ও মানবতাবোধের বড় অভাব সেখানে ঘনরাম মানবতাবোধ ও আদর্শবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাকে ঘনরামের কালগত বাস্তবতাবোধের পরিচয় বলেই মনে করা যায়। কবি কেবলমাত্র পৃষ্ঠপোষক রাজার মঙ্গল কামনা করেননি সেই সঙ্গে তিনি রাজা-

প্রজা সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন—

"চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।" (ঐ/৩৫০)

কিংবা— "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥" (ঐ/৬৮৬)

ঘনরামের পূর্ববর্তী কবিগণের মধ্যে এই উদারতা দেখা যায়নি। অবশ্য শুধু ঘনরামের কাব্যেই নয় সকল ধর্মমঙ্গল কাব্যেই জাতি-বৃত্তিগত চেতনা, রাজা ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধের সামান্য প্রকাশ দেখতে পাই। লাউসেন যখন কালু ডোমকে সঙ্গে করে ময়নানগর নিয়ে যেতে চেয়েছে, তাদের সম্মান দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে চেয়েছে, তখন কালু ডোম লাউসেনের সঙ্গে যেতে চাইলেও দেশের জন্য, সাতপুরুষের ভিটেমাটির জন্য বেদনা বোধ করেছে। রাজা তাদের যদিও কোন খোঁজ করে না, তবু তারা রাজনিন্দা করে পালিয়ে যেতে চায়নি। রূপরামের কাব্যে আছে—

"রমতি গোউড়ে সাত পুরুষের মাটি।
পুর্বাপর রাজার চাকর গুয়াহাটি॥
অনেক দিবস আছি ডোম তের ঘর।
ইবে তত্ব নাই লয় রাজা গৌড়েশ্বর॥
চাকর রাখিতে যদি নিজ সঙ্গে নিবে।
একবার এই তত্ব রাজাকে কহিবে॥
রাজানিন্দা করি কেন যাব পালাইয়া।
সংহতি আপনি লহ রাজাকে বলিয়া॥
রাজাকে বলিলে পরিণাম ভাল হয়।
লবণে জিনিলে তবে ঘরে অন্ন রয়॥" (রূপরাম/২০৫)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যেও সামান্য স্বদেশ চেতনার প্রকাশ দেখা যায়। তাই কবি লিখেছেন—"রাজার কল্যাণ হলে রাজ্যের মঙ্গল।" আমরা জানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বদেশ চেতনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু মানিকরামের কাব্যে কালু ডোম স্বদেশ পরিত্যাগ করতে রীতিমত বেদনা অনুভব করেছে। তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে "জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপিগরীয়সী।" এই ধারণা—

"সে যদ্যপি বলে যেতে তবে যেতে পারি॥
জন্মভূমি জননী স্বর্গের সমতুল।
কেমনে করিব ত্যাগ মমত্বে আকুল॥" (মানিকরাম/৩১১)

শুধু তাই নয়, মুকুন্দ চক্রবর্তীর কালকেতুর মত কালু ডোমেরা রাঢ়বাসী হওয়ার জন্য বেদনাগ্রস্ত নয় এবং সমাজে ঘৃণিত বলে তারা মনে করেনি। বরঞ্চ নিজের জাতি-বৃত্তির গর্বে তারা গর্বিত, নিজ পরিচয় দিতে তারা কুণ্ঠিত নয়। মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে কালুডোম লাউসেনকে জানিয়েছে, তার পক্ষে জাতি-বৃত্তি পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। কবি লিখেছেন—

"ধাইল ডোমের শিশু হইয়া মিশাল।
তাড়িয়ে চলিল কালু শূকরের পাল॥
সেন কন ময়না ধর্মের স্থান হয়।
তায় অনাচার করা উপযুক্ত নয়॥
রেখে চল নদীকূলে বিপিনে নতুবা।

কালু কয় না হল্য আমার তবে যাবা॥
না করিতে পারি ত্যাগ জেতের ব্যাভার।
ইহাতে যে মত হয় হুকুম তোমার॥" (মানিকরাম/৩১৩)

কবি ডোমশিশু আর শূকর ছানাকে সমান করে দিলেও কালু ডোমেরা "জেতের ব্যাভার" ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। আত্মসচেতনতা, স্বদেশ প্রীতি এবং জাতি প্রীতি না থাকলে এই সগর্ব উক্তি সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা যায়; যদিও এই সমস্ত ঘটনায় তৎকালীন রাষ্ট্রনীতির প্রভাব আছে।শাসক চেয়েছিল প্রজাকে ভূমিতে ধরে রাখতে, তাই বাসস্হান ত্যাগ করতে হলে শাসকের অনুমতি প্রয়োজন হত।

ধর্মমঙ্গলে ডোম সমাজের বীরত্বের কথা আছে, কালুডোম, লখাই ডোমনী, শাকা-শুকা প্রতিটি চরিত্র বীরত্বে উজ্জ্বল। একারণেই ডোম সমাজের এই বীরত্ব ও নিষ্ঠা সুন্দরভাবে কাব্যে রূপলাভ করেছে। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য ফলশ্রুতি লক্ষ করা যায়। দেশে সুখ সমৃদ্ধি ছিল, কিন্তু গৌড়ের দুরবস্থা দেখে গৌড়েশ্বর বিস্ময় প্রকাশ করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় নাই, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত নয়; প্রজার দুর্গতির কারণ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও রাজকর্মচারীদের দুর্ব্যবহার। সামন্তশাসকগণ অধিক লোভে দিল্লীর মোগল শাসকদের মত বিশাল আড়ম্বরময় বিলাস-ব্যসনে প্রচুর ব্যয় করার ফলে প্রজাদের কর ভারে জর্জরিত করেছে। স্থানীয় কর্মচারীগণও শাসকের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত কারণে অতিরিক্ত কর আদায় করেছে। অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত, তার প্রারম্ভিক পরিচয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বর পাত্র মহামদের কাছে জানতে চেয়েছে—

"দেশে নাই অনাবৃষ্টি প্রতি বিঘা আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা॥" (ঘনরাম/৩৫১)

শাসকের অগোচরেই রাজকর্মচারীরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করত একথা ঐতিহাসিক সত্য।
বস্তুত পক্ষে মহামদ ক্ষমতা পেয়ে যে অত্যাচার শুরু করেছিল তার বর্ণনা ময়ূরভট্ট, ঘনরাম ও মানিকরামের কাব্যে পাওয়া যায়। ময়ূভট্টের কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তী বর্ণিত শাসকের অত্যাচারের বিবরণ আছে। প্রজাদের নিকট থেকে চাষের বিনিময়ে অধিক কর আদায় হত, ষোল কাঠায় কুড়ার জায়গায় এগার কাঠায় কুড়া পরিমাপ করা হত, ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তিতেও কর আদায় করা হত— এসমস্ত বিবরণ ময়ূরভট্টের কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে। ঘনরাম চক্রবর্তী কাব্যে শাসকের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

"অবিচারে ভাঙে রাজ্য গৌড়ের ভুবন ।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥
কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয় ।
অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্মভয় ॥
কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি।
অসতে আদর নিত্য সৎপথে কন্টক।
সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইয়া ঠক॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত ।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত॥
রাজকর লোকের তেসনি নিল বাড়া।

অতেব সকল প্রজা হোলো দেশছাড়া ॥
সেনের আসানে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা॥
কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।
প্রজার বিপত্তি এত নাহি জানে ভূপ॥"(ঐ/৩৫১)

মানিকরামের কাব্যেও এই বর্ণনা পাই—

"দুরাচার দুষ্টমতি অতি খলচিত্ত।
দোষ বিনে প্রজাগণে দুস্খ দেও নিত্য॥
জবুল জমির জমা বেশী করে ধরে।
যে না দেয় তার সদ্য গুণাকার করে॥
ক্ষেতে হলে খন্দ সে বেচে লয় সব।
বিব্রত হইল প্রজার পেয়ে আধিভব।" (মানিকরাম/৩৩)

শুধু তাই নয়, দেশ থেকে লোক পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেছিল। এ হল তৎকালীন বাস্তব রাষ্ট্রচিত্র। প্রজারা তিন সনের কর দিয়েও বন্ধন দশা মুক্ত হচ্ছে না। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেদের দিয়ে বেগার খাটানো হচ্ছে এরূপ রাষ্ট্রচিত্র পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গলে। যেমন—

"রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি॥
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রীবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকর।
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে॥
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার॥
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা দিলে নাহি মন॥" (ঘনরাম/৩৫২)

রামদাস আদকের কাব্যেও অনুরূপ ঘটনার সাক্ষ্য মেলে—

"দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক।
ভাগ্যহীন জনার জনমে নাই সুখ॥
সম্মুখে সিপাই শোভে শমন সমান।
হায় বুঝি বিদেশে বিপত্ত্যে যায় প্রাণ॥"[২৪]

সমসাময়িক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কবি প্রদত্ত চিত্রাবলীকে অযৌক্তিক বলার যৌক্তিকতা নেই; তবে অত্যাচার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য না হলেও ঘনরাম, রূপরাম, মানিকরাম গাঙ্গুলী কলিযুগে যে অনাচারের চিত্র দিয়েছেন তা একেবারে অবাস্তব নয়। আবার রূপরাম পর্তুগীজ জলদস্যু বা হার্মাদের অত্যাচারের কথা বলেছেন, এর মধ্যে অবশ্যই সমকালীন ঐতিহাসিক সত্যকে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ধরাই যেতে পারে দেশে সুখ-শান্তি খুব

একটা বিরাজিত ছিল না।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ ধর্মমঙ্গল যেহেতু মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের কনিষ্ঠ ধারা, তাই এখানে পরিবর্তিত যুগের অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ যুগ পরিবেশে আর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্যন্ত। তখন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক পরিবর্তিত। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজনৈতিকক্ষেত্রে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলার বুকে তার প্রভাব পড়েছিল। ধর্মমঙ্গলে এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কিছুটা পাই।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং মুদ্রার প্রচলিত নিম্নতম মান ছিল 'কড়ি'। সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র নির্মিত মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও ধর্মমঙ্গলে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার কথা খুব একটা পাই না। সাধারণ জনজীবনে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য, আদানপ্রদানের জন্য মুদ্রা হিসেবে কড়ি প্রচলিত ছিল। কড়ির ব্যবহার আমরা ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখতে পাই। কড়া, গণ্ডা, পোণ বা পণ ইত্যাদি একক কড়ি গণনার জন্য ব্যবহার করা হত। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আমরা কড়ি বা কড়ার ব্যবহার দেখতে পাই—

"পাজ্জাত খাউই বেচে চরখা নিয়র।
পাঁচ গন্ডা বান্ধা দিল মাটিয়া পাথর॥
নাটাই মলিন সুতা অল্প দরে দিল।
চারিকড়া ধুনখাড়া নগরে বেচিল॥
আর যত সম্ভাবনা সব বেচে বুড়ী।
ঘর দ্বার বেচ্যা পাইল দশপণ কড়ি॥" (রূপরাম/১৬৩)

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যেও কড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—

"তৈল চুয়া চন্দনে ফুরাল সব কড়ি॥" (ঘনরাম/২৮৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে টাকার ব্যবহার দেখতে পাই। তখনও কাগুজে টাকার প্রচলন হয়নি, কিন্তু ধাতব টাকার প্রচলন ছিল—

তুষ্ট হৈল কালুবীর সেন তারপরে।
ভঞ্জিত করিয়া টাকা সুবলবাজারে॥
বসন ভূষণ কিনে দিলেন সভাকে।
তীক্ষ্নধার হেতের দিলেন একে একে॥" (মানিকরাম/৩১৩)

প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার কমে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ স্বর্ণমুদ্রা যে কখনো চোখেও দেখেনি এমনি পরিচয় পাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে। রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মানুষের বৃত্তি, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নানারূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষি ঃ মধ্যযুগীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল কৃষির উপরে। বাংলার বেশীর ভাগ মানুষ কৃষি কর্মে নিযুক্ত থাকত। বাংলার ভূমির উর্বরতা শক্তি হেতু সামান্য শ্রমদানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। খাদ্যশস্য ধান ছাড়াও গম, পাট, শন, তিল, তিসি, আখ, কার্পাস, বিভিন্ন ধরনের মসলা উৎপন্ন হত। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফল, পান, ফুল উৎপন্ন হত, যার উপর বাংলার মানুষ নির্ভর করত। ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার সঙ্গে যুক্ত রামাই পণ্ডিত বিরচিত 'শূন্যপুরাণ', এই গ্রন্থখানিতে শিবঠাকুরের কৃষিকার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। রামাই পন্ডিত ধানের জন্মকথায় বাংলার বিভিন্ন প্রকার ধানের পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে,

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে, নাথ সাহিত্যে আমরা শিবঠাকুরের কৃষিকর্মের পরিচয় পাই। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করা সম্ভব হত না। বিভিন্ন বৃত্তিজীবীতার পাশাপাশি ব্যবসায়, সামরিক বৃত্তি বা চাকুরী ইত্যাদির প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে চলেছিল। তবে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের স্বীয় বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল না। রাঢ়বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা ডোমেরা— শূকর, গরু, মহিষ ইত্যাদি পশুপালন করত। কালুডোম ময়না যাত্রাকালে তাদের প্রতিপালিত শূকর নিতে ভোলেনি—

শাখা সুখা গোড়াইল শূকরের পাল।
কর্পূর বলেন দাদা হইল জঞ্জাল॥
ধর্মের শাসন মহী ময়নানগর।
জাতি অনুসারে ডোম নিলেক শূকর।

....

মষি গোরু দিব সভে শূকর বদলে।
ইথে আর নাহি কাজ লাউসেন বলে॥" (রূপরাম/২০৫)

মানিকরামের কাব্যেও কালু ডোমেদের শূকর পালনের প্রসঙ্গ পাই। কৃষিকার্য, পশুপালন ইত্যাদি বৃত্তি ছেড়ে মানুষ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবসায়, শিল্প ও চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

বাণিজ্য ঃ মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালীর বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে; একথা সকলের জানা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাণিজ্য বা ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা সমাজে প্রভাব বিস্তার করেনি। বোধহয়,'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই প্রবাদ আরও অনেক পরবর্তীকালের সৃষ্টি। সুতরাং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতি বাণিজ্য নির্ভর নয়, তবে ব্যবসা সংক্রান্ত ধারণা সমাজে গড়ে উঠেছিল। তাইতো দেখি লাউসেনের বিদেশযাত্রা এবং গৌড়েশ্বরের চাকুরী গ্রহণের কথা শুনে রঞ্জাবতী লাউসেনকে বাণিজ্যে উৎসাহিত করেছে। রূপরামের কাব্যে লাউসেনের গৌড় যাত্রাকালে রঞ্জাবতী বলেছে—

"বিলাতের নামে ক্ষেম নাহি প্রয়োজন।
বেপার করিব আমি বাণিজ্যার ধন॥
লঙ্কার বাণিজ্য তোর সমুদ্রে জাহাজ।
পরধন প্রত্যাশে পরোক্ষে পাই লাজ॥" (ঐ/২১০)

লঙ্কার বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গটি এখানে সম্ভবত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল থেকে নেওয়া। এসময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে উঠেছিল স্থানীয় হাট বা বাজারকে কেন্দ্র করে, যেমন—মোদকরা লাড়ু নির্মাণ ও বিক্রি করত, তামলীরা পান-সুপারি বিক্রি করত, মালীরা ফুলের মালা বিক্রি করত। ফুলমালী বলেছে-

"দেবালয় দক্ষিণে বসিবে দুই ভাই।
তোমার প্রসাদে আমি ফুল বেচ্যা খাই॥
অনেক দিবস আমি গোলাহাটে আছি।
তিন সন্ধ্যা বাজারে বাজারে ফুল বেচি॥" (ঐ/১৬২)

শিল্প ঃ মঙ্গলকাব্যে কোন বৃহৎশিল্প সম্ভাবনার কথা পাওয়া যায় না, তবে গ্রামীণ ক্ষুদ্রশিল্পে, কুটীরশিল্পে বাংলা উন্নত ছিল। ধর্মমঙ্গলে অলঙ্কার শিল্প, বস্ত্রশিল্প, শঙ্খশিল্প, শোলার কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি কুটিরশিল্পের পরিচয় আছে। অলঙ্কার শিল্প বাংলায় কত উন্নত ছিল তার পরিচয় আছে মঙ্গলকাব্যে। তাছাড়া অলঙ্করণ শিল্প, রং-তুলির কাজ, সূঁই-সুতার কাজ করে, চরকায় সুতা কেটে, ফুলের মালা গেঁথে বিক্রি করে মানুষ জীবিকা অর্জন

করত। রূপরামের কাব্যে চরকায় সুতা কাটার প্রসঙ্গ পাই। শোলার কাজের কথাও পাই ধর্মমঙ্গলে, বিভিন্ন ধরনের শোলার শিল্পকর্ম দ্বারা মানুষ জীবিকা অর্জন করত। বাঁশ, বেত ও কাঠের কাজে এক শ্রেণীর মানুষের জীবন ধারণ চলত। ছুতারগণ কাঠের কাজ করত, ডোমেরা বাঁশ ও বেতের ডালা, কুলা, ঝুড়ি বুনে বিক্রি করত, তাল পাতার চাটাই, মাদুর তৈরী করত। দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় বলেই এ সমস্ত কুটীরশিল্পের উপর আপামর সাধারণ মানুষের অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ চাকুরীকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা মধ্যযুগে প্রচলিত হয়নি। চাকুরীবৃত্তি মধ্যযুগে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নিন্দনীয় ছিল, তাইতো লাউসেন গৌড়েশ্বরের চাকুরী গ্রহণ করেছে একথা শুনে রঞ্জাবতী জানায়—

"তোমার বয়স হৈল আঠার বৎসর।
কার বোলে হৈলে তুমি রাজার চাকর॥ (ঐ/২১০)

সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ধারণা ছিল, কিন্তু কালু ডোমের সগর্ব উক্তি সত্ত্বেও দেখা যায় আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষ তাদের জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে জীবিকা অর্জনের নতুন পথকে স্বীকার করেছিল। লাউসেন তাই বলেছে—

"দুই ভাই গৌড়ে হব রাজার চাকর।
ইনাম মাগিয়া নিব ময়না নগর॥
মল্লবধ করিলে বাড়িল বীরপনা।
বারভূঞা হৈতে তোমার বাড়িব মাহিনা॥" (ঐ/১১৭)

চাকুরীবৃত্তিতে মাহিনা অর্থাৎ অর্থের মূল্য মানুষ খানিকটা হলেও বুঝতে পেরেছে। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যেও আমরা অনুরূপ প্রসঙ্গ পাই—

"মামা আছে তার কাছে মহৎ জানাব।
নম্র হয়ে নৃপতির চাকরি লইব॥
জাহির করিব গুণ সভার ভিতর।
লইব জাইগির করে ময়না নগর॥
আর যে নগদ মাহিনা বারমাস পাব।
দেশে বসে দেউল জাঙ্গাল তায় দিব॥" (মানিকরাম/১৫৫)

লাউসেন বুঝতে পেরেছে নিজের সুনাম, উন্নতির জন্য, প্রজার মঙ্গল সাধনের জন্য অর্থ প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের ফলে আমরা দেখি ডোম সমাজ তাদের স্বীয় জাতি-বৃত্তি পরিত্যাগ করে সামরিকবৃত্তি গ্রহণ করছে। জাতিগর্বে গর্বিত হলেও তারা দেখেছে তাদের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন, পাত্রের দুর্নীতি তথা শাসকের শোষণ, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে শাসকের উদাসীনতা। তাইতো কালুর খেদোক্তি-

"অষ্টম পুরুষ এই রমতিয়ে বাস।
নৃপতি চাকর বল্যা না করে তল্লাস॥" (ঐ/৩১০)

তাই কালুর পক্ষে লাউসেন প্রদত্ত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি-

"হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইনাম মাহিনা দিব বাড়ার বিভব॥
বান্ধাব পুরট পাগ পরো পট্টধুতি।
দলুই সবার কানে দোলাইব মতি॥

ময়না পশ্চিমে পাশে তুলে দিব বাড়ী।
নারীগণে তোমার পরাব পাটশাড়ী॥
কাটা কড়ি কঙ্কণ কনক কণ্ঠহার।
পরিবে থাকিবে সুখে ত্যজ দুঃখ ভার॥" (ঘনরাম/৩৪৭)

মানুষের পক্ষেও এই প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত বিষয়সমূহে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার আরও একটি পর্যায় দেখতে পাই 'গোলাহাট পালা'য়। এখানে দেখা যাচ্ছে নারী তাদের কুলত্যাগ করে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করছে। তারা লোকালয়ের বাইরে নিজেদের সাম্রাজ্য তৈরী করেছে। বিদেশী পুরুষকে ভুলিয়ে তারা ব্যবসা ফেঁদেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ডোমদের দারিদ্র্যময় জীবনযাপনের পাশাপাশি তারা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক পরিবর্তনে মোগল হারেম থেকে আগত বিলাস-ব্যসন, ব্যাভিচার সমাজে প্রবেশ করে ছিল তার সুন্দর নিদর্শন বহন করে এই প্রসঙ্গগুলি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রনৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব পড়েছিল বাঙালী সমাজে। ক্রমাগত আক্রমণকারীদের আক্রমণে রাঢ়বঙ্গের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সুগঠিত হতে পারেনি। দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণী অর্থনৈতিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত কিন্তু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল না। অপরদিকে নতুন আমদানি করা বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল শাসককুল ও ধনীরা। আর সাধারণ মানুষ শাসনের নামে কর্মচারীদের দ্বারা নানা ভাবে শোষিত হত, ফলে তাদের দুর্দশার শেষ ছিল না। রূপরামের কাব্যে কালু ডোম জানিয়েছে হাটে কুলা-চেটা বিক্রি করলে তবে তাদের ভাত জোটে। মানিকরামের কাব্যে কালুডোমের উক্তিতেও তাদের দুর্দশার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন—

কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।
কান্তা বুনে কুলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই॥
শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।
হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ॥
ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞি বাস।
আপুনি পরিচয় দিবে এই অভিলাষ॥" (মানিকরাম/৩১০)

প্রাকৃতিক বিপর্যয় না থাকা সত্ত্বেও প্রজার দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান করে ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র লিখেছেন — "প্রজাদের দুর্গতির কারণ রাজকর্মচারীর ব্যবহার। ইহা সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ফল। এদিকে যেমন সামন্তেরা অধিক লোভে ও দিল্লীর মোগল সম্রাটদের বিশাল আড়ম্বরময় বিলাসব্যসনের অনুকরণে প্রচুর ব্যয় করিবার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া কর আদায় করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ বাদশাহের দোহাই দিয়া অথবা ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়াছে।"[১৫] রূপরামের কাব্যে কালু ডোমদের এই দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যাই। লাউসেন তাদের আর্থসামজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার সময়ে নারীরাও ঘরে বসে থাকেনি, কেউ পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করেছে, কেউ দাসী বৃত্তি গ্রহণ করেছে, পথে পথে জিনিসপত্র ফেরি করেছে, মুড়ি ভেজে বিক্রয় করেছে। মানুষ অর্থের জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রয় করতে উদ্যত হয়েছে। ভাজন বুড়ির মত বৃদ্ধা যে শুধুমাত্র কাম-তাড়িত হয়েই লাউসেনকে বশীভূত করার জন্য যথাসর্বস্ব বিক্রি করেছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। সে বিদেশী পুরুষকে বশীভূত করে কিছুটা উপার্জনের স্বপ্ন দেখেছে। ভাজন বুড়ীর কথায় তার দারিদ্র্য সুস্পষ্ট—"মোর ভাড়া ভাঙ্গা পাথর জল খাই ভাঁড়ে।" (ঘনরাম/২৮৩)। সুতরাং মানুষ ঘটি, বাটি, চরকা, সর্বস্ব বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। জিনিসপত্রের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাইতো

ভাজন বুড়ি মালিনীকে বলেছিল—

"বুড়ী বলে বাড়া বেটী দিল বুকদাপ।
মা বাপের পুণ্যে কিছু কড়ি কর মাপ ॥" (ঘনরাম/২৮৩)

সমাজে চোর ডাকাতের অত্যাচার ছিল। মানুষের নৈতিকতাবোধেও অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছিল তাই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষকে নানা ভাবে শোষণ-পীড়ন করত এবং চোর ডাকাতকে দিয়ে অপকর্ম করিয়ে নিত। অপরদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ নতুন নতুন বৃত্তি গ্রহণ করে তার সুফল পেয়েছিল। পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করে মানুষ পেল স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন। কালু ডোমেরা সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। লখাই ডোমনীর উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লখাই ডোমনী কালুকে বলেছে—

"বৃত্তি বেচা ব্যবসা বিস্মৃত কেন হবে।
সেনের সম্পত্তি বিনা দানদার কবে ॥
পাসরিলে পূর্ব্বপাড়া পুকুরের পাড়।
কত হবে সুজন আখের জাতি রাঢ় ॥
মাটির পাথর ভাড় ভাঙ্গা কুঁড়েঘর।
তখন তেমন দশা এক লক্ষেশ্বর।
কখন চিনিতে তৈল তামাক তাম্বুল ॥
লখে কোন না জানে নাথের আদ্যমূল ॥
ঘুষিলে ছ পণ কড়ি নাই ছিল নাম।
এখন আপনি কত বিলাই ইনাম ॥
বলাও দলুইরাজ কানে দোলে মতি।
তখন পড়িতে টেনা এবে পট্টধুতি ॥
ভূমে হাঁটু পাতি পূর্ব্বে প্রবেশিতে ঘর।
এখন শয়ন অট্টালিকার উপর ॥
সম্প্রতি ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু।
সুখে খেতে খুঁদকুড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু ॥
বেজার হয়েছে বুঝি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি ॥" (ঐ/৬১৯)

ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ধনী জমিদাররা, রাজা মহারাজারা বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিনযাপন করত। পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানে প্রচুর ব্যয় করত, মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার পরিধান করত, প্রচুর দান-ধ্যান করত; এই সমস্ত প্রসঙ্গগুলি এক শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচায়ক।

ধর্মনীতি ঃ মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় একটি প্রধান বিষয় হল ধর্ম। তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্য ধারায় যে সমাজকে পাই তা ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজ। কবিগণ ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্মকেই আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বর্ণনা করেছেন। ধর্মমঙ্গলে যে সমস্ত সামাজিক অনুশাসন-ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হয়েছে তা শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রিয়াকর্ম। তবে কবিগণ শাস্ত্র নির্ধারিত ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও বেদ-বহির্ভূত লৌকিক ক্রিয়াকর্মকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন রঞ্জাবতীর বিবাহ চিত্র বর্ণনায় আছে—

"বেদের বিধানে বিপ্র বাঁধে গাটছলা ॥

. . . .

বৈদিক লৌকিক কার্য্য সব কবি সায়।
সেই রাত্রে রাজা তারে করিল বিদায়॥" (ঐ/৭৭)

পৌরাণিক তন্ত্রের প্রভাবও সাধারণ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম শাস্ত্রাদির প্রভাব জনমানসে কতখানি ছিল তার পরিচয় আমরা পাচ্ছি ধর্মমঙ্গল কাব্যের অভ্যন্তরে। ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী কখনো রামায়ণ, কখনো বা মহাভারতের আদলে গড়ে উঠেছে। রামায়ণ, মহাভারত থেকে প্রচুর কাহিনী প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যে এবং তা জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মিশ্রিত রূপ পাওয়া যায় ধর্মমঙ্গলে। হিন্দুসমাজ কখনোই রাম ভক্ত ছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু ঘনরাম স্বয়ং রামভক্ত ছিলেন। ঘনরাম ও মানিকরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও ধর্মের চাইতে হরি ভক্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন বেশী, তাই কাব্যে যত্রতত্র হরিভক্তির প্রসঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। ঘনরামের কাব্যে কাব্যোৎপত্তির যে কাহিনী পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি রাম পাঁচালী লিখতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রাম বন্দনার স্থলে ধর্ম বন্দনা লিখে ফেলায় গুরুর নির্দেশে তিনি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। আসলে পৌরাণিক দেবীই ক্রমপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যের দেবীতে রূপান্তরিত, আবার বাঙালী সমাজের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলকাব্যের ভয়ঙ্করী দেবী শান্ত মাতৃমূর্তিতে পরিণত হয়েছে, ধর্মমঙ্গল কাব্যেও তার কথা পাই।

ধর্মঠাকুর বিশেষত রাঢ়বাসীর দেবতা, ধর্মমঙ্গলে অনার্য রাঢ়বাসীর ধর্মজীবনের পরিচয় পাই। আমরা জানি ধর্মদেবতার অবয়ব তৈরীতে অনেক দেবতার অংশ চয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু এই পরিমার্জনা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই উচ্চবর্ণের সমাজে ধর্মঠাকুরের ঠাঁই হয়নি। অনার্য রাঢ়বাসী ডোমদের দেবতার পূজা পদ্ধতিতে, আচার-আচরণে, উপকরণে অনার্য ছাপ আছে, কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, ডোম, বাউরী ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষরাও ধর্মদেবকে তাদের উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা জাতি হিসাবে শূদ্র, অন্ত্যজ— তাঁতি, শুঁড়ি, দুলে, বাগদী, রজক, মুচি, হাড়ি এরাও ধর্মদেবের ভক্ত হয়েছে। ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামক গ্রন্থে ধর্মপূজক যে সকল জাতি তাম্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিল সেই সব সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে—

"সদ্‌গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকর।
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥
হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি।
মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদ জাতি॥
স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্ম্মকার
সূত্রধর গন্ধবেণে ধীবর পোদ্দার॥
ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা।
পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥[২৬]

কালক্রমে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ধর্ম উপাসনা প্রচারিত হয়েছিল। তাইতো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা পূজার পাশাপাশি ধর্মদেব ঠাকুরঘরেও স্থানলাভ করেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি এক সমন্বয় যুগের সৃষ্টি; এই সময়কার চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে সর্ব দেবদেবীর অভেদত্বের কথা পাই। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে ধর্মঠাকুরের যে স্বরূপ ধরা পড়েছে তাতে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, যম, সূর্য,শিব, বুদ্ধ সকলের প্রভাব আছে। একটা সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে এরূপ সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কোথাও কোথাও শাক্ত দেবী ও শৈব দেবতার বিরোধ ধরা

পড়েছে। যেমন—

"কর্ম্মফলে হৈল যত দেবতার দণ্ডী।
অতেব ইছাই বধে খেমা দিবে চণ্ডী॥
এত শুনি কোপে জ্বলে হেমন্তের ঝি।
কোন যুক্তে তু বেটা বদনে কৈলে কি॥
ভাল বলি প্রধান পুরুষ ধর্ম্মরাজে।
সবাই বিকল বটে আপনার কাজে॥
বাড়াবে আপন পূজা বধি মোর জনে।
এমন উদার কেবা আছে ত্রিভুবনে॥" (ঘনরাম/৫৩৩)

এই বর্ণনায় স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এখানে নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য লাভ করেছে।অবশ্য দেবীর এই বিদ্বেষ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। আসলে এই পর্বে জনমানসে ধর্মসমন্বয়ী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। তা অবশ্য চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের ফলাফল বলেও মনে করা যেতে পারে। রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন- ধর্মপূজায় কোন ভেদাভেদ থাকত না—

"ধর্মের গাজনে বাদ্য বাজে নানা ঠাঁই।
ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ চন্ডাল ভেদ নাই॥ (রূপরাম/৯৩)

কালকেতুর গুজরাট নগরে যে আদর্শ সমাজ পরিকল্পনা কবি দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, ধর্মমঙ্গলে এরকম আদর্শ সমাজ সৃষ্টির, ধর্ম ভেদাভেদহীন সমাজ পরিকল্পনার কথা পাই ঘনরামের কাব্যে। ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে 'আদ্যঢেকুর পালা'য় ইছাই ঘোষের ঢেকুরগড় স্থাপন ও জনবসতির ছবিতে আমরা অনেকটা মুকুন্দ চক্রবর্তীর গুজরাট নগরের ছবি পাই। এখানে সকল শ্রেণীর মানুষকে ধর্ম-ভেদাভেদ ভুলে আপন আপন গোষ্ঠীর সহিত নির্দিষ্ট এলাকায় বসতি স্থাপন করতে দেখা যায়।এরকম ধর্ম সহিষ্ণু মনোভাব সমাজে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ়বাসীর লৌকিক ধর্মাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুর পূজা সম্পর্কিত নানা ধরনের লৌকিক আচার ছাড়াও নানা ধরনের পালাপার্বণ, বার-ব্রত রাঢ়বঙ্গের বাঙালী জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। ধর্মমঙ্গলের কবিগণ কাব্যে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা বন্দনার.পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা করেছেন, কেননা চৈতন্যদেব জনসমাজে অবতার রূপে পূজিত হয়েছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন—

"কলিকাল আইল বিষম অন্ধকার।
নবদ্বীপে হও গোরাচান্দ অবতার॥"(রূপরাম/৩)

মানিকরাম গাঙ্গুলীও কাব্যে চৈতন্য-বন্দনা করেছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সমাজে চৈতন্যদেবের প্রভাব ছিল। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে বিপ্র বন্দনা করেছেন। ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভাব খানিকটা খর্ব হলেও ব্রাহ্মণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তাই কবিরা ব্রাহ্মণ বন্দনা করতে ভোলেননি। ধর্মমঙ্গলে রূপরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলী দিক্ বন্দনা করেছেন। এই বন্দনা অংশগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখানে ধর্মভীরু বাঙালীর সহস্র-কোটি দেবতার মধ্যে বহু দেবতার পরিচয় পাই। তাদের পূজা পদ্ধতি, তাদের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য পাই, এবং তাদের পূজা করলে কি ফল লাভ ঘটে তার বিবরণ পাই। রূপরাম চক্রবর্তী দিক্ বন্দনায় উড়িষ্যার জগন্নাথদেব, কাশীর বিশ্বেশ্বর, গয়ার গদাধর,

গঙ্গাসাগর তীর্থ, অযোধ্যার রামসীতা, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ, নদীয়ার চৈতন্য বন্দনা করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই এগুলি বাঙালী হিন্দুর তীর্থস্থানে পরিণত। আর যে সমস্ত দেবতার বন্দনা করা হয়েছে সেগুলি গ্রামদেবতা, লৌকিক দেবতা। কবি ভগবতী বন্দনা করেছেন, কিয়া পাতে কেতকা সুন্দরী মনসা বন্দনা করেছেন। তাছাড়াও বালিডাঙ্গার সর্বমঙ্গলা, কোতলপুরের বিশাললোচনী, বঞ্চিতালের ঝকরাই, শিওড়ের শান্তিনাথ, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, রাজবল হাটের শ্রীরাজবল্লভী, অম্বুয়ার ঘাটে কালিকা, ময়নাপুরের ষষ্ঠীদেবী, যুঝাটির ধর্মঠাকুর, জারগ্রামের কালুরায়, গবপুরের স্বরূপনারায়ণ ও কাঁকড়া বিছে, সেনপুরের বাঁকুড়া রায়, শালেপুরের যাত্রাসিদ্ধি রায়, কাইতির বাণরাজার পাট, বালিপোতার শ্বেতগঙ্গার ঘাট, সেহাখোলার উত্তরবাহিনী, ধারুয়ার দেবী, জয়ন্তীপুরের সর্বমঙ্গলা, তালপুরের ষষ্ঠীবুড়ী, লাউগ্রামের দন্ডেশ্বরী, গোতানের বটেশ্বরী, পলাসনের অগ্নিমুখা হর ও তাড়েশ্বর শিব, শ্রীরামপুরের মহিষমর্দিনী, নেউরের লাল, বেতায়ের সর্বমঙ্গলা, মৌলার রঙ্কিণী, কালিঘাটের কালী, আমতার মেলাই, খেপুতের খেপায়, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর ,বিজয়া নগরের কমলা, সোনাটিকরির বিষহরি, জোড়ুতের ভগবতী, আহিলার রঙ্কিনী, ধাতানাই এর সারদাঠাকুরানী, কায়ালপুরের চন্দ্রমুখী, তমলুকের বর্গভীমা, পুড়মের ঘাঁটু, কামার হাটির পঞ্চানন্দ, মান্দারন গড়ের পীর ইসলামি, রিসিবাটী গাঁয়ের বড়খাঁ গাজী, পেঁড়োর গুভিখাঁ, ত্রিবেণীর দফরখাঁ গাজী ও ষোলকাজী, দর‍্যার পীর কালুরায় এবং শেষে কবি পিতামাতা ও গুরু বন্দনা করেছেন। (রূপরাম/৫-৬)

মানিকরামের কাব্যে কিছু অতি প্রাচীন দেবস্থান ও দেবতা ছাড়া প্রায় সকলেই লৌকিক ও নবীন দেবদেবী। মনে হয় রূপরামের কাব্যে যে সমস্ত দেবদেবীর কথা নেই সেগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সৃষ্টি হতে পারে নতুবা রূপরাম কাব্যে তাদের কথা উল্লেখ করতেন। মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যে যে সমস্ত নতুন দেব-দেবীর বন্দনা আছে সে গুলি হল- —বেলডিহার বাঁকুড়া রায় ও শীতল সিংহ, কুলুয়ের ফতে সিংহ, বৈতালের বাঁকুড়া রায়, পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম, শ্যামবাজারের দলু রায়, দেপুরের জগৎ রায়, গোপালপুরের কাঁকড়া বিছা, সিয়াসের কালাচাঁদ, ইঁদাসের বাঁকুড়া রায়, মঙ্গলপুরের রূপনারায়ণ, বরুজগ্রামের মোহন রায়, গুরুচের শীতলনারায়ণ, আলগুচিনার ক্ষুদি রায়, আকুটিকুলেমালার ধর্ম, বন্দিপুরের শ্যাম রায়, যাজপুরের দেবগৃহ, তারাহাটের তারকেশ্বর, ফুলুয়ের ফুলেশ্বর দোলেশ্বর, কামেশ্বরের নেড়া দেউল, ব্রাহ্মণ ভূমের ষাড়েশ্বর, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর, বেতায়ের কোঙরেশ্বর, ভদ্রেশ্বরের ভদ্রেশ্বর, খানাকুলের ঘন্টেশ্বর, বালিগড়্যার তরকেশ্বর, কাশীর কাশীশ্বর ,বগড়ির কৃষ্ণ রায়, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, দ্বারিকার দ্বারিকানাথ, সাওড়াকোণের রামকৃষ্ণ, পাণ্ডুগ্রামের শ্যামচাঁদ, ধুলেপুরের কেলেসোনা, বাগনাপাড়ার বলরাম, কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ, তমলুকের জিষ্ণুহরি, বোড়র বলরাম, যাজপুরের রাধাশ্যাম, মাহেশের জগন্নাথ, চন্দ্রকোণার রঘুনাথ, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বালসীর নারায়ণ, কাটোয়ার চৈতন্য ও নিতাই, কামারহাটি, দেশড়া ও পড়াশের পঞ্চানন, ভিতরগড়ের সত্যপীর, মনাইচকের ও মিলিকির মোকাম, ফুলুয়ের জয়দুর্গা, কালীঘাটের কালী, মৌলার রঙ্কিণী, বিক্রমপুরের বিশালা, বড়দার বিশালা, সিয়াখালা এবং বন্দীপুরের বাসুলী, বেতায়ের সর্বমঙ্গলা, কামরূপের কামাখ্যা, হিংগুলাটের হিংগুলাটেশ্বরী, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যাচলবাসিনী, পুরুষোত্তমের বিমলা, কাশীর অন্নপূর্ণা, ঢাকার ঢাকেশ্বরী, আরুড়ের অপর্ণা, কিরীটিকাণার কিরীটেশ্বরী, যাজগ্রামের বিরজা, আশ্বিনকোটার অষ্টভূজা, সেনপাহিড়ের শ্যামরূপা, খাতড়ার মহাকালী, পড়াশের ঘঁটু, নাচড়ের শ্রীসর্বমঙ্গলা, আনুড়ের বিশালা, মড়াগড়্যার বাণেশ্বরী, লাউগ্রামের দণ্ডেশ্বরী, লক্ষ্মীপুরের লক্ষ্মী, বুঞ্জরের চণ্ডী, রঞ্জপুরের বিশালাক্ষী, মানসপুরের মনসা, ছিরামপুরের ত্রিপুরাসুন্দরী, বেলার চণ্ডী, ছাতনার বাসুলী, রায়খাঁর কালী,শনিঘাটের শুভা,শাটীনন্দীর লক্ষ্মী, পলাশীর পলাশচণ্ডীকা, ভাঁড়ারগড়ের ভাড়াচণ্ডী,

খীরগ্রামের নৃমুণ্ডমালিনী, তালপুরের ষষ্ঠী, গোগ্রামের ভগবতী, এ সমস্ত দেবদেবীকে নতি জানিয়েছেন মানিকরাম। প্রাচীন দেবতার স্থলে নতুন দেবতার সৃষ্টি ইতিহাসে নতুন নয়। মানিকরামের দিগ্‌বন্দনায় অনেক জায়গায় দুজন দেবতার কথা আছে, বোধ হয় ঐ দেবতারা সকলেই একই অঞ্চলে সমান প্রসিদ্ধ ছিল। আবার রূপরামের কাব্যে অভিনব বিষয় ফকির, গাজী, পীর, কাজী বন্দনা। এর মধ্যে দিয়ে সর্ব ধর্ম সমন্বয় ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ধরা পড়েছে। কখনো বা একই দেবতা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে পূজিত হত। এতে ধর্মঠাকুরের নামান্তর পাচ্ছি, যেমন- — শীতল সিংহ, ফতে সিংহ, যাত্রাসিদ্ধি, দলু রায় মোহন রায়,শ্যাম রায়, কৃষ্ণ রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি, সুতরাং সমকালীন গ্রামীণ সমাজ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই দিগ্‌বন্দনাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কতটা ছিল তা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়, ঘনরামের কাব্যে আমরা দেখি জামতি পালায় সুরিক্ষার ছ'কুড়ি নাগরদের যে নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাদের বেশীর ভাগ নামই বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণের নামের প্রতিশব্দ; আমরা নামগুলির মোটামুটি তালিকা উল্লেখ করতে পারি,যেমন— কল্যাণ, কুশল, কৃষ্ণ, কেশর, কিঙ্কর, ক্ষেমানন্দ, নগেন্দ্র, খগেশ্বর, গঙ্গাধর, গোবিন্দ, গঙ্গেশ, গঙ্গারাম, ঘনরাম, ঘসীরাম, ঘনশ্যাম, চতুর্ভুজ, চণ্ডীচরণ, চম্পতি, চন্দ্রচূড়, চৈতন্যচরণ, দুখুরাম, ছ'কড়ি, ঈশ্বর, ঈশ্বরীদাস, জানকী রাম, হরিজীবন, ইন্দ্রনারায়ণ, অকিঞ্চন, অনন্ত, অচ্যুত, অভিরাম, দৈবকীনন্দন, দুর্গাদাস, শুভারাম, তুলসী, তিলক, তুলারাম, অর্জুন, অযোধ্যারাম, অদিতি, চক্রপাণি, ভীমরায়, ভরত, ভাবিনী, মুরারী, মাধব, মধুসূদন, মুকুন্দ ইত্যাদি। নামগুলির বেশীর ভাগই বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত, তাছাড়া শিবঠাকুর ও মনসা সম্পর্কিত নামকরণ ছাড়াও দু'-একটি নামকরণ সাধারণ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম তৎকালেও সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা পরিষ্কার করে বোঝায় যায় এই নামকরণগুলি থেকে।

তথ্যপঞ্জী

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬১৯।

২। ঐ , পৃঃ ৬২১।

৩। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২৩।

৪। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭০২।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬২১।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ ১২২।

৭। ঐ, পৃঃ ১২১।

৮। ঐ, পৃঃ ১২২।

৯। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২৯।

১০। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৩০।

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ ১২৭।

১২। ঐ, পৃঃ ১৩৩।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৪১।

১৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ১৩৪।

১৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৫৩।

১৬। মানিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা অংশ, আলোচনা- ৫, বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত।

১৭। ঐ।

১৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ১৬২।

১৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ৭৩৬।

২০। শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিত, ভূমিকা অংশ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ.: ৪।

২১। ঐ, পৃ. :১২-১৩।

২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,সুকুমার সেন, পৃঃ ১১৪।

২৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭১২।

২৪। মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ১২৮ থেকে তথ্যটি প্রাপ্ত।

২৫। ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকা অংশ, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত।

২৬। শূন্যপুরাণ, রামাই পণ্ডিত, ভূমিকা অংশ, ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ৪৪।

পঞ্চম অধ্যায়

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

চতুর্দশ শতকে যে মঙ্গলকাব্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল তা দীর্ঘ কয়েক'শ বছর পথ পরিক্রমের শেষে তার আদর্শ ও শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই শক্তিহীন স্রোতে নতুন কাহিনী, দেব ভাবনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য এবং রীতি ঘটিত অভিনবত্ব আনয়নের মধ্যে দিয়ে জীর্ণ সাহিত্য ধারায় নব প্রাণ-সঞ্চারের চেষ্টা হয়েছিল শিবায়ন কাব্যে। দেখা গিয়েছিল এক সময় মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণবপদ- সাহিত্য রচনার জোয়ারে ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। এই সময় কবিগণ মনসামঙ্গল কাব্যের সংকলন গ্রন্থ 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল', 'ষট্ কবির মনসামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। অবশ্য এখানে 'বাইশ' বা 'ষট্' শব্দগুলি বহুত্ব বাচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই বৈষ্ণবপদ-সংকলন গ্রন্থ রচনায় তাদের দায়িত্ব পালন করেন, যদিও পদাবলীর চর্চা ও সঙ্কীর্তন ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত ছিল এবং সেগুলি তাদের ধর্মচর্চার অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। রচিত হয়েছিল 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'গীতচন্দ্রোদয়' 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি', পদামৃতসমুদ্র' 'পদকল্পতরু'র মত গ্রন্থাবলী। এই রীতি প্রযুক্ত হবার ফলে বহু খ্যাত ও অখ্যাত কবির কাব্য কালগর্ভ থেকে রক্ষা পেয়েছে, বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে বিবেচনা করি। পঞ্চদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি অপৌরাণিক দেবীমঙ্গলের স্থলে সপ্তদশ শতকে কতকগুলি পৌরাণিক দেবদেবী মঙ্গল রচিত হয়েছে; রচিত হয়েছে প্রচুর অপ্রধান দেবদেবীমঙ্গল। শিবঠাকুর অবশ্য পৌরাণিক ও অপৌরাণিক স্বরূপের মিশ্রিত রূপ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি কতকগুলি গতানুগতিক আদর্শকে অনুসরণ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেখানে শিবায়ন নতুন স্বাদ নিয়ে আসে। শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য ধারা হিসাবে চিহ্নিত হলেও অনেকেই অবশ্য এই কাব্যটিকে আদর্শ মঙ্গলকাব্য বলতে রাজী নন, অবশ্য এবিষয়ে উভয় দিকে কিছু যুক্তি রয়েছে।

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য না বলার পেছনে যুক্তিগুলি হল—

প্রথমত ঃ মঙ্গলকাব্যগুলি মূলত দেবদেবীর পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে রচিত। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী শাপভ্রষ্ট দেবতা বা অপ্সর-অপ্সরীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করে এবং পূজার প্রচারে তার মধ্যস্থতা গ্রহণ করে। শিবায়নে শিবঠাকুর কোন দেবতা বা অপ্সর-অপ্সরীকে শাপভ্রষ্ট করে মর্ত্যে প্রেরণ করেনি। এমন কি পূজা প্রচারে তার আগ্রহ দেখা যায় না; কারণ শিবঠাকুর পূর্ব থেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়ত ঃ মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী শিবায়নে সুস্পষ্ট দেবখণ্ড-নরখণ্ড বিভাজন নেই, শিবায়নের কাহিনী দেবখণ্ড হয়ে নরখণ্ডে প্রবেশ করেনি। এখানে মানবলোকের পৃথক কাহিনীও নেই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতারা যেখানে নরকল্প, সেখানে শিবঠাকুর অনেক বেশী মর্ত্য পৃথিবীর মানুষ।

তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি, যথা— নায়কের 'চৌতিশা স্তব', নায়িকার 'বারমাস্যা' বর্ণনা শিবায়নে নেই।

লক্ষণীয়, তা সত্ত্বেও শিবায়নকে মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। কারণ-

প্রথমতঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত পৌরাণিক ও অপৌরাণিক দেবভাবনার মিশ্রণে শিবঠাকুরের অবয়ব গঠিত।

দ্বিতীয়তঃ শিবায়নে বর্ণিত শিবকাহিনীগুলি অনূদিত কাহিনী নয়, বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত শিব সম্পর্কিত কাহিনীর সমবায়ে গঠিত।

তৃতীয়তঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই বাঙালীর সমাজজীবন, পরিবারজীবন অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসের সূক্ষ্ম ছবি শিবায়নে ফুটে উঠেছে।

মঙ্গলকাব্য ধারায় শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বয়োঃকনিষ্ঠ শাখা হিসেবে বিবেচিত হলেও, লক্ষণীয় যে শিবঠাকুর সম্পর্কিত গীত প্রচারিত ছিল বহু প্রাচীনকালেই; সম্ভবত চৈতন্য-পূর্বযুগেই শিবঠাকুরের গীত প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে শিব সম্পর্কিত কথা পাওয়া যায়-

"একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়- গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়া শিবের গীত বেঢ়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্করমূর্ত্তি দিব্য জটাধর॥
এক লাফে উঠে তার কান্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে 'মুঞি সে শঙ্কর'॥
কেহো দেখে জটা, শিঙ্গা, ডমরু বাজায়।
'বোল বোল' মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥
সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥" (শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত/১৩৯)

বাংলাদেশে শিবঠাকুরের প্রভাব বহু ব্যাপক, শিবঠাকুরকে তাই বাংলার 'জাতীয় দেবতা', বলে অভিহিত করা যায়[১]। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মূলত অনার্য-লৌকিক সমাজ থেকে আগত দেবতাসমূহের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, অথচ মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটা অংশ শিব কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মঠাকুরকে কেউ কেউ শিবঠাকুরের সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছেন। বস্তুত ধর্মদেবের অবয়বে যে সমস্ত দেবতার প্রভাব আছে তার মধ্যে শিবঠাকুরের অংশই অধিক। নাথ সাহিত্যেও আমরা শিবঠাকুরের কথা পাই। লক্ষণীয় যে সমস্ত লৌকিক দেবকথা মঙ্গলকাব্যে আছে তারা প্রত্যেকেই শিবঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেই কৌলীন্য প্রাপ্তি ঘটাতে চেয়েছে। একদিক থেকে বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের প্রতিটিই শিবমঙ্গলও বটে, কারণ প্রত্যেকটিতেই শিব সংস্পর্শ আছে। এই শিবকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে স্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য শাখা গড়ে উঠেছে তাহাই শিবায়ন বা শিব মঙ্গলকাব্য।

শিবঠাকুরের স্বরূপঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে শিবঠাকুর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "ভারতীয় যে সকল প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান।"[২] পণ্ডিতগণের মতে শিবঠাকুর পুরাণ আশ্রিত দেব পরিকল্পনা হলেও বৈদিক দেবতা নয়। বাংলাদেশে শৈবধর্মের প্রচারে বহু আর্যেতর উপদান মিশ্রিত ছিল বলেই পণ্ডিতগণের অনুমান। অনার্য দেবতা শিবঠাকুর প্রাক্ আর্য দেবতা হলেও আর্য সমাজে সে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছিল; এদিক থেকে শিবঠাকুর ভারতের প্রাচীনতম দেবতা হিসাবেই চিহ্নিত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার আবিষ্কৃত শীলমোহরে শিবের পশুপতি মূর্তি পাওয়া গেছে। এমন কি লিঙ্গরূপী শিবঠাকুরের পরিকল্পনাও বহু প্রাচীন বলে অনুমিত হয়েছে। বৈদিক শিব রুদ্র; রুদ্র দেবতার মধ্যে বহু অনার্য উপকরণ আছে, বৈদিক সমাজে অনার্য দেবতা স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে এক শান্ত সমাহিত রূপ শিবঠাকুরের পরিকল্পনার পশ্চাতে কাজ করেছিল। কারো কারো মতে শিবঠাকুর দ্রাবিড় জাতির দেবতা। অনার্য

প্রতিবেশ থেকেই শিবঠাকুরের ছাই-ভস্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, সর্পালঙ্কার ভূষিত শিবঠাকুরের পরিকল্পনা। আবার পৌরাণিক শিবঠাকুরের উপর বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবও স্বীকৃত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—"ব্রাহ্মণ্যধর্ম এ'দেশে প্রচার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বহু উপাদান আসিয়া লৌকিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে আরম্ভ করে। পৌরাণিক শিবের পরিকল্পনাও বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত। অতএব বাংলার তদানীন্তন বৌদ্ধ সমাজ শিবের চরিত্রের মধ্যেই নিজেদের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল। জৈন তীর্থঙ্করদিগের জীবনাদর্শ গৌতম বুদ্ধ ও পৌরাণিক শিব হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র নহে, এইজন্যই কালক্রমে তদানীন্তন বাংলার বিরাট বৌদ্ধ ও জৈন সমাজ নিজেদের ধর্মীয় উপকরণ দ্বারা এ'দেশের শৈবধর্মকে অভিনবরূপে পুনর্গঠন করিয়া লইয়াছিল।"[৩] ডঃ ভট্টাচার্য শিবঠাকুরের দরিদ্র ভিখারী পরিকল্পনার উপরে বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের প্রভাবের কথাও স্বীকার করেছেন। পৌরাণিক শিবঠাকুর রুদ্র বা ধ্বংসের দেবতা হলেও সে ভোলানাথ, এ কারণেই সম্ভবত সকল শ্রেণীর ও সকল ধর্মের মানুষ তাকে সহজে আপন করে নিতে পেরেছিল। পৌরাণিক শৈবধর্ম সমাজের নিম্নস্তরে প্রচার লাভ করে নতুন রূপলাভ করেছিল। বাংলায় শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য এই দেবতাটিকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। তবে শিবায়নে ও লৌকিক ছড়ায় যে শিবঠাকুরের কথা আমরা পাই, সে পৌরাণিক রুদ্রদেব নয়; সে স্বতন্ত্র শিব, লৌকিক শিবঠাকুর। সে বাংলার কোন এক পল্লীর শিব নামধারী গৃহস্থ মাত্র।সে বাংলার কৃষককুল থেকে উদ্ভূত কৃষক সমাজের দেবতা। বাংলায় প্রচলিত ছড়ায় বর্ণিত শিব ঠাকুরের প্রসঙ্গটি নিম্নরূপ-

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান।
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ী যান॥"[৪]

আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"কোন কোন জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা, (Fertility god) বলিয়া পূজিত হন। ইনি কখনও স্ত্রীরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে পরিকল্পিত হন।"[৫]

কোচ জাতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায় বিভিন্ন শিবায়ন কাব্যে, কোচ কৃষক সমাজে লৌকিক শিবঠাকুরের উদ্ভব বলে অনুমিত হয়েছে। আবার 'শঙ্খপরা' পালায় শিবঠাকুরের শাঁখারীর ছদ্মবেশ দেখা যায়, সুতরাং শাঁখারী বৃত্তিভুক্ত জাতির সঙ্গে শিবঠাকুরের সম্পর্ক কল্পনা করা হয়েছে। লৌকিক শিবঠাকুরের বাহন বলদ। সে গাঁজা-ভাঙ্ বা সিদ্ধি সেবন করে থাকে—এ সমস্ত কাহিনী সম্ভবত লোকভাবনা জাত এবং লৌকিক জীবনের তথ্য সমৃদ্ধ, তার উপর পৌরাণিক প্রভাব নেই। হয়ত বা লৌকিক প্রভাবই পৌরাণিক শিবঠাকুরকে খানিকটা পরিবর্তিত করে থাকবে। বাংলার শিবঠাকুর গোলোকবিহারী দেবাদিদেব নয়, সে স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত জীবনের শত-সহস্র বন্ধন ও অভাব অভিযোগের মধ্যে বাংলার নিভৃত পল্লীতে গৃহী জীবনযাপন করে থাকে।

বাংলায় শিবঠাকুর সম্পর্কিত সাহিত্যে দু'টি কাহিনী প্রচলিত— (১) মৃগলুব্ধ কাহিনী এবং (২) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল। মৃগলুব্ধ মূলত শিবচতুর্দশী ব্রতের মাহাত্ম্যসূচক কাব্য, অনেকটা ব্রতকথার ধাঁচের। অবশ্য শিবচতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে ব্রতীরা যে ব্রতকথা শুনে থাকে তা মৃগলুব্ধ কাহিনী। শিবচতুর্দশী ব্রত করে কিভাবে এক ব্যাধ স্বর্গে গমন করেছিল এবং রাজা মুচকুন্দ শিবচতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে সেই কাহিনী শুনে সশরীরে স্বর্গে গমন করেছিল, তার কাহিনীই এখানে উপজীব্য। মৃগলুব্ধ কাহিনীতে কোন লৌকিক দেবতার প্রাধান্যের কথা নেই। বাঙালী কবিগণ বিভিন্ন পুরাণ, বিশেষত মহাভারত, হরিবংশ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ মন্থন করে শিবমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। এই কাহিনীতে ব্যাধ কাহিনীর উপর গুরুত্ব দেওয়ায় অনুমান করা হয়েছে শিবঠাকুর ব্যাধ সমাজেরও দেবতা ছিল।

মৃগলুব্ধ কাহিনীতে কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রনে কোন বিশেষত্ব নেই. এমন কি মঙ্গলকাব্যের কোন লক্ষণও এতে নেই। কোন প্রতিভাবান কবির সাক্ষাৎ এই ধারায় পাওয়া যায়নি। মৃগলুব্ধ কাহিনীতে মূলত দু'জন প্রধান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এঁরা হলেন রামরাজা এবং রতিদেব। চট্টগ্রাম অঞ্চলে শৈবতীর্থগুলিকে কেন্দ্র করে শৈবধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল এবং মৃগলুব্ধ কাহিনী পুষ্টিলাভ করেছিল। পরবর্তীকালে সম্ভবত বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলামধর্মের ব্যাপক প্রচলন শৈবধর্মে ভাঁটার টান ধরায়। তাই মৃগলুব্ধ কাব্যগুলিতে শৈবধর্মের ভগ্নতার ছাপ আছে।

শিব সম্পর্কিত কাহিনী নিয়ে যে কাব্যধারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছিল তা শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত। প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শিবপার্বতী সম্পর্কিত কাহিনী আছে। তবে লক্ষণীয় যে প্রতিটি কাব্যে শিবঠাকুরের স্বরূপ কিন্তু এক নয়, মনসামঙ্গলের শিবঠাকুর স্খলিত চরিত্র ব্রাহ্মণ ও কামুক শিবঠাকুর; চণ্ডীমঙ্গল এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী, আর শিবায়নের শিবঠাকুর কৃষক। আবার ধর্মমঙ্গলে শিবঠাকুর বিভিন্ন প্রসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ধর্মদেবে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মূলত দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কোথাও দেবতার সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠা, কোথাও মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বের মধ্যে দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা, আবার কোথাও বা দুই পক্ষীয় মানুষের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে দুই দেবতার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা আছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়, কোন মঙ্গলকাব্যের দেবতা কখনো স্বয়ং নায়ক চরিত্ররূপে অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু শিবায়ন কাব্যে স্বয়ং শিবঠাকুরই কাব্যের নায়ক; অবশ্য সে পূজা প্রচার বা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি। শিবায়নে শিবঠাকুর দেবতা হলেও তার আচার - আচরণ সম্পূর্ণ মানবিক এবং কাব্যের মূল বিষয় শিবের দাম্পত্য জীবন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত শিবায়ন কাব্য দেব-মানব দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদিও শিবায়ন মঙ্গলকাব্যের সকল বৈশিষ্ট্যকে পূরণ করে না তবুও শিবায়ন কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। বাঙালী সমাজের একটা বিশেষ পর্বে দেবচরিত্র সম্পর্কে কবিগণের নতুন ভাবনা শিবায়ন কাব্যকে স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত করে তুলেছে।

শিবায়ন কাব্যকাহিনী ও শিবচতুর্দশী ব্রতের কাহিনী স্বতন্ত্র। ব্রতের কাহিনীতে সংক্ষেপে মৃগলুব্ধ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য বাংলা লোকসাহিত্যে শিবঠাকুর সম্পর্কিত নানা কাহিনী এবং নানা ছড়া প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে শিবঠাকুর সম্পর্কিত বিভিন্ন ছড়ার উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় ছড়া যে বাংলাদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাই 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত শিবকাহিনী ও ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' গ্রন্থে শিবের গাজন উপলক্ষে যে সমস্ত ছড়া উল্লেখ করা হয়েছে তাতে শিবের চাষবাস সম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—

"শিবে হাথে ত্রিশক ভাঁগ্যা গড়ান কোদালি ফাল।
দুর্গা বলে ইয়াকে চাই তিনটী গজাল॥
আনিয়া শালের মূড়া দিল ফুল চাঁচ।
দুর্গা বলে ইয়াকে চাই দ্রব্য চারি পাঁচ॥
আস জুড়ি পাশ জুড়ি চাই দুই ভীতা।
সুবর্ণের জুয়ালি চাই নাঞ্জিথ অন্যথা॥
গোটা পাটা আদি আন্যা গড়িলেন মই।
ময়ের দুপাশে চাই ছান্দন দুগাছি দড়ি।
হ্যালা চালাইতে চায়ি সুবর্ণের লড়ি॥
সনার নাঙ্গল হল্য রূপার হল্য ফাল।

বাঘে বৃষে মহাপ্রভু জুড়িলেন হাল॥
... ...
প্রথম বৈশাখ মাসে দিলেন উগাল।
দ্বিতীয়াতে মহাপ্রভু করিল রসাল॥
তিন চাস দিয়া প্রভু দিলা তথি মই।
শুন শুন আগো দুর্গা তুমারে কই॥
ভূমি সাধ্য হল্য শুন হেমন্তের ঝি।
বিহন ধান্যের তরে করিব কি।
... ...
দ্বিতীয় জুগতে প্রভু চাস চসিল।
তৃতীয় যুগেতে প্রভু ধান্য পেলাইল॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে ভূমে বায়া দেখা দিল।
দেখিয়া শঙ্কর কৃশি হরসিত হল্য॥
আষাড় মাসেতে ধান্যে দিল মই দিয়া।
শ্রাবণ মাসেতে ধান্য দিল কাড়াইয়া॥
ভাদ্রপদ মাসে ধান্য করিল নিড়ান।
আশ্বিন মাসেতে জল বান্ধে সাবধান॥
বিষুব সংক্রান্তি পায়্যা ভকত বৎসল।
ধান্য ডাকিলেন প্রভু ক্ষেত্রে প্রতি নল॥
ফুলিয়া সকল ধান্য হল্য সমতুল।
ধান্য সব সঞ্চরিল মাথে করি ফুল॥ (শূন্যপুরাণ/২৩৬-২৩৯)

শিবায়ন কাব্যে শিবঠাকুরের ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙল-জোয়াল তৈরী ও চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। শিব সম্পর্কিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত ছড়াতে শিবঠাকুরের চাষবাসের প্রসঙ্গ পাই। শিবায়ন কাব্যে গৌরীর 'শঙ্খপরা পালা' একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সংগৃহীত শিবঠাকুর সম্পর্কিত ছড়াতে গৌরীর শঙ্খপরার কথা পাই। যেমন উত্তরবঙ্গ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি ছড়া—

"আমার জাতের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাতের কথা কইলে নাগিবে ঝগড়া॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রণ-পরশুম তাকে।
হাতে শাঙ্কা নাই দ্যান গোঁসাই নজ্জা পাছু তাতে॥
শাঙ্কা কিনিয়া দ্যাও হে মদন মুরলী।
দশ হাতে দশ মুট শাঙ্কা কানে মদন কড়ি॥
শাঙ্কা না পাইলে তবে যাব বাপের বাড়ী।
বাপের বাড়ী যাব দুর্গা ভাইয়ের বাড়ী যাব॥
কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলকে পালিব।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যের প্রবন্ধ গুচ্ছে 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে সংগৃহীত কিছু ছড়ায় গৌরীর শাঁখা পরার আকাঙ্ক্ষার কথা পাই। যেমন—

তোমার নারী হয়ে আমার সাধ নাহি পোরে।
যেন বেন্যা পতির কপালে পড়ে রমণী ঝোরে॥
দিব্য সোনার অলংকার না পরিলাম গায়।
শামের বরন দুই শঙ্খ পরতে সাধ যায়॥
দেবের কাছে মরি লাজে হাত বাড়াতে নারি।
বারেক মোরে দাও শঙ্খ, তোমার ঘরে পরি।[৭]

শাঁখা পরা নিয়ে শিবপার্বতী কলহ, পার্বতীর পিতৃগৃহে গমন এবং শেষ পর্যন্ত শিব শাঁখারী বেশ ধারণ করে পার্বতীকে শাঁখা পরায়। দেখা যাচ্ছে শিবায়নে বর্ণিত শিবঠাকুর সম্পর্কিত কাহিনী ছড়া আকারে জনসমাজে ছড়িয়ে ছিল এবং পরবর্তীকালে সম্ভবত কোন শক্তিমান কবির হাতে পড়ে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রূপ পরিগ্রহ করে।

শিবায়ন কাব্য কাহিনী ঃ মঙ্গলকাব্যের আদর্শকে বজায় রেখে শিবায়ন কাব্যে দুটি অংশ, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড চিহ্নিত করা হয়েছে। দেবখণ্ডে আছে পৌরাণিক শিবঠাকুরের পৌরাণিক কাহিনী আর নরখণ্ডে আছে লৌকিক শিবের লৌকিক কাহিনী। দেবখণ্ডে আছে দক্ষের যজ্ঞ, পার্বতীর বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে গমন, দক্ষের শিব নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, মেনকার গর্ভে সতীর গৌরী রূপে জন্মগ্রহণ, শিবের ধ্যানভঙ্গ, মদনভস্ম, শিবপার্বতীর বিবাহ ইত্যাদি পৌরাণিক প্রসঙ্গগুলি। নরখণ্ডে আছে হরগৌরীর সংসারযাত্রা নির্বাহের কাহিনী। সংসারের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য গৌরী শিবঠাকুরকে মর্ত্যে গিয়ে চাষবাসে মন দিতে বলল। শিবঠাকুর তখন ইন্দ্রের নিকট থেকে জমি গ্রহণ করল, ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে চাষের যন্ত্রপাতি লাঙল-জোয়াল তৈরী করাল, কুবেরের নিকট থেকে বীজ ধান গ্রহণ করে অনুচর তথা ভাগিনেয় ভীমের সহায়তায় চাষবাস আরম্ভ করল। এদিকে জমিতে ফসল ফললে শিবঠাকুর পৃথিবীর মায়ায় স্বর্গলোকের কথা একেবারে ভুলে গেল। আর কৈলাসে দেবী শিব অদর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেবী পৃথিবীতে ডাঁশ, মাছি, মশা প্রেরণ করল, শিবঠাকুর মশা ও মাছির কামড়ে অস্থির হয়ে পড়ল কিন্তু নরলোক থেকে ফিরে গেল না। তখন দেবী বাগদী নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে শিবঠাকুরের ক্ষেতে মাছ ধরতে লাগল। শিবঠাকুর বাগদিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। দেবী কৌশলে শিবঠাকুরের কাছ থেকে আংটি আদায় করল, যাই হোক পরে স্বর্গে শিব-পার্বতীর মিলন হল। শেষে শিবঠাকুর নিজের আংটি দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। এদিকে দেবী শিবঠাকুরের নিকট শাঁখা চাইলে শিবঠাকুর জানায়—

"ভিখারীর ভার্য্যা হয়্যা ভূষণের সাধ।
কেনে অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥" (রামেশ্বর/২৮১)

সুতরাং পার্বতী মহাদেবের নিকট শাঁখা না পেয়ে পিতৃগৃহে চলে গেল, আর এদিকে শিবঠাকুর শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পার্বতীকে ছলনা করে এবং শেষ পর্যন্ত পার্বতীকে শাঁখা পরায়। এই ভাবে শিব-পার্বতীর মিলন ঘটল। শিবায়নে কাহিনী সম্পর্কিত কিছু বিশেষত্ব আছে, যেমন—

প্রথমতঃ শিবায়নের কাহিনীতে লৌকিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবমাহাত্ম্য প্রচার কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, এখানে জীবন ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। এই শিব সাধারণ কৃষক সমাজেরই প্রতিনিধি।

দ্বিতীয়তঃ শিব চরিত্রের দুর্বলতার কথা পাওয়া যায় পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে, কিন্তু সে তবুও দেবাদিদেব। শিবায়নে শিবঠাকুর কামুক, লম্পট ও নিন্দিত একটি চরিত্র। জনরুচি ও যুগরুচির তাগিদেই সম্ভবত কবি শিব চরিত্রকে এভাবে অঙ্কন করেছেন।

তৃতীয়তঃ শিবায়নে পল্লীবাংলার যে জীবনচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তা অনন্য। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মত শিবঠাকুর অমঙ্গলকারী অপদেবতা নয়, দোষে-গুণে ভরা মানব চরিত্র। শিবায়নে আমরা মানব জীবনের স্বাদ পেয়ে থাকি।

শিবায়ন কাব্য ও কবিগণ ঃ অন্যান্য কাব্যের মত শিবায়ন কাব্যেরও অবশ্য আমরা প্রধান প্রধান কবিদের কথাই বলব। শিবায়ন কাব্য ধারার তিনজন কবির কাব্য পাওয়া যায়, এঁরা হলেন রামকৃষ্ণ রায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র এবং রামেশ্বর ভট্টাচার্য। শিবায়ন কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

শিবায়ন কাব্যের অন্যতম কবি রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যই সম্ভবত সর্ববৃহৎ শিবায়ন কাব্য। কবি তাঁর কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় কবির পিতার নাম কৃষ্ণ রায়, মাতা রাধা দাসী; নিবাস-হাওড়া জেলার রসপুর গ্রাম। কবির আত্মপরিচয় অনুসারে—

"পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ প্রণতি॥
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাঁহার সতিনী॥
মাতামহ বন্দিলাম নাম সূর্যমিত্র।
তেয়জ কুলীন তিঁহো পবিত্র চরিত্র॥
পিতা কৃষ্ণরায় বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর।
যাহার প্রসাদে এই মনুষ্যশরীর॥
মাতা রাধা দাসীর চরণে দণ্ডবৎ।
যাঁর গর্ভবাস হইতে দেখিল জগৎ॥" (রামকৃষ্ণ/৭৮)

কবি কাব্যে রচনাকাল উল্লেখ করেননি। কাব্য সম্পাদক কবির পারিবারিক ইতিহাসের নানাবিধ তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কাব্য রচনাকাল স্থির করেছেন। জানা যায় বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রসপুর আক্রমণ করে বলপূর্বক কবির সাতপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ নিয়ে যান, ফলে বৃদ্ধ কবি কুলবিগ্রহের শোকে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবত কবির বয়স তখন নব্বই বছর। কবি সম্ভবত ১৫৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দের দু-এক বছর পর কাব্য রচনা করেন।[৮]

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্য স্থূলায়তন, কাব্যটি পালাভিত্তিক রচনা এবং সর্বমোট ছাব্বিশ (২৬)টি পালায় রচিত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যেরক্ষেত্রে পালাভিত্তিক রচনায় যে একটা নিয়ম ছিল এবং পালাগুলির মধ্যে দিয়ে একটা কাহিনী গড়ে উঠেছিল শিবায়ন কাব্যেরক্ষেত্রে সে রকম কিছু দেখা যায় না। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের গঠন আরও শিথিল। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে পালা রচনা কোন ঐতিহ্য অনুসৃত নয়; কবির স্বেচ্ছাকৃত ছাব্বিশটি পালায় কোন অনিবার্য কাহিনী সংযোগ নেই। কবি এখানে বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক শিবকাহিনী গ্রথিত করে স্থূলায়তন কাব্য রচনা করেছেন এবং প্রতিটি পালাই এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—"ইহা বিভিন্ন শিব-প্রসঙ্গের একটি সংকলন মাত্র— তবে এই সংকলনের পরিকল্পনায় শিবকাহিনীর পারম্পর্য যে রক্ষিত হয় নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না—কিছুদূর পর্যন্ত পুরাণানুযায়ী ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করিবার পর ইহাতে কিছু কিছু লৌকিক উপাদানও অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।"[৯] অতঃপর আমরা রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের কাহিনী পরিকল্পনাটি দেখি—

১ম পালায় — গণেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা ও সৃষ্টি বর্ণনা।

২য় পালা — শিবের জন্ম হতে শিবের বিবাহ বর্ণনা পর্যন্ত।

৩য় পালা — ব্রহ্মা-বিষ্ণু বিবাদ, কালভৈরব মাহাত্ম্য এবং শিবের কাশীমাহাত্ম্য ও শিবস্তুতি পর্যন্ত।

৪র্থ পালা — দক্ষযজ্ঞ থেকে দক্ষালয়ে সতী পর্যন্ত বর্ণনা।

৫ম পালা — দক্ষের শিব নিন্দা, সতীর দেহত্যাগ থেকে শিবের আজ্ঞা ও গুণগান পর্যন্ত॥

৬ষ্ট পালা — ময়দানব তারকোপখ্যান, কালনেমির যুদ্ধ ও মৃত্যু, দেবাসুরের সান্ত্বনা ইত্যাদি।

৭ম পালা — হিমগিরির কথা, হিমালয় মেনকার বিবাহ, আদ্যার জন্ম ,মদনভস্ম, রতি বিলাপ, গৌরীর অভিমান ও তপস্যায় অনুমতি পর্যন্ত।

৮ম পালা — মেনকার নিষেধ, গৌরীর তপস্যা, শিবের পরীক্ষা থেকে কৈলাসে নারদ পর্যন্ত।

৯ম পালা — শিবের উদ্যানে গৌরীর পুষ্পচয়ন, হরগৌরীর মিলন ইত্যাদি।

১০ম পালা — হিমালয় গৃহে শিব থেকে নীলগিরির দৌত্য পর্যন্ত।

১১শ পালা — কুমারের জন্ম ও মহিষবধ।

১২শ পালা — শিবের বিবাহ থেকে ত্রৈলোক্যমোহন রূপ ও বিবাহ পর্যন্ত।

১৩শ পালা — কুশণ্ডিকা থেকে ফুলশয্যা পর্যন্ত।

১৪শ পালা — ফুলশয্যায় গৌরী, প্রহেলিকা, শিবের যোগসাধন ও অগ্নিনির্বাণ পর্যন্ত।

১৫শ পালা — পাশাখেলা, শিবতত্ত্ব বর্ণনা, শিবের কৈলাসযাত্রা ইত্যাদি থেকে লিঙ্গপূজা পর্যন্ত।

১৬শ পালা — মনসার উপাখ্যান।

১৭শ পালা — সমুদ্রমন্থন উপাখ্যান।

১৮শ পালা — বলিরাজার উপাখ্যান।

১৯তম পালা — অগস্ত্য ও সগর রাজার উপাখ্যান।

২০তম পালা — গঙ্গার উপাখ্যান।

২১তম পালা — ত্রিপুর ও তারকের উপাখ্যান।

২২তম পালা — দুর্গার কন্দল।

২৩তম পালা — অন্ধক উপাখ্যান।

২৪ তম পালা — অন্ধকবধ উপাখ্যান।

২৫তম পালা — পরশুরাম ও রাবণ উপাখ্যান।

২৬তম পালা —বাণরাজার উপাখ্যান।

রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে, যেমন—

প্রথমত ঃ রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে প্রথম কয়েকটি পালায় কাহিনীর যোগসূত্র রক্ষিত হলেও শেষ দিকে অদৌ সংগতি রক্ষিত হয়নি অর্থাৎ পরিপূর্ণ কাহিনী সৃজনের কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না। শিবের বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত পালায় (১২,১৩,১৪) বৈদিক ও লৌকিক লোকাচার পালিত হয়েছে, আবার 'মনসার উপখ্যান' (১৬পালা), 'দুর্গার কন্দল' (২২পালা) পালায় বিভিন্ন লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে শিব সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচলিত জনপ্রিয় কাহিনী, যথা— শিবের চাষ, মৎস্যধরা, শঙ্খপরা ইত্যাদি কবি অদৌ গ্রহণ করেননি।

দ্বিতীয়ত ঃ বিপুলায়তন কাব্য হলেও কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাবে কাব্যটি সমগ্রতা লাভ করেনি, তাছাড়া চরিত্র সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণের কোন প্রবণতা এখানে দেখা যায় না।

তৃতীয়ত ঃ লৌকিক শিবের চরিত্রে কবি প্রাধান্য না দিলেও শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কলহ, মনসার

উপাখ্যান অংশগুলিতে বাঙালীর লৌকিক গার্হস্থ্য চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ঃ শিবায়ন কাব্যের প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবি হলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বর ভট্টাচার্য কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা পাঠে জানা যায়, কবির পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্তী, মাতা রূপবতী-

"ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশর-কণী
যতিচক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুইনারী
অযোধ্যানগর নিকেতন॥" (রামেশ্বর/ ১৮৮)

কবির বাসস্থান মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রাম; হেমৎ সিংহ নামক কোন ব্যক্তির অত্যাচারে কবি শেষ পর্যন্ত কর্ণগড়ের রাজা রাম সিংহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যশোবন্ত সিংহ কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁরই আদেশে কবি কাব্য রচনা করেন। 'শিবসঙ্কীর্তন' ছাড়াও রামেশ্বর ভট্টাচার্য 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। কবি কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কাল নির্ণায়ক পয়ার দিয়েছেন তাঁর কাব্যে—

"শকে হৈল্য চন্দ্রকলা রাম কৈল্য কোলে।
বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল্য সারা
অবনীতে আল্য যেন অমৃতের ধারা॥ (ঐ/ ৩৫০)

এই শ্লোকগুলির অর্থ উদ্ধার করে কাল নির্ণয় করা আজও সম্ভব হয়নি। রামেশ্বরের শিবায়ন প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয় তাতে কাব্যের রচনাকাল হিসাবে ১৬৩৪ শকাব্দ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অনেকেই সেটা গ্রহণ করেননি। উল্লিখিত আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে জানা যাচ্ছে ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোমন্ত সিংহ কর্মত্যাগ করে মেদিনীপুরে ফিরে আসেন এবং অল্পকাল পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি রাজা হন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য যশোমন্ত সিংহের রাজসভায় সভাপণ্ডিতের কাজ পান এবং তারপর 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' কাব্য রচনা করেন। সুতরাং পণ্ডিতদের অনুমান ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে মোটামুটি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামেশ্বর কাব্য রচনা করেন।[১০] আবার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যশোমন্ত সিং দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বে মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে চাকুরী করতেন। ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন যশোমন্ত সিংহ দেওয়ানী গ্রহণের পূর্বেই রামেশ্বর কাব্য রচনা করেন।[১১]

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যের প্রকৃত নাম 'শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা'; শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নয়। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের মত কাব্যটি পালাভিত্তিক রচনা এবং এতে মোট আটটি পালা আছে। তাঁর কাব্যদেহ নিম্নরূপ–

প্রথম পালা— (বন্দনা পালা) গ্রন্থের সূচনা, সুতের প্রতি প্রশ্ন, সুতের উত্তর দান, সৃষ্টি কালের দেবতা, সৃষ্টি বিবরণ, পৃথিবীর উৎপত্তি।

দ্বিতীয় পালা—	দক্ষযজ্ঞ কথা, শিব-নারদ সংবাদ, দক্ষযজ্ঞে সতীর গমন-মানস, পতি নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, দক্ষ সৈন্য ধ্বংস, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, দক্ষের ছাগ-মুণ্ড ধারণ।
তৃতীয় পালা—	গৌরীর জন্মলাভ, রতি বিলাপ থেকে গৌরীর বিবাহে হিমালয়ের যৌতুক দান।
চতুর্থ পালা—	শিবের শ্বশুর বাড়ীতে বাস, কোঁচনী পাড়ায় শিব, শিবের ভিক্ষাবৃত্তি থেকে হরগৌরীর কলহ, হরিনাম মহিমা, যমদূত সংবাদ, শবরের বরলাভ ইত্যাদি প্রসঙ্গ।
পঞ্চম পালা—	রুক্মিণীহরণ কথা, রুক্মিণীর বিবাহ আয়োজন, বাণ রাজার কথা, হরিহরের যুদ্ধ, শিবের কৃষ্ণস্তব থেকে অনিরুদ্ধের বিবাহ পর্যন্ত।
ষষ্ঠ পালা—	বকাসুর কথা, হরগৌরী সংবাদ, শিবরাত্রি বিধি, ব্যাধের শিবপূজা, শিবরাত্রির ব্রত, চাষের বিবরণ থেকে শস্যোৎপত্তি পর্যন্ত।
সপ্তম পালা—	নারদের কৈলাস গমন-উদ্যোগ, গৌরীকে মন্ত্রণা-দান, মশা-মাছি-ডাঁশ প্রেরণ, জোঁকের উৎপাত, বাগ্‌দিনী পালা আরম্ভ থেকে শিবের কৈলাস গমন পর্যন্ত।
অষ্টম পালা—	(জাগরণ পালা) হরগৌরীর মিলন মন্ত্রণা, গৌরীর শঙ্খ-পরিধান কথা থেকে গীত সমাপন পর্যন্ত।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য পণ্ডিত কবি ছিলেন। কাব্যে কবি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য সাহিত্য এমন কি কালিদাসের কাব্যেরও ব্যবহার করেছেন। শিব সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী ব্যবহার করলেও অধিকাংশক্ষেত্রে লৌকিক কাহিনী এমন কি মৌলিক কল্পনা শক্তিরও ব্যবহার করেছেন। যে সমস্ত অংশে কবি লৌকিক শিব চরিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে দেবচরিত্র মহিমা বর্জিত হয়ে মানবিক মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

সমাজ বৃত্ত ঃ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই শিবায়ন কাব্যে উল্লিখিত সমাজ ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি—

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ

খাদ্য ও পানীয় ঃ প্রথমে আসা যাক্ শিবায়ন কাব্যে উল্লিখিত বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য ও পানীয়। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করে শিবায়ন কাব্যে কবিগণ মধ্যযুগীয় বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় দিয়েছেন। কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে দেবতা ও ঋষিগণের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে খাদ্য তালিকা পাওয়া যায়। জামাতা শিবঠাকুরকে মেনা রানী লেহ্য-পেয়-চোষ্য-চর্ব্য চার প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরিপাটি রন্ধন করে খাওয়ায় —

"লোকাচারে রন্ধন করিল মেনা রাণী।
ক্ষীর ভোজন তথা কৈল শূলপাণি॥
... ...
লেহ্য পেয় চোষ্য চর্ব্ব্য এ চারি প্রকারে।" (রামকৃষ্ণ/১৩৭)

বাঙালীর প্রধান খাদ্য হল ভাত। তাইতো রামেশ্বর ভট্টাচার্য কন্যার জন্য হাঁটু ঢাকা বস্ত্র আর পেট ভরা ভাতের কামনা করেন—

"আঁঠু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর্যা ভাত।" (রামেশ্বর/ ৫২)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে 'গৌরীর রন্ধন' অংশ কিংবা 'গৌরীর বিবাহ খেলা' অংশে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়ের উপযোগী, তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর সকল রকমের খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে। ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শাক, সুক্তা, সূপ, বড়ি ভাজা, বিভিন্ন ধরনের মাছ ইত্যাদির উল্লেখ পাই। 'গৌরীর বিবাহ খেলা' অংশে গৌরীর পুতুলবিয়ের ছলে বাঙালীর খাদ্যের কথা পাই। যেমন—

"সবাকার সম্মুখে পাতিয়া কচুপাত।
ধরণীর ধূলা তাতে আন্যা দিল ভাত॥
শাক দিল শাকমুরি সজিনার পাতা।
সূপ দিল তণ্ডবালি ত্রিভুবন মাতা॥
বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।
কলামূলা ভাজা দিল কাট্যা কাঁটাসিজ॥
পুঁটি মৎস্য ভাজা দিল ভাল খোলা কুচি।
সফরীতে সবার সুন্দর হবে রুচি॥
বৃহৎ সুসিদ্ধ দিল রোহিতের মুড়া।
চিন্তিনি অম্বল দিল ঢেমনের চূড়া॥
পুকুরের পঙ্ক আন্যা দধি দিল টান্যা।
স্পর্শমাত্র কর্যা মুখে সব দিল পেল্যা॥ (রামেশ্বর / ৫১)

এছাড়া ক্ষীর, দধি-দুগ্ধ, ছানা, বিভিন্ন প্রকার পিঠা, পায়েস, লাড্ডু বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যে গৌরীর বিবাহে 'ঋষিগণের নিমন্ত্রণ' অংশে পাই—

"কসেরু কর্কটি ফল ছেনা শর্করা জল
ক্ষীর খণ্ড পিষ্টক পায়স।
ঘৃত অন্ন থালা থালা শাক সূপ ভাজা তলা
ঝালে ঝোলে দিল ছয় রস॥" (রামকৃষ্ণ / ১৪০)

মিষ্টান্ন বাঙালীর অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য, মঙ্গলকাব্যে তার বহুল উল্লেখ পাই। দরিদ্র শিবের সংসারেও পায়েসের কথা কবি ভোলেননি। যেমন—

"পায়স পর্য্যন্ত পূর প্রস্তুত সমস্ত॥
পায়স করিয়া আদি সূপ কর্যা অন্ত।
রাজরাজেশ্বরী রামা রান্ধিল যাবন্ত॥" (রামেশ্বর / ১০৩)

বিভিন্ন প্রকার ফল বাঙালীর খাদ্য তালিকার অন্তর্গত; সাধারণ মানুষ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা ফলমূল খেত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের অন্নগ্রহণের পরিবর্তে ফলমূল ভক্ষণের কথা পাই—

"কেহ কেহ ব্রহ্মচারী সর্ব্বকাল ফলাহারী
রম্ভা নারিকেল ফলে প্রীত।
পনস রসাল বিল্ব কেহ পান করে তিল
কেহ কেহ পিএ পঞ্চামৃত॥" (রামকৃষ্ণ / ১৪০)

আহারান্তে পানের ব্যবহার বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে ধনীরা কর্পূর, কস্তুরী সহযোগে পান খেত।

সাধারণ মানুষের মধ্যেও পানের বহুল ব্যবহার হত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে ভোজনের শেষে-

"কর্পূর তাম্বুল কিছু করিল ভক্ষণ।
অঙ্গেতে কুঙ্কুম চূয়া কস্তুরী চন্দন॥ (ঐ/ ১৩৭)

রামেশ্বরের কাব্যে পার্বতীর পুতুলবিয়ের খাওয়া দাওয়ার শেষেও কবি পান দিতে ভোলেননি—

"পিপুলের পাতা আন্যা পান দিল পিছু।
পূর্ণ হইল পেট আর বাকি নাই কিছু॥" (রামেশ্বর / ৫২)

শিবায়ন কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের এক বিশেষ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে; এ সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। হরগৌরীর সংসারযাত্রা অংশে বাঙালীর খাদ্যরীতির মধ্যে দিয়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরকন্নার চিত্র ফুটে উঠেছে।

আহারের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বাঙালীর খাদ্য তালিকায় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের উপযুক্ত সব রকম খাদ্যই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত হত এবং সেখানে তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর সব রকম স্বাদের খাদ্যের আয়োজন থাকত, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে তার উল্লেখ পাই—

"চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় তিক্ত কষায়ণ।
অম্ব মধু চতুর্বিধ ব্যঞ্জনের গণ॥ (ঐ/ ১০৩)

এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর খাদ্য পরিবেশনগত বিশেষত্বটি বোঝা যায়। সাধারণত, প্রথমে 'তিক্ত' ব্যঞ্জন তারপরে 'কষায়' অর্থাৎ ঝাল-ঝোল ইত্যাদি, তারপর 'অম্ব' অর্থাৎ অম্ল বা টক ব্যঞ্জন এবং শেষে মিষ্টান্ন পরিবেশিত হত এবং পান বা তাম্বুল ভক্ষণের মধ্যে দিয়ে আহার সম্পূর্ণ হত। বাঙালী সাধারণত পিঁড়ি পেতে বা আসন পেতে বসে আহার করত; উপকরণ হিসাবে থালা, বাটি, বারিপাত্র বা গেলাস ব্যবহার করা হত। বাঙালী গৃহিণী সাধারণত স্বামী-পুত্র এবং অতিথিকে আগে ভোজন করিয়ে তবে নিজে ভোজন করত। স্বামী-পুত্র, আত্মপরিজনকে খাইয়ে তার আনন্দ, তাতে তার ক্লান্তি- শ্রান্তি ছিল না। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে শিবের ভোজনে তাইতো মনে হয়। যেমন—

"যোত্র কর‍্যা (ক) পুত্র দুটী বসে দুই পাসে।
পার্ব্বতী পুরট-পীঠে পুরহর বৈসে॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হৈল বার।
দুটী হাতে গুটী গুটী যত দিতে পার॥
তিন জনে একেবারে বার মুখে খায়।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায়॥
দেখ্যা দেখ্যা পদ্মাবতী বস্যা এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া মুচ করিয়া হাসে॥
সুক্তা খায়্যা ভোক্তা চায় হস্ত দিল শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়্যা খা॥" (ঐ / ১০৪)

বাঙালী সমাজে রন্ধনে এবং পরিবেশনে নারীরাই অংশ গ্রহণ করত। পরিবেশনও নারীরাই দক্ষতার সাথে পরিচালনা করত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর বিবাহে নিমন্ত্রিত মুনি-ঋষিগণকে নারীদেরই পরিবেশন করতে দেখা যায়–

"পরিবেশনকারী যতেক মুনির নারী

হাসিআ সভেই খায় পাক।" (রামকৃষ্ণ / ১৪১)

গৃহস্থালীর দ্রব্য ঃ অতঃপর আসা যাক, মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত বাঙালীর লৌকিকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কিছু গৃহস্থালী উপকরণের কথায়। শিবায়ন কাব্যেও বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালী জিনিসপত্রের কথা পাই, যথা— হাঁড়ি, কলসী, বাটি, পানপাত্র, বাটা, ডাবর ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালীর আহারকালে যে সমস্ত গৃহস্থালী উপকরণ লাগে সেগুলি হল— থালা, বাটি, পানপাত্র, পিঁড়ি ইত্যাদি। যেমন—

"কি কহিব ভোজনসজ্জের পরিপাটি।
কাঞ্চননির্ম্মিত থালা নানাজাতি বাটি॥
রত্নের পাদুকা পিঁড়ি পানপাত্র ঝারি।
অমৃতসদৃশ ভোজ্য সুবাসিত বারি॥" (ঐ / ১৩৭)

'ডাবর' সাধারণত আচমনের জন্য ব্যবহার করা হত—

"কনকডাবরে হর কৈল আচমন।" (ঐ)

হাঁড়ির উল্লেখ আছে শিবায়ন কাব্যে, যেমন—

"কেহ উর্দ্ধমুখে ধায় পেলাইআ হাঁড়ি।
শাশুড়ী ননদী যায় হাতে করি বাড়ি॥" (ঐ/ ১৩৮)

গৃহস্থালীর বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে প্রদীপ, ঝাঁটা, কুলা, ডালা ইত্যাদি গৃহস্থালীর অঙ্গ। শিবায়নে তার ব্যবহার পাই—

"তিন পাএ নাচে দেবী হাথে ঝাঁটা কুলা॥ (ঐ/ ১২৯)

জিনিসপত্র রাখার জন্য ডালা ব্যবহার হত—

"বস্ত্র অলঙ্কার সঙ্গে যোগাইল ডালা॥
অগৌর গুগ্‌গুল দিয়া জ্বালিল ধূপতি।
এক দীপে জ্বালিলেক সহস্রেক বাতি॥" (ঐ/ ১৩৩)

কিংবা— "দুদিকে দুদাসী লয়্যা ঔষধের ডালা।
বরের নিকটে রাখে বরণের মালা॥" (রামেশ্বর / ৮০)

এছাড়া শিবায়নে সাঁপুড়া বা কৌটো, সুপারি কাটার জাঁতি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যে আছে—

"সাঁপুড়া দর্পণ পিঁড়ি কাজললতা জাঁতি।
চাঁদোয়া পালঙ্ক তুলি কাঁচুলি কঙ্কতি॥" (রামকৃষ্ণ / ১২৬)

এ সমস্ত উপাদানগুলির সঙ্গে বাঙালীর মাঙ্গলিক যোগ আছে। এছাড়াও আছে চামর শঙ্খ, সিন্দুর, রজত, হেম ইত্যাদি, যা বাঙালীর ধর্মীয় জীবনের নানান লোকাচারে ব্যবহৃত হত।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে শিবের চাষবাস প্রসঙ্গে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উপকরণের কথা

আছে। মূলত মধ্যযুগীয় অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, এবং মধ্যযুগীয় চাষবাস হত সাধারণত প্রচলিত পদ্ধতিতে। প্রচলিত চাষ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত কৃষিযন্ত্রগুলি হল— লাঙল, জোয়াল, ফাল, মই, নিরানি, কোদাল ইত্যাদি। শিবায়নে তার উল্লেখ পাই—

"বিশাই বুঝিয়া কার্য্য কৈল সাবধান।
লাঙ্গল-জোয়াল-ফাল করিল নির্ম্মাণ॥
হলধর পাশী মার‍্যা পুরাইল ফাল।
আড় চাল লাঙ্গলের যুড়্যা রাখে আল॥
বাটা দিল কোদালে জোয়ালে দিয়া সলি।
পুরস্কার পায়্যা বিশ্বকর্ম্মা গেল চলি॥" (রামেশ্বর/২২৮-২২৯)

কর্ষিত ভূমির মাটি সমান করার জন্য মই দেওয়া হত—

"মাঠ কর‍্যা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ॥
উচ নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।" (ঐ / ২৩৭)

এছাড়া বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতির উল্লখ আছে, যথা— কামারের শাল, সাঁড়াসি, হাতুড়ি, নেহাই, জাঁত, ফাল, দা, উখুন, পাশী ইত্যাদি। যেমন—

"শাল পাত্যা শূল ভাঙ্গ্যা সজ্জা কর বসি।
জোয়াল কোদাল ফাল দা উখুন পাশী॥
. . . .
সর্ব্ব হাতে সাঁড়াশীতে শূল দিল ধর‍্যা।
আটুঁ পাত্যা বৈসে বুড়া আড়ম্বর কর‍্যা॥
ভীষণ ভৈরব জাঁতা জাঁতে হাতে পায়।
দে তায়্যা তায়্যা ই বল্যা ডাকে উভরায়॥
দড়বড় দৃঢ় কর‍্যা দিলেন দ্বিগুণ।
ফোঁস ফোঁস করে জাঁতা ফুকরে আগুন॥
ত্রস্তে পুড়ি ন্যস্ত করে নেহাই উপর।
উদয় পর্ব্বতে যেন শোভে দিনকর॥

হাতি পারা হাতুড় হেলায়্যা তোলে হাত।
মহেশ ভাবিয়া মনে মারিল নির্ঘাত॥" (ঐ/২২৫)

বাঙালী সমাজে দুটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হল ঢেঁকি এবং উদূখল বা 'ছাম'। ঢেঁকি এবং উদূখল ধান ভেনে চাল করার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র। মধ্যযুগে চাল তৈরী করার কাজে একমাত্র উপায় হল উদূখল ও ঢেঁকি। শিবায়নে তার সুন্দর ব্যবহার আছে— "যশোদা লইয়া কৃষ্ণে উদূখলে বান্ধে॥" (ঐ/২২৭)। প্রসঙ্গটি পৌরাণিক সন্দেহ নাই. কিন্তু উদূখলের ব্যবহার মধ্যযুগে ছিল। সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হত ঢেঁকির। কবির বর্ণনায়—

"নারদের ঢেঁকি আন্যা ধান্য ভানে ভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভাল মোর পুত॥
বাতাসে বাউলা ভূত উড়াইল তুষ।
যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যূষ। (ঐ/২৩৬)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ যদিও শিবায়ন যুদ্ধবর্ণনার কাব্য নয় তবুও মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি মেনে যুদ্ধবর্ণনা করা হয়েছে। শিবায়নে যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবসঙ্কীর্তন' পালার সম্পাদক যোগিলাল হালদার বলেছেন— "ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে কবি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের রাজপথ গ্রহণ করিয়াছেন।"[২] রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যের যুদ্ধবর্ণনা সম্পর্কেও একথা বলা যায়। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ বর্ণনায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করা হলেও রুক্মিণী হরণের পর রাজাগণের সহিত যাদবের যুদ্ধ, 'রুক্মির যুদ্ধ', বাণ রাজার সহিত যাদবদের যুদ্ধ, হরিহরের যুদ্ধ, মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ পৌরাণিক যুদ্ধবর্ণনা রীতিতে বর্ণিত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যের যুদ্ধবর্ণনাও মহাকাব্যের যুদ্ধবর্ণনা রীতিতে হয়েছে। এখানে শেল, শূল, শিলী, টাঙ্গী, ডাবুষ, পট্টিশ, নারাচ, কুঠার, ঢাল, তলোয়ার, শর, বাণ, চক্র ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্রের কথা আছে। এগুলি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সময়কালের যুদ্ধ ইতিহাসের কথা নয়, তা সমকালের সমাজ ইতিহাসের সত্যকে বহন করে না।

সাজসজ্জা ঃ অতঃপর আসা যাক্ পোশাক-পরিচ্ছদের কথায়। বাঙালীর সাধারণ পোশাক হিসাবে পুরুষরা ধুতি ও নারীরা শাড়ী পরিধান করত। উৎসব অনুষ্ঠানে শৌখিন শাড়ী ও ভাল পোশাক পরিধান করত। রামেশ্বরের কাব্যে গৌরীর বিবাহে নারীদের বেশভূষার কথা আছে—

"সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পর্যা।
দাণ্ডাল্য দেবের আগে দিব্য শোভা কর্যা॥" (ঐ/৮০)

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে শিবের বিবাহের তত্ত্ব হিসাবে পাঠানো হয়েছে কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ। কবির বর্ণনায়—

"কেন্দুয়া বাঘের ছাল গুজরাট ছিট॥
কৃষ্ণসারচর্ম্ম যেন পাটনেত শাড়ি।
মুনিপত্নীগণের দেখিব কাড়াকাড়ি॥" (রামকৃষ্ণ/১২৪)

পুরুষরা ধুতি ও লাঙট ব্যবহার করত, নারীগণ বক্ষাবরণ কাঁচুলি ব্যবহার করত। যেমন গৌরীর বাসরসজ্জা অংশে পাই—

"বিচিত্র কাঁচলি বান্ধা বুকের উপর।" (রামেশ্বর/৪৮)

সাধু-সন্ন্যাসীরা এবং পুরুষরা অন্তর্বাস হিসাবে কৌপীন ব্যবহার করত। যেমন—

"করে দিল করঙ্গ কৌপীন কটিদেশে।" (ঐ/১২৩)

শৌখিন বস্ত্র হিসাবে মেখলা, উত্তরীয়, ঘাঘরা ইত্যাদি বিভিন্ন বয়সের নারীরা ব্যবহার করত। ঘাঘর বা ঘাঘরার ব্যবহারও দেখা যায়—

"কটিদেশে কিঙ্কিণী করিছে কলরব।
ঘাঘরের উপরে ঘটার ঘটা সব॥ (ঐ/৪৮)

শয্যা নির্মাণে ব্যবহার করা হত খাট, বালিশ, মশারি, চাঁদোয়া, পাছড়া (সম্ভবত চাদর) ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে হরগৌরীর ফুলশয্যা বর্ণনায় শয্যা নির্মাণ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"তবে মহেশ্বর আসি বসিলা খট্টায়।
পাটের পাছড়া কথুবার তুলি তায়॥
আশে পাশে বালিশ পাটের মশাঅরি।
বিচিত্র চাঁদোআ শোভা করে তদুপরি॥" (রামকৃষ্ণ/১৪১-১৪২)

উৎসব বা বিবাহ উপলক্ষে গন্ধদ্রব্য, চন্দন, ফুল দিয়ে শয্যা নির্মাণের কথা পাই। যেমন—

"যক্ষকর্দ্দম গন্ধ তৈল ভরি শিশি॥

পথে ঝাটি দিয়া দিয়া চন্দনের ছড়া।

ফুল বিছাইয়া পাড়ে পাটের পাছড়া॥" (ঐ/১৪৪)

চামর, ব্যজন বা পাখা শয্যা নির্মাণের উপকরণ; গ্রীষ্মকালে চামর ও পাখা বাতাস করার জন্য ব্যবহৃত হত—

"চামর ব্যজন করি পাদ সম্বাহন"॥(ঐ)

অথবা— "পাখা পরিত্যাগ করি তারার বচনে।

বসিলা আসিয়া গৌরী পদ সম্বাহণে॥" (ঐ/১৪৬)

তাছাড়া কম্বল ও ছাতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণের কথা পাওয়া যায়।

পোশাক-পরিচ্ছদের পরে আসি অলঙ্কারের কথায়; মঙ্গলকাব্য মধ্যযুগীয় বাঙালীর অলঙ্কার শিল্পের ক্যাটালগ। শিবায়ন কাব্যেও বাঙালী ব্যবহৃত বিভিন্ন অলঙ্কারের কথা পাই, যেমন— হার, কঙ্কণ, কেয়ূর, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয় বা আংটি, নূপুর, শঙ্খ, বলয়, পাসুলি, বউলি, পলা, চুড়ি, তার, মল ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে 'গৌরীর প্রসাধন' অংশে পাই—

"কর্ণেতে তাড়ঙ্ক দিল চক্র কলস।

গণ্ডে চিত্রকেল দিআ মৃগমদরস।

কণ্ঠ ভূষণিআ পাত নানাজাতি হার।

কাঁচলি বান্ধিল বুকে লেপি ঘনসার

শঙ্খ কঙ্কণ মুদ্রা বলয় কেয়ূর।

কটিতে মেখলা কাঞ্চী চরণে নূপুর॥" (ঐ/১৪২)

গৌরীর বর দর্শনে আগত নারীগণের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ রায় যে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে নানা অলঙ্কারের পরিচয় আছে। কবির বর্ণনানুসারে—

"পত্রাবলী মাঝে পরে কর্ণের কর্ণিকা।.

দিলেন উত্তর কাণে নাকের বেশর।

কনক বউলি নাকে না রহে সোঁশর॥

কেহ এক নয়নেতে পরিআ কজ্জল।

কেহ কেহ এক কাণে পড়িল কুণ্ডল॥

পাএর মঞ্জীর কেহ করিল অঙ্গদ॥

কেয়ূর বলয়া দিয়া সাজাইল পদ॥

হস্তের অঙ্গুলে দিল পাএর পাশুলি।

কটির কিঙ্কিণী কেহ গলে দেই তুলি॥ (ঐ/১৩৮)

সোনা ও রূপার বিভিন্ন গহনা নানা রকম মূল্যবান পাথর সহযোগে তৈরী হত । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে কিশোরী গৌরীর সাজসজ্জার বিবরণে তার সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন—

"গিরীন্দ্র গৌরীর গায় দিল অলঙ্কার॥

পায় দিল পাটামল পাসুলির পাঁতি।

মহামণি মুকুতা মণ্ডিত কত ভাতি॥

গুম্ফের উপর যে গঠিত গোটা মল।

দপদপ করে দুটী চরণ কমল॥

... ...

কন্ঠদেশে কত রত্ন শোভা করে হার।
মণির মোহন মালা মূল্য নাহি যার॥
সুবলিত ভুজে সাজে সুবর্ণের চুড়ি।
সূর্য্য রহিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি॥
রজতের কঙ্কণ রহিল তার কোলে।
হাটক জড়িত হীরা দপ্ দপ্ জ্বলে॥
আগে সাজে পঁউছি পশ্চাতে বাজুবন্দ।
দিব্যরূপা পাটখোপা দেখিতে সুছন্দ॥
সকল অঙ্গুলিগুলি অঙ্গুরী ভূষিত।
মরকত চুণী মণি মাণিক্য ভূষিত॥
দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুই দর্পণের ছাব।
রবিশশী উভএ কর্য্যাছে আবির্ভাব॥
বাহুমাঝে তাড় সাজে বিরাজে পদ্মিনী।
বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে বিশ্ব বিমোহিনী॥
নব ঢাকি উপরে বউলি বিলক্ষণ।
রতনে জড়িত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
দুদিকে দুগুণ মুক্তা মধ্যখানে চুণী।
সুবর্ণের নথ নাকে ভুবনমোহিনী। (রামেশ্বর/৪৮-৪৯)

শিবায়নে বাঙালীর রূপচর্চার কথা পাওয়া যায়। তেল, আমলকি, হরিদ্রা, চন্দন, কাজল, আলতা, কুঙ্কুম, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, চন্দন, অগুরু ইত্যাদি রূপচর্চার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়া রূপচর্চার সহায়ক উপকরণ দর্পণ, চিরুণী ইত্যাদি ব্যবহারের কথা পাই। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর প্রসাধন অংশের বর্ণনায় আছে—

"এথাতে পার্ব্বতী লৈআ যতেক অবলা।
উদ্বর্ত্তন করি তাঁর দূর কৈল মলা॥
চন্দন কস্তুরী চূয়া মিশাইয়া কুঙ্কুমে।
মঙ্গল করিল অঙ্গে এই চতুঃসমে॥
গন্ধরাজ তৈল দিআ কৈল অভ্যঙ্গিত।
কলসে আনিলা জল কর্পূরবাসিত॥
নখী আমলকী মিথি মাখিয়া মস্তকে।
স্নান করাইল সভে পরম কৌতুকে॥
. . .   .
কনককঙ্কতি লৈআ আঁচড়ে চিকুর।
সম্মুখেতে পদ্মাবতী ধরিল মুকুর॥" (রামকৃষ্ণ/১৪২)

নারীরা ললাটে চন্দন, কপালে সিন্দুর ও চোখে কাজল পরত। যেমন—

"ললাটে চন্দনবিন্দু সিন্দুরতিলক।
বিজুলী সদৃশ পত্রাবলীর ঝলক॥
চক্ষে পরাইল তাঁর সোহাগ অঞ্জন।

শরদ পঙ্কজে যেন উড়িছে খঞ্জন॥" (ঐ)

কিংবা, "সুন্দর কপালে দিল চন্দনের বিন্দু।
তার সনে তারাগণে আগুলিল ইন্দু॥
কজ্জলে উজ্জ্বল কর‍্যা কুরঙ্গ লোচন।
অপাঙ্গে অনঙ্গ বাণ করে বরিষণ॥" (রামেশ্বর/৪৯)

শাঁখা ও সিন্দুর হিন্দু বাঙালী এয়োস্ত্রীদের প্রধান প্রসাধন। শুধু প্রসাধনই নয়, এর সংস্কারগত মূল্যও আছে, তাইতো এয়োস্ত্রীদের আজন্ম সিন্দুর পড়ার আশীর্বাদ করা হত। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারীরা নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলতে নানা ছাঁদে চুল বাঁধত, খোপা, বিনুনী বা বেণী বাঁধত, বিভিন্ন রকম অলঙ্কার ও ফুল দ্বারা তারা সাজত, এতে তাদের রুচিবোধ এবং শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর প্রসাধন অংশে পাই—

"বেশ বিন্যাস সভে করে মনোসুখে।
অন্ধকারে আলো করে পার্ব্বতীর মুখে॥
বেণী বিনাঞা পিঠে পেলিল তাঁহার।
মণি উগারিয়া যেন ফণী করে চার॥" (রামকৃষ্ণ/১৪২)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে গৌরীর কেশ সজ্জার বিবরণে আছে——

"চিরাণিতে চিরিয়া চিকুর কৈল বন্ধ।
মদন মূর্চ্ছিত হৈল দেখিয়া সুছন্দ॥" (রামেশ্বর/৩১৯)

কিংবা— "খোঁপা বান্ধে চাঁপা ঝাঁপার সহিত।
মোহন-মল্লিকা মালা মস্তকে বেষ্টিত॥" (ঐ/৩৩৮)

শিবায়ন কাব্যে মধ্যযুগীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ বিন্যাসের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিত্তবানরা মূল্যবান পোশাক, গহনা ও অলঙ্কার দিয়ে সাজসজ্জা করত আর দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দারিদ্র্যময়। দরিদ্র সাধারণ নিম্নশ্রেণীর বাগদী, দুলে জাতির মানুষরা সাধারণ বস্ত্র, পিতলের ঝুটা গয়না পরিধান করত, খোপায় ফুল ব্যবহার করত। রামেশ্বরের গৌরীর বাগদিনী বেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে এই তথ্য পাওয়া যায়। কবির বর্ণনায়——

"দুহাতে দুগাছি মাঠ্যা কাপড় পড়েছে আঁট্যা
খাট কর‍্যা হাঁটুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটী
পুঁতি বেড়্যা সাজ্যাছে সুন্দর॥
অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি খঞ্জন-গঞ্জন দেখি
সুললিত নাকে নাকচোনা।
নবীন নীরদ তনু তরুণ তিমির ভানু
রূপে আলো কৈল কাল্যাসোনা।
ভুবনমোহন খোঁপা সঙ্গী শালুকের ঝাঁপা
পেট্যা পাড়্যা পর‍্যাছে সিন্দুর।

কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়্যাছে উচ্চ
কদম্ব কুসুম কর্ণপুর॥
পিত্তলের ঝুট্যা পায় যাবক রঞ্জিত তায়
করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।" (ঐ/৩৪০)

বাদ্যযন্ত্র ঃ শিবায়ন কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের আর একটি উপকরণ হল বাদ্যযন্ত্র। ধাতু নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, চামড়া আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র, তারের বাদ্যযন্ত্র এবং বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাদ্যযন্ত্র— চার প্রকার বাদ্যযন্ত্র ই এখানে আছে, যেমন— দুন্দুভি, বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল, ঢাক, ঢোল, দগ (দগড়),ডঙ্কা, ধামা (দামামা), ভেরী, মুরচঙ্গ, মুরারী, সপ্তস্বরা, পাখাজু, টমক, ঘণ্টা, সানি, রবার, কাঁসি, শঙ্খ, ভৃঙ্গা, বাঁশি, পিণাক, কবিলাস, খমক, মাদল, পড়া, কাড়া, ডিণ্ডিম ইত্যাদি।

বাঙালী আনন্দ-উৎসব, যথা— বিবাহ, পূজা-পার্বণাদি বা সন্তানের জন্মের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মহোৎসব করত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে 'ঋষিগণের আনন্দোৎসব' অংশে বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্রের কথা পাই। যেমন—

"বাজে বাদ্য বীণা বেণু বেড়াজাল কাঁসি।
শঙ্খ সিংহনাদ ভৃঙ্গা করতাল বাঁশি॥
রবাব পিণাক স্বরমণ্ডল কেঙ্গিরা।
ঘণ্টার টঙ্কার ঘন বাজায় মন্দিরা॥
সপ্তস্বরা কবিলাস মধুর কেঙ্গারি
মাদল মৃদঙ্গ পড়া দণ্ডি মহুরি॥
তুম্বুরি কিন্নরী বাজে দগর টমক।
দামা দড়মশা ডম্ফ ডমরু খমক॥
ভেরী ভুড়ুঙ্গ সানি বাজে কাতকালি।
বিজি ঘোষ বিশাল ডিণ্ডিম একতালি॥
ঢাক ঢোল ঢেমচায় হৈল গণ্ডগোল।
শুনিতে না পায় তথা কেহ কার বোল॥(রামকৃষ্ণ /১২৭)

বিবাহ উপলক্ষে শুধু বাজনাই বাজত না রীতিমত নৃত্যগীতের আয়োজন হত—

"রথের সাজনী দেখি বাজনিঞা ধায়।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে সালিবেনু গায়॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী রম্ভা মেনকা অপ্সরা।
অঙ্গভঙ্গে নাচিআ বাজায় সপ্তস্বরা॥
পাখাজু মৃদঙ্গ বীণা কার কার হাতে।
করতাল মন্দিরা বাজাইআ যায় পথে॥ (ঐ /১৩৭)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে 'শিবের বরযাত্রা' অংশে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—

"ত্রিদশ দুন্দুভি বাজে বাজায় বিশাল।
বেণু বিনা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল॥

ঢাক ঢোল দগ ডঙ্কা সড় ধামা ভেরী।
মঙ্গল মুরচঙ্গ কত মোহন মুরারী॥
কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গান করে তারা।
আগে আগে নৃত্য করে ইন্দ্রের অপ্সরা॥" (রামেশ্বর /৭৪)

এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির কতকগুলি যুদ্ধ যাত্রাকালে ব্যবহৃত হত, যথা— রণভেরী রণদামামা, শিঙ্গা, দগড়, কাড়া, রুদ্রবীণা জয়ঢাক ইত্যাদি। শিবায়নে যুদ্ধবর্ণনার অবকাশ কম, তাই এই বাদ্যযন্ত্রগুলি রণবাদ্যের অন্তর্গত করা হয়নি। বাদ্যযন্ত্র ছাড়া বিবাহ বা মঙ্গল উৎসবে বাজী পোড়ানো হত,যেমন-চরকি, হাউই বা হাওয়াই, আতস বাজী ইত্যাদির উল্লেখ আছে শিবায়নে। উজ্জ্বল আলোর জন্য মশাল ব্যবহার হত। রামেশ্বরের বর্ণনায়—

"খোশাল হৈয়া পেতি মশাল যোগায়।
কৌতুকে কুষ্মাণ্ডগণ গড়াগড়ি যায়॥
দপ্ দপ্ দীপক জ্বলিছে ধূনা মড়া।
হাজার হাজার চলে হয়ে হাতী ঘোড়া॥
চরকি হইয়া কেহ চলে সাথে সাথে।
হাওয়াই হইয়া কেহ ধায় শূন্য পথে॥
অশেষ আতস বাজি করে সর্ব্বভূত।
শঙ্কর সাবাসি দেন ভেলা মোর পুত॥" (ঐ/৭৫)

শিল্পকর্ম ঃ শিবায়ন কাব্যে বাঙালীর ব্যবহৃত নানা উপকরণের মধ্যে দিয়ে নানা শিল্পকর্মে রুচি, শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় আছে। যেমন— দেবীর কাঁচুলি নির্মাণ মঙ্গলকাব্যের বিশেষ প্রসঙ্গ, এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগীয় বাঙালীর চিত্রশিল্পের পরিচয় পাই। সে সময়ে মেয়েরা যে কাঁচুলি বা বক্ষবন্ধনী ব্যবহার করত তাতে চমৎকার কারুকার্য থকত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"বিচিত্র বসনে বেশ চতুর্দ্দশ পুরী।
পূর্ব্বাপরে শোভা করে উদয়াস্ত গিরি॥
সোম সূর্য্য উভয় উদয় হয় তায়।
তার মাঝে বিরাজে তারকা সমুদায়॥
. . . .
বিচিত্র কাঁচলি চিত্র করিয়া কামিলা।
বন্দনা করিয়া মাথে বিশ্বনাথে দিলা॥" (ঐ / ৩৩৫-৩৩৬)

শুধু কাঁচুলিই নয় শিবায়নে গৌরীর শঙ্খ নির্মাণের কথা আছে। কাঁচুলির মতই শঙ্খও নানা কারুকার্য মণ্ডিত করা হত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য শঙ্খের কারুকার্য বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় আছে। কবি লিখেছেন—

"যোগেন্দ্রপুরুষ যোগ পথে দিয়া দৃষ্টি।
দিব্য দুটী বাই শঙ্খ করিলেন সৃষ্টি॥
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন কৈল তায়।
স্থাবর জঙ্গম চরাচর সমুদায়॥
. . . .
বিচিত্র শঙ্খের চিত্র বর্ণিবার নয়।

সোম সূর্য্য সহিত সকল রত্নময়॥" (ঐ/ ৩০২-৩০৪)

তাছাড়া অলঙ্কার শিল্প বাংলার একটি বিশিষ্ট শিল্পের মর্যাদা লাভ করেছিল। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুন্দর চিত্র অঙ্কন করা হত, সুন্দরভাবে পূজামণ্ডপ, বিবাহের ছায়ামণ্ডপ, পালঙ্ক ফুল-পাতা দিয়ে সুসজ্জিত করা হত।

যানবাহন ঃ অতঃপর আসা যাক্ যানবাহনের বাহনের কথায়। শিবায়নে সেকালে ব্যবহৃত যানবাহনসমূহের উল্লেখ করা হয়নি। তবে সাধারণত পশুর পিঠে যাতায়াত করা হত। তাছাড়া রথ বা ঘোড়ায় টানা গাড়ী, চতুর্দোল, পালকী ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিবায়ন কাব্যে সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানগুলি তেমনভাবে বর্ণনা করা হয়নি। কাব্য ইতিহাস নয়, তবে কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাসের নানান উপকরণ কাব্যে উঠে এসেছে। শিবায়নের কাব্যকাহিনী অনুসারে সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানের বর্ণনার অবকাশ নেই। যে জাতীয় কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কার বিশ্বাসগুলি উঠে এসেছিল শিবায়নে তার সুযোগ নেই। ঝাঁড়-ফুঁক, তুক্-তাক্, ঔষধীকরণ, বশীকরণ, গ্রহ-নক্ষত্র বিচার, পশুপাখির নানা নিদর্শনের মধ্যে দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয়ের কথাও নেই। এমন কি গণৎকার জ্যোতিষী, ওঝা ও বৈদ্যদের প্রভাবের কথাও নেই, অথচ এই সময়ে রচিত মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে তার প্রচুর বর্ণনা দেখা যায়। আমরা দেখেছি চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যান অংশে সংস্কার-বিশ্বাস, আচার আচরণগত লৌকিক উপাদানগুলির ব্যবহার কম। মনে হয় সহজ সরল নিম্নবর্ণের অনার্য সমাজে বিভিন্ন কুসংস্কারগুলি তেমন দানা বেঁধে ওঠেনি। কবিগণ অনেক সময় আপন সমাজের প্রসঙ্গকে ব্যাধ সমাজের উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন। শিবায়ন কাব্যে সাধারণ অশিক্ষিত কৃষিজীবী সমাজের কথা বর্ণিত হওয়ায় এই জাতীয় উপাদানের ব্যবহার অনেক কম। তবে কিছু উপাদান বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে আছে, যেমন— শাঁখা ও সিন্দুর বাঙালী নারীর কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই শঙ্খের গুণাগুণ বিষয়ে সংস্কার ছিল——

"শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ তিলেক নাহি হয়॥
কান্তের সহিত কতকাল থাকে জীয়া।
এমন শঙ্খের গুণ শুধিবে কি দিয়া॥ (ঐ/৩১১)

রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত। এই সময় সমাজের বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল; কৃষিজীবী সমাজের মূল ধর্মই ছিল বৈষ্ণবধর্ম। বস্তুতপক্ষে শাক্ত এবং শৈবধর্ম হয়ে পড়েছিল উচ্চবিত্তের তথা উচ্চবর্ণের ধর্ম। লৌকিক সমাজে বিভিন্ন বার-ব্রত, শিব চতুর্দশীর ব্রত, একাদশী ব্রত, সত্যনারায়ণের ব্রত বা সত্যপীরের ব্রত প্রচলিত ছিল। শিবরাত্রি ব্রত মাহাত্ম্য, একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য প্রচলিত ছিল এবং তার প্রতি সাধারণ মানুষের এক জাতীয় বিশ্বাস কাজ করেছিল। শৈব-শাক্ত, বৈষ্ণব সকলের কাছেই একাদশী ব্রতের মাহাত্ম্য প্রচারিত ছিল। লোকে বিশ্বাস করত বলেই কবি প্রচার করেছেন—

"যোড় হাতে যত্ন কর্য্যা বলি জনে জনে।
খায়্য না খায়্য না অন্ন একাদশী দিনে॥
সত্য বলি সার বলি আর বলি হিত।
একাদশী দিনে অন্ন খাবা অনুচিত।" (ঐ/২১৪)

শিবরাত্রি ব্রত সম্পর্কে অনুরূপ প্রচার ছিল—

"মোর চতুর্দশী যেন অষ্টমী তোমার
একাদশী তেমন বিষ্ণুর ব্রত সার।

হরি হর হৈমবতী তিনে নাই ভেদ।
তিন ব্রত সভার কর্ত্তব্য বলে বেদ॥
শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।
মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ঠ হবে কিসে॥
একাদশী অন্ন খাল্যে অধঃপাত হয়।
অতএব সবার কর্ত্তব্য ব্রত হয়॥" (ঐ/ ২১১)

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে সংস্কার-বিশ্বাসের কথা নেই, কারণ কবি চৈতন্য প্রভাবিত মুক্ত সমাজে বৈদিক আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। শিবায়ন কাব্য প্রকৃতপক্ষে এক সমন্বয় যুগের ফসল; তাই এতে ধর্ম সমন্বয়ের কথা আছে, আছে অনেকটা আচার-বিচারহীন মুক্ত সমাজের কথা। যে সমাজের মূল কথা হল নব মানবতাবাদ। শিবায়নে আমরা এই নব মানবতাবাদের কথা পাই। তাই শিবঠাকুর স্বীয় পূজা প্রচারের চেষ্টা করেনি, ফসল ফলিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে চেয়েছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের সমাজে তুক্-তাক, ঔষধীকরণ বশীকরণের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তাই স্বীয় কন্যার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে কনের মাতা বিবাহকালে জামাতা বশীকরণের জন্য ঔষধ করত। শিবায়নে গৌরীর বিবাহে মেনকাকে চালপড়া ছোঁয়াতে দেখি——

"ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন।
একে একে আরম্ভিল ঔষধের গণ॥
মন্ত্র পড়্যা গুড়ে চাউলি বক্ষে দিলে ফেল্যা।
দপ্ দপ্ কপালে দহন উঠে জ্বল্যা॥ (ঐ/৮১)

নারী সম্পর্কে বিভিন্ন বাধা-নিষেধ ও সংস্কার প্রচলিত ছিল। রজঃস্বলা হবার পূর্বেই নারীকে পাত্রস্থ করা প্রয়োজন হত, না হলে তার পিতৃপুরুষগণের নরকবাস হয় এরূপ ধারণা ছিল—

"অবস্থিতা কালে যদি হয় রজস্বলা
তার পিতৃলোক ভুঞ্জে নরকের জ্বালা॥ (রামকৃষ্ণ/১১১)

শুধু তাই নয়, কন্যা যদি বিবাহের পূর্বে কোন পুরুষকে দেখে কামাসক্ত হয় কিংবা কোন পুরুষের প্রতি কটাক্ষ করে তবে তার কন্যার পিতা অধোগতি প্রাপ্ত হয় বলে মনে করা হত। যেমন—

"পুরুষ সম্ভাষে কন্যা হয় কামচিন্তা।
অবস্থিতা দোষেতে পাতকী হয় পিতা॥
অবস্থিতা কালে কন্যা পুরুষের প্রতি।
কটাক্ষে চাহিলে পিতা যায় অধোগতি॥" (ঐ)

পার্বতী স্বয়ং এই সমস্ত সামাজিক সংস্কার-বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারেনি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সতীত্বের মহিমা উৎকটভাবে প্রচলিত ছিল। সতী নারীর মহিমা সম্পর্কে রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন—

"গৌরী বলে সতী অগ্ন্যে নাহি যায় পোড়া।
তার গায়ে অগ্নি যেন চন্দনের ছড়া॥" (ঐ/১২১)

সতীত্বের মূল্য বাঙালী সমাজে কত দৃঢ় ছিল রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যেও তা দেখতে পাই—

"সতীর প্রতাপ সয়্যা শুন মন দিয়া।
জনম সার্থক হবে জুড়াইবে হিয়া॥

শুষ্ক হয় সাগর সতীর অভিশাপে।
সতী নষ্ট করিলে রাখিবে কার বাপে॥
সতীশাপে ঈশ্বর আপনি হল্যা অশ্ম।
সতীশাপে সুবর্ণের লঙ্কাপুরী ভস্ম॥
সতীর প্রতাপে কুরুবংশ হয় ক্ষয়।
সতীশাপে অনন্ত অবনী শিরে বয়॥
সংসারে সতীর পর নাহিক উত্তম।
ব্রহ্মাবিষ্ণু কহেন সতীর পরাক্রম॥ (রামেশ্বর / ৩১৩)

পরনারী সম্পর্কিত সংস্কার ছিল, পরনারী গমন সামাজিক দৃষ্টিতে পাপ বলে চিহ্নিত হত—

"পরস্ত্রীর প্রতি যদি মতি করে অন্য।
অধোগতি যায় অধমের অগ্রগণ্য॥ (ঐ)

বস্তুত এসময়ে সমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দৈবজ্ঞদের প্রভাব অনেকটাই বোধ হয় হ্রাস পেয়েছিল। তাই এসময়ে রচিত মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাদের প্রভাবের কথা থাকলেও তা গতানুগতিক কাহিনীকে বজায় রাখার জন্য, এসময়ের মৌলিক কাব্য শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলে তার উল্লেখ নেই। বিশেষত অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র ব্যাস এবং শিবকে নিয়ে যে তামাশা করেছেন তাতে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তা সত্ত্বেও সমাজে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষীদের এতকালের প্রভাব কিছুটা বজায় ছিলই। বিবাহ বা কোন শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দৈবজ্ঞের পরামর্শে পাঁজি-পুথি দেখে, লগ্ন, তিথি, রাশি দেখে দিনক্ষণ স্থির করা হত। শিবায়নে গৌরীর বিবাহে দেবগণ তুলা লগ্নে শঙ্করের বিবাহ স্থির করে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়-

"তুলা লগ্নে হয় যেন শঙ্করের বিভা।" (ঐ/১২৩)

এছাড়া আশীর্বাদ, অভিশাপ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং তার ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস ছিল। গৌরীর বিবাহকালে তাকে সারাজীবন এয়ো থাকার আশীর্বাদ করা হয়েছিল—

"আশীর্ব্বাদ নিল কন্যা থাকিব আইয়াতে॥
আমিষ ভোজনে তাঁর যাইবেক কাল।
সিন্দূরে উজ্জ্বল তাঁর থাকিবেক ভাল॥
. . .   .
আশীর্ব্বাদ করে তথা যতেক আভীরী।
দুধে পুতে জন্মে জন্মে বাড়িবেন গৌরী॥ (ঐ/১৩০)

বাঙালী সমাজ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে, অলৌকিকতা নিয়ে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল।

শিবায়ন কাব্যে বাঙালীর আচার-বিচারগত ঐতিহ্যের কথা আছে। নবজাতকের জন্ম থেকে বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত পালিত আচারের কথা পাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। শিবায়নের কাহিনী অংশে জন্ম ও মৃত্যুকালীন আচারের কথা তেমন নেই তবে বিবাহাচারের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। রামেশ্বরের কাব্যে গৌরীর জন্মকালীন লোকাচার পালনের কথা আছে। বাঙালী সমাজে অর্থ ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা সন্তানের জন্মকালে নানা রকম আমোদ-প্রমোদ করত। যেমন, গৌরীর জন্মকালে——

"লইয়া বান্ধব জনে বাদ্যগীত কোলাহলে
করিল কৌলিক মহোৎসব। (রামেশ্বর/৪৭)

কুলাচার অনুসারে নবজাতকের জন্মের পর নানান আচার পালিত হত, শিবায়ন কাব্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রসূতির গর্ভকালীন সময় থেকেই নানান লোকাচার পালিত হত,আবার সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে আঁতুরঘর বা সূতিকা গৃহে রাখা হত। যেমন–

"পূর্ণ গর্ভ হইলা মেনার লোকাচারে।
প্রসব হইলা রাণী সূতিকা আগারে॥ "(রামকৃষ্ণ/৭২)

নবজাতকের জন্মকালে শঙ্খ, ঘন্টা বাদ্য ও উলুধ্বনি সহকারে নবজাতককে বরণ করে নেওয়া হত। ধাত্রী নবজাতকের নাড়িচ্ছেদ করত। তারপর কুলধর্ম অনুসারে ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা করা হত––

"শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজিল আকাশে।
জয় জয় হুলাহুলি কুসুম বরিষে॥
হীরার ধারাতে তাঁর কৈল নাভিচ্ছেদ।
স্নান করাইল কন্যা উচ্চারিল বেদ॥
হরিষে হেমন্ত ঋষি করিল জাতকর্ম্ম।
কন্যার জনমে যেন আছে কুলধর্ম্ম॥
ছয় রাত্রে ষষ্ঠীপূজা করাইল ঋষি।
রক্ষক বেড়িয়া জাগে যত দাস দাসী॥ (ঐ)

সাত মাসে নবজাতকের অন্নস্পর্শন বা অন্নপ্রাশন করা হত। এ উপলক্ষে মঙ্গলকর্ম, হোম যজ্ঞ করা হত। ধনীরা এই উপলক্ষে দানধ্যান করত, কেউ বা মঙ্গলগানের আয়োজন করত—

"সপ্ত মাসে তথাতে আইলা সপ্ত ঋষি।
হাহা হুহু সঙ্গে আইলা মেনকা উর্ব্বশী॥
মেনকা অপ্সরা রাজমহিষীর সই।
মঙ্গল গাইয়া সে বিলায় দই খই॥
নৃত্য গীত মহোৎসব বিবিধ বাজনা।
আইলা তথায় দেবঋষির অঙ্গনা॥
হোমকর্ম্ম সমাপিয়া কন্যার প্রাশন।
দেবপুরোহিত কৈল নামকরণ।" (ঐ)

অর্থাৎ অন্নপ্রাশনে নবজাতকের নামকরণও করে নেওয়া হত। রামেশ্বরের কাব্যে পাই পাঁচ মাস বয়সে কন্যার কর্ণভেদ করার কথা এবং সাত মাসে অন্নপ্রাশন ও নামকরণ করার কথা––

"পর্ব্বত পুণ্যাহ পাইয়া পাঁচ মাস কালে।
কর্ণভেদ কন্যার করে কুতূহলে॥
পূষ্যায় পরমানন্দে পরিপাটি করি।
সাতমাসে শিশুকে ওদন দিল গিরি॥ (রামেশ্বর/৪৭)

যৌবনকালে বিবাহ মানব জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। শিবায়নে বাঙালীর বিবাহরীতির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বৈদিক ও লোকাচার উভয়ে মিলেই বাঙালীর বিবাহাচার পালিত হত। গৃহস্থের ধর্মে কন্যার পাণিগ্রহণ সামাজিক রীতি। বিবাহের পূর্বে ঘটক মহাশয় বর-কনে নির্বাচন করে তিথি-নক্ষত্র বিচার করে বিবাহ লগ্ন স্থির করত। বাঙালীর বিবাহে ঘটকের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কারণ—

"নন্দি বলে প্রভু   বিভা নহে কভু
ঘটক না থাকে যথা।" (রামকৃষ্ণ /১০৪)

বাঙালীর বিবাহে নানা আচার ক্রমান্বয়ে পালিত হত, যথা— গায়েহলুদ-অধিবাস-জলসওয়া-বর বরণ–শুভদৃষ্টি-সম্প্রদান-সিন্দুর দান–কুশণ্ডিকা–বাসরযাপন–ফুলশয্যা ইত্যাদি। বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের প্রথম আচার হল গায়েহলুদ; বর ও কনেকে নিজ নিজ পারিবারিক আচার অনুসারে গায়ে হলুদ করানো হত। কবি লিখেছেন—

"বাদ্যগীত বিস্তর করিয়া কোলাহল।
হর্ষযুক্ত হৈয়া কৈল হরিদ্রা মঙ্গল॥"(রামেশ্বর/৭৩)

এরপর বর ও কনেকে নিজ গৃহে কুলাচার অনুসারে অধিবাস করানো হত এবং বর-কনের হাতে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হত। যেমন—

"করিল আধিবাস মনেতে উল্লাস
দেবপুরোহিত জীব॥
করেতে মণিবন্ধে মঙ্গলসূতা বান্ধে
আসিয়া ভৃগু হরষিতে।" (রামকৃষ্ণ/১২২)

অধিবাসের উপকরণ হল—

"মহীগন্ধ শিলা ধান্য দুর্ব্বা পুষ্প ফল।
ঘৃত দধি দুগ্ধ দিল সিন্দূর কজ্জল॥
রোচণা সিদ্ধার্থ স্বর্ণ রূপা তাম্র আদি।
চামর দর্পণ দীপ দিল যথাবিধি॥" (রামেশ্বর/৭৭)

ষোড়শমাতৃকাপূজা, ষষ্ঠী ও মার্কণ্ডেয়পূজা করে অধিবাস সম্পন্ন হত এবং পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে 'নান্দীমুখ' করা হত। কবির বর্ণনায়—

"বন্দিল প্রশস্ত পাত্র সূত্র বান্ধি করে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজা করে তারপরে॥
ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় পূজ্যা দিল বসুধারা।
চেদিরাজ পূজ্যা নান্দীমুখ কৈল সারা॥ (ঐ)

অন্যদিকে বরকেও যথাবিধি অধিবাস করানো হত। অবশ্য বিবাহ সম্পর্কিত আচার পালনে, অঞ্চল বিশেষে পার্থক্য আছে, কোথাও বা বরের অধিবাসের পর অধিবাসদ্রব্য এবং এয়োগণের নানা উপঢৌকন কন্যাগৃহে পাঠানো হত, তারপর কন্যার অধিবাস সম্পন্ন হত। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে পাই শিবের অধিবাসের পর অধিবাস দ্রব্য হিমালয় গৃহে পাঠানো হয়েছে—

"অধিবাস দ্রব্য লও করি পরিপাটি।
যেমতে গৌরীর মাতা না করে আখুটি॥
কুবের ভাণ্ডারী হৈয়া চল সেই স্থানে।
সেই দ্রব্য দিবে তুমি যে চাহিব যখনে॥" (রামকৃষ্ণ /১২৩)

এই অনুষ্ঠানে প্রথমে পুকুর কেটে তার চার কোণে কলা, পান, সুপারি দেওয়া হত, এয়োগণ গন্ধদ্রব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চকষায় নানা তীর্থের জলে মিশিয়ে পাত্র বা কন্যাকে স্নান করাত। যেমন—

"আকাটি পুকুরী কৈল চারি কোণে কলা।
আসন তাহার মধ্যে রাখিলেন শিলা॥

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইল দিয়া হুলাহুলী।
গন্ধদ্রব্যে পার্ব্বতীর উদ্বর্ত্তন করি ॥
পঞ্চামৃত পঞ্চ গব্য পঞ্চরত্ন জলে।
পঞ্চ কষায়ের রস দিল কুতূহলে ॥
সর্ব্বতীর্থজলেতে গুলিয়া সর্ব্বৌষধি।
সহস্র ধারায় স্নান যেন আছে বিধি ॥" (ঐ/১২৬)

এর পরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে অধিবাস করানো হত এবং শেষে এয়োগণ বর বা কনের হাত ধরে ঘরে নিয়ে যেত—

"অধিবাস হইল দুর্গা গেল অন্তঃপুরে।
অরুন্ধতী আগে যায় ধরি তাঁর করে ॥" (ঐ/১২৭)

তারপর জলসওয়া নামক অনুষ্ঠান; এয়োস্ত্রীগণ মঙ্গলডালা, মঙ্গলঘট নিয়ে বাদ্য সহযোগে মঙ্গলগান গাইতে গাইতে জলসইতে যেত। রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন—

"হাতে কৈল মঙ্গলের ডালা।
জয় জয় যায় মেনা জল সহিবারে।
আইয় সুইয় শতে শতে চলিলা নগরপথে
মঙ্গল গাইয়া উচ্চস্বরে।" (ঐ/১২৮)

জলসইতে যাবার উপকরণ হল মঙ্গল ডালা, মঙ্গল ঘট, ফুল, পান, সুপারি, চন্দন, সিন্দুর, প্রদীপ, চামর, গঙ্গাজল ইত্যাদি। আসলে ঐ সমস্ত মাঙ্গলিক উপকরণ সহযোগে বিবাহমঙ্গল উপলক্ষে দেবদেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হত এবং তাদের আশীর্বাদ কামনা করা হত। নগরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যেখানে যত দেবদেবী আছে তাদের আহ্বান করা হত—

"পুনর্ব্বার আইলা রাণী নগর ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমিলা মুনির ঘরে ঘরে ॥
কুটুম্বিনী সহিত করিয়া কুলাচার।
চৌহাটে করিল জাত গ্রামদেবতার ॥" (ঐ/ ১৩০)

এবং শেষে জলপূর্ণ মঙ্গলঘট ছায়ামণ্ডপের বেদীকায় রাখা হত—

"ছায়ামণ্ডপেতে আছে কাঞ্চনবেদিকা।
তাহাতে মঙ্গলঘট রাখিল মেনকা ॥" (ঐ /১৩২)

এদিকে বরযাত্রী সহ বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হলে কনের মাতা এবং এয়োরা বরকে পাদ্য, আসন, মধুপর্ক দিয়ে বর বরণ করে নিত। কবির বর্ণনায়—

"দিলেন আসন পাদ্য বরণের কালে।
অর্ঘ্য দিয়া আচমন দিল গঙ্গাজলে ॥
মধুপর্ক পূরি দিল কাঞ্চনের পাত্র।
পরশিয়া শঙ্কর লইল ঘ্রাণ মাত্র ॥" (ঐ/১৩৩)

এবং

"মেনা সাজাইয়া ডালা বরণ করিতে গেলা
আইয় সুইয়গণের সহিতে।" (ঐ)

বিবাহ উপলক্ষে ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হত, চার কোণে চারটি কলাগাছ পুঁতে ছায়ামণ্ডপ মঙ্গলঘট দিয়ে সুসজ্জিত করা হত। সেখানে বিবাহের স্ত্রীআচার পালিত হত। বরকে বিবাহ সভায় বা ছায়ামণ্ডপে এনে বিবাহাচার অনুসারে বরকে নানা রকম দ্রব্য উপহার দেওয়া হত এবং পরে কন্যাকে ছায়ামণ্ডপে নিয়ে আসা হত। কনে পান দিয়ে মুখ ঢেকে কন্যা সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করত এবং তারপর পান ফেলে দিয়ে বরকনের শুভদৃষ্টি ও মালাবদল করা হত। শেষে ছায়ামণ্ডপে বসিয়ে বরের হাতে কনের হাত বন্ধন করে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদান সম্পন্ন হত—

মধ্যে চন্দ্র আচ্ছাদন দিআ সাত বার।
প্রদক্ষিণ করি কন্যা হৈল নমস্কার॥
পান ঘুরাইআ আনএ ঔষধের ডালা।
চারি চক্ষে চাহিআ বদন কৈল মালা॥
অন্তস্পট দূর করি আনিল ছামনি।
কন্যা বর একত্র করিল দুই পাণি॥ (ঐ / ১৩৫)

এবং এরপর—

"তাম্রপাত্রে গঙ্গাজল ত্রিপত্র তুলসীদল
আরম্ভ করিল মহাবাক্য॥
হর পার্ব্বতীর পাণি ঘটের উপর আনি
দিল পঞ্চ হরিতকী ফল॥
দুই হস্ত রাখি চিত্রে বেষ্টিত করিল সূত্রে
কন্যার হস্তেতে দিল জল॥
মুখচন্দ্রিকার লক্ষ্যে শুভদৃষ্টি চারি চক্ষে
বর কন্যা আচ্ছাদিআ বাসে।
দক্ষিণান্ত কৈল গিরি কন্যা সমর্পণ করি
বসাইল শিবের বাম পাশে॥" (ঐ/ ১৩৫)

বিবাহান্তে কন্যাকে সিঁদুর দান করা হত —

"শঙ্কর আপন হাথে সিন্দূর দিলেন সিঁথে
পরশিল কর কর্ণশোভা।" (ঐ / ১৩৬)

পরদিন বাসিবিয়ে ; এর প্রধান আচার হল কুশণ্ডিকা বা হোম বা যজ্ঞক্রিয়া। কৃত্রিম পুকুর নির্মাণ করে বর-কনেকে স্নান করানো হত এবং তারপরে হোমাগ্নি সাক্ষী করে নেবার জন্য কুশণ্ডিকা বা যজ্ঞক্রিয়াসাধন করা হত—

"কৃত্রিম পুকুরি করি আনি কন্যা বরে।
স্নান করাইল সভে গৌরী মহেশ্বরে॥
কুশণ্ডিকা ক্রিয়া সাঙ্গ কৈল সপ্ত ঋষি॥" (ঐ / ১৩৬)

বিবাহান্তে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়-পরিজনদের পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হত। সকলেই নবদম্পতিকে নানা যৌতুক প্রদান করে আশীর্বাদ করত। তারপর কনের মাতা লোকাচার মত রন্ধন করে নব জামাতাকে আহার

করাত। সেদিন রাত্রে দম্পতির বাসরযাপন করা হয়। কনের মাতা নানা উপদেশ দিয়ে কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করে। পতিগৃহে নব দম্পতির প্রথম অনুষ্ঠান হল ফুলশয্যা, সেই রাত্রেই ফুলশয্যায় নববধূ এবং বরের মধ্যে কিছু প্রহেলিকার উত্তর প্রত্যুত্তর হত। এর মধ্যে দিয়ে নব দম্পতির সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে যেত। পরদিন প্রাতে এয়োগণ নবদম্পতির নিকট থেকে শয্যা তোলা বাবদ নানান উপহার আদায় করত—

"পুষ্পশয্যা হইল বাসি　　কে আছে তোমার দাসী
বাসি শেজি তোলে বিনা দানে।
এক এক পাট শাড়ি　　পঞ্চাশ কাহন কড়ি
যদি দিতে পার প্রতি জনে॥" (ঐ / ১৪৯)

বাঙালীর বিবাহে নানা সংস্কার পালন করা হত , যেমন–বিধবা, অপুত্রক, অলক্ষ্মীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া নিষেধ ছিল। তাই মেনকা জলসইবার সময় পাপ অলক্ষ্মীকে সঙ্গে যেতে নিষেধ করে—

"অরুন্ধতী বলে তুমি অপসর দূরে।
তোমার আসিতে বিধি নহে দেবপুরে॥
. . .　. . .　. . .　. . .
দূরে হইতে দেখ যদি থাকে অভিলাষ।" (ঐ / ১২৯-১৩০)

মানব জীবনে মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু কিছু আচার পালিত হত তবে শিবায়নে মৃত্যু সম্পর্কিত কোন আচারের বর্ণনা নেই। সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে সহমরণের দাপট যে খুব সাধারণ জনসমাজে ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে। শিবায়নে সহমরণের কথা পাওয়া যায় 'রতি-বিলাপ' অংশে। সহমরণে গমনের সময় সদ্য বিধবা স্ত্রী আমের ডাল হাতে মৃত স্বামীর শিয়রে বসত, তাকে সিন্দুর, চন্দন, কাজল দিয়ে সাজানো হত এবং নানা রকম মিষ্টান্ন, পান ও কর্পূর খাওয়ানো হত। উপস্থিত সকলে জয়-জোকার, শঙ্খধ্বনি করে সতীর আশীর্বাদ কামনা করত। তাই কবি বলেন—

"প্রবেশিব পাবকে প্রভুর পদলোভে।
কুণ্ড জ্বাল কুণ্ড জ্বাল হরি বল সবে॥
আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বৈসে সতী।
. . .　. . .　. . .　. . .
মাল্য মলয়জ দিয়া মুখে দেই মিঠা।
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খণ্ড পিঠা॥
সিন্দূর কজ্জ্বল দিয়া বসন ভূষণ।
কতজনে করে পাখা চামর ব্যজন॥
কত নারী গলে ধরি মরি মরি বল্যা।
কর্পূর তাম্বুল তার মুখে দিল তুল্যা॥
বাদ্য গীত হুলাহুলি দিয়া জয় জয়।
নতি হইয়া সতীর আশিস্ সবে লয়॥
স্নান দান তর্পণ করিয়া গঙ্গা জলে।
চিকুরে চিরুণী সব সিন্দূর কপালে॥ (রামেশ্বর/৬১-৬২)

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি ভাব-কেন্দ্রিক উপকরণগুলি অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতির কথায়।

শিবঠাকুর শিবায়নে কৃষিজীবী সমাজের দেবতা, সুতরাং শিবায়ন কাব্য গড়ে উঠেছে নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী সমাজকে আশ্রয় করে। ফলে শিবঠাকুর, গৌরীঠাকুরানী, ভৃত্য ভীম, কার্তিক, গণেশ প্রত্যেকেই সাধারণ জনসমাজের মানুষ ; তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা খুব একটা ছিল না। শিবায়নে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ও সেভাবে অনুপস্থিত। তবে বিবাহ বা পালাপার্বণে, মণ্ডপসজ্জা, পালঙ্ক সজ্জায় রুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় আছে। শঙ্খের কারুকার্য, কাঁচুলি চিত্রনে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের পরিচয় আছে। বাঙালী সংস্কৃতির একটি বড় দিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ; শিবায়নে শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা আছে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে হিমালয় গৃহে দুর্গোৎসবের সুন্দর বিবরণ আছে। যেমন কবির বিবরণ অনুসারে—

"শরতে শারদা পূজা সবাকার ঘরে।
নৃত্য গীত আনন্দিত সকল নগরে॥" (ঐ/ ৩০০)

বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মঙ্গলগীত গাওয়া হত, এগুলি অবশ্যই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির বিষয়।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিবায়নের একটি অন্যতম বিষয় প্রবাদ-প্রচনের ব্যবহার। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে পড়ে ছড়া, পাঁচালী, ধাঁধাঁ প্রবাদ-প্রবচন। শিবায়নে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার দেখতে পাই। কবি সমাজ অভিজ্ঞতারভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার করেছেন কাব্যে। যেমন, রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদসমূহ—

১। স্ত্রী জাতি যত দেখ ঐশ্বর্য্যের বশ।
২। পোড়া ঘায়ে পড়ে যেন লবণের ছিটা।
৩। গন্ধবাস নাহি পায় শিমুলের ফুলে।
৪। সাগর শুখাল্য মা গ কপালের দোষে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদসমূহ—

১। পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে।
২। দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাহি আর।
৩। বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী।
৪। পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
৫। নামের নিমিত্ত লোকে নানা কর্ম্ম করে।
৬। হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।

প্রবাদগুলির মধ্যে দিয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ন্যায়-নৈতিকতা, সমাজ, অর্থনীতি ও মানব চরিত্র সম্পর্কে জানা যায়। প্রবাদ-প্রবচন ছাড়াও প্রচুর বিশিষ্ট বাক্‌রীতির ব্যবহার দেখা যায় এখানে। শিবায়ন কাব্যে প্রচুর ধাঁধাঁর ব্যবহার আছে, যেগুলি বিবাহ সভায়, বাসরযাপনে বা ফুলশয্যার সময় বর নব বধূকে জিজ্ঞাসা করত। এর মধ্যে বাঙালীর জীবন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ আছে, যা বাইরের রূপগতভাবে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হলেও আভ্যন্তরীণ গঠনে পরিবর্তন হয়নি। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন কাব্যে হরগৌরীর বিবাহকালে ঋষি পত্নীগণ বাসরঘরে শিবকে কয়েকটি ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা করেছে। ধাঁধাঁটি হল——

"যোগী নহে জটা ধরে তোমার লক্ষণ।
গঙ্গা নহে জল বহে এ তিন লোচন॥
নারী সম্বোধন মাত্র নহে স্ত্রী জাতি।
শস্য উপজে তাহে নহে সেই ক্ষিতি॥

হর, বুঝ প্রহেলিকা হর বুঝ প্রহেলিকা।
জিজ্ঞাসে তোমারে একপাটলা বালিকা॥" (রামকৃষ্ণ /১৪৬-১৪৭)

এর সমাধান 'নারিকেল'। লক্ষণীয় বিষয় শিবঠাকুর এই ধাঁধাঁগুলির উত্তর সরাসরি না দিয়ে প্রহেলিকার মধ্যে দিয়েই দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এর মধ্যে দিয়ে চরিত্রের বৈদগ্ধ ও রসবোধের পরিচয় প্রকাশিত। যেমন প্রত্যুত্তরে কথিত ধাঁধাঁটি হল ——

"শুন একপাটলা তোমার প্রহেলিকা।
নাম কহিআ দিলে দিবে কুমুদকলিকা॥
যেই অস্ত্র করে ধরে রেবতীর কান্ত।
তৃতীয় অক্ষরে তার কর ইকারান্ত।
সেই ত বৃক্ষের ফল শুন গ সুন্দরী।
শুনি কহি ইবে একপর্ণার হেয়ালি॥" (ঐ/১৪৮)

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপদানগুলির কথা শিবায়ন কাব্যে কিছু পাওয়া যায়। বাঙালী ঘরের বালিকারা বাল্যকালে অন্য ক্রীড়া অপেক্ষা পুতুলবিয়ে খেলত। এর মধ্যে দিয়ে বাল্যকাল থেকেই তাদের মনে ঘরকন্না, স্বামী ও সংসার সম্পর্কে ধারণা জন্মাত।গৌরীর বাল্যক্রীড়া বর্ণনা করতে গিয়ে রামেশ্বর সেকালের কতকগুলি লোকক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন। ক্রীড়ার বর্ণনা এরকম–

"খেলে লুকলুকানি (ক) আপনি হয়্যা বুড়ি।
একচোরে সভাকারে করে তড়াতাড়ি॥
. . . .
খেলে দশ পঁচিশ ছ কড়া লয়্যা কড়ি।
দাম ধর্ম্ম ফেলে দান ফেলে বুড়ি বুড়ি॥
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে।
বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিয়া হরে॥
মিছা মুঠা কর‍্যা কার গুণাগার কর‍্যা।
করে কর ধর‍্যা কিল মারে শ্বাস ধর‍্যা॥
দুই চাইর সখীসহ হয়্যা সমবায়।
খেল্যা ফুল ঘুসিংহ পুখুর দিল তায়॥
আঁটুল বাটুল খেলে পসারিয়া পা।
আর কত লীলা খেলা কত কব তা॥" (রামেশ্বর/৫৩-৫৪)

পাশা খেলার কথা শিবায়নে পাওয়া যায়। শরীরচর্চা করার প্রবণতা বোধহয় মধ্যযুগীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না, কাব্যে তার ব্যবহারও নেই। যুগগত অস্থিরতা এবং দৈন্যতার মধ্যে সাধারণ জনজীবনে শরীরচর্চা করা খুব একটা সম্ভব ছিল না বলেই মনে হয়।

সমাজিক অবস্থা ঃ রামকৃষ্ণ রায় রামেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রায় এক'শ বছর পূর্বে কাব্য রচনা করেছিলেন সুতরাং রামকৃষ্ণ রায়ের কাল ছিল মঙ্গলকাব্য রচনার ঐশ্বর্য যুগ। এই যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব সমাজ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। চৈতন্যদেবের ভাব ও প্রেমসাধনার বন্যা বাংলার আকাশ বাতাসকে একদা প্লাবিত করেছিল তার প্রভাব অনেকাংশে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছিল, ফলে সমাজে নৈতিক পরিশুদ্ধতা ও দৃঢ়তা বজায় ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর তাঁর সমুন্নত আদর্শ সমাজ থেকে যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই সমাজ চরিত্রে

নৈতিক শিথিলতা প্রকাশিত হতে লাগল। রামকৃষ্ণের কাব্য রচনার এক'শ বছরের ব্যবধানে সমাজ চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, ফলে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে সমাজের নীতিভ্রষ্ট কদর্য রুচি বড় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে আরো পরিবর্তিত হয়ে ভারতচন্দ্রের যুগে এসে পৌঁছায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যেও ভ্রষ্ট সমাজ চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ যুগ পরিবেশেই রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্য রচিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রায়ের কিছু পূর্বে মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেছিলেন ; মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে যে সমুন্নত মহিমা, আদর্শ ও রুচিবোধের প্রকাশ আছে রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যও ঐরকম একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগেই রচিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রায় তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; যুগরুচি বা যুগগত প্রভাব তাঁর কাব্যদেহকে তাই স্পর্শ করতে পারেনি। রামকৃষ্ণ রায় প্রধানত বিভিন্ন পুরাণের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়কে সংযোজিত করে শিবায়ন কাব্য রচনা করেছিলেন, সেখানে তিনি শিব সম্পর্কিত লৌকিক কাহিনীকে গুরুত্ব দেননি। বস্তুতপক্ষে চৈতন্য প্রভাবিত সমাজের আদর্শে পৌরাণিক মূল্যবোধের স্বপ্নে তিনি শিব চরিত্রকে গড়ে তুলেছিলেন, ফলে তাঁর শিব চরিত্রটি যথার্থ মানব চরিত্র হয়ে যুগ প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "রামকৃষ্ণ শিব-সম্পর্কিত সর্বাধিক জনপ্রিয় ও লৌকিক প্রসঙ্গ তাঁহার কাব্য হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে ব্যক্তিগত জ্ঞানলব্ধ ও রুচিসম্মত বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াই কাব্য রচনা করিয়াছেন।"[১৩] একারণে রামকৃষ্ণের শিবায়নে যুগচিত্র ও সমাজ ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ চিত্রগুলি ফুটে উঠতে পারেনি। মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে সমুন্নত আদর্শ অবলম্বন করলেও যুগগত প্রবণতাগুলিকে অস্বীকার করতে পারেননি। রামকৃষ্ণ রায় যুগ সত্যকে অনেকটা অস্বীকার করে আপন আদর্শগত সত্যকে মূল্য দিয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, কবি রামকৃষ্ণ কিন্তু পৌরাণিক ভাবাদর্শের প্রচার করতে চাইলেও লৌকিক জীবনকে পরিহার করতে পারেননি। শিবের বিবাহ, হরগৌরীর কোন্দল অংশে লৌকিক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে অপূর্ব জীবন বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর অপরদিকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য যুগরুচি ও রসবোধকে আশ্রয় করে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের শিবঠাকুর শিথিল চরিত্র নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ সমাজপতি। বস্তুতপক্ষে শিবায়নের শিবঠাকুর কৃষিজীবী সমাজের দেবতা। চণ্ডীমঙ্গলের ভিখারী শিবের সূত্রটি বহন করে শিবায়নে প্রথমে শিবঠাকুরের ভিখারী রূপের পরিচয় পাই কিন্তু পরবর্তীকালে সে কৃষিকর্মে নিযুক্ত হয়েছে। আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৃত্তি ও জীবিকা পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে চার বর্ণের পাশাপাশি বৃত্তিভিত্তিক ভাবে গড়ে ওঠা জীবিকার চিত্র পাই। শিবায়নে চার বর্ণের প্রাধান্য নেই। বৃত্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জনজীবনের কথাও নেই। অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের লক্ষে শিবঠাকুর কখনো কৃষিকার্য গ্রহণ করেছে আবার কখনো সে শাঁখারী হয়ে শাঁখা বিক্রি করেছে। অর্থাৎ লৌকিক কাহিনী আশ্রিত শিব কাহিনীতে মানুষের মিশ্র বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মা তো এখানে দেবশিল্পী নয়, সে কখনো কর্মকার হয়ে ত্রিশূল ভেঙ্গে লাঙলের ফাল, দা, কোদাল তৈরী করেছে আবার কখনো ছুতোরের বৃত্তি গ্রহণ করে কাঠ কেটে লাঙল, জোয়াল তৈরী করেছে, আবার কখনো বা শঙ্খ কেটে শাঁখা তৈরী করেছে। বস্তুতপক্ষে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছত্রিশ জাতির পরিচয় এখানে নেই। অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই ভেদাভেদ লোপ করে জীবিকার প্রয়োজনকে বড় করে দেখেছিল। তবে এর পাশাপাশি কামার, কুমার, ছুতোর, তাম্বুলী, শাঁখারী, চাষা ইত্যাদি বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের তথাকথিত বৃত্তিজীবীতার অবসান হতে চলেছিল, তাইতো শিবঠাকুর বলেছিল—

> "মাগে হর তেপান্তর কোচ পাশে পাড়া
> দেববৃত্তি গোবৃত্তি বিপ্রের বৃত্তি ছাড়া॥" (ঐ/২২৩)

এই সময়কালে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। শিবায়নে তার সম্পূর্ণ

পরিচয় নেই বরঞ্চ এখানে একই শিবঠাকুর কখনো ভিখারী, কখনো কৃষক, আবার কখনো বা বণিক।

শিবায়ন কাব্যে মঙ্গলকাব্যের ধারাটিকে বজায় রেখে নারীর অবস্থান ও ক্রমবিবর্তনের কথা পাই। শিবায়ন কাব্যে বর্ণিত সমাজ পিতৃতান্ত্রিক অর্থাৎ পুরুষশাসিত। নারীর অবস্থান এখানে সঙ্কুচিত। ধর্মমঙ্গলে যে সমস্ত নারীদের পাওয়া যায় তারা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কিন্তু সমাজের নারী সম্পর্কিত প্রবণতাটি ছিল স্বতন্ত্র, সেখানে নারীকে সমাজ নানা বাঁধনে আবদ্ধ করে রাখার জন্য নানা বিধিনিষেধের গণ্ডীতে বাঁধত। সমাজে নারীর সতীত্বের মূল্য ছিল যথেষ্ট। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার মুখে কিংবা ঘনরামের কাব্যে লাউসেনের মুখে নারী সম্পর্কিত ভাবনার প্রতিধ্বনি পাই রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন সমাজের নারী সম্পর্কিত বিশ্বাস ও ধারণা শিবায়ন কাব্যে পাওয়া যাই। যেমন—

"স্বামী বিনে রমণীর আর নাহি গতি।
যে করে পতির ভক্তি সেই ভাগ্যবতী॥
... ...
বৃদ্ধ বা দরিদ্র জড় যদি হয় পতি।
কন্দর্প সমান দেখে সেই নারী সতী॥
কোপদৃষ্টে স্বামী যদি চাহে মনোদুঃখে।
পতিব্রতা পতিরে সম্ভাষে হাস্যমুখে॥" (রামকৃষ্ণ/১৪৩)

বাঙালী সমাজের নারী ছিল পুরুষের উপর নির্ভরশীল, একারণে স্বামী বিনে নারীর গতি ছিল না। বস্তুত, নারী কার্যে দাসী, ভোজনে ও স্নেহে মাতা, শয়নে বেশ্যা এই ধারণা মধ্যযুগীয় মানসিকতায় নারী সম্পর্কিত প্রকৃত অবস্থান। রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন-

"সকল প্রকারে তুমি জানাইবে শীল।
স্বামী ছাড়ি কোথাও না যাবে এক তিল॥
কার্য্যকালে দাসীর সমান পতিব্রতা।
ভোজন সমএ স্নেহ করে যেন মাতা॥
শয়নে বেশ্যার ভাব বিপত্ত্যে মন্ত্রিণী।
সুস্ত্রীর লক্ষণ এই শুন গো ভবানী॥" (ঐ)

মধ্যযুগীয় সাধারণ বাঙালী নারী ছিল অশিক্ষিত। চণ্ডীমঙ্গলে এবং ধর্মমঙ্গলে কয়েক জন সামান্য শিক্ষিতা নারীর সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু শিবায়নের নারীগণ অশিক্ষিত বলেই বোধ হয়। বস্তুতপক্ষে এযুগে নারীর শিক্ষা ছিল নিষ্প্রয়োজন, তাই কোথাও বাল্যকালে নারীর শিক্ষার কথা বলা হয়নি। হরগৌরীর সংসারযাত্রা অংশে আমরা যে নারীকে পাই কিংবা রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গঙ্গা-দুর্গার কলহ অংশগুলিতে নারীর কলহপরায়ণতা এবং যে রুচির প্রকাশ পাই তাতে তাদের শিক্ষিত বলে মনে করাও কষ্টকর। বস্তুতপক্ষে নারী এই স্বাভাবিক জীবনকেই গ্রহণ করেছিল। মনসা বা চণ্ডী, কানড়া বা কলিঙ্গার মত নারীকে আমরা এখানে পাই না। তবে লক্ষণীয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসারিক অমঙ্গল-অবনতির জন্য নারীকে দোষারোপ করে তৃপ্ত হত। তাই কবি বলেছেন—

"গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেল্যা দিয়্যা পুরুষ পাসরে সে কি জানে॥
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ কর‍্যা উথলয়ে গারি॥
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মায়্যা।

শতকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়্যায়া॥" (রামেশ্বর/২১৫)

মনসা যেখানে কঠোর সংগ্রামে নেমেছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, চণ্ডী সহজেই সেই প্রতিষ্ঠা আদায় করেছিল, শিবায়নে এসে গৌরী কিন্তু শিবের অকর্মণ্যতা ও ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। গৌরীর কঠোর নির্দেশ, হয় চাষ চষ, নয় পরিবার পরিজন পরিত্যাগ কর—

"চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন॥" (ঐ/২১৬)

বস্তুত শিবায়নে অলস অকর্মণ্য, সৃষ্টিছাড়া ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক শিবঠাকুর আপন ঐশ্বর্যকে হারালেও হৃত ঐশ্বর্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল। সেকালে কৃষিকাজ ব্রাহ্মণ সমাজ ভাল চোখে দেখেনি। চিরকালীন বৃত্তি পরিত্যাগ করে নতুন বৃত্তি গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের মনে হয়েছে—

"কাদা পানি খায়্যা ক্ষেতে কর‍্যা চাষিপনা।
নরোত্তম ছাড়্যা নরাধম উপাসনা॥" (ঐ/২১৭)

'দেবতার পোত বৃত্তি বড়ই লঘুতা' মনে হলেও মঙ্গলময়ী নারীর কঠোর নির্দেশে শিবঠাকুর বাধ্য হয়েছিল ত্রিশূল ভেঙ্গে চাষবাস আরম্ভ করতে। মনে হয় পতিব্রতার মাহাত্ম্য ঘোষিত হলেও নারী পতিদেবতার বাক্যকে বেদবাক্য বলে মনে করেনি। মনে হয় শিবের ত্রিশূল ভেঙ্গে চাষবাস আরম্ভ নারী কর্তৃত্বের খানিকটা প্রতিষ্ঠা। তাই ক্ষিপ্ত দেবাদিদেব ক্ষুণ্ণস্বরে বলে ফেলে—

"শূলভঙ্গ শুনিয়া শিবের হৈল কোপ।
ফাল কর আপনার চক্র কর‍্যা লোপ॥
গায় হাত দিয়ে কথা কও নাই বটে।
শূলপাণি লোপ হেতু লাগিয়াছ হটে॥ (ঐ/২১৯)

তাই শূলের মাহাত্ম্য যতই ঘোষিত হোক নারী পুরুষকে দিয়ে আপন ভাত-কাপড়ের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে, তাই গৌরীর নির্দেশে শিবের চাষবাস। শুধুমাত্র পুরুষ বা নারীর দ্বারা সংসারের সকল মঙ্গল সম্ভব নয়, তাই নারী পুরুষ মিলে যৌথ প্রচেষ্টায় শিবের বলদ আর গৌরীর বাঘ দু'য়ে মিলে জমি কর্ষণের সূত্রপাত। বিপথগামী পুরুষকে ঘরে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় গৌরীর বাগদী নারীর বেশ ধারণ এবং নিজ দাবী আদায়ের প্রচেষ্টায় 'শঙ্খপরা' পালার আয়োজন। ঘরের নারীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শিবঠাকুরকে কৃষিকার্যের পাশাপাশি ব্যবসায়বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।

সে সময়ের বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। কন্যা রজঃস্বলা হবার আগেই পাত্রস্থ করতে হত। কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কৌলীন্য বজায় রাখার জন্য বালিকার বিবাহ দিতে হত, ফলে বালিকা কন্যার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তার অবধি থাকত না। শিবায়নে বালিকা বধূর করুণ কাহিনী কবি চিত্রিত করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলার সরল জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে এর মধ্যে দিয়ে। অসহায় বালিকা বধূর দায়িত্ব জামাতার হাতে দিয়ে শাশুড়ী জামাতার হাত নিজের মাথায় দিয়ে দিব্য করাচ্ছে, জামাতা যেন কন্যার সকল দোষ ক্ষমা করে মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে—

"কান্দিয়া কন্যার মাতা কৈল সমর্পণ॥
জামাতার হস্ত তুলিয়া নিল নিজ মাথে।
শাশুড়ীর কথা হৈল জামাতার সাথে॥
কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি॥

আঁঠু ঢ্যাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর‍্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ॥" (ঐ/৫২)

বস্তুতপক্ষে কৌলীন্য প্রথাশাসিত সমাজে কন্যার অবস্থার কথা জেনে ভীতা মা মেনকা জামাতাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়েছে। মেনকা সমাজে নারীর অবস্থানগত সত্যকে জানে বলেই কন্যার জন্য বিলাসিতা চায়নি, শুধু মোটা ভাত কাপড়ের প্রত্যাশাই করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যুবতী নারীর পক্ষে পথঘাট তো নয়ই নিজ গৃহও সর্বদা নিরাপদ ছিলনা। মানুষ কু-লোকের কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও বালিকা কন্যাকেই বিবাহ দিতে বাধ্য হত। অতিথি, ভিখারী, ফকিরের দৃষ্টিপথ থেকেও ঘরের যুবতী কন্যাকে আড়ালে রাখতে হত। তাইতো গৌরীর জননী বলেছে—

"ভালই আছিলুঁ উমা যখন ছাওয়াল।
যৌবন শরীর রূপ মোরে হৈল কাল॥
কত দিনে বিভা হইবেক মোর মাথা খাইয়া।
অতিথ দেখিলে কত রাখিব লুকাইয়া॥" (রামকৃষ্ণ/১০১)

কৌলীন্য প্রথা ও সামাজিক অবস্থানগত কারণে কন্যার পিতা বৃদ্ধ, পঙ্গু, কানা, খোঁড়া যে কোন রকম কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিত। তাই নারীর পতিনিন্দা অংশে নারীগণ নিজ নিজ স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে স্বীয় স্বামীর নিন্দা করেছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে 'শাশুড়ীদের জামাই নিন্দা' একটি বিশেষ অংশ। কন্যার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শাশুড়ীরা জামাতা নিন্দা করেছে—

"খোঁড়া বরে খুজ্যা দিনু খুদি হেন ঝি॥
সোনস্যা সুন্দরী নারী তাকে নাকি সাজে।
পাদ কুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে॥
... ...
মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সাধ্যা আন্যা বেতী দিল বাপ॥" (রামেশ্বর/৮৯-৯০)

এই অংশগুলিও নারী প্রগতির এক ধাপ বলে ভাবা যায়। যুবতী নারীদের পাশাপাশি বয়স্কা নারীগণও এই অংশগুলির মধ্যে দিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করেছে।

বাঙালী নারীর জীবন ছিল এক ছকে বাঁধা। শিক্ষাদীক্ষাহীন, ব্যক্তিচেতনাহীন নারীকে বাল্যকাল থেকেই গড়ে তোলা হত গড়পরতা মানসিকতা দিয়ে, তাই বাল্যে বালিকার মনে ঘর-সংসার, পুত্র-কন্যা, নির্ভরতা ইত্যাদি প্রচলিত ধারণাগুলি গড়ে উঠত। তাইতো বালিকার ক্রীড়া রান্নাবাড়ি, ঘর সাজানো, পুতুলবিয়ে ইত্যাদি। লক্ষণীয় বিষয় শিবায়নে নারী পুরুষশাসিত সমাজের এই মানসিকতার প্রতিবাদ করেছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তাই বৃদ্ধ জামাতা দেখে মেনকা হিমালয়কে তিরস্কার করেছে মাত্র, কিন্তু রামেশ্বরের শিবায়নে মেনকা জানিয়েছে কন্যা তার কাছে দায় নয়, তাই বৃদ্ধ বরে সে কন্যা সমর্পন করতে চায় না। বরং নারী বৃদ্ধ বরকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছে। সে বলেছে—

"বিহার দায় নাই দায় নাই।
মৈনাক মোর বাপ হ বল গিয়া তোরা গো
কন্যার মায়ের মনে বর ভায় নাই॥

ভাতার চক্ষের মাথা খায়্যা বর আন্যাছেন দিবেন মায়্যা।

ছি ছি ছি ছি কি বলিব তারে।

খেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্কা মার‍্যা বাহির কর

আইবড় মোর ঝি থাকুক মোর ঘরে॥ (ঐ/৮২)

এর মধ্যে দিয়ে যুগাচারের মধ্যেও নারীর যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে।

শিবায়ন কাব্যেও বাঙালীর পারিবারিক গঠনচিত্র পাওয়া যায়, সেখানে সকলকে নিয়ে সুন্দর পরিবার জীবন নির্বাহ হত, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে পরিবার জীবন গড়ে উঠত। গৌরীর গৃহস্থালী চিত্র বর্ণনায়, শিবের ভোজন অংশে সুন্দর গৃহস্থালী চিত্র আছে। গৌরী সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী, অভাব অনটনের মধ্যেও সে নিপুণভাবে সংসার পরিচালনা করে। শিব সংসার উদাসীন, তার জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তি। আয় সামান্য হলেও সে ভোজনপরায়ণ। গৌরীঠাকুরানী অভাবের সংসারে প্রত্যহ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের বন্দোবস্ত করে, পরিপাটি রূপে স্বামী-পুত্রকে খাওয়ায়। শিবের সংসারে ভোক্তা কম নয়, স্বামী-স্ত্রী, দুটি পুত্র, ভৃত্য ভীম, তিন দাসী— জয়া, বিজয়া ও পদ্মা, আট জনের সংসার ভিক্ষান্নে চলে না। তাই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে কলহও হয়। ধার করজ করেও আর সংসার চলে না। ধনীর দুলালী দরিদ্র স্বামীর ঘরের সর্বংসহা গৃহিণী, তার বাস্তব চিত্র আছে এখানে—

"রঙ্গিনী রাজার বেটী রুখু করি স্নান।

তৈল বিনে তনু ক্ষীণ খড়ি উড়্যা যান।" (ঐ/১১১)

শুধু তাই নয়, পুত্র দুটি পথ চেয়ে থাকে। শিব ভিক্ষা থেকে ফিরে এলে দুই ভাই ঝুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ক্ষুধিত পুত্রদ্বয় পিতা আনীত খাদ্যদ্রব্য গোগ্রাসে গিলতে থাকে। দুর্গা গণেশকে ধমক দিয়ে কনিষ্ঠ কার্তিককে কিছু দিতে বললে কার্তিক-গণেশের কলহ দূর হয়— এ চিত্রগুলি আসলে মধ্যযুগীয় দরিদ্র পরিবার চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে সুস্থিত পরিবার জীবন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মা, বাঙালী পরিবারে যাবতীয় দায়ভার মাকেই বহন করতে হত। দেখা যায় পুত্রেরা বাপের কাছে বসে থাকলেও ক্ষুধা পেলে মায়ের কাছেই খেতে চায়—

"এখন বাপের কাছে বস্যা আছে পো।

ক্ষুধা হৈলে কবে মোকে খাইতে দেনা গো॥" (ঐ/১১০)

শুধু কি তাই, সর্বসংহা বাঙালী জননী পুত্র-কন্যা স্বামীর যাবতীয় উপদ্রব নিরুপদ্রবে সহ্য করে. কারণ পুত্র হতে পিতার প্রতাপ অতিশয় ছিল। মঙ্গলকাব্যে বাঙালী জননীর স্নেহপরায়ণ হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ দেখি। সে আপন সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল হয়, কখনো বালিকা কন্যাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে বিচলিত হয়, জামাতার কাছে কন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি নেয়, আবার বহুদিন পরে কন্যাকে কোলে পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আর কন্যাকে জামাতা গৃহে পাঠাবে না। কবির বর্ণনায়—

"পাঠায়্যা পরের ঘরে কান্দিয়া তোমার তরে

অভাগী মায়ের দেখ হাল।

আর না পাঠাব আমি ভাল হৈল আল্যে তুমি

মোর ঘরে থাক চিরকাল॥" (ঐ/২৯৯)

রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতেও মা মেনকার কণ্ঠে এই খেদোক্তি শোনা যায়।কিন্তু বাঙালী জননীর হৃদয় ব্যাকুলতা ভিন্ন করণীয় কিছু থাকত না। কেননা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক, তাই তাকে সবই দৈবের নির্ঘন্ট বলে মেনে

নিতে হত। তাই মা মেনকার বক্তব্য—

"ননীর পুতলী ছাল্যা জ্বলন্ত অনলে ফেল্যা
বাপ দিলে কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী মরি সকল খণ্ডাত্যে পারি
কপাল খণ্ডান নাহি যায়।" (ঐ)

সুতরাং কয়েক দিন কন্যাকে নিয়ে আনন্দে থাকলেও যথারীতি আবার থাকে পতি গৃহে পাঠাতে হত। কারণ বিশ্বাস করা হত কন্যার প্রকৃত অবস্থান পতিগৃহে—

"স্বামী ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ মাকে
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।" (ঐ/৩৪৪)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী পরিবারের ঘরজামাই রাখার প্রথা ছিল, কিন্তু এই প্রথা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কবি তাই বলেন—

"করিয়া শ্যালক সেবা শ্বশুরান্নে জীয়ে যেবা
তাহার জীবনে থাক ধিক্।" (ঐ/৯৫)

সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং একারণে সপত্নী সমস্যা একটা বড় সমস্যা ছিল। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে গঙ্গা-গৌরীর কলহ বর্ণনা অংশে তার সুন্দর পরিচয় আছে।যাই হোক না কেন, বাঙালীর এই পারিবারিক বাঁধন মধ্যযুগেই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণে। কেননা দারিদ্র্য শতেক গুণরাশি নাশ করে। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে কবি লিখেছেন—

"প্রভুর যতেক গণ নাহি পায় ভক্ষ্য।
পার্ব্বতী বলেন মোরে হইল অশক্য॥
যত জনে ঘর কেহ নহে কারো বশ।
বাঁটিতে না আঁটে গৃহিণীর অপযশ॥" (রামকৃষ্ণ/২৩৫)

পারস্পরিক প্রীতি, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার উপর যে পরিবার জীবন দাঁড়িয়েছিল মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে দারিদ্র্যের কষাঘাতে তা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

বাঙালী সমাজে নারী ছিল পর্দানসীন। উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে যে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল তা গৌরীর উক্তি থেকে জানা যায়। শিব গৌরীকে ঋণ করতে বললে গৌরী জানিয়েছে ঋণ করা নারীর কর্ম নয়, নারীর স্থান গৃহাভ্যন্তরে। ঋণী পুরুষ মহাজনের সামনে ঘরের স্ত্রীকে ঠেলে দিত, কিন্তু কুলবধূরা পর্দানসীন থাকত আর মহাজনের সঙ্গে কথা বলত ছেলে। এ প্রসঙ্গে গৌরীর উক্তি স্মরণযোগ্য—

"মন্দ যায় গোঠে মাঠে মায়্যা থাকে ঘরে।
ভাঁড়াবার দায় নাই নিত্য দায় ধরে॥
মন্দের করজ হৈলে মায়্যা দেয় ট্যালা।
কোণে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছ্যালা॥" (রামেশ্বর/২২৯)

নিম্নবর্ণের সমাজে পর্দাপ্রথার বালাই ছিল না, তারা ছিল স্বাধীন। যেখানে সেখানে তারা ইচ্ছা মত যাতায়াত করতে পারত। জীবন-জীবিকায় তারা অনেকটা স্বনির্ভর হত এবং প্রয়োজনে পুরুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়াত। ধর্মমঙ্গলে

ডোম নারীগণের মধ্যে দিয়ে এই তথ্য পাওয়া যায়। শিবায়নে বাগদিনীর রূপ ধারণ করে গৌরী বলেছে, তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে সুতরাং খাল- বিলে মাছ ধরে হাটে হাটে বিক্রি করে তার দিনাতিপাত হয়। বস্তুতপক্ষে এটি নিম্নবর্ণের সমাজের এটি একটি সত্যমূলক তথ্য।

বাঙালী নারীর মানসিক ও চারিত্রিক প্রবণতাগুলিও শিবায়ন কাব্যে উঠে এসেছে। উৎসব অনুষ্ঠানে, বিবাহে পাড়াপড়শী সকলেই অংশ গ্রহণ করত; নববর বা নববধূ দেখার জন্য বাঙালী গ্রাম্য নারীরা কিভাবে ছুটে আসত তার চিত্র ফটোগ্রাফির মত ফুটে উঠেছে। রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে গৌরীর বিবাহে বর দেখতে আসার জন্য নারীদের যে আচরণ, বোধ হয় তা বাঙালী সমাজ ব্যতীত অন্যত্র প্রত্যক্ষ নয়। যেমন,রামকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে-

"কেহ ধাইআ আইল করে ধরিআ মুকুর।
কেবল সীমন্ত মাত্র নাহিক সিন্দূর।
... ...
বালক পেলিআ ঘরে চলিল কামিনী।
ভাদ্রের সরিৎ যেন সমুদ্রগামিনী ॥" (রামকৃষ্ণ/১৩৮)

রাজনৈতিক চালচিত্র ঃ শিবায়নের আভ্যন্তরীণ গঠনে রাজনৈতিক জীবনের ছোঁয়া নেই। সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ওঠাপড়া যেভাবে সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত তার ছোঁয়া সহজে জনজীবনের গভীরে প্রভাব ফেলতে পারত না। কাহিনীগত জটিলতা মুক্ত হওয়ায় শিবায়নে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির স্পর্শ নেই। তবে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ফলশ্রুতি জনজীবনকে প্রভাবিত করত। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ শাসকের দ্বারা কর ভারে জর্জরিত হত, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হলেও কর মুক্তি ঘটত না। রামেশ্বরের কাব্যে শিবঠাকুরের কথায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ শিবায়নে অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল তার প্রারম্ভিক প্রস্তুতির কথা আছে শিবায়নে।

কৃষি ঃ অন্ত মধ্যযুগ অর্থাৎ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি। সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরী তেমন প্রচলিত হয়নি, ফলে কৃষিই ছিল একমাত্র সম্বল। বাংলাদেশের ভূমি ছিল উর্বর, ফলে স্বল্প শ্রমদানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত। রামেশ্বর ভট্টাচার্য কাব্যে শিবের চাষবাস প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ করেছেন। গৌরী ঠাকুরানী ছদ্মবেশে শিবঠাকুরের খোঁজে এসে শিবঠাকুরের ক্ষেতে ধান দেখে চমৎকৃত হয়েছে—

"যুক্তি কর‍্যা পার্ব্বতী পদ্মারে লয়ে সাথে।
অবতীর্ণ মহামায়া মহেশের ক্ষেতে॥
ধান্য দেখ্যা পুণ্যবতী ধন্য ধন্য করে।
সার্থক শিবের চাষ সাবাস শঙ্করে॥ (রামেশ্বর/২৫৬)

তুর্কী আক্রমণের প্রথম যুগেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ হিন্দুসমাজ থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে ছিল। পরবর্তীকালে আর হৃত সম্মান উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সমাজে বণিকগণ অর্থনীতির নতুন আলোকে উঠে এসেছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ ব্যবস্থাই ছিল কৃষি নির্ভর। দরিদ্র ব্রাহ্মণরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিতে পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে পড়ায় কৃষিতে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে দুর্গা বলেছে, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়েছে—

"ভিক্ষার উপরে ভর নানাজাতি পোষ্য।
বাণিজ্য নাহিক চাষে না উপজে শস্য।" (রামকৃষ্ণ/২৩৫)

কিন্তু দেব-ব্রাহ্মণের পক্ষে কৃষিবৃত্তি শোভাকর নয়, তাই কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করতে শিবের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব—

"দেবতার পোত-বৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষে দুঃখে আছি ভাল অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥" (রামেশ্বর/২১৬)

যাই হোক, গৌরীর অনুরোধে শিবঠাকুর চাষবাস করার জন্য বিশ্বকর্মার কাছ থেকে লাঙল, জোয়াল তৈরী করে নিল। বিশ্বকর্মা শিবঠাকুরের প্রতিবেশী বিশাই কামার। শিব নিজ হাতের লোহার ত্রিশূল ভেঙ্গে দা, ফাল, কোদাল তৈরী করে নিল, দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ভূমি পাট্টা নিল এবং কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান ঋণ করল, শেষে নিজের বলদ আর গৌরীর বাঘ নিয়ে, ভীম নামক মাহিন্দারকে নিয়ে মর্ত্যলোকে জমি চাষ করার জন্য যাত্রা করল-

"চলে বৃষে চন্দ্রচূড় চণ্ডী রন চায়্যা।
পাছে ভীম চলিলা চাষের সজ্জা লয়্যা॥" (ঐ/২৩৩)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষিকাজ নিন্দনীয় ছিল না, বরঞ্চ সম্মানজনক বৃত্তি বলেই গ্রাহ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণরাও চাষবাসকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী তার পরিবারের যজমানি বৃত্তির পাশাপাশি চাষবাসের কথা বলেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা চাষবাসকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

মধ্যযুগের কৃষিকাজ আদিম পদ্ধতিতে হলেও অনুন্নত ছিল না। সাধারণ কৃষকের কৃষি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। চাষীকে কৃষিকার্য ও ফসল সংগ্রহ করার জন্য অনেক সময় দূরবর্তী ক্ষেত্রে বসবাস করতে হত। ফসল সংগ্রহ করে তবেই চাষী ঘরে ফিরত, একারণে বছরের ছয়-সাত মাস তাকে গৃহছাড়া হয়ে থাকতে হত। শিবঠাকুর কৃষিকার্যের জন্য দেবলোক ছেড়ে মর্ত্যে গিয়েছিল। সেকালে চাষবাসের জন্য লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি ব্যবহার করা হত, আর চাষের কাজে বলদ গরুই ছিল চাষীদের সম্বল। জলসেচের জন্য কোন উন্নত পদ্ধতি ছিল না। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চাষবাস আরম্ভ হত। শিবের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে রামেশ্বর লিখেছেন—

"মনে জান্যা মঘবান্ মহেশের লীলা।
মহীতলে মাঘশেষে মেঘ বরষিলা॥
দিন সাত বরষিয়া দিলেক ঈশানে।
হৈল হাল-প্রবাহ শিবের শুভক্ষণে॥" (ঐ/২৩৩-২৩৪)

সাধারণত জলসেচের জন্য নিকটবর্তী নদী-নালা, খাল-বিল থেকে জল ব্যবহার করা হত, অনেক সময় বৃষ্টির জল আল বেঁধে খালে আবদ্ধ করে রেখে দেওয়া হত। কবির বিবরণ অনুসারে—

"দুদণ্ডে ছাড়িয়া হাল হাল্যা গেল ঘরে।
বান্ধ আলি বৈকালে বান্ধিল একপরে॥" (ঐ /২৩৪)

রামেশ্বর সেকালের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন—চৈত্রমাসের শেষে জমিতে লাঙল দেওয়া. মই দেওয়া ও মাটি সমান করা শেষ হত, বৈশাখ মাসে শুভদিন দেখে জমিতে বীজ বুনে দেওয়া হত। কবির বিবরণে আছে—

"চৈত্র মাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।
মাঠ কর‍্যা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ॥
উচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্রম॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার‍্যা সব ভূমি বাতে বুনে॥" (ঐ/২৩৭-২৩৮)

কৃষকরা কৃষির পাশাপাশি পশুপালনও করত, আসলে নিজের হালের গরুগুলিকে চাষীরা নিজেই প্রতিপালন

করত। তাই কবি বলেন—

"হাল ছাড়্যা হাল্যা যবে করে জলপান।
হেল্যাকে চরান শিব হয়্যা সাবধান॥" (ঐ/২৩৭)

শুধু তাই নয়, চাষীরা পশুদের যত্ন ও চিকিৎসার কাজও জানত। গাছ-গাছড়া টোট্‌কা চিকিৎসায় তারা পশুর চিকিৎসা করত। কবির অভিজ্ঞতা অনুসারে—

"দিন দশে দু হেল্যার কান্ধ গেল রস্যা।
ধুতরার রস তাতে শিব দিল ঘস্যা॥" (ঐ)

চাষবাস সম্পর্কে তারা কতটা বিজ্ঞ ছিল তা জানা যায়। চাষ সম্পর্কে কিছু কিছু সংস্কার ছিল, নিষিদ্ধ সময়ে চাষ করলে চাষীর ও ফসলের ক্ষতি হয় বলে বিশ্বাস করা হত। তাই —

"হেল্যার দেখিয়া দুঃখ হরে হল্য মো।
কালে কালে কৈল হাল কামাঞের যো॥
সেই সেই কালে যার হয় হল যোগ।
ধরা শস্য হরে ধান্যে ধরে নানা রোগ॥
বৃষ কান্দে বাসব বরিষে নাই বাড়া।
তেঞি হাভাতিয়া চাষী হয় লক্ষ্মীছাড়া। (ঐ)

এসময় হালচাষ বন্ধ থাকলেও কৃষিকার্য বন্ধ থাকে না, চাষী ক্ষেতের আগাছা পরিস্কার করে—

"হাল কামাঞের দিন হর দেন বল্যা।
গাছি মার্য্যা হরা গাছি পাড়ে রাখে তুল্যা॥" (ঐ)

চাষবাস সম্পর্কে তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ আছে এই অংশগুলিতে। বৃষ্টিতে যাতে ফসল নষ্ট না করে তার জন্য উত্তর দিকে উঁচু করে এবং দক্ষিণ দিকে নীচু করে জল গড়িয়ে যাবার নালা রাখা হত। যেমন—"দক্ষিণে মোহনা রাখে জল যাত্যে নালা।" (ঐ/২৩৪)। আর মাঠে সোনার ফসল ফললে, চাষী ফসলের মোহে ঘর-সংসার ভুলে যেত—

"হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম॥
হাপুতের পূত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখা রহিল পাসর্য্যা পরিজন॥" (ঐ/২৩৮)

সোনার ফসল ঘরে তুললেও কিন্তু চাষীর অন্তরে খুব একটা সুখ থাকত না, কারণ চাষের যাবতীয় খরচ তার ঋণে; কারো জমি, কারো বীজধান, লাঙল-জোয়াল ধার নিয়ে চাষী চাষ করত। শিবঠাকুর বিশাই কামারকে দিয়ে বিনা বেতনে লাঙল-জোয়াল তৈরী করিয়েছে, ইন্দ্রের কাছে জমির পাট্টা নিয়েছে। ইন্দ্র চাষের অর্থ জোগাতে চাইলেও শিবঠাকুর নেয়নি, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে জমিদার-মহজনকে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না।কবির বিবরণ অনুসারে জানা যায় কৃষকরা ক্রমাগত জমিদার ও মহাজনের দ্বারা শোষিত হত। ইন্দ্র শিবঠাকুরকে জমি দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু—

শিব বলে শক্র কিছু চক্র বক্র আছে।
ক্ষেতে খন্দ দেখ্যা তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে॥
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাটুকি হল্যা পর কাল শুদ্ধ হয়॥" (ঐ/২২৩)

যেহেতু শিব ব্রাহ্মণ তাই দেবরাজের কাছে সে জমি দেবোত্তর হিসেবে পাট্টা করে নিয়েছে। সেকালে ব্রাহ্মণরা দেবোত্তর পাট্টায় নিষ্কর জমি পেত। শিবঠাকুর দেবরাজের কাছে নিষ্কর পাট্টা নিয়েছিল—

"মসীপত্র হাতে লয়্যা কশ্যপের বেটা।
লেখ্যা দিল দেবদেবে দেবোত্তর পাটা॥
বিশ্বনাথ বলে বাপু এই কালে কই।
দেখ আমি দুঃখী চাষী ডাট ডোট নাই॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হবে সাবধান।
অঙ্গীকার কৈল ইন্দ্র তবে নিল দান॥" (ঐ/২২৪)

চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত। উৎপাদিত ধান বীজের জন্য অর্ধেক রেখে বাকী অর্ধেক খাবার জন্য ব্যবহার করত।কবি এসম্পর্কে লিখেছেন—

"অর্দ্ধ ভাগ বীজ রাখ বুনিবার তরে।
পূড়া ভাঙ্গ্যা ফেল্যা রাখ পড়্যা থাক ঘরে॥
চাকরের চারা নাই যে করেন নাথ।
রামেশ্বর বলে হর খাওয়াইবে ভাত॥" (ঐ/২৩৫)

চাষের সময় চাষীকে কোন রকমে শাক পাতা খেয়ে ফসল ফলাতে হত। তাই—

"ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড়্যা।
কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা॥" (ঐ/২৩৮)

কিন্তু ফসল ঘরে উঠলেও চাষীর সুখের দিন আসত না, কারণ জমিদার-মহাজন সকলের লোলুপ দৃষ্টি পড়ত ঐ ফসলের উপর। তাই শিবঠাকুর পার্বতীকে তার সমাজ অভিজ্ঞতার কথা দুঃখ করে বলেছে-

"শুনিতে সুন্দর চাষ শুনিতে সুন্দর।
সকল সম্পূর্ণ যার তার নাই ডর॥
চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব।
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব॥
অনেক যতনে ক্ষেতে শস্য উপস্থিত।
শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥
গরীবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।
বার কর্‌য়া সকল আনয়ে লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখ্যা খন্দ যদি খাত্যে নাই পায়।
কুতকাতে কায়েত কিফাত করে তায়॥" (ঐ/২১৭)

সুতরাং অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে চাষীর দুর্দশার সীমা থাকত না। রামেশ্বর ভট্টাচার্য সেকালের চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব অবস্থা বর্ণনায় প্রাবন্ধিকের মত যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

বাণিজ্য ঃ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত বাণিজ্য প্রসারলাভ করেনি। এই শতকের বাঙালী সুদূর অতীতের চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছিল। বাণিজ্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা সাধারণ জনসমাজে ছিল না। এসময়ে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না, কেননা মানুষের হাতে এখনকার মত রৌপ্যচক্রের আমদানী হয়নি। বাণিজ্যকে লোকে হীন চোখে দেখত। তবে বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির খবর জনসমাজে প্রবাদের মত ছড়িয়ে ছিল, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি সাধারণ মানুষের হাতে

একেবারেই ছিল না। তাছাড়া ব্যবসা অর্থেই প্রবঞ্চনা বোঝাত, তাই ধর্মপরায়ণ সাধারণ মানুষের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণীয় ছিল না । তাই গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের কথা বললেও তার পুঁজির অভাব। তাই শিবঠাকুরের উক্তি—

"চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥
বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়।
বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমার নয়॥
পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সেত নাই কিসে সুপ্রতুল॥" (ঐ/২১৭)

কিন্তু আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে কামার, কুমার, ছুতোর, নাপিত, রজক, মোদক, শাঁখারী ইত্যাদি বৃত্তিজীবী শ্রেণী স্বীয় বৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষি কাজের ফলে খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা ছিল না, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের আয়োজন তাতে হত, কিন্তু হাতে কাঁচা পয়সার অভাবে টাকা-পয়সার বিনিময়ে ক্রীত জিনিসপত্র যোগানো সম্ভব ছিল না। শিবের সংসারে খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই কিন্তু অর্থের অভাব, তাই গৌরীকে এক জোড়া শাঁখা কিনে দেবার সামর্থ্য তার ছিল না। শিবের উক্তিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"গৃহস্থ গরীব তার সাত গাঁঠ্যা তেনা।
সোহাগী মাগীর কানে কাটা কড়ি সোনা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
মূল খাট্যা মরে তারে মাগী মাগে শাঁখা॥
... ...
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান।
স্বতন্ত্ররা বট শঙ্খ পর নাই কেন।" (ঐ/২৮০)

সুতরাং গৌরীর শঙ্খ পরিধানের শখ মেটাবার জন্য স্বয়ং শিবঠাকুরকে শাঁখারীর ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে। সেকালে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে শাঁখারীরা শাঁখা বিক্রি করত। বৃদ্ধ বয়সে শিবকে কাঁচা পয়সার জন্য বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে–

"পসরা প্রস্তুত কৈল অনেক যতনে॥
শঙ্কর ধরিল শঙ্খ-বণিকের বেশ।
তিনকাল পূর্ণ হৈল পাক্যা আল্য কেশ॥" (ঐ/৩০৪)

আরো পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাণিজ্যের গুরুত্বের কথা পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে গৌরী শিবঠাকুরকে ভিক্ষা নয়, চাষ নয়, বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে। চাকুরী গ্রহণ তখনো প্রতিষ্ঠিত বৃত্তির মানসিকতায় আসেনি, শিবায়নে এই তথ্য পাওয়া যায়। কারণ যারা সমাজে এতদিন সেবা পেয়ে এসেছে তাদের পক্ষে পরের সেবাবৃত্তি গ্রহণীয় হয়নি। গৌরী শিবঠাকুরকে বলেছে—

"আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে।
সেব্য হয়্যা যাবে কেন সেবকের কাছে॥" (ঐ/২১৭)

কিন্তু চাকুরীকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা যে সাধারণ জনসমাজে এসেছে তা ধর্মমঙ্গল কাব্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয়, এই পর্বে ব্রাহ্মণ রাজসেবা বৃত্তি গ্রহণ করেনি। কায়স্থ বা শূদ্র বা অন্যান্য জাতির মানুষই এই বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। শিবায়নে দেখি এক শ্রেণীর মানুষ খাওয়া পরার বিনিময়ে মজুরবৃত্তি গ্রহণ করেছে. ভৃত্য ভীম

তার উদাহরণ।

শিল্প ঃ প্রতিটি মঙ্গলকাব্যেই বাংলার কুটীরশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। কাঠের কাজ, অলঙ্কার শিল্প, লোহার কাজ, সূচীশিল্প, অলঙ্করণ শিল্প ইত্যাদি কুটীরশিল্পের পরিচয় আছে শিবায়নে। কাঠ কেটে আসবাবপত্র ছাড়া, লাঙল, জোয়াল তৈরীর কথা পাই শিবায়নে। কর্মকাররা লোহা থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরী করত। বাংলার অলঙ্কার শিল্পের বৈচিত্র্যের কথা আছে মঙ্গলকাব্যের পাতায় পাতায়। সূচীশিল্প, চিত্রশিল্পে গ্রামীণ শিল্পীরা বৈদগ্ধের পরিচয় দিত। শিবায়নে আমরা শঙ্খশিল্পের কথা পাই, শিবঠাকুর নিজেই শঙ্খ কেটে শাঁখা তৈরী করেছে এবং অলঙ্করণ করেছে, স্বয়ং শাঁখা বিক্রেতা হয়ে শাঁখা বিক্রি করেছে।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। সুস্থিত প্রশাসনের অভাবে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। সাধারণ মানুষের উপর কর ভার আরোপের ফলে জনগণ কপর্দক শূন্য হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত মুষ্ঠিমেয় ধনীরা, আর জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে জনগণের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। শুধুমাত্র তাই নয়, সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনা ছিল শুধু খেয়েপরে বেঁচে থাকা, তার জন্য মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা। পেট ভরা ভাতের জন্য মানুষ অন্যের গৃহে বেগার খাটত, তবুও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পরতে পেত না। ভৃত্য ভীমের উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

"ক্ষেতে খাট্যা ক্ষুধা বড় খাব কিহে মামা।
বিশ্বনাথ বলে বাপু আজি কর ক্ষমা॥
শিববাক্য শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ গেল জ্বল্যা।
ডাক্যা বলে ডাকাত্যে মাল্যেক মোকে বল্যা॥
সর্ব্বকাল সারাদিন কর্ম্ম করি তবু।
পেট ভর্য়া ভাত মোর দিলে নাই কভু॥" (ঐ/২৩৪)

শিবায়নে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানগত দিকটিও ফুটে উঠেছে। ধনী জমিদার ও মহাজনরা সাধারণ দরিদ্র মানুষক ঋণদান করত, ফলে চাষীর উৎপাদিত ফসলের অনেকটাই চলে যেত জমিদার ও মহাজনদের ঘরে। ধনীদের ঘরে ছিল ঐশ্বর্যের যাবতীয় আয়োজন। তবে সাধারণ মানুষ অভাব অনটনের মধ্যেও উৎসব-অনুষ্ঠানে আনন্দে মত্ত হত। রামেশ্বর ধনী দরিদ্রের পার্থক্যগত দিকটি উল্লেখ করেছেন—

"ত্রিপুরে ত্রিপুরোৎসব রব সব ঠাঞি।
অভাগা বিমুখ যার পরলোক নাই॥" (ঐ/৩০১)

রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যেও তার সমকালীন মানুষের সমৃদ্ধির ছাপা আছে।

ধর্মজীবন ঃ মঙ্গলকাব্যগুলি ধর্ম প্রধান হলেও শিবায়ন কাব্যে কিন্তু শৈবধর্ম প্রচারের চেষ্টা নেই। বরঞ্চ শিবায়ন কাব্যের যুগ শৈবধর্মের পতনকাল বা ভগ্নতার যুগ। শৈবধর্মের উপরে শাক্তধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। রামকৃষ্ণ রায় তাঁর শিবায়ন কাব্যে পৌরাণিক শিব-কাহিনী সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে বৈদিক হিন্দুধর্ম ও আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে ঐ জাতীয় প্রবণতা নেই। বস্তুত রামেশ্বর নিজে শৈব বা শাক্ত নন, তাঁকে বৈষ্ণব বলেই মনে হয়। শিবের প্রতি তাঁর ভক্তির কোন প্রকাশ নেই, আসলে কাব্যে তাঁর বিশিষ্ট ধর্মমতের পরিচয় নেই। তিনি যেমন শিবঠাকুরকে স্মরণ করেছেন আবার বৈষ্ণবধর্মের কথাও বলেছেন। তিনি গণপতি, শিব বন্দনার পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা ও সর্বদেব দেবীর বন্দনা করেছেন। বাঙালীর ধর্মগত প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা খুব শক্ত, আসলে বাঙালী পঞ্চোপাসক বলেই ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোন বিশিষ্ট চিন্তা নেই। রামেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পর্কেও বোধহয় একথা বলা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মমোহ ছিল জ্বরের মত। তবে

একালে শৈবধর্ম ছাপিয়ে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য সূচিত হয়েছিল। রামেশ্বরের কাব্যে 'মহেশ্বর জ্বর' ও 'বৈষ্ণব জ্বরের' যুদ্ধে বৈষ্ণব জ্বরের প্রতিষ্ঠা একথা প্রমাণ করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য এক সমন্বয় যুগের মানুষ, তাঁর কাব্যে ধর্ম সমন্বয়ের সুউচ্চ আদর্শ প্রকাশিত। শিবায়ন ছাড়াও কবি 'সত্যপীরের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন এবং সত্যপীরের পাঁচালীতে হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম সম্মিলনের কথা আছে। কবি মুসলমান ফকিরের দেহে বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করেন। কবি লিখেছেন—

"রাম রহিম দোয় নাম ধরে একনাথ।"

কিংবা, "মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।"[১৪]

মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মকলহের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা সমন্বয়ের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। রামেশ্বরের কাব্যে সকল দেবতার প্রতি সমান শ্রদ্ধা দেখা যায়। গণেশ, শিব, চৈতন্যদেব এবং অন্য দেবতার প্রতি কবির একই মনোভাব। বরঞ্চ কোন দেবতাকে অবহেলা করে অন্য দেবতার পূজা করলে ধর্মাচরণ সার্থক হয় না— এই মনোভাবই কবির কাব্যে পরিস্ফুট। শিবমহিমা কীর্তন করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"অন্য দেবের দেব শিব জানে নাই যারা।
পণ্ডিতের পাশে কভু বৈসে নাই তারা॥
... ...
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।
গঙ্গাধরে ঘৃণা করে গুরুদ্রোহী জীব॥" (রামেশ্বর/৬৮)

রামেশ্বর তাঁর কাব্যে সর্ব দেবদেবী বন্দনার পাশাপাশি গন্ধর্ব, দৈত্য-দানো, ডাকিনী, যোগিনী সকলেরই বন্দনা করেছেন, সকলের প্রতি কবির সমান শ্রদ্ধা। ধর্ম সম্পর্কে কবির কোন অভিব্যক্তি নেই। বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবকে কবি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি কাব্যে বার বার উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"তোমার মহিমা হর মনোবাক্য অগোচর
হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে।" (ঐ/৯)

রামেশ্বর হরিনামের মহিমা ঘোষণা করে লিখেছেন—

"আর কিছু কৃষ্ণকথা কহ কৃপাময়।
অমৃতের আস্বাদনে অরুচি না হয়॥
....
কোন কার্য্যে কোন কথা কহিবার বেলা।
বিষ্ণুনাম নিতে কেহ কর‍্য নাই হেলা॥" (ঐ/১২৮-১২৯)

আবার শিবনাম ও রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে ভোলেননি—

"তার মধ্যে রামনাম সকলের সার
রামনাম পরে পর-ব্রহ্ম নাহি আর॥ (ঐ/১৩৭)

কবি নিজেকে বৈষ্ণব বলে দাবী করেছেন—

"হরিনাম শৈব শাক্ত বৈষ্ণবের পর
বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর॥ (ঐ/১২৮)

রামেশ্বরকে বৈষ্ণব বলা যায়, কিন্তু কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের দ্বারা তিনি পরিচালিত হননি। সমন্বয় যুগের মানুষ বলে সকল ধর্মের মহিমা কীর্তন করেছেন তিনি। সমকালীন সমাজে প্রচলিত শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের পাশাপাশি নানা

ধরনের বার-ব্রত পালিত হত। শাস্ত্রীয় ব্রত, লৌকিক ব্রত দু'প্রকার ধর্মাচরণের কথাই কবি বলেছেন। সমাজে এ সমস্ত বার-ব্রত বিশেষ ধর্মকর্মের অঙ্গ ছিল। পার্বতী শিবঠাকুরকে ফসল ঘরে তোলার ব্রত বা পৌষলক্ষ্মীর ব্রত করতে বলেছে—

"পৌষ মাস পায়্যা পরে পার্ব্বতী কহেন হরে।
পৌষী-কৃত্য কর পশুপতি।" (ঐ/৩৪৫)

এছাড়া মনসা, ষষ্ঠী অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর ব্রত, পূজাপাঠ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মঙ্গলগান গাওয়া লৌকিক ধর্মাচরণের অঙ্গ ছিল।

শিবায়নে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মত বাঙালীর লৌকিক জীবন, লৌকিক ইতিহাসের বিচিত্র প্রবণতার কথা আছে। বাঙালী সমাজে সন্তানের নামকরণ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যে। সাধারণত সন্তানের নামকরণ করা হত ঠাকুর দেবতার নামে; এর মধ্যে দিয়ে ধর্মভীরু, দৈববাদী বাঙালীর বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর বিবাহে মেনকার জলসওয়া নামক অনুষ্ঠানে সমাগত এয়োদের নাম আছে। যেমন—

অরুন্ধতী লোপামুদ্রা সুমিত্রা সুভদ্রা ভদ্রা
সাবিত্রী সারদা সরস্বতী।
... ...
জীবনী যৌবনী জিতা জয়ন্তী অপরাজিতা
আশা প্রেমবতী পুণ্যবতী॥" (রামকৃষ্ণ/১২৮-১২৯)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যের 'এয়োদের নাম' অংশে ঐরূপ নামকরণ আছে—

"ভদ্রকালী ভবানী ভৈরবী ভগবতী।
ভানুমতি ভাগ্যবতী ভাগিরথী রতি॥
....
কুঞ্জলতা ললিতা লক্ষ্মীর অবতার।
এয়োর প্রধান এয়ো কত শত আর।" (রামেশ্বর/৭৮-৭৯)

এই নামকরণগুলিতে বেশীর ভাগ বৈষ্ণবীয় বিভিন্ন দেবদেবী ও তাদের নামের প্রতিশব্দে কিংবা চণ্ডী, মনসা অন্যান্য দেবদেবীর নামের প্রতিশব্দে নামকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আস্থা, তাদের বিচিত্র মানসিক ক্রিয়া ও মৌল প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার কোথাও, বিশেষত রামেশ্বরের কাব্যে লৌকিক শব্দবন্ধে বা সাধারণ নামকরণও দেখা যায়, যেমন— পদী, খুদি, সোনা, রূপা, সোহাগী, সম্পদী, মণি, চাঁপা, ভগী, মাধুনী, মল্লিকা, সুশীলা ইত্যাদি। এর মধ্যে দিয়ে লোকায়ত জীবনের প্রতি আস্থা প্রকাশিত। বাঙালী সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মুখে কিংবা স্ত্রীলোকের উচ্চারণে নামগত বিকৃতি লক্ষ করা যায়, তাইতো পদ্মাবতী হয় 'পদী', ভাগিরথী হয় 'ভগী'। যেমন—

"হৈমবতী বলে হ্যাদে নারাণ্যার মা।
নারাণ্যা ব্যাটার বিভা কোথা দিলা বা॥" (রামেশ্বর/৫০)

নারায়ণ এখানে 'নারাণ্যা'তে পরিণত হয়েছে। রামেশ্বর মধ্যযুগীয় বাঙালীর উচ্চারণ প্রবণতাটিকেও তুলে ধরেছেন।

তথ্যপঞ্জী

১। সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৩৮।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮৩।

৩। ঐ, পৃঃ ১৮৯।

৪। 'ছেলে ভুলানো ছড়া', লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সংস্করণ, পৃঃ ১৫১।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৮৫।

৬। ঐ, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

৭। 'গ্রাম্যসাহিত্য', রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড পঃ বঃ সংস্করণ, পৃঃ ২০৩।

৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২১২।

৯। ঐ।

১০। শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, 'রামেশ্বরের জীবনী' ভূমিকা অংশ।

১১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২৫-২২৬।

১২। শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২০।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৪৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের শেষ কবি, সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বস্তুতপক্ষে ভারতচন্দ্রের পরে আর কোন কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেননি, অথবা আর কোন কবি মঙ্গলকাব্য রচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। যেমন করে প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় তেমনি করে মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ধারা শুকিয়ে যাওয়ার আগে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার আলোক দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনে ভারতচন্দ্র ও তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্য একটি বিশিষ্ট পর্যায়। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় অন্নদামঙ্গলের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়; মনে হয় ভারতচন্দ্রের যুগ পরিবেশের মধ্যেই অন্নদামঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল। দেবদেবী চরিত্রের রূপান্তর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নদার পূর্ণতালাভ ঘটেছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের জন্মলগ্ন থেকেই মনসা, চণ্ডী, শিব, ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পদচারণে মুখরিত ছিল বাংলা সাহিত্য। ধীরে ধীরে শিক্ষিত রুচিবান কবিদের হাতে পড়ে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেকটা পুরাণানুগ হয়ে পড়েছিল; শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে তোলার প্রয়াস থেকেই পৌরাণিক দেবদেবীরা লৌকিক দেবদেবীর স্থান দখল করে নিতে চলেছিল। আমরা বলতে পারি এই সংযোজকের কাজটি করেছিল দেবাদিদেব মহাদেব। অন্যান্য লৌকিক দেবীরা কখনো শিবের স্ত্রী, কখনো শিবের কন্যাতে পরিণত হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে পুরাণের দেবদেবীরা লৌকিক দেবতার স্থান দখল করে নিতে থাকে। পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ মঙ্গলগান রচনা করলেন। এভাবে কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এসময় রচিত। ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নদা পৌরাণিক দেবী, সে সমাজে পূর্ব প্রতিষ্ঠিতা। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে।শিব এবং অন্নপূর্ণা সমাজে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বলেই তাদের পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগে রচিত শিবায়ন এবং অন্নদামঙ্গলে তাই দেবকথা অপেক্ষা মানবকথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের আলোক পথেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গলের কবি ও কাব্য ঃ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর একটি বিশেষ সন্ধিপর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাঁর ঘটনাকীর্ণ জীবন বাংলার সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তথ্য খুব বেশী নেই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সর্বপ্রথম ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন ১২৬২বঙ্গাব্দে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে। এরপর তা "কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায়।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান জেলার ভুরসুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় জমিদার ছিলেন। ভারতচন্দ্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁদের কৌলীক পদবী মুখোপাধ্যায়, ধনাঢ্য হবার জন্য তাঁরা 'রায়' উপাধি পেয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে কবি সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যাবলী পাওয়া যায়—

"ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ

সদাভাবে হত কংস	ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত	ভারত ভারতী যুত
ফুলের মুকুটি খ্যাত	দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম	দেবানন্দপুর নাম
তাহে অধিকারী রাম	রামচন্দ্র মুনশী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়	দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপাদায়	পড়াইল পারসী।" (ভারতচন্দ্র/৩৯৬)

জনশ্রুতি অনুসারে বর্ধমানরাজের সঙ্গে নরেন্দ্রনারায়ণের বিবাদের ফলে ভুরসুট পরগণা বর্ধমানরাজের অধিকৃত হয়, ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ নিঃস্ব হয়ে যান। এই সময় ভারতচন্দ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নওয়াপাড়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং তাজপুর গ্রামে পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করে স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং বিবাহ করেন। কনিষ্ঠের বিবাহে অগ্রজেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তিরস্কার করেন, এবং শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও তাঁকে তিরস্কার করেন। ভারতচন্দ্র অভিমানবশত গৃহত্যাগ করে দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট পারশী ভাষা শিক্ষালাভ করেন, তখন থেকেই ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তির উন্মেষ। রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে ভারতচন্দ্র স্বরচিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পাঠ করেন।তখন কবির বয়স মাত্র পনের বছর। এর কিছু দিন পর ভারতচন্দ্র স্বগৃহে ফিরে যান এবং ভাইদের পরামর্শক্রমে কর সংক্রান্ত কার্যভার নিয়ে বর্ধমান গমন করেন, কিন্তু সেখানে গোলযোগ হওয়ায় ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন এবং ভাগ্যক্রমে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার পর ভারতচন্দ্র একজন ভৃত্যকে নিয়ে উড়িষ্যায় গমন করেন, সেখানে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা করে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত খানাকুলে এসে উপস্থিত হন। তখন ভারতচন্দ্র শালীপতির প্রচেষ্টায় গৃহধর্ম গ্রহণ করে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হন। পরবর্তীকালে ফরাসী গভর্ণমেন্টের দেওয়ান ফরাসডাঙার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সাহায্যক্রমে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভায় স্থানলাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র গুণের পূজারী ছিলেন, তিনি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন এবং অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার নির্দেশ দেন । এখানেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, ভবানন্দ মজুমদারের পালা বা মানসিংহ পালা এবং রসমঞ্জরী কাব্য রচনা করেন। পাণ্ডিত্য এবং কবিত্ব শক্তির গুণে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ রূপে গণ্য হন।পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে মূলাজোর পরগণা লাভ করেন এবং তথায় গৃহনির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের জননী বিশেষ উপলক্ষে মূলাজোড় পরগণা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে ইজারা নেন। ফলে ভারতচন্দ্র গৃহহীন হয়ে 'গুস্তে' নামক গ্রামে গিয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূলাজোড় তিনি পরিত্যাগ করলেন না। এই সময় বর্ধমানরাজের কর্মচারী পত্তনীদার রামদেব নাগের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে 'নাগাষ্টকম্' কাব্য রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজ নাগাষ্টক পাঠ করে সন্তুষ্ট হয়ে মূলাজোড়ে রামদেব নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করেন এবং ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় পুনরায় প্রদান করেন। এভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হবার পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮বছর বয়সে বহুমূত্র রোগে ভারতচন্দ্র ইহলীলা ত্যাগ করেন।

মধ্যযুগের কতিপয় কবির মত ভারতচন্দ্রও একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; তাঁর গ্রন্থতালিকা নিম্নরূপ ঃ ১) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা ২)অন্নদামঙ্গল ৩) রসমঞ্জরী, ৪)অথ নাগাষ্টকং ৫)চণ্ডী নাটক ৬)গঙ্গাষ্টক ৭) বিবিধ (খণ্ডকবিতা)- বসন্তবর্ণনা, বর্ষাবর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি, হাওয়া বর্ণন, বাসনা বর্ণনা, খেড়ে ও ভেড়ে, করদ্রাফ্থ বর্ণন, বৃন্দাবলীর উক্তি, বলি রাজার উক্তি, অথ পত্রং, হিন্দীভাষায় কবিতা। এগুলির মধ্যে একটি

কবিতা হিন্দীতে রচিত, তাছাড়া অথপত্রং, নাগাষ্টকং, গঙ্গাষ্টক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, 'চণ্ডীনাটক' বাংলা ও সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় রচিত।

ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবকাশ আছে, বিশেষত সত্যনারায়ণের ব্রতকথার রচনাকাল নিয়ে। কবি সত্যনারায়ণের ব্রতকথার শেষে উল্লেখ করেছেন-"ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা"। ঈশ্বর গুপ্তের গণনা অনুসারে রুদ্র- ১১, চৌ-৪, এবং গুণা-৩, হিসাবে ১১৩৪ সন স্থির হয়েছে।[১] ঈশ্বর গুপ্তের তথ্য অনুযায়ী ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জন্ম এবং পনের বছর বয়সে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন।[২] দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই গণনা নির্ভুল নয়। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ-"দেবানন্দপুরে আসিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার পূর্বেই অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথার রচনাকালে তাঁহার পারস্য ভাষা শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১১৪৩ সনে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫/৩০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে ১৮ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫-১০খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।"[৩] তাহলে কবি প্রদত্ত তথ্য 'সনে রুদ্র চৌগুণা' মোটামুটি রক্ষিত হয়।অন্নদামঙ্গলে কবি কাব্যের রচনাকাল ও সমাপ্তি কাল উল্লেখ করেছেন—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"(ঐ/৩৪৯)

অঙ্কস্য বামাগতি অনুসারে ১৬৭৪ শক অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন এবং এর পরে 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন।

অন্নদামঙ্গল প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে রচিত হলেও ভারতচন্দ্র প্রচলিত কাব্যাদর্শকে গ্রহণ করেননি। কাব্যকাহিনী রচনায় ভারতচন্দ্রের কোন আদর্শ ছিল না। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ভারতচন্দ্র লোকসমাজে প্রচলিত কাব্য কাহিনীকে গ্রহণ করেননি। আসলে অন্নদামঙ্গলে কোন পরিপূর্ণ কাহিনী নেই, বরঞ্চ বলা চলে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনীর সমাহার। গ্রন্থ রচনায় ভারতচন্দ্র বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, শাস্ত্রগ্রন্হাদির সাহায্য নিয়েছেন; সাহায্য নিয়েছেন কালিদাসের কাব্যের, তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের কোন কোন অংশের আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাছেও তিনি ঋণী। অন্নদামঙ্গলের মধ্যবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রচলিত 'চৌরপঞ্চাশিকা' নামক কাব্য এবং 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের অনুসরণে রচিত, আর কাব্যর তৃতীয় খণ্ড ভারতচন্দ্র ইতিহাসের ছায়ায় রচনা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থনায় মানুষের ইতিহাস প্রবেশ সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র যেভাবে কাব্যকাহিনী রূপায়িত করেছেন তার পরিচয় তুলে ধরা হল।অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি খণ্ড; প্রথম খণ্ডঃ অন্নপূর্ণামঙ্গল। দ্বিতীয় খণ্ডঃ বিদ্যাসুন্দর। এবং তৃতীয় খণ্ডঃ ভবানন্দ মজুমদারের পালা বা মানসিংহ পালা। অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রথম খণ্ডে আছে— দেববন্দনা, গ্রন্থসূচনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, গীতারম্ভ, সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ, সতীর দক্ষালয়গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, শিবের দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষযজ্ঞনাশ, প্রসূতিস্তবে দক্ষজীবন, পীঠমালা, শিববিবাহের মন্ত্রণা, নারদের গান, শিববিবাহের সম্বন্ধ, শিবের ধ্যানভঙ্গে কামভস্ম, রতিবিলাপ, রতির প্রতি দৈববাণী, শিববিবাহযাত্রা, শিববিবাহ, কন্দল ও শিবনিন্দা, শিবের মোহন বেশ, সিদ্ধিঘোটন, সিদ্ধিভক্ষণ, হরগৌরীর কথোপকথন, হরগৌরীর রূপ, কৈলাশবর্ণন, হরগৌরীর বিবাদসূচনা, হরগৌরীকন্দল, শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ, জয়ার উপদেশ, অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ, শিবে অন্নদান, অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য, শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা, বিশ্বকর্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি, অন্নপূর্ণাপুরী নির্ম্মাণ, দেবগণনিমন্ত্রণ, শিবের পঞ্চতপ, ব্রহ্মাদির তপ, অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান, শিবের অন্নদাপূজা,

অন্নদার বরদান, ব্যাসবর্ণন, শিবপূজা নিষেধ, শিবনামাবলী, ঋষিগণের কাশীযাত্রা, হরিনামাবলী, ব্যাসের বারাণসী প্রবেশ, ব্যাসের শিবনিন্দা, ব্যাসের ভিক্ষাবারণ, কাশীতে শাপ, অন্নদার মোহিনী রূপ, শিবব্যাসে কথোপকথন, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ, গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি, ব্যাসকৃত গঙ্গাতিরস্কার,গঙ্গাকৃত ব্যাসতিরস্কার, বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা, ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন, ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য, অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসছলনা, ব্যাসের প্রতি দৈববাণী,বসুন্ধরে অন্নদার শাপ ,বসুন্ধরের বিনয়, বসুন্ধরের মর্ত্ত্যলোকে জন্ম, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, হরিহোড়ে অন্নদার দয়া, হরিহোড়ে বরদান, বসুন্ধরার জন্ম, নলকূবরে শাপ, নলকূবরের প্রাণত্যাগ, ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত, অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে— রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন, বিদ্যাসুন্দর কথারম্ভ, সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা, সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ, গড়বর্ণন, পুরবর্ণন, সুন্দরদর্শনে নাগরীগণের খেদ, সুন্দরের মালিনীসাক্ষাৎ, সুন্দরের মালিনীবাটী প্রবেশ, মালিনীর বেসাতির হিসাব, মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন, বিদ্যার রূপবর্ণন, মাল্যরচনা, পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা, মালিনীকে তিরস্কার, মালিনীকে বিনয়, বিদ্যাসুন্দরের দর্শন, সুন্দরসমাগমের পরামর্শ, সন্ধিখনন, বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি, সুন্দরের পরিচয়, বিদ্যাসুন্দরের বিচার, বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ, বিহারারম্ভ, বিহার, সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা, বিপরীত বিহারারম্ভ, বিপরীত বিহার, সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শন, বিদ্যা সহ সুন্দরের রহস্য, দিবাবিহার ও মানভঙ্গ, সারীশুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ, বিদ্যার গর্ভ, গর্ভসংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার, বিদ্যার অনুনয়, রাজার বিদ্যাগর্ভশ্রবণ,কোটালে শাসন, কোটালের চোর অনুসন্ধান, কোটালগণের স্ত্রীবেশ, চোরধরা, কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ, সুড়ঙ্গদর্শন, মালিনীনিগ্রহ, বিদ্যার আক্ষেপ, নারীগণের পতিনিন্দা, রাজসভায় চোর আনয়ন, চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা, রাজার নিকট চোরের পরিচয়, রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ, শুকমুখে চোরের পরিচয়, মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি, দেবীর সুন্দরে অভয় দান, ভাটের প্রতি রাজার উক্তি, ভাটের উত্তর, সুন্দর প্রসাদন, সুন্দরের স্বদেশগমনপ্রার্থনা, বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসিবেশ, বার মাস বর্ণন, বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রা।

তৃতীয় খণ্ডে আছে— বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, মানসিংহের যশোরযাত্রা, মানসিংহ ও প্রতাপআদিত্যের যুদ্ধ, মানসিংহের ভবানন্দবাটী আগমন, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, দেশ বিদেশ বর্ণন, জগন্নাথপুরীর বিবরণ, মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি, পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্তকথন, পাতশাহের দেবতা নিন্দা, পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর, দাসু বাসুর খেদ, মজুন্দারের অন্নদা স্তব,অন্নদার মজুন্দারে অভয় দান, অন্নপূর্ণাসৈন্যবর্ণন, দিল্লীতে উৎপাত, পাতশার নিকট উজিরের নিবেদন, অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ, ভবানন্দে পাতশার বিনয়, গঙ্গা বর্ণন, অযোধ্যা বর্ণন, রামায়ণ কথন, ভবানন্দের কাশী গমন, ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি, ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি, বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য, ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য, ভবানন্দের অন্তঃপুরপ্রবেশ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা, পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি, ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ, মজুন্দারের রাজ্য, অন্নদার এয়োজাত, রন্ধন, অন্নদাপূজা, অষ্টমঙ্গলা, রাজার অন্নদার সহিত কথা, মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তিনটি খণ্ডে রচিত কাব্যের কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন—

প্রথমতঃ মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতিতে দেবদেবী বন্দনা, গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ, আত্মপরিচয় তথা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও দেবখণ্ডের বর্ণনায় মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব আছে। শিবের দারিদ্র্য, ভিক্ষাযাত্রা এবং হরিহোড়ের দারিদ্র্যে কালকেতু কাহিনীর প্রভাব আছে এবং ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর কলহ বর্ণনায় বণিক খণ্ডের খুল্লনা-লহনা দ্বন্দ্বের ছায়া আছে।

তৃতীয়তঃ অন্নদামঙ্গলে ব্যাসকাহিনী ভারতচন্দ্রের নিজের সৃষ্টি। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত হরিহোড়ের বৃত্তান্ত ও ঈশ্বরী পাটনী প্রসঙ্গ কবির নিজের সৃষ্টি।

চতুর্থতঃ অন্নপূর্ণা শেষে ভবানন্দ ভবনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, এই ভবানন্দ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে থেকে দেবী নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তি বর্ণনা কাব্যের মূল লক্ষ।

পঞ্চমতঃ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরে কাহিনীর সঙ্গে মানসিংহের কিংবা ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনীর কোন যোগ নেই, এমন কি ত্রয়ী কাব্য হলেও বিদ্যাসুন্দরের দেবী কালিকা অন্নপূর্ণা নয়।

ষষ্ঠতঃ মধ্যযুগে চরিতগ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনেক কবিই পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারের নির্দেশে কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু কাব্য লিখেছেন দেবমাহাত্ম্যসূচক। ভারতচন্দ্র প্রথম চরিত গ্রন্থের বাইরে মানুষের ইতিহাস নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করলেন। দেব ভাবনায় অভিনব পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। দেব মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে কবি পৃষ্ঠপোষকের পূর্বপুরুষের যশোকীর্তন করেছেন।

সপ্তমতঃ ভারতচন্দ্র ইতিহাস নয় কাব্য লিখেছেন। তাই ইতিহাসের মধ্যে থেকে কাল্পনিক কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এখানেই ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা।

অষ্টমতঃ সাধারণত মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজের সৃষ্টি, কবির মুখে সমাজ কথা বলেছে; কিন্তু ভারত চন্দ্রের কাব্য ব্যক্তি ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি। এখানে মানুষের ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ লক্ষ করার মত।

সমাজ বৃত্ত ঃ

ভারতচন্দ্র ইতিহাসের এক বিশেষ যুগপরিবেশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন; ভারতচন্দ্রের দাবী ছিল তিনি নতুন মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। যাই হোক, যেহেতু তিনি মঙ্গলকাব্যের কবি, তাই মঙ্গলকাব্যের প্রথাসম্মত রীতিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই ভারতচন্দ্রের কাব্যেও লোকজীবনের নানা উপাদান কাব্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসের লৌকিক উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করে পূর্বোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ প্রথমে আসা যাক্ বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল খাদ্য ও পানীয়। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত বা অন্ন। অন্নদা অন্নেরই দেবী, সে ভক্তকে অন্ন দান করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর নিরামিষ ও আমিষ চর্ব্য-চোষ্য- লেহ- পেয়ের উপযোগী তিক্তকষায়- অম্ল-মধুর চার প্রকার স্বাদের খাদ্যের কথাই আছে। বাঙালীর ব্যঞ্জনক্রম অনুযায়ী প্রথমে নিরামিষ বিভিন্ন প্রকার শাক; বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, ছোলা, অড়হর, মাষ, বরবটী, মটর, ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার সব্জি, যথা— নারিকেল, থোড়, কাঁঠাল বীজ, বেগুন, কুমড়ো ইত্যাদি থেকে নানা প্রকার ব্যঞ্জন তৈরী হত। ব্যঞ্জনগুলি হল, যথা- বড়া, বড়িভাজা, নারিকেল ভাজা, দুধথোড়, ডালনা, শুক্তানি,ঘন্ট ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রের ভাষায়—

"হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘন্ট ভাজা নানামত শাক ॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মূলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘন্ট তাজা॥
কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনিরসে বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥

নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে।" (ঐ/৩৪১)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আবার প্রমাণিত হল 'মাছে ভাতে বাঙালী'। বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাছের ব্যঞ্জন বাঙালীর খাদ্য তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছে, যেমন— মাছভাজা, মাছের ঝোল-ঝাল, মুড়োঘন্ট, চরচড়ি, মাছের ডিমের বড়া, মাছের টক ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, মাছ ও মাংসের বিভিন্ন প্রকার বিদেশী ব্যঞ্জনও এযুগে বাঙালীর খাদ্য তালিকায় স্থান লাভ করেছিল। মাছ, পাঁঠা, খাসি, কচ্ছপের মাংস সহযোগে বিভিন্ন ব্যঞ্জন তৈরী হত, যেমন— মাছ ও মাংসের কালিয়া, কোপ্তা, দোলমা, বাগা, সেকচী, সামসা,কাবাব ইত্যাদি। তারপর খাদ্য তালিকায় পড়ে টক জাতীয় ব্যঞ্জন। আম, আমসত্ব, আমসি, কুল, তেঁতুল, আমড়া, চালতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হত টক জাতীয় ব্যঞ্জন। এবং সব শেষে হত মিষ্টান্ন ও পিঠা, যেমন- পায়েস, বড়া, আস্কে পিঠে, পুরি, পীযূষী, পুলী, চুষী, রুটি, মুগসাউলী, কলাবড়া, ঘিয়ড়, পাঁপড় ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মৎস্য মূলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥
আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পীযূষী পুরী পুলী।
চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়ড় পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা॥" (ঐ/ ৩৪২)

খিচুড়ি বাঙালীর একটি অতি প্রিয় খাদ্য। খাদ্য বিষয়ে বাঙালী কত সৌখিন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গলে। বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম চালের অন্ন ধনী বাঙালীর খাদ্য তালিকায় পড়ে। ভারতচন্দ্র– পায়রারস, বাঁশমতি, কুসুমশালী ইত্যাদি অজস্র ধানের উল্লেখ করেছেন। যেমন—

"পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
. . . .
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥ (ঐ)

দুধ, দই, ঘি, মধু, বিভিন্ন প্রকার মসলা— লবঙ্গ, জায়ফল ইত্যাদি বাঙালীর খাদ্য তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়াও ক্ষীর, চিনি, মিছরি, সন্দেশ ইত্যাদি নানা সুখাদ্যের উল্লেখ করেছেন কবি। যেমন—

"ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি॥ (ঐ/২০৯)

রন্ধন বাঙালীর একটি বিশিষ্ট শিল্প; রন্ধন, পরিবেশন ও ভোজনে বাঙালীর নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য আছে। রন্ধন একটি অতি পবিত্র কার্য হিসাবে পরিগণিত হত, তাই স্নান করে শুদ্ধ হয়ে অগ্নিপূজা করে দেবদেবীকে স্মরণ করে

তবেই রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হতে হত—

"স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥" (ঐ/৩৪১)

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বাঙালী সমাজে পান-সুপারির ব্যাপক প্রচলন ছিল। পান, সুপারি, চুন, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচ, জয়িত্রী, জায়ফল দিয়ে দিয়ে পান সাজানো হত। আহারের শেষে পান খাবার রীতি কিংবা সম্ভোগের বলকারক উপাদান হিসাবে পান-সুপারির ব্যবহার ছিল। যেমন—

"মিঠা পান মিঠা গুয়া চূন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া॥
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল॥ (ঐ/২০৯)

যুদ্ধাস্ত্র ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতই বাঙালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জামের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্য প্রসাধন বেশী থাকায় মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ বর্ণনারীতির প্রয়োগ অনেক কম, বর্ণনার অবকাশও কম। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্বে অনেকটা আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। খাঁড়া, ঢাল, তরোয়াল, তীর ধনুকের ব্যবহার হলেও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র কামান, গোলা, বন্দুক ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে হস্তী বাহিনী, অশ্ব বাহিনী, পদাতিক বাহিনী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করত এবং স্থলপথ ও জলপথে যুদ্ধ হত। প্রতাপাদিত্যের বিশাল নৌবাহিনী ছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বর্ণনায় প্রতাপাদিত্যের বিশাল নৌবাহিনীর কথা জানা যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে—

"ধুধু ধম্ ধম্   ঝাঁ ঝাঁ ঝম্ ঝম্
দমামা দম্দম্ বাজে।
হুড় হুড় হুড়   দুড় দুড় দুড়
কামানের গোলা গাজে॥

. . . .

গোলায় উড়িছে   আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥ (ঐ/২৯৬-২৯৭)

সাজসজ্জা ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ খুব একটা নেই।তবে সাধারণ বাঙালী পুরুষের পোশাক ছিল জোড়, ধুতি, চাদর, ইজার ইত্যাদি। নারীর পোশাক ছিল প্রধানত শাড়ী, তবে বক্ষাবরণ কাঁচুলি পরিধান করত, তাছাড়া মেয়েদের মধ্যে ঘাঘড়া পরার প্রচলন ছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কোটালগণ চোর ধরার জন্য নারী বেশ ধারণ করেছে, সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের কথা পাই। যেমন —

"কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘুরীতে॥" (ঐ/২৪৭)

সেকালে তাঁতিরা শ্রীরাম, তসর, মেঘডম্বর, বাঘাম্বর ইত্যাদি মূল্যবান শাড়ী তৈরী করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

"শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥" (ঐ/৩৩০)

কিংবা— "খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।" (ঐ/১৩৩)

মেঘডম্বর, বাঘাম্বর শাড়ীর উল্লেখও পাওয়া যায়—

"শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।" (ঐ/২৮৬)

পুরুষরা প্রধানত ধুতি পরিধান করত, তবে ঘরের বাইরে কাজ করার জন্য ধনীদের আলাদা পোশাক থাকত। ভারতচন্দ্র ভবানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন—

"দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার ।
দাসু যোগাইল ধুতিজোড় পরিবার॥" (ঐ/৩২৯)

রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিরা ঘড়ি, নাগরা জুতা, শিরোপা পরিধান করত। তৎকালে ঘড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছিল বোধহয়, কেননা ভারতচন্দ্রের কাব্যে ঘড়ির উল্লেখ আছে। তাছাড়া ভারতচন্দ্র লিখবেন কেন—

"রাজাই পাইলা ঘড়ি নাগারা নিশান। (ঐ/৩২৮)

অন্নদামঙ্গলে বাঙালীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত তা অবশ্য সুপ্রচুর নয়। নারীরা বিভিন্ন শৌখিন পোশাক-পরিচ্ছদের পাশাপাশি আলতা, সিন্দুর, চুয়া, চন্দন, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করত। সাধারণ দরিদ্র বাঙালী নারীর প্রসাধনদ্রব্য ছিল শাঁখা, সিন্দুর, আলতা ইত্যাদি। এয়োস্ত্রীদের অন্যতম প্রসাধন ছিল সিন্দুর ও আলতা। ছদ্মবেশিনী দেবী অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় পার হতে গিয়ে পাটনীকে বলে ছিল—

"ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥" (ঐ/১৫৮)

এয়োস্ত্রীরা রাঙ্গা শাড়ী, রাঙ্গা শাঁখা ও সিন্দুর পরিধান করত। যেমন —

"রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামালা গলে।
সিন্দুর কপালভরা খাঁড়া করতলে॥" (ঐ/২৪৮)

তাছাড়া আতর, চুয়া, চন্দন, কেশর, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, পুষ্পমালা, গঙ্গাজল প্রসাধন হিসাবে ও গৃহসজ্জার উপকরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হত। যেমন—

গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পূরি॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা॥

....

শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত॥" (ঐ/২০৯)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়, যথা– কেয়ূর. কঙ্কণ, কেশর, নূপুর, ঘুঙুর, কুণ্ডল, হার ইত্যাদি। যেমন ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিদ্যাসুন্দর পালায় বিদ্যা ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি হল—

"ঝন ঝন কঙ্কণ রণ রণ নূপুর
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে।
লটপট কুন্তল কুণ্ডল ঝলমল
পুলকিত ললিত কপোলে॥" (ঐ/২১২)

অলঙ্কারে বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর ব্যবহার করা হত। যেমন—

"হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।

দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পালায়॥" (ঐ/২৮৬)

অলঙ্কার হিসাবে বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি ফুলের মালা ব্যবহার করত শৌখিন ধনী কন্যারা, তারা গলায়, হাতে ও খোপায় ফুলের মালা ব্যবহার করত। বিদ্যাসুন্দর পালায় বিদ্যার প্রসাধনে পুষ্প সজ্জার কথা আছে। ধনী জমিদারগণ ফুল জোগাবার জন্য মালিনী রাখত, তারা মেয়েদের জন্য মালা গেঁথে সরবরাহ করত। সেকালের শয্যা নির্মাণের কথা পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে।ধনীরা শয্যা রচনার জন্য খাট ও পালঙ্ক ব্যবহার করত এবং নানা ধরনের মূল্যবান উপকরণ দ্বারা গৃহসজ্জা করত।

সাধু-সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও কাপালিকগণ ভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা ব্যবহার করত। শৈবরা বাঘথাবা বা বাঘ্রচর্ম চিহ্নিত নামাবালী, বৈষ্ণবরা হরিনাম লেখা হরিনামাবলী পরিধান করত। তাদের তৈজসপত্র বা সাজসজ্জার উপকরণ হল কমণ্ডলু, কোশাকুশি, করঙ্গ, তুম্বীফল ইত্যাদি । তারা গলায়, বক্ষে, কপালে, তিলক চিহ্ন বা চড়ক ফোঁটা অঙ্কন করত। বস্তুতপক্ষে এগুলি তাদের ধর্মাচরণের চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করা হত। যেমন 'ব্যাসবর্ণন' অংশে ব্যাসদেবের বেশভূষার যে পরিচয় পাই তা নিম্নরূপ —

"কপালে চড়ক ফোঁটা গলে উপবীত মোটা
বাহুমূলে শঙ্খচক্ররেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা কলিমৃগ বাঘথাবা
সারি সারি হরিনাম লেখা॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে লম্বি মালা করতলে
হাতে কানে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন কক্ষতলে সুশোভন
তাহে কৃষ্ণসার মৃগছালা॥
কটিতটে ডোর ধরি তাহাতে কৌপীন পরি
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল করঙ্গ পিবারে জল
হাতে আশা হিঙ্গুলবরণ।" (ঐ/৯০)

বাদ্যযন্ত্র ঃ ভারতচন্দ্রের সমকালে লোকসমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই অন্নদামঙ্গলে, যেমন— বীণা, বাঁশি, রবাব, কপিনাশ, তম্বুরা, শঙ্খ, ঘন্টা, সপ্তস্বরা, ঘুঙুর, মোচঙ্গ, নহবৎ, দামামা, রণশিঙ্গা, রণভেরী, ভোড়ঙ্গ, ধামসা, ঝাঁঝড় ইত্যাদি। বাদ্যযন্ত্রগুলি উৎসব অনুষ্ঠান, বিজয় উৎসব, নৃত্য-সঙ্গীত পরিবেশনে বাজানো হত। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে পাওয়া যায়—

"বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব কপিনাশ।
বাজাইয়া সপ্তস্বরা স্বরের প্রকাশ॥
আঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
. . . .
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।

বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥" (ঐ/২১০)

আবার কিছু কিছু রণবাদ্যেরও উল্লেখ আছে এখানে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানসিংহ পালায় 'মজুন্দারের রাজ্য' অংশে ভবানন্দ মজুমদার রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হলে ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়—

"ধূধূ ধূধূ নৌবত বাজে রে।
বরপুত্র অন্নদার ভবানন্দ মজুন্দার
রাজা হৈলা বাগুয়ান মাঝে রে॥
ভোঁভোঁ ভোরঙ্গ বাজে ধাঁধাঁ ধামসা গাজে।
ঝাঁঝাঁঝাঁ ঝম ঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ি বাজে ঠন ঠন ঘন্টা বাজে রন রন
গন গন গজঘন্টা গাজে রে॥" (ঐ/৩৩৭)

পূজা-পার্বণ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শঙ্খ, ঘন্টা বাজানো হত। ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে প্রত্যাগমন উপলক্ষে তাকে শঙ্খ, ঘন্টা, উলুধ্বনি সহযোগে বরণ করে নেওয়া হয়—

"শঙ্খ ঘন্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥" (ঐ/৩২৯)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাতায়াতের অর্থাৎ পরিবহনের মাধ্যম ছিল মূলত পশুপৃষ্ঠে আরোহণ। নিকটবর্তী স্থানে যাতায়াতে মহিলারা পালকী ও দোলা ব্যবহার করত, আর যুদ্ধযাত্রা বা দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতের মাধ্যম ছিল হাতি, ঘোড়া, উট ইত্যাদি দ্রুতগামী পশু।

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসা যাক্ অন্নদামঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ বা অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানের কথায়। ভারতচন্দ্রের কাব্য মঙ্গলকাব্য হলেও সমাজের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তি ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি একারণে সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণ এতে স্থানলাভ করেনি। ভারতচন্দ্রের জীবনীতে লক্ষ করা যায় সংস্কার- বিশ্বাস বা আচার-আনুষ্ঠানিকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অনেকক্ষেত্রেই কবি আচার আনুষ্ঠানিকতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন, হাসির উপকরণ করে তুলেছেন; এটা অবশ্য ভারতচন্দ্রের যুগ প্রবণতারই উপস্থাপনা। ভারতচন্দ্রের সমকালে পুরাতন কাব্যধারা স্তব্ধ হয়ে নতুন কাব্যধারা ও নতুন ভাবধারা সৃষ্টি হতে চলেছিল। ভারতচন্দ্র তাকে কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন, তাই পুরাতন কাব্যের বর্ণনা প্রাধান্যকে খানিকটা হলেও পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কাব্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান,সংস্কার-বিশ্বাস বর্ণনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্র সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে তেলপড়া, জলপড়া, ধূলাপড়ার মত ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করা হত। আবার এসব নিবারণের জন্য তাবিজ বা মাদুলি ধারণ করা হত। 'মানসিংহ পালা'য় দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটলে ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

খবিশ পাইল বলি ডাকি আনি ওঝা।
লিখে দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায়॥ (ঐ/৩১৫)

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস স্থানলাভ করেছে, সেখানে ভারতচন্দ্র কাব্যে এসবকে স্থান দেননি। আচার-কেন্দ্রিক উপাদানের ব্যবহার ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে তবে তার পুঙ্খানুপঙ্খ বর্ণনা নেই। আসলে এসময়ে বাঙালী সমাজে সন্তানের জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সম্পর্কিত আচারগুলি পালিত হত; কিন্তু ভারতচন্দ্র

তাঁর কাব্যে তাকে বর্ণনার বিষয় না করে স্পর্শ করে গেছেন মাত্র। নবজাতকের জন্মের পর ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, ছয় মাসে অন্নস্পর্শ বা অন্নপ্রাশন করা হত। হরিহোড়ের জন্মের পরও এই আচার পালিত হয়েছে। যেমন —

"ষষ্ঠীপূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা, হৈল নানা দুঃখ পায়ে।" (ঐ/১৪১)

কিংবা, সুন্দরের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের পর—

"পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হইল তনয়।" (ঐ/২৮৪)

বিবাহকালেও কিছু কিছু আচার পালিত হত। কন্যাগৃহে বরযাত্রীদের আগমন হলে তাদের বরণ করে নেওয়ার পর বিবাহ সভায় অধিষ্ঠান করা হত। কনের পিতা নানা উপহার সামগ্রী দান-সজ্জা বরকে উপহার দিত। বিবাহকালে শাস্ত্রীয় মতে পুরোহিত বরের পিতৃপিতামহের পরিচয় জানতে চাইত, হিন্দু বিবাহরীতিতে এটা আবশ্যিক ভাবে পালিত হত। শিববিবাহে এই আচার পালিত হতে দেখা যায়—

"কুশহস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেন কালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥" (ঐ/৪১)

যথাশাস্ত্র কন্যাদানের পর পালিত হত নানা রকম স্ত্রী আচার। যেমন—

"এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার কবিবারে মেনকা আইলা॥
. . . .
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনিডালা হুলাহুলি দিয়া॥" (ঐ)

বিবাহে বরপণ ও কনেপণ উভয়ই প্রচলিত ছিল। অন্নদামঙ্গলে দাসু-বাসুর উক্তিতে ষোল টাকা পণ দিয়ে বিবাহ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

মৃত্যু সম্পর্কিত আচারের উল্লেখ নেই ভারতচন্দ্রের কাব্যে। তবে মৃত্যু সম্পর্কিত বিশ্বাস ও আচারের কথা আছে। তীর্থস্থান হিসাবে কাশী বাঙালীর নিকট অতি পবিত্র, এখানে মৃত্যুবরণ করলে মোক্ষলাভ হয় এজাতীয় বিশ্বাসে বাঙালী প্রতিপালিত। তাইতো ব্যাসদেব শিব-কাশী অপেক্ষা দ্রুত ফল লাভের জন্য ব্যাস-কাশী স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। বাঙালীর এজাতীয় বিশ্বাসে ভারতচন্দ্রের আস্থা না থাকলেও এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করেছেন। জরতী বেশধারী দেবী ব্যাসের কাছে এ কথাই জানতে চেয়েছে—

"তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
. . . .
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥" (ঐ/১২৯)

মৃত্যুর পর গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন বা কাশীতে পিণ্ডদান বাঙালীর মৃত্যু বিষয়ক আচারের অন্তর্গত। তাছাড়াও বিভিন্ন

পূজা-পার্বণে, বার-ব্রতে নানা ধরনের আচার পালিত হত। ব্রতমাহাত্ম্য ও ব্রতকথা শ্রবণে বিশ্বাস ছিল, তাইতো দেবী অন্নপূর্ণা ভবানন্দ মজুমদারকে দেবী প্রদত্ত ঝাঁপি না খোলার পরামর্শ দেয়, দেবীর এই নির্দেশ পালন করলে গৃহে দেবী অচলা হয়ে থাকবে। তাই কবি লেখেন—

এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে॥ (ঐ/১৫৯)

চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হত। পূজা উপলক্ষে ব্রতী ও এয়োস্ত্রীদের তেল-সিন্দুর দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বা ঘরের পুত্র ঘরে ফিরে এলে নানা উপচারে বরণ করে নেওয়ার প্রথা ছিল। ভবানন্দ দিল্লী থেকে দেশে ফিরে এলে নানা বাদ্য বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। এ উপলক্ষে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে তেল, সিন্দুর বিতরণ করা হত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে—

"সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্ট হয়ে॥
. . . .
পাইয়া সিন্দুর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছে মজুন্দার কি করি এখন॥" (ঐ/৩২৯)

চৈতন্য-পূর্ব যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে নিত্যকর্ম বা সায়ংসন্ধ্যার কথা পাওয়া যায় না। চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব সমাজে নিত্যকর্ম বা সায়ংসন্ধ্যা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই বৈষ্ণবীয় প্রভাবের কথা আছে। ভবানন্দ মজুন্দার যথারীতি সায়ংসন্ধ্যা প্রতিপালন করত। কবি লিখেছেন—

"সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান॥" (ঐ)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ, গণৎকার, ওঝাদের কোন প্রভাবের কথা নেই। আসলে তাঁর কাছে এসব উপেক্ষনীয় বিষয় ছিল, কিন্তু সমাজের অন্তঃস্থলে এসবের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল।

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি ভাববাদী উপকরণগুলির কথায়। ভারতচন্দ্রের জীবনী পাঠে সেকালের শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা করা যেতে পারে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কাব্যশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি প্রথাগত শিক্ষা প্রচলিত ছিল। 'সুন্দরের বিচার' অংশে কাব্য, অলংকার, সাহিত্য, নাটক ছাড়াও বেদান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, সাংখ্য, বাদরায়ণ, পুরাণ, সংহিতা, মনু ইত্যাদি দর্শন চর্চার কথা আছে। ভারতচন্দ্রও তার পাঠগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতচন্দ্র প্রথাগত শিক্ষার জন্য তিরস্কৃত হয়ে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি ঘনরাম চক্রবর্তীও স্বয়ং আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। বস্তুতপক্ষে সময়োপযোগী বস্তুমুখী শিক্ষা এবং কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও তার প্রয়োজনের দিকটি এযুগে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরও প্রথাগত শিক্ষার বাইরে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। ভারতচন্দ্রের সময়কালে চাকুরীবৃত্তি বা রাজসেবা স্বীকৃতি পেয়েছে, ফলে বৃত্তির প্রয়োজনেই এজাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। নারীশিক্ষার প্রচলন খুব একটা না থাকলেও অভিজাত ঘরের নারীরা শিক্ষালাভ করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে বিদ্যা শিক্ষিতা রমণী ছিল এবং বিদ্যা গৌরবে সে বড়বড় পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছে বলে জানা যায়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সামান্য আছে। আচার-আচরণ, বার-ব্রত, পালা-পার্বণে বাঙালীর নিজস্ব ধ্যান, মনন, সৌন্দর্যবোধ প্রকাশিত। শিল্পকর্ম, সজ্জারীতি, প্রসাধনচর্চা বাঙালীর শিল্পবোধের পরিচায়ক। বার-ব্রতের পাশাপাশি বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, বিশেষত দুর্গাপূজার কথা আছে।

দুর্গাপূজা বাঙালী সমাজে বিশিষ্ট প্রধান উৎসবে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যা সুন্দরের নিকটে 'বার মাস বর্ণন' অংশে দুর্গাপূজার কথা বলেছে—

"আশ্বিনে এ দেশে দুর্গাপ্রতিমাপ্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥" (ঐ/২৮৮)

বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের অনেকগুলির পরিচয় আছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, যথা— কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে রাসযাত্রা, পৌষে নবান্ন ও পৌষপার্বণ, চৈত্রে দোল ইত্যাদি। ভারতচন্দ্র বিদ্যার 'বার মাস বর্ণন' অংশে লিখেছেন—

কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্তমহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার।
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥" (ঐ)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে নতুন নতুন সংস্কৃতিচর্চার ধারা গড়ে উঠেছিল। পুরাতন সাহিত্য শাখাগুলি ম্রিয়মান হলে শাক্ত সাহিত্য, ঝুমুর, খেউর, আখড়াই, কবিগানের মত বিষয়গুলি সাংস্কৃতিক জগতে বিস্তৃত হতে থাকে। নদীয়া, শান্তিপুর অঞ্চলের ঝুমুর ও খেউর গান বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে বিদ্যা সুন্দরকে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চল থেকে নতুন খেউর বা 'খেঁড়ু' এনে শোনাতে চেয়েছে—

"নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥ (ঐ)

বাঙালীর গৃহসজ্জা, মণ্ডপসজ্জা, বিবাহরীতি, পূজা-পার্বণে বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিল্পবোধের ছাপ আছে।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথা বলা যাক্। প্রচুর প্রবাদ- প্রবচনের ব্যবহার আছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, যার সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ইতিহাসের সম্পর্ক থাকতে পারে। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত প্রবাদগুলির উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—

১। নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
২। মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে।
৩। খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত।
৪। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন।
৫। হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
৬। স্ত্রী ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে পুত্র।
৭। বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানি ।
৮। নারী যার স্বতন্তরা সে জন জিয়ন্তে মরা।
৯। বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে।
১০। যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।
১১। নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

১২। যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে।

১৩। গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল।

১৪। বড়র পিরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

১৫। যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকের লাঠি বাজে।

১৬। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ।

১৭। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।

১৮। সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥'

১৯। ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।

২০। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর॥

২১। যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

২২। মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।

২৩। মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥

২৪। বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি সুদ্ধি যায়।

২৫। সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়।

২৬। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট।

২৭। ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।

সামাজিক অবস্থা ঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্ণিত অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বলতে হলে আমাদের অবশ্য মনে রাখা উচিত ভারতচন্দ্র অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিগণের মত জনসভার কবি নন, তিনি রাজসভার কবি, নাগর জীবনের কবি। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে নাগরিক জীবনের বৈদগ্ধ ও রুচি। এমন কি ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রটির কথাবার্তায় নাগরিক রুচির প্রকাশ আছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিগণ অনেকেই রাজসভাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা করলেও কবি নিজ পরিবশকে ভোলেননি; তাই তাঁদের লেখনীতে এসেছে সমাজ ইতিহাসের নানান উপাদান। আর ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা পেয়েছি নাগর জীবনকথা ও নাগর রুচিবোধকে। ভারতচন্দ্রের চেতনা ও রুচিবোধ ছিল ভিন্নতর। লক্ষণীয় কালগত তফাৎ ব্যতিরেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর জনসমাজ জনরুচি, জনচরিত্র তাদের আচার-বিচার, সংস্কারের ভারে কখনো কখনো ভারগ্রস্থ হয়ে পড়লেও নাগর জীবন বাংলার ঐতিহ্য এবং জীবনধারাকে বহন করে চলেছিল। তাই বাঙালীর পারিবারিক জীবন, নারীর অবস্থান ইত্যাদিতে প্রায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি, অনেকক্ষেত্রেই পুরাতন রীতি-রেওয়াজ জগদ্দল পাথরের মত শ্বাসরোধ করেছে। ফলে জনজীবনে কালগত প্রয়োজনবোধেই এসেছে প্রচলিত রীতিনীতি, সংস্কারের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর অবস্থানগত সত্যতা ফুটে উঠেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। এযুগেও নারী ছিল প্রকৃতপক্ষে পরান্নজীবী। বস্তুতপক্ষে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তাই সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে নারী অষ্টোপাসের বন্ধনকে মেনে নিলেও সমাজকে উপেক্ষা করতে চেয়েছে। ফলে ধনীঘরের নারীও খানিকটা বিলাসিতা ও অবজ্ঞার চোখে দেখেছে সমাজকে। নারীর প্রচলিত মূল্যবোধের অবসান ঘটেছে, তাই মুকুন্দের কাব্যের "স্বামী বনিতার পতি/স্বামী বনিতার গতি/স্বামী বনিতার সে বিধাতা।" (মুকুন্দ/৫৩)। ঐ জাতীয় বিশ্বাসের

মূল্য অষ্টাদশ শতকে ছিল না— ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় আছে। ভারতচন্দ্র 'হরগৌরীর কথোপকথন' অংশে হরগৌরীর বাক্যালাপে তা ব্যক্ত করেছেন। গৌরীর দৃষ্টিতে পুরুষের প্রেম ছিল অসম্পূর্ণ—

"হাসিয়া কহেন দেবী এমনো কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মন কি তেমন॥
পাইতে পতির অঙ্গ নারীর সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥" (ঐ/৫১)

পুরুষশাসিত সমাজ নানান সংস্কার, আচার-বিচারের ভারে নারীকে ভারগ্রস্ত করছে আর এই সঙ্গে তৈরী হয়েছে সমাজের কঠোর নিয়মতন্ত্রতাকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা। তাইতো শিবঠাকুর তার সংসারের আর্থিক অবনতির জন্য গৌরীকে দায়ি করলে গৌরী শিবঠাকুরের এই অভিযোগ স্বীকার করেনি। এমন কি 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র' এই প্রবাদবাক্যটিও গৌরী স্বীকার করেনি। এতদিনের সমাজচিত্রের বিপরীত চিত্র এখানে দেখা যায়। তাই গৌরী স্পষ্ট জবাব দিয়েছে—

"আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সব হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥" (ঐ/৫৮)

তাইতো শিবের খেদোক্তি, সে স্বামী হিসেবে যথার্থ সম্মান পায় না—

"আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥" (ঐ/৫৭)

তাসত্বেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ বাঙালী নারীর অবস্থা ছিল ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর চাইতে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। পুরুষ-কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনে নারীর স্বাধীনতা তো দূরের কথা স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারও ছিল না। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার কখনোই স্বীকৃত হয়নি, নারী সাধারণত অশিক্ষিত , এমন কি তাদের উপযুক্ত জীবিকা অবলম্বন বা শিক্ষার উপযুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো ছিল না। সর্বময় কর্তা পুরুষ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করত। বিশেষত কুলীন ঘরের নারীর অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন ছিল। নারীকে পরিবারের শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হত, অন্যথায় নেমে আসত কঠোর শাস্তি। যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে নারী কোনক্রমেও পরের বাড়ি এক রাত্রির জন্য অবস্থান করতে পারত না, তাহলে সমাজ তাকে গ্রহণ করত না। আবার বিবাহিতা নারীর কাছে পিত্রালয়ও নিরাপদ ছিল না, পিতৃগৃহে সমবেদনার পরিবর্তে গঞ্জনা মিলত। তাইতো ভিখারী শিবের সংসার ত্যাগ করে পিতৃগৃহে যেতে চাইলে সখী জয়া অন্নপূর্ণাকে উপদেশ দিয়েছে-

"জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া॥" (ঐ/৬১)

নারীর অবস্থানগত নিম্নতা সত্ত্বেও কিন্তু নারীই কখনো মাতৃরূপে, কখনো বা বধূরূপে পরিবারের কেন্দ্রস্থলে ছিল।

বাঙালীর পরিবারের নারীর এই কেন্দ্র স্বরূপ হয়ে উঠার জন্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হত। অন্নপূর্ণা হরিহোড়কে উপদেশ দিতে গিয়ে তাই বলে—

"গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে॥" (ঐ/১৪৪)

সন্তান প্রতিপালন থেকে সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গল কামনায় নারীর দায়িত্ব সমধিক ছিল। তাইতো সতী পিতৃগৃহে গেলে কৃষ্ণবর্ণা সতীকে দেখে পিতা তিরস্কার করলেও মাতৃহৃদয় কেঁদে ওঠে। সতীর জননী কন্যাকে সর্বাগ্রে পেটভরে আহার করায় —

"জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া।
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া॥" (ঐ/১৯)

সন্তানের যাবতীয় আনন্দ-আবদার ছিল মাকে কেন্দ্র করে। দরিদ্রের সংসারে অভুক্ত সন্তানের দায় মাকে সামাল দিতে হত। তাইতো ঈশ্বরী পাটনী সন্তানের জন্য দেবতার কাছে মোটা ভাত-কাপড় চায়। সমাজে নারীর পর্দাপ্রথা যে কঠোরভাবে পালিত হত তা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। কুলীন সমাজে নারী ছিল পর্দানসীন, তারা ঘরের বাইরে যেতে পারত না। তাইতো ছদ্মবেশিনী দেবীকে কুলবধূ হিসাবে একা দেখতে পেয়ে ঈশ্বরী পাটনী বিস্মিত হয়েছে। তাই ঈশ্বরী পাটনী একা কুলবধূকে নৌকায় পার করতে ভয় পায়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যাকে এভাবেই পর্দানসীন করে রাখা হয়েছিল। অন্তঃপুরের নিরাপত্তার জন্য পরিচারিকা এবং খোজা সৈন্যদের রাখা হত। সাধারণ ঘরের নারীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল, তাদের কোন রকম কঠোরতা ছিল না। এ'কারণে সাধারণ নিম্নবর্ণের নারীরা জীবন-জীবিকারক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারত, সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়াও আর্থিক উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত। উচ্চবর্ণের অর্থাৎ কুলীন ঘরের মেয়েরাও অনেকক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা নিম্নশ্রেণী মেয়েরা ধান ভানতো, কিংবা সুতা কেটে অর্থ উপার্জন করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এক নারীর উক্তিতে চরকায় সুতা কেটে উপার্জনের কথা পাই। হরিহোড়ের জননী ঘুঁটে বেচে অর্থ উপার্জন করে। ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবাদের অবশ্য পর্দাপ্রথার বালাই ছিল না। বিধবা ব্রাহ্মণীরাও অনেক সময় ধনীগৃহে ধাত্রীবৃত্তি, পরিচারিকাবৃত্তি গ্রহণ করত। মুকুন্দের কাব্যে দুর্বলা, ভারতচন্দ্রের কাব্যে হীরা মালিনী, কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনীর কথা আছে। এরা ফুল বিক্রি করত আবার দাসীবৃত্তিও করত।

নারীর সতীত্বে বিশ্বাস ছিল প্রবল। অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত নারীকে সমাজ গ্রহণ করত না। সামাজিক বিধিবিধানের প্রতি সেকালের নারী সচেতন ছিল। তাইতো বিদ্যার অবৈধ গর্ভ শ্রবণের পর বিদ্যার জননী বিদ্যাকে তিরস্কার করে বলে—

"না মিলিল দড়ি   না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ   কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে॥ (ঐ/২৩৭)

রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে সখীরা পর্যন্ত বিদ্যাকে গঞ্জনা দিয়েছে। সখীরা বিদ্যার জননীকে "উদরে ধরেছ কেন কুল খাকী ঝি।"[৪] বলে গঞ্জনা দিয়েছিল। অসতী নারীকে আত্মীয়-পরিজনরা কেউই গ্রহণ করত না। সতীত্ব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল। তাই বিদ্যার সতীত্ব পরীক্ষার চাইতে সুন্দরের সঙ্গে বিবাহ প্রদানই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে মধ্যযুগে সতীত্বের প্রতি অনুগত থেকেও নারী নিজ নিজ পতিনিন্দা করেছে এবং শেষে একটি মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। অদৃষ্ট নির্ভর বাঙালী নারী অদৃষ্টের শাসনকেই মেনে নিয়েছিল।ভারতচন্দ্রের নারী কিন্তু ভাগ্যের দোহাই দেয়নি, মনের দুঃখ চেপে

রেখে কথা বলেনি এবং শেষ পর্যন্ত প্রচলিত মূল্যবোধেও আস্থা স্থাপন করেনি। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে নারীর সতীত্ব টিকিয়ে রাখাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাংলার বেশীরভাগ মানুষ নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ভোগবিলাসীতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার স্রোতে গা ভাসিয়ে ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার সুন্দর চিত্র আছে। নারীও এই স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, তাইতো রাজনন্দিনী বিদ্যার সুন্দরের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় নারীগণের পতিনিন্দায় সেকালের সমাজব্যবস্থার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথা তো প্রচলিত ছিলই এমন কি এর কঠোরতা ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্ণহিন্দু পরিবারের কৌলীন্য প্রথা নারীকুলের চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। কেননা কালক্রমে কৌলীন্য প্রথা তার মর্যাদা ও গুণাবলী হারিয়ে শুধুমাত্র বিবাহ গুণে পর্যবসিত হয়েছিল। পুরুষ সমাজের চরিত্রেও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল, ফলে পুরুষের কৌলীন্য নির্ভর করত বিবাহ সংখ্যার উপরে। এযুগে ব্রাহ্মণ ছাড়াও রাজা মহারাজা, অর্থবান জমিদার, এমন কি কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ সমাজেও কৌলীন্য প্রথা প্রবেশ করেছিল। এরই ফলে কুলীন বরে কন্যা সম্প্রদান করে কৌলীন্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কুলীন কন্যার বিবাহ এক ভয়াবহ সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সপত্নী সমস্যার মত বহুবিধ সমস্যায় সমাজ জীবন জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। কুলীন কুলের কুল রক্ষার এই ন্যাক্কারজনক পরিণতি সম্পর্কে ঈশ্বরী পাটনীর সচেতন মন্তব্য আমাদের বিস্মিত করে—

"পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥" (ঐ/১৫৭)

কুলীন বরে কন্যা সম্প্রদানে উন্মত্ত কুলীন চূড়ামণির কন্যার বিবাহ হতে হতে যৌবন বয়ে যেত। বিদ্যাকে হীরা মালিনী তাই বলেছে—

"এ রূপ তোমার যৌবনের ভার
অদ্যাপি না হইল বিয়া।
কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া॥"(ঐ/১৮৯)

'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে কুলীন কন্যার আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে—

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥"(ঐ/২৬৪)

ফলে শেষ পর্যন্ত কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে অন্ধ, কানা, খোঁড়া, আশীতিপর বৃদ্ধ কিংবা বালকের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিত। ভারতচন্দ্র এক কুলীন কন্যার মুখে শুনিয়েছেন—

"যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥"(ঐ)

কৌলীন্য প্রথার এই ছিদ্র পথে কুলীন চূড়ামণিগণ কুলীনের কুল রক্ষাকে অর্থ উপার্জনের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল। বিবাহের পর কুলীন জামাই কালেভদ্রে শ্বশুরবাড়ি আসত এবং কন্যাটি পিতৃগৃহেই থাকত। অর্থের প্রয়োজন হলে তবেই তার শ্বশুরবাড়ি আগমন ঘটত। কুলীন জামাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য টাকা দিতে হত, শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্য কন্যাকে 'শয্যাগ্রহণী' দিতে হত। কন্যার কষ্টোপার্জিত অর্থ হস্তগত করে তবেই তার প্রতিগমন হত। ভারতচন্দ্র কুলীন কন্যার এমনি করুণতম দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন—

"দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার॥

সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥" (ঐ)

ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনা গতানুগতিক বর্ণনা মাত্র নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের জীবন্ত দলিল বলে মনে করা যায়। এযুগে নারীর দুর্গতির আরও একটি অন্যতম কারণ হল অসম বিবাহ। অসম বিবাহ অষ্টাদশ শতাব্দীর নারী জীবনকে অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কৌলীন্যশাসিত সমাজে তাই দেখা যেত বিদুষীর কালা স্বামী, অন্ধের সুন্দরী গৌরবর্ণা স্ত্রী, যুবতীর বৃদ্ধ স্বামী। নারীদের খেদোক্তিতে সমাজ ইতিহাসের এই মর্মবেদনা প্রকাশিত। যেমন— বিদূষী পত্নী তার কালা স্বামী সম্পর্কে বলেছে—

"এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥"(ঐ/২৫৯)

কিংবা, যুবতীর বৃদ্ধ স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর খেদ প্রকাশিত —

"আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া॥"(ঐ)

এইভাবে কৌলীন্য প্রথার যাবতীয় কুফল কিন্তু কুলীন কন্যাকেই সহ্য করতে হত। স্পষ্টভাষী ভারতচন্দ্র সমাজ জীবনের বাস্তব সত্যগুলিকেই রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন।

কৌলীন্য প্রথার আরও একটি কুফল হল পুরুষের বহুবিবাহ। কুলীন পুরুষ অপর কুলীনের কুল রক্ষার জন্য বহুবিবাহ করত, ফলে সপত্নী সমস্যা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে এক ভয়াবহ সমস্যা হয়ে উঠেছিল। বস্তুত সপত্নীর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে কুলবধূগণ গৃহত্যাগ করত।সমাজে এসমস্ত সমস্যার কথা কারও অজানা ছিল না। তাই ঈশ্বরী পাটনী ছদ্মবেশিনী দেবী অন্নপূর্ণাকে দেখে সন্দেহবশত তার পরিচয় জানতে চায়। দেবী আলঙ্কারিক ভাষায় যে পরিচয় দিয়েছে তাতে তৎকালীন সমাজ-সত্য উন্মোচিত হয়েছে। পিতার ঘরে আদরে পালিতা কন্যার বিবাহ হয়েছে বহুপত্নীক বৃদ্ধের সঙ্গে, ফলে পারিবারিক জীবনে চরম অশান্তির মর্মান্তিক চিত্রফুটে উঠেছে—

"পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥

. . . .
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥"(ঐ/১৫৭)

অন্নদামঙ্গলে হরিহোড়ের চার স্ত্রী এবং ভবানন্দ মজুমদারের দুই দাসী সাধী ও মাধীর দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-বিবাদ কুলীন সমাজের বাস্তব চিত্র। কুলীন নারীরা তাই কৌলীন্য প্রথা ও তাদের পিতৃপিতামহের দোষারোপ করত, গালিগালাজ করত। সপত্নী সমস্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কত নারী নিজের অথবা স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করত। যেমন বসুন্ধরার উক্তিটি স্মরণযোগ্য—

"আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥ (ঐ/১৪৮)

সে কালে ঘরজামাই রাখার প্রথাও ছিল, সেই সঙ্গে কন্যার পিতারাও অনেক সময় জামাই গৃহে বাস করত ফলে, অধিকাংশ কুলীন ঘরে নানা অশান্তি বিরাজ করত। অন্নদামঙ্গলে হরিহোড়ের পরিবারে তার শ্বশুরকে বসবাস করতে দেখা যায়। বস্তুত সমাজজীবনে এসকল সমস্যার সমাধানের কোন রাস্তাই ছিল না। কোন কোন মুসলিম শাসক চেষ্টা করেও সমাজ মানসের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি।

কৌলীন্য প্রথার আর একটি ফলশ্রুতি হল সতীদাহ প্রথা। সতীদাহ প্রাচীন প্রথা হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। শুধুমাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজেই নয় কায়স্থ সমাজেও সতীদাহ আবশ্যিকভাবে পালিত হত। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেখি হরিহোড়ের মৃত্যুতে সোহাগী, বসুন্ধরের মৃত্যুতে বসুন্ধরা সহমরণে গমন করে-

"সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥" (ঐ/১৫৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অন্যান্য সাহিত্যে সতীদাহের কথা পাওয়া যায়।

ক্রমাগত নিষ্পেষিত হতে হতে বাংলার নারী সমাজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। নারী পরিবারের কেন্দ্র স্বরূপা হয়ে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করত তা সত্ত্বেও নারীকে নানা রকম বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ করে রাখা হত, যেমন— গুরুজনদের নাম উচ্চারণ না করা, পুরুষের সামনে বের না হওয়া, মাথায় ঘোমটা দেওয়া ইত্যাদি। এসমস্ত বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি সেকালের নারীও দায়ী ছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষাহীনতা, কুরুচিকর দলাদলি, কলহ, আত্মবিশ্বাসহীনতা নারীকে অন্ধকারের পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারী জাগরণ সম্ভব ছিল না; কিন্তু লক্ষণীয়, মধ্যযুগের শেষপর্বে নারী সমাজের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেছিল । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে গৌরীর বৃদ্ধ বরকে মনঃপূত না হওয়ায় মেনকা বরকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীর এই মানসিকতা লক্ষ করি। হরগৌরীর বিবাহ অংশে আমরা দেখি বৃদ্ধ বরের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য মেনকা ও অন্যান্য নারীগণ নারদ ও হেমন্ত ঋষিকে তিরস্কার করেছে —

"ও রে বুড়ো আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥" (ঐ/৪২)

কিংবা, গৌরীকে শিবঠাকুর অলক্ষণা বললে গৌরী নির্বিবাদে তা মেনে নেয়নি। কলহের ভঙ্গীতে হলেও গৌরীর বক্তব্যে প্রতিবাদের সুর আছে। সতীর দক্ষালয়ে যাত্রাকালে শিবঠাকুর নিষেধ করলে সতী বিভৎস্য 'দশমহাবিদ্যা' রূপ দেখিয়ে পিতৃগৃহে গমনের সম্মতি আদায় করে। ভারতচন্দ্রের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটিতে নারীরা যেন সমাজ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে এবং নিজ মনের কামনা -বাসনা অকপটে প্রকাশ করেছে ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর সমাজ ও পরিবারের নানা তথ্য পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরে ছিল তার পূর্বসূত্র পাওয়া যায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে। ভারতচন্দ্রের নিজের জীবনেও পতনোন্মুখ পারিবারিক জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিবঠাকুরের দরিদ্রের সংসার; সে ভিক্ষোপজীবী মাত্র, কিন্তু সংসারে প্রতিপালককম নয়। তার সংসারের সদস্য স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা, তাছাড়া নিজে, নিজের বলদ, গণেশের ইঁদুর আর কার্তিকের ময়ূর। একমাত্র উপার্জনশীল শিবঠাকুর, তাও ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল; সুতরাং শিবের সংসারে নিত্য দারিদ্র্য। শিবঠাকুর জানে পূর্বেকার মত ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি নাই, তাই ভিক্ষাও তেমন পাওয়া যায় না। সংসারে পুত্রদের একজন শুধু খায় আর নেশা করে, আর অন্যজন বাবুগিরি করে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।

সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥

. . . .

ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।

উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥" (ঐ/৫৮-৫৯)

বলাই বাহুল্য ঘরে অভাব থাকা সত্ত্বেও বাবুগিরি করার প্রবণতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাবু সমাজে বিশেষ করে লক্ষ করা গিয়েছিল— এই বিবরণে আমরা বাবু সমাজের পূর্বাভাস পাই। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক কলহ এবং অনিবার্যভাবে পারিবারিক ভাঙন্ দেখা দিয়েছিল। শিবঠাকুর গৃহত্যাগ করলে গৌরী সন্তানের হাত ধরে বাঙালী নারীর স্বভাব সুলভতায় পিতৃগৃহে যেতে চাইল, কিন্তু পিতৃগৃহে স্বামী পরিত্যক্তা রমণীর সম্মান নাই, তাই সখী জয়ার উপদেশে সংসারের হাল ধরতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়। ছদ্মবেশিনী দেবী অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগ, হরিহোড় জননীর ঘুঁটে কুড়িয়ে বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ তার প্রমাণ দেয়। সপত্নী সমস্যায় জর্জর হয়ে পারিবারিক আদর্শ নষ্ট হয়েছিল। এযুগে কিছুটা হলেও আত্মসচেতন নারী তাই আপনজন অন্বেষণ করে।ভারতচন্দ্রের ছদ্মবেশিনী অন্নপূর্ণার সুস্পষ্ট উক্তি—

"যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥" (ঐ/১৫৭)

শিবায়নে শিবঠাকুরকে গৌরী সংসার প্রতিপালনের জন্য চাষবাস করার পরামর্শ দেয় নতুবা পরিজনাদি পরিত্যাগ করার কথা বলে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের গৌরী স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয় দরিদ্র ভিখারীর সংসার ধর্ম থাকা উচিত নয়। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"যে ঘরে গৃহস্থ হেন   সে ঘরে গৃহিণী কেন

নাহি ঘরে সদা খাই খাই।

কি করে গৃহিণীপনে   খন খন ঝন ঝনে

আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই॥" (ঐ/৬০)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেই পেয়েছি বাঙালী সমাজে নতুন নতুন বৃত্তিধারী জাতির কথা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বাণিজ্যবৃত্তির পাশাপাশি চাকুরীজীবী শ্রেণীর উৎপত্তি হতে থাকে, সুতরাং নতুন নতুন বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এযুগে। বর্ণাশ্রম প্রথার মর্যাদা না থাকলেও উচ্চবর্ণের বর্ণশ্রেষ্ঠতার আত্মম্ভারিতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। পতিনিন্দা অংশে কুলীন কন্যার উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।

জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥" (ঐ/ ২৬৪)

ভারতচন্দ্রের সময়কাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন যুগগত প্রবণতাটি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন— "ভারতচন্দ্র যখন বাংলা দেশে আবির্ভূত হন, তখন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পুরাতন যুগকে বিদায় দিয়া নূতন যুগে পদার্পণ করিতেছে; এই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া তাঁহার কাব্যে যুগের রূপটি ধারণ করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশ হইতে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিল। সাগরপার হইতে আগত বিদেশী বণিক বাংলার শাসনভার অধিকার করিবার সময় আসন্ন হইল। মুসলমান আমলে চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ-সভ্যতার পতনের শেষ ক্ষীয়মাণ দীপ্তি তৎকালীন সমাজের উপর আপনার বিলীয়মান প্রভাবের অন্তিম প্রহর ঘোষণা করিল। অপর পক্ষে ইংরেজ বণিকের অনুগ্রহ-পুষ্ট হইয়া দেশে এক নূতন অভিজাত ধনি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সমাজে তখনও পুরাতন ধারার রেশ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙনের মুখে সমাজের শাসন নাই, চারিদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রবৃত্তির অবারিত উন্মত্ততা রাজত্ব করিতেছে।"[৫] অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব। একালে রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক

বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে ওঠে, শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জনগণের ধন প্রাণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের মতে — "মধ্যযুগের নবাবী জীবন-সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারের সমস্তই লক্ষণই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, বাংলা দেশের আর্থিক দুর্গতির এবং সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার সূচনা এই সময়েই দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার এই অরাজকময় পরিস্থিতিতে ছোট বড় জমিদাররা রাজা নাম ধারণ করে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন রাজা নামধারী প্রখ্যাত জমিদার। ভারতচন্দ্র এই রাজসভারই আশ্রিত কবি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় নানা বিদ্যার অনুশীলন হলেও সেকালের অবক্ষয়ী লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একাধারে দরবারী জীবনের অন্তঃসারশূন্য বিলাস-ব্যসনের বাগাড়ম্বর, অন্যধারে মানুষের নৈতিক চেতনা ও আদর্শবোধের অবসান ঘটেছিল। বস্তুতপক্ষে মোগল দরবার থেকে আগত নৈতিকতা বর্জিত রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণের ফলে দেখা গিয়েছিল রুচি বিকৃতি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাটের প্রতিপত্তি হানি ঘটলেও কিন্তু জাঁকজমক ও আড়ম্বর কমেনি, বরঞ্চ বলা যেতে পারে অন্তিম প্রহরে প্রদীপ নেভার আগে যেন দপ্ করে জ্বলে উঠে অন্তিম শিখা স্পর্শ করেছিল। আর তারই প্রভাব পড়েছিল সাধারণ নাগরিক জীবনেও। সামগ্রিক বিপর্যয়ের মুখে শোষণে-অত্যাচারে জনসমাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে নবাগত ইংরেজি সংস্কৃতি আমাদের সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। প্রবীণ-নবীনের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত বিভেদ, অর্থনৈতিক বিভেদ উভয় সমাজে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর্থিক বন্টন ব্যবস্থার বৈষম্যে দরিদ্র ক্রমশ দারিদ্র্যের গভীরে নিমজ্জিত আর ধনী আরও ধনী হয়ে উঠেছিল। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ জনসমাজ নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। এ সময় হতচকিত জাতির প্রতিনিধি রূপে শাক্ত সাধকেরা আদ্যাশক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দৈবচেতনা ও ভক্তিবাদের উপর বিশ্বাস রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহিরঙ্গ জীবনে চাকচিক্য আড়ম্বর সত্ত্বেও মানুষ হয়ে পড়েছিল নিঃস্ব ও রিক্ত।এই জনসমাজ ধর্ম-কেন্দ্রিক কৌম জীবনের পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। এই আত্মকেন্দ্রিকতা গোষ্ঠীবদ্ধ ও পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরিয়েছিল। আধুনিক জীবনের মর্মমূলে যে আত্মকেন্দ্রিকতা রয়েছে তার উৎপত্তি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। এই ভাব-পরিবেশে ভারতচন্দ্র বড় হয়েছিলেন এবং সচক্ষে দেখেও ছিলেন।জীবনের কোন এক সময় প্রচুর কষ্ট সহ্য করলেও যেহেতু তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, তাই দুঃখ দুর্দশা তাকে স্পর্শ করেনি, কিন্তু রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচিত হল তা অষ্টাদশ শতাব্দীর কলুষতা মুক্ত হতে পারেনি। একারণেই ভারতচন্দ্র প্রথাসম্মত মঙ্গলকাব্যের কবি হতে পারেননি। যে ভক্তিবাদ মঙ্গলকাব্যের নেপথ্যচারী প্রধান শক্তি ছিল, তা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতকীয় যুগ-পরিবেশ তথা সামাজিক ইতিহাস সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়েছে। ঘটনা সংস্থাপনে, চরিত্র গঠনে, বর্ণনায় তা পরিস্ফুট হয়েছে। রাজদরবার থেকে আগত বিলাস-ব্যসন জনজীবনকে গ্রাস করেছিল; নৈতিক শিথিলতা, ব্যাভিচার, ভোগবাদ জীবনকে আচ্ছাদিত করেছিল। বিশেষত ধর্মকথার মোড়কে পরিবেশিত হয়েছিল স্থূল ইন্দ্রিয়লিপ্সা ও কামোত্তেজক বর্ণনা, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাগরিক জীবনের বাক্‌পটুতা. অলঙ্কার সর্বস্বতা। ধরা যাক্ 'রতিবিলাপ' অংশটি, ভারতচন্দ্রের রতি প্রেমিকা নয়, কামোন্মাদ চরিত্র।অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে শিবের ধ্যানভঙ্গের প্রয়োজন হয়েছিল দেবসেনাপতির জন্মের প্রয়োজনে, ভারতচন্দ্র সে প্রয়োজন অনুভব করেননি। ভারতচন্দ্র শিবের ধ্যানভঙ্গ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

"বিবাহ করিয়া তাঁহারে লইয়া
আনন্দে কর বিহার।"(ঐ/৩৪)

তাই শিবঠাকুর ধ্যানভঙ্গ হওয়া মাত্র মদনপীড়া অনুভব করে নারীসঙ্গ সন্ধান করে–

"সিহরিল অঙ্গ ধ্যান হৈল ভঙ্গ

নয়ন মিলিলা হর॥

কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত

নেহালেন চারি পাশে ।

সমুখে মদন হাতে শরাসন

মুচকি মুচকি হাসে॥" (ঐ/৩৩-৩৪)

কিংবা, নলকূবরের বৃত্তান্তে তার উক্তিতে এ'যুগের বিকৃত কামচর্চা ও ভোগবাদের প্রসঙ্গ পরিস্ফুট। তাই নলকূবর দেবপূজা করার চাইতে কামচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করে–

"এ সুখযামিনী এ নব কামিনী

এ আমি নব যুবক।

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া

ধ্যানে রব যেন বক॥" (ঐ/১৫২)

অষ্টাদশ শতকীয় দরবারী রুচিহীন বিকার প্রধানত নাগরিক জীবনকেই গ্রাস করেছিল, তার অনন্য দৃষ্টান্ত 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য। ভারতচন্দ্র লেখনীর প্রসাদে আচ্ছাদিত করে পরিবেশন করলেও তার পরিচয় গোপন থাকেনি। বিদ্যাসুন্দরের কামচর্চার নির্লজ্জ বর্ণনা যুগেরই ফসল। এই বিকৃত জীবনযাপন থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বাদ ছিল না। মালিনী বিদ্যাকে সুন্দরের কাছে ঠেলে দিলে বিদ্যা মালিনীকে তিরস্কার করে বলে -

"বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।

রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট॥" (ঐ/১৮৮)

এই কামচর্চার মূলে ছিল কর্মশক্তিহীন বিকৃত মানসিকতা, বিলাসিতা, মদ্যপান, গাঁজা-ভাঙ্ সেবনের প্রবণতা। তাই ভারতচন্দ্রের কাব্যে সিদ্ধি ঘোটনার ব্যাপক-বিস্তৃত বিবরণ পাই। এই বিকৃত মানসিকতা শুধু ধনীর বিলাসকক্ষেই নয়, ধনীর অন্তঃপুর থেকে সাধারণ জনসমাজেও প্রবেশ করেছিল। তাই ভিখারী শিবের দুই পুত্রের একজন পিতার মত নেশা করে, আরেকজন উপার্জন না করলেও বাবুগিরি করে ('ময়ূরে উড়ায়')। উনবিংশ শতাব্দীতে যে বাবু সমাজ গড়ে উঠেছিল তার মর্ম্মমূলে শুধুমাত্র ইয়ংবেঙ্গলীদের মদ্যপান প্রবণতাই ছিল না, তার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতকেই।

প্রেম চেতনাগতক্ষেত্রেও অষ্টাদশ শতকে বিকৃতি গ্রাস করেছিল। তাই বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলে নরনারীর বৈবাহিত সম্পর্কে একটা প্রেমের আচ্ছাদন ছিল, তাই মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রেমিক নারী পুরুষের ছবি তুলেছেন। অষ্টাদশ শতকে বিবাহ বিষয়টির মূলে ছিল বিকৃত কামচিন্তা, তাই বিদ্যাসুন্দরের প্রেম প্রকৃতপক্ষে কামকুণ্ড মাত্র। রতিবিলাপে, বসুন্ধর-বসুন্ধরা বা নলকূবরের প্রণয়ে প্রেমের স্পর্শ নেই। জনজীবনে এর প্রভাব কতখানি পড়েছিল তার পরিচয় পাই 'দাসু বাসুর খেদ' অংশে। ভারতচন্দ্রের লেখনীতে জন-মানসিকতা এভাবে প্রকাশ পেয়েছে–

"দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে

নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।

নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে

তারে বড় কেবা আছে দুখী॥

. . . .

কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া

এক দিনো শুতে না পাইনু।" (ঐ/৩০৯)

শুধু তাই নয়, শিববিবাহ সভায় উপস্থিত নারীগণের সংলাপে কিংবা সুন্দরকে দেখে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের অবনতি হয়েছিল, ধর্মে,চিন্তায়, মানসিকতায়, আচার-আচরণে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে বাঙালী জমিদারগণ অনেকেই দস্যুদল পালন করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সার্বিক অবনতিতে সমাজে চোর, ডাকাত, বাটপাড়ের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, এদের সামাল দিতে শাসকগণ হিমসিম খেয়েছিল। কারাগার চোর ডাকাতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষেত্রে চোর ডাকাতদের হাতে, পায়ে শেকল বেঁধে নগরে ছেড়ে দেওয়া হত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—

"চকের মাঝেতে কোতয়ালি চবুতরা।
ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায়ে মেগে খায় বাজার বাজার॥" (ঐ/১৬৯)

ছলনা, প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরিতে মানুষ আস্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল, বিশেষত বণিকরা সমাজে নিন্দিত হয়ে পড়েছিল। এযুগের সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ তাই ব্যবসায়বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকৃত ছিল। তবে সাধারণ মানুষের দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা এবং সততার প্রতি সহজাত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে ঠক্ ও প্রবঞ্চক মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র বণিক নয় শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজসভায় সভাসদ্ থেকে দ্বারী পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে খানাদারের উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়-

"ঠক ভরা দরবার   ছলে লয় ঘর দ্বার
খরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই   ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমিসম হয়ে আছি ॥" (ঐ/১৬৭)

নগরের দারোয়ান সুন্দরের নিকট থেকে এক জোড়া ঘোড়া, পাঁচটি হাতিয়ার ঘুষ নিয়ে তবে তাকে রাজসভায় প্রবেশাধিকার দেয়। বণিকদেরও দুর্নীতির পরিচয় পাওয়া যায় হীরা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায়-

"নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায়   মূল রাখা হৈল দায়।
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী   বসিয়াছে সারি সারি
রসের পসরা গীত নাটে॥" (ঐ/১৭৯)

অন্নদামঙ্গলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তনের যে চিত্র পাওয়া যায় তা মূলত গ্রামীণ জীবন প্রভাবিত, যেখানে মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বৃত্তি অনুযায়ী বসতি স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সংগঠন একটু ভিন্নতর বলে মনে করা যায়। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিদ্যাসুন্দর পালায় 'পুরবর্ণন' অংশে বর্ধমান নগরের যে জনবিন্যাসের চিত্র তুলে ধরেছেন তা সম্পূর্ণ নাগরিক সমাজ। যেখানে জাতি. বর্ণ, বৃত্তি ও ধর্মগত কোন বিভেদ নেই, সকল শ্রেণীর মানুষ নগরে সহাবস্থান করেছে অর্থাৎ এখানে মিশ্র

জনবিন্যাস দেখা যায়। কোন বিশিষ্ট জাতি বা ধর্ম বা বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক বসতি স্থাপন নয়, বরঞ্চ সকল শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়ে বসবাস করেছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে —

"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক।
সেকড়া ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর॥
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥" (ঐ/১৭০-১৭১)

লক্ষণীয়, ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় সকল জাতির মানুষ মিশ্রিত হয়ে গেছে। আসলে সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে চেতনাগত পরিবর্তনের ফলে এযুগে মানুষে মানুষে পার্থক্য অনেক কমে গিয়েছিল। মানুষের মূল্য খানিকটা হলেও স্বীকৃত হওয়ায় তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের বাণী শোনা গিয়েছিল। সামগ্রিকভাবে বলা যায় জীবন-জীবিকা ইত্যাদির দ্বারা ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সকল শ্রেণীর মানুষের চরিত্রগত ঐতিহাসিক পরিচয় আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখতে পাই।

মনসামঙ্গলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সংঘর্ষের যে চিত্র পাওয়া যায় কালক্রমে তা সহনশীলতার রূপ পেয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পুনরায় অবনতি ঘটেছিল। হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মতের যেমন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর সমাজের মধ্যে উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের বৈষম্য তীব্র হয়ে উঠলে ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিভেদ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। যেমন হিন্দুধর্মের শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সহজিয়াপন্থীদের মধ্যে তেমনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের আচরণগত, ব্যবহারগত বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। হিন্দুর দেবতা ও ক্রিয়াকর্ম যেমন মুসলমান সমাজে হাস্যস্পদ হয়ে উঠেছিল তেমনি মুসলমানদের ধর্মীয় আচারও হিন্দুর কাছে হাস্যস্পদ ছিল। ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে বাদশাহের (জাহাঙ্গীর)কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুসলমান শাসকের দ্বারা হিন্দুধর্মের উপর যে আঘাতের চিত্র আছে তা ঐতিহাসিক সত্য। আলিবর্দি খান ভ্রাতুষ্পুত্র সৌলদজঙ্গকে কটকের নবাবী দেন, এদিকে মুরাদবাখর সৌলদজঙ্গকে পরাজিত ও বন্দি করেন। আলিবর্দি খাঁর বিজয়ী সৈন্য মহাবদজঙ্গের নেতৃত্বে কটক আক্রমণ করে মুরাদবাখরকে বিতাড়িত করেন এবং তাঁরা বিজিত এলাকা কটকের বিখ্যাত ভুবনেশ্বর মন্দির ধ্বংস করেন। ভারতচন্দ্র এই ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র অঙ্কন করেছেন —

"ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম॥

ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥"(ঐ/১০)

এভাবে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়া, হিন্দুর জাতি নষ্ট করা ছিল মধ্যযুগে সাধারণ ব্যাপার। মানসিংহ পালায় বাদশাহের সঙ্গে ভবানন্দ মজুমদারের কথোপকথনে তৎকালীন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত; একে শুধু মাত্র গতানুগতিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবদেবীকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেছেন, হিন্দুর ধর্মগ্রন্থাদি কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন—

"সয়তান দিল দাগা ভুতেরে পূজায়।
আল চাউল বেঁড়ে কলা ভুলাইয়া খায়।
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥
সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥" (ঐ/৩০৫)

এখানে নিজ ধর্মের আচার-আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে। অপরদিকে হিন্দুর কাছেও মুসলমানী আচার-আচারণ ও ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হয়েছে। ভবানন্দ ইসলামের নিরাকারবাদকে বিদ্রুপ করেছে—

"তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥" (ঐ/৩০৭)

ভারতচন্দ্র দ্রষ্টা মাত্র ছিলেন, যা দেখেছেন নিজে তার মধ্যে না গিয়ে তাঁর কাব্যে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। হিন্দুসমাজের বিধবা রাখা মুসলমানের কাছে নিন্দনীয় ছিল, অপর দিকে মুসলমানের বিধবাবিবাহ ও তালাক প্রথা হিন্দুর কাছে নিন্দনীয় ছিল।হিন্দুরাও যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করত না তা নয়, অষ্টাদশ শতকেও কবি জাহাঙ্গীর বাদশাকে হিন্দুর দেবীর কাছে নত করেছেন। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটলে মুসলমানরা বিপন্ন হয়, এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দুর দেবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়—

"জাহাঁগীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণাপূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥" (ঐ/৩২০)

ভবানন্দের কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে ভারতচন্দ্র তৎকালীন ধর্ম কলহের দিকটিকে পরিস্ফুট করেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নয়, হিন্দুসমাজে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব কতটা প্রকটিত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাস কাহিনীতে।

ভারতচন্দ্রের যুগ কেবল মাত্র দৈব মুখাপেক্ষী নয়, অর্থাৎ দেববাদ বা ভক্তিবাদের যুগ নয়। সমগ্র মধ্যযুগে সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষ দৈব নির্ভরশীল হয়েই থেকেছে— ততখানি দৈব নির্ভরতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর দেখা যায়নি। অন্নদামঙ্গল কাব্যের ছত্রে ছত্রে মানুষের পৌরুষ ও মনুষ্যত্ববোধের

জাগরণ, ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ দেখা যায়। তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেখানে দেবতার সঙ্গে দেবতার বিরোধই মুখ্য হয়ে এসেছে, তার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে মানুষ, সেখানে অন্নদামঙ্গলে দেবতা-মানুষ দ্বন্দ্ব প্রকটিত হয়েছে। ব্যাস চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে এই যুগগত পৌরুষ স্ফূর্তিলাভ করেছে। বৈষ্ণব ও শৈব দ্বন্দ্বে বৈষ্ণব ব্যাস স্বয়ং শিবঠাকুরকে অগ্রাহ্য করেছে, আবার শৈব হয়ে বিষ্ণুকে অগ্রাহ্য করেছে এবং শেষ পর্যন্ত আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। 'ব্যাস গঙ্গা কথোপকথনে' কিংবা 'ব্যাস অন্নদার কথোপকথনে' ব্যাসের উজ্জ্বল পৌরুষ ফুটে উঠেছে। 'ব্যাস ব্রহ্মার কথোপকথন' অংশে ব্যাসের পৌরুষোজ্জ্বল উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য-

"যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন॥" (ঐ/১২৫)

এই মানবীয় শক্তি চেতনাই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগধর্ম। তাইতো মানুষ দৈবানুগ্রাহী না হয়ে "Do or Die" নীতি গ্রহণ করেছে, আর মানুষের কামনা-বাসনা অর্থাৎ বলিষ্ঠ ভোগবাদই প্রধান্যলাভ করেছে। ভারতচন্দ্র তাইতো সামাজিক রীতিনীতি, দেবভক্তিকে উপেক্ষা করে নরনারীর বলিষ্ঠ সম্ভোগ চিত্র অঙ্কন করেছেন কাব্যের বিভিন্ন অংশে। তাই সতী, মহাদেব, গৌরী, কার্তিক, নলকূবর ও নলকূবর পত্নী, ব্যাস, বিদ্যা, সুন্দর এমন কি ঈশ্বরী পাটনী পর্যন্ত পার্থিব ভোগবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছে।ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার মধ্যে এই বলিষ্ঠতা প্রকাশিত। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দৈবানুগৃহীত মানুষ যেখানে শেষ পর্যন্ত কাতর, সেখানে ভারতচন্দ্র দেবীর কাছে সকাতর নন। ঈশ্বরী পাটনীও দেবীর কাছে কাতর নয়, এমন কি দেবীর পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরীর কোন ভাব পরিবর্তন হয়নি। এযুগের মানুষ দৈবানুগ্রহের চাইতে নিজের কর্মতৎপরতায় আস্থা স্থাপন করেছিল, ফলে দৈবপ্রাপ্তি অপেক্ষা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছিল। সুন্দর বিদ্যার রূপ-গুণের কথা শুনে তাকে লাভ করার জন্য বর্ধমান যাত্রা করে। তার বলিষ্ঠ উক্তি—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥" (ঐ/১৬৪)

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের দ্বারা ভারতচন্দ্র বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের কাব্যের বিষয়বস্তু ও বিন্যাস লক্ষ করলে যুগগত পরিবর্তনের ইতিহাস বোঝা সম্ভব।

রাজনৈতিক চালচিত্র : অষ্টাদশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ঘনঘটাময়; ভারতচন্দ্রের কাব্যে সে সময়কার রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ছবি পাওয়া যায়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের আমলে আমীর-ওমরাহগণই রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তি স্বার্থের কারণে মোগল উত্তরাধিকারীগণ মগ্ন থাকলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। বাংলার ছোট ছোট জমিদাররা 'রাজা' নাম গ্রহণ করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। এ পর্বের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস আসলে এক বিভগ্নতার ইতিহাস। ভারতচন্দ্র এ সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলি প্রত্যক্ষ করে ছিলেন, এবং তার বিবরণ দিয়েছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে। ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন আলিবর্দি খান। ইতিপূর্বে মুর্শিদকুলি খানের সময়ে বাংলা স্বাধীন সুবায় পরিণত হয়।আলিবর্দি বিচক্ষণ শাসক হলেও তাঁর রাজত্বকাল নিষ্কন্টক ছিল না। মুর্শিদকুলি খানের জামাতা সুজাউদ্দীন এবং সরফরাজ খান বাংলার শাসক হলে তাঁদের দেওয়ান ছিলেন আলমচন্দ্র রায় রাঁয়া। সেকালে মুসলমান নবাবদের 'খান ই খানান' ইত্যাদি উপাধি থাকত। হিন্দু জমিদার ও রাজাগণ তার অনুকরণে 'রায় ই রাঁয়ান' বা 'রায়রাঁয়া' উপাধি নিতেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে-

"সুজা খাঁ নবাবসুত সরফ্‌রাজ খাঁ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায়রাঁয়া॥" (ঐ/১০)

সে সময়ে আলিবর্দি খান পাটনার নবাব ছিলেন। আলিবর্দি খান মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার নবাব হন; তখন থেকেই বাংলায় আলিবর্দি খানের রাজত্ব শুরু। আর অন্যদিকে আলিবর্দি কটক আক্রমণ করে মুর্শিদকুলি খানকে বিতাড়িত করে ভাইপো সৌলদজঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী—

"ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইলা নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ্ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥ (ঐ)

কিছুকাল পরে সুজাউদ্দীনের আত্মীয় মুরাদবাখর কটক আক্রমণ করে সৌলদজঙ্গকে বিতাড়িত ও কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু আলিবর্দি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কটক আক্রমণ করেন এবং মুরাদবাখরকে পরাজিত করে সৌলদজঙ্গকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আলিবর্দি খান উড়িষ্যা আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালান। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুসারে—

"নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥
লুঠি নিল নারী গারী দিল বেড়ি তোক।
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া।" (ঐ)

বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে যখন অরাজকতা বিরাজ করছিল তখন বাংলার রাজনৈতিক জীবনে আরো একটি আঘাত হানল মারাঠা বর্গীর আক্রমণ। মারাঠা বর্গীরা চৌথ আদায়ের নামে প্রায় দশ বছর বাংলার জনগণের উপর নিপীড়ন চালায়। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী আলিবর্দির সৈন্য-সামন্তরা উড়িষ্যার পুরী ও ভুবনেশ্বর মন্দির লুন্ঠনের দ্বারা হিন্দুধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছিল। তাছাড়া হিন্দু রাজা, জমিদার ও সামন্তগণ দীর্ঘকাল মুসলমান রাজশক্তির হাতে উৎপীড়িত হওয়ায় তারা প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিলেন। এই ঘটনাকে ভারতচন্দ্র বর্ণনা করেছেন—

"আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন॥" (ঐ/১১)

কিন্তু কার্যত প্রথমত আশ্বাস পেলেও বর্গীয় অত্যাচারে সে ভরসা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। বর্গীরা বাংলার গ্রাম কে গ্রাম লুন্ঠন করে, হত্যালীলা, অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ এমন কি নারী লুন্ঠনের মত ঘৃণ্যতম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে বাংলার গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়—

"লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।

গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥

... ...

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥" (ঐ)

কবি গঙ্গারাম বিরচিত 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' কাব্যে, তাছাড়া সে সময়কার বহু পণ্ডিতের বিবরণে বর্গী আক্রমণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। সেকালে রচিত প্রচলিত গ্রাম্য ছড়ায় বর্গী আক্রমণের ভয়াবহতার বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালের বাঙালীর খাজনা যোগাবার সামর্থ ছিল না। সমাজে তখন শাসনের পরিবর্তে শুধু শোষণ বিরাজিত ছিল, কেননা রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। জনৈক সমালোচকের ভাষায় – "প্রজাসাধারণের বিন্দু বিন্দু চোখের জল রৌপ্যচক্রে পরিণত হয়ে নবাবের বিলাস-বাসনা চরিতার্থতা করেছে।"[৭] ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত ছোট বড় জমিদার , রাজা মহারাজাগণ কর ভারে জর্জরিত হন, আলিবর্দি খান কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট থেকে বারো লক্ষ টাকা নজরানা দাবী করেন। ইতিমধ্যে বর্গী আক্রমণ ঘটলে প্রজার ধন-প্রাণ নাশ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র কর দিতে অপরাগ হলে আলিবর্দি তাকে বন্দি করে রাখেন। বর্গীরা নবাবকেও কিছু দিন মুর্শিদাবাদে আবদ্ধ করে রাখে। ভারতচন্দ্রের বিবরণ অনুযায়ী —

"মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।
বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন।
বন্ধ করি রাখিলেক মুরশিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥ (ঐ)

এই সময়ে বর্গী আক্রমণের ফলে আলিবর্দি তাঁর পরিবারবর্গ সহ মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করার সংকল্প করেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের জননী বর্ধমান ছেড়ে মূলাজোড়ে বসবাস শুরু করেছিলেন।[৮] ভারতচন্দ্রের জীবনী পাঠে জানা যায় সেকালের সামন্ততান্ত্রিক শাসনের কুফলের কথা। এ সমস্ত কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সময়ে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রজা শোষণ-নিপীড়নের বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র রামদেব নাগের যে নিপীড়ন চিত্র তুলে ধরেছেন তা সামন্ততান্ত্রিক শাসনেরই ফলশ্রুতি। সামন্ত ভূস্বামীগণ আফগান, রাজপুত, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ রূপে এবং এদের সাহায্যে প্রজা শোষণ করত। দরবারী জীবনের নানান অপকর্মের সহায়কও ছিল এরা, ফলে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। সেকালের বিত্তবান লোকেরা গ্রামের বাইরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান নগরাঞ্চলে বসবাস করত। বর্ধমান, কোলকাতা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এই নগরগুলিই ছিল সামন্ততান্ত্রিক শাসনের কর্মকেন্দ্র। চাকুরী, ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কারণে শিক্ষিত বণিক সম্প্রদায় এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা নগরাঞ্চলে বসবাস করত। প্রজার নিকট থেকে আদায়কৃত রাজস্বের অধিকাংশই রাজদরবারের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় হত। অন্যদিকে জমিদার ও বণিক সম্প্রদায় মুসলমান নবাবের সমর্থন পেয়ে যথেষ্ঠ ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েছিল এবং অস্তায়মান দরবারী জীবনের অন্ধ অনুকরণে চাক্‌চিক্যময় বিলাস-ব্যসনে নিয়োজিত হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের মানুষরা নবাবী পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুগ্রহের

ফলে মুসলমানি সংস্কৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল।নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা এর বাইরে ছিল না। বস্তুত সর্বত্র অনৈতিকতা, প্রাণহীনতা, বাগাড়ম্বর প্রাধান্যলাভ করেছিল; আর তারই অর্থ জোগাতে প্রজারা কর ভারে জর্জরিত হয়। সেকালের ছোট-বড় রাজা মহারাজাগণ সাহিত্য, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তবে তার মূলে ছিল রাজসভা অলঙ্কৃত করার বাসনা, ঐশ্বর্য, বিলাসবহুলতা ও রাজকীয় দর্পের ঘোষণা করার মানসিকতা। কোন আদর্শবোধ বা বৃহত্তর মানব কল্যাণের নিমিত্ত তাঁরা আত্মনিয়োগ করেননি। এছাড়াও তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক কূটনীতি, রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে এঁরাই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুত ইংরেজের বুনিয়াদ এদেশে সুদৃঢ় করতে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে ইঁহারা সকলেই এত জড়িত ছিলেন, নিজেদের স্বার্থ-অন্বেষণে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে, দেশের এই চরম দুর্গতির দিনেও জনসাধারণের কথা ভাবিবার অবসর বা ইচ্ছা তাঁহাদের ছিলনা। যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহারা করিতেন, তাহা তাঁহাদেরই ধর্ম্ম, আদর্শ ও রুচির প্রতিফলন দেখিবার জন্য, এবং সেই রুচি একান্তভাবে ক্ষীয়মাণ সামন্ততন্ত্রের বিলাসব্যসন-লিপ্ত, আত্মরতিময়, ভোগ-প্রমত্ত স্থূল রুচি।"[৮] এ সময় যে দরবারী জীবন গড়ে উঠেছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তাতে দরবারী জীবনের রুচির পরিচয় আছে। সেকালের রাজা-মহারাজার যে রাজদরবার থাকত তাতে মূলত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বৈরাচারীতা ও স্বজনপোষণ নীতি দেখা যেত। রাজসভায় রাজার প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর পদ সকলই রাজা বা জমিদারদের আত্মীয়স্বজনরা ভোগ করতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যাঁরা শোভাবর্দ্ধন করতেন তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর আত্মীয়-পরিজন। তাছাড়া সেখানে কিছু শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিরা স্থান পেতেন । অবশ্য হিন্দু রাজদরবারেও মুসলমান কর্মচারী থাকত; সম্ভবত মুসলমানরা সেনাবাহিনী ও নিম্নশ্রেণীর রাজকর্মচারীর পদ পেতেন। হিন্দু রাজা বা জমিদারের রাজসভায় গণক, বৈদ্য, ভাঁড়, সভাকবি, দেওয়ান, বক্সী, মুন্শী, গায়ক,নর্তক, ঘড়ীয়াল, খানেজাদ, সিপাহী, জমাদার, আমীন, পেশকার, কানুনগো ইত্যাদি রাজকর্মচারী থাকত। হিন্দু রাজার রাজসভায় মুসলমানি রাজদরবারের আদলে কিছু কিছু পদ সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন- হাবশী, মনসবদার ইত্যাদি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়ের মত ভাঁড়, হাস্যর্ণব ভাদুড়ী মহাশয়, রসিকপ্রবর কেনারাম মুখোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ রায়, চাঁদ রায়, শুকদেব রায়, কালিদাস সিদ্ধান্ত, কন্দর্প সিদ্ধান্তের মত পণ্ডিত সভাসদ ও পারিষদ ছিলেন, এঁরা সবাই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাছাড়াও ছিলেন গণক বাঁড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি, বৈদ্য প্রধান গোবিন্দরাম রায়, জগন্নাথ রায়, দেয়ান গোপাল চক্রবর্তী, রায়বক্সী মদনগোপাল, মুনশী কিঙ্কর লাহিড়ী, গোবিন্দ লাহিড়ী, কালোয়াত গায়ক বিশ্রাম খাঁ, নর্তক শের মামুদ, বিদ্যাধর খোষালচন্দ্র, জমাদার মামুদ জাফর, তীরন্দাজ মুজঃফর হুসেন, হাজারি পঞ্চম সিংহ, আমীন নীলকন্ঠ রায়, দেয়ানের পেশকার বিশ্বনাথ বসু, হাবসী ইমামবক্স প্রমুখ। এছাড়াও ভোজপুরী, সোয়ার, বুন্দেলা, মাল প্রভৃতি নানা জাতি নানা ধর্মের কর্মচারীগণ রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন।

অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ অষ্টাদশ শতকেও বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি; যদিও শিল্প ও বাণিজ্য ধীরে ধীরে মানুষের জীবিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছিল। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকে চাকুরীজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। অন্নদামঙ্গল কাব্যে আমরা সেকালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় পেতে পারি।

মোগল আমল থেকেই এদেশে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল; ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু (১৭০৭) পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থা চালু থাকলেও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুদ্রা ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রা চালু থাকলেও রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার ব্যবহারই বেশী ছিল। মুদ্রা ব্যবস্থার নিম্নতম মান হিসাবে কড়ি ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে এবং অষ্টাদশ শতকে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে হীরা মালিনীর বেসাতি অংশে, কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় কড়ি

ব্যবহারের উল্লেখ পাই। বাজারে কড়ির মূল্য ওঠানামা করত, ফলে দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয়ে অসুবিধা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাজারে খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে মেকী মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই মেকী মুদ্রার কথা পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দর হীরা মালিনীকে বাজার খরচের জন্য দশ টাকা দিলে হীরা মালিনী সেই টাকা লুকিয়ে মেকী টাকার ব্যবহার করে—

"সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।" (ঐ/১৭৮)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাজারে পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রকার 'সিক্কা' টাকার প্রচলন ছিল। পুরাতন টাকার পরিবর্তে নতুন টাকা নিতে গেলে 'বাট্টা' দিতে হত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এবং কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল কাব্যে পুরাতন টাকার পরিবর্তে নতুন টাকার 'বাট্টা' প্রদানের চিত্র পাই। মোহরের প্রচলন এসময় প্রায় ছিল না, তবে রাজা-মহারাজারাই সাধারণত মোহর ব্যবহার করত। তাই সুন্দর বিমলা মালিনীকে মোহর দিলে সে অবাক হয়েছে। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনী সুন্দরকে বলেছে—

"পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা।
কোথায় এমন টাকা পাইয়া ছিলা বাপা॥
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি।
সিক্কা সিক্কা কাটিল মণত বাট্টা কমি।
বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত।
থোকে ছয় তঙ্কার বণিক দ্রব্য জাত॥" (কৃষ্ণরাম/৩০)

অন্নদামঙ্গলে অচল টাকা বা খোঁটা টাকার ব্যবহারের কথাও পাওয়া যায়। এসব অপ্রচলিত বা অচল টাকা ভাঙ্গিয়ে নিতে বাট্টা দিতে হত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তারও উল্লেখ পাই। হীরা মালিনী সুন্দরকে বলেছে—

"বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।
যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা॥" (ভারতচন্দ্র/১৮০)

অচল টাকা বা সিক্কা টাকার বাট্টা বদলের বাজার ওঠানামা করত। বিমলা মালিনী তাই বলেছে-

"তবে থাকে টাকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই।
আগুন লাগিল কড়ি বড় কম পাই॥"(কৃষ্ণরাম/৩০)

এর ফলে বাজার ফেরত ব্যক্তির হিসাব দেওয়া অসুবিধা হত। বিমলা মালিনী সুন্দরকে হিসাব দিতে গিয়ে তাই হিম্‌সিম্‌ খেয়েছে—

"লিখিয়া খুজুরা দ্রব্য বুঝ কতগুলা।
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুলা॥
গণ্ডা দশ বারো কড়ি পড়িয়াছে ভুল।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল॥"(ঐ/৩১)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আড়কাট' নামে এক প্রকার মুদ্রা ব্যবহারের কথা পাই। একালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। আড়কটের নবাবের টাকশালে মুদ্রিত মুদ্রাকে 'আড়কাট' বা আড়কট বলা হত।[১০] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে এবং রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে আড়কাট মুদ্রা প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। সেকালে প্রচলিত এরকম বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রাকে সিক্কা টাকায় বদল করে নিতে হত এবং এর জন্য

উচ্চহারে বাট্টা দিতে হত। ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীর বেসাতি প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলা টাকা মোর।" (ভারতচন্দ্র/১৭৮)

টাকাপয়সার বা কড়ি গণনার জন্য কিংবা জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য বিভিন্ন রকম একক ব্যবহার করা হত। কড়ি গণনায় গণ্ডা, পণ, কাহন ইত্যাদি একক ব্যবহার করা হত। আবার গুণতি করা জিনিস, যেমন— পান, সুপারি পণ বা কাহন হিসাবে বিক্রিত হত। চাল, ডাল, চিনির মত দ্রব্যাদি সের হিসাবে পরিমাপ চলত। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় তার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। যেমন—

"তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥
সেবের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
....
দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥" (ঐ/১৮০)

সেরের এক চতুর্থাংশকে 'পোয়া' বলা হত। 'পোয়া' হিসাবেও জিনিসপত্র পরিমাপ হত। কৃষ্ণরামের কাব্যে পাই-

"কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি।" (কৃষ্ণরাম/৩১)

কাঠ বা শাকের মত দ্রব্যগুলি 'আটি' হিসাবে পরিমাপ হত এবং বাজারে বিক্রি হত।ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই—

"আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি।" (ভারতচন্দ্র/১৮১)

কৃষি ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর এবং প্রধান উৎপন্ন শস্য ছিল ধান। কৃষকেরা অন্য ফসলের চাইতে ধান চাষে গুরুত্ব দিত এবং বাংলার উর্বর ভূমিতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হত। প্রধানত তিন প্রকার ধানের চাষ হত বাংলাদেশে, এগুলি হল— আউশ, আমন এবং বোরো।ভারতচন্দ্রের বর্ণনায়—

"মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসূ বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥" (ঐ/৩৪২)

তবে মোটা-সরু, স্বাদে-গন্ধে, আকৃতি-প্রকৃতিতে তিন প্রকার ধানের জাত ছিল অনেক প্রকারের। কৃষ্ণরাম দাসের 'কমলামঙ্গল' কাব্যে বিভিন্ন প্রকার ধানের উল্লেখ পাই, যথা— ধান্যমুড়ি, পারিজাত, কল্পলতা, নাউচিকে, পদ্মদল, বগড়া, ঘিকলা, গঙ্গাজল, সূর্যভোগ, কালিনী, গুয়াশালী, নিসিন্দি, চন্দ্রমণি, জগন্নাথশালী, হেঁউড়্যা, চড়ুইনেচা, কলামচা, কামিনী, জেইন্দি, জামাইনাড়ু, কিয়া, মউলতা, কৃষ্ণকেলী, মাটিচালি, সীতাশালী, খয়েরশালী, রাজমহিষী, বেন্যাবউ, হরগৌরী, রত্নামালি, পাতরা, কর্পূরশালী, কামরাঙ্গা, বেনাফুল, কনকচূর মালতী, সোয়ালতা, রত্নশালী, কেসুরকলি, সুয়াশালী, নীলাবতী, দুধকলম, শীতলজিরা, কমলামোহন, গুনফুলি, মরীচশালী, আকই, পানিকলস, শীতলজটা, দুগ্ধভোগ, এপানিকলস, পাতামল, গুয়াথুপি, গন্ধশালী, ঝিঙ্গাশালী, কালোজিরে, শঙ্খনাদ, মধুতুলসী, রোসন ইত্যাদি শতাধিক জাতের ধানের নাম।" ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বিভিন্ন প্রকার ধানের নাম পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—

"দলকচু ওড়কচু ঘিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা।
কালিন্দী কনকচূর ছায়াচূর পুদি।
শুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবি সুঁদী॥
ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার॥
দাদুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুদসার লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল॥
মাকু মেটে মষিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনিমন হরে॥
সুধা দুধকলম খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্ধে॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু॥" (ঐ/৩৪২)

ধান ছাড়াও পাট, শন, তিল, সরিষা, আখ, বাজরা, চিনা; বিভিন্ন প্রকার ডাল– মুগ, মসুর, মাষ, অড়হর, ছোলা, মটর ইত্যাদি; তাছাড়া যব ও গমের চাষ হত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে তার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের রন্ধন তালিকায় পাওয়া যায় এসমস্ত দানাশস্যের কথা।তাছাড়া কার্পাস, তামাক, রেশম চাষ হত; বিভিন্ন প্রকার শাকসব্‌জি— লাউ, কুমড়ো, বেগুন, মূলা ইত্যাদি; বিভিন্ন প্রকার ফল, যথা— কলা, আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল, তাল, বেল, জামির, চালতা, তেঁতুল, কুল, আমড়া, আনারস ইত্যাদি উৎপন্ন হত। তাছাড়া প্রচুর পান ও সুপারি উৎপন্ন হত। বিভিন্ন প্রকার মসলা — হলুদ, লঙ্কা, আদা, জিরা, রসুন, লবঙ্গ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এসবের প্রচুর উল্লেখের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যের সুলভতার কথা অনুমান করা যায় ।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীনালা খালবিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন প্রকার মাছের প্রচুর ব্যবহার ও নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। মাছ বাঙালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য। মাছ কাঁচা ও শুকনো উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশের ভূমিতে সোনার ফসল ফললেও লোকে অনেক সময় চাষে উৎসাহিত হত না, কারণ কৃষকরা জমিদার মহাজনদের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হত। শিবায়নে কৃষক সমাজের শোচনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক জাতির উত্থানের কথা থাকলেও অধিকাংশ মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত হত না, কারণ ধর্মভীরু বাঙালী প্রবঞ্চনার পেশাকে গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তাই কৃষিই ছিল গ্রাম বাংলার সমাজ-অর্থনীতির মূল বুনিয়াদ।

শিল্প ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে কৃষির পরেই শিল্পের স্থান ছিল। সেকালে ক্ষুদ্রশিল্পের যথেষ্ট প্রসার ছিল। ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যে— বস্ত্রশিল্প, স্বর্ণশিল্প, লৌহশিল্প, কাঠ-বাঁশ ও বেতের শিল্প ইত্যাদি প্রধান। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বণিকদের হাতে কাঁচা পয়সা এসেছিল। পেশাজীবী মানুষরা কাঁচা পয়সার লোভে শহরমুখী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে দেখা যায় বণিক ও শিল্পীরা নগরবাসী। কালকেতুর গুজরাট নগরে পেশাজীবী মানুষের আগমন চিত্র থেকেও একথা অনুমান করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকে শিল্পী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নগরবাসী হয়ে পড়েছিল। এ শতকে বাংলার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল এবং তার চাহিদাও ছিল ব্যাপক। বাংলার তাঁতিরা শ্রীরাম, মেঘডম্বর,বাঘাম্বর, তসর, বুটিদার ইত্যাদি শাড়ী তৈরী করত, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে বা ঢাকাই বুটিদার বস্ত্রের বিশেষত্বের কথা আছে—

"বনাত মখমল পট্টু ভূষণাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাশা ॥"[১২]

বাংলার মেয়েরা কাপড় তৈরীর জন্য তুলা থেকে সুতা কাটত; কুলীন-অকুলীন পরিবারের মেয়েরা সুতা কাটার অর্থে জীবিকা নির্বাহ করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কুলীন কন্যার সুতা কাটার কথা আছে।
'গোর্খবিজয়' কাব্যে এক নারীর উক্তিতেও সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহের কথা পাই। যেমন—

"আহ্মারে কাটিমু সূতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।
দিনে দিনে বেশ হইব সম্পদ বাড়িআ যাইব
তবে জাইব কাথা আর ঝুলি ॥"[১৩]

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার বিভিন্ন শিল্পের প্রচুর বর্ণনা আছে। অষ্টাদশ শতকে শিল্পেরক্ষেত্রে অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। বর্গী আক্রমণ, দস্যুভয় ও শাসকের শোষণের ফলে দেশীয় শিল্পের অবনতি দেখা দেয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই তৎকালীন দেশীয় শিল্পকর্মের বিবরণ খুব বেশী নেই।

বাণিজ্য ঃ মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল ছাড়া পরবর্তীকালে যে সমস্ত মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল তাতে বণিক সম্প্রদায় ও তাদের বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ নেই। ধরা যেতে পারে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছিল। মুহম্মদ আবদুল জলিল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মোগল আমলের কিছুটা পূর্ব থেকেই বাঙালী বণিকেরা বহির্বাণিজ্য ছেড়ে অন্তর্বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেছিল। কারণ সুলতানি যুগের শেষপর্বে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বে গৌড়ের সিংহাসন টালমাটাল তখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। গৌড়ের শাসকের এই উপদ্রব দমনের ক্ষমতা ছিল না বরং তারা পর্তুগীজ দস্যুদের ভয় করত। তৎকালীন গৌড়েশ্বর মামুদ শাহের সাহায্যে পর্তুগীজরা এদেশে বাণিজ্য কুঠী নির্মাণ করে এবং এদেশীয় বহির্বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ করে।[১৪] বাংলার বণিকরাও তৎকালীন পর্তুগীজদের বহির্বাণিজ্যের দৌলতে লাভবান হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় তৎকালীন বণিকগণ ঘরে বসেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। কবিকঙ্কণের কাব্যে তার সাক্ষ্য আছে। আসলে এই পর্বে বহির্বাণিজ্য বিদেশী বণিকদের হাতে চলে গিয়েছিল। বাংলার দ্রব্য তারাই বিক্রয় করত আর দেশীয় বণিকগণ অন্তর্বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। বিদেশী বণিকগণ বাংলার সস্তা দ্রব্য কাঁচা পয়সায় কিনে নিত এবং চড়া দামে বিক্রি করত। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেশবিদেশ থেকে আগত এই বণিকদের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরের গড় বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।

সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী॥

. . . .

ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।

আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥

সেই গড়ে নানাজাতি বৈসে মহাজন।

লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন।"(ভারতচন্দ্র/১৬৮)

ভারতচন্দ্র শুধু বৈদেশিক বণিকদের কথাই বলেননি, ভারতবর্ষের ভিন্ন প্রদেশের বণিকদের কথাও বলেছেন—

"দ্বিতীয় গড়েতে দেখ যত মুসলমান।

সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥

তুরকী আরবী পড়ে ফারসী মিশালে।

ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥" (ঐ)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক দুরবস্থা এবং পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের ফলে বাংলার কৃষি ও শিল্পের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অবনতি হয়েছিল। মধ্যযুগে নগর সংলগ্ন এলাকায় বাজার গড়ে উঠেছিল। যেখানে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনা করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান, কৃষ্ণনগরের মত নগর এলাকার পাশে বাজারের চিত্র পাই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে হীরা মালিনীর বেসাতি কিংবা কৃষ্ণরাম দাসের 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে বিমলা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় বাজারের চিত্র আছে। রামপ্রসাদ সেন তৎকালীন বর্ধমান নগরের বাজারের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু তাতে অধিকাংশই বিদেশী বণিকরা দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করে বিদেশে চালান দিচ্ছে আর তার পরিবর্তে বিদেশী দ্রব্য আমদানি করছে।[১৫] একালে বাংলার বস্ত্রশিল্প, অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্প ও বাণিজ্য বর্গীর আক্রমণ, দস্যুর উৎপাতের ফলে ধ্বংস হয়েছিল, অপরদিকে বাজারের মালিক ও জমিদারদের অতিরিক্ত কর ভার চাপিয়ে দেবার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত ছিল না। অন্নদামঙ্গলে হীরা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় তার কিছু পরিচয় আছে। দস্যুদের উৎপাত ও লুন্ঠন অনায়াসভাবে চলত, ফলে তাঁতি, শিল্পী, বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় এক প্রকার বন্ধ করেই দিয়েছিল। বাঙালী সমাজে সাধারণ মানুষ ব্যাবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিছু বৃত্তিজীবী মানুষ নিজের উৎপাদন স্থানীয় বাজারে বিক্রি করত। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস'; কিন্তু ধর্মভীরু বাঙালীর কাছে বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণীয় ছিল না। তাই কৃষিজীবী বাঙালী শিবঠাকুর কৃষিকাজই আরম্ভ করেছিল। ভারতচন্দ্রের গৌরী কিন্তু শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে, কেননা শুধুমাত্র চাষবাসের দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভব ছিল না। তাই গৌরীর অভিমত —

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ

রাজসেবা কত খচমচ।"(ঐ/৬০)

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে চাকুরীবৃত্তি বা 'রাজসেবা' ততখানি গ্রহণযোগ্য হয়নি। রামেশ্বরের কাব্যেও দেখা যায় ব্রাহ্মণের চাকুরীবৃত্তি স্বীকৃত ছিল না। কেননা জাতিগত অভিমান পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখি 'রাজসেবা' বা চাকুরীবৃত্তি 'খচমচ' মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।সেকালে রাজা বা জমিদারের সেনাবাহিনী ও উচ্চপদস্থ রাজপদে, যথা— দেওয়ান, আমীন, পেশকার বিভিন্ন পদে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষরা চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করত। ভারতচন্দ্র স্বয়ং চাকুরীবৃত্তি গ্রহণের জন্য ফারসী ভাষা শিখেছিলেন।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের

প্রভূত উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক জীবনে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার সুফল ভোগ করেছিল সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষ— বণিক সমাজ, জমিদার, মহাজন, সামন্তরাজ ও রাজকর্মচারীগণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত কম থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা কম ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন বাংলাদেশের জনজীবনের ঐশ্বর্য ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি আছে। এমন কি আলিবর্দি খাঁর সময়কালে বর্গী আক্রমণ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও অল্পকালের মধ্যেই জনজীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ফিরে আসে। রামপ্রসাদ সেনের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে বর্ধমান নগরের জনজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। কবির বর্ণনায়-

"স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক
নাহি কোন অধর্মের লেশ।"[১৬]

বস্তুতপক্ষে, অষ্টাদশ শতকে রাজদরবার ও নগরজীবনের যে সমৃদ্ধির কথা পাওয়া যায়, রাজদরবার ও নগর সংলগ্ন বাজারের যে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা ছিল মুষ্ঠিমেয় রাজসভাসদ্ ও অভিজাতবর্গের ভোগ্য। ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায় নবাব ও ইংরেজ বণিকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে প্রতিপত্তিশালী ও অপর্যাপ্ত বিত্ত লাভ করেছিল, পক্ষান্তরে সাধারণ জনজীবন ছিল অন্ধকারময়। সাম্প্রদায়িক শ্রেণীগত ভেদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও গভীরভাবে প্রকটিত হয়, তার কারণ উৎপাদিত অর্থ বণ্টনের বৈষম্য এবং সাধারণ জনজীবনে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যেও তার পরিচয় আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কৃষি ও বাণিজ্যের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থে সমৃদ্ধ হলেও অল্পকালের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।শাসকের শোষণ-পীড়নে, কর ভারে গ্রামীণ জনজীবন ন্যুব্জ হয়ে পড়ে।অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই ভগ্ন আর্থিক অবস্থার কথাই পাওয়া যায়।

কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মানুষ কৃষিকেই আশ্রয় করেছিল। কৃষিতে শাসক ও মহাজনের থাবা প্রসারিত থাকলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিজাতদ্রব্যের অভাব হয়তে ছিল না, কিন্তু কৃষি বিনষ্ট হলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, যথা—চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, চিনি, ময়দা বাজারে মহার্ঘ হয়ে ওঠে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কথা আছে। হীরা মালিনী বাজারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেছে—

"মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥" (ভারতচন্দ্র/১৮১)

কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিমলা মালিনীর বেসাতি বর্ণনায় তৈজসপত্রের মহার্ঘতার পরিচয় পাওয়া যায়।শুধু তাই নয়, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে বাজার দর বৃদ্ধি পেত। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও দ্রব্যের মানগুণ কিন্তু হ্রাস পেয়েছিল। কৃষ্ণরামের বর্ণনানুসারে—

"ঘৃতের দোকানে দেখি এত কেন চোক।
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক॥
কিনিতে চিকন চিনি কত হুড়াহুড়ি।
প্রলয় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি॥
বিবাহ অনেক ঠাঞি কর্ণবেধ কারো।
দ্রব্যের দর তাই বাড়িয়াছে আরো॥
পশিতে নারিলাম গুয়া পরশের বাড়া।
পোণেক দুই পোণ সেহ নহে ছাড়া॥
যেন তেন ছাঁচের আছয়ে এক গুণ।

সবে মাত্র বাজারে সুলভ আছে চুন॥" (কৃষ্ণরাম/৩১)

লক্ষণীয় বিষয়, মধ্যযুগের কাব্যে যে দ্রব্যমূল্য তালিকা পাওয়া যাচ্ছে তা অত্যন্ত কম; দৈনন্দিন তৈজসপত্রের সহজলভ্যতা এতে অনুমেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের খুব স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, কারণ তাদের ক্রয় ক্ষমতা অত্যন্ত কম ছিল। ধন বন্টন ব্যবস্থার অসাম্যের ফলে দ্রব্যমূল্য কম সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। অন্নবস্ত্রহীন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের চিত্র কম নেই এযুগের সাহিত্যে। তার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হরিহোড় জননী পদ্মিনী। ঘুঁটে বিক্রি করা তার জীবিকা অর্থাৎ এযুগের বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে মানুষ ন্যূনতম জীবিকা আশ্রয় করেছিল, তাই পদ্মিনীর পরিধানে পদ্মপাতার আচ্ছাদন। ভারতচন্দ্র লিখেছেন—

"তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি॥ (ভারতচন্দ্র/১৩৯)

হরিহোড়ের জীবিকা ঘুঁটে বিক্রয় করা এবং বহু সংখ্যক মানুষ এভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে স্ত্রীর ন্যূনতম শাঁখা পরার শখ পূরণের ক্ষমতা শিবঠাকুরের মত সাধারণ মানুষের ছিল না। অন্নদামঙ্গলে সাধারণ অন্নবস্ত্র জোগানোর ক্ষমতাও মানুষের নেই। হরিহোড়ের উক্তিতে একথা স্পষ্ট—

ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে।

....

এই দেখ বৃদ্ধ বাপ অন্ন বিনা পান তাপ
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।" (ঐ/১৪৩)

সাধারণ অন্নবস্ত্র ছিল মহার্ঘ, তাতে অতিথির আগমন হলে মানুষের দুর্দশার এক শেষ হত। বর্গী আক্রমণের পরবর্তীকালে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল তার বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে। ক্রমাগত বিপর্যয়ের ফলে এক শ্রেণীর দরিদ্র মানুষ ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল। শিবায়নে যে শিব কৃষিকার্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা খুঁজেছিল সেই শিব ভারতচন্দ্রের যুগে আবার ভিখারীতে পরিণত হয়েছিল। ভিক্ষা চাইবার লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু ভিক্ষা দেবার মত লোক ছিল না; কেননা সকলের ঘরে অন্নাভাব। তাইতো শিবঠাকুর যেদিকে যায় সেদিকে শুধু অন্নাভাব। কবির ভাষায়—

"যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥" (ঐ/৬৫)

ঘরে ঘরে অন্নের জন্য কাতরতা, হাহাকার ও ক্রন্দনধ্বনি। ভারতচন্দ্রের বর্ণনানুসারে—

"কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥" (ঐ/৬৬)

সমাজ মানসের সকরুণ আর্তি ভারতচন্দ্রের কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। সাধারণ মানুষের জীবনে অন্নের চাইতে প্রিয় বস্তু আর কিছুই ছিল না। কোন রকমে কায়ক্লেশে মোটা ভাত-কাপড়ে বেঁচে থাকাই মানুষের একমাত্র কাম্য ছিল, তাই দেবীকে কাছে পেয়েও ঈশ্বরী পাটনীর মত অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ধন-রত্ন-মণি-মুক্তার পরিবর্তে খেয়েপড়ে বেঁচে থাকা প্রার্থনা করেছে এবং সন্তানের জন্যও ঐ একই কামনা করেছে। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনা—

"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। " (ঐ/১৫৯)

এছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কৃষি ও বাণিজ্যে লব্ধ অর্থের দ্বারা যারা ঐশ্বর্যবান হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ ও অত্যাচারে কৃষি ও বাণিজ্য নষ্ট হলে তাদেরও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে, ফলে তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না। সমাজের অপেক্ষাকৃত ধনীরাও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তাইতো ভারতচন্দ্রের শিবঠাকুর বলেছে—

"লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই আর যাব কার ঠাঁই
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই॥
. . . .
অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ॥" (ঐ/৬৬-৬৭)

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর বিশেষত্ব হল হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, ধন ও ঐশ্বর্য দান করা। কিন্তু ভারতচন্দ্রের দেবী অন্নপূর্ণা হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দেবার দেবী নয়, সে নিখিল জনের অন্নদাত্রী দেবী। একদিন সমাজ ইতিহাসের তাগিদ থেকে সাধারণ মানুষ অমঙ্গলকারী দেবীকে হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। অন্নদামঙ্গলের পরিকল্পনার পিছনে আর্থসামাজিক প্রয়োজন ছিল বেশী। নিরন্ন মানুষ অন্নের তাগিদে অন্নপূর্ণার আরাধনা করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে অর্থ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ফলে মানুষ অন্নপূর্ণা অর্থাৎ মুদ্রাদেবীর আরাধনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'মুদ্রাদেবী' বলেছেন সে হল ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা। তাইতো ভারতচন্দ্র এযুগের মানুষের অর্থনৈতিক চালচিত্র সম্পর্কে মোক্ষম কথা বলেছেন— দেবী অন্নপূর্ণার পূজা করলে কি হবে? ভারতচন্দ্রের দেবীর উক্তিতে—

"আমার পূজার ফলে বড় সুখের রবে।
মাটিমুটা ধর যদি সোনামুটা হবে॥" (ঐ/১৪৫)

মুদ্রাই মানুষকে সামাজিক প্রতিপত্তি, মন ও কৌলীন্য দিয়েছে। অর্থ কৌলীন্যের জোরেই নীচু শ্রেণীর লোকের কৌলীন্য প্রাপ্তি এযুগের অন্যতম বিশেষত্ব বলে মনে করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরীবৃত্তি সমাজে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা না পেলেও এক শ্রেণীর মানুষ চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। ধনী জমিদার বা রাজা-মহারাজাদের সেনাবাহিনীতে সৈন্যবৃত্তি বা রাজসভায় বিভিন্ন বৃত্তিতে মানুষ নিযুক্ত হত। তাছাড়াও সমাজে নতুন নতুন বৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল, একালের নতুন বৃত্তিগুলি হল— মুনশী, বখশী, উকিল, আরজবেগী, খাজাঞ্চি, পোদ্দার, হিসাবের মুহুরী, নিকাশের মুহুরী, বাজে জমাদার, দপ্তরী, ঘড়েল ইত্যাদি। এই সমস্ত বৃত্তিধারী মানুষরা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল মধ্যসত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের মূলে এই শ্রেণীর মানুষরা ছিল। বাংলাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা হলে চাকুরী বৃত্তিজীবী শ্রেণীর অর্থাগমের পথ আরও সুগম হয়।

ধর্মজীবন ঃ বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে হিন্দুধর্ম ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য

শাসিত হিন্দুসমাজ সেদিন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষার মানসে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। নানা রকম পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু সমাজপতিদিগকে সেদিন এগিয়ে চলতে হয়েছিল। বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাঙালীর হিন্দুধর্মে অবনমন দেখা গিয়েছিল, মধ্যযুগের সাহিত্যে তার পরিচয় আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত তান্ত্রিক ধর্ম পুনরায় প্রসারলাভ করতে থাকে। এই পর্বে বৈষ্ণবধর্ম ও শাক্তধর্মের বিরোধের ভাব অনেক হ্রাস পায়।[১৭] কেননা শাক্ত সাধকগণ কৃষ্ণ ও কালীকে একাকার করে দেখেন। শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদ সেনের সাধনায় কালী, কৃষ্ণ, শিব ও রাম এক হয়ে গিয়েছিল—

"ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম
সকল আবার এলোকেশী।
বিশ্বরূপে ধর সিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী
ওমা রাম রূপে ধর ধেনু
কালী রূপে করে অসি॥"[১৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শৈবধর্ম আপন স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলেছিল। সমগ্র মধ্যযুগে শৈবধর্মের স্থলে শাক্তধর্মের প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়। জীর্ণ শৈবধর্ম ও সমাজের উপরে শাক্তধর্মের প্রলেপ পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে শৈবধর্ম পুনরায় নতুনভাবে জাগরিত হবার প্রয়াস পায় কিন্তু শৈবধর্ম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বৈষ্ণবধর্ম ও ইসলামের প্রভাবে শৈবধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে; এই পর্বের সাহিত্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিবকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মঙ্গল সাহিত্য রচিত হলেও শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এই পর্বে বৈষ্ণব-শৈব দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যাস কাহিনীতে বৈষ্ণব ও শৈবের দ্বন্দ্ব দেখা যায় তার পূর্বাভাস রচিত হয়েছে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে। তবে এর মধ্যেও প্রাচীন শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠার ক্ষীণ লক্ষণ দেখা যায় রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী সমাজে লৌকিক শিবের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে তিরোহিত হয়ে চলেছিল এবং কালক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব অর্থাৎ শিব ও বিষ্ণুকে এক আসনে বসিয়ে পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন-"পরবর্তী বাংলার সমাজে লৌকিক শৈব ধর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ক্রমে বাংলার হিন্দু সমাজে লৌকিক শিবের প্রাধান্য একেবারে লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালীর নৈতিক জীবনের যে স্তর হইতে লৌকিক শিবের জন্ম হইয়াছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন ক্রমে অনেক উর্ধ্বে আসিয়া উপনীত হইল। সেইজন্য বাংলার প্রাচীনতম সমাজ হইতে জাত দেবচরিত্রসমূহ পরবর্তী বাংলার উন্নততর সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইল না। ইতিমধ্যে সমাজের সকল স্তরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব কার্যকর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফলে শিবের পার্শ্বে নারায়ণের সিংহাসন স্থাপিত হইয়া গিয়াছে।"[১৯] অষ্টাদশ শতকে ভক্তিবাদ বা যুক্তিবাদ কোনটাই সমাজে সম্ভব ছিল না। তাই ভক্তিবাদের স্থানে দেখা গিয়েছিল ধর্মকলহের বাগাড়ম্বর, তবে স্থির বিশ্বাস কোন ধর্মের মধ্যেই ছিল না, তাই ব্যাসদেব বৈষ্ণব রূপে শিব নিন্দা এবং শৈব রূপে বৈষ্ণব নিন্দা করেছে। ভারতচন্দ্র ব্যাসের এই ধর্মধ্বজী স্বরূপ সম্পর্কে শিবের উক্তিতে বলেছেন—

"দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥" (ভারতচন্দ্র/১০০)

সেকালের কবিগণ সমাজ ইতিহাসের এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁরা কাব্যে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছিলেন। এই সূত্র ধরেই শিবের সঙ্গে নারায়ণের অভেদত্বের কথা বলা হয়েছিল। কখনো কখনো শিব ও নারায়ণকে এক আসনে বসাতে গিয়ে লৌকিক শিবের গা থেকে গ্রাম্য উপকরণগুলি সরিয়ে হরি ও হরকে

সমন্বিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের শিব কাহিনীতে শিবের এই রূপই প্রকটিত। রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের শিব চরিত্র ঠিক বৈদিক রুদ্রও নয় আবার মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত লৌকিক শিবও নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে কতকগুলি শিবমাহাত্ম্যসূচক এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্যসূচক পুরাণকাহিনী সংযোজনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আদর্শ থেকে আগত দেবচরিত্রগুলির সমন্বয় সাধন করে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে দেবতার এই মূর্তিই রচিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাই বিষ্ণুকে নিন্দার জন্য শিব স্বয়ং নন্দীকে উপদেশ দিয়েছে—

"মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি ত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত না চাহেন তারে॥
হরি হর দুই মোরা অভেদশরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥" (ঐ/১০০-১০১)

আবার বিষ্ণু ভক্ত ব্যাস শিব নিন্দা করলে স্বয়ং বিষ্ণু ব্যাসকে এই বিভেদের জন্য তিরস্কার করে-

"যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাববলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবেরে যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিবপূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥(ঐ/৯৮-৯৯)

অর্থাৎ এক দেবতার পূজা করে অন্য দেবতার অবহেলা করলে কোন দেবতার পূজা সফল হয় না। বাঙালী হিন্দুরা স্বভাবত পঞ্চোপাসক, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় তাদের আস্থা— অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী হিন্দুর ধর্মগত আদর্শ এরূপ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুধু হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায় নয়, হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্ম সম্প্রদায় এই সমন্বয়ের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল, সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর এই সম্মিলিত দেবমূর্তি। হিন্দুর হরি মুসলমানের ফকির রূপে অবতার গ্রহণ করে। 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা'য় ভারতচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সমন্বয়ের এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন। এখানে কবি লিখেছেন—

"কলিযুগে অবতরি সত্যপীর নাম ধরি
প্রণমহ বিধির বিধাতা॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান্।
ফকির শরীর ধরি হরি হৈলা অবতরি
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান॥(ঐ/৩৯১)

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আদর্শ থেকে এই শ্রেণীর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। এই আদর্শ সমাজ মানসে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল তা বলা শক্ত, তবে উভয় শ্রেণীর মানুষকে নাড়া দিয়েছিল বলেই সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যেও এই আদর্শের প্রচার দেখা যায়।

এযুগের সমাজ মানসে নিষ্কলুষ ভক্তিভাবের জায়গায় স্থান গ্রহণ করেছিল অবিশ্বাস, আড়ম্বরপ্রিয়তা ও জৌলুস। দেবদ্বিজে মানুষের নিষ্ঠা ও ভক্তি তিরোহিত হয়েছিল। তাইতো ভারতচন্দ্র দেবতাকে নিয়ে খেলা করেছেন, তামাশা করেছেন। যে মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা মূলে ভয়-ভক্তি কাজ করেছিল, কবি ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক দেবতার স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য করে দেবদেবীর যশোগাথা রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন; ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবীর প্রতি সেই আস্থা ও ভক্তি নেই। প্রথাগত রীতি অনুযায়ী দেব বন্দনা করলেও সেখানে ভক্তির চন্দন তিলক নেই। ভারতচন্দ্র কাব্যে চৈতন্য বন্দনা করেননি। সম্ভবত পোষ্টা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত বলে তাঁর মন রক্ষার জন্য চৈতন্য বন্দনা করেননি। ভারতচন্দ্র ব্যক্তি জীবনের এক পর্বে সন্ন্যাসী হয়েও তার সারবত্তা খুঁজে পাননি, ফলে পুনরায় গৃহধর্ম গ্রহণ করেন। দেবী অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের আনুগত্য ও ভক্তি অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় কাব্য রচনা করেন— দেবীর আজ্ঞায় নয়। তাই দেবী সরাসরি ভারতচন্দ্রকে কাব্য রচনার নির্দেশ দিতে পারেনি অর্থাৎ দেবীর ইচ্ছা হলেও কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমতি ভিন্ন ভারতচন্দ্র কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন না। তাই দেবী মাতৃসুলভ বিনয়ে ভারতচন্দ্রকে বলেছে—

"অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥"(ঐ/১৪)

এযুগে দেবতার প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ দেবতাকে নিজ খামখেয়ালী ও আপন স্বার্থ প্রতিপূরণে ব্যবহার করতে চেয়েছে। অইতো দেখা যায় ব্যাসদেব বারবার দেবতাকে খেয়াল খুশী মত রদবদল করে নিয়েছে। বিষ্ণুকে ছেড়ে শিবকে গ্রহণ করেছে, আবার বৈষ্ণবীয় বেশভূষা পরিত্যাগ করে শৈবধর্মের আচার গ্রহণ করেছে, কারণ বিষ্ণু তার আকাঙ্ক্ষা প্রতিপূরণে সমর্থ হয়নি। তাই ব্যাসের ক্রোধ —

"বিষ্ণুর দেখেছি গুণ নন্দী করেছিল খুন
কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই॥" (ঐ/১১২)

মানুষ দেবতার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এভাবে। আর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেবীকে মানুষ তার অপকর্মের সহায়ক করে তুলেছে। আসলে মানুষ ধর্ম অপেক্ষা কামনা-বাসনা, স্বার্থ ও ক্ষুধাকে বুঝেছিল। ক্ষুধার্ত ব্যাস কাশীবাসীকে অভিশাপ দিয়েছিল, কারণ শিব ব্যাসের ভিক্ষা বন্ধ করেছিল। অন্নপূর্ণা শিবকে তাই বলেছিল–

"এখনো যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আর বার দিবে শাপ পেটের জ্বালায়॥" (ঐ/১০৪)

'পেটের জ্বালা'র মূল্য বুঝেছিল বলেই ঈশ্বরী পাটনী ভক্তি-মুক্তি-মোক্ষ না চেয়ে সামান্য পার্থিব প্রার্থনা করেছিল। সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, বার-ব্রত অবশ্যই প্রচলিত ছিল, কিন্তু মানুষের কাছে এসব আচারের খুব একটা মূল্য ছিল না। তাইতো অন্নপূর্ণার ব্রততিথি অপেক্ষা সুখ ও কামনার মূল্য বেশী। তাই বসুন্ধর বলেছিল——

"অন্নপূর্ণা কি করিবে অষ্টমী কি সুখ দিবে
যে সুখ পাইবে রতিসুখে।" (ঐ/১৩৫)

কাঞ্চনমূল্য সমাজে স্বীকৃত হওয়ায় অর্থের মানদণ্ডে সবকিছু স্থির হতে শুরু করেছিল। তাই নলকূবরের সদর্প উক্তি—

"জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন।

আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥" (ঐ/১৫২)

সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্যে যেখানে দেবতা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এযুগে দেবতাও মানুষের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছে। তাই মানুষের কাছে দেবতার পরাজয়। অন্নপূর্ণাকে তাই মানুষের মূল্য স্বীকার করতে হয়েছে। শিবকে অন্নপূর্ণা বলেছে—

"কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥" (ঐ/১০৪)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ এক নব মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা।

ভারতচন্দ্র ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি কতখানি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিলেন তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ বর্ণনায়। ভারতচন্দ্রের ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করেছে—

"হাস্যতুণ্ড যজ্ঞকুণ্ড পূরি পূরি মূতিছে।"(ঐ/২৪)

বস্তুত কোন মঙ্গলকাব্যের কবি ধর্মাচরণের প্রতি এত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে পারেননি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমাজ সংস্কার , ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা, ধর্ম সংস্কার এবং সমন্বয়বাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরুষ তো বটেই নারীও তার আদর্শ ও মূল্যবোধকে হারিয়ে ফেলেছিল। পুরুষরা নারীকে ভোগের সামগ্রী রূপে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল। এযুগের নারীও যেন পুরুষের চরিত্রহীনতার প্রতিশোধ স্বরূপ চরিত্রহীনা হয়ে পড়ে, দেহ সম্ভোগের জন্য পরপুরুষকে প্রলুব্ধ করে। অন্নদামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দরের দেহ সম্ভোগের চিত্রে, নারীগণের পতিনিন্দা বর্ণনায় বাঙালী নারীর সতীত্ব, নমনীয়তা, সংযম ও সহনশীলতার অভাব দেখা যায়। আর একারণেই রামপ্রসাদের মত সাধক কবিও যুগরুচির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিদ্যাসুন্দরের মত অশ্লীল কাব্য রচনা করেন। আসলে বিদ্যাসুন্দরের কামলীলা বর্ণনায় সুন্দরের সুড়ঙ্গ খনন সমাজ মানসের চরম অবনমন সূচিত করে। পুরুষ চরিত্র নারী অপেক্ষা আরও হীন ছিল। দেবতাকেও মানুষ তার ভোগোন্মত্ততার সহায়ক হিসাবে ব্যাবহার করেছে। ধর্মীয় তত্ত্ব দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা করে নিজেদের স্খলনের সহায়ক রূপে ব্যবহার করেছে। এসমস্ত বিবরণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের নির্মম সত্য।

বাঙালীর আচরণগত পরিচয়, নামকরণগত পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায়। যেমন বিবাহ সভায় এয়োদের আচরণ, বর দেখতে আগত স্ত্রীদের আচরণ বাঙালীর নিজস্ব। আবার নামকরণেরক্ষেত্রে দেবতার নামেই সন্তানের নামকরণ করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার পরিবর্তে লৌকিক নামকরণ করতে দেখা যায়, এর দ্বারা দেবতার প্রতি ও ধর্মের প্রতি মানুষের অনাস্থা প্রকাশিত।

তথ্যপঞ্জী

১. ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ভূমিকা অংশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, পৃঃ ২২।
২. ঐ , পৃঃ ২২।
৩. ঐ ,পৃঃ ২৩।
৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১২০।
৫. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৯৩-৭৯৪।
৬. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪।
৭. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ, পৃঃ ৩।

৮. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮।

৯. ঐ, পৃঃ ৭।

১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৬২।

১১. কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩০৪-৩০৫।

১২. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতি সংস্করণ, পৃঃ ৮।

১৩. গোর্খবিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশ, পৃঃ ৪৫।

১৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৭০-১৭২।

১৫. ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩।

১৬. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৭।

১৭. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৩৪।

১৮. রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী, বসুমতি সংস্করণ, পৃঃ ২২।

১৯. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৪৪-২৪৫।

সপ্তম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন

সপ্তম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল কাব্য বিশ্লেষণ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক সময়কালের মধ্যযুগীয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে; প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সামাজিক ইতিহাসের একটা বিবর্তন-ধারা ধরা পড়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এই বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য-ধারা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক চরিত্রের বিবর্তন-চিত্র এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ডঃ অতুল সুর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় 'বিবর্তন' শব্দটি প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন – " 'বিবর্তন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন'। 'বিবর্তন' শব্দের সঙ্গে অবনতি বা উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই।"[১] বর্তমান নিবন্ধে 'বিবর্তন' শব্দটিকে অনুরূপ অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত কালক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক ইতিহাসের যে রূপান্তর ঘটেছে তাকেই প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একথা ঠিক যে, বাঙালী সমাজ অনেকটা রক্ষণশীল; তবে এই রক্ষণশীলতা বাঙালীর দোষ ও গুণ উভয়ই। সমাজের চারিদিকে রক্ষণশীলতার লক্ষ্মণরেখা টেনে দেওয়ায় যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েও বাঙালী জাতির সংস্কৃতি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বিদেশী-বিজাতীয় শক্তি বারবার আঘাত করলেও বাঙালীর জাতিগত সত্বাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। এক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা লৌহবর্মের মত বাঙালী সমাজকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে; আবার যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছে তখন নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিতর থেকেই সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। একারণেই বাঙালী সমাজ বিদেশীয় সংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত হলেও আপন স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন না দিয়ে বিদেশী-বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে আপন শক্তি সঞ্চার করেছে। আবার এই রক্ষণশীলতা বাঙালী সমাজের দোষ বলেও বিবেচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বাঙালী সমাজ অনেকটা স্থবির; তার নিজস্ব পরিমণ্ডলকে সহজে পরিত্যাগ না করায় সমাজের অভ্যন্তরে পরিবর্তন বা বিবর্তনের ঢেউ সহজে লাগেনি, তাই সমাজের গঠনতন্ত্রে তেমন অদলবদল হয়নি।

মঙ্গলকাব্যসমূহের প্রায় সকল কবিই, বিশেষত বিপ্রদাস পিপিলাই, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র তৎকালীন সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার একদিকে যেমন স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয় তেমনি অপর দিকে বৃত্তিগত, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনধারার রূপান্তরও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের নায়কগণ তাদের বীরত্ব ও শৌর্যের প্রকৃত নিয়ন্তারূপে কোন না কোন দেবতা বা দৈবশক্তিকে তুলে ধরেছে। এই দৈবশক্তি কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদ, কর্মবাদ, দৈববাদকেই প্রতিফলিত করেছে। আবার ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত পুরুষকার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের নায়কদের মধ্যে উৎকৃষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণবাদ, দৈববাদ ও কর্মবাদের মধ্যে স্থবিরতা লক্ষ করা গেলেও পুরুষকার সমাজের পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। এই দুয়ের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীতেই মঙ্গলকাব্যের সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনকে বুঝতে হবে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে; একারণে সামাজিক গঠনতন্ত্রে না হলেও জীবনধারায় ও জীবনচর্চায় বিবর্তন ঘটেছে। তাই খাদ্য-পানীয় থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার ও সংস্কার-বিশ্বাসে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়— এই ভিন্নতাকেই এখানে বিবর্তন বলা হয়েছে। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজের

আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে হচ্ছিল।

তুর্কী আক্রমণ সর্বপ্রথম বাঙালীর স্থবির জীবনে আঘাত করে। প্রাক্ তুর্কী আক্রমণকালে বাঙালী সমাজ ধর্ম, জাত্যভিমান, দেশাচার ও দেশাচারগত বিধিনিষেধের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু আক্রমণের অভিঘাত বহির্জগতের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দিল। ফলে মানুষের অজ্ঞাতসারেই দেশজ সংস্কার-সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে লোকমানসের বিবর্তন, গণজীবনের সংস্কার ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে চলেছিল। সমকালীন সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই বিবর্তনের ছাপ ধরা পড়েছে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার যথার্থই বলেছেন— "কোন সমাজকে যেমন তার বিবর্তন ধারার সংগে সম্পর্কিত না করে বিচার করা যায় না, তেমনি বিশেষ কালের সাহিত্যকেও তার কাল পরিবেশ এবং সমাজ পরিবেশের পটভূমিতে সংস্থাপন না করে বিচার করা যায় না।"[২] অর্থাৎ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, কোন সমাজ পুরোপুরি স্থবির হতে পারে না, সুতরাং বিবর্তনের পটভূমিতেই তাকে দেখা উচিত। জীর্ণ লোকাচারের ভারে যখন সমাজ ইতিহাসের গতিপথ রুদ্ধপ্রায় হয়ে এসেছিল তখন তুর্কী আক্রমণের অভিঘাত সমাজকে সচল করতে সাহায্য করেছিল। আরও পরবর্তীকালে সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছিল। এই বিবর্তন অবশ্য এক দিনে ও খুব সরল গতিতে হয়নি, ধীরে ধীরে ও সর্পিল গতিতে সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে এই বিবর্তনের স্বরূপ বোঝা খুব কঠিন। সুতরাং দেখা যায় যে, মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সমাজব্যবস্থার উপর বাইরের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী না হলেও তার পরোক্ষ প্রভাব আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। তুর্কী আক্রমণ যদি আদৌ সংঘটিত না হত তহলে তৎকালীন সামাজিক বিবর্তন একই ভাবে চলত এই দাবী যথার্থ বলে মনে হয় না। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বিচার করার ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের পশ্চাতে যে সমস্ত বাহ্য প্রভাব কাজ করেছে তাদের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন, মধ্যযুগের কাব্য নির্ভর আলোচনায় নির্ভুল কালক্রম অনুযায়ী আবিষ্কৃত পুথির পাঠ ও সঠিক তথ্য পরিবেশনের অভাবে যথার্থ সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন আলোচনায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার সঙ্গত কারণেই লিখেছেন – "সমাজ-বিবর্তনের প্রবাহও সরল রেখায় অগ্রসর হয়না – সর্পিল রেখায় চলে। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার প্রধান অন্তরায়, নির্ভুল ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত পুথির নির্দিষ্ট কাল নির্দেশের অভাব। ঐ অভাব সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে আরও বেশী সর্পিল করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিবর্তনের ইংগিত সুস্পষ্ট।"[৩]

ইতিহাস মৃত্তিকাখণ্ড বিশেষ নয়, মানুষই ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। আর জনপ্রবাহ যেহেতু একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা ,তাই এর শেষ কখনো হয় না। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন ——

"ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে-বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।"[৪] 'জনৈক'

কবির বাণীকে সামনে রেখেই বলি, মানুষের ইতিহাস এক চিরন্তন আবর্তে এগিয়ে চলে।

কোন সময়কালকে বুঝতে হলে, সেই কালের জনজীবনের স্বরূপ বোঝা দরকার। সেই সময়ের মানুষ দৈনন্দিন জীবন-যাপন — ধর্ম, কর্ম, আমোদ-প্রমোদ কিভাবে সম্পাদন করতেন তার বর্ণনা থেকে সেই কাল সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত সাহিত্যে বাংলার সমাজ জীবনের যে উপাদান-উপকরণ বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তা

আহরণের মধ্যে দিয়ে বাংলার জন-জাতি ও সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবর্তনশীল চরিত্র ধরা যেতে পারে। তবে সাহিত্য-নির্ভর আলোচনায় সমাজ ইতিহাসের উপাদান চয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা সাহিত্য নির্ভর সামাজিক উপাদানের সবগুলিই বাস্তব সামাজিক নিরিখে এসেছে তা নয়। কল্পনা ও লোকশ্রুতির মিশ্রণে গড়ে ওঠা সাহিত্য পুরোপুরি বাস্তব হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মধ্যযুগীয় কবিদের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই থেকে গেছে। উপাদান গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে তাই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য-ধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, তার প্রধান তিনটি ধারা হল –মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ও অপ্রধান দুটি ধারা হল— শিবায়ন বা শিবমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল। এই সকল ধারাগুলির মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট ধারায় ভৌগোলিক পরিবেশেরও ভিন্নতা রয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে যে রীতি-রেওয়াজ ও জনজীবনের পরিবর্তন ঘটে তাই-ই নয়, ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারেও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন মনসামঙ্গল উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে পৃথক ভাবে রচিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলেও অনুরূপ তিনটি বিভাজন আছে। আবার ধর্মমঙ্গল মূলত রাঢ়বঙ্গের বিষয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই বিভাজনগুলিতে সামাজিক ইতিহাসের অনেকাংশে পার্থক্য ও অনেকাংশে মিল আছে। যেমন ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বঙ্গের মানুষের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় না। আবার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট পীরগাথা জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম সম্পর্কে সে কালের মানুষের বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এজাতীয় পরিবর্তনগুলিকে বিবর্তনের রূপরেখায় ধরা হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হল। এর পরবর্তী দেড়'শ বছর কার্যত বাংলার শাসকরা ছিলেন পরস্পর আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত — কার্যত স্বাধীন হলেও একটা সামান্য সম্পর্ক দিল্লীর সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সুলতানি আমলের অবসান ঘটলে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটল তার মূল্য কম নয়। কিন্তু বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা শুধু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট বিবর্তন নিয়ে আসে। সুলতানি আমলে যে সমস্ত মুসলমান শাসক এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকেই দেশে ফিরে যাননি – বরঞ্চ বলা যায় এদেশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে ফেলেন। এদেশের বিপুল সম্পদ থেকে রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত অর্থ কিছুটা নিজেদের ভোগ-বিলাসিতা ও সামরিক খাতে ব্যয় করলেও দেশের অর্থ দেশেই থেকে যেত। কিন্তু মোগল আমলে সুবাদারগণ স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্বভার নিয়ে এদেশে আসতেন এবং কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে তাঁরা দিল্লী ফিরে যেতেন – সুতরাং অল্প সময়ে যতটা অর্থ সংগ্রহ করা যায় সেদিকে ব্যপৃত থাকতেন। মোগল সুবাদারগণ নবাবের অনুগৃহীত হবার জন্য প্রচুর অর্থ উপঢৌকন হিসেবে দিল্লী পাঠাতেন. এইভাবে জাহাঙ্গীরের আমল থেকে ঔরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ বাংলার অর্থ প্রতি বছর বাংলার বাইরে চলে যেত। বাংলার নবাবেরাও পরবর্তীকালে প্রচুর অর্থ নজরানা স্বরূপ দিল্লী প্রেরণ করতেন। এভাবে অর্থ প্রেরণের ফলে বাংলার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হত। তবে একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক বিবর্তনের ঢেউ লাগে।

তুর্কী আক্রমণ সর্বপ্রথম গ্রাম বাংলার স্থবির জীবনের সীমারেখাকে ভেঙ্গে উন্মুক্ত করে দিলেও তুর্কীরাও খুব একটা সচল সংস্কৃতির ধারাকে বহন করতে পারেনি। কিন্তু মোগল আমলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বাংলা আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক কূপমণ্ডুকতা দূর হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এমনকি বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়. ফলে দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। গোটা

বিশ্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।

মোগল শাসন স্থাপিত হলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে বিবর্তন আসে তার গুরুত্ব কম নয়। সুলতানি আমলে বাঙালী বণিকরা যেমন বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত না তেমনি বিদেশী বণিকরাও এদেশে বাণিজ্য করতে আসত না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার বণিকদের যে বহির্বাণিজ্যের বিবরণ পাওয়া যায় আসলে তা তৎকালীন ঐতিহাসিক বিষয় নয়। সুলতানি যুগে প্রধানত দু-চার জন আরবীয় ও চীনা বণিক আসত। কিন্তু মোগল আমলে বিদেশীয় বণিকগোষ্ঠী, বিশেষত পর্তুগীজ বণিকদের একাধিপত্য শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের আগমন ঘটতে থাকে। বাংলার কৃষিজাত পণ্য সহ কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সহ বিদেশী বাজারে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সুতরাং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দারুণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এই স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে অধিক মুনাফা লাভের কারণে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা পড়ে যেতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবাবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মোগল রাজসভা থেকে আগত বিলাস–ব্যাভিচার এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জনগণ কপর্দকশূন্য হয়ে দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই বিপর্যয়ের চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলার সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন বা বিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল তাও গুরুত্বপূর্ণ। সুলতানি যুগের প্রারম্ভ থেকেই ভারতবর্ষের বাইরে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে ভাগ্য সন্ধানী শাসক, সৈনিক, ধর্মপ্রচারক, চিকিৎসক, কবি, শিল্পীগণ এদেশে আসতে থাকেন। বিশেষত ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী সহ অন্যান্য নগর -- শহরগুলিতে তারা ভীড় জমাতে থাকেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ও রামপ্রসাদ সেনের বর্ণনায় তৎকালীন বর্ধমান শহরে বিচিত্র মানুষের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার চিত্র পাওয়া যায়। যাই হোক তাঁরা এদেশে আসার সময় তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বহন করে নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে এদেশে এসে বসবাস করার ফলে তাঁরা যেমন নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে দূরে চলে যেতে থাকেন তেমনি এদেশীয় জনগণও তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয় – এইভাবে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে যেতে থাকে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাইরে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সমস্ত কবি, শিল্পীরা আসেন, তাঁদের উন্নত সাহিত্য সম্পদের সঙ্গে এদেশীয় মুসলমানদের পরিচয় ঘটতে থাকে। সুতরাং তাঁরা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরবী, ফারসী, উর্দু ও হিন্দি ভাষার সাহিত্যকর্ম বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক প্রণয় কাব্য নামে এক জাতীয় কাব্য গড়ে ওঠে দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওলের হাতে। তাছাড়া মুসলমান কবিদের দ্বারা মুসলমানী সাহিত্য নামে নতুন সাহিত্য ধারার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

মোগল আমলে সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। তাছাড়া নাগরিক সমাজে কথ্য ভাষা হিসাবে আরবী-ফারসী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার মিশ্রণ ঘটে যায়। বৈষয়িক প্রয়োজনে আরবী-ফারসী ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই মিশ্রভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতচন্দ্রের মত কবি কাব্যরস সৃষ্টির দিকে লক্ষ রেখেই 'যাবনী' ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব অনুভব করেন। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষত তৎকালীন কোলকাতা, মুর্শিদাবাদের মত নগরগুলিতে কথ্যভাষা হিসাবে 'যবনী' ভাষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর ধর্মীয় জীবনেও পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল। এর হোতা হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কারের মধ্যে থেকেই বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম হলেও বৌদ্ধধর্মের কাছে অন্যান্য ধর্ম অবারিত দ্বার ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। পালরাজাগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁরা অন্যান্য ধর্মেরক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেনরাজাগণ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের

উপাসক ছিলেন। সুতরাং সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাঙালী জাতি ও সমাজব্যবস্থার ভিতরেই অস্তায়মান বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন রয়ে গেল। এইভাবে কয়েক'শ বছর অতিক্রান্ত হবার পর বৌদ্ধধর্মের শেষ ধারাটি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে মিশে গেল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে জোয়ার এসেছিল বাঙালী সমাজ তার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। তাই দীনেশচন্দ্র সেন চৈতন্যদেবকে মানব প্রেমের মূর্ত অবতার রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন।[৫] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় চৈতন্যদেবের ধর্ম সাধনার মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা লক্ষ করেছিলেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে যায়। অবশ্য কতিপয় বৈষ্ণব আচার্য্যের চেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রয়াস পেল। তাছাড়াও বৈষ্ণব ধর্ম-কর্মের সঙ্গে ইসলামীয় সুফী সাধকদের পরিচয় ঘটে এবং তারা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রধর্মের প্রভাবে সুফী অধ্যাত্মবাদী সাধনা প্রভাবিত হয় এবং খানিকটা বিকৃত হয়ে পড়ে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বৈষ্ণব ধর্মেও বিকৃতি দেখা দেয়। বৌদ্ধ তন্ত্রাচারীদের প্রবেশের ফলে বৈষ্ণব ধর্মেও সহজিয়া, কর্তাভজা ইত্যাদি নানা শাখার সৃষ্টি হয়। আর চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকেই লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য - ধারার জন্ম হয় এবং মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য-ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য নিয়েও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য রচিত হতে থাকে। এইভাবে নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ এগিয়ে চলে। এখন পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে সমাজ ইতিহাসের যে তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে তার নিরিখে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন-চিত্র রচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এই বিবর্তনের ধারাকে সুস্পষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ভাগগুলি হল —

১. উপাদানগত বিবর্তন।
২. সামাজিক অবস্থাগত বিবর্তন।
৩. জাতি-বৃত্তিগত বিবর্তন।
৪. রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তন।
৫. অর্থনৈতিক বিবর্তন।
৬. ধর্মনৈতিক বিবর্তন।

১) উপাদানগত বিবর্তন ঃ মানুষের জীবনধারণের উপাদান এত বিচিত্র ধরনের যে তাদের কয়েকটি সুস্পস্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখানে উপাদানগত বিবর্তনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

যথা— ক) বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।
খ) সংস্কার ও বিশ্বাস- কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।
গ) ভাব-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।
ঘ) বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।
ঙ) ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।

ক) বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান বলতে বোঝায় খাদ্য-পানীয়, গৃহস্থালীর উপকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, বাদ্যযন্ত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে।

খাদ্য পানীয় ঃ প্রথমে দেখা যাক্ বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান— খাদ্য-পানীয়ের কথা। মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে বাঙালীর খাদ্য প্রবণতা অনুযায়ী তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর চার রকমের খাদ্যরীতির ব্যবহারই লক্ষ করা যায়, তবে ঐ চার রকম স্বাদের হরেকরকম ব্যঞ্জন তৈরী হত। মঙ্গলকাব্যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন এমন কি চৌষট্টি ব্যঞ্জনেরও উল্লেখ

পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। গমের ব্যবহার বিশেষ ছিল না। অনেক ঐতিহাসিকের মতে— মধ্যযুগের বাঙালীরা গম বা রুটি খেত না।"[৬] সম্ভবতঃ তথ্যটি সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নাও হতে পারে। মুসলমান আগমনের পর এদেশে বিশেষভাবে গম বা রুটি খাওয়ার প্রচলন হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে রুটি খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। চৈতন্য-পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে এবং হিন্দুসমাজে রুটি খাওয়ার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বাঙালী মুসলমান সমাজে 'হেরা রুটি'র উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যেও রুটির উল্লেখ আছে। গমজাত খাদ্য হিসাবে লুচির ব্যবহার পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং লুচি বাঙালীর খাদ্য তালিকায় শোভাবর্দ্ধন করেছে অনেক পরবর্তীকালে। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে রচিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে ঘিয়ে ভাজা লুচির বিবরণ পাওয়া যায়। এই শতকের মধ্য পর্বে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে লুচির বিবরণ পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বাঙালীর খাদ্য তালিকায় লুচি-কচুরির প্রবেশ সম্পর্কে লিখেছেন – "কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরির বর্ণনা করেছেন? ও লুচি-কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে।"[৭] সুতরাং খাদ্যরীতির বিবর্তনে এটা একটি বিশেষ সংযোজন বলা যায়।

প্রধান খাদ্য ছাড়াও বাঙালীর খাদ্য স্বভাবে সামান্য বিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বাঙালীর খাদ্য তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি, ফুল-মূল ও মাছ-মাংস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে খাম আলু, মউয়া আলু ও মিষ্টি আলুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সময়ে রচিত বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে আলুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত এখানে আলু বলতে মউয়া আলু বা মিষ্টি আলুকেই বোঝাত। কেননা পর্তুগীজদের আগমনের পরই এদেশে আলুর ব্যবহার শুরু হয়। আলুর ব্যবহার সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন – "বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে।"[৮] প্রথমদিকে বাঙালীরা আলুকে বিদেশী, বিজাতীয় ফল মনে করে ঘৃণা করত, তবে ধীরে ধীরে তাদের এই স্পর্শদোষ কেটে যায়।সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাঙালীর খাদ্য তালিকায় আলুর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এই বিদেশীয় সব্জিটিকে বাঙালী সহজে গ্রহণ করেনি বলেই কবিরা খাদ্য ও রন্ধন বর্ণনায় আলুর উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতে আলুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙালীর খাদ্য তালিকায় একটি অপরিহার্য ব্যঞ্জন হল ডাল। প্রধানত মুগ, মাষ, ছোলা, মটর, খেসারি ডালের প্রচলন থাকলেও মসূর ডালের ব্যবহার উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজে ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের নির্দেশ অনুসারে বাঙালী ব্রাহ্মণরা মসূর ডালের ব্যবহার শুরু করেছিল।[৯] তাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মসূর ডালের উল্লেখ নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে পবরর্তীকালের প্রায় সকল কবিই খাদ্য তালিকায় মসূর ডালের উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণবরাও সম্ভবত মসূর ডাল খেত না। তাছাড়াও শাক্সবজি, ফল-মূল খাদ্য হিসাবে ব্যবহারেও নানা প্রকার বিধিনিষেধ ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব বিধিনিষেধ হ্রাস পাওয়ায় কবিরা অকপটেই খাদ্য তালিকায় এগুলি উল্লেখ করেছেন।

মাছ বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। কিন্তু মাছ খাওয়া সম্পর্কেও নানা বিধিনিষেধ ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে আঁশবিহীন মাছ ও যে সকল মাছ সাপের মত দেখতে সেগুলি ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ছিল।[১০] তাছাড়া শুঁটকি মাছও উচ্চবর্ণের সমাজে ব্যবহৃত হত না, তবে নিম্নবর্ণের সমাজে শুঁটকি মাছের ব্যবহার হত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এসমস্ত বিধিনিষেধ হ্রাস পাওয়ায় ব্রাহ্মণ কবিরাও অকপটে আঁশবিহীন ও আঁশযুক্ত বা অন্যান্য মাছের প্রচুর উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মাংস ও ডিম হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। হাঁস ও মুরগীর ডিম,

বিশেষত মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা খেত, তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা মুরগীর মাংস ও ডিম খেত না। কচ্ছপের মাংস ও ডিম, পাঁঠা ও খাসীর মাংস, হরিণের মাংস, কবুতরের মাংস প্রধানত হিন্দুরা খেত। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যেও ঐ সকল মাংসের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, বিশেষত ডোম ও ব্যাধ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁদুর, শূকর, সজারু, গো-সাপ ও গোধার মাংস খেত। মুসলমানরা গো-মাংস খেত, হিন্দুর কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ অভক্ষ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজেও বিভিন্ন প্রকার মাংস খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিভিন্ন প্রকার মাংসের ব্যঞ্জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বিত্তবান হিন্দুর ঘরে মুসলমান ঘরানার, বিশেষত মোগলাই খানা'প্রবেশ করে যায়। ভারতচন্দ্র কালিয়া, কোর্মা, কাবাব, দোলমা, সেকচি, সামসা, পোলাও ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় -

"কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কন্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগমাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া॥" (ভারতচন্দ্র/৩৪১-৩৪২)

তবে সাধারণ নিম্নবিত্তের হিন্দুর খাদ্য তালিকায় এই খাবারগুলি প্রবেশ করেনি। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কোন কাব্যে এসমস্ত খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী পাক্শালা থেকে অভিজাত হিন্দু পরিবারে এসমস্ত খাবার প্রবেশ করে যায়। ভারতচন্দ্র শিক্ভাজা মাংসের কাবাবের উল্লেখ করেছেন। উচ্চবর্ণের বাঙালীরা এই খাবার না খেলেও মুকুন্দের কালকেতুর শিকপোড়া গোধিকাকে কাবাবের পূর্বপুরুষ বলা যায়।

মিছরি সম্ভবত মিশর থেকে আগত। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যেই মিছরির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে ভারতচন্দ্রের কাব্যে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাঙালীর খাদ্য হিসাবে মিছরি ব্যবহার হতে থাকে একথা অনুমান করা যায়। আবার 'সূপ' ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলি ও চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতে। যার অর্থ 'ঝোল' বা রান্না করা ডাল, শব্দটি সম্ভবত বাংলা নয়, দক্ষিণ ভারত থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দটি বাংলায় এসে থাকবে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে রচিত কাব্যগুলিতেও সূপের ব্যবহার পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দের কাব্যে 'কাঁজি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কাঁজি' শব্দটির অর্থ ভাতের মাড়; কিন্তু সাধারণ ভাবে তা আমানি বা অম্লজল হিসাবে পরিচিত। শব্দটি দক্ষিণ ভারত থেকে উড়িষ্যার মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছে।[১১] সম্ভবত চৈতন্য-পরবর্তীকালে নিম্নবিত্তের বাঙালীর খাদ্য তালিকায় এর অনুপ্রবেশ ঘটে থাকবে। তাছাড়া ভারতচন্দ্রের কাব্যে চিনা চাউল, বাজরার চাউল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে এর উল্লেখ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রারম্ভিক পর্বে এসমস্ত দানাশস্য বাঙালীর খাদ্য তালিকায় প্রবেশ করে থাকবে।

বিভিন্ন প্রকার ফলমূলের মধ্যে একমাত্র ক্ষেমানন্দের কাব্যেই মর্তমান কলার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সম্ভবত 'মার্তামান' থেকে আগত। পর্তুগীজরাই বিভিন্ন ধরণের ফল, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, জারুল, সফেদা, পেঁপে চীনাবাদাম, কেশুবাদাম, আনারস, কামরাঙা, পেয়ারা, আতা, নোনা, লঙ্কা, মরিচ এদেশে ক্রমে ক্রমে আমদানি করেছিল।[১২] সুতারং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিদেশী জাতি আগমনের পূর্বে এর ব্যবহার শুরু হয়নি বলে অনুমিত হয়।

বাঙালীর রান্নায় পেঁয়াজ ও রসুনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল মুসলমান আগমনের পরেই। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর হেঁসেলে পেঁয়াজ ও রসুনের প্রবেশ ঘটেনি। তাই কোন কবিই পেঁয়াজ-রসুনের উল্লেখ করেননি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দই প্রথম পেঁয়াজ-রসুনের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই সময়েই পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালীর খাদ্য প্রবণতারও কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে।

পান-সুপারি খাওয়ার প্রবণতা বাঙালীর অতি প্রাচীন। এদেশে মুসলমান আগমনের পরে মুসলমানরাও পান-সুপারি গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে সম্ভবত উচ্চবর্ণের সমাজেই পান-সুপারি ব্যবহার হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষও পান-সুপারি খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু এবং ধর্মমঙ্গলে ডোমদের পান-সুপারি খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। অন্যান্য নেশাকর দ্রব্যের মধ্যে গাঁজা, ভাঙ, ধুতুরা, আফিম ও পোস্তের ব্যবহার থাকলেও তামাকের ব্যবহার ছিল না। মধ্যযুগে পর্তুগীজরাই তামাকের প্রচলন করে।তামাক এদেশে আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি এলেও সপ্তদশ শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে তার প্রচলন হয়নি। কারণ সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বের আগে মোগলরা এদেশে দখলীস্বত্ব কায়েম করতে পারেনি।[১৩] তবে আমীর-ওমরাহরাই তামাকের ব্যবহার করত।[১৪] পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের কাব্যে মুসলমান সমাজে তামাকের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবরণ অবশ্য পরবর্তীকালে সংযোজন হতে পারে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে তামাক ব্যবহারের বিবরণ পাওয়া যায়। আহমদ শরীফের বিবরণ অনুসারে মধ্যযুগের মধ্যপর্বে তামাক প্রশস্তিসূচক 'তামাকু পুরাণ', 'হুক্কাপুরাণ' কাব্য রচিত হয়।[১৫] এসমস্ত তথ্য জনসমাজে তামাকের ব্যাপক প্রচলন নির্দেশ করে।

গৃহস্থালীর দ্রব্য : বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান হিসাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর উপকরণগুলি মনসামঙ্গল থেকে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলে একই প্রকার এবং এগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে মুসলমান আগমনের পর দু'-একটি বাসনপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাঙালী সমাজে ব্যবহার শুরু হয়েছে, যেমন – সানকি, বদনা, হুঁকো ইত্যাদি। বিপ্রদাস কাব্যে হুঁকো বা হুঁকার ব্যবহারের উল্লেখ

করেছেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে সানকি ও বদনা ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তাছাড়া কৃষিকাজের সহায়ক যন্ত্রপাতি থেকে অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেনি। মুসলমানদের আগমন বাঙালী সমাজে জীবন-জীবিকার সহায়ক নতুন কোন যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও গৃহস্থালীদ্রব্যের প্রচলন করেনি।

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-পরিচ্ছদে। মধ্যযুগের প্রথম পাদে সাধারণত বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য ছিল না। সাধারণ বাঙালীর পোশাক ছিল পুরুষের ধুতি-চাদর ও নারীর শাড়ী। নীহাররঞ্জন রায়ের বিবরণ অনুযায়ী— "ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সংগতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর-এক খণ্ড সেলাই-বিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহা ছিল পুরুষের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের একবস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।"[১৬] ঐতিহাসিক গোলাম হুসায়ন সলীমও বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদের অনুরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন।[১৭] তবে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদে পার্থক্য যথেষ্টই ছিল। সাধারণভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদের পাথর্ক্য ছিল না। ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত মধ্যযুগে মধ্যবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায় লিখেছেন— "Middle class people used to wear a picec of cotton cloth and a piece of dobaya or ekapatta during the summer and during the winter they protected themselves from cold, some by using another piece of cloth (dohar) and some a haman or glap over their body. Sometimes during the winter, some of them managed to procure a benian or merjai for their bodies. Some middle class men of advanced age used venat and rejai's at night"[১৮] ধুতি, চাদর ও শাড়ীই প্রধান পোশাক হলেও হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পোশাক-পরিচ্ছদে পাথর্ক্য দেখা যায়। মুসলমানরাই বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। মুসলমানদের প্রধান পোশাক হল তহবন, কুর্তা, পাগড়ী, জামা, ইজার, পিরান বা পৈরান, টুপি ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মুসলমানদের এসমস্ত পোশাকের ব্যবহার আছে। অভিজাত পুরুষরা, রাজ-পুরুষরা অনেক সময় কাবাই, শেরোয়ানি, জোব্বা, চাপকান, পাজামা, নিমা পরিধান করত। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও এসমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে এসমস্ত পোশাকের ব্যবহার নেই, তবে সপ্তদশ শতকে রচিত ধর্মমঙ্গলে, অষ্টাদশ শতকের অন্নদামঙ্গলে হিন্দুদেরও এসমস্ত পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। এর কারণও কিন্তু ঐতিহাসিক। মুসলমান শাসনকালে পেশাগত কারণেই হোক বা রাজ-আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় হোক হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের সংস্পর্শে চলে এসেছিল। এবং এরাই ধীরে ধীরে মুসলমান রাজদরবারের বিলাস-বৈভবে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তারাই নিজেদের সমাজে ঐ সমস্ত মুসলমানি পোশাক প্রচলন করে। এইভাবেই বোধহয় হিন্দু রাজদরবারগুলিতে মুসলমানি দরবারি পোশাক পরিধান করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল এবং ক্রমশ তা জনসমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। পাগড়ী, কাবাই, চোগা, চাপকান, শেরোয়ানি, জোব্বা ব্যবহার প্রচলিত হয়। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে কলিঙ্গ রাজসভায় গমনকালে ভাঁড়ু দত্ত পাগড়ী ব্যবহার করে। বৈষ্ণব মহান্তরা পর্যন্ত পাগড়ী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে একজন বৈষ্ণব মহান্তকে পাগড়ী ব্যবহার করতে দেখা যায়। হিন্দু মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও মুসলমানি ঘরানার পোশাক বিবর্তন এনেছিল। তাই বাঙালী কবি শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় লিখেছেন -

"নীল ওড়না মাঝে মুখ শোভা করে।
সোনার কমল বলি দংশিল ভ্রমরে॥"[১৯]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সেকালের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায় লিখেছেন - "প্রায় সমস্ত শুভ

কর্মোপলক্ষ্যে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাঘড়া ও ওড়না পরিধান করিতেন।"[২০] ভারতচন্দ্রের কাব্যেও মহিলাদের ঘাঘড়া ও ওড়না ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং বেশভূষা পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারে বাঙালী সমাজের বিবর্তিত রূপটি ধরা পড়ে। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদেই কিছুটা বিবর্তন এসেছিল। বিভিন্ন প্রকার শৌখিন ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার থাকলেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জাতির আগমনের ফলে চিকিমিকি, মলমল, কিরমিজি, আসমান তারা ইত্যাদি বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহারও চালু হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে উৎপাদিত বস্ত্রও ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের কাব্যে গুজরাটি বস্ত্রের উল্লেখ আছে। যেমন কবি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী—

"গুর্জ্জরাটি অম্বর করিল পরিধান।
উপরে উড়ানি দিল কুসুম বসন।" (জগজ্জীবন/১৯৪)

রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে 'গুজরাটি ছিট' কাপড়ের উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় আরও বৈচিত্র্য আছে, তিনি দিল্লীর দরবারে ভবানন্দকে 'বিলাতী খেলাৎ' দিয়েছেন। রামপ্রসাদ সেন বনাত, মখমল, পট্টু, ভূষণাইখাসা, বুটাদার ঢাকাইয়া ইত্যাদি বস্ত্রের কথা বলেছেন। মঙ্গলকাব্যের বাইরে অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালী ছিল নগ্নপদ। ব্রাহ্মণরা খড়ম ব্যবহার করত তবে অভিজাত ও ধনীরা জুতা ব্যবহার করত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঐ একই রকম বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে গোটা মধ্যযুগে এই রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

অলঙ্কার ব্যবহারেরক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে একই ধরনের অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। সাধারণত সোনা-রূপার তৈরী, মণি-মুক্তা খচিত বিভিন্ন রকম অলঙ্কার নারীরা ব্যবহার করত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ অলঙ্কার ব্যবহার করত। বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদেও অলঙ্কার ব্যবহারের পার্থক্য ছিল না, তবে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের তথাকথিত অন্ত্যজদের মধ্যে গহনা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল। উচ্চবিত্তের পরিবারের নারীরা প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত। ঐতিহাসিক ষ্টাভোরিনাস অলঙ্কার বিভূষিতা বঙ্গললনাদের দেখে লিখেছিলেন —"Adorn their hair with gold bodkings, and their arms, legs and toes, with gold or silver rings, and hands, as like-wise their ears, and the cartiledge of the nose."[২১] দরিদ্র নারী-পুরুষরা সাধারণত রূপা ও পিতলের তৈরী গহনা, বাজু, হার, রসকাটি ইত্যাদি ব্যবহার করত।

মধ্যযুগে পুরুষরাও গহনা ব্যবহার করত। শিশু এবং বালক ছাড়াও যুবকরা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার পরতে অভ্যস্ত ছিল। তবে মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসে পুরুষের গহনা পরার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল। সাধারণত পুরুষের গহনা পরিধানের প্রবণতা কম ছিল। অলঙ্কার ব্যবহারে দেখা যায় বাঙালী সমাজে বিবাহ বা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রায় একই প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করা হত। অনুষ্ঠান বিশেষে গহনা ব্যবহারের পার্থক্য ছিল না। তবে পুরুষরা সাধারণত বিবাহের সময় বেশী অলঙ্কার পরত। জমিদার ও সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহার করত।

বঙ্গললনার অলঙ্কার বৈচিত্র্য এত বেশী ছিল যে, বিভিন্ন সময়ে বিদেশীদের আগমনের পরও বাইরে থেকে আমদানি করা অলঙ্কারের প্রবেশ ঘটেনি। অন্তত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে রকম সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মুসলমানী সাহিত্যে কিছু কিছু অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়, যেমন – ছনলুয়া, আরবেকী, পায়জের

ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসমস্ত অলঙ্কারের উল্লেখ নেই। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতেই ঐ অলঙ্কারগুলি বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। তবে হিন্দু বাঙালী সমাজে এসব অলঙ্কারের ব্যবহার হত বলে মনে হয় না।

একই কথা বলা যায় রূপচর্চা বা প্রসাধনের ক্ষেত্রেও। মঙ্গলকাব্যে বাঙালী রমণীর রূপচর্চার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন রকম কৃত্রিম উপাদান ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ ভেষজ-প্রাকৃতিক উপাদান সহযোগে রূপচর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কাজল দ্বারা রূপচর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে হিন্দুর পাশাপাশি দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে হিন্দুর মত মুসলমান রমণীরাও অনেকে সিন্দুর ব্যবহার করতে শিখেছিল।[২২] মুসলমান রমণীরা গন্ধদ্রব্য হিসাবে আতর, চোখে সুরমা ও হাতে-পায়ে মেহেন্দি ব্যবহার করত। মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত কাব্যগুলিতে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গগীতিকার 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায় মেহেন্দি বা 'মেন্দী' ব্যবহারের উল্লেখ আছে। যেমন –

"মেন্দী দিয়াছে কন্যা বাটিয়া চরণে।
সুরমা দিয়া আঁকিয়াছে দুইটী নয়নে॥
সেইত নয়ানে কন্যা যার পানে চায়।
আদম পুরুষ নারী পাগল হইয়া যায়॥"[২৩]

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কাব্যগুলিতে এই উল্লেখগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে এসবের অনুল্লেখ থেকে মনে হয় হিন্দুসমাজে এগুলির ব্যবহার হত না। আসলে প্রসাধন ও রূপচর্চার প্রচুর উপকরণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গরমণীগণের করায়ত্ব ছিল; সুতরাং বিদেশীর নিকট এবিষয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়নি।

বাদ্যযন্ত্র ঃ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চার'শ বছর ধরে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর সঙ্গীতচর্চা ও বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাপদ, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে সেগুলির উল্লেখ চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে. কিন্তু মঙ্গলকাব্যে নতুন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নেই তা নয়। তবে মঙ্গলকাব্যের মত বিস্তৃত বর্ণনাবহুল কাব্যের গায়ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিকে সম্ভব ছিল না। অবশ্য কোন কোন মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব গায়ন পদ্ধতি ছিল। মঙ্গলকাব্য থেকে সঙ্গীত সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ। শুধু মঙ্গলকাব্যেই নয়, মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও প্রচুর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়াও দীর্ঘ চার'শ বছরের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রধান-অপ্রধান, পরিচিত-অপরিচিত বহু বাদ্যযন্ত্র – যা বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ পাওয়া যায়, এগুলির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া কঠিন। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারায় নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলির প্রায় সবগুলি উল্লেখ পাওয়া যায় অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে। তাঁর উল্লিখিত একটি নতুন বাদ্যযন্ত্র হল 'নৌবত' বা নহবত। আলাওলের পদ্মাবতীতে 'বিউগল'[২৪] নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। মনে করা যেতে পারে ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে বাঙালী সমাজে অজ্ঞাত ছিল। আবার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্য জীবনী কাব্যে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের বেশীরভাগই প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আবার কিছু বাদ্যযন্ত্র ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রের অনুল্লেখ থেকে অনুমান করা যেতে পারে ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি সে সময়ে অজ্ঞাত ছিল। আবার কতগুলি বাদ্যযন্ত্রের নাম পরবর্তীকালের কাব্যে উল্লেখ না থাকায় ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল বলে মনে করা যায়। কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে যেগুলির পরিচয় উদ্ধার করা একালেও সম্ভব হয়নি, যেমন – মঙ্গল, বরগো, চন্দ্রহাস, ধূসরী, বেণী, রামবেণী, দোখণ্ডী, ঠমক, চন্দ্রতারা,

পঞ্চশব্দী ইত্যাদি। এগুলি ধীরে ধীরে জনসমাজ থেকে হারিয়ে গেছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র জনসমাজে পরিচিত হয়েছে; কেননা ঐ সময় মোগল রাজসভা থেকে দেশীয় রাজা বা জমিদারদের রাজসভায় সেগুলি প্রবেশ করেছিল। মোগল রাজদরবারের অনুকরণেই দেশীয় রাজা-জমিদাররা রাজসভায় শিল্প-সঙ্গীত চর্চা করতেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই শিল্প-সঙ্গীত চর্চায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। বিশেষত বর্গী আক্রমণ ও পলাশীর যুদ্ধ এবং বিভিন্ন সময়ে শাসকের শোষণের ফলে মানুষ গান-বাজনা ও সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণে লিপ্ত হয়, ফলে প্রাচীন সঙ্গীত-বাদ্যের অনেকটাই লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। তাছাড়া মানুষের রুচি পরিবর্তনের ফলেও সেকালের সঙ্গীত-বাদ্যাদির বিবর্তন ঘটে যেতে থাকে। রাজ্যেশ্বর মিত্র বাংলার সঙ্গীত বিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন— "সেকালের প্রচলিত বহুপ্রকার প্রবন্ধ সঙ্গীত হঠাৎ বিলুপ্ত হ'ল। এবং তার স্থলে কাব্যসঙ্গীতের নবতর অভ্যুদয় ঘটল। প্রাচীনধারার এই যে বিলুপ্তি এর জন্য রাজনৈতিক গোলযোগ অনেকটা দায়ী হ'তে পারে, কিন্তু মধ্যযুগীয় ধারার বিলোপসাধন যে কতকটা সহসাই ঘটেছে আমাদের সঙ্গীতের বিবর্তন দেখে সেটা অস্বীকার করবার উপায় নাই।"[২৫] সঙ্গীতে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তন ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান - পূজা-পার্বণ, বিবাহ, সন্তানের জন্মোৎসব, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কোন তারতম্য ছিল না। প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রই সকল প্রকার অনুষ্ঠানে বাজানো হত। এমন কি শোভাযাত্রা বা বিজয়োৎসবে ব্যবহৃত রণবাদ্যগুলিও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বাজানো হত, তেমনি অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও শোভাযাত্রা বা বিজয়োৎসবে বাজানো হত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এমন কি একালেও এবিষয়ে কোন বাছবিচার নাই।

বিপ্রদাসের কাব্যে, আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে বিবাহ শোভাযাত্রায় আতস বাজী ব্যবহারের কথা আছে। সেকালে হাউই, ভুঁইচাপা, তুবড়ি, চরখি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আতস বাজী পোড়ানো হত। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেবের কাব্যে আতস বাজীর ব্যবহার উল্লেখ নেই। মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলদের আগমনের পরে আতস বাজীর ব্যবহার বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ সমগ্র মধ্যযুগে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ছিল একেবারেই অনুন্নত এবং মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসেও যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। স্থলপথে ও জলপথে পরিবহনের চিরাচরিত মাধ্যমই প্রচলিত ছিল। তবে মধ্যযুগে মুসলমান আগমনের পরে এদেশে স্থলপথে যাতায়াতের জন্য পশুবাহন হিসাবে উটের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে উটের উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত ইংরেজ প্রাধান্যের পূর্বে এদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেনি।

গৃহনির্মাণ ঃ মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য আছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর গৃহনির্মাণ ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার সিজুয়া পর্বতে বসতি স্থাপন, ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন, সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠীগড় স্থাপন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্ধমান নগরের বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়াও রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান নগরের বিবরণ, রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে কান্তেশ্বরের জামবাড়ি নগর স্থাপন সেকালের নগর স্থাপনের দৃষ্টান্ত। বস্তুত কাব্যের বর্ণনা হলেও সে যুগে গ্রাম ও নগর স্থাপনের দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিক সত্য। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এরকম বহু গ্রাম স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের নামে কৃষ্ণপুর গ্রাম ছাড়াও হরধাম ও আনন্দধাম গ্রাম স্থাপন করেন এবং রেউই গ্রামকে কৃষ্ণনগরে পরিণত করেন।[২৬]

কাব্যের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সেকালের নগরগুলি ঠিক একালের নগরের মত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর নগর পরিকল্পনা অপেক্ষা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নগর পরিকল্পনার পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা শাসকের শোষণে জর্জরিত নানা বৃত্তিধারী মানুষ কালকেতুর গুজরাট নগরে এসেছে এবং আপন সামাজিক অবস্থান অনুসারে বসতি স্থাপন করেছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর নগরের ঘরবাড়িগুলি তৈরী হত বাঁশ, কাঠ, দড়ি, কাদামাটি, পাথর দিয়ে এবং তালপাতা ও খড়ের ছাউনি দিয়ে। এই নগরগুলি আসলে সমৃদ্ধ গ্রাম। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে মনসার সিজুয়াতে বসতি স্থাপন, কিংবা মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন বনকেটে বসতি স্থাপন মাত্র। মধ্যযুগে বন কেটে বসতি স্থাপনের কথা ঐতিহাসিক সত্য। শোষিত ও বিপর্যস্ত মানুষকে নানা প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের বসতি স্থাপনের জন্য আহ্বান করা হত। কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন একালের সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিঞার ময়না দ্বীপে বসতি স্থাপনের মত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠীগড় স্থাপন কিংবা ভারতচন্দ্রের বর্ধমান নগর অনেকাংশে একালের শহরের মত। এখানে বসবাস স্থাপনের জন্য মানুষকে আহ্বান করার প্রয়োজন হয়নি। কৃষ্ণনগর বা বর্ধমানের মত নগরে ধনী বণিক সম্প্রদায়, আমীর-ওমরাহরা, সামন্ত জমিদাররা, বুদ্ধিজীবী রাজকর্মচারীরা সামাজিক বিন্যাস অনুসারে বসবাস করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের মত নগরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, দিনেমার বণিকরা ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বণিকরা ব্যবসা- বাণিজ্যের জন্য বসবাস করত। ষোড়শ শতাব্দীর কালকেতুর গুজরাট নগরের বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য নগরের পাশে হাট থাকত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে হাসনহাটির হাট, শ্রীকলার হাট, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে তিয়র হাটের প্রসঙ্গ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নগরগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নগর-বাজার থাকত। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এই বাজারগুলিতে। নগরগুলিতে সারি সারি দোকানপাট থাকত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ও রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান নগরের সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। এই নগরগুলি তৈরী হত সাধারণত ইট, কাঠ, পাথর, চুন-সুড়কি দিয়ে।

মধ্যযুগে গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল। দরিদ্ররা কাদামাটি, বাঁশ, কাঠ, বেত, খড়, নাড়া দিয়ে তৈরী ঘরে বসবাস করত – তাতে ভাল বেড়া বা ভাল ছাউনি থাকত না। ঘরগুলি সাধারণত আটচালা, চারচালা, দোচালা হত; দোচালা ঘরগুলিকে 'বাংলাঘর' বলা হত। এই ঘরগুলি সাধারণত উলুখড়, শীতলপাটি, পাটকাঠি, নলখাগড়া, সুন্দিবেত ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হত। মৈমনসিংহগীতিকার 'মলুয়া পালা'য় নিম্নবিত্ত বাঙালীর গৃহনির্মাণ চিত্র পাওয়া যায়-

"কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে।
ভালা কইর‍্যা বান্ধে বাড়ী সত্যা নদীর কানে॥
আটচালা চৌচাল ঘর বান্ধিয়া সুন্দর।
ভালা কইর‍্যা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইরা ঘর॥
শীতলপাটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া।
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহরা॥"[২৭]

দরিদ্ররা একটি বা দু'টি ঘরে বসবাস করত। অনেক সময় তাতে বাঁশ বা বেতের কারুকার্য করা হত। ঘর সংলগ্ন 'পিঁড়া' বা বারান্দা থাকত। গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা বাঁশ ও কাঠের তৈরী বাসগৃহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিত। সেখানে মন্দির বা ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, অতিথি অভ্যাগতদের জন্য মূল অন্তঃপুরের বাইরে কাছারি ঘর বা 'বার-বাঙ্গলা' বা 'বার-দুয়াইরা ঘর' থাকত। গৃহাভ্যন্তরে সরোবর থাকত, তাতে নামাওঠার জন্য শান বাঁধানো ঘাট থাকত। ধনীর অনেকে ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কাচ লাগাত, মণি-মুক্তা খচিত করত, গৃহে

নেতের পতাকা লাগাত, বাড়ীর চারিদিকে বাগান থাকত। প্রতিটি মনসামঙ্গলেই চাঁদ সদাগরের উদ্যানবাটী নির্মাণ প্রসঙ্গ আছে। কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপনায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালীর গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার বিবরণ পাওয়া যায়। অবস্থাপন্ন বিলাসী লোকেরা গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের উপর জলটুঙ্গি নির্মাণ করে বসবাস করত। 'গোর্খবিজয়' কাব্যে হরগৌরীর জলটুঙ্গিতে বসবাসের চিত্র আছে।

মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য থেকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দরিদ্র, নিম্নবিত্তের গৃহনির্মাণ পদ্ধতির কোন তারতম্য ঘটেনি। অপর দিকে উচ্চবিত্তের লোকেরা, যারা গ্রামে বাঁশ-কাঠের তৈরী শৌখিন গৃহে বসবাস করত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই শ্রেণীর লোকেরা অনেকে নগরবাসী হয় এবং কোঠাবাড়িতে বসবাস করতে থাকে। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানী মঙ্গলকাব্যে কান্তেশ্বরের জামবাড়ি নগর স্থাপন বনকেটে বসতি স্থাপন, তবে এটা ঠিক কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন নয়, এখানে বাঁশ-কাঠ নির্মিত বাড়ীর পাশাপাশি কোঠাবাড়ি ছিল। এখানে উত্তরবঙ্গীয় গৃহনির্মাণ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ) সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার ও লোকাচারগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষের বিষয় যেমন নয়, তেমনি একটি কালের বিষয়ও নয়। বহু মানুষের বহু যুগের চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যেতে পারে এসবের মধ্যে। বাঙালী সমাজ এসমস্ত লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার ও লোকাচারের ভারে অনেক সময় ভারগ্রস্ত হয়ে পড়লেও এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানত নারী-কেন্দ্রিক হলেও ক্রমশ পুরুষও লোক-সংস্কার ও লোক-বিশ্বাসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের বহু মানসের চিন্তা-চেতনা, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল বোধ, দুঃখ-দারিদ্র্য পীড়িত জনমানসের আশ্রয়, শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ ঘটেছে এর মধ্যে দিয়ে। বাঙালী জনমানসে এই সব সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে। যুগ পরিবর্তনের ফলে অনেকক্ষেত্রেই পুরাতন সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণের স্থলে নতুন সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ জন্ম নিয়েছে। পুরাতন ধ্যান-ধারণার প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। আবার পুরাতন সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ জনমানস থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে তা-ও নয়, সমাজের অভ্যন্তরে অন্তঃপ্রবাহি ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

দেখা যায় মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। পূর্বালোচিত অধ্যায়গুলিতে তর প্রচুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় মনসামঙ্গল থেকে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন সব কাব্যেই প্রায় একই প্রকার সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার বিচারের কথা পাওয়া যায়। যুগ পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন কাব্যে আচার-বিচার ও সংস্কার বিশ্বাসের স্বল্পতা ও আধিক্য লক্ষিত হয়। তবে এসমস্ত উপাদান ও প্রয়োগগুলি সবই বাঙালী সমাজ থেকে এসেছে তা নয়; মুসলমান সমাজের আচার-বিচার যেমন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেছে তেমনি হিন্দুর কিছু কিছু আচার-বিচার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে গেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত সাহিত্যে এসব উপাদানের প্রয়োগ দেখে অনুমান করা যায় ঐ সময়ে হিন্দু-মুসলমান অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল তাই লোকাচার ও লোক-বিশ্বাসের আদান-প্রদান ঘটে গিয়েছিল।

সংস্কার-বিশ্বাসগুলিকে লক্ষ করলে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি জাতীয় সংস্কার পালিত হত তা বোঝা যায়, যেমন– কৃষি বিষয়ক সংস্কার, গৃহনির্মাণ ও গৃহ প্রবেশ বিষয়ক সংস্কার, নতুন পোশাক পরিধান সম্পর্কিত সংস্কার, প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত সংস্কার, রোগ-ব্যাধি বিষয়ক সংস্কার, যাত্রা-অযাত্রা, মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ক সংস্কার ইত্যাদি। কৃষি নির্ভর বাঙালী সমাজে শস্যরোপণ, ফসল কাটা ও ফসল ঘরে তোলা সম্পর্কিত আচার পালিত হত। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে শিবের চাষবাস আরম্ভের আগে ভূমিপূজা বা বসুমতীপূজার কথা আছে। অকুমারী ভূমিতে লাঙল দেওয়া নিষিদ্ধ বলেই ভূমিপূজা করা হত। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম সাত

দিন জমিতে লাঙল দেওয়া নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলে বা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গলে এরকম সংস্কারের কথা পাওয়া যায় না। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার আগে পূর্ণঘট স্থাপন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে নৌকা পূজার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা বহু মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আজও গ্রামীণ বাঙালী সমাজে ভূমিপূজা ও নৌকাপূজা করা হয়ে থাকে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শস্যরোপণ ও ফসল কাটা সম্পর্কিত বিভিন্ন আচারগুলি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে পালিত হয়ে আসছে। মহালক্ষ্মীর ব্রত, ইতুলক্ষ্মীর ব্রত, নবান্ন উৎসব, পৌষলক্ষ্মীর ব্রত বা পৌষীকৃত্য কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন আচারের অন্তর্গত।

যাত্রা-অযাত্রা বা যাত্রাপথের শুভাশুভ ও মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই পালিত হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দুসমাজে বিভিন্ন সংস্কার পালিত হতে দেখা যায়। কাব্যে উল্লিখিত মুসলমান সমাজেও নির্দিষ্ট কতকগুলি সংস্কার পালিত হতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে এবং মুসলমান কবিদের রচিত কাব্যগুলিতে যেমন হিন্দুর পালিত সংস্কার দেখা যায়, তেমনি মুসলমান পালিত বিভিন্ন সংস্কারও দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে যাত্রা-অযাত্রা সম্পর্কিত সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। বলাই বাহুল্য সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এজাতীয় সংস্কার-বিশ্বাস আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তাই পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কাব্যগুলি অপেক্ষা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসবের প্রয়োগ অনেক বেশী। হাঁচি পড়া, টিকটিকির ডাক শোনা, চোখে কানামাছি পড়া, মাথার উপর শকুনি ডাকা, মরা ডালে কাক বসা, কুইলা বলদ গোয়ালে রাখা, ঋণ করা, মদ্যপান করা, কালপেঁচা ডাকা, মেয়েদের মাথার উকুন বাছতে দেখা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র সংস্কার ছিল। তাছাড়া গ্রহ-নক্ষত্র, তিথি, বার, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বাছবিচারও বেড়ে গিয়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিরা ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থ জাতীয় রচনা করেছিলেন, সেগুলিতে মুসলমান সমাজের নিজস্ব সংস্কার-বিশ্বাসের পাশাপাশি হিন্দুসমাজে পালিত সংস্কারও দেখা যায়।

পালিত বিভিন্ন আচার-বিচারগুলি, যেমন— ঋতুবতী রমণীও প্রসূতি বিষয়ক আচার ও সংস্কার, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকালীন আচার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে পালিত হত তাদের নিজস্ব রীতি অনুসারে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যু সম্পর্কিত আচার বর্ণনা অনেক কম। হারীত, হলায়ুধ, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ নবজাতকের বিভিন্ন রকম সংস্কারের কথা বললেও বাংলায় সামবেদীয় দশ-সংস্কার গৃহীত হয়। এগুলি হল— গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ও বিবাহ। লক্ষণীয় বিষয়, মঙ্গলকাব্যগুলিতে এগুলি আনুপূর্বিক পালনের বিবরণ পাওয়া যায় না। অঞ্চলভিত্তিতে এই আচারগুলির পার্থক্য ছিল এবং কবিগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই ঐতিহ্যগত সত্যকে তুলে ধরেছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে বিবাহাচারের বর্ণনা অনেক বেশী। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর বিবাহে বা লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে চৈতন্যদেবের বিবাহের লোকাচারের আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সময়কালে সমাজ ছিল অধোগতি সম্পন্ন। কবি সমাজের মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধের দ্বারা সমাজ সংগঠন করতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ রায় কাব্যে পৌরাণিক আদর্শকে প্রচার করতে চাইলেও সামাজিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি, তাই নারী সম্পর্কিত নানা বিধি- নিষেধগুলি তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজ জীবন থেকেই গ্রহণ করেছেন। সতী নারীর কি কি করণীয় এবং কি কি নিষেধ ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন, যেমন— সতী নারীর পূর্ণ কলসীতে হাত দেওয়া নিষেধ, মালীর মালঞ্চ থেকে ফুল তোলা বা চুরি করা নিষেধ, অখণ্ড ক্ষেত্র থেকে শস্য ছিন্ন করা নিষেধ, বারুইয়ের বরজ থেকে পান নেওয়া, বন দাহন করা, গোটা কুমড়ো ছেদন করা, ভাদ্রমাসে চন্দ্রকলা

দেখা নিষেধ। কবির ভাষায়——

"পূর্ণ কলসীতে হাত না দিয়ে কুমারী।
মালীর মালঞ্চে পুষ্প না করহ চুরি॥
অখণ্ড ক্ষেত্রেতে কভু না ছিণ্ডিহ শস্য।
এই তিন কর্ম্মে হয় কলঙ্ক অবশ্য ॥
বারইয়ের বরজে কভুপান নাহি লুড়ি।
ত্রিস জাতি (?বিশ) হইয়া কভু বন নাহি পুড়ি॥
কুষ্মাণ্ড কাটিতে নাহি হইয়া অবলা।
ভাদ্র মাসে চন্দ্র না দেখিহ চারি কলা॥
এই সব কর্ম্মে লোক হয় অপরাধ।
ফলিল আমায় (এই) তিন অপরাধ॥ (রামকৃষ্ণ/১২১)

রামকৃষ্ণ রায় বলেছেন, এই কাজগুলি করলে লোক অপরাধ হয়। ভারতচন্দ্রের সময়কালে বাঙালী অনেকখানি বলিষ্ঠ ধ্যানধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তাই ঝাড়ফুঁক, তুক্-তাক্, বশীকরণ, মারণ-উচাটনের প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে নেই, বরঞ্চ সে স্থান গ্রহণ করেছে কলা-কৌশল ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ। তাইতো সুন্দরকে ধরার জন্য কোন তুক্তাকের প্রয়োগ না করে কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। ধর্মীয় আচরণ অনেকাংশে হাস্যকর হয়ে উঠেছিল, তাই অন্নদামঙ্গলে ব্যাসদেবের ধর্মধ্বজী বেশভূষা ও আচরণ হাস্যকর। দেবদেবীর পূজাতিথি, বার-ব্রত অনেকাংশ অবহেলিত হয়েছিল। দেবদেবীর পূজাতিথি অপেক্ষা কামনা-বাসনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। তিথি, বার-ব্রত মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। হিন্দুর বিবাহে সম্প্রদান, যজ্ঞ এবং সপ্তপদী ছাড়া সমস্তই লোকাচার মাত্র। কন্যার বিবাহে কুলশীলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। মেয়েদের বিবাহ খুব অল্প বয়সে দেওয়া হলেও এসম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ ছিল।শাস্ত্রকার মনু গুণহীন পাত্রে কন্যাদানের বিরোধিতা করলেও ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন অবশ্য তা স্বীকার করেননি। এসময় মুসলমান শাসনকালে বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের স্থিতিশীলত্ব নষ্ট হওয়ায় সে সময়কার স্মৃতিকারগণ অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ বিধিবদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে তা ক্রমশ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে অল্প বয়সে কন্যার বিবাহদানের কথা পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া বয়স্থ কন্যা ঘরে রাখলে সামাজিক ভাবে অবরোধ করা হত।

হিন্দুসমাজে বিবাহের নানা প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। সাধারণত আট রকমের বিবাহ প্রচলিত ছিল, এগুলি হল— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সাধারণত ব্রাহ্ম বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্যে গান্ধর্ব, প্রাজাপত্য ও আসুর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।বোধহয় চৈতন্যযুগে ও তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনসমাজ থেকে আগত লোকাচার বাঙালী হিন্দুর লোকাচারে প্রবেশ করে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণবসমাজে বিবাহ প্রথা অনেকটা জটিলতা মুক্ত হয় এবং কণ্ঠী বদল প্রথায় বিবাহ চালু হয়। হিন্দুসমাজে কণ্ঠী বদলের মত 'তুলসী বদল' প্রথা চালু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবন ঘোষাল বিবাহরীতিতে 'তুলসীবদল' প্রথার বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তামা-তুলসী স্পর্শ করে দুই পক্ষ বিবাহ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হত।

মৃত্যুকালীন সংস্কারও হিন্দু-মুসলমান সমাজে আপন আপন প্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন হত। বৈষ্ণব সমাজে মৃতদেহ দাহ করার পরিবর্তে সমাধি দেওয়ার প্রথা চালু হলেও হিন্দুর মৃতদেহ সৎকারে পরবর্তীকালে জটিলতা বৃদ্ধিই পেয়েছিল বলে মনে হয়। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সদাগরের পিতার মৃত্যুর পর প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ, জগজ্জীবনের কাব্যে 'বৃষোৎসর্গ' শ্রাদ্ধ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির

বিবরণ অনুযায়ী মৃত্যুর পর এক বৎসরকাল পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধ পালনের কথা জানা যায়। এসব বিষয়ে হিন্দুসমাজ অনেকটা রক্ষণশীলতা পালন করেছিল। এখন প্রশ্ন হল ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংস্কার-বিশ্বাসের অতি বৃদ্ধির কারণ কি ? তুর্কী আক্রমণ বাঙালী সমাজে যে সচলতা নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে লড়াই করে প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বাঁচতে হত - সুতরাং ভাববিলাসীতার স্থান কমে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, এবং চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এক শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও আরেক শ্রেণীর মানুষ পার্থিব ভোগবাদের দ্বারা ভাববিলাসী জীবনচর্যাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে নানারকম আচার-বিচার বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে দেশের স্থিতাবস্থা নষ্ট হলে নারীরা নিরাপত্তার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়ে, ফলে আচার বিচারের নিগড়ে নারীকে আবদ্ধ করা হতে থাকে। আর নারীও নানা সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-বিচারে নিজের পরিমণ্ডল তৈরি করে নেয়। তাই দেখা যায় নতুন নতুন বিধিনিষেধের ব্যবহার যা পূর্ববর্তীকালে রচিত কাব্যে উল্লেখ নেই।

মধ্যযুগের প্রথম পর্ব থেকেই হিন্দুসমাজে ঘটক, দৈবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসীদের প্রভাব ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবে ব্রাহ্মণের মর্যাদা হানি ঘটেছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে এদেশীয় সমাজব্যবস্থার উপরের স্তর থেকে ব্রাহ্মণের স্খলন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণরা সমাজ রক্ষার মানসে আপন কর্তৃত্বকে বজায় রাখার জন্য হিন্দুসমাজ সংগঠনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে ব্রাহ্মণ সমাজ আর কোনদিনই তাদের হৃত প্রতিপত্তি ফিরে পায় নি, কেননা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল বণিক সম্প্রদায় সমাজের মধ্যমণি হয়ে পড়েছিল। তবে ষোড়শ শতাব্দী এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বেদ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি কিছুটা ছিলই। তাই মুকুন্দের কাব্যে দেবরাজ কর্তৃক ভিখারী শিবের পূজা। শিবঠাকুর দেবরাজকে যে কথাগুলি বলেছিল —

> "শুন শক্র তুমি তো স্বর্গের অধিকারী।
> কিসের কারণে পূজ জনম ভিখারী॥
> করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
> কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥" (মুকুন্দ / ৩২)

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী ও দৈবজ্ঞদের প্রতি মানুষে বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে। তাই জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি বাণিজ্য যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ নির্দেশ দিয়েছে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা কুশল নয়। চাঁদ সদাগর গণনায় আস্থা স্থাপন না করে দৈবজ্ঞকে বন্দি করার নির্দেশ দিয়েছে —

> "ক্রোধে বোলে বানিয়া ব্রাহ্মণ বন্দী কর।
> যাবত না আসি আমি চম্পালি নগর॥
> সত্য হইলে আমি দিব পঞ্চ গ্রাম।
> মিথ্যা হইলে তোমার করিব অপমান॥" (জগজ্জীবন/১২২)

ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধবের কাব্যেই অর্থবান ধনপতির ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ হৃত প্রতিপত্তির গৌরব ভুলতে পারে নি। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় ধনপতি সিংহলরাজকে বহুমূল্য সম্পদ উপঢৌকন দিয়েছে। যথাকালে অগ্নিশর্মা নামে পুরোহিত ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হয়। রাজার উপঢৌকন প্রাপ্তি এবং ব্রাহ্মণের বঞ্চনায় রুষ্ট হয়ে সে বলে —

> "ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে।
> ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
> বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন।

কার্য কারণের কালে আমি উদাসীন॥

- - - - - - - - - - - - - - - -

এত বলি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি।
প্রবোধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি॥" (মুকুন্দ /১৬৩)

এই উক্তিতে ব্রাহ্মণের হৃত ক্ষমতার ক্ষোভ প্রকাশিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সামাজিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। একারণেই অগ্নিশর্মা পুরোহিত পথের কুশলবার্তায় কমলেকামিনীর ফাঁদে ধনপতিকে কারারুদ্ধ করায়। শিবায়নে ব্রাহ্মণের পোদবৃত্তি অর্থাৎ কৃষিবৃত্তি গ্রহণ ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি শিবঠাকুরের ভাল লাগেনি; ভিক্ষাবৃত্তিকেই তাই শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল। আসলে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে সমাজে ব্রাহ্মণের মর্যাদা প্রায় ছিল না। তাই শিবঠাকুরের আক্ষেপ—

"সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥" (ভারতচন্দ্র/৫৬)

শিবঠাকুরের উপলব্ধির কারণ কাঞ্চন কৌলীন্যের যুগে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হলেও তার মূল্য নেই। অন্নপূর্ণা এখানে দেবী নয়, সে ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য। তাই নলকূবর অন্নপূর্ণার পূজাতিথি উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দেয়। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশিনী দেবী নিজে নলকূবরের কাছে জবাব পেয়েছে-

"অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার॥
কি বলে বামণ অরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ।" (ঐ/১৫২)

'ব্রাহ্মণ অবধ্য' এই আপ্তবাক্যটিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নষ্ট হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দক্ষ শিব নিন্দায় শিবের যে পরিচয় উপস্থাপিত করেছে সেটা ঐতিহাসিক সত্য। দক্ষের সঙ্গে শিবের দ্বন্দ্ব এখানে ধর্ম দ্বন্দ্ব নয়, আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বও নয়, বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব। দক্ষ এখানে শিবঠাকুর সম্পর্কে বলেছে-

"কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচারবহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়

না করে অতিথিসেবা।"(ঐ/২০)

অর্থ ও গুণের বিচারে শূদ্র ও দরিদ্র সমাজে মর্যাদা পেতে শুরু করেছিল। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখা যায় দেবরাজ কর্তৃক ভিখারী শিবের পূজা। ব্রাহ্মণ হিসাবে ভিখারী শিব পূজা পেলেও অষ্টাদশতাব্দীতে সে অবহেলার পাত্র হয়ে উঠেছিল। তবে সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন শূদ্র জাতির উদ্ভব হয়েছিল।

মুসলমান সমাজেও পীর, ফকির, দরবেশদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে হিন্দুরা যেমন মুসলমান পীর, দরবেশদের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকে মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছিল। তুর্কী আক্রমণের অতর্কিত বিপর্যয়ে বিপন্ন হিন্দুসমাজ দৈববাদী হয়ে পড়েছিল, তেমনি ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে মুসলমান নবাবদের শাসন সম্পর্কে শৈথিল্য, বর্গী আক্রমণ, পলাশীর যুদ্ধ সমস্ত বিপর্যয় মিলে বাংলাদেশের সমাজকে বিপর্যস্ত করে। নাগর সমাজ ভোগবিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারীতার গভীরে নিমজ্জিত হয়, এমতাবস্থায় মুসলমান সমাজও আত্মশক্তি হারিয়ে অদৃষ্ট নির্ভর হয়ে পড়েছিল। একারণে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পীর, দরবেশদের প্রতি আস্থা স্থাপন করে কাব্য রচিত হতে থাকে, ফলে হিন্দুরা শুধু জগজ্জননীকে আশ্রয় করেই ক্ষান্ত হয়নি সত্যপীরকে সত্যনারায়ণে, বড়গাজী খাঁকে বাঘদেবতা সোনা রায়ে পরিণত করেছে। সুতরাং শুধুমাত্র ধর্ম সমন্বয়ের মানসিকতা থেকে এসব দেবতার সৃষ্টি সম্ভব হয়নি; এর মূলে দৈববাদী, আচার সর্বস্ব মানসিকতা সক্রিয় ছিল। এসমস্ত পরিবর্তনগুলি আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাসের পরিবর্তন বা বিবর্তন বলে মেনে নেওয়া চলে।

গ) ভাব-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনে শিক্ষা-সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছিল, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেকালে টোল, চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও আশ্রমিক শিক্ষাও প্রচলিত ছিল। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী স্বয়ং গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। মুসলমানরা মক্তব ও মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করত। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যোৎসাহীরা নদীয়া. শান্তিপুর, চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেত। ঐ স্থানগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ স্থানগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপের যে গুরুত্ব সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর এই গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। তবে সপ্তদশ শতকেও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র রূপে নবদ্বীপের গৌরবোজ্জ্বল ধারা যে অব্যাহত ছিল তার কথা জানা যায় রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে। কবি নিজের শিক্ষা প্রসঙ্গে সেকালের শিক্ষাকেন্দ্র শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও জউগ্রামের কথা বলেছেন, এবং সেকালের কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নাম করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বর্ধমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্ধমান শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য বর্ধমান আসত। রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের মুখে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বর্ধমানের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলেছেন।[২৮] মধ্যযুগের শিক্ষণীয় বিষয়ের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে, তবে সেকালে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন ছিল না বলেই বোধ হয়. পঞ্চদশ-ষোড়শ বা তারও পরবর্তীকালের সাহিত্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষয়িক প্রয়োজনে জীবিকার সহায়ক যুগোপযোগী শিক্ষা চালু হতে চলেছিল. বিশেষত ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোগল যুগে সরকারি ভাষা ছিল ফারসী, ফলে সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার প্রয়োজনে ফারসী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আরবী. ফারসী, উৎকল প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত. সংস্কৃত বা নাগরী ভাষার মর্যাদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের তথ্যানুযায়ী— ফারসী ভাষা না জানলে সামাজিক ভাবে তিরস্কৃত হতে হত। ভারতচন্দ্র ফারসী না শেখার জন্য ভ্রাতাগণের নিকট

তিরস্কৃত হয়ে রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা শিখেছিলেন। আবার ঘনরাম চক্রবর্তী স্বয়ং আরবী, ফারসী ভাষা শিখেছিলেন বলে জানা যায়।[২৯] জনমানসের আকাঙ্ক্ষার গভীরে অর্থকরী ফারসী ভাষা শিক্ষা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্রে। কুমারী ব্রতীর কামনা বাস্তব প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বেশী দূর যেতে পারেনি। তাই ব্রতী প্রার্থনা করে—"আরশি আরশি আরশি/আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি।"[৩০] অন্যান্য সূত্র থেকেও আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষার গুরুত্বের কথা পাওয়া যায়।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষার ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী। ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন ও শিক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত; যদিও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ ও ধর্মীয় ভাষা শিক্ষার অধিকার সকলের ছিল না। চৈতন্য-পরবর্তীকালে সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার তাগিদে, রাজানুগ্রহলাভে ঐ সমস্ত ভাষা শেখানো হত। তাছাড়া জীবিকা অর্জনের সহায়ক হিসাবে লোক-সমাজে কবিরাজি, ধন্বন্তরীবিদ্যা, সর্পবিষনাশ, হেকিমী শিক্ষার কথা পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত এসমস্ত শিক্ষার গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া পুথিগত শিক্ষা ছাড়াও চিত্র শিল্প, কারুশিল্প, সূচীশিল্পে নারীপুরুষ উভয়েই দক্ষতার পরিচয় দিত। নৃত্যগীত চর্চায় সেকালের নারীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিত। মনসামঙ্গলে বেহুলা, চণ্ডীমঙ্গলে রত্নমালা, ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষা, ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাজকুমারী বিদ্যা ও তার সখীদের নৃত্যগীতে পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নারীর নৃত্যগীত চর্চায় ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন— "যে সকল শিল্পকলায় প্রাচীনকালে নারীর প্রাধান্য ছিল তাহাও কালক্রমে লোপ পাইল। মধ্যযুগের শেষভাগে এইসব বিদ্যা কেবল গণিকারাই চর্চা করিত। কোনো ভদ্র পরিবারের মহিলাদের এই সব শিক্ষা কল্পনারও অতীত ছিল।"[৩১] বস্তুতপক্ষে এই বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেহুলার নৃত্যগীত চর্চার কথা থাকলেও ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলে রত্নমালা স্বর্গীয় নর্তকী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান কাব্য ধর্মমঙ্গলে বারবনিতা সুরিক্ষা, গোপীচন্দ্রের গানে হীরা নটীর নৃত্যগীত চর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে রাজকুমারী পদ্মাবতীর নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ থাকলেও তা রাজ-অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। মূলত গণিকারাই নৃত্যগীত পরিবেশন করত। পদ্মাবতীর বিবাহে দেখা যায় –

"নৃত্যগীত আনন্দে বাজায় পুণ্য দেশ।
নাচে বেশ্যা নৃত্যকালে মনোহর বেশ॥"[৩২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রাজকুমারী বিদ্যাও সখীদের নৃত্যগীতে পারদর্শিতার কথা থাকলেও তা অভিজাত অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কারণেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীরা আবার খানিকটা অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, ফলে নৃত্যগীত ও শিল্প চর্চায় ভাঁটা পড়েছিল এবং সেই জায়গা দখল করে নেয় গণিকা ও বারবনিতারা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান, ঝুমুর, খেউর, খেমটা একান্তভাবেই দেহোপজীবী গণিকাদের বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মধ্যযুগে শিক্ষায় যেহেতু রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকত না, তাই শিক্ষকের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। তাঁরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই সামান্য দু-এক টাকা ব্যতীত চাল, ডাল, তরিতরকারি পেতেন। ধনী পৃষ্ঠপোষকের নিকট থেকে তাঁরা অনেক সময় উচ্চহারে বেতন পেতেন, অনেকে গৃহশিক্ষক হিসাবে জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ধনীর বাড়িতে থাকতেন। সেকালে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গলে পাঠশালার শিক্ষক সোমাই পণ্ডিতের কথা এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের পাঠশালার শিক্ষকের কথা পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে সোমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তার শিক্ষার্থীদের মধুর সম্পর্কের চিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি চণ্ডীমঙ্গলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির কথা জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রের হানি ঘটেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে যাই হোক, সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট

আগ্রহ ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে চাকুরী ও বৈষয়িক প্রয়োজনেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছিল বলে মনে হয়।

ঘ) বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রথমে আসে প্রবাদ-প্রবচনের কথা। প্রবাদ-প্রবচনগুলি একটি জাতির দীর্ঘকালের ব্যবহারিক জীবন অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। এগুলি একদিক থেকে যেমন প্রাচীন তেমনি আধুনিক।[৩৩] সমাজজীবনের অভ্যন্তর থেকে প্রবাদের জন্ম, সমাজ জীবন পরিবর্তনের সঙ্গে তাই প্রবাদসমূহেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন- "প্রবাদ মাত্রই সমাজ জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইজন্য সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত বিষয়মূলক প্রবাদও পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু তাহা পরিবর্তিত ও নূতন সমাজের উপযোগী করিয়া কমই লওয়া হয়।"[৩৪] দেখা যাচ্ছে চর্যাপদ থেকে যে সমস্ত প্রবাদ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু প্রবাদ অন্য ভাষায় অন্য ভাবে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু অনেক প্রবাদ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কালে কালে নতুন প্রবাদের উদ্ভব হয়েছে। যুগের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে প্রবাদেরও বিনষ্টিকরণ ঘটে। ডঃ ভট্টাচার্য আরও বলেছেন— "পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের নূতন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোন প্রবাদই সংস্কার লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস পায় না; ইহারা লুপ্ত হইয়া গেলেও পরিবর্তিত হয় না, বরং তাহাদের পরিবর্তে নূতন প্রবাদের উদ্ভব হইতে পারে।"[৩৫] কিছু প্রবাদ অবশ্য প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত, ইহারা প্রাচীন প্রবাদেরই আধুনিক রূপ মাত্র। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-বিচার, এক কথায় জীবনের সর্বাঙ্গীন রূপ যা একই ভাবে বর্তমান অবধি প্রচলিত সে সমস্ত বিষয়ে রচিত প্রবাদই আধুনিক রূপে প্রচলিত থাকে অন্যগুলি লোপ পায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রবাদ-প্রবচনের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং লক্ষ করা যায় সমগ্র মধ্যযুগে একই প্রবাদ একটু ভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন কবিরা ব্যবহার করেছেন। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী সমাজ চরিত্র যে প্রায় একই রূপ ছিল এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি তা প্রমাণ করে।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে যে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করা আছে সেগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে সমাজ বিবর্তনের ছকটি আরও সুস্পষ্ট হবে। প্রবাদ-প্রবচনগুলি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বস্তুনিষ্ঠ উপকরণ, যার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত কালের প্রচ্ছন্ন ছবি পাওয়া সম্ভব। যেমন একটি বিশিষ্ট প্রবাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্ত ব্যবহার করেছেন - 'দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন'। ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধব বলেছেন - 'বিধির নির্ব্বন্ধ কভো না যায় খণ্ডন'। সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন - 'কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন' এবং শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন - 'সাগর শুকাল্য মা গ কপালের দোষে'। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রও একই কথা বলেছেন ভিন্ন ভাষায় - 'ভবিতব্যং ভবিত্যেব খণ্ডিতে কে পারে'। তাহলে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ চার'শ বছর ধরে বাঙালী সমাজ অদৃষ্টবাদী থেকে গেছে। কখনো 'দৈব', কখনো 'বিধি' কখনো বা 'কপাল' আবার কখনো 'ভবিতব্য' এই ব্যবহারে সূক্ষ্ম পরিবর্তন কি লক্ষ করা যায় না। দৈব → বিধি → কপাল → ভবিতব্য, দৈব থেকে বিধাতার বিধানে, তা থেকে নিজের ভাগ্য বা কপাল এবং ভবিতব্য বা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা অদৃষ্টবাদী বাঙালীর চিন্তার সামান্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে। ভারতচন্দ্রের মত কবি যিনি দেবতাকে নিয়ে তামাশা করেন, তিনি দেবতার উপর নির্ভর করতে পারেন না, তাই কর্মতৎপরতায় তাঁর আস্থা, কিন্তু ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত - তা খণ্ডন করা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজ রামদেব ব্যবহৃত দু'টি প্রবাদ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য - ১। 'বীর বোলে দুঃখ সুখ কর্মের অধীন'। ২। 'সুখ দুঃখ যত হয়ে কর্মের অধীন'। এই প্রবাদ দু'টিতে অদৃষ্ট অপেক্ষা কর্মতৎপরতার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাঙালী সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে, নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে বহু প্রবাদ গড়ে উঠেছিল। নারী ছিল পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাই বিজয় গুপ্ত লিখেছেন - 'স্বামী না থাকিলে নারীর জীবন কুৎসিৎ'।

দ্বিজমাধব লিখেছেন - 'পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রী ধর্ম হইয়া'। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ফুল্লরার উক্তি তো অবিস্মরণীয় - 'স্বামী বনিতার পতি / স্বামী বনিতার গতি / স্বামী বনিতার বিধাতা'। ততখানি স্বামী নির্ভরতা কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত প্রবাদে পাওয়া যায় না। ঘনরাম যদিও উল্লেখ করেছেন - 'স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি'। তবুও পুরুষসমাজও যে নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে তা বেশ বোঝা যায়, যদিও তা উনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নয়। বিপ্রদাস অনেক আগেই উল্লেখ করেছিলেন - 'আপদে বনিতা বিনা নাহিক সহায়'। কিন্তু ঘনরাম বলেছেন - 'নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা / সহজে হইবে বলে সোনায় সোহাগা'। ভারতচন্দ্র আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বলেছেন - 'নারী যার স্বতন্তরা তার সে জীয়ন্তে মরা' ইত্যাদি। সমাজ ইতিহাসের চেতনাগত বিবর্তন এই প্রবাদগুলি প্রমাণ করে। নারীপুরুষের সম্পর্ক নিয়েও বহু প্রবাদ গড়ে উঠেছিল। নারীকে সকল অনিষ্টের কারণ বলে ভাবা হত। সমাজের বিভিন্ন অনুষঙ্গ – পুরুষের বহুবিবাহ, সপত্নী সম্পর্ক, বিমাতা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে অনেক প্রবাদ আছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও জাতিবৃত্তিগত ভাবনা নিয়ে, যেমন - 'পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল', কিম্বা 'বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী' কিম্বা 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ' ইত্যাদি অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের ব্যক্তিত্ব চেতনার উন্মেষকে প্রমাণ করে। যেমন - 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন', 'মাতঙ্গ পড়িলে দড়ে পতঙ্গ প্রহার করে', 'খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত', 'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন' ইত্যাদি। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' – ধর্ম সম্পর্কে মানুষের অনাস্থা প্রমাণ করে। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিল। মানব জীবন অপেক্ষা জাতি-ধর্মকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যগুলিতে অনেক বেশী বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষাল জনৈক বৃদ্ধার মুখে তাই শুনিয়েছেন - 'প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।' ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে আরো অগ্রণী।তিনি বলেছেন - 'ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্তমানে মরে'। তেমনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব উপলব্ধিও গুরুত্বপূর্ণ সমাজ বিবর্তনের পরিচয় বহন করে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার আছে, তবে প্রবাদগুলি ভারতচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি না লৌকিক প্রবাদ বাক্যকে তিনি সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন তা বলা শক্ত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্র ব্যবহৃত প্রবাদগুলি সম্পর্কে বলেছেন – "ভারতচন্দ্র যে-সকল প্রবাদ তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কোনও আধুনিক লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, অতএব ইহারা তাঁহার মৌলিক রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।"[৩২] ভারতচন্দ্র ব্যবহৃত প্রবাদবাক্যগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাব পরিবেশে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। কেননা প্রবাদবাক্যগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এই প্রবাদগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের ব্যক্তিত্ব চেতনার স্পর্শ পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ না ঘটলে এ ধরনের বাক্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা যেতে পারে। কবিগণ সমাজের ভিতর থেকেই প্রবাদগুলি সংগ্রহ করুন কিম্বা নিজেই সৃষ্টি করুন, পরিবর্তিত কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যে প্রবাদগুলির সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে ছড়া ও ধাঁধাঁর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ছড়াগুলির উদ্দেশ্য ও ভাব যাই হোক না কেন, দেখা যায় সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ রেখেই ছড়াগুলি তৈরী। মঙ্গলকাব্যগুলির কোন কোন অংশে ছড়ার স্বাদ আছে, তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে স্বাধীনভাবে প্রচুর ছড়া গড়ে উঠেছিল। আধুনিক কালে সংগৃহীত এই ছড়াগুলিতে ক্রমবিবর্তনের পরে হয়ত উদ্ভবকালের রূপ বজায় নেই কিন্তু পরিবর্তিত কালের রূপটি তার মধ্যে ধরা পড়ে। কেননা সমকালীন সমাজ জীবনের নানান উপকরণ— সংস্কৃতি, প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, জীবনচর্যার নানা বিষয়ে এই ছড়া রচিত হয়, যার মধ্যে সমাজ ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন - ঘুমপাড়ানি ছড়ার কথা বলা যেতে পারে। মুকুন্দ চক্রবর্তী শ্রীমন্তের বাল্যকথা বর্ণনায়

ঘুমপাড়ানি ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া বলেছেন খুল্লনার মুখে। তার মধ্যে মুকুন্দের সমকালীন সমাজ ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে যে সমস্ত ছেলেভুলানো ছড়া গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যা প্রচুর এবং ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত কালের ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেভুলানো' ছড়া প্রবন্ধে বলেছেন— "ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।"[৩৭] রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যই প্রমাণ করে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্যবহৃত উপকরণের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বর্গী হাঙ্গামা বিষয়ক প্রচলিত ছড়াটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্বের পূর্বে গড়ে উঠতে পারে না। ছড়াটি হল –

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে,
ধান ফুরুল পান ফুরুল খাজনার উপায় কি?
আর কিছুকাল সবুর কর রসুন বুনেছি।"[৩৮]

ছড়াটিতে বর্গী আক্রমণের বিভীষিকার কথা এবং বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আছে তা ঐতিহাসিক সত্য। বর্গী আক্রমণের বিভীষিকার কথা বলে মা দুষ্টু ছেলেদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত। আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদ কর্তৃক প্রেরিত চোর ইন্দামেটে শিশু লাউসেনকে অপহরণ করতে গিয়ে নগরবাসীকে নিদ্রালি মন্ত্রে ঘুম পাড়াচ্ছে, মন্ত্র টি একটি ছড়া ছাড়া কিছু নয়; এর বিষয়বস্তু মধ্যযুগীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। জলপড়া, তেলপড়ার মতে ধুলোপড়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং ছড়াটিতে মধ্যযুগীয় আচরণগত বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। আবার ধর্মমঙ্গলে ডোম সৈন্যদের বীরত্বগাথা সুবিদিত; একটি প্রচলিত ছড়ায় ডোম সৈন্যদের বীরত্বের কথা আছে।ছড়াটি হল—
"আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে / ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।"[৩৯] ইত্যাদি। অতীতের ডোম সৈন্যদের বীরত্বের পাশাপাশি সেকালের জীবনের নানা উপকরণ ছড়াটিতে পাওয়া যেতে পারে। এই ভাবে দেখা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে, যেমন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনকে কেন্দ্র করে বহু ছড়া রচিত হয়েছিল— ছড়াগুলি সংগ্রহ করে তার মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের পরিবর্তিত কালের রূপকে পাওয়া যেতে পারে। ধাঁধাঁগুলি সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে, সমকালীন ইতিহাসের খুঁটিনাটি উপকরণ অবলম্বন করেই তা গড়ে উঠেছিল সুতরাং জীবনযাত্রা, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ধাঁধা-র উৎপত্তি হতে থাকে।

ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন : স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপকরণগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোকক্রীড়ার উল্লেখ পেলেও সমগ্র মধ্যযুগে ঐ সমস্ত ক্রীড়াগুলিই প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁদের কাব্যে যে সমস্ত ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতে ঐ সমস্ত লোকক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশে নতুন ক্রীড়া প্রচলিত হয়নি বলেই মনে হয়। বস্তুত ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যচর্চা, শরীরচর্চা সাধারণ বাঙালী সমাজে খুব একটা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাই এর ব্যবহারও অত্যন্ত কম।

২) সামাজিক অবস্থাগত বিবর্তন ঃ মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বহিরাঙ্গিক উপাদানগুলি ছাড়াও আভ্যন্তরীণ গঠনের বিবর্তনও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মনীতির ক্ষেত্রে মোটামুটি পরিবর্তনগুলি ধরা যেতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান, বাঙালীর পারিবারিক গঠন ও আদর্শবোধ, জাতিবৃত্তিগত পরিবর্তন এবং সর্বোপরি মধ্যযুগীয় বাঙালীর চরিত্রগত পরিবর্তনটিও মঙ্গলকাব্য থেকে মোটামুটি অনুধাবন করা যেতে পারে।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগীয় নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন খুব একটা ঘটেছে তা

নয়; তবে কালগত পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থানগত সত্যতা ফুটে উঠেছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারী অন্তঃপুরচারিণী, গৃহবন্দি। অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরেই তার কামনা- বাসনা নির্বাপিত হয়েছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাহিত হয়েছে। তাই ব্রতের নারী দেবীর কাছেই তার ক্ষুদ্র নিতান্তই জাগতিক কামনা-বাসনা নিবেদন করেছে। তার মধ্যে থেকেই পারিবারিক কল্যাণ, শান্তি কামনা করেছে। গৃহাভ্যন্তরে বন্দি বলেই সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। যত্রতত্র যাওয়া-আসা বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তাই দেখা যায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সমাজের নারীকে বাইরে যাবার জন্য বার বার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে। নিম্নবর্ণের সমাজে নারীর অবস্থান এতটা সঙ্কুচিত ছিল না, তাই পুরুষের সঙ্গে তারা অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করতে পারত। ব্রাহ্মণ সমাজেও বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর এই বাধা ছিল না। একারণেই মঙ্গলকাব্যের দেবীরা হয় নিম্নবর্ণের নারী ডোমনী বা বাগদিনী বেশ ধারণ করেছে অথবা বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এবিষয়ে মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত দেখা যায় মনসামঙ্গলে মনসাকে যতবার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীকে ততবার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়নি, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলে আরও কম। বস্তুত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানগত সামান্য পরিবর্তনই এই প্রবণতার কারণ বলে ধরা যেতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুসমাজ 'কমঠবৃত্তি' অবলম্বন করেছিল। অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজে পুরুষরাই দিশাহারা হয়ে দৈববাদী ও আত্মশক্তি রহিত হীনবল হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে নিস্তরঙ্গ হিন্দুসমাজ ছিল কর্মবিমুখ, ভাববিলাসী, ফলে নারীকে সুরক্ষা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একারণে নারী গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজন বা অর্থনৈতিক কারণে নারীকে ছদ্মবেশ ধারণ করে বাইরে যেতে হত। তাছাড়া পুরুষশাসিত সমাজ একালে নানা বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ করে নারীকে গৃহবন্দি হতে বাধ্য করেছিল। এক রাত্রির জন্যও নারী বাড়ির বাইরে নির্বাহ করতে পারত না। পথঘাটও নারীর পক্ষে যেমন নিরাপদ ছিল না তেমনি যত্রতত্র নারীকে পুরুষের লালসার শিকার হতে হত, ফলে নারীর ঘরের বাইরে যাবার উপায় থাকত না। মনসামঙ্গলে বেহুলার দেবলোক যাত্রাকালে পথের বিঘ্ন একথা প্রমাণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ফলে নারী খানিকটা মুক্ত হয়। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম জাতপাতের ব্যবধান তুলে সমাজকে অনেকখানি মুক্তি দিতে পেরেছিল ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীও ধর্মাচরণে নিযুক্ত হয়েছিল। তারা মুক্তাঙ্গনে দলবদ্ধভাবে কীর্তন করার অধিকার লাভ করেছিল। বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তিতে পরিণত হয়, তাই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে নারী শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে অনেকখানি মুক্তিলাভ করে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু কাহিনীতে ব্যাধ সমাজের দেবী চণ্ডী গোধিকা রূপ ধারণ করে শেষে কালকেতুকে বর দিতে তার গৃহে উপস্থিত হল, ফুল্লরার সঙ্গে কথোপকথনে বোঝা যায় দেবী আসলে উচ্চবর্ণের গৃহবধূ। উচ্চবর্ণের নারীরা সতীনের জ্বালায় গৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হত। অবশ্য খুল্লনাকে বনে ছাগল চরানোর অপরাধে 'অষ্টপরীক্ষা' দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়নি। একালে রচিত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে গতানুগতিক কাহিনী-ধারাকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও চরিত্রগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে নারীর এই অবস্থার আরও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ডোম নারীদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় কলিঙ্গা, কানড়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর জন্য অস্ত্রধারণ করেছে অর্থাৎ এখানে নারী শুধুমাত্র গৃহবধূ হয়ে থাকেনি, বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটল। কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগে সর্বস্তরে অনৈতিকতা, বিলাস-ব্যাভিচার, নীতি ও রুচিহীনতা বিরাজ করেছিল, ফলে সামাজিক প্রয়োজনেই নারীকে আবার খানিকটা গৃহবন্দি হতে হয়েছিল।বস্তুত নারী এই সময়ে জীর্ণ লোকাচারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের

প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে নারী অনেকখানি মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু এই পর্বে নিরাপত্তার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়লে রক্ষণশীল সমাজও তাদের প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীর ভাববাদী পরিবেশে এক শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্ম সাধনায় উন্মার্গ হয়ে পড়লেও আরেক শ্রেণীর মানুষ পার্থিব জীবনকে আঁকড়ে ধরে আচার-বিচারে জড়িয়ে ফেলে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতেই আচার-বিচার-সংস্কার সমাজকে রুদ্ধ করে ফেলে। বিশেষত নারী সমাজ গৃহাভ্যন্তরে আচারে-সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া পুরুষশাসিত সমাজ নানা বিধান, নানা শ্রেণীতে নারীকে ভাগ করে কুক্ষিগত করে ফেলে। তাই শিবায়নে দেবী পার্বতী বাগদী নারীর বেশ ধারণ করে শিবঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়। অবশ্য এরপরে শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে পার্বতী পুত্র-কন্যার হাত ধরে পিতৃগৃহে যাত্রা করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তাই দেখা যায় বিদ্যাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। দাসী ও সখী পরিবেষ্টিত হয়েও বিদ্যা সামাজিক বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের দেবখণ্ডের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের দেবখণ্ডে হরগৌরীর সংসারযাত্রার ভিন্নতা দেখা যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে সতী পিতৃগৃহে যেতে চাইলে শিব অনুমতি না দিলেও শেষ পর্যন্ত নন্দী-ভৃঙ্গী ও শিবানুচররা সম্মিলিতভাবে সতীকে পিতৃগৃহে পৌঁছে দেয়। ভারতচন্দ্রের সতী কিন্তু বীভৎস্য মূর্তি প্রদর্শনে শিবঠাকুরকে ভয় দেখিয়ে পিতৃগৃহে যাত্রার সম্মতি আদায় করেছে। তাই শিবঠাকুর বাধ্য হয়ে বলে ফেলে -

"মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ে গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥" (ভারতচন্দ্র/১৯)

ব্যাসের তপস্যা ভঙ্গ করতে অন্নপূর্ণার বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ ধারণ যতটা কাব্যের প্রয়োজনে ততটা সামাজিক প্রয়োজনে নয়। তাছাড়া মনসা বা চণ্ডী কেউই কিন্তু পুরুষের অন্যায় শক্তিকে অবদমিত করতে পারেনি। মনসা চাঁদের পূজা আদায় করতে পারেনি, চণ্ডী খুল্লনার সহায়তায় পূজা আদায় করে, অন্নপূর্ণার কিন্তু ব্যাসের মত পুরুষের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের মত রাজা-মহারাজার অন্তরপুরে সে প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্যাসের একগুঁয়েমি সহজেই ব্যর্থ করে দেয়। সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা যায়।

পঞ্চদশ শতক থেকে নারীশিক্ষার খানিকটা হলেও অগ্রগতি হতে থাকে। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে নারীর লেখাপড়া শেখার কথা পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গলে বেহুলা ও অন্যান্য নারীদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গ নেই। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা সামান্য লেখাপড়া জানা নারী। খুল্লনা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, অপরের হস্তাক্ষর ও ধনপতির হস্তাক্ষরের পার্থক্য সে বুঝতে পারে। বস্তুত নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না। সমাজে পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তান অবহেলিত হত। তাই পুত্র সন্তানের শিক্ষার কথা বললেও নারীকে পুতুলখেলা, ঘরকন্না, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলিই মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তাই ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে গর্ভবতী খুল্লনাকে বলে যায় –

"যদি কন্যা হয় শশীকলা নাম থুয়ো।
দেখিয়া উত্তম বরে তায় বিভা দিয়ো॥
যদি পুত্রে হয় নাম রাখিও শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে পুত্রে করিও সুমতি॥" (মুকুন্দ / ১৫২)

বস্তুত যেহেতু অবরোধ প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তাই নারী বাল্যকালে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত না। হিন্দু মেয়েদের মত মুসলমান মেয়েরাও অনেকে লেখাপড়া করত। গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষালাভ করত।[৪০] আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতীর শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ আছে। বিশেষত হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার কথা জানা যায় – দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের নায়িকা চন্দ্রানী,

ভারতচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিদ্যা শিক্ষিতা এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে অতুলনীয়া। পুথিগত শিক্ষার বাইরে অনেক নারীই কিছু কিছু শিক্ষালাভ করত। চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা, লীলাবতী, দুর্বলা দাসী, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীরা কম বেশী লেখাপড়া জানত। ফুল্লরার মত ব্যাধ রমণীও পণ্ডিতের কাছে পুরাণকথা শুনেছিল, বস্তুত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই পুথিগত শিক্ষায় না হলেও সামাজিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম নারী চেতনার পালে অনেকটা হাওয়া লাগিয়ে ছিল বলেই নারীর চেতনাগত বিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাইতো মুকুন্দের কাব্যে দেখা যায়, লক্ষপতি একমাত্র কন্যা খুল্লনাকে সতীনের ঘরে বিবাহ দিতে দেখে রম্ভাবতী প্রথমে স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং বিফল হয়ে কন্যাকে গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে-

> "খুল্লনা বান্ধিয়া গলে মরিব গঙ্গার জলে
> নাহি দিব দারুণ সতীনে।" (মুকুন্দ / ৯৬)

রম্ভাবতীর এই আত্মপ্রত্যয় চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের ফল।

পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সূত্র ধরেই সমাজে নারীশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, মধ্যযুগের বাংলাদেশ রঘুনন্দনের স্মৃতিশাসন, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, পর্দপ্রথা, জাতিভেদ প্রথা নারীকে আসূর্যম্পর্শা করে তুলেছিল। নারী ছিল ভোগের উপকরণ মাত্র, পুত্রসন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। নারী ছিল নরকের দ্বার। নারীকে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকতে হত। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে নারীর অচলায়তনে সামান্য মুক্তির বাতাস বয়েছিল। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের পূর্বে নারী পুরুষের সঙ্গে ধর্মাচরণ করতে পারত না, কিন্তু ষোড়শ শতকে নারীরাও কীর্তনের আসরে যোগদান করতে পারত। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নারীদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি নারায়ণী দেবীকে শ্রদ্ধা করতেন। নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি মধ্যযুগের পরিবেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বৈষ্ণবসমাজের নারীরা নারী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য সেই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি একালের মত ছিল না। সেকালে কোন কোন মহিলা ক্ষমতার শীর্ষে উপনীত হতে পেরেছিল। এই পর্বে জাহ্নবা দেবী, সীতা দেবী, হেমলতা দেবী, ঈশ্বরী ঠাকুরানী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জাহ্নবী দেবী খড়দহের বৈষ্ণবসমাজে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন; তিনি ছিলেন প্রথম গোস্বামীনী। জাহ্নবা দেবী ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী এবং হেমলতা দেবী শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মাচরণ ছাড়াও সামাজিক ভেদাভেদ দূর করতে জাহ্নবা দেবীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৪১] জাহ্নবা দেবী মধ্যযুগের নারীশিক্ষা বিস্তারে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। মধ্যযুগের বাংলাদেশে শিক্ষাদীক্ষার তেমন চল না থাকলেও জমিদার বা স্থানীয় রাজা মহারাজাদের দৌলতে কিছু কিছু টোল, পাঠশালা, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন হত, তবে তা ছিল একান্তভাবে পুরুষের জন্য। মুসলিম অধিকারের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে হিন্দুসমাজে স্ত্রীরা পর্দানসীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সামাজিক বিধিনিষেধ ও প্রথার কারণেও নারীর শিক্ষাদীক্ষা সম্ভব ছিল না। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ফলে জাতিভেদ ও সামাজিক বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে পড়ে। হরিনাম সংকীর্তন ছাড়াও কাজীদলনের মত আন্দোলনে নারীরা অংশ গ্রহণ করেছিল।এই ধর্ম আন্দোলনের ফলে নারী-সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। জাহ্নবা দেবী স্বয়ং মহিলাদের বাংলা ও সংস্কৃত শেখাতেন। ধর্মগুরু ছাড়াও তিনি শিক্ষিকা ছিলেন। হেমলতা দেবীরা বিষ্ণুপুরের রাজ-অন্তঃপুরের নারীদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৪২] গ্রামে গ্রামে আখড়া স্থাপন করে তাঁরা ধর্মাচরণ ছাড়াও লেখাপড়া শেখাতেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব নারী-সমাজে এই ধরনের সচেতনতা ছিল, ফলে জাতিভেদ ও পর্দাপ্রথার মত কুসংস্কারের গ্রন্থি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হেমলতাদেবী বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজমহিষীরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৪৩] ডঃ প্রভাত কুমার সাহা যথার্থই লিখেছেন— "যখন সপ্তদশ-

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুসংস্কার এবং নৈতিকতা শিথিল হয়ে গিয়েছিল তখন বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহিলাদের মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ ও নেতৃত্ব দান নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই পরিবর্তনকে নিঃশব্দ নারী আন্দোলনের ফল বলেই অভিহিত করা বোধহয় সমীচীন হবে।"[৪৪] মঙ্গলকাব্যগুলি অধ্যয়ন করলেও এসমস্ত ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সমাজ তৎকালে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিল কিন্তু তার প্রভাব সমাজের গভীরে পড়েনি একথা বলা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী দেবী শিক্ষিতা ছিলেন, তিনি মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি বলে চিহ্নিত। শুধু পুথিগত শিক্ষাই নয় শিল্প, সঙ্গীত চর্চায়ও নারীরা অগ্রণী ছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থায় নারীরা নিরাপত্তার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়লে শিল্প, সঙ্গীত চর্চা, নৃত্যগীত পরিবেশনের স্থানগুলি দখল করে নেয় বারবনিতাগণ। তবে অভিজাত ভদ্র গৃহের নারীরা যে নৃত্যগীত ও সঙ্গীত চর্চায় পারদর্শিনী ছিল তা দেখা যায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে। বিদ্যা ও তার সখীরা প্রত্যেকেই সঙ্গীত চর্চায় দক্ষ ছিল। এই পরিবর্তনগুলি সমাজ বিবর্তনের ফল বলে মনে করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের নারী চরিত্রগুলি অর্থাৎ দেবী ও মানবী চরিত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যগুলির একটা পারম্পর্য আছে। কালগত বিভাজন অনুযায়ী মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত নারী চরিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রথম সৃষ্টি মনসামঙ্গল। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাসের কাব্যে দেখা যায় কিভাবে মনসা পরিবার ও সমাজের কাছে ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পূজা প্রচারে অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিল। কুলীন পিতার অবৈধ সন্তান, বিমাতার দ্বারা লাঞ্ছিত, বিবাহ রাত্রে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সমাজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত মনসা নিজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মনসা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু সমাজ মানস চূড়ান্তভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে সাহিত্যে, তাই সাহিত্যের চরিত্রগুলি সমাজ চরিত্রেরই প্রতিফলন। একালের যে নারী-জাগৃতি ও নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যায় তার সূচনা হয়েছিল মধ্যযুগে, মনসা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ। পুরুষশাসিত সমাজের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পুরুষের স্বীকৃতিলাভ সেকালে সহজ ছিল না। মনসা ছলে-বলে-কৌশলে সেদিন পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিভূ চাঁদ সদাগরের উৎকট ব্যক্তিত্ব ও একগুঁয়েমিকে পরাভূত করেছিল আপন আত্মশক্তিতে, সুতরাং মধ্যযুগের প্রথম পর্বেই নারীর আত্মজাগরণ শুরু হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে তৃণ- লতা-গুল্মের মত মধ্যযুগীয় সমাজের মানুষ সহজেই নারী-শক্তির প্রাধান্য মেনে নিলেও ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের প্রতিভূ চরিত্ররা সহজে নারী-শক্তির বশ্যতা স্বীকার করেনি। সংস্কার কখনও দলবদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হয় না, সুতরাং মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে নারী-জাতিও ভাল চোখে দেখেনি, তাই চণ্ডী মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়নি। একইভাবে বেহুলার দেবলোকে যাত্রার সংকল্পকেও সনকার মত নারীরা ভাল চোখে দেখেনি। বস্তুত বেহুলার দেবলোকে বিজয়িনী হয়ে আসা সমাজের কাছে স্বীকৃতি লাভ। মনসা জঙ্গী মনোভাব নিয়ে, বেহুলা বাঙালীর চিরাচরিত সম্পর্ক ও মমত্ববোধ নিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলন নারীর আত্মচেতনায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। প্রেম-ধর্ম সাধনার মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রীতির বীজ উপ্ত হয়, তাই চৈতন্যযুগে ও পরবর্তী চৈতন্য প্রভাবিত সমাজে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসার খলতা, উগ্রতা যেমন হ্রাস পায় তেমনি চাঁদের উগ্র ব্যক্তিত্ববোধ হ্রাস পায়। একারণেই জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা প্রথমেই চাঁদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের চেষ্টা করে পীরিতের পূজালাভের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়ে বলপ্রয়োগ করে। আর এখানে চাঁদ সদাগরও অনেক বেশী নতজানু, ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর মনসার কাছে স্তবস্তুতি করেছে। আবার জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ সদাগরকে শিবঠাকুর মনসাপূজার কথা বললে চাঁদ বলে-

"লাজ নাই পদ্মার এ মত বোলে বাণী।

শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপানি॥
স্বামীএ ছাড়িল যাকে দেখি অনাচার।
হেন জনা পূজিবার ইচ্ছা আছে কার॥ (জগজ্জীবন/১১৪)

আসলে মনসা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিনী হয়েছিল, তাই কলঙ্কিনীর বশ্যতা স্বীকার চাঁদের পক্ষে সম্মানহানিকর ছিল। সমাজ সেদিন শক্তিমানের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল, তাই চাঁদ সদাগর নারী-শক্তির সামর্থে বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং নারী-শক্তির উত্থানকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে চণ্ডীর প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অন্য মাত্রা পেয়েছে। যে চণ্ডী একদা মনসার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিতে পারেনি সেই চণ্ডী স্বয়ং মনসা প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠা খুঁজেছে, কারণ মনসামঙ্গলে চণ্ডী শিথিল চরিত্র স্বামীকে নিয়ে হিম্‌সিম খেয়েছে। অকর্মণ্য, কামুক, ভোজন রসিক মানুষটি চণ্ডীমঙ্গলে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে; সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও সন্তান প্রতিপালনে অপারগ দরিদ্র স্বামীর উপর আস্থা হারিয়ে চণ্ডী স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছে। চিরাচরিত সংস্কার অনুযায়ী স্বামীকে দেবতা ভাবলেও তার কর্মক্ষমতায় আস্থা হারিয়ে স্বয়ং শক্তি অর্জন করেছে। তবে তার প্রতিষ্ঠা মনসার মত আবর্তসঙ্কুল নয়, অনেক মসৃণ। কলিঙ্গরাজকে ভয় দেখিয়ে বশ্যতা আদায় করে, কালকেতুকে ধন দান করে বশ্যতা আদায় করে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের মধ্যমণি ধনপতির স্বীকৃতি আদায়ে তাকে খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবীকে আর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেব স্বয়ং পূজা প্রচারে আবির্ভূত হয়নি, অনুচর হনুমানকে দিয়ে কর্যোদ্ধার করেছে। ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চণ্ডীর বিরোধ থাকলেও এই বিরোধ অনেকটা সমধর্মী। আপাতপক্ষে চণ্ডীর পরাজয় হলেও চণ্ডীই ধর্মদেবের প্রতিষ্ঠায় বাঙালী নারীর চিরায়ত ধর্মকে সামনে রেখে, কন্যা-জামাতা লাউসেন ও কানড়াকে দিয়ে ধর্মদেবকে জয়ী করেছে। আর শিবায়নে ভিখারীর ঘরণী গৌরী পরিবারের কর্ণধার হয়ে শিবঠাকুরকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করেছে এবং তার স্পষ্ট নির্দেশ— হয় চাষবাস করে সংসার প্রতিপালন কর, নয়তো স্ত্রী-সন্তান-দাসদাসী পরিত্যাগ কর। শুধু কৃষির দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও স্বচ্ছলতা সম্ভব নয়— তাই শিবঠাকুরকে বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই চাষী শিবঠাকুর আবার ভিখারীতে পরিণত হয় অষ্টাদশ শতকে। ভারতচন্দ্রের চণ্ডীর নির্দেশ— ভিখারী পুরুষের স্ত্রী-পরিজনাদি থাকা উচিত নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নপূর্ণার পূজা প্রচারের কোন প্রচেষ্টা নেই, কেননা নারী তখন অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতকে নারী অনেক প্রতিষ্ঠিত বলেই পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বন্ধনকে অস্বীকার করতে পেরেছে। ধর্মমঙ্গলে কলিঙ্গা, কানড়া বীরাঙ্গনার মত স্বামীর সহযোগী। শুধুমাত্র গৃহবধূ হয়ে থাকা সম্ভব নয়— এই বাস্তব সত্য ধর্মমঙ্গলে উপলব্ধ। শিবায়নে চণ্ডী শিবের সঙ্গে বিবাদ করে পতিগৃহ পরিত্যাগ করেছে আর অন্নদামঙ্গলে সতী স্বামীকে ভয় দেখিয়ে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি আদায় করেছে।

চৈতন্য-পরবর্তীকালে নারীর ভূমিকা অন্য মাত্রা পায়; নারী অনেক বেশী প্রতিবাদী বলেই জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে লখীন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকে দায়ী করা হলে বেহুলা তা মেনে নেয়নি। বস্তুত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এই প্রবণতা আর দেখা যায়নি। একারণেই ধর্মমঙ্গলে কানড়া পিতামাতার নিষেধ অমান্য করে একাকী গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। নিজস্ব কামনা-বাসনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে বলেই দৌলত কাজীর কাব্যে চন্দ্রানী নপুংসক স্বামী বামনকে পরিত্যাগ করে লোরককে পতিত্বে বরণ করে। বিদ্যা সামাজিক কারণে অন্তঃপুরে বন্দি হলেও সামাজিক বিধিবিধানকে অগ্রাহ্য করে, প্রচলিত মূল্যবোধকে লঙ্ঘন করে সুন্দরকে দেহ দান করে। বস্তুত হিন্দু নারীর দ্বিতীয় পতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত মহাভারত ছাড়া এর আগে দেখা যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে নারীও যে ভেসে গিয়েছিল তার প্রমাণ বিদ্যাসুন্দর কাব্য। সামাজিক ইতিহাসে এটাকে একটা স্থূল ধরনের বিবর্তন বলাই সমীচীন। লক্ষণীয় বিষয় যে. মনসামঙ্গলে মনসা, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নের চণ্ডী, অন্নদামঙ্গলের অন্নপূর্ণা একই দেবীর সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তিত রূপ। চৈতন্য- পূর্ববর্তীকালের মনসামঙ্গলে চণ্ডীর ভূমিকা অতি

সামান্য। চৈতন্য-পরবর্তীকালের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত চণ্ডীর বিশেষ পার্থক্য নেই। চৈতন্য প্রভাবিত সমাজে মনসা কোমল ও মসৃণ হয়ে পড়েছিল এবং মনসা-ই ধীরে ধীরে মুকুন্দের চণ্ডীতে পরিণত হয়েছে, আবার যুগের প্রয়োজনে নারী-শক্তির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এবং তার সঙ্গে চিরায়ত বাঙালী নারী চরিত্র মিশ্রিত হয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যে নিখিল জনের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছে; শাক্ত সাধকগণের কাছে জগজ্জননীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগীয় বাঙালীর পারিবারিক জীবনের পরিচয় আছে। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবার ছিল পুরুষ-কেন্দ্রিক অর্থাৎ পুরুষ পরিবারের কর্তা। সেখানে নারী ছায়ার মত আশ্রিত, এবং পরিবারে নারী বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নানাভাবে পুরুষের অধীন। নারী পরিবারের কেন্দ্র স্বরূপা হলেও তার জগৎ ছিল অন্দরমহল। তাদের সুখ-দুঃখ, আবেগ-আবেদনের প্রতি পুরুষের লক্ষ ছিল না।তাই শিথিল চরিত্র পুরুষকে আঁচলে বেঁধে শুতে হয়, নারী দর্শন মাত্র পুরুষ কামাসক্ত হয় আর নারী তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। অথচ সনকাকে গর্ভপত্র নিতে হয়েছে, বেহুলা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনলেও তাকে পরীক্ষা দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। সেই নারী পরিবারে কন্যা, বধূ ও মাতা রূপে স্নেহে, মায়া-মমতায় ভরিয়ে রেখেছিল। নারীর পৃথক ধর্মাচরণের অধিকার ছিল না বলেই মনসাপূজার অপরাধে সনকাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পরিশুদ্ধি ঘটানো হয়। বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের ফলে নারীর স্বাতন্ত্র্য খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, তাই চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখা যায় সনকা মনসার পূজা করলে চাঁদের আগমনে তাকে ভয়ে পলায়ন করতে হয়েছে। নারীকে নানাভাবে শারীরিক নিগ্রহ ও শাস্তি বিধানের কথা পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীতে কালকেতু ফুল্লরাকে দিয়ে মুকুন্দ আদর্শ পরিবার গঠনের চেষ্টা করেছেন। আবার ধনপতি উপাখ্যানে পুরুষের বহুবিবাহের কারণে সপত্নী সমস্যা থাকলেও একটা পারিবারিক বৃত্তের ছবি আছে। ধর্মমঙ্গলেও সুন্দর পারিবারিক গঠনের চিত্র আছে। সপত্নী সমস্যা অনেকটা মর্মগত হওয়ায় বেশীরভাগক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্দর সহাবস্থানের চিত্র আছে। আবার সপত্নী সম্পর্ক, বিমাতা ও সপত্নী সন্তানের সম্পর্ক অনেকটা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন ধরে, তাই পুরুষের ইতরতা ও নারী লোলুপতার চিত্র পাওয়া যায় কাব্যগুলিতে। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরার মধ্যে আদর্শ পারিবারিক গঠন নেই। খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারলে কালকেতুর ফুল্লরাকে প্রহার করার কথাও কবি উল্লেখ করেছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে পারিবারিক সম্পর্কগুলি খানিকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যে দেখা যায় নারী পারিবারিক জীবনের কর্ণধার হয়ে অনেকক্ষেত্রেই পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই অন্নদামঙ্গলে দাম্পত্য কলহে শিব গৃহত্যাগ করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে অন্নপূর্ণার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্ত নারী শেষ পর্যন্ত পিতৃগৃহে স্থান পেত না, ফলে পতিগৃহই তার একমাত্র আশ্রয় ছিল। নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাকে পতিগৃহেই থাকতে হত, মুকুন্দের কাব্যে ফুল্লরাও ছদ্মবেশিনী দেবীকে সেই উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র ছদ্মবেশিনী দেবীর মুখে শুনিয়েছেন পারিবারিক দ্বন্দ্বে নারীর গৃহত্যাগের কথা, আপনজন সন্ধানের কথা। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে ফিরে যেতে বললেও ঈশ্বরী পাটনী কিন্তু অন্নপূর্ণাকে গৃহে প্রত্যাগমনের কথা বলেনি। চেতনা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনেই অন্নদামঙ্গলে বাঙালীর পারিবারিক বৃত্তের এই ভাঙন লক্ষ করা যায়। সপত্নী সমস্যা, দাম্পত্য কলহ, ঘরজামাই-প্রথা, অনেকক্ষেত্রে জামাতা গৃহে কন্যার পিতামাতার বসবাসের ফলে পারিবারিক জীবনে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর প্রেমচেতনাগত মূল্যবোধের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রেম একটি অনুভূতি হলেও একটি সমাজ চেতনাগত সত্বা। সমাজকে অস্বীকার করে প্রেম চেতনাগত মূল্যবোধটিকে ধরা অসম্ভব। মধ্যযুগে বাংলার জনজীবন ছিল সে যুগের নানা বিধিনিষেধের অচলায়তনে আবদ্ধ। সুতরাং সে যুগের কবিগণ

সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই সাহিত্যে প্রেমের চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাগত সারল্যের মতই তাদের প্রেমের অনুভূতিও জটিলতা মুক্ত ছিল। সাধারণ প্রেমের দু'টি রূপ ছিল, বিবাহ-পূর্ব প্রেম ও বিবাহ-পরবর্তী প্রেম। বাঙালী সমাজে বিবাহ-পূর্ব প্রেমের সমর্থন ছিল না, তাই বিবাহ-পরবর্তী গার্হস্থ্য প্রেমের চিত্রই মূলত লক্ষ করা যেত। চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত প্রেমের একটি রূপচিত্র পাওয়া যায়। চর্যাপদে সমাজ বিগর্হিত প্রেমের গোপন অভিসার যাত্রার চিত্র পাওয়া যায়। তারই লৌকিক জনশ্রুতি দেখা যায় জয়দেব-পদ্মাবতী কিংবা রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের রাধা প্রেম আসলে ভাগিরথী তীরবর্তী কোন গোপপল্লীর গোপ বালকের নির্লজ্জ দেহ সম্ভোগ লিপ্সার প্রকাশ। বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেম সাধনার কথা পাওয়া যায় তা সর্বদা লোকায়ত প্রেমচেতনার অভিজ্ঞতা বহন করে না, কেননা তা ছিল অনেকটা ঐশ্বরিক প্রেম। আধ্যাত্মিক প্রেমে প্রেমের সমস্যা সঙ্কুলতা দেখা যায় না - কেননা সেখানে রক্তমাংসের মানুষের পরিবর্তে মানবীয় চেতনা বিহীন একটি আধিভৌতিক শক্তিকে কল্পনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ তাঁদের সৃষ্ট পদাবলীতে যে আধ্যাত্মিক প্রেমের চিত্র অঙ্কণ করেছেন তা মানব জীবন অতিরিক্ত বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের তাই প্রশ্ন ছিল -

"সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে ?"

তিনি বিশ্বাস করতেন বৈষ্ণব কবিগণ বাস্তব জীবন থেকেই রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমের চিত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা ভারতীয় দর্শনে দেবতা আর প্রিয়জনের মধ্যে ভেদ করা হয়নি।

বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের জয়গান করা হয়েছে। কিন্তু কেন ? আসলে বৈষ্ণব কবির রোমান্টিক মন সর্বদাই সমাজ জীবনের ঘেরাটোপে, গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধনে সীমায়িত করে খণ্ডিত করে প্রেমকে দেখেননি। কিন্তু সমাজকে অস্বীকার করার মত শক্তি ও সাহস তাঁরা দেখাতে পারেন নি, তাই আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আচ্ছাদিত করে প্রকাশ করেছেন। সমাজের কঠোর অনুশাসনে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা বিঘ্নিত হয়, এ কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধা অবশ্য এক অর্থে বিদ্রোহিনী। চৈতন্য-পূর্ব যুগের বিদ্যাপতির রাধা রাজসভায় পদচারিনী বলেই বিলাসিনী, কিন্তু জনসভার কবি চণ্ডীদাসের রাধা ভাবসম্মিলনেই প্রেমের সমাধি দিয়েছে, গৃহপ্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে নি। চৈতন্যদেবের ধর্ম সাধনা যদি নারী ব্যক্তিত্বের পালে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে থাকে তাহলে চৈতন্যপরবর্তীকালের পদকর্তা গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা অভিসার যাত্রায় দুঃসাহসিক। কুল মর্যাদার কপাটকে ভেঙ্গে সে মানবীয় প্রেমের জয় ঘোষণা করেছে।মনসামঙ্গলে নরনারীর প্রেমের ছবি নেই,তবে দেবখণ্ডে শিবঠাকুর নামক চরিত্রের নারী লোলুপতার চিত্র আছে। আর বেহুলা-লখীন্দরের এক রাত্রির দাম্পত্যে কোন প্রেমের সম্পর্ক নেই। আসলে বাল্যবিবাহের ফলে নারীর প্রেমের উন্মেষ হবার আগেই বিবাহ হত, পুরুষের বিবাহও অনেক অল্প বয়সে হত, ফলে প্রেমের উন্মেষ লক্ষ করা যেত না। নারী ছিল পুরুষের সেবাদাসী, ফলে দাম্পত্য প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না সনকা ও চাঁদ সদাগরের দাম্পত্য জীবনেও। নারী ছিল পুত্রসন্তান উৎপাদনের যন্ত্র , তাই নারীরা সাধারণত বহু সন্তানের জননী হত। চৈতন্য-পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বরীয় প্রেমের ব্যাপক প্রচারের ফলে নরনারীর সম্পর্কে প্রেমের উন্মেষ লক্ষ করা গেল। চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে বিবাহিত ধনপতি পারাবত ক্রীড়ার সময় খুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হয়, এবং পরিণতিতে বিবাহ হয়। কিন্তু লহনা-ধনপতির দাম্পত্যে প্রেমের স্পর্শ নেই, তার কারণও হতে পারে বাল্যবিবাহ। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার সম্পর্কে দাম্পত্য প্রেমের পরিচয় আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রেমেরক্ষেত্রে

নারীপুরুষ অনেক বেশী সক্রিয়। কানড়া তাই লাউসেনকে লাভ করার জন্য একাকী গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বৈষ্ণবপদাবলী ও অনুবাদ সাহিত্য বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে নারীর পতি নির্বাচন এই প্রথম। দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যে চন্দ্রানীর লোরককে লাভ করার বৃত্তান্ত নারীর বলিষ্ঠতার পরিচায়ক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল হারেম থেকে আগত ব্যাভিচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেশীয় জমিদার ও রাজা মহারাজাদের রাজসভা হয়ে জনসভায় প্রবেশ করে যায়। একারণেই বৈষ্ণবপদাবলী ও পরকীয়া তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যে প্রেমের স্পর্শ নেই। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে লখীন্দরের মাতুলানীর ইজ্জত হরণ বৃত্তান্ত, অন্নদামঙ্গলে রতিবিলাপে, শিববিবাহ ও হরগৌরীর দাম্পত্য সম্পর্কে, নলকূবর বৃত্তান্তে, বসুন্ধর-বসুন্ধরা বৃত্তান্তে, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়ে, মানসিংহ পালায় দাসু-বাসুর উক্তিতে কামনার ক্লেদ ছাড়া প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যায় না। এমন কি দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রেমের স্পর্শ নেই, ভারতচন্দ্রের নারীদের পতিনিন্দা কিংবা ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষা ও নয়ানীর বৃত্তান্তে, গোপীচন্দ্রের গানে হীরানটীর আখ্যানে প্রেমের ছোঁয়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কবিগান, খেউর, ঝুমুর গানে অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন এখানে নারীকেও বিপথগামী করে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ভ্রমর বৃত্তি নিন্দনীয় ছিল বলে মনে হয় না।বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রেম কখনোই সংসারের সীমারেখাকে, পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। আসলে গার্হস্থ্য জীবনে বাঙালীর প্রেমের আদর্শ ছিল সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ। তাই বিবাহিত জীবনই মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের আদর্শ ভূমি। একারণেই লখীন্দরের মৃত্যুর পর দেবলোক বিজয়িনী হয়ে ফিরে আসাতেই বাঙালীর মন প্রেমাপ্লুত হত। সেখানেই তার নিষ্ঠা ও বীর্যের প্রকাশ। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা, লহনা ও খুল্লনার প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে সহনশীলতা ও নীরব স্বামী সেবার মধ্যে দিয়ে। দেবখণ্ডে হর-গৌরীর সংসারযাত্রার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পার্থিব জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যে যে জীবন রস আছে তাতেই প্রেমের সার্থকতা। তাইতো ব্রতকথায় ব্রতীর সমস্ত কামনা স্বামী ও পুত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে, আরাকান রাজসভায় সৃষ্ট কাব্যগুলিতে প্রেমের বলিষ্ঠতা প্রকাশিত। বিদ্যাসুন্দরের বিবাহপূর্ব ভোগ চিত্রে সমাজের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে দেহজ আকর্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজ মানসিকতার পরিবর্তনই এই পরিবর্তন চিহ্নিত করে।

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতাহীনতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অসহযোগিতা প্রেমের উন্মেষে সহায়তা করেনি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যতটুকু নারী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তারই অনুরণন শোনা গিয়েছিল এই পর্বের সাহিত্যে। একই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বিধবা নায়িকাদের ও সমাজ বিগর্হিত প্রেমের একাধিপত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য প্রেম চেতনায় যুগগত বিবর্তন চিহ্নিত করেছে।

মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যেই একটি বিশিষ্ট চরিত্র শিব। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবের ভূমিকা আছে। মনসামঙ্গল কাব্য থেকে শিব চরিত্রটির পরিণতি লক্ষ করলে বোঝা যায় যুগগত পরিবর্তনের ফলেই শিব চরিত্রটি বিবর্তিত হয়েছে। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রামীণ সমাজপতি. চণ্ডীমঙ্গলে শিবঠাকুর ভিখারী. শিবায়নে শিবঠাকুর কৃষক, আর অন্নদামঙ্গলে শিবঠাকুর আবার ভিখারীতে পরিণত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলেও শিব ঠাকুরের ভিক্ষাবৃত্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের প্রধান রচয়িতারা হলেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনজন কবির কাব্যেই শিব চরিত্রটি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজপতি। কৃষিজীবী সমাজের দেবতা হলেও সে অলসতাবশত কৃষিকাজ করে না। তবে কখনো কখনো তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে

হিন্দুসমাজ থেকে ব্রাহ্মণের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটেছিল ; একারণে বাঙালী সমাজের উপর থেকে ওদের এতদিনের কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছিল। প্রাক্ তুর্কী আক্রমণকালে বাংলার গ্রামগুলি ছিল নিস্তরঙ্গ। ফলে গ্রামবাসীরা ছিল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভাববিলাসী। রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটলে সেই স্থান দখল করে নেয় অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ নবোদ্ভূত বণিক সমাজ। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও অলসতাবশত দেববৃত্তি কৃষিকাজে অমনোযোগের ফলে ব্রাহ্মণদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমনের ফলে ব্রাহ্মণ ও চাষার ভেদ বোধহয় খানিকটা কমে গিয়েছিল, তাই বচাই চাষার গৃহে সকন্যা শিবকে দেখে বচাই জননী বিনতা ভাবে, শিব বোধহয় তার পুত্রের সঙ্গে কন্যা বিষহরির বিবাহ দিতে এসেছে। নরায়ণ দেব লিখেছেন -

"হাল চষিতে চাষাগণ দেখিল সুন্দরি।
বুলেলেক চাষাগণ দেখিয়া বিষহরি॥
নাচে বচাইর মাও বিনতা সুন্দরি।
কন্যা বিহা দিতে আইল সিব অধিকারী॥ (নারায়ণ দেব / ২৪)

আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে এইভাবে ব্রাহ্মণের অধঃপতন ঘটেছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে ডোমনী বেশধারী চণ্ডী শিবকে 'দেবতা' বলে সম্বোধন করেছে। তৎকালে ব্রাহ্মণ দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে শিব ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজপতি হলেও ওর সংসারে অভাব অনটন ছিল না। তবে প্রায় প্রতিটি মনসামঙ্গলেই শিবঠাকুরের কোচ রমণীর সংসর্গ দোষের কথা আছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা ও ভণ্ডামী সমাজকে কলুষিত করেছিল। তাই কবি স্বয়ং ভণ্ড সমাজপতিদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষার জন্য চণ্ডীর কাছে আবেদন জানিয়ে লিখেছেন -

"ডোমনির সঙ্গে সহিয়ালা করে সাধিবারে কাজ।
সেই চণ্ডী রক্ষা কর সুজন সমাজ॥ (বিজয় গুপ্ত / ২৭)

গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকায় শিবঠাকুরকে সংসার প্রতিপালনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। মনসামঙ্গলে একমাত্র নারায়ণ দেবের কাব্যে শিবঠাকুরের ভিক্ষাবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ডোমনী বেশধারী চণ্ডী শিবঠাকুরকে নৌকায় পার করতে গিয়ে বলেছে —

"ঘরের স্ত্রী তুমি রাখিতে না পার।
দেবের দেবরাজ নাম কেনে ধর॥
জর্ম্ম ভিকারি বাউল বচন মাত্র সার।
কড়া গোটা নাহি তোমার পার হইবার॥" (নারায়ণ দেব / ৬)

মনসামঙ্গল কাব্য গ্রামজীবনের কাব্য হওয়ায় তার ছায়াপাত ঘটেছে শিব চরিত্রেও। নারায়ণ দেবের কাব্য রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে। ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি থাকলেও অর্থকৌলীন্য অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে সংসার প্রতিপালনে অক্ষম শিবঠাকুর ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের ভিক্ষোপজীবীতার কথাই বলেছেন। এ সময়ে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ফলে ব্রাহ্মণ ওদের হৃত সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। কারণ চৈতন্যদেবের সাম্যের গান মানুষকে সামাজিক মর্যাদায় অনেকখানি কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। তবে ব্রাহ্মণ ভিখারী হলেও যে সমাজে ওদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুকুন্দের কাব্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ভিখারী শিবের পূজার মধ্যে দিয়ে। 'ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর' অন্যান্য জাতির ব্যবধান হ্রাস পেলে ব্রাহ্মণের স্থান সংরক্ষণের জন্য স্মার্তপণ্ডিতগণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণেতর

সমস্ত জাতিকে 'শূদ্র' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু করণ বা কায়স্থ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য এবং নবশায়ক নামে জাতি ব্যবস্থার নতুন স্তর বিন্যাস হল, একারণে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থকৌলীন্যের জোরে বণিক, কায়স্থ ও বৈদ্যরা সমাজের মধ্যমণি হয়ে পড়লে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। বস্তুতঃ সেকালে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন নিন্দনীয় ছিল না। বৈষ্ণবসমাজে ভিক্ষাবৃত্তি দেববৃত্তি হিসাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের দীন-দরিদ্ররা বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের সামাজিক বাধাও দূরীভূত হয়। এইকারণে ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী। মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের কৃষিকাজের কথা বললেও বাস্তবে ব্রাহ্মণের কৃষিকাজ খুব একটা সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলেই বোধ হয় ; তাই হিমালয় প্রদত্ত ভূমিতে মসুর, কার্পাস, মাষ, ধান ফললেও ঘরজামাই শিবঠাকুর কৃষিকাজ করে না, বরঞ্চ ভূত-প্রেত নিয়েই তাস-পাশা খেলে আলস্যে দিনযাপন করে। কিন্তু আপন সংসারে এসে পাকাপাকিভাবে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। সে চাল-ডাল-নুন-তেল-কড়ি-নাড়ু সকলই ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করে থাকে। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুরের ভিক্ষোপজীবীতার কথা থাকলেও সে পেশাদারী ভিক্ষুক নয়; সে কখনো কখনো ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে যেহেতু চৈতন্য প্রভাবিত মুক্ত সমাজ বিরাজিত ছিল, তাই শিবঠাকুর কোচগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করলেও কোচনী বা ডোমনী সংসর্গ দোষের কথা নেই। জনসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা অনেকখানি স্বচ্ছল ছিল বলেই ভিক্ষা দ্বারা, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের আয়োজন হত। চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিক্ষোপজীবী হলেও ভোজনরসিক বাঙালীর প্রতিনিধি। স্ত্রী গৌরীকে মনোমত রন্ধনের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেয়, কিন্তু ভিক্ষাতেও তার আলস্য, তাই প্রত্যহ ভিক্ষায় যায় না। গৌরী তাকে হাতের ত্রিশূল বন্ধক দিয়ে চাল সংগ্রহ করতে বললে ক্ষুব্ধ শিবের সংসার-নিরাসক্তি জন্মায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এই শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেই আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং জনমানস অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মঙ্গলকাব্যের ভাবধারাগত পরিবর্তন হয়েছে। শিবঠাকুর চরিত্রটিরও এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবরূপায়ণ ঘটেছে। বস্তুতঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তন পালা কাব্যের শিবঠাকুর কৃষক; সে কৃষিজীবী সমাজের দেবতা। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভিখারী শিবঠাকুর রামেশ্বরের কাব্যে কৃষকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান মঙ্গলকাব্য-ধারা ধর্মমঙ্গলে শিবঠাকুরের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নেই। এর কারণ অষ্টাদশ শতাব্দী শৈবধর্মের ভগ্নতার যুগ। এই শতাব্দীর শেষ পর্বে রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে এবং রামরাজা ও রতিদেবের মৃগলুব্ধ কাব্যে শৈবধর্মের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। রামকৃষ্ণ রায় মহেশ্বর জ্বর ও বিষ্ণু জ্বরের যুদ্ধে হরি-হরের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে মহেশ্বর জ্বর ও বিষ্ণু জ্বরের যুদ্ধে মহেশ্বর জ্বরের পরাজয় শৈবধর্মের বিভগ্নতা সূচিত করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবঠাকুরের কৃষিকাজের কথা বলেছেন ; যদিও শিবঠাকুরের কৃষিকাজের বিবরণ বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণে, বিভিন্ন লৌকিক ছড়ায় শিবঠাকুরের কৃষিকাজের বিবরণ পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক শিব মাহাত্ম্য কীর্তন করলেও বাংলাদেশের ভিক্ষোপজীবী শিবের স্বরূপ তিনি স্পর্শ করে গেছেন। আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বণিক শ্রেণী সমাজের মধ্যমণি হয়ে পড়লে মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ফলে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হলেও তার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয়। ফলে শুধুমাত্র ভিক্ষোপজীবীতার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। তাই রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর মুখে আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল। আরো পরবর্তীকালে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে গৌরী শিবঠাকুরকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাষবাস করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি শিবঠাকুরের কৃষিবৃত্তি গ্রহণে

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। ব্রাহ্মণের 'পোতবৃত্তি' লঘুকর্ম বলে মনে হয়েছিল, "নরোত্তম ছাড়্যা নরাধম উপাসনা" (রামেশ্বর / ২১৭) বলে মনে হয়েছিল। শিবঠাকুর বাঙালী কৃষক সমাজের দৈন্যদশার কারণ জানত, তাই সে কৃষিবৃত্তি গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মনির্ভরতার কারণে সে ইন্দ্রের কাছে দেবোত্তর পাট্টা হিসাবে জমি নিল, কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান ঋণ নিল, হাতের ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশ্বকর্মার কাছ থেকে লাঙল, জোয়াল তৈরী করিয়ে নিল এবং শেষে নিজের বলদ আর গৌরীর বাঘের সাহায্যে হাল তৈরী করে ভীম নামক মাহিন্দারকে সঙ্গে নিয়ে জমি চাষের জন্য মর্ত্যে যাত্রা করল। বাংলার ভূমিতে সোনার ফসল ফললে শিব ফসলের মোহে ঘর-সংসার ভুলে গেল। এইভাবে ভিখারী শিবের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এল, শিব কৃষকে পরিণত হল। কৃষক পত্নী গৌরী এবার হাতের শাঁখার আবদার করল। এইভাবে আর্থসামাজিক পরিবর্তন শিব চরিত্রটিকে পরিবর্তিত করেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য থাকলেও সাধারণ জনসমাজে বাণিজ্য বৃত্তি খুব একটা গ্রহণীয় ছিল না। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্রগুলি হল অর্থকৌলীন্য পুষ্ট নবোদ্ভূত বণিক সমাজ। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা মনসামঙ্গলে পাল ও সেন যুগের বাঙালী বণিককুলের বহির্বাণিজ্যে একচ্ছত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা তারই ইঙ্গিতবাহী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটতে থাকলে এবং পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদের আক্রমণের ফলে বাঙালী বণিকদের বহির্বাণিজ্যে একচ্ছত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। একারণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যের পরিবর্তে রাজকীয় উদ্যোগে বাণিজ্য শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রায় রাজকীয় উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপর্ব থেকে বিদেশী বণিকদল ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত বণিকদল দেশীয় হাট ও নগর বাজারের ব্যবসায় ভাগ বসাতে থাকে। রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ণিত বর্ধমান নগরে দেশী-ভিন্‌দেশী বণিকদের সমাগম লক্ষ করা যায়। এ কারণেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান কাব্য ধর্মমঙ্গল ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য নেই। শিবায়ন কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় শিবঠাকুর বাণিজ্যের কথা বললেও গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যে উৎসাহিত করে নি। দেবাদিদেব কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি সম্পর্কে গৌরীর পরামর্শ চায় -

"চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥" (রামেশ্বর / ২১৭)

বস্তুতঃ 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা অর্থাগমের খবর জনসমাজে প্রবাদের মত ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু সাধারণ বাঙালী প্রবঞ্চকের বৃত্তি গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না; তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও বাঙালীর ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা গেল বৃত্তি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজে অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। এই কালপর্বে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাই দেখা যায় ভারতচন্দ্রের গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি সমাজে নিন্দনীয় হয়ে পড়েছিল। চিরাচরিত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে কৃষকের অবস্থাও হীন হয়ে পড়েছিল। তাই স্বাধীনভাবে বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে কৃষির দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না হলেও অর্থের বিনিময়ে ক্রীত দ্রব্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। তাই শিবায়নে শিবঠাকুর স্ত্রীর সামান্য শাঁখা পরার শখ পূরণে অক্ষম ছিল। সেকালে সাধারণ বাঙালী গ্রামীণ কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য স্থানীয় হাট বা বাজারে বিক্রয় করে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাত। কখনো গাঁওয়ালে বিক্রয় করত। শিবায়নে শিবঠাকুর স্বয়ং শঙ্খ কেটে শাঁখা তৈরী করে বিক্রয় করেছে।

চাকুরি বৃত্তি তখন পর্যন্ত সাধারণ বাঙালীর বৃত্তিগত মানসিকতায় আসেনি। সাধারণত উচ্চবিত্তের শিক্ষিত

সম্প্রদায় রাজসভায় উচ্চপদ অলঙ্কৃত করত। কতিপয় সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ নিম্ন জাতির মানুষ এবং মুসলমানরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বাসী অন্ত্যজ ডোম সম্প্রদায়ের স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে দলে দলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে দেখা যাচ্ছে। আর্থসামাজিক প্রয়োজনেই মানুষ বৃত্তি পরিবর্তন করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষ চাকুরি বৃত্তি অর্থাৎ অন্যের সেবা বৃত্তি গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না, কেননা বর্ণব্যবস্থার উপরের স্তরে অবস্থিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এতদিন অন্যের সেবা পেয়ে অভ্যস্ত ছিল। আর্থসামাজিক কারণে তদের অবস্থার পরিবর্তন হলেও মনে লুপ্ত সম্মানের অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে শিবায়নে গৌরী শিবঠাকুরকে পরামর্শ দিতে গিয়ে চাকুরি বৃত্তির কথা মনে হলেও তর সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্রে এসে দেখা যাচ্ছে রাজসেবা গৌরীর কাছে 'খচমচ' মনে হয়েছে, তাসত্ত্বেও চাকুরি বৃত্তি বাঙালী মানসিকতায় অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। ভারতচন্দের কাব্যে তাই চাকুরি বৃত্তিধারী বিভিন্ন শ্রেণীর কথা আছে। ভারতচন্দ্র স্বয়ং ভ্রাতাগণের নিকট তিরস্কৃত হয়ে চাকুরি বৃত্তি গ্রহণের জন্য রাজভাষা ফারসী শিক্ষা করেছিলেন। বাঙালী নারীর ব্রতের কামনায় তাই স্বামীর ফারসী শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ এসেছে। বাঙালী নারীর কামনা বাস্তব প্রয়োজন ও পার্থিব সীমাকে অতিক্রম করে বেশী দূর যেতে পারে নি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের শিবঠাকুর পেশাদারী ভিক্ষুক, সে জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণই ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করে। হরগৌরীর সংসারযাত্রা বর্ণনায় ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু দুই কবির যুগগত প্রেক্ষাপট ও আদর্শ ভিন্নতর ছিল। ভারতচন্দ্রের ভিখারী শিবের পরিকল্পনার পিছনে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটই বড় ছিল বলে মনে হয়।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এই পর্বে বাংলার জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলি হল - ক) শাসকের শোষণ ; খ) রাজকর্মচারীদের নিপীড়ন-নির্যাতন ; গ) বিদেশী বণিক, দালাল, মহাজনদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা ; ঘ) নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই সমস্ত কারণে এ সময় এক শ্রেণীর মানুষ প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ধনী হয়ে উঠেছিল, আর এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমাগত দারিদ্র্যের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ছোট বড় রাজা, জমিদার ও শাসকের শোষণের ফলে সাধারণ মানুষ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিল আর তাদের বিন্দু বিন্দু চোখের জল রৌপ্যচক্রে পরিণত হয়ে ধনীর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করেছিল। অষ্টাদশ শতব্দীর সাহিত্যে এই বৈষম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অদৃষ্টবাদী বাঙালী এই পরিস্থিতিকে দৈবের পরিহাস বলে মেনে নিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্বে রচিত সাহিত্যে কৃষক সমাজের সঙ্কট ও বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। শাক্ত পদকর্তাগণ এই অরাজকময় পরিস্থিতিতে জগজ্জননী শ্যামামায়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শাক্ত পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন শ্যামামায়ের কাছে এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন

"কে বলে তোমাকে তারা দীন দয়াময়ী।
কারে দিলে ধনজন মা, হয় হাতী রথী জয়ী,
আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা শাকে অন্ন মেলে কই।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
কেহ থাকে অট্টালিকায় আমার ইচ্ছা তেমনি রই।
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার, কারো ভাগে শাকে বালি ধানে ভরা খই।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
মাগো, আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়েছি মই॥"

কিংবা —

"কেহ সারাদিন পায়না খেতে, কেহ সুখে খায় সাদা চিনি।
কেহ শুয়ে তেতলাতে পালঙ্কে মশারি টানি॥
আমরা মরি গুড়গুড়িয়ে, ভাঙা ঘরে নাইকো ছানি।
অনুভবে বুঝি তারা তেলা মাথায় তেল ঢালানি॥"[৪৫]

ধর্মকেন্দ্রিক বাঙালী কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য এই পদটিতে ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ এক শ্রেণীর মানুষ রাজা বা জমিদারের বিভিন্ন দফ্‌তরে কিংবা নবাগত ইংরেজ বণিকের বিভিন্ন অফিসে চাকুরি গ্রহণ করায় অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়ে পড়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন গোটা মধ্যযুগের সামগ্রিক বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন - "হোসেনশাহী বংশের অবনতির সময় হইতে দেশের বাণিজ্যিক অবস্থা তাড়াতাড়ি পড়িয়া আসিতেছিল। তাহার পূর্ব হইতে বহির্বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিদেশী বণিকের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঘটিতে লাগিল। তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাধারণ বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া ভূমি উপজীবী হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের মর্যাদা আরও বাড়িতে থাকে বটে কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনগিরির দরুন বহুবিবাহের ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা আরও দ্রুত বাড়িতে লাগিল। যজন-যাজন, অধ্যাপন ও গুরুগিরি ছাড়া তাঁহাদের আর কোন বৃত্তির সুযোগ না থাকায় ব্রাহ্মণদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি, যাঁহারা চাকরি ও কায়িক শ্রম হীনকর্ম মনে করিতেন না আর যাঁহারা জমি চষিতেন, তাঁহাদের অবস্থা তেমন খারাপ হয় নাই"।[৪৬]

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে বাংলাদেশে মারাঠা বর্গীর আক্রমণ ঘটেছিল। বর্গী আক্রমণের ফলে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। বাংলার গ্রাম কে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। সবকিছু মিলিয়ে বাংলার গ্রামগুলির স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত মানুষ কৃষিকাজের দ্বারা স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছিল, তরা সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। শিবায়নে যে শিবঠাকুর কৃষির দ্বারা স্বচ্ছলতা আনতে চেয়েছিল ভারতচন্দ্রে সে আবার পেশাদারি ভিক্ষুকে পরিণত হল। এসময়ে স্বচ্ছল ধনীরাও সর্বস্ব হারিয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাইতো ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর ঘরেও অন্নাভাব দেখা দেয়। শিবঠাকুর যেদিকে ভিক্ষাযাত্রা করে সেদিকেই 'হা অন্ন হা অন্ন' ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পায়। মানুষ জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম জীবিকাকেও গ্রহণ করেছিল। হরিহোড়ের জনক-জননীর দারিদ্র্য একথাই প্রমাণ করে। তাই মানুষের কাছে অন্নের চাইতে শ্রেয় কাম্য বস্তু আর কিছুই ছিল না - ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার ভিতরে এই সত্যই নিহিত আছে। এইভাবে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রস্তুতিভূমি রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে অর্থনৈতিক অবস্থা আরো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বর্ণব্যবস্থা তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। জাতি ব্যবস্থার পরিবর্তন ও শিক্ষা বিস্তারের ফলে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। যে বর্ণব্যবস্থায় গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, মানুষ তাকে অস্বীকার করে, বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে, ফলে সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তাহলে সামাজিক পরিস্থিতিই সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত আর্থসামাজিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। প্রায় তিন'শ বছর বিস্তৃত কালপর্বে জন চরিত্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধি শিবঠাকুর বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এভাবে ক্রমবিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ শিব চরিত্র পরিকল্পনার পিছনে যথার্থ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

অনেক সমালোচক পণ্ডিতের মতে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি অষ্টাদশ শতকে অন্নদামঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।[৪৭] কিন্তু লক্ষণীয়, মুকুন্দ চক্রবর্তীর দু'শ বছর পরে যে কাব্যাদর্শ গড়ে উঠেছিল তার যুগগত প্রবণতা, সংস্কার,

রুচিবোধ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সমাজ ইতিহাসে যে বিবর্তন ঘটেছিল সেই বিবর্তনকে সাক্ষী করেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাহিনীধারা এক হলেও যুগচেতনা ভিন্নতর হওয়ায় কাব্যদেহ যুগচেতনা অনুযায়ী রূপ লাভ করেছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে একান্তভাবে দৈববাদী যুগ বলা যায়। দৈবশক্তি অপরিমেয় ও অপ্রতিহত, মানব-শক্তি সেখানে নিতান্তই দীনহীন। দৈবশক্তির কাছে মানব-শক্তি ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত বলেই ভয়ে-ভক্তিতে মানুষ দৈবশক্তির উপর একান্তভাবে আস্থাশীল ছিল। দৈবশক্তির ক্রীড়নক হয়েই মানুষ তাদের সারস্বত জীবন সমাপ্ত করেছে। দৈব শক্তিই হোক আর শাসকের শোষণ - মানুষ তা নির্বিবাদে গ্রহণ করে এসেছে। মনসামঙ্গলের সাধারণ মানুষ কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের পশুসমাজ প্রত্যেকেই দৈব প্রত্যাশী। এই যুগের একমাত্র প্রতিবাদী বিদ্রোহী নায়ক চাঁদ সদাগর। তাই তো একালের কবি চাঁদ সদাগরের বন্দনা করে তাকে তৃণলতা-গুল্ম দলের মধ্যে বজ্রজয়ী বনস্পতির মর্যাদা দিয়েছেন। চাঁদ সদাগরের এই উগ্র ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ কতটা পঞ্চদশ শতাব্দীর যুগ চরিত্রের বিষয় তা প্রশ্নাতীত নয়, কেননা চাঁদ সদাগরের পৌরুষ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে ধারাবাহিকভাবে চাঁদ সদাগর চরিত্রের এই পৌরুষ রক্ষিত হয় নি। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর চরিত্রটি পরবর্তীকালে ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, তন্ত্রবিভূতিতে এসে যুগ প্রভাবে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন বাঙালী সমাজে প্রীতি রসের বন্যা নিয়ে এসেছিল এবং তারই প্রভাবে মানব চরিত্র হয়েছিল কোমল ও কমনীয়। একারণেই কাশীরাম দাসের মহাভারতের অর্জুন আর্য বীর নয়, করুণ কমনীয় বাঙালী পুরুষ। প্রথম পর্বে রচিত মনসামঙ্গলের বিদ্রোহী নায়ক আর্য বলদীপ্ত মহাকাব্যের নায়ক, আর চৈতন্যপরবর্তী যুগের চাঁদ সদাগর বাঙালী পুরুষ। বিজয় গুপ্ত কিংবা নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে দেবীর কর্তৃত্ব স্বীকার করলেও চৈতন্য পরবর্তী যুগের চাঁদ সদাগর দেবীর কাছে অনেক বেশী নতজানু। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্যের চাঁদ সদাগর কঠোর শিবভক্ত, সে দেবশূলপাণি ছাড়া অন্য কোন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু চৈতন্যপরবর্তীকালে এসে জগজ্জীবনের চাঁদ সদাগর শিবের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা থেকে চাঁদ সদাগর অনেক বেশী আপোষপন্থী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - "মনসা অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক এবং চাঁদ সদাগর অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতীক"।[৪৮] এই মন্তব্য স্বীকার করে নিয়ে বলা যায়, তুর্কী আক্রমণের প্রথম যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যে রকম ছিল, পরবর্তীকালে মোগল যুগে তা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের সহাবস্থান শাসক ও শাসিত অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করেছিল। এ কারণেই জগজ্জীবনের মনসা চাঁদের কাছে পিরীতের পূজা কামনা করেছিল। তাই চাঁদ সদাগরও অনেক বেশী নমনীয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির দেব বিরোধিতা চাঁদ সদাগরের ঐতিহ্য নিয়ে। চণ্ডীমঙ্গলের এই বিদ্রোহী নায়কের চণ্ডী বিরোধিতার প্রকৃষ্ট কারণ নেই। বস্তুতঃ মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দের কাব্যের ধনপতির বিশেষ কোন বিশেষত্ব নেই, তেমনি এই যুগে রচিত মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের সঙ্গেও তার খুব পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। আসলে চৈতন্য-পূর্ব যুগের মানুষের যে অস্তিত্বের দায় ছিল, চৈতন্যপরবর্তীকালে সেই দায় আর ছিল না। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই ঘোষ চরিত্রে দেব বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ চেতনা ভিন্নতর ছিল, সে কারণেই ইছাই ঘোষ প্রাণ দিলেও ধর্মদেবের আধিপত্য স্বীকার করে নি। ভারতচন্দ্রের যুগ ঠিক দৈব মুখাপেক্ষী যুগ নয়। যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ঠিক সে অর্থে না হলেও দৈবশক্তির প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা অষ্টাদশ শতাব্দীর মানব চরিত্রে নেই; যদিও একালে বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন নানাভাবে বিপন্ন তবু মানব চরিত্রের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যাস কাহিনীতে। চাঁদ সদাগর ও ধনপতি যেখানে প্রবল পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দৈবশক্তির কাছে নতজানু, ভারতচন্দ্রের ব্যাস কিন্তু পৌরুষে উজ্জ্বল, অনেকটা

উন্নত শির মানুষ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই প্রবাদবাক্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই ব্যাস দৈবশক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েও কিন্তু আপন সংকল্পচ্যুত হয় নি। এই পৌরুষ ও উন্নত চেতনা অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগগত মূল্যবোধ। মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত কাব্যের দেবদ্রোহী নায়কদের বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ করলে সমাজ বিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাঁদ সদাগর অপেক্ষা ব্যাস অনেক বিবর্তিত সমাজের আধুনিক মানুষ। এখানে সে দেবতার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দৈবাদিষ্ট হয়েই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। দৈবাদেশ লঙ্ঘন করবার মত ক্ষমতা কবিদের ও সাধারণ মানুষের ছিল না। তাই দেবীর প্রতি কবির মনোভাব ভক্তির চন্দন তিলকে বিনম্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ঘনরাম চক্রবর্তীই বোধহয় প্রথম মানুষের নির্দেশে কাব্য রচনা করলেন। তিনি গুরুর আদেশে লেখনী ধারণ করেন। আর ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তাই যুগচেতনার নিরিখে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডী যেখানে বরাভয়দায়িনী, ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা সেখানে নিখিল জনের অন্নদাত্রী। মুকুন্দের চণ্ডী আরাধনা যেখানে অস্তিত্বের দায়ে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেখানে শরণাগতির বালাই নেই। বরঞ্চ তিনি অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে নতজানু, তাই তিনি দেবীর আদেশে কাব্য রচনা করেননি পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বরঞ্চ দেবীকেও কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রও দেবীর কাছে শরণাগত নন; অভাবে বা পীড়নে তিনি অন্নপূর্ণার আশ্রয় প্রার্থনা করেননি; তাঁর অন্নপূর্ণা পূজা রাজকীয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র। তাই অন্নদামঙ্গলে দেব বন্দনা অংশগুলিতে যেমন ভক্তির লেশমাত্র নেই, তেমনি সতীর দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষের যজ্ঞনাশ, শিবের ধ্যানভঙ্গ, হরগৌরীর বিবাহ, সিদ্ধিঘোটনা বা হরগৌরীর সংসারযাত্রা বর্ণনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজকীয় বিলাস-ব্যসন ও ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রকাশ আছে।

মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক'শ বছর ধরে রচিত কাব্যের কাব্য-দেহ রূপায়ণের বিবরণ প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই তুলে ধরা হয়েছে ব্যবহৃত সংস্করণ ধরে। সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। পুচ্ছানুগ্রাহীতার কারণে কবিগণ একই কাব্য কাহিনী ধরেই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু লক্ষনীয় ভৌগোলিক অবস্থান ও কালগত পার্থক্যে কাব্য-দেহ রূপায়ণে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এই পার্থক্য অবশ্যই সমাজ-ভাবনাগত পার্থক্য। যেমন মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রে চৈতন্য-পূর্ব যুগের তিন প্রধান কবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাস পিপিলাই, তিনজনেই হাসন-হোসেন পালা ব্যবহার করেছেন। বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস হাসন-হোসেন পালার বিস্তৃত বিবরণ দিলেও নারায়ণ দেব অনুষঙ্গ মাত্র ব্যবহার করেছেন। আবার পরবর্তীকালের কবি ক্ষেমানন্দ, বংশীদাস ও বিষ্ণুপাল হাসন-হোসেন পালা ব্যবহার করলেও উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তা ব্যবহার করা হয়নি। আমার মনে হয় দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও ভাল ছিল না। আবার নারায়ণ দেব যে অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন সেখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক ছিল। আবার কালগত বিবেচনায় চৈতন্যপরবর্তীকালের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সুস্থতা লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে চণ্ডীমঙ্গলে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি সহাবস্থানও একথা প্রমাণ করে। ধর্মমঙ্গলেও হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের চিত্র নেই। অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক ধর্ম অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে, সুতরাং বলাই বাহুল্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় হিন্দ- মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মনসামঙ্গলে শিব-মনসার দ্বন্দ্ব, মনসা ও যমযুদ্ধ দু'টি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী ও শিবের দ্বন্দ্ব, ধর্মমঙ্গলে চণ্ডী ও শিবের দ্বন্দ্ব একই ধর্মের দু'টি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলে এবং রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়নে বিষ্ণু জ্বর ও শিব জ্বরের যুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা

সপ্তদশ শতাব্দীতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করে। মুকুন্দ চক্রবর্তী দেব বন্দনার পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা করেছেন। বৈষ্ণব তীর্থস্থানের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং কাব্যের শেষে তিনি 'হরিনাম মাহাত্ম্য' বর্ণনা করেছেন। অপরপক্ষে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবতীর্থ নবদ্বীপে থেকেও সম্ভবত পোষ্টা মহারাজের অনুমতি না থাকায় চৈতন্য বন্দনা করেননি। বস্তুতঃ মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন। ভারতচন্দ্র জীবনের এক পর্বে বৈষ্ণব সাধুদের সংস্পর্শে এলেও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেননি। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোন স্থির বিশ্বাস ছিল না।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য পরিকল্পনা কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দরের মাতুলানীর ইজ্জত হরণ বৃত্তান্তে। যা অন্য কবিগণ ব্যবহার করেন নি। এই ঘটনা এবং বিদ্যাসুন্দরে কামকেলির নির্লজ্জ বর্ণনা যুগ পরিবর্তনের উপস্থাপনা।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে সতীর দক্ষালয় গমনে অনুমতি গ্রহণ, দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, মদনভস্ম, শিবের ধ্যানভঙ্গ, রতিবিলাপ, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, শিব বিবাহ, হরগৌরীর সংসারযাত্রা অংশগুলিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে যা যুগরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাব্যদেহ রূপায়ণে, বিশেষত দেবখণ্ডের কাহিনীতে ভারতচন্দ্র মুকুন্দ চক্রবর্তীকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই সৃষ্ট চরিত্র পরিকল্পনা লক্ষ করলেই সমাজ বিবর্তনের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর সময়কালে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কাহিনীতে একটা ধর্মের ও নৈতিকতার আচ্ছাদন ছিল। ভারতচন্দ্র সে প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ভারতচন্দ্রের সতী খানিকটা নারী চেতনায় জাগ্রত। তাই পিতৃগৃহে যাত্রাকালে বীভৎস্য মূর্তি প্রদর্শন আসলে নারীর বোধহয় খানিকটা আধিপত্য বিস্তার। আবার দক্ষের শিব নিন্দায় যেখানে মুকুন্দে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব প্রধান, ভারতচন্দ্রে সেখানে সামাজিক কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব বড় হয়ে উঠেছে। মদনভস্ম ও শিবের ধ্যানভঙ্গে ভারতচন্দ্র মুকুন্দের মত কার্তিকের জন্মের প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরঞ্চ শিব ধ্যানভঙ্গের পর নারীসঙ্গ সন্ধান করে। ভারতচন্দ্র দেবতাকে নিয়ে বপ্রক্রীড়া করলেও একথা সত্য, তাঁর দেবাদিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল হারেম থেকে আগত রুচিবোধের দ্বারা পীড়িত। সুতরাং ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপ কিংবা শিব বিবাহের শুভ উদ্দেশ্য নেই। তা দৈহিক কামনা-বাসনার নিবৃত্তিতেই ভরপুর। আবার ভারতচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রগুলি— ব্যাস, গঙ্গা, ব্রহ্মা, ঈশ্বরী পাটনী, অন্নপূর্ণা, শিব, বসুন্ধর, বসুন্ধরা, হরিহোড়, ভবানন্দ এবং বাদশা জাহাঙ্গীর পর্যন্ত প্রত্যেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ তাড়িত চরিত্র। নারীগণের পতিনিন্দা অংশে মুকুন্দের নারীরা গ্রাম্য নারী, এমন কি শ্রীমন্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুশীলা পর্যন্ত গ্রাম্য নারী, আর ভারতচন্দ্রের নারীরা নাগরিকা. তাই মুকুন্দ যেখানে শুধুমাত্র কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বধিরের স্ত্রীকে দিয়ে পতিনিন্দা করিয়েছেন, ভারতচন্দ্র সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট নতুন নতুন চাকুরী বৃত্তিজীবী কর্মব্যস্ত রাজকর্মচারীদের স্ত্রীকে দিয়েও পতিনিন্দা করিয়েছেন, এখানে ভারতচন্দ্র নিজেকেও বাদ দেননি। প্রতিটি নারীর কথাবার্তায়, আবেগ-আক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর সমাজের গলদ-গ্লানি চিত্ররূপ লাভ করেছে।

সর্বোপরি মনসামঙ্গল থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্য পর্যন্ত যেখানে বিভিন্ন কবির মুখে সমাজ কথা বলেছে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কিন্তু কবি নিজের কথা, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা করেছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ববোধের কারণে ভারতচন্দ্র-পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ছিলেন দর্শকমাত্র, ভারতচন্দ্র স্বয়ং সেখানে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত কবি। ভারতচন্দ্র যা দেখেছেন জনরুচির তাগিদে তাকে পরিবেশন করেন নি। অন্যান্য কবিরা যেখানে একাধারে কবি ও গায়েন হওয়ায় তাঁদের জনরুচিকে রক্ষা করতে হয়েছে। ভারতচন্দ্র কিন্তু রাজসভার কবি হওয়ায় জনরুচি রক্ষার দায় তাঁর ছিল না, দর্শক হিসাবে তিনি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তুলে ধরেছেন। সেখানে অন্যান্য কবি অপেক্ষা ভারতচন্দ্র অনেক আধুনিক। কাব্যদেহে এই সামগ্রিক পরিবর্তনগুলি সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি। আর বিবর্তিত সমাজের ইতিহাসই কাব্যে রূপায়িত করেছেন ভারতচন্দ্র।

৩) জাতি-বৃত্তিগত বিবর্তন ঃ মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ নানা ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। সমাজের মূল নিয়ন্তা

ছিল ধর্ম এবং ধর্ম অনুযায়ী একই ধর্মের অন্তর্গত হলেও নানা বর্ণে সমাজ বিভক্ত ছিল। তবে লক্ষণীয়, সমগ্র মধ্যযুগ জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও সময়ের পরিবর্তনে তা এক রূপ ছিল না। জাতি ও বর্ণগত দিক থেকে বাঙালী সমাজ বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথার দ্বারাই বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণই মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার মূল ভিত্তি। বৈদিক যুগ থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের কাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল।[৪৯] ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে কোন পার্থক্য ছিল না। শূদ্ররা ছিল সমাজে অস্পৃশ্য, তাদের সঙ্গে কোন রকম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্ভব ছিল না। শূদ্রদের মধ্যে ছিল আবার এক শ্রেণীর অন্ত্যজ হিন্দু। এরা সমাজে 'পঞ্চম বর্ণ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৫০] বর্ণ হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করে এড়িয়ে চলত। লোকালয়ে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাই এরা লোকালয়ের বাইরে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করত। চর্যাপদে ডোম, শবর, ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণের কথা পাওয়া যায়, যারা নগরের বাইরে বসবাস করত। কিন্তু মধ্যযুগে এসে সমাজ বিবর্তনের ফলে জাতিগত বিবর্তনের রূপরেখা পাওয়া যায়। বৈদিক সমাজব্যবস্থার চার বর্ণ ভেঙ্গে আরও নানা বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠার ফলে ব্রাহ্মণের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণগুলি অপেক্ষাকৃত হীন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে কিন্তু এমনটি হওয়া খুব একটা সম্ভবপর ছিল না। মুহম্মদ আবদুল জলিল লিখেছেন— "বাস্তবতার দিক থেকে তা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই যথেষ্ট বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন ঘটতে থাকে। এই নিয়ম থেকে অনার্য শূদ্রেরাও বাদ যায়নি। তাদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈবাহিক মিলন হয়। এর ফলে চার বর্ণ বা জাতি ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় বহুবর্ণ বা বহুজাতিক হিন্দু সমাজের।"[৫১]

বাঙালী সমাজে জাতি পরিচয় সম্পর্কিত দু'টি বিশিষ্ট গ্রন্থ হল বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ; যদিও এই দু'টি গ্রন্থের প্রামাণিকতা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনার অবকাশ আছে। গ্রন্থ দু'টির রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কালপর্ব।[৫২] বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিকে ছত্রিশটি জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ছত্রিশ জাতির মধ্যে প্রধান ছিল করণ ও অম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠরা বৈদ্য, এদের বৃত্তি ছিল চিকিৎসা, করণরা ছিল কায়স্থ, এরা প্রধানত রাজকার্য ও লিপিকার্য করত। তবে বৈদ্যরা কেউ কেউ বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করে বিদ্যাচর্চা করত। মধ্যযুগে কয়েকজন বিখ্যাত বৈদ্য কবি নাম পাওয়া যায়। অর্থ কৌলীন্যের জোরে এরা সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছিল। অন্যান্যরা অবশ্য প্রত্যেকেই নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণী। মিশ্রণের মাত্রার ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণী নির্ধারিত হত, তই ছত্রিশ জাতি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—

উত্তম সঙ্কর : করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, নাপিত, গন্ধবণিক, গোপ, কর্মকার, তৌলিক, কুম্ভকার, কংসকার, দাস, শাঙ্খিক, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সুত, রাজপুত, তাম্বুলী ইত্যাদি।

মধ্যম সঙ্কর : তক্ষক, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, তৈলকার, আভীর, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক ইত্যাদি।

অধম সঙ্কর : মলেগ্রহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, মল্ল ইত্যাদি।

অধম সঙ্কররা অন্ত্যজ বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত হত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আরও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এই পুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল সঙ্কর বর্ণই শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। জল আচরণীয় শূদ্ররা সৎশূদ্র ও জল অনাচরণীয় শূদ্ররা অসৎশূদ্র বলে পরিগণিত হয়েছিল। এরা হল —

সৎশূদ্র : করণ, অম্বষ্ঠ, নাপিত, গোপ, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, কংসকার, চিত্রকার, সূত্রধর, কুবর, মোদক, ভিল্ল ইত্যাদি।

অসৎশূদ্র : রাজমিস্ত্রী, কোটক, তীবর, তৈলকার, লেট, চর্মকার, শুঁড়ি, মল্ল, পৌণ্ড্রক, কসাই, কৈবর্ত, .বজাক,

রাজপুত, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুগী ও আগরী ইত্যাদি।এছাড়া আরও কয়েকটি বর্ণ পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে এসে বাংলার জাতিগত বিন্যাসে আরো পরিবর্তন ঘটে। করণ ও অম্বষ্ঠদের পরে 'নবশাখ' বলে একটি নতুন সম্প্রদায়কে গণ্য করা হয়। গৌতম ভদ্র এসম্পর্কে লিখেছেন – "সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার গোপভূমে জঙ্গল হাসিল করে সদগোপরা গোরক্ষণ থেকে কৃষিকাজে মন দেয় এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। তখন মন্দির তৈরি করে ও জমি দিয়ে এই গোপরা তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োজিত করে এবং তারা 'নবশাখ' বলে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা পায়।"[৫৩] তিলি, মালী, তাম্বুলী, বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কর্মকার, কুম্ভকার ও তন্তুবায় এই নয়টি সম্প্রদায় নবশাখের অন্তর্গত হয়। এরা ব্রাহ্মণদের কাছে একেবারে জলঅচল ছিল না। নবশাখ ছাড়া শাঁখার বণিক, ব্যাধ, ভড়, কোচ, কোল, জোলা, ডোম, নমশূদ্র, যুগী, কপালী প্রভৃতিরা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য ছিল। অবশ্য মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে জন্মগত কৌলীন্যের বদলে অর্থ কৌলীন্য ও বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপ-সৎগোপ, জেলে কৈবর্ত-হেলে কৈবর্ত, হেলে কায়েৎ-মৎস্যজীবী কায়েতের পার্থক্য আসলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর দাঁড়িয়েছিল। বাঙালী সমাজে বৃত্তিগত অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মোটামুটিভাবে বৃত্তিগত মিশ্রণ দেখা দিতে থাকে। ব্রাহ্মণরা কৃষিকার্য ছাড়াও সব রকম বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। অর্থ কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব সমাজে তীব্র আকার ধারণ করে।ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এসম্পর্কে লিখেছেন— "তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে গোপজাতির কিছু লোকের পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যে মনোনিবেশ এবং তৈল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তেলি ভিন্ন কলু নামে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় একটি লক্ষণীয় সামাজিক পরিবর্তন।"[৫৪] সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীরে বিদেশী ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আঘাত সমাজের পুরাতন মূল্যবোধকে নষ্ট করে দিয়েছিল। এভাবে উপজাতি ও নিম্নবর্ণের ভূমিজরাও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কখনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দাক্ষিণ্যে সমাজের নীচুতলা থেকে সামাজিক বর্ণ ব্যবস্থার উপরের স্তরে উন্নীত হয়। উচ্চবর্ণের রীতিনীতি ব্যবহার করার ফলে তারা তথাকথিত নিম্নবর্ণের চাইতে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে অলক্ষে সামাজিক বিবর্তন ঘটে যেত। সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক, তিলি, গোপ, কর্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা মধ্যযুগের প্রথম থেকেই অর্থ কৌলীন্যের জোরে যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে চতুর্দশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের যে ধারা আমরা লক্ষ করি তার প্রধান বৈশিষ্ট হল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া প্রবণতা। হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর "Social Mobility in Bengal" গ্রন্থে এই বিবর্তনের চারটি ধারা উল্লেখ করেছেন।[৫৫]

তাঁর মতে প্রথম প্রকার বিবর্তন হল, কোন একটা জাতির অভ্যন্তরস্থ বিবর্তন। একটা জাতির অন্তর্গত কুলীন সম্প্রদায় মৌলিক সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিকতর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অধিকারী ছিল। যার ফলে মৌলিক থেকে কুলীনে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রবণতা জাতির অভ্যন্তরে দেখা দিয়েছিল। ময়রাদের মধ্যে এই প্রবণতা অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। উন্নত ময়রা কুলীনদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কৌলীন্য দাবী করে। প্রাচীন কুলীনদের মধ্যে এই আগন্তুক শ্রেণীকে সমমর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা ও কুণ্ঠা ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার বিবর্তনে. আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল উন্নত সামাজিক মর্যাদার দাবী করে, নবশাখ. গন্ধবণিক ও তাম্বুল বণিকগণ আর্থিক উন্নতির ফলে বারুই, কর্মকার. নাপিত ও অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সম্মান দাবী করত।

তৃতীয় প্রকার বিবর্তন ঘটে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সামাজিক মর্যাদা আদায়ের জন্য নতুন নাম ধারণের প্রবণতার মধ্যে দিয়ে। যেমন বিদ্রোহী নাপিত. ধোবা ও শুঁড়ি সম্প্রদায় তাদের নামের আগে 'মধু' , 'ফুল' প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে উন্নত সামাজিক মর্যাদা দাবী করে। মধুনাপিত, ফুলনাপিত, চাষাধোবা, সৎচাষী, প্রকৃত সৎচাষী. বরেন্দ্র শুঁড়ি প্রভৃতি

নামকরণ এর দৃষ্টান্ত। এসব নতুন নামকরণের মাধ্যমে তারা তাদের জাত ভাইদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়। বীরভূম, নদীয়া, যশোর, হুগলী, চব্বিশ পরগণা জেলাতেই প্রধাণত এই সম্প্রদায়কে লক্ষ করা যায়।

চতুর্থ প্রকার বিবর্তন ঘটে নতুন জাতির উদ্ভব এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ভিন্নতার মধ্যে দিয়ে। এই আচার অনুষ্ঠান তাদের আদি সম্প্রদায় থেকে নিজেদের পৃথক করে দেয়। গোপ, তেলি ও ভূমিজদের মধ্যে এই বিবর্তন অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ পুরুলিয়া এবং সিংভূম জেলার কিছু অংশের কোন কোন ভূমিজ সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষত্রিয় ও রাজপুত বলে ঘোষণা করে।

উক্ত চার প্রকার বিবর্তনের মধ্যেই জীবিকার পরিবর্তন ও উন্নত জীবিকা প্রধান নিয়ামক রূপে কাজ করে।শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদী ধর্ম আন্দোলন গোঁড়া হিন্দুসমাজে প্রাণ সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনায়। এর ফলে তথাকথিত বর্ণভিত্তিক ঘৃণা-বিদ্বেষ লোপ পেতে থাকে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব সমাজ গণমুখী চেতনাকে হারিয়ে ফেলে। তবু বলা যায় বৈষ্ণবধর্ম স্থবির-গতিহীন হিন্দুসমাজে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি করেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে জাতিভেদ অপেক্ষা প্রাণের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে তাই জনৈকা বৃদ্ধার মুখে শোনা যায়—

"বৃদ্ধা বলে প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।" (জগজ্জীবন/১৪৬)

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত এই বর্ণাশ্রমিক সমাজ আদর্শই দেখা যায়। মনসামঙ্গলে অবশ্য তেমনভাবে জাতি-বৃত্তির পরিচয় নেই। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে লখীন্দরের বিবাহ অংশে শোভাযাত্রায় নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। বিপ্রদাস পিপিলাই- এর মনসাবিজয় কাব্যে মনসার সিজুয়া পর্বতে বসতি স্থাপনে বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত ছত্রিশ জাতির কথা উল্লেখ থাকলেও তার কয়েকটির নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের পরে ক্ষেত্রি, বৈশ্য, বৈদ্য, কায়স্থ, ভট্ট, দৈবজ্ঞ, গোপ, বারই, কুমার, পঞ্চবণিক, কর্মকার এবং অন্যান্য জাতির মানুষ বাদ্যপূরক, কলু, কুশলি, কাঠুর‍্যা, শাঁখারি, কাঁসারি, মালাকার, রজক, নাপিত, ছুতার, গাড়ার, ধীবর, তিয়র, মালা ইত্যাদি জাতির উল্লেখ আছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী জাতিবৃত্তিগত পরিচয় উপস্থাপিত করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের গাঞি, গোত্র. পদবী সমেত উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণরা প্রধানত জ্ঞানচর্চা করত, আর মূর্খ বিপ্ররা যজমানী করত। তবে বৈদিক জীবনচর্যানুসারে নির্ধারিত শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা বা যজমানীবৃত্তি দ্বারা চলত না, তাই ব্রাহ্মণের কৃষিকার্যের পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং নিজের কৃষিকাজের উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন— গ্রহ-বিপ্র, বর্ণ-বিপ্র এবং অগ্রদানী-বিপ্র। গ্রহ-বিপ্ররা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তারা শিশুদের কোষ্ঠী তৈরী করত, কুল পাঁজি বিচার করত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বর্ণ-বিপ্রদের সম্পর্কে বলেছেন - "সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দু সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য করিত না। এইজন্য বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরহিত্য করিত এবং বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত।"[৩৬] মুকুন্দ চক্রবর্তী যাদের মূর্খ-বিপ্র বলেছেন তারা হল অগ্রদানী-বিপ্র; এরা যজমানী বৃত্তি ও মৃত্যুকালীন শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করত। এরা ব্রাহ্মণ সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। ব্রাহ্মণদের আরও তিনটি উপশ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি হল— বারেন্দ্র, রাঢ়ী ও বৈদিক। কুলেশীলে বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী এই ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করেছেন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বাংলার বাইরে থেকে আগত।[৩৭]

ক্ষত্রিয়রা ছিল যুদ্ধ ব্যবসায়ী। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে মল্লবিদ্যা শিক্ষাদানকারী, যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ও রাজপুত জাতির উল্লেখ আছে। তবে মধ্যযুগে ক্ষত্রিয় ও রাজপুতদের স্থান কায়স্থের নিম্নে বলে গণ্য হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে তিরস্কার করে বলেছে—

"হয়ে তুই রাজপুত বলাস কায়স্থ-সুত

নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ।

সেবকের যোগ্য নও　　　কুটুম্ব করিয়া কও

কুলের মহিমা কৈল নাশ॥" (মুকুন্দ/৮৭)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রচালনা ও যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করতে। তাছাড়াও শূদ্রবর্ণ এমন কি অন্ত্যজ বাগদী, হাড়ী, ডোম, চণ্ডালরা যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। ধর্মমঙ্গলে ডোমদের যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। তাছাড়াও তারা কৃষিকার্য করত। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহে উগ্র ক্ষত্রিয় বা 'আগরি'দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মধ্যযুগে রচিত কোন কোন গ্রন্থে কায়স্থদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে –

"সৌভরির ভৃত্যের নাম কালিদাস মিত্র।

যোদ্ধৃবেশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র॥

ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।

পঞ্চ ঋষের সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন॥"[৫৮]

ক্ষত্রিয়রা মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় খুব একটা সম্মানের অধিকারী ছিল না তা বেশ বোঝা যায়। বৈশ্যরা কৃষিকার্য করত। এরা মূলত বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণী। বৈদ্যরাও বৈশ্যের অন্তর্গত ছিল। মধ্যযুগে কায়স্থদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরাই ছিল মূল নিয়ন্তা। অবশ্য কায়স্থরাও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, এগুলি হল— রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ।[৫৯] তার মধ্যে কতিপয় কায়স্থরা অর্থ কৌলীন্যে হীন ছিল, একারণে এই ধরনের বাহাত্তর রকমের কায়স্থকে 'বাহত্তরে কায়স্থ' বা হীন কায়স্থ বলে চিহ্নিত করা হত। ভারতচন্দ্র হরিহোড়কে 'বাহত্তরে কায়স্থ' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অর্থ কৌলীন্যের জোরে এরা উন্নত হতে পারত। সমাজে কাঞ্চনমূল্য কতটা স্বীকৃত হয়েছিল অন্নদার নিজস্ব উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। হরিহোড় বাহত্তরে কায়স্থ অর্থাৎ নীচু শ্রেণীর কায়স্থ, কারণ তার সম্পদ নেই এবং ঐ শব্দবন্ধটি একটি গালি হিসাবে সমাজে ব্যবহৃত হত। হরিহোড় মৌলিক কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও -

"বাহত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।

বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥" (ভারতচন্দ্র/১৪০)

কিন্তু, দেবী তাকে অর্থ কৌলীন্য দিয়ে বলেছিল—

"ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।

কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥" (ঐ)

দেবীর এই উক্তি অসম্ভবভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। হরিহোড়ের অর্থ কৌলীন্যে তার কুল-কলঙ্ক মুছে গেল, উচ্চবর্ণের সমাজে তার মর্যাদা ফিরে এল—

"এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।

ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর॥

কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।

নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥

ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।

বাহত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥

ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।

বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥"(ঐ/১৪৭)

বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদিক বর্ণাশ্রম লুপ্ত হয়ে মিশ্র বৃত্তি ও মিশ্র জাতি তৈরী হয়েছিল, ফলে মানুষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্র পরিচয় রইল না, বৃত্তিজীবীতারক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মিশ্র বৃত্তি জীবীতার সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজে অর্থ ও গুণাবলী অনুযায়ী সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের সময়কাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন যুগগত প্রবণতাটি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতচন্দ্র যে ছত্রিশ জাতির নাম তুলে ধরেছেন তারা হল— চণ্ডাল, কুরমী, কোরঙ্গা, পোদ, কপালী, বাজীকর, পটুয়া, বাইতি, কসবি, ভক্তিয়া, ভাঁড়, নর্তক ইত্যাদি। এরা নিজ নিজ বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। এসমস্ত বৃত্তিধারী জাতির জন্যই গ্রামীণ সমাজ স্বনির্ভর ছিল। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসে দ্রুত বৃত্তি পরিত্যাগের ফলে গ্রামীণ সমাজের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নবাবী আমলের শেষে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করলে পেশাজীবীরা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা চাকুরীর লোভে পরিত্যাগ করলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজের ভিত ভেঙ্গে পড়েছিল। আসলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম তার কঠোরতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে জনবিন্যাস ও বসতি স্থাপনের চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। তা-ও কালগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই নানা বর্ণে, গোত্রে বিভক্ত হিন্দুসমাজে জাতিভেদ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হত। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোনরকম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল না। নগর বিন্যাসে বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে এই কঠোরতা বিশেষভাবে রক্ষা করা হত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণ নগরের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করত এবং জাতিব্যবস্থার নিম্নস্তরে অবস্থিত অন্ত্যজরা অপেক্ষাকৃত নগরের বাইরের দিকে বসবাস করত। 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' কিংবা 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি সেকথা প্রমাণ করে। মধ্যযুগের প্রথম পর্বেও এই চিত্রই দেখা যায়। তুর্কী আক্রমণের ফলে নবাগত মুসলমানরা ছিল এদেশীয়দের চোখে যবন বা বিধর্মী। সুতরাং দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতিগত জাতির সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। মনসামঙ্গলে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক গ্রামে পৃথক এলাকায় বসতি স্থাপনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। মালাপাড়া, বারুইপুর, রাখালগাছি হিন্দুর গ্রাম। বলাই বাহুল্য এই গ্রামগুলি মালো, বারুই, গোয়ালা ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের বাসস্থান। আবার হাসনহাটি মুসলমানদের গ্রাম। একমাত্র বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সিজুয়াতে মনসার বসতি স্থাপনের চিত্র পাওয়া যায়। লক্ষনীয় এই বর্ণনায় মুসলমান জনবসতির চিহ্ন নেই। আবার বিজয়গুপ্ত ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রাকালে বিভিন্ন জাতির মানুষের ভীত হয়ে পলায়নের চিত্র পাওয়া যায়। তাতে মুসলমানের উল্লেখ নেই। এই চিত্র বেশীর ভাগই অন্ত্যজ শ্রেণীর বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের চিত্র।

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্যে জাতিব্যবস্থার গোড়ায় ভাঙন ধরেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকে আলিঙ্গন দান করেছিলেন এবং পানিহাটিতে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে জাতপাতের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, আর তাঁর কীর্তনের আসরগুলি ছিল সকল ধর্ম ও সকল জাতির মানুষের মিলনক্ষেত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তী অনেকটা মুক্ত সমাজের মানুষ ছিলেন। তিনি কালকেতুর আদর্শ রাজ্যে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষকে স্থান দিয়েছেন। তাই গুজরাট নগরে হিন্দু সমাজব্যবস্থার সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে মুসলমানেরও সমাগম ঘটিয়েছেন, যদিও শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাপুষ্ট মুসলমানগণ প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করত। কালকেতুর গুজরাট নগরে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম হলেও তারা একই গ্রামের পৃথক অঞ্চলে জাতি-বৃত্তি অনুযায়ী বসবাস করত এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। কবি অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য ও কায়স্থ এবং শেষে অপরাপর শূদ্র ও ইতর জাতির মানুষের সমাগম বর্ণনা করেছেন। মুকুন্দের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব ছিল বলেই তিনি লক্ষ করেছিলেন হিন্দুর জাতিব্যবস্থা মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। তাই সামাজিক কৌলীন্য অপেক্ষা বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী

মানুষের পাশাপাশি বসবাসের চিত্র এঁকেছেন। তাই বৈদ্যগণের পাশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপনের চিত্র ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। এমনকি সেবক শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বৃত্তির শূদ্র, জায়াজীবী বা পতিতাদেরও নগরে বসতি স্থাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একই নগরের নির্দিষ্ট এলাকায় স্বীয় বৃত্তি ও ধর্মাচরণ করতে পারত। সুতরাং বলা যায় যোড়শ শতাব্দীতে গ্রামীণ জীবন প্রভাবিত নাগরিক সমাজের জনবিন্যাসে বিবর্তিত সমাজের চেহারা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠী নগরে বসতি স্থাপনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে আদিবাসী কিরাত শ্রেণীর উল্লেখ আছে। লাউসেন অন্ত্যজ ডোমশ্রেণীর মানুষদের সামাজিক কৌলীন্য প্রদান করে ময়না নগরে নিয়ে গিয়ে বসতি দেয়। এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে জনজীবন ধীরে ধীরে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতচন্দ্র বর্ধমান নগরের জনবিন্যাসের যে বিবরণ দিয়েছেন, সকল জনজাতির মানুষ সেখানে মিশ্রভাবে বসতি স্থাপন করেছে। শুধু হিন্দুমুসলমান ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ই নয়, ইউরোপ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মানুষের এখানে পাশাপাশি বসবাসের চিত্র এঁকেছেন। ভারতচন্দ্র শুধু ভাষা ব্যবহারে 'যাবনী মিশাল' করেন নি, জনবিন্যাসেরও 'যাবনী মিশাল' বিবরণ দিয়েছেন। জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গলে কামগঞ্জে লখীন্দরের প্রজাপত্তনেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশ্র জনবিন্যাস দেখা যায়। সুতরাং সমাজ বিবর্তিত না হলে, চেতনাগত বিবর্তন না হলে কবিগণের এই সমস্ত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হত না।

ব্রাহ্মণরা সমাজের মধ্যমণি হিসাবে নগর বা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করলেও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে ক্ষত্রিয় কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষরা বসবাস করত। তবে অন্ত্যজ ও পতিতারা সাধারণত নগরের বাইরে একাংশে বসবাস করত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জনবিন্যাসের এ চিত্রই পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয়, যোড়শ শতাব্দীতেই সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পাশাপাশি বসতি স্থাপনের চিত্র পাওয়ায় যায়। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে বৈদ্যগণের পাশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বসবাসের চিত্র আছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু শুধুমাত্র জাতি কৌলীন্য অনুসারে বসতি স্থাপন হয়নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্ধমান নগরে হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় বণিকগণের একত্র বসবাসের কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে যেখানে হিন্দু-মুসলমান পৃথক এলাকায় পৃথক গ্রামে বসবাস করত মুকুন্দের কাব্যেই সেখানে একই নগরে পৃথক এলাকায় বসতি স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। আবার ভারতচন্দ্রের কাব্যে একই এলাকায় পাশাপাশি বসবাসের চিত্র পাওয়া যায়, এবং এখানে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের এক সঙ্গে বসবাসের বিবরণ পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখায় বাঙালী মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজও নানা জাতি ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। হিন্দুর চার বর্ণের মত মুসলমান সমাজ পাঁচটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এরা হল— সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান ও দেশজ। সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠানরা বিভিন্ন কর্মসূত্রে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।[৬১] দেশজ মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হিন্দু। বহিরাগত এসমস্ত মুসলমানরা অর্থ-সম্পদ থাকায় ও শাসকের ক্ষমতাপুষ্ট হওয়ায় নিজেদের অভিজাত বলে মনে করত। দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত এবং বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর মত বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে দেশজ মুসলমানদের কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক থাকত না। অবশ্য পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন এদেশে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং হিন্দু কুলীনের মত মুসলমান সমাজেও পেশা, অর্থ ও বিদ্যাবুদ্ধিগত আভিজাত্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র বংশগত কৌলীন্য স্থাপিত হয়, যা বংশ পরম্পরায় চালিত হয়ে আসতে থাকে। অবশ্য মুসলমান সমাজের এই কৌলীন্য চেতনা হিন্দুসমাজের প্রভাবের ফল বলে মনে করা যায় আসলে হিন্দুসমাজের এই কৌলীন্য চেতনা ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল।[৬২] যোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত কাব্যগুলিতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। যোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরে মুসলমানগণের আগমন উপলক্ষে এসব অভিজাত

মুসলমানের আগমনের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের আগমনের কথা বলা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবি আরাকান রাজসভায় যে সমস্ত প্রভাবশালী মুসলমানদের কথা বলেছেন তারা হল— সৈয়দ, কাজী, শেখ, মোল্লা, আলীম, ফকির ইত্যাদি। কবির বর্ণনায়—

"সৈদয় কাজী শেখ মোল্লা আলীম ফকির।
পূজেন্ত সে সব যেন আপনা শরীর॥" (লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না/৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ অংশে বর্ধমান গড় বর্ণনায় যে সমস্ত অভিজাত মুসলমানের কথা বলেছেন তারা হল – সৈয়দ, মল্লিক, শেখ, মোগল পাঠান ইত্যাদি। এসমস্ত অভিজাত মুসলমানরা রাজকার্য ছাড়াও ধর্মকর্ম ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করত। মুকুন্দ চক্রবর্তী এদের প্রসঙ্গে বলেছেন – তারা সকাল থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করে, রোজা করে, সোলেমানি মালা বা তসবী জপ করে এবং পীর পয়গম্বরের মোকামে বাতি জ্বালে। এসমস্ত আচরণের অনেকটা হিন্দুসমাজ থেকে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে থাকবে। তবে অবশ্য কিছু মুসলমান গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতই অনেকাংশে ঠক, প্রবঞ্চক, ধর্মধ্বজী ও হিন্দু বিদ্বেষী ছিল। পাঠান মুসলমানদের মধ্যেও আবার নানা ভাগ ছিল, যেমন— সাবানি, লোহানি, লোদানি, সুরয়ানি ইত্যাদি। দেশজ মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হবার আগে হিন্দুসমাজে নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। ধর্মান্তরিত হবার পরও তারা তাদের জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করতে পারেনি। কাজেই হিন্দুসমাজের অনুরূপে মুসলমান সমাজেও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বাঙালী সমাজে এটা একটা বড় ধরনের বিবর্তন বলে মনে করা যেতে পারে। কবিকঙ্কণের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এসব বৃত্তিজীবী মুসলমানরা হল – গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, গরসাল, সানাকার, হাজাম, কাগজী, তীরকর, কলন্দর, দরজী, বেনটা, রঙ্গরেজ, হালান, কসাই ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া আরও কিছু বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন— ঢালী, নিশা, মুলঙ্গি, কলু, মালী, ধোপা, নাপিত, বেদে, বাজিকর, বৈদ্য, ব্যাধ, চুরিয়া ইত্যাদি।[৬৩] আবার হিন্দুসমাজের মতই যে সমস্ত মুসলমানরা রাজকর্মচারী ছিল তারাও পরবর্তীকালে তাদের নাম পদবীর মধ্যে তাদের বৃত্তিগত পরিচয় উল্লেখ করত, যেমন – কাজী, খাঁ, চৌধুরী, তালুকদার, মল্লিক, সরকার, মণ্ডল, মিঞা, মুন্সী, মির্জা, বেগ, লস্কর, বখ্‌শী, পাটোয়ারী, ব্যাপারী, পসারী ইত্যাদি। অবশ্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এসমস্ত পদবী ব্যবহার করতে দেখা যায়। বস্তুত সমাজ বিবর্তিত না হলে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যেত না।

৪) রাজনৈতিক বিবর্তন : মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ ছিল সহজ, সরল এবং তারা রাজনীতি সচেতন ছিল না। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর গ্রাম জীবনে সাধারণ মানুষ শাসকের রক্তচক্ষু এড়িয়ে নিরুপদ্রব জীবন-যাপন করত। উৎসব অনুষ্ঠানে, আমোদে, প্রমোদে গা ভাসিয়ে অলস-ভাববিলাসী জীবন-যাপনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবন থেকে শত যোজন দূরবর্তী অঞ্চলে শাসককুলের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করত না, এমনকি তাদের অভ্যস্ত নিরুপদ্রব জীবনে তার কোন প্রভাবও ফেলত না। সুতরাং কাদের দ্বারা তারা শাসিত হচ্ছে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। তবে কখনো কখনো রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে এলে অদৃষ্টবাদী বাঙালী অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করত। পূর্বেই বলা হয়েছে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ গ্রামসমাজেরই কবি। কবিরা কেউ কেউ গায়েন ছিলেন, তাই মন্দিরা বাজিয়ে, চামর ঢুলিয়ে তারা গ্রামীণ মানুষের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁরাও রাজনীতি সচেতন ছিলেন না। রাজরাজার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে কেউ কাব্য রচনা করেন নি। কেউ কেউ রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও একমাত্র ভারতচন্দ্র ব্যতীত কোন কবিই কাব্যে পৃষ্ঠপোষককে প্রাধান্য দেন নি। তবে কখনো কখনো তাদের নামোল্লেখ মাত্র করেছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস প্রাধান্য পায় নি। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। তাছাড়া বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের বিষয়বস্তু সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন, তাই রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস আলোচ্য নয়। কিন্তু চতুর্দশ-পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ

শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক ওঠাপড়া জনজীবনকে কিভাবে কতখানি প্রভাবিত করেছে তার একটা বিবর্তিত চেহারা তুলে ধরা হল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া না গেলেও কবিগণ পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখ করেছেন, কেউ কেউ দূর থেকেই তাদের কথা শুনে তৃপ্ত হয়েছেন। মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যে সুশাসক হিসেবে হুসেন শাহের নামোল্লেখ, ক্ষেমানন্দের কাব্যে বারা খাঁ, জগজ্জীবনের কাব্যে দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথের কথা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধব আকবর বাদশাহের নামোল্লেখ করেছেন, মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মবিবরণী মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা তথ্য সমৃদ্ধ দলিল। ঘনরাম চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্রের নাম করেছেন, ইনি বর্ধমানরাজ ছিলেন। শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায় বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দ্বারা কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রে এসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া গেল। সাহিত্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রবেশ এই প্রথম। আধুনিক চিন্তায় ভাবিত বাস্তববাদী ভারতচন্দ্র শাসকের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী কাব্যের বিষয়বস্তু করে তুললেন। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তুর্কীর মত বিদেশী শক্তির আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় বাঙালী কমঠবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। নবাগত তুর্কীরা শক্তির মহোৎসাহে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ এবং হিন্দু কাফেরদের ইসলামে দীক্ষিত করার পবিত্র চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। বিপর্যস্ত বাঙালী সুধী সমাজ সেদিন তাঁদের সাহিত্যকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন আর এভবেই রক্ষা পেয়েছিল চর্যাপদের মত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কিন্তু শাসকের ভাগ্যও সুখ শয্যায় ছিল না। তাঁরা ক্রমাগত হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। প্রায় দেড়'শ বছর বাংলার বুকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল - বাংলার সংস্কৃতি নিষ্ফলা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপর সুদিন ফিরে এলেই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের দ্বারা নতুন জাতির সৃষ্টি হল, নতুন উদ্যমে বাংলার সংস্কৃতি জাগ্রত হবার প্রয়াস পেল। বাঙালী সমাজ এই প্রথম কূপমণ্ডুকতা মুক্ত হয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে সামাজিক বিবর্তন অনিবার্যভাবে ঘটে যেতে লাগল।

মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে ও শাসক শক্তির মদতপুষ্ট হয়ে নবাগত মুসলমানরা হিন্দুর জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। যদিও হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। মনসামঙ্গলে হাসন-হোসেন পালায় মুসলমান কাজীর সঙ্গে রাখালদের দ্বন্দ্ব এবং হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার বিবাদ হিন্দু জমিদার ও মুসলমান শাসকের প্রতিপত্তি বিস্তারের কাহিনী। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলেও জনজীবন রাজনৈতিক আবর্ত সঙ্কুলতার দ্বারা অনেক বেশী পীড়িত হয়েছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে শাসনকার্যের সুবিধার্থে নতুন বিধি প্রণয়ন সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারে নি। তাকে শাসকের দুরাচার বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া মামুদ শরীফের মত শাসকের দ্বারা জনজীবন কম বিপর্যস্ত হয় নি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত মনসামঙ্গলের কবি ক্ষেমানন্দ শাসকের দ্বারা বিপর্যস্ত হন। রামকৃষ্ণ রায় বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণত্যাগ করেন। ভারতচন্দ্র স্বয়ং বর্ধমানরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'নাগাষ্টকম্' কাব্যটি তো তৎকালীন সামন্ত শাসক রামদেব নাগের অত্যাচারের বিবরণ। শাসকের যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা সাধারণ মানুষ এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিল যে সাধারণ মানুষ ধনীর শোভাযাত্রার শব্দ পেলেও ভয়ে বাসস্থান পরিত্যাগ করে পলায়ন করত। মনসামঙ্গল থেকে ধর্মমঙ্গল পর্যন্ত এর প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ় বাংলা তুর্কী আক্রমণ থেকে বর্গীর হাঙ্গামা পর্যন্ত এতবার বিপর্যস্ত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী শুনতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিল - এ কারণেই ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সর্বাপেক্ষা যুদ্ধ বিগ্রহে ভরপুর। সাধারণ জনসমাজ এক সময় বর্ণ হিন্দুর পীড়নে মুসলমান আক্রমণকারীদের পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখেছিল। অষ্টাদশ

শতাব্দীতে এসে তারাই আবার পরিত্রাতার ভূমিকায় মারাঠা বর্গীদের দেখেছিল।

সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির প্রভাব মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনী ধর্ম রূপায়ণে সাহায্য করেছিল। মনসামঙ্গলে এই প্রভাব কম, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ চাঁদ সদাগরকে অত্যাচারী জমিদার রূপে চিত্রিত করেছেন। শাসকের দ্বারা পীড়িত হয়েই মুকুন্দ চক্রবর্তী কালকেতুর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছেন। যেখানে প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারবে। ভাঁড়ুদত্তের উক্তিতে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন মুকুন্দ চক্রবর্তী মোগল সম্রাট আকবরের আদর্শে কালকেতু চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতির প্রভাব আছে। যেমন, শাসকগণ অনেক সময়ই কর্মচারীদের দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন আর তাঁর অগোচরেই রাজকর্মচারীদের দ্বারা প্রজারা শোষিত হত। ধর্মমঙ্গলের গৌড়েশ্বরের অগোচরেই মহামদ প্রজার উপর অত্যাচার করত। বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যকে সামন্ত শাসকে পরিণত করা মধ্যযুগের রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবর এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিয়ে করদ সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেছে। আবার এই সামন্ত শাসকগণ সুবিধা পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করত। ইছাই ঘোষ ক্ষমতাশীল হয়ে গৌড়েশ্বরকে কর দিতে অস্বীকার করে, এমনকি ত্রিষষ্ঠী নাম পরিবর্তন করে তার রাজধানীর নাম করে ঢেকুরগড়। কেন্দ্রীয় শাসক কখনো কখনো বিদ্রোহী সামন্ত শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তাকে দমন করত। এই সময়ে কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগে ছোট বড় জমিদাররা রাজা নাম গ্রহণ করে প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করত। কৃষ্ণচন্দ্র এমনি একজন জমিদার ছিলেন। তাদের ভোগ বিলাসীতার অর্থ যোগাতে জনসাধারণ বিপর্যস্ত হত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় পরিবর্তিত রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সমাজ জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাহ্যিক রাজনীতির প্রভাব না থাকলেও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিশেষভাবে দেখা যায় অর্থাৎ দেবদেবী চরিত্র ও অন্যান্য চরিত্রের রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগ দেখা যায়। গ্রাম্য কবিদের প্রত্যক্ষ শাসন নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলেও স্থানীয় জমিদার বা সামন্ত শাসককে তাঁরা দেখেছিলেন, রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগে তারা দক্ষ হত। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা দীর্ঘ অরাজকতার পর মনসামঙ্গল কাব্যগুলি লিখিত হয়েছিল। তাই মনসামঙ্গলের কাহিনীতে স্থির কূটকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায় না। এখানে মনসা মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসকের প্রতিভূ। প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে তাই সে হীনতা ও নীচতার পরিচয় দিতে ভোলেনি। চাঁদ সদাগরের প্রতি সে ব্যক্তিগত ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে মাত্র — কোন রকম ন্যায়-নৈতিকতার পরিচয় দেয় নি। মধ্যযুগীয় সুলতানগণ যেমন শাসন ক্ষমতা ও ধর্ম বিস্তার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়ে বশীভূত করেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবীরাও প্রথম থেকে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে অর্থ সম্পদ দিয়ে স্বপক্ষে নিয়ে এসেছিল। সাধারণ মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবানকে আশ্রয় করত। জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদের উক্তিতে এই সত্য প্রকাশিত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষের জীবনে শাসকের প্রভাব ছিল অনেক বেশী স্পষ্ট। বিশেষত মোগল সুশাসনের প্রভাব পড়েছিল জনজীবনের উপর এবং চৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে মানুষ অনেকখানি আপোষপন্থী হয়ে পড়েছিল। তাই চাঁদের পূজা আদায় করতে গিয়ে মনসা প্রথমেই পিরীতের পূজা আদায়ের কথা ভেবেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসাকে যতটা ক্রুর হতে দেখা যায় পরবর্তীকালে রচিত মনসামঙ্গলের মনসা চরিত্রে ততটা ক্রুরতা দেখা যায় নি। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে চণ্ডীকে পূজা প্রসার করতে গিয়ে কিন্তু ততটা ক্রুর হতে দেখা যায় না। কেননা যে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে মনসাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল চণ্ডীমঙ্গলে তারা অনেক বেশী নমনীয় ও আপোষপন্থী। চণ্ডী পূজা প্রচার করতে গিয়ে কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শাসকগণের মত উদারতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষত ব্যাধ কালকেতুর

গুজরাট নগর স্থাপন একথা প্রমাণ করে। পশুসমাজ, কালকেতু এবং কলিঙ্গরাজ প্রত্যেকেই দেবীর ভক্ত। কিন্তু কলিঙ্গরাজ অরণ্যে দেবীর দেউল প্রতিষ্ঠা করে নামমাত্র পূজার দ্বারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। কিন্তু চণ্ডী নিত্যপূজা অর্থাৎ কলিঙ্গরাজকে আরো নত দেখতে চায়। তাই কলিঙ্গরাজ্যের অভ্যন্তরেই দেবী গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠা করে কালকেতুকে প্রতিষ্ঠা করল। আবার অন্যদিকে পশুগণ ও কালকেতু উভয়েই দেবীর ভক্ত হওয়ায় দেবী কারোই ক্ষতি করতে পারে না। তাই গুজরাট নগর স্থাপন করে কালকেতুর আক্রমণ থেকে পশুদের রক্ষা করল এবং পশুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সিংহকে পশুরাজ নিযুক্ত করল। আবার কালকেতুকেও ধন-ঐশ্বর্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়ে অন্ত্যজ ব্যাধ জীবন থেকে মুক্তি ছিল। দেবী সচেতন ভাবেই কালকেতু ও কলিঙ্গরাজের দ্বন্দ্বের সূচনা করে কলিঙ্গরাজকে দমন করল। এখানে দেবী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মত কাজ করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সম্রাট আকবরের মত সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা দেখা যায়। মধ্যযুগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও শাসকের অত্যাচারে প্রজাদের দেশত্যাগ সাধারণ ঘটনা। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং দামুন্যা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে কলিঙ্গ রাজ্যের বিপর্যস্ত প্রজারা গুজরাট নগরে আশ্রয় লাভ করে এবং জীবনজীবিকার নিরাপত্তা লাভ করে। বস্তুত কালকেতুর মত প্রজাহিতৈষী জমিদারের অভাব সেকালে ছিল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির প্রভাব দেখা যায়, লাউসেনের রাজ্য জয় ও বিবাহনীতির দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করা, কালু ডোমের মত ডোমদের প্রতিষ্ঠা দিয়ে অন্ত্যজ জীবন থেকে মুক্তি দান করা ইত্যাদি। গৌড়েশ্বর ও মহামদের ব্যবহারে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়। ধর্মদেবও গৌড়েশ্বরের মত শাসনক্ষমতাহীন চরিত্র, সে হনুমানকে দিয়েই কার্যোদ্ধার করেছে। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র কিন্তু দেবী অন্নপূর্ণাকে রাজনীতিবিদের মত অঙ্কণ করেননি। বরঞ্চ বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ইতিহাসের ছবি এঁকেছেন তিনি। মানসিংহ পালায় ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বাক্‌বিতণ্ডা কাল্পনিক কাহিনীর উপর দাঁড়িয়ে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় বিশেষত লভ্য নয়, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে কোথাও তা দেখা যায় নি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে কিছুটা দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরাম চক্রবর্তী রাজার, প্রজার ও দেশের মঙ্গল কামনা করেছেন। কালু ডোমের দেশত্যাগ করতে পীড়া বোধ হওয়া, নিজের জাতি-বৃত্তি ত্যাগ করতে অস্বীকার করার মধ্যে স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশ প্রেম বিষয়টি ইউরোপীয় শিক্ষা -সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পরই বাঙালীরা লাভ করতে পেরেছে। মধ্যযুগের মধ্য পর্বে ইউরোপীয় বণিকদের সংস্পর্শে এলেও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বাঙালীরা আগ্রহ দেখায় নি। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের শাসনক্ষমতা বিস্তারের পরই বাঙালীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেই বাঙালী সমাজে স্বদেশ চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে বলে দাবী করা যায় ,যদিও জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চাইতে বড় এই ধারণা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। তাছাড়াও তৎকালে প্রজাদের দেশত্যাগ করতে হলে শাসকের অনুমতি গ্রহণ করতে হত। তাই কালু ডোম লাউসেনের সঙ্গে ময়না যেতে গৌড়েশ্বরের অনুমতি নেবার কথা ভেবেছে। কিন্তু কিছুটা স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ চেতনা না থাকলে তাদের পক্ষে এধরণের ভাবনা চিন্তা সম্ভব হত না বলেই বোধহয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলালের আত্মত্যাগের কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়। সুতরাং মধ্যযুগের শেষ পর্বে এই বোধ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড় ধরণের বিবর্তনকে চিহ্নিত করেছে বলেই মনে করি। কেননা গোটা মধ্যযুগে যেখানে আদর্শহীনতা, অমানবিকতা শাসকগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেখানে এই ধরণের আদর্শবাদ অভিনব ঘটনা।

৫) অর্থনৈতিক বিবর্তন ঃ অর্থনৈতিক বিবর্তন বলতে বোঝায় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবর্তন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল মধ্যযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বহুল বিবরণ পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তার যথাসম্ভব বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মধ্যযুগে শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার হলেও বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ও কৃষক। গৌতম ভদ্র বলেছেন – "মুঘল অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল কৃষি। কারণ কৃষিই ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপজীবিকা এবং উদ্বৃত্ত সামাজিক শ্রমের বিপুল সম্পদ কৃষি থেকে সংগৃহীত হত। শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি।"[৬৪] মোগল যুগে কৃষি ব্যবস্থায় সম্রাটের মালিকানা থাকলেও জমি চাষের জন্য কৃষকের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হত। এ সম্পর্কে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত 'আইন'-এ বলা হয়েছে— 'রাইয়তি কশ্‌থ' জমিকে 'মদৎ-ই-মায়েশ' বা নিষ্কর জমি উপভোগকারীর দল কখনোই 'খুদ কশথ' জমিতে রূপান্তরিত করতে পারবে না । এ সম্পর্কে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি ফরমানে বলা হয়েছে - যদি কৃষক কৃষির যন্ত্রপাতি কিনতে অক্ষম হয়, অথবা জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে আরেক জন কৃষককে জমি দিয়ে দেওয়া হবে, আবার ভূতপূর্ব কৃষকরা জমি চাষ করতে সমর্থ হলে তাকে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।[৬৫] এসমস্ত তথ্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে কৃষকের জমি ভোগ-দখল করার অধিকার মোগল সম্রাটরা মেনে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে নিষ্কর জমি উপভোক্তারা কৃষকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। অপরদিকে ভূমির মূল স্বত্বভোগী ছিল জমিদার, জায়গীরদার ও সামন্তরাজরা, ফলে জমি ছেড়ে চলে যাবার অধিকার বা বিক্রি করার অধিকার চাষীর ছিল না। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় লাউসেন তার সঙ্গে কালু ও তার পরিবারকে ময়না নিয়ে যেতে চাইলে শাসক গৌড়েশ্বরের অনুমতি নিতে হয়েছে।

মোগল যুগে কৃষির উন্নতিকল্পে যেমন রাষ্ট্র উৎসাহী ছিল তেমনি কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের কোন বাধা ছিল না। তাছাড়াও দেশে প্রচুর অনাবাদী জমি থাকায় ভূমি রাজস্ব লাভের কারণেও বনজঙ্গল কেটে আবাদি জমি সম্প্রসারণ ও জমিদারি স্থাপন করার অধিকার দেওয়া হত। এরকম জমিদারদের 'বনকাটি' জমিদার বলা হত। বাংলা সাহিত্যে এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। আবার ভূমি রাজস্ব লাভের আশায় সামন্তরাজ বা জমিদাররা নিজ জমিদারীতে প্রজাদের সুবিধা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করত। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন অংশে এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে চাষীরা এসে বসতি স্থাপন করে, এবং ক্রমশ নানা জাতি ও ধর্মের লোক এখানে বসতি স্থাপন করতে থাকে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এ শ্রেণীর জমিদার ও সামন্তরাজ ছাড়া আর এক রকমের চাষীর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। এরা ছিল অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এরকম সম্পন্ন চাষীদের বলা হত মোড়ল বা মণ্ডল। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আছে -

"জগাই নামে মণ্ডল নগরেত ঘর।
ধনের অন্ত নাহি রাজার সমোসর ॥" (বিজয়/২৯৪)

মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও এরকম গ্রামীণ মোড়লের সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গগীতিকার মলুয়া পালায় মলুয়া তার পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে এরকম সমৃদ্ধির কথা বলেছে।

এসমস্ত সম্পন্ন চাষীদের বলা হত 'খুদ-কশথ'।[৬৬] এদের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর এরকম গ্রামীণ মোড়লের মজুরি করে অর্থ সংগ্রহ করেছিল।এসমস্ত 'খুদ-কশথ' চাষীরা সম্পদশালী হওয়ায় মজুরকে সামান্য মজুরি দিয়ে অথবা অন্নের বিনিময়ে বেগার শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করাত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে এরকম মজুরদের কথা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে সেকালের সাধারণ চাষীর অবস্থা, চাষ পদ্ধতি ও শ্রমদানের কথা পাওয়া যায়। জমিদার ও মহাজনরা চাষীদের জমি, বীজধান ও চাষের উপকরণ দিয়ে চাষের সহায়তা করত। চাষীরা সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় ফসল ফলাত এবং এসময়ে চাষীদের দুর্দশার অন্ত থাকত না, কিন্তু ফসল ফলাবার পর তাতে জমিদার-মহাজনের থাবা প্রসারিত হত।

সাময়িক সুবিধালাভের লোভে কোন জমিদারের এলাকায় বসতি স্থাপন করলে আর ঐ জমিদারের এলাকার বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। সামন্তরাজ বা জমিদারকে কোন না কোন ভাবে কখনো না কখনো রাজস্ব শোধ করতেই হত, ফলে চাষী বা প্রজা জমিদার থেকে শুরু করে ইজারাদার, পেশকার, ডিহিদারের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হত। অত্যাচারিত প্রজাগণ নিষ্কৃতি লাভের জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারত না, কেননা কর আদায়কারীরা সর্বদাই পেয়াদা বসিয়ে পাহারা দিত। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মবিবরণীতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামদাস আদকের কাব্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় স্থানীয় শাসক চৈতন্য সামন্তের অত্যাচারের কথা পাওয়া যায়। কবিও গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। একই ঘটনার সাক্ষ্য মেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় না থাকলেও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে প্রজার দুর্দশার অন্ত থাকত না। স্থানীয় শাসক সামন্ত বা জমিদারগণ মোগল রাজদরবারের অনুকরণে আড়ম্বর ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে গিয়ে প্রজাদের কর ভারে জর্জরিত করেছে, আবার কখনো রাজকর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শাসকের দোহাই দিয়ে অতিরিক্ত কর আদায় করত। রাজকর্মচারীদের অত্যাচার অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠত। তাই অষ্টাদশ শতকে রচিত গোপীচন্দ্রের গানে প্রজাদের সমৃদ্ধির চিত্র থাকলেও অল্পকালের মধ্যে কর ভারে জর্জরিত প্রজার দুর্দশার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রজাদের লাঙল, গরু এমন কি স্ত্রী-পুত্র বিক্রি করে রাজস্ব পরিশোধের চিত্র পাওয়া যায় —

"চাষা লোকে দেয় খাজনা হাল গরু বেচেয়া॥
সাউধ সদাগর দেয় খাজনা নাও নৌকা বেচেয়া॥
ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলা কেথা বেচেয়া॥
লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপত বেচায় দুধের ছাওয়াল॥
দুধের পুত্র বেচেয়া হাকিমের মালগুজার জোগাইল।
পুত্র শোকে রাইয়ত প্রজা কান্দিতে লাগিল॥" (গোপীচন্দ্রের গান/২)

এরকম অমানবিক শোষণের ফলে প্রজা সাধারণ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর বিবরণে পাওয়া যায় সেকালে শাসকের রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা, যেমন— সেলামী, বাঁশগাড়ী, পার্বণি, পঞ্চক, জাতগুড়া, ধানকাটি ইত্যাদি। গৌতম ভদ্র জানিয়েছেন – "এইসব 'আবওয়াব' কৃষকদের কাছে রাজস্বের বোঝাকে অসহ্য করে তুলেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একথা বলা হয় যে, মুগলযুগের শেষে কৃষকদের উপর রাষ্ট্রের দাবিও বৃদ্ধি পেয়েছিল।"[৬৭] বাংলাদেশে টোডরমল প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্বনীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই রীতির উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা। প্রথম দিকে জমি জরিপ ও উৎপাদিত শস্যের উপর কর আদায়ের চাইতে লাঙল পিছু কর আদায় করা হত।কিন্তু মোগল শাসনের প্রভাবে উৎপাদিত শস্য, জমি জরিপ ও মাপজোখেরভিত্তিতে রাজস্ব আদায় করা হতে লাগল।এই রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, ফলে প্রজার উপর অতিরিক্ত কর ভার আরোপিত হয়। তাছাড়া কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা প্রজাদের আরও জর্জরিত করে। বলাই বাহুল্য কৃষক সমাজের প্রতিনিধি কবিরা এই নতুন ব্যবস্থাকে ভাল বলে মেনে নিতে পারেননি, তাই এই নতুন ব্যবস্থাকে শাসকের অত্যাচার বলে মনে হয়েছে। আমরা ভাঁড়ু দত্তের মুখে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা পাই এছাড়াও আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। খরা ও বন্যার ফলে বাংলার মানুষের দুর্দশার এক শেষ হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এরকম বন্যায় মানুষের দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত মানুষ মহাজনের দ্বারস্থ হত, একবার মহাজনের কবলে পড়লে আর কোন দিন সে নিস্তার পেত না। বাঙালী সমাজে তাই কিরাত পাড়া থেকে অভিজাত পাড়া সর্বত্রই অভাবের করাল গ্রাস ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই

দারিদ্র্যের করুণ চিত্র সর্বত্রই পাওয়া যায়। অন্যদিকে সমাজে অর্থ কৌলীন্য স্বীকৃত হওয়ায় অর্থহীন মানুষের করুণ অভিব্যক্তি সূচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাসকের কু-শাসন, দস্যুদের অত্যাচার এবং মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে অন্নাভাব প্রকটিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের একমাত্র আকুতি ছিল কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা। লক্ষণীয়, দরিদ্র তো বটেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ধনীরাও এই পর্বে অর্থ ও বিত্ত হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাইতো ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণার ঘরেও প্রবল অন্নাভাব দেখা যায়। গোপীচন্দ্রের গানেও এই চিত্র পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্রের গানে এক রায়ত বলেছে—

"ছোট রাইয়ত উঠি বলে, 'বড় রাইয়ত ভাই।
ধন-কাঙ্গালী হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর।
কেমন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল'।" (গোপীচন্দ্রের গান/৩)

লোকে বাধ্য হয়ে ঋণ পরিশোধ এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বংশানুক্রমে আত্মবিক্রয় করত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে মাত্র চোদ্দ টাকায় পুরুষানুক্রমে আত্মবিক্রয়ের চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯০ খ্রীঃ) ধর্মমঙ্গলের কবি রামকান্ত রায়ের আত্মবিবরণীতে সে সময়কার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। কৃষি ও গৃহকর্ম ছিল সে সময়কার স্বাভাবিক জীবিকা অর্জনের উপায়, কিন্তু চাষী গৃহস্থ ঘরের ছেলেরাও কর্মহীন বেকার হয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ এই বেকারত্বের চিত্র মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। রামকান্ত রায়ের বর্ণনা অনুসারে —

"মাস ছয় বেকারে বসিয়া আছি ঘরে
[গৃহ] স্থিতি কাজ মোর মনে নাই ধরে।"[৬৮]

শিক্ষিত কবি কৃষির প্রতি উৎসাহ বোধ করেননি, তাই তিনি বেকারত্বের জ্বালা অনুভব করেছেন। শহরে গিয়ে দরখাস্ত নিয়ে ঘুরে ঘুরেও কবি চাকুরী জোগাড় করতে পারেননি।

কৃষিজাতদ্রব্যের প্রাচুর্ব, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার ফল ভোগ করত উচ্চবিত্তের মনুষ ও মধ্যম শ্রেণীর মানুষরা। তাদের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের বর্ণনায় বণিক, সামন্তরাজ, মহাজন, জমিদারদের ঐশ্বর্যের চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গী আক্রমণের ফলে সাধারণ জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেলেও এক শ্রেণীর মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। ভারতচন্দ্র স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় থেকে দারিদ্র্যের যন্ত্রনা ভোগ করেননি। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সমৃদ্ধি ছিল। তৎকালীন দ্রব্যমূল্য কম থাকায় জনজীবনে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও সুখ ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোগল আমলের পূর্ব থেকেই বাঙালী বণিকরা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। সুলতানী আমলের শেষের দিকে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রীয় অরাজকতার ফলে জলপথে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। তৎকালীন শাসকের পক্ষে এই অত্যাচার দমন করা সম্ভব ছিল না। তৎকালীন গৌড়েশ্বর শেরশাহের আক্রমণের ভয়ে পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বিনিময়ে বাংলার দু'টি বাণিজ্য বন্দর সাতগাঁ এবং চাটগাঁয়ে তাদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬৯] এর ফলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহির্বাণিজ্যে পর্তুগীজ বণিকরা একাধিপত্য লাভ করে। তার সুফল অবশ্য বাংলার বণিকরাও খানিকটা পেয়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের বণিকদের ঘরে বসেই প্রচুর ধন অর্জনের চিত্র পাওয়া যায়। যাই হোক, এভাবেই ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাঙালী বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার অবসান ঘটে। তৎপরিবর্তে রাজকীয় উদ্যোগে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রার পরিবর্তে চণ্ডীমঙ্গলে রাজকীয় উদ্যোগে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার চিত্র

পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কাব্যে বৈদেশিক বণিকদের বাণিজ্যের চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রপ্তানি বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য গড়ে ওঠে। বিদেশী বণিকরা বাংলার সস্তা জিনিসপত্র অল্প পয়সায় কিনে নিতে শুরু করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে আগত দেশী-বিদেশী বণিকদের কথা পাওয়া যায়। এভাবে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায়। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেকালের দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য বিনিময়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে কৃষিজ ও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য বিনিময়ে ধাতব দ্রব্য আমদানির চিত্র পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায় কাল্পনিকতা থাকলেও যে সমস্ত দ্রব্যের তালিকা পাওয়া যায় তাতে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে এদেশীয় বণিকরা অন্তর্বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্য বা অন্যান্য স্তরের বণিকদের সঙ্গে সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক ছিল না। অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূস্বামীরা নিজেদের অঞ্চলে ছোট ছোট হাট বা বাজার বসিয়ে বাণিজ্যে সহায়তা করত। এই স্থানিক বাণিজ্য ও বণিকরা স্থানীয় কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। স্থানীয় ভূস্বামীরা বণিকদের নিকট থেকে তোলা আদায় করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরে হাট বসানো এবং ভাঁড়ু দত্তের তোলা আদায়ের চিত্র পাওয়া যায়। তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের চিত্রও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিরাজদ্দৌলার পতনের পূর্বে অসংখ্য বিদেশী জাতি বাংলার বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসীরাই প্রধান ছিল। পরবর্তীকালে দেশীয় বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে এদের গুরুত্ব খুব কম ছিল না। তাছাড়া পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার ও বর্গী আক্রমণের ফলে এ দেশীয় বাণিজ্য প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। অর্থনৈতিক বন্টন বৈষম্যের ফলে সাধারণ এক শ্রেণীর মানুষের জীবন অর্থ-সম্পদে ভরপুর হয়ে ওঠে, আর এক শ্রেণীর মানুষের জীবন শোষণ ও বঞ্চনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে; যদিও সাধারণ বাঙালী সমাজে বাণিজ্যবৃত্তি খুব একটা গ্রহণীয় ছিল না। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' একথা জানা সত্ত্বেও মূলধনের অভাবে ও প্রবঞ্চনার পেশাকে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্নের চাহিদা মিটলেও কাঁচা পয়সার অভাবে বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য হয়েছিল। ফলে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায় গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে।

মোগল আমলে কৃষির পরেই অর্থনীতিতে শিল্পের স্থান ছিল। তবে সেকালে বৃহৎশিল্প ছিল না, ক্ষুদ্রশিল্পই প্রধান ছিল, তার মধ্যে অন্যতম তাঁত শিল্প। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে বহির্বাণিজ্যে বাংলার তাঁতজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অবশ্য বাংলার তাঁত শিল্পীরা খানিকটা সুফল ভোগ করতে থাকে। গ্রাম ছেড়ে তারা শহরমুখী হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বাজারে বাংলার বস্ত্রে র চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেকালের বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় আছে। বাংলার সাধারণ ঘরের মানুষরা বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। কুলীন-অকুলীন পরিবারের মেয়েরাও সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহ করত। বস্ত্র ছাড়া পাট, তুলা ও রেশম থেকে নানা ধরনের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদিত হত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া লবণ, চিনি, লোহা, সীসা, মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরী শিল্পজাতদ্রব্য বাংলার কুটীরশিল্পে তৈরী হত। মধ্যযুগে বর্ণ ও বৃত্তি ব্যবস্থায় জাতিগত বৃত্তি পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু বৃত্তি পরিবর্তনের কথা পাওয়া যায়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন বৃত্তিতে থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষকে এই পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে চাকুরীবৃত্তিধারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে এক শ্রেণীর মানুষ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকলেও চাকুরীবৃত্তি বা রাজসেবা সমাজে স্বীকৃত ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রচিত শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি শিবঠাকুরকে গৌরী চাকুরীবৃত্তি গ্রহণের পরামর্শ দেয়নি। কিন্তু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যাবার ফলে সাধারণ মানুষকে বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতচন্দ্র স্বয়ং ফারসী ভাষা শিখেছিলেন রাজকার্য লাভের জন্য। এভাবে চাকুরীবৃত্তিধারী মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এই মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর পরিচয় আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের চাইতে এরা অনেক বেশী সুবিধাও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টির মূলে এই শ্রেণীর বৃত্তিজীবীরা ছিল।

মোগল আমলে সুষ্ঠু মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকলেও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার ফলে মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রমুদ্রা প্রচলিত থাকলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। মুদ্রা ব্যবস্থার নিম্নতম মান হিসাবে কড়ির ব্যবহার মধ্যযুগের প্রথম থেকে প্রচলিত থাকলেও শেষ পর্বে কড়ির মূল্যমানে হেরফের ঘটে যায়। ভারতচন্দ্রে কাব্যে, কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কড়ির মূল্যমান ওঠানামা করায় দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয়ে অসুবিধা হত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে বাজারে মেকী মুদ্রা চালু হয়েছিল। বাজারে পুরাতন ও নতুন উভয় প্রকার মুদ্রা চালু থাকলেও পুরাতন সিক্কাকে নতুন সিক্কায় বদল করে নিতে বাট্টা দিতে হত। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুদ্রিত বিভিন্ন মানের টাকা বাংলাদেশে প্রচলিত হয়। এসমস্ত মুদ্রাকে বদল করে নিতেও বাট্টা দিতে হত। মধ্যযুগের শেষ পর্বে এটা একটা বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন রূপে চিহ্নিত হয়।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগীয় বাজার ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অত্যন্ত কম। সাধারণ মানুষ খুব অল্প মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে তেরো গণ্ডা কড়িতে কালকেতুর বিবাহের কেনাকাটা সম্পন্ন হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দুর্বলা দাসীর বেসাতি বর্ণনায় সস্তা বাজার দরের পরিচয় আছে। সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এ সমস্ত তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির পরিচয় আছে। হীরা মালিনী কিংবা বিমলা মালিনীর বেসাতি অংশে যে দ্রব্যমূল্য তালিকা পাওয়া যায় তা খুব কম হলেও তাকে মহার্ঘ বলা হয়েছে, এখানে মনে রাখা দরকার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত কম। এক শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগের চিত্র থাকলেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার শেষ ছিল না। কেননা কৃষিজাতদ্রব্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের চাহিদা মিটলেও কাঁচা পয়সার অভাবে অন্য প্রয়োজন মেটাতে পারত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে এ অবস্থার আরও অবনতি হয়, তাই সাধারণ মানুষ ন্যূনতম জীবিকা গ্রহণ করেছিল। অন্নাভাব ও বস্ত্রের অভাবে গাছের পাতা পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছে এরকম চিত্রও সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাই মানুষের কামনা ছিল শুধুমাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তীকালেও জনগণের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। অর্থাভাব, কর্মহীনতায় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

৬) ধর্মনৈতিক বিবর্তন : নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত বাঙালীর ধর্মগত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা খুবই কঠিন কাজ এবং ধর্মগত বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা দুঃসাধ্য বিষয়। কেননা বাঙালী সমাজে প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে পৃথক পৃথক ধর্মাচার দেখা যায়, সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণগত ক্ষেত্রে দুস্তর ব্যবধান দেখা যায়। এমন কি আর্থসামাজিক কারণেও একই ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের আচার-আচরণগত ব্যবধান ছিল। কিন্তু কালগত বিবর্তনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, শুধু মাত্র ধর্ম নয়, বাঙালীর দেবভাবনাগত পরিবর্তন বা দেবচরিত্রগত পরিবর্তনও সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে। প্রাচীন যুগে বাঙালী সমাজের প্রধান ধর্ম ছিল দু'টি- বৌদ্ধধর্ম ও বৈদিক-পৌরাণিক ধর্ম। মধ্যযুগে সমাজের প্রধান ধর্ম হয় তিনটি— বৌদ্ধ,

বৈদিক-পৌরাণিক ও ইসলামধর্ম। মধ্যযুগীয় বাঙালীর হিন্দুধর্ম বস্তুতপক্ষে বৈদিক-পৌরাণিক ধর্মেরই বিবর্তিত রূপ। প্রাচীনকালের বাংলাদেশে অবৈদিক, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ, বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম কালক্রমে প্রবেশ করেছিল।[৬৯] তবে 'হিন্দু' নামে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম ছিল না। তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে বিজিত মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মসমূহকে 'হিন্দু' নামে চিহ্নিত করেছিল। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেছেন— "মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিয়া বসবাস করিল তখন 'হিন্দু' এই একটি সাধারণ নামেই তাহারা এখানকার জাতি ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করিল।"[৭০] পাল ও সেন যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্ম ও আর্যেতর লৌকিক ধর্মের নানা মিশ্রণ ঘটে চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের উচ্চতর শ্রেণীতে বৈদিক-পৌরাণিক ধর্ম এবং নিম্নকোটিতে অনার্য প্রভাবিত লৌকিক ধর্মের চর্চা হতে থাকে। অনার্য প্রভাবিত লৌকিক ধর্মের লৌকিক দেবতারা উচ্চতর সমাজে স্থান লাভ করতে পারেনি, তাই তারা এতদিন অন্তরালবর্তী হয়ে ছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণ ও ইসলামধর্মের প্রসারের ফলে হিন্দুধর্মের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল, এসময় লৌকিক দেবতারা আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেল এবং অনেকক্ষেত্রেই পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে নানা সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে এক ও অভিন্ন রূপে প্রতিপন্ন হতে থাকল। তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম নানা বিপর্যের সম্মুখীন হয়েছিল। ইসলামের আগ্রাসন থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার প্রয়োজনে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী হিন্দুরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন-বিবর্তনের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যগুলিতে এই পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হিন্দুধর্মের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের শুরুতেই বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে যে চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের সাহিত্যে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সেকালের এই অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষ পৌরাণিক ধর্মাচার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, শাক্ত-তান্ত্রিকতা, মদ্যপান, ব্যাভিচার ধর্মাচারের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। লোকজীবনে নানা লৌকিক-অপৌরাণিক দেবদেবী— মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, বাশুলী, ধর্মঠাকুরের প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবধর্ম তখন পর্যন্ত জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর্যেতর এসমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে পুরাণ সাহিত্যের আদলে এক শ্রেণীর নতুন সাহিত্যধারা গড়ে উঠল, যার মূল বিষয়বস্তুই হল লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা। এই নতুন সাহিত্য শাখাই 'মঙ্গল সাহিত্য' বা 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত হল। বৌদ্ধধর্ম ও তার সংস্কারের মধ্যে থেকেই বাঙালী জাতির জন্ম, কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত হতে থাকে, কেননা বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিকতাবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেও তান্ত্রিকতা ছিল, ফলে উভয় ধর্মাচারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ তন্ত্র মতের চামুণ্ডা, বাশুলী, ষষ্ঠীর মত দেবীরা হিন্দুধর্মে স্থান করে নেয়। কারো কারো মতে হিন্দুর কালী ও ভদ্রকালী বৌদ্ধ তন্ত্রেরই দেবী।[৭১] কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। পাল ও সেন যুগে এসে নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে পড়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মে আর বিশেষ পার্থক্য রইল না। বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে চলে গেলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেল। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাক্তধর্মের মধ্যে মিলিয়ে যেতে থাকল।[৭২] চর্যাপদের সহজিয়া সাধকগণের গুহ্য সাধনপন্থায় ও নাথধর্মের মধ্যে অবলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাংশ বেঁচে রইল। চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে শাক্ত-তন্ত্রধর্মের ব্যপকতা দেখা গিয়েছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শাক্ত-তান্ত্রিকদের সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে —

"রাত্রি করি মন্ত্র পঢ়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সভার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।

খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানারঙ্গ ॥" (বৃন্দাবনদাস/১৪৩)

সেকালে বৈষ্ণব বিরোধী ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণবদের শাক্ত-তন্ত্রাচারী বলে নিন্দা করত, বৈষ্ণবদের সাধন পদ্ধতিও তাদের কাছে তাই নিন্দনীয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ঘটলে শাক্তধর্ম ও তান্ত্রিকতায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণবধর্মেও নানা আচার-বিচারের জীর্ণতা দেখা দেয়, ফলত বৈষ্ণবধর্মেও তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে 'রাধাতন্ত্র' সৃষ্টি করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্য হ্রাস পেলে তন্ত্রচর্চা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তবে এই পর্বে শাক্ত ও বৈষ্ণব বৈরিতা হ্রাস পায়। শাক্ত সাধকদের চিন্তাধারায় বৈষ্ণবের কৃষ্ণ ও শাক্তদের কালী একাকার হয়ে যায়। শাক্ত সাধকরা কালীকে নটবর বেশে বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ করেন। রামপ্রসাদ সেন কালীকে কৃষ্ণ, শিব ও রামের সঙ্গে একাকার করে দেখেন।

বাঙালীর ধর্মীয় চেতনায় যে বড় রকমের বিবর্তন ঘটেছিল মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। মধ্যযুগের শুরু থেকেই বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্যের কারণ সমাজ মানসের গভীরেই প্রোথিত ছিল। তুর্কী আক্রমণে বাঙালী হিন্দুর বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে সমাজের অভ্যন্তরে চলেছিল বিরাট সংমিশ্রণ। এরই ফলে উচ্চবর্গের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের সংমিশ্রণ ঘটে এবং সমাজ রক্ষার তাগিদ থেকেই উচ্চবর্গের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে অনার্য লৌকিক দেবদেবীদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে থাকে। এইভাবে ব্রতের দেবী শীতলা, ষষ্ঠী, কমলামঙ্গলের ব্যাঘ্রভয় নিবারণকারী দেবী কমলা 'জগজ্জননী', 'শৈলসুতা', 'শঙ্কর গৃহিণী', 'পরমেশ্বরী' রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। চৈতন্য-পূর্ব যুগে শৈব-শাক্ত প্রবল দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর উগ্র শৈব হলেও শেষ পর্যন্ত বাম হাতে মনসা পূজার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মনসা ভগবতী রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

চৈতন্য-পরবর্তীকালে মনসার উগ্রতা ও চাঁদের রূঢ়তা অনেক কমনীয় হয়েছে। তাই চাঁদ সদাগর দেবীর কাছে অনেক বেশী নতজানু হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর মনসার স্তবস্তুতি করতে গিয়ে শুধু ভগবতী নয়— লক্ষ্মী, সীতা. গয়া, গঙ্গা একাকার করে দিয়েছে।কবির ভাষায়—

"তুমি দেবী ভগবতী : অযোনিসম্ভবা সতী : মাহেশ্বরী অনন্তরূপিণী।
ভবানী ভাবিনী সীতা : লক্ষ্মী-স্বরূপিণী মাতা : মহাকাল রাত্রি তপস্বিনী ॥
তুমি ভুজঙ্গের মাতা : আকাশ পাতাল যথা : ত্রিভুবনে তোমার গমন।
জগতে তোমার দয়া : তুমি গঙ্গা তুমি গয়া : স্তুতি নাহি জানে দেবগণ ॥" (ক্ষেমানন্দ/২৯২)

কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যেও দুর্গার সঙ্গে শীতলা ও ষষ্ঠীর অভেদত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমলামঙ্গলে কমলার সঙ্গে বাঘদেবতা দক্ষিণ রায়কে এক করে দেখা হয়েছে। তাই কমলামঙ্গলে বাঘ কর্তৃক বিপন্ন সাধু কমলার স্তবস্তুতি করতে থাকে।

ধর্মঠাকুরের পূজা সমাজের সকল স্তরে প্রচলিত ছিল না। প্রধানত ডোম সম্প্রদায়ের মানুষই ধর্মঠাকুরের ভক্ত; তাছাড়া চাঁড়াল, ধোপা, শুঁড়ি, জেলে প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজক। এই ধর্মঠাকুরের উপর হিন্দুর বিভিন্ন দেবদেবীর প্রভাব কল্পিত হয়েছে, আবার কেউ কেউ এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক, ধর্মঠাকুরের সংস্থাপনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, হিন্দু-তান্ত্রিক প্রভাব, অনার্য জাতির দেবভাবনা ও ধর্ম বিশ্বাস মিলেমিশে গেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের দু'টি খণ্ডে চণ্ডীপূজার প্রচার সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন – "এখানে দেখিতেছি নীচ ব্যাধ-জাতির মধ্যে প্রচলিত দেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস আসলে বাঙলাদেশের একটা

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ়-অঞ্চল আজিও বহু প্রকারের আদিম-অধিবাসি অধ্যুষিত। এই আদিম অধিবাসিগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চকোটি হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। সেই স্বীকৃতিলাভের ভিতর দিয়াই আদিম-অধিবাসিগণের দেব-দেবীগণও পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া অভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।"[৭৩] তাছাড়া মধ্যযুগে ধর্মীয় বিবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা একটা থাকতই। সাধারণত শাসকের ধর্মই রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হত, তাই চণ্ডীমঙ্গলে অনার্য ব্যাধ প্রতিপত্তি লাভ করলে তার উপাস্য দেবীও প্রচারলাভ করল। তাই স্বাভাবিকভাবেই কালকেতুর গুজরাট নগরে বর্ণহিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাধ পূজিতা বা 'পশুগণ'পূজিতা দেবী বর্ণহিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। একারণেই মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসার চাঁদ সদাগর কর্তৃক এবং চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি কর্তৃক পূজা লাভে দেবীর এত আকুতি।

মধ্যযুগের মধ্যপর্বে বাঙালী সমাজের মূল ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় বৈষ্ণবধর্ম। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু বাঙালী সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যা অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর জীবনদর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম জনসমাজকে তুমুলভাবে আলোড়িত করেছিল। বৈষ্ণবগণ নাম সাধনার মধ্যে দিয়ে জাতপাত মুক্ত সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন, মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই বৈষ্ণব কবি 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই বাণী রচনা করেন। চৈতন্যদেব সমাজের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ভক্তিমন্ত্রের আঘাতে ভেঙ্গে ফেলতে চাইলেন। তিনি ঘোষণা করলেন— কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা জাতপাতহীন ভক্তির রাজ্যে সাম্যের গান রচনা করেন। সেখানে বর্ণ বিরোধিতা, পঙ্‌ক্তি ভোজন ইত্যাদির দ্বারা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কোশাম্বীর মতে— "শিব-শক্তি উপাসনা অথবা শক্তিপূজা ধনী জমিদারদের একচেটে ছিল। চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম সেই অচলায়তনে আঘাত করে গরীব চাষী মজুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি সাধারণ লোকের মাঝে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে।"[৭৪] শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নাম সঙ্কীর্তন ও ভক্তি আন্দোলন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও মুসলমানরা ভাল চোখে দেখেনি, তেমনি বৈষ্ণবরাও ব্রাহ্মণদের 'পাষণ্ডী' নামে চিহ্নিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মুসলমান কাজীর নিপীড়নকে দমন করেন। তিনি এভাবে মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বৈষ্ণবধর্মকে তিনি গণধর্মে পরিণত করেন।[৭৫] বর্ণাশ্রম কন্টকিত হিন্দুসমাজকে তিনি প্রেমধর্মের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী করে তোলেন। বৈষ্ণবদের পবিত্র চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, তস্কর, দস্যু এমন কি মুসলমানরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুর ধর্মীয় চেতনা নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়ে শুধু সমাজের নিম্নকোটিতে অবস্থিত হিন্দুই নয় আদিবাসীদের মধ্যেও প্রসারিত হয়। ডঃ যদুনাথ সরকার 'হিসট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন- "চৈতন্যের প্রচারে বাংলার হিন্দুধর্মচেতনা নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়; সেখানে বৈষ্ণব গোস্বামীরা শুধু সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত দোকানদার ব্যবসাদারদের মধ্যে নয়, আদিবাসীদের মধ্যেও হিন্দুধর্ম ও সমাজচেতনা প্রসারিত করেন। বহুযুগ ধরে যারা অবহেলিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তাদের মধ্যেও সভ্যতার আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।"[৭৬] বস্তুত চৈতন্যদেবের পূর্বে কেউ-ই এমনভাবে রঘুনন্দন শাসিত বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য খর্ব করতে পারেননি। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই বৈষ্ণব সমাজে ভেদাভেদ আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, সহজিয়ারা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে বৈষ্ণবধর্মকে জরাজীর্ণ করে তোলে। বৈষ্ণব সমাজে ভিক্ষোপজীবী গুরুবাদী প্রথা জন্ম নিয়েছিল এবং তারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে এই শ্রেণীর কথা পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলে ব্যাস চরিত্রটিও এজাতীয় চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসমস্ত তথ্যের সমর্থন রয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত

মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনেকটা জাতপাতহীন মুক্ত সমাজের চেহারা পাওয়া যায়, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বৈষ্ণবধর্মের কথা থাকলেও জাতপাত, আচার-বিচারে জরাজীর্ণ সমাজের চেহারা দেখা যায়। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভণ্ডামী বৃদ্ধি পায়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা একেবারে হ্রাস পায়। তাই পরিশীলিত বুদ্ধিমান মানুষের কাছে ধর্ম উপহাসের বিষয় হয়ে পড়ে। ভারতচন্দ্রের মত কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। দেবতাকে নিয়ে ভক্তির পরিবর্তে ঠাট্টা-তামাশা করেছেন। মানুষ দেবতাকে উপহাসম্পদ করে সামাজিক ব্যাভিচারের সহায়ক করে তুলেছিল, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ধর্মীয় তত্ত্ব-দর্শনের অপব্যাখ্যা সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছিল। কবিগান, ঝুমুর গানে তৎকালীন সমাজের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমগ্র মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর জীবনে তন্ত্র-মন্ত্র, লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব থাকলেও স্থির ধর্মবিশ্বাস ছিল না। পৌরাণিক দেবতা শিব, বিষ্ণু, শক্তি ও গণপতির উপাসক ছিল বেশীর ভাগ মানুষ, অর্থাৎ ব্যবহারিক ধর্মীয় জীবনে বাঙালী ছিল পঞ্চোপাসক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার সম্ভব ছিল না বলে কোন দেবতার প্রতিই ভক্তি ছিল না। যুগ প্রতিনিধি হিসাবে ভারতচন্দ্র কোন ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না, বরঞ্চ ধর্মীয় আচার-আচরণ বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র হয়ে উঠেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগীয় বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় জীবনের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এক শ্রেণীর নৈষ্ঠিক মুসলমানের পরিচয় পাওয়ায় যায়, যারা কঠোরভাবে ধর্মাচার পালন করত, আর তার সঙ্গে ছিল ধর্মান্তরিত দেশজ নব্য মুসলমানরা। তারা ধর্মীয় আচার খুব একটা জানত না। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে ধর্মীয় কারণেই হিন্দু-মুসলমানের সহনশীলতা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পাশাপাশি বসবাসের ফলে সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ দিনের সহাবস্থান বাহ্যিক জীবন অপেক্ষা ধর্মীয় জীবনে গভীরতর প্রভাব ফেলেছিল। তুর্কী মুসলমানগণ দীর্ঘ দিন এদেশে বসবাস করার ফলে নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে চলে এসেছিল – ফলে তারা ধীরে ধীরে এদেশীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। হুসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খান হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণ, মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে তাঁরা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই পরাগলী মহাভারতের জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। মধ্যযুগে কয়েকজন মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অভিজাত মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজে পালিত পূজা-পার্বণ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নিয়ে নানা সংস্কার পালিত হত। মনসামঙ্গলে হাসন-হোসেন ও কাজীর মনসাপূজা এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যের মানসিংহ পালায় জাহাঙ্গীরের অন্নপূর্ণাপূজা একথা প্রমাণ করে। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের রচিত সাহিত্য থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার বিবর্তন ঘটে গিয়েছিল বলেই কবিগণ অকপটে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হিসেবে সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন, অবশ্য এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উভয় সমাজে নানা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে অন্ত্যজ হিন্দু ও দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানরা একই বংশোদ্ভূত। ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমানদের ধর্ম ছিল অপূর্ণ। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও পুরুষানুক্রমে পালিত সংস্কারকে ত্যাগ করা সহজ ছিল না। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নানা সংস্কার-কুসংস্কার, আচার-বিচার, বিশ্বাস তারা প্রতিপালন করে এসেছিল – ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে ওঠেনি। মুসলমান সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের দ্বারা হিন্দু সমাজও কম প্রভাবিত হয়েছে তা নয়। অনেক হিন্দু মুসলমান পীর ও সুফিদের প্রতি এবং কোরানশরীফের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর বাসরঘরে মনসার ক্রোধ থেকে

লখীন্দরকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুস্থানী তাবিজ কবচের সঙ্গে কোরাণশরীফও রেখেছিল।[৭৭] লক্ষপতি সদাগরের পুত্র বাণিজ্যযাত্রাকালে হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে আল্লাহ্‌কেও স্মরণ করেছিল।[৭৮] ধর্ম সম্পর্কিত চেতনার বিবর্তন ঘটেছিল বলেই কবিদের রচনায় এর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। মানবতাবাদী কবিগণ ধর্মকেন্দ্রিক কৌম জীবনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে তাই ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এই সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়াও পূর্ববঙ্গগীতিকা, মৈমনসিংহগীতিকার বিভিন্ন পালায় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা আছে।হিন্দুর উপর মুসলমান স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের চিত্র আছে। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবর্তন ঘটে যেতে পারে। মুসলমান শাসনের শেষ প্রান্তে এবং ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে মুর্শিদাবাদের নবাবদের শাসনকার্যে অবহেলা, বর্গীর হাঙ্গামা, পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ, পরবর্তীকালে পলাশী যুদ্ধে সিরাজের শোচনীয় পরাজয় বাংলাদেশের বিশেষত নাগর সমাজের ভিত নষ্ট করে দিয়েছিল। ধনী, ছোট-বড় রাজা-জমিদার ও সামন্ত শাসকগণের স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফলে হিন্দু সমাজের মত মুসলমানরাও অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছিল। হিন্দু কাব্যগুলিতে উল্লিখিত বীরের মত বীর কল্পনা করে মুসলমান সমাজেও কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল। তাই সত্যপীর, বড় গাঁজী খাঁর মত দেবতা সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যেমন প্রবল হয়ে ওঠে তেমনি আচারে-বিচারে ধর্ম জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের মানসিংহ পালায় জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দ মজুমদারের উক্তিতে তা ধরা পড়েছে। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবদেবীকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হিন্দুর আচারের নিন্দা করেছেন। যেমন -

"আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে সরম॥
- - - - - - - - - - - - - - - -
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥" (ঐ ৩০৫-৩০৬)

অপরদিকে মুসলমানের আচরণও হিন্দুর কাছে নিন্দনীয় ছিল। জাহাঙ্গীরের কথার উত্তরে ভবানন্দ বলেছেন –

"পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥" (ঐ ৩০৭-৩০৮)

ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে ধর্ম সহিষ্ণু সমাজ গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তা ভেঙ্গে পড়েছিল।

মধ্যযুগে রাজনৈতিক ঘনঘটা জনমানসকে কতখানি পরিবর্তিত করেছিল তুর্কী আক্রমণ ও বর্গী আক্রমণের মত দু'টি ঘটনা থেকে বোঝা যেতে পারে। শূন্যপুরাণে উল্লিখিত নিরঞ্জনের রুষ্মা অনুযায়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুর অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা একদা তুর্কী যবনদের পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে মুসলমান শাসকের অত্যাচারে জনসমাজ মারাঠা বর্গীদের পরিত্রাতা হিসাবে কামনা করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে জনমানসের এই আকূতি ধরা পরেছে। এই পর্বে সমাজ মানসের প্রতিনিধি হিসাবে কবিগণ শুধু হিন্দুর বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই করেননি, হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে পীরকে কেন্দ্র করে এক জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আদর্শটি সমাজে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও সমাজ মানসকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথায়, ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে তার প্রমাণ পাওয়ায় যায়। ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও সকল ধর্মের

মূল বিষয় এক ও অভিন্ন বলে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, ফলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজ বিবর্তনের ফলেই জনগণের ধর্মীয় ভাবনা ও দেবভাবনাগত বিবর্তন মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধরা পড়েছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ক্রম পরিণতিতে লক্ষ করা যায়— মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও ভক্তিভাবের ক্রম অবনতি দেখা দিয়েছে। মানুষের বিস্ময়বোধ ও দৈবনির্ভরতার অস্পষ্টতা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। ভক্তি ক্রমশ রঙ্গব্যঙ্গের পর্যায়ে নেমে এসেছে, মুকুন্দের হরগৌরী ও ভারতচন্দ্রের হরগৌরীর পার্থক্যই সেকথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়। দৈববিশ্বাস ক্রমশ অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই এই অবিশ্বাস শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের কাব্যে মনসাপূজার সময় মনসার মাথার উপর চাঁদের নাম লেখা চাঁদোয়া টাঙ্গানো আসলে দেবতাকে পিছনে ফেলে মানুষের বিজয় সূচিত করেছে। সমাজজীবনের ক্রমপরিণতির ধারাতে এই ভাবটি সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। এখানেই আধুনিক যুগের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তাতে একটা পরিবর্তনশীলতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত মনসামঙ্গল - চণ্ডীমঙ্গল - ধর্মমঙ্গল - শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলের সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ একরূপ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সমাজবৃত্ত, অর্থনীতি, ধর্মবোধ ও মানুষের চেতনাগত গতিশীলতা লক্ষ করা গিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি অবলম্বন করে এই গতিশীল রূপকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। পরিশেষে কবিগুরুর শাশ্বত বাণী - "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে / ওরা কাজ করে।" এই সত্য উপলব্ধ হয়। বিবর্তনের ধারা বেয়ে 'ওরা' মধ্যযুগ বেয়ে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ডঃ অতুল সুর, পৃঃ ৫।

২। মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ২৪৬-২৪৭।

৩। ঐ, পৃঃ ২৪১।

৪। জনৈক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃঃ ৬১।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড,পৃঃ ২৯০।

৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৪৪।

৭। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৫১।

৮। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৭৯।

৯। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ডঃ অতুল সুর, পৃঃ ১৪২।

১০। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৭৮।

১১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৯৬।

১২। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৮।

১৩। ঐ, পৃঃ ১৯৩।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৪৮।

১৫। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, আহম্মদ শরীফ, পৃঃ ২১৭।

১৬। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৮৪।

১৭। রিয়াজ-উস-সলাতিন, গোলাম হুসায়ন সলীম, রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, পৃঃ ১৭।

১৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিলের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত, পৃঃ ৪৯।

১৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, কঃ.বিঃ., ১৩৫৬, পৃঃ ১৫৬।

২০। ঐ।

২১। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিলের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত, পৃঃ ৫২।

২২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৫৪।

২৩। পূর্ববঙ্গগীতিকা (২য় খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৫৫৪।

২৪। পদ্মাবতী, আলাওল, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৭১।

২৫। বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), রাজ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ৭৬।

২৬। মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ৪৬।

২৭। মৈমনসিংহগীতিকা, মলুয়া পালা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৬৬।

২৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৯৬।

২৯। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ (কবি-পরিচয়)।

৩০। মেয়েদের ব্রতকথা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৬৯।

৩১। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৯৮।

৩২। পদ্মাবতী, আলাওল, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৬৭।

৩৩। বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৬৯।

৩৪। ঐ, পৃঃ ৫৮২।

৩৫। ঐ।

৩৬। ঐ, পৃঃ ৫৮১।

৩৮। বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৪৫।

৩৯। ছেলেভুলানো ছড়া, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), পৃঃ ১৬৯।

৪০। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড), ডঃ এম.এ. রহিম, পৃঃ ৩৫১।

৪১। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের সন্ধানে, প্রভাত কুমার সাহা, পৃঃ ২৮।

৪২। ঐ, পৃঃ ৩০।

৪৩। ঐ, পৃঃ ৩১।

৪৪। ঐ।

৪৫। মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ১৩৬।

৪৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ৩০৫।

৪৭। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৮।

৪৮। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৪২১।

৪৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১২২।

৫০। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ২৯।

৫১। ঐ, পৃঃ ৩০।

৫২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১২৪।

৫৩। মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ১০৩।

৫৪। জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩।

৫৫। Social Mobility in Bengal, Hiteshranjan Sanyal, P 42.

৫৬। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ২৮৩।

৫৭। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৩১।

৫৮। ঐ, পৃঃ ৩৩।

৫৯। ঐ।

৬০। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২৫-২২৬।

৬১। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৩৬।

৬২। ঐ।

৬৩। ঐ, পৃঃ ৩৯।

৬৪। মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ১।

৬৫। ঐ, পৃঃ ৩৮।

৬৬। ঐ, পৃঃ ৪৭।

৬৭। ঐ, পৃঃ ৫১।

৬৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৬৬।

৬৯। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৩১।

৭০। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ),রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ২৩০।

৭১। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪।

৭২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৩৪।

৭৩। ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৮০।

৭৪। নীতি যুক্তি ও ধর্ম-কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এর গ্রন্থ থেকে উক্তিটি সংকলিত, পৃঃ ১৪৫।

৭৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২৩।

৭৬। 'শ্রী চৈতন্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব' নীতি, যুক্তি ও ধর্ম — কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, পৃঃ ১৪৬।

৭৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র ,সেন, কঃ. বিঃ.,১৩৫৬, পৃঃ৩১৯।

৭৮। ঐ।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির পাঠ ঃ-

১) "শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদেশের অধিকারী

\- - - - - - - - - - - -

কপট ভকতি মোরে কর বিড়ম্বনা।" (পৃঃ ৩৭)

২) "ইহা সুনি অগ্নিশর্মা বলে অভিরোষে

- - - - - - - - - - - - -

ফিরাইল রাজপাত্র তার পাএ পড়ি।" (পৃঃ ২১০)

৩) "হইআ তুঞি রাজপুত বলাসি মৌলিক দত্ত

- - - - - - - - - - - - -

কুলের মহিমা কৈলি নাশ।" (পৃঃ ১০৬)

অষ্টম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য

অষ্টম অধ্যায়

সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য

জগৎ পরিবর্তনশীল, জীবন পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল মনুষ্য সমাজ ও সংস্কৃতি। পরিবর্তন ও পরিশীলনের মধ্যে দিয়েই মনুষ্য সমাজ অতীত অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এই পরিবর্তন যেমন সত্য, তেমনি সত্য পরিবর্তনের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র। সমাজে বিবর্তন ঘটলেও তাই একটি জাতির ঐতিহ্যমূল সুপ্ত অবস্থায় থেকেছে সমাজের অতীত ইতিহাসে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মতই সংস্কার ও সংস্কৃতি সহজে বদলায় না। তাই বর্তমান জীবনযাপন ও সংস্কৃতির মূল সূত্রটির সন্ধান করতে হয় অতীত ইতিহাসের পাতায়।

খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে উদ্ভূত বাঙালী জাতি মধ্যযুগের কালসীমাকে অতিক্রম করে ঐতিহ্যগত জীবনচর্চা থেকে কতটা সরে এসেছে কিংবা বাঙালীর বর্তমান জীবনের ঐতিহ্যমূল কোথায় প্রোথিত রয়েছে—এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যায়ণে অত্যন্ত জরুরী। এই নিবন্ধের অন্তিম পর্যায়ে তাই বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে যে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনীভূত হয়েছিল বাংলাদেশের ভাগ্যও সেদিন থেকেই অন্য পথে পরিচালিত হয়েছিল। স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থার অভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মুঠি শিথিল হয়েছে; আর এই দুর্বল রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ, ক্রমাগত পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণে বাংলার কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এবং গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণে এই বর্গী হাঙ্গামার বিবরণ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় জনগণের সামান্যতম কর প্রদানের ক্ষমতাও ছিল না, কিন্তু স্থানীয় শাসকেরা বিলাস-ব্যসনের ব্যয়ভার জোগানোর জন্য প্রজাদের উপর করের বোঝা আরোপ করে। বাংলাদেশের এই চরম দুর্দিনে ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। আলিবর্দী খাঁ ও পরে সিরাজদ্দৌলা এই রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও আর্থসামাজিক দুর্গতি রোধ করতে সক্ষম হননি। বাংলার জনগণ সেদিন মুসলমান শাসনের প্রতি বিরূপ হওয়ায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভ মাত্র দু'শ শ্বেতাঙ্গ সেনা ও পাঁচ'শ দেশীয় সিপাহী নিয়ে মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করেন— এভাবে ক্রমশ বাংলার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হল, বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হল। রাজশক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ঘনঘটা দেশের আর্থসামাজিক জীবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ গ্রাম বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল, ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি ভূমি রচনা করেছেন আর বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তার ভয়াবহতার বিবরণ দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের পতনের পর কোলকাতা বাংলার নতুন রাজধানীতে পরিণত হয় এবং বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়। কোলকাতা নব্যতন্ত্রের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। আর্থসামাজিক বিপর্যয়ে এক শ্রেণীর মানুষ লাভবান হয়েছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে কোলকাতামুখী হয়ে পড়েছিল; তারা 'দিশি চাল' সম্পূর্ণরূপে না ছাড়লেও 'বিলিতি চালে' অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তৎকালীন ছড়াতেও সমাজ পরিবর্তনের এই অভিব্যক্তি রচিত হয়েছে। যেমন—

> "ধন্য ওহে কলিকাতা, ধন্য ওহে তুমি, যত কিছু নূতনের তুমি জন্মভূমি
> দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল; নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল
> রাতারাতি বড়লোক হইবার তরে, ঘর ছেড়ে কলিকাতা গিয়ে বাস করে।"[১]

ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্য বা দেশ শাসনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন বৃত্তিধারী চাকুরীজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। হাতে কাঁচা পয়সা আসার ফলে এক শ্রেণীর মানুষ অর্থ-সম্পদে

প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। পরানুকরণের মধ্যে দিয়ে বিকৃত রুচি সম্পন্ন এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তারা 'বাবু' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। সমকালীন সাহিত্যে তার পরিচয় আছে।

রাষ্ট্রনৈতিক এই পরিবর্তন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনেও পালাবদল নিয়ে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ছাপাখানার প্রচলন। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ছাপাখানা স্থাপন করলেও এর দ্বারা মহতী উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। ১৮০০ খ্রীঃ ওয়েলেসলির উদ্যোগে ফোর্টউইলিয়াম কলেজ স্থাপন এবং ছাপানো বইয়ের প্রচলন শিক্ষাজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। অতঃপর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেস থেকে জনক্লার্ক মার্শম্যানের উদ্যোগে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ সময়কার বিশিষ্ট মনীষীদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, নারী শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, জড়তা, অন্ধতার বিরুদ্ধে কিছু মানুষ প্রতিবাদী ভূমিকা নেয়। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় কুসংস্কার, ব্যাভিচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, ফলে সামাজিক মুক্তি আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আবির্ভূত হন রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই দুই যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব। কবিকঙ্কণের দৈববাদী যুগ তখন স্মৃতিতে পর্যবসিত, ভারতচন্দ্রের দোলাচলতা যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে। ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে দেশীয় সংস্কৃতি ও দেশীয় ইতিহাস ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ করার আইন পাশ হয়; বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পাকাপাকি ভাবে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। দেশের কিছু সংখ্যক মানুষ পরিবর্তনশীলতায় আস্থা স্থাপন করে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজ শাসকও তাদের প্রগতিশীল ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ভারতবাসীর আস্থা অর্জন করেছে। এভাবে সমাজদেহে যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনের ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনেও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব পড়তে থাকে। বাঙালী ইতিপূর্বে ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজ্যস্থাপনে সহায়ক হলেও তাদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেনি। এযুগে বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরীই নয়, তাদের চিন্তাধারা এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে নতুন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য করে এক নতুন ভাবধারায় বাঙালী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে একবিংশ শতকেও সেই পরিবর্তিত-বিবর্তিত ভাবধারাকে অবলম্বন করে বাঙালী এগিয়ে চলেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ প্রাধান্য পেতে থাকে; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকেই শহরে অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ছিল, কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতিই ছিল শহরের অভিজাত শ্রেণীরও আচরণীয়। ডঃ অতুল সুর লিখেছেন— "শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রথম সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল।"[২] মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও কয়েক দশক পর্যন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতিই বজায় ছিল। বিংশ শতাব্দীর দু'-তিন দশকে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, ইউরোপীয় জীবনযাপনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বাঙালীর জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে। অবশ্য তার বেশীরভাগ প্রভাবই পড়ে শহুরে জীবনযাত্রার উপর। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে তার প্রভাব পড়লেও তা ছিল অনেক কম। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে গ্রাম বাংলার জনজীবনে পরিবর্তন হলেও বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে শহুরে জীবনে; কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করতে হলে আমাদের গ্রামীণ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে. ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে গ্রামীণ বাঙালী সমাজের যে চেহারা বিধৃত রয়েছে তার অনুসন্ধান করতে হবে।

বাঙালীর আহার-বিহার বা খাদ্য-রুচি প্রসঙ্গে আলোচনা করলে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক

যুগ পর্যন্ত প্রায় একই রকম খাদ্য প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রকৃত পৈঙ্গলের একটি কবিতাতে যে ভোজন চিত্র লভ্য, মঙ্গলকাব্যগুলি কিংবা চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে খাদ্যবোধের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অম্ল-মধুর-তিক্ত-কষায় চার রকমের খাদ্য আজও ভোজন প্রিয় বাঙালীর খাদ্য তালিকায় স্থান পায়। পিঠা-পায়েস, মিষ্টান্ন বিভিন্ন পালা- পার্বণ বা আত্মীয়ের সমাগমে আজও রান্নাঘরের শোভা বৃদ্ধি করে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে 'পাঁটা', 'পৌষপার্ব্বণ' কবিতাগুলি অষ্টাদশ শতকের বাঙালীর রসনাপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। বর্তমানে আর্থিক চাপ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বিভিন্ন রকম ব্যঞ্জন রাঁধার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে; তাছাড়া জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনের কারণেও বর্তমানের শিক্ষিত বাঙালী অনেক বেশী স্বাস্থ্য সচেতন ও খাদ্য সচেতন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাঙালী আজও ভোজন প্রিয়। মাছ, মাংস, ডিম থেকে শুরু করে সারা বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জির ব্যঞ্জন বাঙালীর প্রিয়। এক সঙ্গে একাধিক ব্যঞ্জন রাঁধার প্রবণতা হ্রাস পেলেও রন্ধনের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি বই হ্রাস পায়নি। বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রন্ধন পদ্ধতিতে রান্না করা খাবার বাঙালীর হেঁশেলে স্থান পেয়েছে। বাজারে হরেকরকম রান্না শিক্ষার বইগুলিতে বা টি.ভি. চ্যানেলগুলিতেও হরেকরকম রান্নার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষণীয় পিৎজা, বার্গার, চাওমিন, চপ, কাটলেট ফাস্ট ফুডের প্রচলন থাকলেও বাঙালীর রসনা পরিতৃপ্তি ঘরোয়া রান্নায়। শাক-শুক্তো, ঝাল-ঝোল, টক, পিঠা-পায়েস বা বিভিন্ন রকম মাছ— ইলিশ, রুই, কাতলা, চিংড়ির কদর এতটুকু কমেনি, এবং তার যথার্থ স্বাদ-গন্ধ বাঙালী গৃহিণীর হাতের জাদুতেই। একদা 'মাছে ভাতে বাঙালী' এই প্রবাদ প্রচলিত ছিল, বর্তমানেও এই প্রবাদটি নিরর্থক হয়ে যায়নি; যদিও উর্দ্ধমুখী মূল্যমান বিভিন্ন প্রকার মাছ সাধারণ বাঙালীর নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসু 'ভোজন শিল্পী বাঙালী' গ্রন্থে বাঙালীর রন্ধন বৈচিত্র্য ও অসামান্য মৌলিকতার উল্লেখ করেছেন; তাঁর 'তিথিডোর', 'গোলাপ কেন কালো' উপন্যাসে বাঙালীর ব্যঞ্জন বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাঙালীকে 'ভোজন শিল্পী'[৩] অভিধায় ভূষিত করেছেন।

বর্তমানে সময় সঙ্কীর্ণতার কারণেও বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন রান্নার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া বর্তমানের শিক্ষিতা নারীরা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রান্নার সময় তাদের কম, তাই গ্রামীণ গৃহস্থ গৃহিণীদের কাছেই বাঙালীর ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করতে হবে। তবে মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত একালের পুরুষরাও রন্ধনে পারদর্শী এবং রন্ধন আজকের যুগে শিল্পে পরিণত হয়েছে। রন্ধনে পারদর্শী পুরুষরা আজকাল বড় বড় হোটেলে ব্যবসায় পাচকের কাজ করে। বাঙালীর চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের যে পরিবর্তন হয়নি, তা বোঝা যায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাবারের দোকানগুলিতে ঘরোয়া খাবারের চাহিদা দেখে। পূজায় নাড়ু, মুড়কি, মোয়া, পৌষপার্বণে পাটিসাপটা, পায়েস, মালপোয়া, পুলি, পিঠা সবই খাবারের দোকানগুলিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময় বেচাকেনার ভীড় দেখে বাঙালীর ঘরোয়া খাবারের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ডালের বড়ি, আচার, কাসুন্দি হয়তো গৃহিণীরা তৈরী করতে ভুলে গেছে কিন্তু খাবারের দোকানগুলি থেকে চাহিদা মেটানো যায়। আজও গ্রামাঞ্চলের মা-দিদিমারা সযত্নে আচার, কাসুন্দি, ডালের বড়ি তৈরী করে। তবে একটা কথা বলা যায়, হয়তো বাজারের দৌলতে আমরা অর্থের বিনিময়ে আমাদের চিরাচরিত খাদ্যেই রসনা পরিতৃপ্ত করে থাকি কিন্তু তাতে মা-দিদিমার হাতের স্নেহস্পর্শ নেই।

বর্তমানে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে জীবন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রধানত মাটি ও পাথরের তৈরী বাসনপত্র ব্যবহার করত। ধনীরা কাঁসা ও সোনা-রূপার বাসনও ব্যবহার করত, কিন্তু বর্তমানে ঐ স্থানে অ্যালুমিনিয়াম, ষ্টেইনলেস ষ্টীল, কাঁচ ও পোর্সিলিনের বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া প্লাষ্টিকের বাসনপত্রও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি স্বল্পমূল্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যবহার করাও সুবিধাজনক। নাগরিক জীবনে প্রেসার কুকার, ফ্রিজ ব্যবহৃত হচ্ছে;

উনুনের পরিবর্তে ষ্টোভ ও গ্যাস ওভেন ব্যবহৃত হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলেও ধনীরা এগুলি ব্যবহার করে থাকে। তবে লক্ষণীয় আজও গ্রামাঞ্চলে মাটি ও পাথরের বাসনপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, পাথর ও কাঁসার বাসনপত্র সমাদৃত হয় বাঙালীর ঘরে ঘরে। তবে একটা কথা বলা যায় নতুন নতুন জিনিসপত্রের ব্যবহার হলেও কিন্তু পুরানো দিনের জিনিসপত্র, যেমন— থালা-বাসন, হাঁড়ি, পাতিল, বাটি, ঘটি, গামলা, বাটা, ষ্টেইনলেস ষ্টীল বা অ্যালুমিনিয়াম এমনকি প্লাস্টিকেও তৈরী হচ্ছে, অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যবহারের পরিবর্তন খুব একটা হয়নি।

চাষবাসের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও বাংলাদেশের আপামর চাষপদ্ধতির পরিবর্তন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয়নি। আজও গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা হাল, গরু, লাঙল, জোয়াল, মই দিয়েই চাষ করে থাকে। গৃহস্থালী বা কৃষিকাজে সহায়ক অস্ত্রাদির ব্যবহার আজও অটুট। যুদ্ধ প্রবণতা প্রায় কমে যাওয়ায় প্রাচীনকালের অস্ত্রাদি অবশ্য ব্যবহার হয় না, তবে কামান, বন্দুক, গোলা বারুদ আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে যুদ্ধবিদ্যায় পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার অভিনব সংযোজন।

বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-পরিচ্ছদে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাঙালী পুরুষের প্রধান পোশাক ছিল ধুতি ও চাদর এবং মহিলাদের প্রধান পোশাক হল শাড়ী। পোশাকের বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে; এখন পুরুষরা ধুতি ও চাদরের পরিবর্তে শার্ট, প্যান্ট, কামিজ, পিরান, কোট, টাই, হ্যাট ব্যবহার করে থাকে। গ্রামাঞ্চলেও ধুতি-চাদর ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, ধুতির মত সেলাই বিহীন বস্ত্রের স্থান দখল করেছে লুঙ্গি। বালকরা পাঁচহাতি ধুতি পরে না, হাফপ্যান্ট ব্যবহার করে। মেয়েরা শাড়ী ব্যবহার করলেও বাইরে চলাফেরার উপযুক্ত সালোয়ার- কামিজ, বিভিন্ন ধরনের অন্তর্বাস— সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার ব্যবহার করে। অনেকে পুরুষের শার্ট, প্যান্ট, পাজামা, ফতুয়া ব্যবহার করে থাকে। বালিকারাও আজ আর শাড়ী পরে না, ফ্রক বা চুড়িদার ও কামিজ পরে। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে শাড়ীর ব্যবহার থাকলেও পাজামা, সালোয়ার, কামিজ পরাই পছন্দ করে। অনেকে সাহেবদের অনুকরণে নেকটাই, কোট ও টুপি ব্যবহার করে থাকে। পুরুষের প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, লুঙ্গি পরার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে। মধ্যযুগে পুরুষরা প্রধানত খড়ম, চটিজুতা ব্যবহার করত, নারীরা সাধারণত নগ্নপদ থাকত। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও পুরুষরা বাইরে চলাফেরার উপযুক্ত চটি, নাগরা জুতা, বার্নিশ করা জুতা ব্যবহার করত। বর্তমানে খড়মের ব্যবহার এক প্রকার নেই তৎপরিবর্তে বিভিন্ন উন্নতমানের জুতার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত মেয়েদের জুতা-মোজা ব্যবহারের চল ছিল না, এমন কি মেয়েদের জুতা-মোজা ব্যবহার সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ছিল। এ সময়ে রচিত বাংলা সাহিত্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে গ্রামের মেয়েরাও আর নগ্নপদ নয়। জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।কিন্তু বাঙালীর ঐতিহ্যমূল মধ্যযুগের সীমানায় প্রোথিত রয়েছে, তাই আজও বাঙালী হিন্দুর বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পূজা-পার্বণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে ধুতি, চাদর, গামছা, খড়ম, মেয়েদের শাড়ী আবশ্যক; সেখানে কিন্তু শার্ট, প্যান্ট বা লুঙ্গি দন্তস্ফুট করতে পারেনি। হিন্দু সমাজপতিদের রক্তচক্ষু দেখে নয়, অজান্তেই আমরা ঐ সমস্ত পোশাক পরে থাকি।

বর্তমানে সোনা-রূপা বা অন্যান্য মণি-মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান পাথরের মূল্য বৃদ্ধিতে সোনা-রূপার গহনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। শিক্ষিত মেয়েরা পথেঘাটে চলাফেরার জন্য গহনা পরে না, তবে গহনা পরার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে তা নয়। কোন উৎসব অনুষ্ঠানে লক্ষ করলেই তা বেশ বোঝা যায়। কোমরে গোট, নাকে নোলক, নথ, নাকছাবি পরার প্রবণতা কমে গেলেও বিভিন্ন অলঙ্কার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি। মধ্যযুগে সোনা-রূপার মূল্য কম থাকায় নারীদের প্রচুর অলঙ্কার থাকত, একালেও ধনী পরিবারের নারীদের গহনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। তবে গহনা পরার প্রবণতা হ্রাস পায়নি, সোনা-রূপার গহনার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের ইমিটেশন সামগ্রী সোনার জলকরা গহনা, সিটিগোল্ড, ঝুটা মুক্তার গহনা ব্যবহার করে থাকে;

অনেকে উৎসব অনুষ্ঠানে পোড়ামাটির গহনাও ব্যবহার করে থাকে। পুরুষের গহনা পরার প্রবণতা প্রায় নেই, তবে এখনো বহু পুরুষ হার, আংটি পরে। হাতে বালা ব্যবহারের পরিবর্তে রিষ্টওয়াচ বা হাতঘড়ি ব্যবহার করে। শিশুদের গোট, বাজু ব্যবহার করতে দেখা যায়।

রূপচর্চা ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের প্রবণতা এতটুকুও কমেনি। বরঞ্চ একালের মেয়েরা অনেক বেশী রূপ-সচেতন। তাই রূপচর্চায় বিউটি কোর্স বা ফ্যাশন ডিজাইনের কোর্স করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে।তবে রূপচর্চার ঘরোয়া পদ্ধতি এখন অচল; মধ্যযুগে নারীরা গৃহেই রূপচর্চার উপকরণ তৈরী করে ঘষে মেজে নিজেদের রূপসী করে তুলবার চেষ্টা করত। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সাবান, শ্যাম্পু ছাড়াও রূপচর্চার উপকরণের অভাব নেই। বাজারগুলিতে ভেষজ ও রাসায়নিক উভয় প্রকার প্রসাধনের ছড়াছড়ি । বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, টি.ভি. চ্যানেলগুলিতে রূপচর্চার বিশেষ টিপস্ দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া শহরাঞ্চলে যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে বিউটি পার্লার, যেখানে রূপচর্চা করানো হয়। বর্তমানে বিবাহে কনে সজ্জা বা উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেয়েরা ঘরোয়া পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি রূপচর্চা করেনা, বরঞ্চ পার্লারগুলিতে চটজলদি তা সেরে নেয়। পুরুষরাও এবিষয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই।

বর্তমানে মেয়েদের লম্বা চুল রাখার প্রবণতা কিছুটা কমেছে, শহরে মেয়েরা অনেকে বয়েজকাট্ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের খোপা বাঁধার দক্ষতা একালের মেয়েদের না থাকলেও পার্লারগুলিতে সহজেই তা করা যায়। পুরুষের চুল-দাড়ি কামাবার জন্য নাপিতকে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয় না, শহরে ও গ্রামে সেলুনগুলিতে মানুষ ভীড় করে থাকে। চুল কাটাবার বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাঙালী সধবাদের অলঙ্কার হিসাবে শাঁখা-পলা, রুলি বা প্রসাধন হিসাবে সিন্দুর-আলতা পরার প্রবণতা সামান্য কমে গেলেও বলা যায় বেশীরভাগ মেয়েরা শাঁখা-সিন্দুরের পক্ষপাতী। গ্রামাঞ্চলে শাঁখা-সিন্দুর পরার প্রবণতা এতটুকু হ্রাস পায়নি, বাঙালীর চিরাচরিত সংস্কার এর মূলে রয়েছে বলেই তা কোন দিন মুছে যাওয়া সম্ভব নয়।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে বাদ্যযন্ত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হত তার অনেকগুলিই আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, অনেকগুলির পরিচয় উদ্ধার আজ সম্ভব নয়; আরও কত রকমের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত ছিল তার খবর কে রাখে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কত রকমের বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে তার নমুনা সংগ্রহ শ্রমসাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হলেও ভারতীয় রাগ প্রধান সঙ্গীত, লোকসঙ্গীতে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রই গ্রহণযোগ্য।আবার বিবাহাদি অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে ইংরেজী ব্যাণ্ডের আড়ালে দেশীয় বাজনা হারিয়ে যেতে বসেছে, তবে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে বা কীর্তন গানে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রই অপরিহার্য, সেখানে বিদেশী বাদ্যযন্ত্র অনুপযুক্ত।একালেও বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতে বাঙালীর মৌলিকতার কারণেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি বিশিষ্ট প্রবাদ প্রচলিত আছে–'সাজা বাজা কেশ তিনোঁ বাংলা দেশ।'[৪] অর্থাৎ অঙ্গসজ্জা, বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ এবং কেশ বিন্যাসে বাংলাদেশের মর্যাদা সুবিদিত। একালেও আমরা এ বিষয়ে গর্ববোধ করতে পারি।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় মধ্যযুগের সঙ্গে এযুগের যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটে গেছে সে বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বেই ভারতবর্ষে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং ক্রমাগত বিস্তার লাভ করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যোগাযোগ ব্যবস্থা চরম উন্নতি লাভ করেছে। মধ্যযুগের গরুরগাড়ী. পালকি. দোলা, চতুর্দোল একালে স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে আজ দূর আর দূর নেই, সমগ্র পৃথিবীই ঘরের মধ্যে এসে গেছে।

সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমানে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। মধ্যযুগের

অবসানে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হলেও কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার-বিশ্বাস হ্রাস পায়নি। কুসংস্কার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল বাঙালী সমাজকে। তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ-উচাটন, বশীকরণের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে তন্ত্র-মন্ত্র বশীকরণ এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীদের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শ্যামা সুন্দরীর স্বামী বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহ করতে কপালকুণ্ডলা বনে গিয়েছিল। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় তো বটেই, শিক্ষিত নাগরিক সমাজ থেকেও বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার মুছে যায়নি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ সমাজের চেহারা দেখা যায়। আজও সাপে কামড়ালে ওঝা-গুণীনদের আগে ডাকা হয়, ফলে প্রতি বছর প্রচুর লোক মারা যায়। আদিবাসী সমাজে ডাইনীপ্রথা ভয়ানক ভাবে প্রচলিত। এখনও শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ বাঙালী সমাজে তন্ত্র-মন্ত্র-বশীকরণ বা জাদুশক্তির প্রতি বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। সন্তানের মঙ্গল কামনায়, ভূত-প্রেতের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আঁতুরঘরে গোমুণ্ড স্থাপন করা হয়, একখণ্ড লোহা সঙ্গে রাখা হয়। বিবাহের পর এক বৎসর কাল নানা ধরনের বিধিনিষেধ পালন করতে হয়। জলপড়া, তেলপড়া, ধুলোপড়া ইত্যাদি করণ প্রক্রিয়া দ্বারা বশীকরণ করা বা সর্বনাশ করা বা রোগ সারানো যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। আরোগ্য কামনায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা, বৃষ্টি কামনায় বৃক্ষ বিবাহ, ব্যাঙের বিবাহ এমন কি বন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বিবাহের উদাহরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের পাথর ধারণ, পশুর চামড়া, শিং আংটি ও মাদুলিতে ধারণ করলে মঙ্গল হয়, শনির কু-দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। শিক্ষিত সমাজেও বহু ব্যক্তি আংটিতে, মাদুলিতে ঐগুলি ধারণ করে থাকে। ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাস এতটুকুও কমেনি। বিভিন্ন মন্দিরে দেয়াসী বা সেবায়েত বা জ্যোতিষীরা ভাগ্য গণনা করে মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতিবিধান করে থাকে। শিক্ষিত বাঙালীরও এতে বিশ্বাস রয়েছে, তা বোঝা যায় সংবাদপত্র বা টি.ভি. চ্যানেলগুলিতে দৈনিক রাশিফলের বিচার, কররেখা গণনার দ্বারা ভাগ্যফল নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত থেকে। পাঁজি-পুথির প্রতি বিশ্বাস আজও অটুট; পাঁজি দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করা হয়, লগ্ন স্থির করা হয়। হাঁচি-টিকটিকির বাঁধন, কাক চরিত, পশুপাখির আচরণ বা অঙ্গ স্পন্দন চরিত্র অনুযায়ী শুভাশুভ নির্ণয়ের প্রতি বিশ্বাসও মুছে যায়নি। সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের দিন হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দেওয়ার প্রবণতা গ্রামীণ সমাজে ও অশিক্ষিত- অন্ধ বিশ্বাসে ভরপুর মানুষের মধ্যে আজও অটুট। গৃহে মৃত্যু হলে হাঁড়ি ফেলা, হবিষ্য করা আজও হয়ে থাকে। তবে এই প্রবণতাগুলি অপেক্ষাকৃত কমে আসছে।

বাঙালী সমাজে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' আজও প্রবাদবাক্য হিসেবে প্রচলিত। বিভিন্ন ধরণের বার-ব্রত পালনের প্রবণতা বর্তমানে অনেকটাই কমে গেছে ঠিকই তবে এখনও নবান্নে নতুন চালের অন্নগ্রহণ, পৌষপার্বণে পিঠে-পুলি করা, অরন্ধনে পূর্বদিনের রাঁধা অন্ন গ্রহণ করা,. শ্রী পঞ্চমীতে কড়াই সেদ্ধ করে শীতলষষ্ঠীতে ভক্ষণ করা, চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু ভক্ষণ করা, বৈশাখ মাসে বসুধারা ব্রত পালন করা হয়। জামাইষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী, শীতলা অষ্টমী, অম্বুবাচীতে বিধবাদের নিয়মকানুন পালন ও আগুনের সংস্পর্শহীন খাদ্যগ্রহণ, একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ব্রত. ইতুর ব্রত, সুবচনীর ব্রত, দশহরায় ফলার ভোজন, শিবরাত্রিতে ও শ্রাবণ মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার প্রবণতা কমে যায়নি। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নানের খামতি শিক্ষিত জনসমাজেও পড়েনি। আবার বিপত্তারিণী, সন্তোষী মাতা, বাবা লোকনাথের মত নতুন দেবতারা ব্রতের দেবদেবীর স্থান দখল করে নিয়েছে।নবজাতকের জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুতে আচার পালন আজও হয়ে থাকে। নারীর রজঃ অনুষ্ঠান পালন আজ হয় না. স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নার্সিংহোমে সন্তানের জন্ম হওয়ায় প্রাথমিক আচারগুলি পালন করা হয় না, কিন্তু প্রসূতির সাধভক্ষণ, নবজাতকের জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা ও নামকরণ অনুষ্ঠান করা হয়। হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের প্রচলন কমে গেলেও অন্নপ্রাশন পালন করা হয় । বিয়ের আগে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। বিবাহের আচারগুলি হয়ত সংক্ষিপ্ত হয়েছে. তবে গায়েহলুদ. নান্দীমুখ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, সম্প্রদান যথাক্রমে পালিত হয়।

তবে কিছু কিছু আচার যেমন— বিবাহ উপলক্ষে নাড়ু ভাজা, ছাদনা তলায় নাপিতদের ছড়া কাটার প্রচলন নেই। তবে অঞ্চল বিশেষে ভিন্নতা আজও আছে। তাছাড়া বর্তমানে যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিবাহ-পূর্ব প্রেম বৃদ্ধি পাওয়ায় কোর্ট ম্যারেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়াও বর্তমানে বিবাহে ব্যয়বহুলতা এবং ঝামেলা এড়ানোর জন্য অভিভাবকরাও কোর্ট ম্যারেজ অনেকক্ষেত্রে মেনে নিচ্ছে, ফলে অনেকক্ষেত্রেই বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠানটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রেজিস্ট্রি ম্যারেজ আজ রাষ্ট্র-স্বীকৃত। তবে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটা নষ্টালজিয়া থাকায় সম্পূর্ণভাবে বিবাহাচারগুলি উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— মধ্যযুগে "শিবের বিয়ে যেভাবে হয়েছিল বার-অ্যাট-ল-র বিয়েও ঠিক সেইভাবেই এখনও ঘটছে।"[৫] আসলে আমাদের অন্তঃপুরটা এবং জাতির সংস্কৃতিগত মানসিকতা সহজে বদলায় না, আর তা প্রোথিত রয়েছে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে। মৃত্যুর পর আজও সদ্য বিধবাদের আচার পালন করতে হয়, মৃতের পুত্রদের পৈতে ধারণ, সেলাই বিহীন বস্ত্র পরিধান, একখণ্ড লোহা ধারণ, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান, গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন আবশ্যিকভাবে পালিত হয়। হয়ত অশৌচকাল এক মাসের স্থলে পনের দিন হয়েছে কিন্তু আজও মৃত্যুর এক বৎসর কাল পর্যন্ত নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীতে থাকতে হয়।

বর্তমানে হয়ত জাতিভেদ, ছোঁয়াছুয়ি বাছ-বিচার হ্রাস পেয়েছে, আজ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপার প্রায় নেই। ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি ও লাঘব হয়েছে, বিবাহকালে ঘটক ব্রাহ্মণদের তেমন প্রভাব নেই। সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রী কলমে বা ইন্টারনেটে পাত্র-পাত্রী ডট কমে তার চাহিদা পূরণ করেছে। কিন্তু আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বা সত্তর-আশি বছর আগে ভেদাভেদ যথেষ্টই ছিল তার প্রমাণ পেতে পারি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে গ্রামীণ সমাজের চেহারা থেকে।

আমোদ-প্রমোদমূলক ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানগুলি একালের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, নগরকেন্দ্রিক জীবনে তো বটেই গ্রামীণ জীবনেও লোকক্রীড়া ও শরীরচর্চার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেকালে হা-ডু-ডু বা কবাডি, ডাংগুলি, ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এক্কা-দোক্কা,লুকোচুরি বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়েদের মানসিকতা ও অবসর খুবই কম, তাছাড়া সঙ্গী-সাথীর অভাবেও যৌথ ক্রীড়াগুলি সম্ভব হয়না। নানা রকম বিদেশী খেলা— ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাটমিন্টন, ভলিবল, লুডো, ক্যারমের দৌলতে লোকক্রীড়াগুলি প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। অবশ্য ফুটবল, ক্রিকেট, দাবায় বাঙালী পেশাদারী খেলোয়াড়রা বিশ্বমানেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে খুব সামান্য হলেও লোকক্রীড়াগুলি প্রচলিত রয়েছে। তবে দুভার্গ্যের বিষয় ফুটবল-ভলিবলের মত খেলাগুলিও গ্রাম বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। এক সময় ধনী পরিবারের ছেলেদের কুস্তি, মল্লবিদ্যা ও শরীরচর্চা শেখানো হত বর্তমানে তা হারিয়ে যাচ্ছে; দূরদর্শনের ক্রীড়া চ্যানেলগুলি অথবা ভি.ডি.ও. গেমসের দৌলতে ছেলেমেয়েরা ঘরে বসেই খেলা দেখে, কিন্তু খেলে না। শরীরচর্চার রেওয়াজ প্রায় নেই। গ্রামাঞ্চলে দলবদ্ধভাবে খেলা এখন কদাচিৎ দেখা যায়, শহরাঞ্চলে তাও দুর্লভ। কোথাও কোথাও জিমন্যাসিয়ামে বা পাড়ার ক্লাবগুলিতে শরীরচর্চা কোর্স করানো হয় বা নিয়মিত শরীরচর্চা করানো হয়। এক সময় বাঙালীর সময় চলত ঢিমে চালে, ফলে তাদের প্রচুর সময় থাকত, বালক-বালিকারা অবসরে খেলাধুলা করত; বর্তমানে প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে সময় চলে দ্রুত;ফলে খেলাধূলার অবকাশ খুব কম। জীবনযাপন ও মেলামেশা অনেকটা কৃত্রিম হওয়ার ফলও বাঙালী হ্রতোনাতে পাচ্ছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের চাইতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে। মধ্যযুগের শিক্ষা অত্যন্ত সীমাবদ্ধক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল । দর্শন, কাব্যশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ পাঠের মধ্যেই ছিল সারস্বত শিক্ষা। গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস শিক্ষার চল ছিল না।অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে যুগোপযোগী ভাষা হিসাবে ফারসী

শিক্ষার প্রবণতা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হলেও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ফলে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।শিক্ষার নানা দ্বার উন্মোচিত হয়, সাহিত্য, দর্শন ছাড়াও ইতিহাস চর্চা শুরু হয়, তাছাড়া ভূগোল ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন ইত্যাদি নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটে। সাহিত্যে.শুধুমাত্র ব্যাকরণ ও প্রাচীন কাব্য, নাটকই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ নতুন সাহিত্যের পত্তন করে। আধুনিক কোলকাতার ভাষাই তাদের সাহিত্যের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়। বিদ্যাসাগর, মাইকেল-হেম-নবীন ছাড়াও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রবীন্দ্রনাথের হাতে সাহিত্য নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দু'য়ের দশকে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে 'আধুনিক সাহিত্য' নামে এক নতুন সাহিত্য গড়ে ওঠে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান সবই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অন্ধতা থেকে মুক্তির প্রত্যাশা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

মধ্যযুগে শিক্ষা ছিল সাধারণত অর্থশালী ধনী জমিদারদের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা; ধনীরা তাদের চণ্ডীমণ্ডপে বা পণ্ডিতদের টোলে শিক্ষাদানের পাঠশালা স্থাপন করত। শাসককূল কখনোই জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করত না। আধুনিক যুগের শুরুতেই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের উদ্যোগে নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুদ্রিত বইয়ের প্রকাশ শিক্ষা জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। মধ্যযুগে নারী শিক্ষার আয়োজন ছিল না কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুতেই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নব-দিগন্ত উন্মোচিত হল, নারীশিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল। বিংশ শতব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে এল। স্বাধীন ভারতবর্ষে সরকার জনসাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে; আয়োজন ও উপকরণে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি শিক্ষকদের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও শিক্ষকরা নিতান্ত অবহেলার পাত্র ছিল। বুনো রমানাথের গল্প বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে সেকালে শিক্ষকদের দুরবস্থার চিত্র আছে। বর্তমানে সরকার শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ভার গ্রহণ করেছে, ফলে তাদের অবস্থার উন্নতি ও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছে। কিন্তু পাশাপাশি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। একদা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটা আদর্শবোধের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ক্রেতা-বিক্রেতা সুলভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই শিক্ষা মানুষ গড়ার মাধ্যম না হয়ে চাকুরী প্রাপ্তির মাপকাঠিতে দাঁড়িয়েছে।

লোককথা, ছড়া, ধাঁধাঁ, প্রবাদ-প্রবচনগুলি লোকজীবনের উপাদান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে লোকজীবনের অঙ্গ হিসাবে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয়েছিল। সেকালের লোকেরা কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধাঁ ব্যবহার করত, মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারত, সেগুলিই যুগ যুগ ধরে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে আসত। কিন্তু আধুনিক যুগে গ্রামীণ ও নগরজীবন মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে লৌকিক জীবন পরিহার করে নাগরিক জীবনকে গ্রহণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনকার শিক্ষিতা জননীরা ছেলেমেয়েদের রূপকথা, উপকথা, ধাঁধাঁ শোনায় না. তাই শিশুরা কমিকস্ পড়ে, দূরদর্শনে কার্টুন চ্যানেল দেখে। বস্তুত গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ছড়া. প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ রচনার যুগেরও অবসান ঘটেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি একালে সকল প্রকার সত্যকে বহন না করলেও অধিকাংশ প্রবাদ-প্রবচনগুলি একালেও সত্য বলেই সমাজে টিকে আছে। তবে একালের নারীরা কথায় কথায় প্রবাদ ব্যবহার করে না; অবশ্য শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে যেখানে গ্রামীণ সংস্কৃতি বেঁচে রয়েছে সেখানে

ক্ষীণভাবে প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁগুলি টিকে থাকলেও নগর জীবনের ছোঁয়ায় ধ্বংসোন্মুখ। তাই বর্তমানে প্রাচীন ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ জনশ্রুতিতে অপেক্ষা না করে লিখিত আকারে প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মৈমনসিংহগীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা, গোপীচন্দ্রের গান, ধাঁধাঁ ও প্রবাদ-প্রবচনগুলি সংরক্ষণ করার মানসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। একালেও তার জনপ্রিয়তা এতটুকু নষ্ট হয়নি। মঙ্গলকাব্যগুলিও তাই। বাঙালীর নিজস্ব জীবন বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপনের মূল সূত্রগুলি আমরা তার মধ্যে খুঁজে পেতে পারি।

আধুনিক যুগে বাঙালী সমাজের বাহ্যিক গঠন অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ গঠন ও মনোধর্মের ক্ষেত্রে বড় রকমের বিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিগত শতাব্দীর তিন দশকের পূর্বে নারীর অন্দরমহল অবশ্য অনেকটা রক্ষণশীল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে সে সময়কার নারীর দুরবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে নারী সমাজকে যে ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তা থেকে মুক্তির জন্য আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন সে সময়কার মনীষীরা। সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ থেকে শুরু করে বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং নারীশিক্ষা প্রচলনের মত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু নারী আলোকপ্রাপ্তা হলেও তা সর্বৈব অবস্থা নয়। ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে নারী মুক্তির ঢেউ লাগলেও কোলকাতা থেকে সুদূর গ্রামাঞ্চলে মধ্যযুগীয় চিরাচরিত ধারাবাহিকতার দ্বারাই নারীকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। নারীরা কোন অবস্থাতেই গৃহের বাইরে যেতে পারত না, এমনকি একই পরিবারে ভাশুর-ভাদ্দর বৌ এর মধ্যে বিধিনিষেধের প্রাচীর ছিল, ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে পাপস্খলন করতে হত। বর্ষীয়সী নারীরা পর্দা দ্বারা আবৃত পালকীতে করে গঙ্গাস্নানে যেত এবং পালকী সুদ্ধ তাদের জলে চুবিয়ে তোলা হত। নারীশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়ে একই বিদ্যালয়ে পড়া তো দূরের কথা যারা বালিকা বিদ্যালয়ে যেত অরাও পর্দাঘেরা গাড়ী বা পালকিতে যাতায়াত করত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয় এরকম অযৌক্তিক ধারণা প্রচলিত ছিল। রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন' গ্রন্থে সেকালের নারীর দুরবস্থার ছবি পাওয়া যায়। অবশ্য মাইকেলের কাব্যে সেকালের নারীমুক্তি আন্দোলন ও নারীর বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষে নারীর প্রভূত উন্নতি হয়েছে; শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, শিল্পকলায় নারীরা যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। নারীরা আর সেকালের মত নানা বার-ব্রত পালন করে না, কিন্তু আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকেই নারীর প্রগতিশীলতার পথ নিষ্কন্টক ছিল না। নানা রকম ভাবেই নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। তাই আধুনিক যুগের রক্ষণশীল কবির মুখে নারী প্রগতির বিরুদ্ধে কন্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল—

"আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো,
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ী গুলো, তুড়ী মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন "এ,বি," শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সতীদাহ রদ হলেও কৌলীন্য প্রথা ও বিধবা সমস্যা কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায় এযুগের সাহিত্যে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' নাটকে এই সমস্যার ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। তছাড়াও পরবর্তীকালে রচিত কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলীযাত্রা'

উপন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত, এগুলিতে ঐ সময়কার নারীর অবস্থান সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায়।

বর্তমান অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দ্বারা নারী পুরুষের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। একালের শিক্ষিতা নারী আপন ভাগ্য জয় করার প্রচেষ্টায় বিধাতার ওপর নির্ভর করে না। তারা নিজের গুরুত্বকেও উপলব্ধি করতে শিখেছে। একালের শিক্ষিতা নারী রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বলতে পারে—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা-ওঠা
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা॥"[৭]

কিন্তু একটা কথা সত্য যে, সার্বিকভাবে নারীর অবস্থান্তর ঘটেনি। গ্রামাঞ্চলে আজও পরপুরুষ বা একই পরিবারের মধ্যেও পুরুষদের সামনে বধূরা ঘোমটা দিতে ভোলে না, এখনও তারা স্বামী-ভাশুরের নামোচ্চারণ করে না। গ্রামাঞ্চলে তো বটেই অনেক শিক্ষিত পরিবারেও নারীর অবস্থা তথৈবচ। আজও কন্যা সন্তানের ভ্রূণ হত্যা করা হয়ে থাকে। সমাজে বধূ হত্যা ও পণপ্রথার মত কুপ্রথা নারী সমাজকে আজও অবদমিত করে রেখেছে। আজও নারী সম্পর্কিত বিধিনিষেধ পালিত হয়, আজও নারীর সমানাধিকার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই একই পরিবারে পুত্রসন্তান অপেক্ষা কন্যাসন্তান অবহেলিত হয়ে থাকে— কাজেই নারী সম্পর্কিত চিন্তাধারা আজও মধ্যযুগীয় অন্ধকারেই ঢাকা রয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বর্তমানে অবশ্য নারীমুক্তি সংগঠনগুলিতে বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বা সাহিত্যে নারীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়। মধ্যযুগের প্রারম্ভে ব্রতকথার যুগেই ধর্মের আড়ালে নারীমুক্তির নিঃশব্দ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মনসা-চণ্ডী-কানড়া-কলিঙ্গারা যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে এবং নারীর প্রতিষ্ঠা চেয়েছে। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলন নারীকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছিল— তারই উত্তরাধিকার বহন করে চললেও আজও নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামীণ নারী সমাজের নিরিখে বিচার করলে আজও তা বহুদূরেই রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে একালের নারী সম্পূর্ণভাবে অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না হলেও গ্রামাঞ্চলের নারীরা বেশীরভাগই রান্নাঘরের চার দেওয়ালেই আবদ্ধ। মধ্যযুগের নারীর মত একালেরও বেশীরভাগ নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, এ ব্যাপারে তারা পুরুষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন নারীর প্রকৃত অবস্থান্তর ঘটতে পারে না। নারী সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যে খুব একটা ঘটেনি তা বেশ স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। আজও পুরুষরা নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসাবেই দেখে। তবে এই মানসিকতার দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। নারীর পক্ষে পথঘাট আজও খুব একটা নিরাপদ নয়। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ আজকের সমাজেও যথেচ্ছভাবে ঘটে চলেছে। নারী সম্পর্কে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতার পরিবর্তন তো হয়ইনি বরং নারী নিজের সম্পর্কেও কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় নারী অপেক্ষাও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে। নারী নিজেই ভোগবাদী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নারী স্বাধীনতার অপব্যবহার করে নিজেকে ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে। অর্থ উপার্জন ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য বহু ক্ষেত্রে বিকৃত মানসিকতা ও রুচিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। মনসার মত অবৈধ-জারজ সন্তানরা সমাজে দুর্লভ নয়, একালেও তারা সমাজে অনেকটাই অবহেলিত রয়ে গেছে। ভ্রূণ হত্যা বা গর্ভপাত একালে বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি, প্রতিদিনের সংবাদপত্র বা সংবাদ চ্যানেলগুলিতে লক্ষ রাখলে তা বেশ বোঝা যায়। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় এটি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক। মনন-মানসিকতায় আজও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালী মধ্যযুগীয় রয়ে গেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় একালে তা লভ্য নয়। মধ্যযুগে পরিবারগুলি ছিল একান্নবর্তী; সেখানে আত্মীয়-পরিজন, দাস-দাসী থেকে শুরু করে অনেক ধনী পরিবারে ব্রাহ্মণ

পুরোহিতও একত্রে বসবাস করত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরেছিল। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে এই ভাঙনের ছবি আছে। মধ্যযুগে তো বটেই উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও বাঙালী পরিবারগুলিতে বহু সন্তান দেখা যেত, কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণেই মাইক্রো পরিবারের ধারণা এসেছে। 'ছোট পরিবার সুখী পরিবার', তাই একালের শিক্ষিতা জনক-জননীরা একটি বা দ'ুটি সন্তানেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষিত অনেক পরিবারেই এখন ছেলে বা মেয়েতে কোন ভেদ করা হয় না। পরিবার ছোট হয়ে যাওয়ায় একালের ছেলেমেয়েরা শৈশবে ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা দাদু-দিদিমার সংস্পর্শ বর্জিত এবং খুড়তুত-জ্যেঠতুত ভাইবোনদের সংস্পর্শ না পাওয়ায় তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও কমে গেছে। তবে শহরে জীবনযাপন অপেক্ষা গ্রামীণ জীবনযাপনে এখনও অনেকখানি বাঙালীর জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে, কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রামীণ জনজীবনও সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাঙালীর পারিবারিক সম্পর্কগুলিতে শাশুড়ী-পুত্রবধূ, ননদ-ভাজ, দুই সতীন কিংবা বিমাতা-সপত্নীজাত সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্তন হয়নি; আজও এই সম্পর্কগুলি মধুর নয়। মধ্যযুগে বাংলার গ্রাম এককেটি বৃহৎ পরিবারের মত ছিল, সেখানে আধুনিক যুগে পাড়া বা নিকটতম প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যেত উৎসব অনুষ্ঠানে সমগ্র গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠত, একালে তা একটি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে গেছে মধ্যযুগীয় জাতিভেদ প্রথায়। আধুনিক যুগের প্রারম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দীর কয়েক দশক পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল, এমন কি একালেও আছে, কিন্তু চতুঃবর্ণ প্রথা বা ছত্রিশ বর্ণ ভেদ অনেকটাই মূল্যহীন হয়ে গেছে। বস্তুত এ'কালে সামাজিক পরিচয় অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তি পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে; তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ভেদ নেই বলা চলে। ব্রাহ্মণের মধ্যে কিছুটা জাতিগত সচেতনতা থাকলেও তা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণরা সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও অবস্থান অনুযায়ী বৃত্তি গ্রহণ করেছে। যজন-যাজন বৃত্তির ব্রাহ্মণ একালে খুব কম চোখে পড়ে, বরঞ্চ বলা যায় পূজা-পার্বণে পূজারী পুরোহিত পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। সকল বর্ণের মানুষ একত্রে আহার করা মধ্যযুগে দুষ্কর ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম পানিহাটিতে সকল বর্ণের মানুষের একত্রে পঙ্‌তি ভোজনের ব্যবস্থা করে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, তাঁর কীর্তনের আসরগুলি সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। একালে সকল বর্ণের মানুষ নির্বিবাদে পঙ্‌তি ভোজন করে থাকে। তাছাড়া আইনগতভাবে জাতিভেদ করা, মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করা অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। শিক্ষার প্রভাবে তথাকথিত অন্ত্যজরাও আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে; নিজের স্বাধীকার ও অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের ভেদাভেদ অনেক মুছে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে সরকারীভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিত করে মানুষকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- আদিবাসী. তফশিলী, অন্যান্য অনগ্রসর এবং সাধারণ । পিছিয়ে পড়া মানুষদের চিহ্নিত করে সরকারীভাবে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমেও পিছিয়ে পড়া মানুষকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক সম্পর্কগুলিতে দেখা যায় অনেকক্ষেত্রেই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, ফলে জনমিশ্রণের সুযোগ একালে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত বাঙালী হিন্দুই নয়, অনেকক্ষেত্রে মুসলিম. খ্রীষ্টান, বিদেশী-দেশী সকলের মধ্যে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ বেড়েছে। একালে কেউ জাতিগতভাবে তথাকথিত হীন নয়,মধ্যযুগে তো বটেই বিংশ শতাব্দীতেও বিভিন্ন কারণে নিম্নবর্ণের মানুষ বা সামাজিক কারণে একই বর্ণের অন্তর্গত মানুষের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে সামাজিকভাবে অবরোধ করা হত. একালে এগুলি হাস্যকর ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। শিক্ষার বিস্তার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের ফলে মানুষের মূল্য প্রায় সমান হয়ে গেছে। অর্থ কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থের মানদণ্ডে মানুষের মূল্য

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই অনেক দিন আগেই বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্য' গ্রন্থে অর্থ কৌলীন্যের দ্বারা মানুষের মূল্য বিচারের কথা বাঘ্রচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের মুখে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। কিন্তু প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকেই, তাই একালেও মানুষ যথার্থ সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, সমাজের অন্তঃস্থলে দুষ্ট ক্ষতের মত রয়ে গেছে জাতিভেদ। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে জাতিভেদ প্রথার কথা পাওয়া যাচ্ছে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' ও অন্যান্য উপন্যাস ও গল্পে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। একালেও তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ অনগ্রসর শ্রেণীর বা তথাকথিত অন্ত্যজদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় তো বটেই, শিক্ষিত শহুরে সমাজেও রক্ষণশীলতা দেখা যায়। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও গ্রহ-নক্ষত্র, ঠিকুজি কিংবা জাতিগত প্রশ্ন তুলে থাকে। রক্ষণশীল পরিবারের অচলায়তনে আজও মুক্তির বাতাস লাগেনি।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রটি আজও যে মধ্যযুগীয় রয়ে গেছে তা একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। মধ্যযুগে মুসলমান শাসক সম্প্রদায় হিন্দুর উপর নিপীড়ন করলেও সাধারণ মানুষ মিলে মিশে বসবাস করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানরা নিজেদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। বস্তুত মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণে হিন্দুসমাজ অপেক্ষা পিছিয়ে পড়েছিল, ফলে মুসলমান রাজনৈতিক নেতারা তাদের জন্য পৃথক্‌ভাবে চিন্তাভাবনা করেন। বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেনের মত শিক্ষাব্রতী মুসলমান মহিলারা মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্য লেখনী ধারণ করেন। হিন্দু-মুসলমানের এই ভেদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা- হাঙ্গামা বৃদ্ধি পায় এবং সব চাইতে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তাতেও কিন্তু সমস্যার শেষ হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি। ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ সমস্যাকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যপূর্ণ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হলে পৃথক পৃথক দাঙ্গায় প্রচুর হিন্দু-মুসলমান প্রাণ হারায় দুই বঙ্গেই। তসলিমা নাসরিন তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাসে এর বিবরণ দিয়েছেন। তার অনেক আগে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থান বা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে নির্বিচারে হিন্দু জনগণকে হত্যা করা হয়েছিল, মুসলমান হত্যাও কম হয়নি। বর্তমান বাংলাদেশের বহু শরণার্থী ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সে সময়ে। তাছাড়া স্বাধীনতার ছাপান্ন বছরেও হিন্দু-মুসলমান সমতা আইনের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই মুসলমানদের জন্য পৃথক আইন সংস্থা রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানকে একই শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে আসা যায়নি। কাজেই বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তাদের সম্পর্ক মধ্যযুগ অপেক্ষা ভাল একথা দাবী করা যায় না।

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রটি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে, বস্তুত এই দ'ুটি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের বোধহয় তুলনা চলে না। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর নয়। অবিভক্ত বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গ কৃষি প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ শিল্প ও কৃষি প্রধান ছিল। বর্তমানে শিল্প ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হলেও কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে অনেক কম। তবে উন্নত চাষ পদ্ধতি উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সারের ব্যবহারে আধুনিক কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। শিবায়নে যে ধানের নাম পাই, আজ সেগুলি স্মৃতি মাত্র। উচ্চ ফলনশীল বীজ পূর্বের ঐতিহ্যশালী শস্যকে সরিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে উন্নত উচ্চ ফলনশীল ধান— জয়া,রত্না, পদ্মা, আই-আর-এইট ইত্যাদি চাষ হয়। ধান ছাড়াও গম, আলু, ডাল, শাকসবজি, ফল ইত্যাদির উন্নত বীজের ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুপালনে বেশী হারে মাংস, দুধ ও ডিম প্রদানকারী গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন করা হয়। বেশী ডিম ও মাংস পাওয়ার জন্য পোলট্রি প্রথায় হাঁস, মুরগী পালন করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদন বর্তমানে একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। মানুষের পশুপালন প্রবণতা কমে গেলেও ডেয়ারী শিল্পগুলি দুধের চাহিদা

মেটায়। বর্তমানে বাংলার নদীনালা ও খালবিলে মাছের সংখ্যা ভয়ানকভাবে কমে গেছে, এর কারণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ ধরা। তাই জনগণ ও সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর মাছ চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশীয় মাছের জায়গায় বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছ রসনা পরিতৃপ্তি করছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার প্যাকেটজাত মাছ,মাংস ও দুধে বাজার ভরে যাচ্ছে। সরকারী সহয়তায় গ্রাম সংসদ ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী পশুপালন ও চাষবাস করে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে পারছে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে কৃষকের অবস্থা যেমন ভাল ছিল না তেমনি কৃষিও আদিম পদ্ধতিতেই হত। কৃষকরা জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হত; বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে সে তথ্য তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের চাষবাস হয় আদিম পদ্ধতিতেই। আজও কৃষককে চাষের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হলে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না, কৃষক উৎপাদিত ফসলের নায্য মূল্য পায় না। ফলে একালেও প্রতি বছর অনেক কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ফলে গ্রাম বাংলার সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক-মজুরদের অবস্থার উন্নতি ঘটলেও সবার এক অবস্থা নয়। মধ্যযুগে বাংলার সমৃদ্ধশালী কুটীরশিল্পের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আজও বাঙালী সমাজে সমান জনপ্রিয়। বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বিদেশেও বাংলার কুটীরশিল্প সমাদৃত হচ্ছে।

বাঙালীর ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ মধ্যযুগ অপেক্ষা একালে আরও সঙ্কর আকার ধারণ করেছে। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব তিনটি ধর্মীয় বিশ্বাসে বিভক্ত বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে আধুনিক যুগের শুরুতেই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত করেন; অবশ্য ব্রাহ্মধর্ম কোন ধর্ম বিশেষ নয়, সকল ধর্মের সম্মিলিত একটি নতুন রূপ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্রের নেতৃত্বে হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হয়, এর উদ্দেশ্য হল পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থান; এই পর্বটিকে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম এর যুগ বলা হয়। এ পর্বের সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যকর্মে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করেন। গিরিশচন্দ্রের মত নাট্যকার মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ প্রচার করেন তাঁর পৌরাণিক নাটকাবলীতে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ এবং শ্রী অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে শাক্তধর্ম নতুন মাত্রা পায়। স্বামী বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চিকাগোর ধর্মীয় সম্মেলনে হিন্দুধর্মকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। আধুনিক যুগ কিন্তু ভক্তিবাদ বা দৈববাদের যুগ নয়- নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি শৃঙ্খলার দ্বারা যাচাই করাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সনাতন বাঙালীর ঘরে ঘরে দৈববাদ-ভক্তিবাদ মুছে যায়নি। শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব আজও সমানভাবে রয়েছে। আজও প্রকৃতিগত ভাবে বাঙালী পঞ্চোপাসক; বাঙালীর ঠাকুরঘরে প্রায় সকল দেবতার সমান অধিষ্ঠান। গ্রামীণ সমাজে বার-ব্রতের পরিমাণ কমে গেলেও বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। আরোগ্য কামনায়, বৃষ্টি বা শস্য কামনায় বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা হয়। অবশ্য বর্তমানে শিক্ষিত বাঙালী ধর্মকেও যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করেছে। ব্যক্তিবাদের বিকাশের ফলে ধর্মীয় উন্মাদনা বা দৈব নির্ভরতা শিক্ষিত সমাজে হ্রাস পেয়েছে, তাহলেও সাধারণ বাঙালী সমাজে ধর্মীয় উন্মাদনা একেবারেই মুছে গেছে তা নয়, মাঝে মাঝেই তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। বস্তুত একালের শিক্ষিত বস্তুবাদী বাঙালী ধর্মকে কিছুটা সঙ্কীর্ণতা মুক্ত করে সংস্কৃতির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তাই একালে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকল ধর্মের ধর্মানুষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণীর মানুষ সমানভাবে সমবেত হয়ে থাকে। সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানব জীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় ঠাকুর দেবতার নামে নামকরণ করার প্রবণতাও কমে গেছে। পূজা-পার্বণে ধর্মীয় আচার ও ভক্তি বা নিষ্ঠার পরিবর্তে জৌলুস বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক যুগে মানুষের মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসের স্থানটি গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রপূজার প্রতি আগ্রহ বা রাজনৈতিক উন্মাদনা। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী দেবদেবীদের স্থান দখল করেছে একালের রাষ্ট্রনায়কগণ। আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাজনীতি অনেকটা সমার্থক হয়ে গেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে জনগণকে নিষ্ক্রিয় করে দেবদেবীরা যে নিয়ন্ত্রণ

নীতি চালাত সেভাবে জনমতকে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দলীয় ব্যবস্থার অনুবর্তী ও নিষ্ক্রিয় করে রাখার সর্বাত্মক কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। দেবদেবীদের মতই বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে জনগণকে ভয় দেখানো বা বলপ্রয়োগ করে বশীভূত রাখা হয়। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নীতি বা রাষ্ট্র পরিচালকদের মতামত মধ্যযুগীয় ধর্মের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপদেবতা বা উপদেবতা বা অনিষ্টকারী শক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তিগুলি জনজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে। সেখানে মানুষের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা ও স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে।

বস্তুত কোন সমাজই স্থিতিশীল নয়, নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলাই সমাজের ধর্ম। কিন্তু এই বিবর্তন সর্বদা স্থূলভাবে চোখে পড়ে না। সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক চরিত্র একত্রিত হয়ে যে সমাজ-চরিত্র গড়ে ওঠে তা রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, বিবর্তিত হয়। প্রাচীনযুগীয় বাঙালী সমাজ মধ্যযুগ অতিক্রম করে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছে। মানব সমাজ নানা পরিবর্তন ও পরিশীলনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হলেও, একথা বলা যায় মানুষের বর্তমানের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে তার প্রাচীনতম মিথটি; এবং ভিন্নতর অবস্থায় তার প্রকাশও ভিন্নতর। মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে একালের জীবনযাত্রার তুলনা চলে না, তবে লক্ষণীয় বিংশ শতাব্দীর দু'-তিনের দশকের আগে বাঙালী মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে ত্যাগ করতে পারেনি। একালেও গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় জীবনের প্রভাব রয়েছে। বাঙালীর সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ, বিশ্বাস-সংস্কারের মূল প্রোথিত রয়েছে মধ্যযুগেই, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে হলেও তার রূপ-রস মধ্যযুগীয় সমাজ ইতিহাসের মধ্যে থেকেই পাওয়া যায়। কাজেই যাকে বিবর্তন বলা হচ্ছে সেটা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের শুরু পর্যন্ত ততবেশী ক্রিয়াশীল নয়। বর্তমানে বাঙালী সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, যা শুধু শহুরে জীবনই নয় গ্রামীণ জীবনকেও প্রভাবিত করছে, ফলে বাঙালী সমাজ দ্রুত তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলছে। পশ্চিমী দুনিয়ার হাতছানি গ্রাম বাংলার জনজীবনকেও স্পর্শ করছে। পরিবর্তন বা বিবর্তন ইতিহাসের নিয়তি, কিন্তু অতি দ্রুত বিবর্তন জাতির ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করতে পারে, তাই বাঙালীর স্বকীয়তা রক্ষার্থে তার সংস্কৃতিগত ও ঐতিহ্যগত অনুশীলন প্রয়োজন। কেননা মানুষ যদি তার ঐতিহ্য ভুলে যায়, তার সংস্কৃতির সংরক্ষণ না করে, তবে তো জাতি হিসাবে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরবর্তী প্রজন্ম জানতেও পারবে না আমরা কী ছিলাম, কোথা থেকে এলাম।

তথ্যপঞ্জী

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পৃ :৭।

২। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ডঃ অতুল সুর, পৃ : ৩৫৯।

৩। ভোজন শিল্পী বাঙালী, বুদ্ধদেব বসু, 'প্রসঙ্গত'-অংশ।

৪। বাংলার সঙ্গীত, রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'পরিচিতি' অংশ।

৫। বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ : ১২।

৬। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ : ৯১।

৭। সঞ্চয়িতা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ : ৫৫৫।

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১। গুপ্ত, বিজয় : পদ্মাপুরাণ,
শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

২। গাঙ্গুলী, মানিকরাম : ধর্মমঙ্গল,
শ্রী বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।

৩। ঘোষাল, জগজ্জীবন : মনসামঙ্গল,
ডঃ আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।

৪। চক্রবর্তী, মুকুন্দ : কবিকঙ্কণ চণ্ডী,
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

: কবিকঙ্কণ চণ্ডী,
ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত,
সাহিত্য অকাদেমী, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১।

: কবিকঙ্কণ চণ্ডী,
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী
সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪।

৫। চক্রবর্তী, রূপরাম : ধর্মমঙ্গল,
অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত,
ভারবি, ১৯৮৬।

৬। চক্রবর্তী, ঘনরাম : শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,
শ্রী পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

৭। চক্রবর্তী, দ্বিজ বংশীদাস : শ্রীশ্রীপদ্মাপুরাণ,
শ্রী মদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও
শ্রী ধনপতি হালদার (পুরাণ ভারতী) কর্তৃক
সংশোধিত, জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রেস।

৮। দত্ত, মানিক : চণ্ডীমঙ্গল,
শ্রী সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।

৯। দ্বিজ মাধব : মঙ্গলচণ্ডীর গীত,
শ্রী সুধীভূষণ আচার্য সম্পাদিত,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।

১০। দেব, সুকবি নারায়ণ : পদ্মাপুরাণ,
শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদিত,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭।

১১। দ্বিজ রামদেব : অভয়ামঙ্গল,
শ্রী আশুতোষ দাস সম্পাদিত,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

১২। পিপিলাই, বিপ্রদাস : মনসাবিজয়,
ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত,
এশিয়াটিক সোসাইটি।

১৩। পাল, বিষ্ণু : মনসামঙ্গল,
ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত,
এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৮।

১৪। ভট্ট, ময়ূর : ধর্ম্মমঙ্গল,
অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত,
জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং,
প্রথম প্রকাশ ১৮৩১।

১৫। ভট্টাচার্য, রামেশ্বর : শিবসঙ্কীর্ত্তন পালা,
যোগিলাল হালদার সম্পাদিত।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭।

১৬। রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র : শিবায়ন,
শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩।

১৭। রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র : ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৯।

১৮। ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস : মনসামঙ্গল,
অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পাদিত,
লেখাপড়া,
প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪।

সহায়ক গ্রন্থ

১। আলাওল : পদ্মাবতী (১ম খণ্ড),
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৪।

: পদ্মাবতী (২য় খণ্ড),
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৫।

২। আব্দুল করিম, মুন্সী (সংকলিত) ও শরীফ, আহমদ সম্পাদিত : পুঁথি পরিচিতি,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২

৩। কাজী, দৌলত : লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না,
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,
সাহিত্য সংসদ, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫।

৪। কৃত্তিবাস : রামায়ণ,
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ সেন, শ্রী গোপাল হালদার ও
শ্রী অশোক ঘোষ সম্পাদিত,
সাক্ষরতা প্রকাশন,
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি,
প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪।

৫। খান, মুহম্মদ : সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ,
আহমদ শরীফ সম্পাদিত,
বাঙলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।

৬। গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস,
গ্রন্থ নিলয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৯।

: কবি মুকুন্দরাম, গ্রন্থ নিলয়,
তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

৭। গুপ্ত, ঈশ্বর : কবিতা সংগ্রহ,
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত,
প্রথম কলেজষ্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৯৮৭।

: কবি জীবনী,
ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত,
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি,
অকাদেমি সংস্করণ ১৯৯৮।

৮। গুপ্ত, রামপ্রাণ সম্পাদিত : রিয়াজ-উস-সালাতিন,
কলিকাতা, ১৩২২ বঃ।

৯। গাজী, দোনা : সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল,
আহমদ শরীফ সম্পাদিত,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫।

১০। গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ : মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য,
পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৮
: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র,
পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৯।
: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র,
পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬।

১১। গিরি, সত্যবতী : বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ,
রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮।

১২। গিরি সত্যবতী ও মজুমদার, ডঃ সমরেশ সম্পাদিত : প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ, মধ্যযুগ, পৃঃ ১১-১৫০,
রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।

১৩। গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ : শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌,
সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত,
পি.সি. মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৪১।

১৪। গোস্বামী, ডঃ জয়ন্ত : প্রাচীন পুথি গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ,
পুস্তক বিপণি, ১৯৯০।

১৫। ঘোষ, কবিতা : সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য,
পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪।

১৬। ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড,
প্রকাশ ভবন, দ্বিতীয় সংস্করণ,
চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৫।
: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড
প্রকাশ ভবন, দ্বিতীয় সংস্করণ.
তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৮।

১৭। চক্রবর্তী, নিরঞ্জন : ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও
বাংলা সাহিত্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড,

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮।

১৮। চক্রবর্তী, ডঃ বরুণকুমার (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪।

: চৈতন্য পরিক্রমা, খিদিরপুর হরিসভা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৩।

১৯। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার : চর্যাগীতির ভূমিকা, ডি.এম.লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫।

২০। চক্রবর্তী, মুকুন্দ : কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম খণ্ড), ডঃ ক্ষুদিরাম দাস সম্পাদিত, দে'জ পাবিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৯।

: চণ্ডীমঙ্গল (ধনপতি উপাখ্যান), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

: চণ্ডীমঙ্গল ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চ্যাটার্জী পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।

২১। চক্রবর্তী, ডঃ পঞ্চানন : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১৪০২।

২২। চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রমোহন : বাঙালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০), সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪।

২৩। চট্টোপাধ্যায়, অঘোরনাথ : মেয়েলি ব্রত, শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্যাপিরাস, ১৯৯৭।

২৪। চট্টোপাধ্যায়, ডঃ হীরেন : শাক্ত পদাবলীর রূপরেখা, এস. ব্যানার্জি এণ্ড কোং, পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৮৭।

২৫। চট্টোপাধ্যায়, অসীম (অনূদিত) : গ্রামবাংলার ইতিকথা, W.W. Hunter এর Annals of Rural Bengal এর অনুবাদ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক

২৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, তুলিকলম,

প্রথম সংস্করণ ১৩৯৩।

২৭। চট্টোপাধ্যায়, সুনিতী কুমার : বাঙ্গালীর সংস্কৃতি
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী,
চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৮

২৮। চন্দ্র, দ্বিজমাধব : চণ্ডিকার ব্রতকথা,
নৃপেন্দ্রনাথ পাল ও মৃণালকান্তি দাস
সম্পাদিত, ১৯৮২।

২৯। চৌধুরী, ভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়),
দে'জ পাবলিশিং, নূতন সংস্করণ ১৯৯৫।

৩০। চৌধুরী, নীরদচন্দ্র : আত্মঘাতী বাঙালী, প্রথম খণ্ড,
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,
প্রথম প্রকাশ, একাদশ মুদ্রণ ১৪১০।

৩১। চণ্ডীদাস, বড়ু : শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন,
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত,
দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ ১৯৯৬।

৩২। জলিল, ডঃ মুহম্মদ আবদুল : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও
বাঙালী সমাজ,
বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬।

৩৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সঞ্চয়িতা,
বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ,
সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ ১৪০০।
: রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯
: রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড.,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০।

৩৪। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : বাংলার ব্রত,
বিশ্বভারতী, ১৪০৭।

৩৫। দাস, কৃষ্ণরাম : কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,
শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

৩৬। দাস, বৃন্দাবন : শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত,
বসুমতি-সাহিত্য-মন্দির,
পঞ্চম সংস্করণ।

৩৭। দাস, লোচন : চৈতন্যমঙ্গল,

বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই সম্পাদিত,
সাহিত্যলোক,
প্রথম সংস্করণ ২০০০।

৩৮। দাস, কাশীরাম : মহাভারত (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ সেন,
শ্রী গোপাল হালদার ও
শ্রী কেশব আড়ু সম্পাদিত,
সাক্ষরতা প্রকাশন,
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি,
প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬।

৩৯। দাস বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ : গোসানীমঙ্গল, হরিশচন্দ্র পাল সম্পাদিত,
ত্রিবৃত্ত প্রকাশন, কুচবিহার।

৪০। দত্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ : ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, ৩য় খণ্ড,
নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

৪১। দত্ত, বরুণকুমার : শ্রী চৈতন্যের জীবন ও দর্শন,
নবপত্র প্রকাশন।

৪২। দত্ত, অক্ষয়কুমার : ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়,
করুণা প্রকাশনী, প্রথম করুণা সংস্করণ,
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৯।

৪৩। দে, আশিস্কুমার
ও
রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল
আলোচনা ও পর্যালোচনা,
পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬।

৪৪। দে, আশিস্কুমার : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাষাপট ও ভাবকথা,
(প্রথম খণ্ড), শৈলী, প্রকাশ ১৯৯৭।

৪৫। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,
সাহিত্য সংসদ,
প্রথম প্রকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৮৭।

৪৬। পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ,
ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড,
প্রথম প্রকাশ ১৯৫২।

৪৭।পণ্ডিত, রামাই : শূন্যপুরাণ,
ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৭৭।

৪৮। নস্কর, শ্রী সনৎকুমার : মুঘলযুগের বাংলা সাহিত্য,
রত্নাবলী,
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫।
: মেয়েলি ব্রত বিষয়ে,

পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫।

৪৯।বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৫।

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পঞ্চম মুদ্রণ ২০০০।

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড), প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড), দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮১।

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (চতুর্থ খণ্ড) মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫।

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (পঞ্চম খণ্ড) মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫।

: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পুণর্মুদ্রণ ২০০১-২০০২।

৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র : মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী, কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬।

৫১। বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন : মধ্যযুগে বাঙ্গলা, কমল চৌধুরী সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং।

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পাদিত) : জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮,

৫৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র ও সিংহরায়, শ্রী শুভেন্দুসুন্দর (সম্পাদিত) : বাশুলীমঙ্গল বা বিশাললোচনীর গীত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৪।

৫৪। বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস : বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)
দে'জ পাবলিশিং
তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

৫৫। বসু, স্বপন : বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস
পুস্তক বিপণী, ১৯৭৫।

৫৬। বসু, রাজনারায়ণ : সে কাল আর এ কাল
শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রী সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ।

৫৭।বসু, বুদ্ধদেব : ভোজন শিল্পী বাঙালী,
বিকল্প প্রকাশনী,
প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

৫৮। বসু, শঙ্করীপ্রসাদ : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য,
(বৈষ্ণব কবি ও কাব্য)
জেনারেল, নবম সংস্করণ ১৯৯৭।
: চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি,
দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ ১৯৯৯।
: কবি ভারতচন্দ্র,
দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ ২০০০।

৫৯। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবতা,
দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৮।

৬০।বসু, মালাধর : শ্রীকৃষ্ণবিজয়,
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও সুমঙ্গল রাণা
সম্পাদিত, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ ২০০৩।

৬১। বসাক, ডঃ শীলা : বাংলার ব্রতপার্বণ
পুস্তক বিপণি
প্রথম সংস্করণ. দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০।

৬২।বিবেকানন্দ. স্বামী : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,
উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১৯৮৫।

৬৩। বিশ্বাস, নীতিশ ও
বিশ্বাস, মুকুলেশ (সম্পাদিত) : বঙ্গ সংস্কৃতি সংহতির ঐতিহ্য.
ঐক্যতান গবেষণা সংসদ, ১৯৯৫।

৬৪। ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,
পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ ১৯৯৮।

(সংকলিত ও সম্পাদিত) : বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা,.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬২।

: বাংলার লোকসাহিত্য,
ক্যালকাটা বুক হাউস,
তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২।

৬৫। ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পাদিত) : চৈতন্য প্রসঙ্গ,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,
প্রথম প্রকাশ ১৩৯৬।

৬৬। ভট্টাচার্য, পণ্ডিত প্রবর গোপালচন্দ্র (সম্পাদিত ও সংশোধিত) : মেয়েদের ব্রতকথা,
নির্মল বুক এজেন্সি,

৬৭। ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী : বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি,
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৪।

৬৮। ভট্টাচার্য, শ্রী পরেশচন্দ্র : সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়,
জয়দুর্গা লাইব্রেরী,
তৃতীয় সংস্করণ ২০০১।

৬৯। ভট্টাচার্য, শিবপ্রসাদ : ভারতচন্দ্রের কবি মানস,

৭০। ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার : উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি,
ভারতী বুকস্টল, ১৯৭০।

৭১। ভদ্র, গৌতম : মুঘলযুগের কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ,
সুবর্ণরেখা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৩।

৭২। মিত্র, রাজ্যেশ্বর : বাংলার সঙ্গীত,
প্রাচীনযুগ, মিত্রালয়।

: বাংলার সঙ্গীত
মধ্যযুগ, মিত্রালয়

৭৩। মিত্র, প্রেমেন্দ্র : শ্রেষ্ঠ কবিতা
সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
দেজ পাবলিশিং
তৃতীয় মুদ্রণ - ১৯৯১

৭৪।মিত্র. শ্রী সনৎকুমার : রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য,
সাহিত্য প্রকাশ.
প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮।

৭৫।মণ্ডল. ইন্দুভূষণ : বাংলা মঙ্গলকাব্যে লৌকিক উপাদান.
সাহিত্যলোক,
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

৭৬। মণ্ডল, শ্রী পঞ্চানন (সম্পাদিত) : গোর্খবিজয়, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭।

: পুঁথি-পরিচিতি, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫৮।

: চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র, প্রথম খণ্ড বিশ্বভারতী, ১৩৭৫।

৭৭। মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), মধ্যযুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৩।

: বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, কলিকাতা, ১৩৭৫।

: বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, ভারতী বুকস্টল, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩।

৭৮। মজুমদার, বিমানবিহারী : গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাহার যুগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১।

৭৯। মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত) : বাংলার লোকসংস্কৃতি, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬।

৮০। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ : 'শ্রী চৈতন্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব', নীতি, যুক্তি ও ধর্ম কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, গ্রন্থে সংকলিত, পৃ, ১৪০-১৪৯. আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৩৯৫।

৮১। মল্লিক, দীপঙ্কর : মধ্যযুগ ফিরে দেখা, পুস্তক বিপণি প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

৮২। মুখোপাধ্যায়, প্রভাত : মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ২০০১।

৮৩। মুখোপাধ্যায়. সুবোধকুমার : প্রাক্‌পলাশী বাংলা, কে.পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী. প্রথম প্রকাশ ১৯৮২।

৮৪। মুখোপাধ্যায়. গীতা : বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা।

৮৫। মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ : জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, কে.পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮১।

৮৬। মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুখময় : বাংলার নাথ সাহিত্য, সুবর্ণরেখা প্রথম প্রকাশ ১৪০১।

: কৃত্তিবাস পরিচয়, শ্রীগুরু লাইব্রেরী প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯।

: বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

: বাংলার ইতিহাসের দু'শোবছর, ভারতী বুকষ্টল, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৮।

: বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়কাল, ভারতী বুকষ্টল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯২।

: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুকষ্টল, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮।

৮৭। রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল, অধ্যাপক কার্তিক ভদ্র সম্পাদিত, এস. ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ১৯৮৩।

৮৮। রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), লেখক সমবায় সমিতি, ১৩৮২।

৮৯। রায়, অনিরুদ্ধ ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।

৯০। রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র : চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল, প্রথম সংস্করণ।

৯১। রায়, গিরিজাশংকর : উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, এন.এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়. আসাম, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৯।

৯২। লাহিড়ী, দুর্গাদাস : বঙ্গের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩১৫।

৯৩। শরীফ, আহমদ : বাঙালীর চিন্তাধারার বিবর্তন,
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭।
: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমাজ
ও সংস্কৃতির রূপ,
ঢাকা, ১৯৭৭।

৯৪। শাস্ত্রী, শিবনাথ : আত্মচরিত,
বিশ্ববাণী প্রকাশনী,
প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩।
: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,
কলিকাতা, ১৯০৯।

৯৫। সেন, শ্রী সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ,
তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫।
: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,
দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ সংস্করণ,
পঞ্চম মুদ্রণ ২০০০।
: ইসলামি বাংলা সাহিত্য,
ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স,
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮০।
: বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
সপ্তম সংস্করণ ১৯৬৩।
: মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী
বিশ্বভারতী।

৯৬। সেন, দীনেশচন্দ্র : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান
করুণা প্রকাশনী,
প্রথম করুণা সংস্করণ, ১৯৯৫।
: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম খণ্ড),
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,
তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২।
: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড),
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ,
তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০২।
: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

৩। Dev, Ashutosh : Dev's Concise Dictionary
Dev Sahitya kutir, Private Ltd,
Received Edition, 1979.

গবেষণাপত্র

১। নিয়োগী, তুষারকান্তি : বাংলা মঙ্গলকাব্যে লোকসাহিত্যগত ভিত্তি,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮।

২। ধর (দাস), শ্রীমতী মায়া : মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যানকাব্যের ভিত্তিতে
মধ্যযুগের বাঙালী নারীসমাজ,
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯।

NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY